কলাবতী

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

সৃষ্টির চালচিত্র

দুটি সুবৃহৎ খণ্ডে আমার 'বীর্যবতী বীরভোগ্যা' নামে হাজার হাজার বছরের মানব-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত ষোলোখানি উপন্যাস প্রকাশের পর দে'জ পাবলিশিং খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করছেন আমার রোমান্টিক উপন্যাসগুলি। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তিনটি খণ্ড—'মৃগনয়নী', 'মধুমাধবী', 'অধরা মাধুরী'। সংকলিত প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ।

খণ্ডগুলি পরপর প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে।

এবারও বইমেলাতে প্রকাশিত হল দুটি খণ্ড—'ললিত বসন্ত' আর 'কলাবতী'।

প্রতিটি রোমান্টিক উপন্যাস সৃষ্টির পেছনে আমার ভেতর কি প্রেরণা কাজ করেছে, তা জানতে চেয়েছিল আমার কন্যা-প্রতিম এক পাঠিকা—কল্যাণীয়া রোমি সাহা।

আমি উপন্যাস রচনার পশ্চাৎ সূত্রগুলি তার কাছে বিভিন্ন সময়ে বলে গেছি আর সে শ্রুতিধরের মতো সেগুলি তার স্মৃতিতে ধরে রেখে আমার কাছে লিখে এনে দিয়েছে। আমি সেগুলি সামান্য সংশোধনের পর প্রতিখণ্ডে প্রকাশ করেছি।

এবার কল্যাণীয়া রোমিই পরিবর্তন করেছে তার পরিকল্পনা। সে আমার উপন্যাসগুলি সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছে আর উত্তরদাতার ভূমিকায় আমি এঁকে গেছি আমার সৃষ্টির চালচিত্রগুলি।

কৃষ্ণকলি

প্রঃ বহু বিচিত্র পটভূমিতে আপনি আপনার উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন। তার ফলে পাঠক কাহিনীর রস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে পটভূমিরও একটি স্বতন্ত্র আস্বাদ। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি আপনার বেশ কয়েকটি উপন্যাসে কাহিনী ভিন্ন হলেও একই পটভূমি বারবার ফিরে এসেছে—এর কারণ কি ?

উঃ প্রকৃতির অজস্র দাক্ষিণ্যে পূর্ণ হয়ে আছে আমাদের এই দেশ। সেই বিচিত্র আনন্দ-নিকেতনে আমন্ত্রিত অতিথির মতো আমি বারে বারে উপস্থিত হয়েছি। যে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি আমাকে আবিষ্ট করেছে, সেখানে আমি একাধিকবার নিয়ে গেছি আমার প্রিয়জনদের। একই সঙ্গে আনন্দযজ্ঞে অংশ নেব বলে।

আমার উপন্যাসের চরিত্রগুলিও আমার প্রিয়জনদের মতো একান্ত অন্তরঙ্গজন। তাই তাদের ওই সব পটভূমিতে নিয়ে গিয়ে আমি গভীর তৃপ্তি লাভ করেছি। আমার উপন্যাসের পাঠকেরা আমার কাহিনীর সঙ্গী হয়ে সেই সব রূপলোকের আনন্দ আস্বাদ করেছে।

কুলুর পটভূমিতে আমি বেশ কয়েকখানা উপন্যাস লিখেছি—আঁধার পেরিয়ে, অপরাহ্ণে অরুণোদয়, নির্জনে খেলা, নির্ঝরের গান ও তিন্‌নির রোদ আর বৃষ্টি। শেষের তিনটি একই উপন্যাসের তিনটি পর্ব।

আবার কিন্নরের পটভূমি আমার তিনটি উপন্যাসকে স্পর্শ করে আছে।—কিন্নরী, তুমি রবে নীরবে, অগ্নিশুচি।

কার্শিয়াং-এর পটভূমি আমি ব্যবহার করেছি আমার ভোরের রাগিণী, আপন ঘর, কৃষ্ণকলি ও অগ্নিশুচি উপন্যাসে।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে নিয়ে এসেছি রিসেপ্‌শনিস্ট, নন্দিনী, কন্যাকাশ্মীর উপন্যাসের ভেতর।

সমুদ্র পর্বতবেষ্টিত কেরালায় আমি আবিষ্কার করেছিলাম নর্তকী প্রেমা মেননকে। যাকে রূপ দিয়েছি আমার মোহিনী উপন্যাসে। নিষাদী উপন্যাসটিও আংশিকভাবে কেরালার ছায়ায় রচিত।

প্রায় শতাধিক উপন্যাসের ভেতর এই কয়েকটি মাত্র আবর্তিত হয়েছে চার পাঁচটি বিশেষ পরিবেশকে কেন্দ্র করে।

প্রঃ কৃষ্ণকলি উপন্যাসটি পড়ে আমার ভাল লেগেছে। এর কাহিনীর বিন্যাস, চরিত্র সন্নিবেশ অন্তরঙ্গ পাঠককে আকর্ষণ করবে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, কৃষ্ণকলির ওপরেই আপনি বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

উঃ তুমি ঠিকই ধরেছ, কৃষ্ণকলিই আমার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। একটি কালো মেয়ের নানারকমের গুণ থাকা সত্ত্বেও সমাজে কখনও কখনও তাকে অবহেলার শিকার হতে হয়। সেই সত্যটিকে আমি কৃষ্ণকলির ভেতর দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

যে ছেলেটির সঙ্গে তার মনের আদান-প্রদান ছিল, ঘটনার আবর্তে তাকে সরে যেতে হল তার কাছ থেকে। মা ও সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কৃষ্ণকলি স্বার্থপরের মতো নিজের সুখের সংসারটি রচনা করতে চাইল না। একান্ত প্রিয় সঙ্গীটিকে হারানোর যন্ত্রণা সে সহ্য করল নীরবে।

প্রবীণদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সেবা ছিল তার সহজাত গুণ, এছাড়া বিপথগামী বন্ধুকে সে সৎপথের সন্ধান দিয়ে টেনে নিয়েছে নিজের কাছে।

কার্শিয়াং-এর পটভূমিতে কৃষ্ণকলি যখন তার পূর্বপ্রণয়ী দিব্যকে ফিরে পেল এবং যখন জানতে পারল দিব্যর সঙ্গে তার স্ত্রী সুচেতনার মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তখনও কিন্তু সে সুযোগ পেয়েও কাছে টানল না দিব্যকে। দিব্যর স্ত্রীর এতখানি প্রতিভার যে মৃত্যু ঘটছে সেটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। বন্ধুত্বকেই সে মেনে নিল জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন বলে।

এই সত্যের আলোকেই আমি কৃষ্ণকলিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

অগ্নিশুচি

প্রঃ অগ্নিশুচি উপন্যাসে শুচিস্মিতা আর অগ্নি কি আপনার কল্পলোকের বাসিন্দা না বাস্তবের মাটি থেকে তুলে এনেছেন? ওড়িশার বন্যা পরিস্থিতিকে আপনি আপনার উপন্যাসে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন। মনে হচ্ছিল সেটি আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল, না হলে এতখানি জীবন্ত চিত্র আঁকা বোধহয় সম্ভব হত না।

উঃ মর্নিং কলেজে পড়িয়ে, ডে-কলেজের পার্টটাইম কয়েকটা ক্লাশ নিয়ে আমি নামকরা প্রকাশন-সংস্থা 'রূপা' কোম্পানী'র এডিটিং-এর কাজে যোগ দিতাম।

আমি বসতাম, কোম্পানীর কর্ণধার মিঃ দাউদয়াল মেহেরার টেবিলের ঠিক উল্টোদিকের চেয়ারটি দখল করে। কাজের চেয়ে নানা বিষয়ের আলোচনায় জমে উঠত আসর। অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন মানুষটি।

আমার ডানদিকে বেশ বড় একটা জানলা। ঐ জানলার ফাঁকে দেখা যেত ট্রাম-রাস্তার উল্টোদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজ আর ফুটপাথ জুড়ে পুরনো বই-এর দোকান। দোতলা থেকে দেখতাম, মানুষজনের চলাচল। ঘন ঘন আওয়াজ তুলে চলে যেত অগণিত ট্রাম-বাস।

সেদিন আমি হাজির কিন্তু মিঃ মেহেরা অনুপস্থিত। চেয়ারে বসে বসে বই পড়ছিলাম। হঠাৎ প্রসেশানের আওয়াজ শুনে বই রেখে জানালার ধারে উঠে গেলাম। মনে হল মেডিক্যাল কলেজের দিক থেকে আসছে প্রসেশানটা।

একটি মেয়ে বইপত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রেসিডেন্সির গেটের সামনে। হঠাৎ কোথা থেকে হাজির হল দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ এক যুবক। তাদের যেন দীর্ঘদিন পরে দেখা হয়েছে এমনি একটা বিস্ময়ের ভাব, তারপর হাতে হাত বেঁধে উচ্ছ্বাস।

ঠিক সেই সময় প্রসেশানটা বাঁক নিয়ে যাচ্ছিল সম্ভবত ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটের দিকে।

হঠাৎ কোথায় যেন ভীষণ শব্দ করে দু'তিনটে বোমা ফাটল।

মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। যে যেদিকে পারছে দৌড়োচ্ছে। পুরনো বইগুলোকে পাঁজা করে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে পালাচ্ছে বই বিক্রেতারা।

নীচের রাস্তায় নেমে দেখলাম, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কোথা থেকে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল পুলিশের দু'তিনখানা কালো ভ্যান।

থমকে গেছে ছাত্রদের কোনও একটা প্রতিবাদ মিছিল।

সহসা কোথা থেকে ইঁটপাটকেল ছোঁড়া শুরু হল। অমনি পুলিশ হাতের কাছে যেসব ছেলেকে পেল, টেনে টেনে তুলতে লাগল ভ্যানে।

ছুটে এলো প্রেসিডেন্সির দিক থেকে সেই দুটি তরুণ-তরুণী। তারা পুলিশের হাত থেকে টেনে ছাড়াতে গেল সম্ভবত তাদের বন্ধুদের।

তাদের দুটিকেও অনেক ধস্তাধস্তির পর তোলা হল পুলিশ ভ্যানে।

কয়েক মিনিটের ভেতর ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। পুলিশের ভ্যানগুলো চলে গেল থানার দিকে।

আমার এই বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই উপন্যাসের সূচনা। বাকি কাহিনী কল্পনায় বোনা।

তোমার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর প্রসঙ্গে বলি, ওড়িশার ভয়াবহ সাইক্লোনের প্রত্যক্ষদর্শী আমি ছিলাম না। তবে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের তদানীন্তন সভাপতি বিজ্ঞান-সাধক শঙ্কর চক্রবর্তীমশায় সে সময় একটি সর্বভারতীয় কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন ভুবনেশ্বরে।

তাঁর সে সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই আমার বর্ণনায় উঠে এসেছে।

অবশ্য চারের দশকের প্রথমদিকে মেদিনীপুরের সমুদ্র-উপকূলে যে বিধ্বংসী সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম আমি।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে, তাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে 'অগ্নিশুচি' উপন্যাস রচনা শুরু করি।

মাধবী

প্রঃ বিষ্ণুপুরের পটভূমিতে আপনি লিখেছেন আপনার 'মাধবী' উপন্যাস। এই বৈষ্ণবী চরিত্রটিকে কি আপনি সত্যিই খুঁজে পেয়েছিলেন?

উঃ ড. পীযূষকান্তি আমার অনুজপ্রতিম, অন্তরঙ্গজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের একদা সম্পাদক এবং পরবর্তিকালে লাইব্রেরি সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান, পীযূষকান্তির অন্যতম পরিচয় সুরসিক কথাকোবিদ। আসর জমিয়ে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা এই সুদর্শন পুরুষটির।

পীযূষকান্তির যখন এতখানি পদোন্নতি ঘটেনি তখন আমরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম নানা জায়গায়। ভারতের বিখ্যাত অরণ্যভূমি সারান্দার কোলে গড়ে ওঠা টাউনশিপ 'গুয়া'-তে ওর মামা ছিলেন ডাক্তার। সেখানে আমরা মহানন্দে কটা দিন কাটিয়েছিলাম। তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরেস্ট রেঞ্জারের জিপে আমরা গভীর অরণ্যের অন্দরে কন্দরে রাত্রিদিন ঘুরে বেড়িয়েছি।

ঐ সারান্দার পটভূমিতেই আমি লিখি 'ডাক্তার জনসনের ডায়েরী' নামে উপন্যাস। পরবর্তিকালে যেটি 'শনিচারি' নামে 'বীর্যবতী বীরভোগ্যা' উপন্যাস সংকলনের অন্তর্ভূক্ত হয়।

এতক্ষণ আমার প্রশ্ন-বহির্ভূত এতগুলো কথা শুনে তুমি হয়ত মনে মনে ভাবছ, আমি কেন 'ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি'।

একটু সম্পর্ক আছে বইকি তোমার প্রশ্নের সঙ্গে। এই পীযুষকান্তিই আমার 'মাধবী' উপন্যাসের নায়ক 'অমৃত'। অবশ্য নানারকম গড়াপেটার ভেতর দিয়েই 'পীযুষ' 'অমৃতে' রূপান্তরিত হয়েছে।

একাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থের রচয়িতা পীযুষকান্তি। সেই কাজে সে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার অন্যতম কর্মকর্তা মানিকলালবাবু আমাদের আহ্বান জানান বিষ্ণুপুর ঘুরে দেখার জন্য। তাঁরই আতিথ্য লাভ করে আমরা একবার বিষ্ণুপুর বেড়াতে যাই।

সেখানে টেরাকোটার নিখুঁত নিদর্শনগুলি দেখতে পাই ভগ্ন মন্দির গাত্রে। খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠে গিয়েছিলাম মন্দিরের একটা বিশেষ জায়গায়। নীচ থেকে টেরাকোটার যে যুগল-মূর্তি আমাকে আকর্ষণ করছিল, তারই টানে আমি বিপদ উপেক্ষা করেও ওপরে উঠেছিলাম।

এখন, যুগল-মূর্তিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইঁট রঙের এমন অপূর্ব পোড়ামাটির রাধাকৃষ্ণমূর্তি আমি আগে কখনো দেখিনি। আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু রূপ অনির্বচনীয়। বৈষ্ণবভাবে মগ্ন শিল্পী ছাড়া এমন সৃষ্টি সম্ভব ছিল না।

রাসমঞ্চ দেখলাম। মনে হল বাধাকৃষ্ণকে বেষ্টন করে সখিরা ঘুরে ঘুরে নৃত্যলীলায় মত্ত।

লালবাঁধে ঘুরে বেড়ালাম। নদীর জল স্পর্শ করলাম। মনে হল এ অন্য কোন নদী নয়, যমুনা।

বিষ্ণুপুর থেকে সেই ভাবটি নিয়ে সেবার ফিরে এসেছিলাম, কিন্তু তখনও মাধবী আমার মানসলোকে মূর্তিমতী হয়ে দেখা দেয়নি।

প্রঃ তাহলে কি ধরে নেব বিষ্ণুপুর আপনার উপন্যাসের পটভূমি আর মাধবী আপনার মানসী?

উঃ বলতে পার মাধবী চরিত্রটি কবির ভাষায় 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'।

একবার আমার এক পাঠকের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। তার বিশেষ আবেদন, আমি যেন কোনও বৈষ্ণবীর জীবন নিয়ে একটি উপন্যাস লিখি। আর সে বৈষ্ণবীর সন্ধান সেই আমাকে দেবে।

চিঠি পড়ে জেনেছিলাম, পাঠকটি অবিবাহিত এবং যুবক। বেশ কয়েকখানি চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল ওর সঙ্গে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ওর দখল দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম।

মনে হয়েছিল ও 'মধুর' রসের কারবারি। জয়দেবের মেলায় ও বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমাকে।

সেই রসবতী যুবতী বৈষ্ণবীটির কথা সে বারে বারে আমাকে লিখে জানাতো। তার সঙ্গে দেখা হলে, তার কথা শুনলে আমি নাকি তাকে নিয়ে একটি উপন্যাস না লিখে পারব না।

অনুরাগী যুবক বন্ধুটির ডাকে সাড়া না দেওয়ায় সে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। শেষ চিঠিতে লিখেছিল, আপনি বৈষ্ণব সাহিত্য পড়ান। মাথুর পর্বে শ্রীমতী রাধার বেদনার কথা আপনার অজানা নয়, কিন্তু সেই রাধারানীর রক্তমাংসে গড়া ভাবময়ী মূর্তিটি দেখা এবং তার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বঞ্চিত হলেন।

সেই অদেখা শ্রীমতীকে আমি দেখার চেষ্টা করেছি আমার উপন্যাসের নায়িকা মাধবীর মধ্যে। শুধু তাকে তার স্বস্থান থেকে সরিয়ে এনে প্রতিষ্ঠা করেছি বিষ্ণুপুরের পটভূমিতে।

অপরাহ্নে অরুণোদয়

প্রঃ আপনি আপনার উপন্যাসের নাম দিয়েছেন 'অপরাহ্নে অরুণোদয়'। এর বিশেষ তাৎপর্য কি? অপরাহ্নে তো অরুণোদয় সম্ভব নয়।

উঃ প্রাকৃতিক নিয়মে কখনও অপরাহ্নে অরুণোদয় হতে পারে না কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে অপরাহ্নে অরুণোদয় হওয়া অসম্ভব নয়।

আরও একটু স্পষ্ট করে বলি, যথার্থ ভালবাসা থাকে মনের গভীরে। অনেক সময় সংসারের বাঁধনে তাকে বাঁধা যায় না। পরিবেশ ও পরিস্থিতি দুটি মিলন সমুৎসুক হৃদয়কে কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

দীর্ঘ ব্যবধানের পর যদি সহসা দুজনের দেখা হয় তখন অতীতও তার উজ্জ্বল বর্ণ ফিরে পায়, বয়স কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

কান্তিময়ী কুলুর পরিবেশে প্রথম জীবনে যে রূপবতী তরুণী পাহাড়ী কন্যাটির সঙ্গে উপন্যাসের নায়কের দেখা হয়েছিল এবং নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অন্তরঙ্গতা তা একদিন ভেঙে গেল সমতলে নিজ বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। সেই নৃত্যশীলা কন্যাটির সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন হয়ে গেল হৃদয়ের অরুণোদয়।

জীবনের অপরাহ্ণবেলায় নায়ক যখন গিয়ে দাঁড়াল কুলুর সেই স্বপ্নলোকে তখন খুলে গেল তার হৃদয়ের দ্বার। সরে গেল এতদিনের পুঞ্জিত মেঘ।

দেখা হল দুজনের আবার সেই আপেলের ডালভরা ফুলের মহোৎসবে। মধুবিন্দুর মতো তখন ঝরছিল অপরাহ্নের আলো। দুজনে দুজনের হাত ধরল, স্মৃতির সরণি বেয়ে তারা চলতে লাগল প্রেমের প্রথম রোমাঞ্চে ভরা অরুণোদয়ের দিকে।

জন্মান্তর

প্রঃ দুর্ঘটনায় স্মৃতিভ্রষ্ট এক নানের জীবন নিয়ে আপনি রচনা করেছেন জন্মান্তর উপন্যাসটি। ঘটনার আবর্তে কাহিনীটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আমার প্রশ্ন, নানের জীবনের এই ঘটনাটি কি সত্যভিত্তিক, না শুধুই কল্পনা-সৃষ্ট ?

উঃ এ-উপন্যাসটি সম্পূর্ণ কল্পনাকে আশ্রয় করেই রচিত। আঘাতের ফলে পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরকম হারানো স্মৃতি নিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক কাহিনী ও তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র। সেই সূত্র ধরেই আমি আমার কাহিনীটি রচনা করেছি।

তবে এই কাহিনীর চরিত্র এবং পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে একটা প্রেরণা আছে।

প্রঃ কি ধরনের প্রেরণা কাজ করেছে তা যদি একটু ব্যাখ্যা করে বলেন।

উঃ সেবার মুসৌরিতে বেড়াতে গিয়ে আমরা ছিলাম ক্যামেলস্ ব্যাকে লালসিয়া স্টেটের একটা বাড়িতে।

জায়গাটার অবস্থান বেশ উঁচুতে। ওখানে একটা রিজারভার আছে। আমরা রাতে ওই জায়গায় বসে নীচের দিকে তাকাতাম। দূরে সমতলে অন্ধকারের বুকে ফুটে উঠত আলোর ফুলতোলা একখানা কার্পেট। লাল, হলুদ, নীল রঙের নকশাকাটা।

আসলে আলোকোজ্জ্বল দেরাদুন রাতের অন্ধকারে পর্বতশীর্ষ থেকে এমনি দেখাত।

কেম্‌টি ফলস্-এ স্নান করে, দূরের তুষার পর্বত দেখে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে দিলাম।

শুরু হল ক্রিসমাসের উৎসব। গাছে রঙিন আলো আর সান্তাক্লজের মূর্তি দিয়ে সাজানো হয়েছে পাহাড়ী আঁকা বাঁকা পথ।

আমরা ওপরে বসে তাই দেখতাম, যদিও শীত তখন প্রবল।

একদিন দেখলাম, সাদা পোশাকে অল্পবয়সী একটি নান পাহাড়ী পথ ভেঙে এগিয়ে চলেছেন। পেছনে একটি পাহাড়ী-লোকের কোলে চেপে চলেছে ফুটফুটে এক শিশু, মাথায় তার রঙবাহারী টুপি।

অমনি জন্মান্তরের ভাবনার সঙ্গে হঠাৎ নান ও শিশুটি যুক্ত হয়ে গেল।

এইভাবেই পেলাম পাহাড়ী পরিবেশে জন্মান্তর রচনার প্রেরণা।

আলোর ঠিকানা

প্রঃ আপনার 'আলোর ঠিকানা' উপন্যাসের সীমা চরিত্রটি কি একান্ত কাল্পনিক না তার বাস্তব কোনও ভিত্তিভূমি রয়েছে?

উঃ দক্ষিণ থেকে উত্তরে আমাকে যেতে হত কলকাতার একটি মর্নিং কলেজে ক্লাস নেবার জন্য।

আমি কলেজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ওখানে পৌঁছে যেতাম।

সেদিন প্রফেসরস্ রুমে বসে আছি, হঠাৎ আমাদের প্রিন্সিপালের গলা পেলাম। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কাউকে যেন ধমকাচ্ছেন। তখনও অন্য কোনও প্রফেসর এসে পৌঁছননি।

ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমি চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। একতলা থেকে চারতলা সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের সাড়া পেলাম মেয়েদের। নিশ্চয়ই প্রিন্সিপালের ধমক খেয়েছে ওরা।

কিন্তু আমি ঝুঁকে দেখলাম, তিনতলার ল্যান্ডিং-এর ওপর দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপাল্ একটি মেয়েকে ভীষণভাবে বকুনি দিচ্ছেন। মাথা নীচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। তার কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ব্যাগ। মেয়েটি শীর্ণ, কেমন যেন এক ধরনের বিষণ্ণতা তাকে ঘিরে রয়েছে।

প্রিন্সিপাল্ বলছিলেন, এটা কি বাজার পেয়েছ? এটা লেখাপড়ার জায়গা, খাবার বিক্রির জায়গা নয়। আর কোনওদিন যেন আমি তোমাকে এই কলেজ কম্পাউন্ডে না দেখি। যাও।

মেয়েটি ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল। ঠিক কী কারণে যে সে বকুনি খেল তা সেদিন আমি জানতে পারলাম না। জানলাম, পরের দিন।

আমি কলেজে ঢুকতে গিয়ে রাস্তার ধারে তাকে দেখতে পেলাম। সেই কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, রুগ্ন কালো মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কলেজের কয়েকটি মেয়ে। মনে হল, তারা মেয়েটির কাছ থেকে কিছু কিনছে। আমি দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ করলাম, ওরা লজেন্স নিচ্ছে ওর কাছ থেকে। গতকাল প্রিন্সিপালের বকুনির কারণটা তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না ওই মেয়েটির করুণ, বিষণ্ণ মুখের ছবি।

মাসখানেক পরের ঘটনা। সেদিন আমি কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখি, গেটের সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ওর দিকে তাকাতেই ও এগিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করল।

মৃদু হেসে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বললাম, কিছু বলবে?

স্যার, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে আমি একটা কথা বলতাম।

কি বলবে, বল না?

আপনার ডিপার্টমেন্টে আমি কিছু কাজ পেতে পারি স্যার?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি রকম কাজ?

অন্তত পার্টটাইম লেকচারারের একটা কাজ।

এবার সত্যিই আমি চমকে উঠলাম। লজেন্স বিক্রি করছে যে মেয়ে, সে চায় পার্টটাইম লেকচারারের কাজ!

আমার মুখে সংশয়ের ছবি ফুটে উঠতে দেখে সে বলে উঠল, আমি গত বছর বাংলায় এম. এ. পাস করেছি স্যার, নম্বরও ভাল পেয়েছি।

ঠিক আছে, তবে এই মুহূর্তে তো কোনও ভেকেন্সি নেই, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। সময় সুযোগ হলেই আমি তোমাকে জানাব।

মেয়েটির নাম সীমা। সে আমার ঠিকানা মেয়েদের কাছ থেকে জোগাড় করে একদিন বাড়িতে এসে হাজির।

আমি মনে মনে খুশি হলাম। সেদিন অনেক কথার ভেতর দিয়ে তার সংসারের অনেক খবরই পেলাম।

মা নেই, বৃদ্ধ বাবা প্রায় অথর্ব। একটা ভাই আছে কিন্তু তাকে বহু চেষ্টা করেও বেশিদূর লেখাপড়া শেখাতে পারেনি। সে এখন পথে পথে বখে যাওয়া ছেলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনদিন বাড়ি ফেরে, কোনদিন ফেরে না।

সীমা প্রতিদিন অন্তত দু'দুটো কলেজ আর ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের কাছে লজেন্স বিক্রি করে

তার জীবিকার ব্যবস্থা করে। কথা বলে বুঝলাম, ভাইয়ের ব্যাপারে ওর মনের ভেতর একটা যন্ত্রণা আছে।

যদি, ওর ভাইটাকে কোনওরকমে সৎপথে ফেরানো যায় তাই তার কাজের একটা ব্যবস্থা করলাম।

রূপা কোম্পানির মালিক মি. ডি. মেহেরা-কে সব কথা বলে সেখানেই তাকে কাজে ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু পথের বন্ধুবান্ধবদের স্বাদ যে পেয়েছে তার পক্ষে কোনও বাঁধাধরা কাজ করা সম্ভব নয়। তাই সে মাস কয়েক কাজের পরেই আর এলো না।

সীমাকে আমি বললাম, ছুটির দিনগুলোতে যখন কলেজ, ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকবে তখন তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার কিছু কিছু কাজ করে দেবে।

এর পর থেকে প্রায়ই সীমা আমার বাড়িতে আসত। আমার প্রয়োজনীয় লেখাগুলো ও কপি করে দিত, কখনও বা দরকার হলে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ আর্টিকেল কপি করে আনত।

আমি ওকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা দিতাম, ও তা গ্রহণ করতে আপত্তি জানাত না, কিন্তু যত আপত্তি ছিল তার খাবার ব্যাপারে। আমাদের বাড়ি থেকে যখনই তার কাছে খাবার নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখনই সে তা ফিরিয়ে দিয়েছে। নিতান্ত পীড়াপড়ি করে এক কাপ গরম চা ছাড়া তাকে আর কিছু খাওয়ানো যায়নি।

পরে আমার মনে হয়েছিল ওর না খাওয়ার একটা কারণ থাকতে পারে। ঘরে হয়ত অভুক্ত বাবাকে সে ফেলে এসেছে, তাঁর কথা চিন্তা করে সে কোনওভাবেই খাবার মুখে তুলতে পারছে না।

যদিও আমি কাজের ব্যাপারে তাকে কোনওরকম সাহায্য করতে পারিনি কিন্তু কিছুদিনের ভেতরেই সে আমার কাছে একটি শুভ সংবাদ বয়ে আনল।

ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক সীমাকে স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর গ্রামের একটি গার্লস স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় সীমা ওই স্কুলে পড়ানোর কাজ পেয়ে যায়।

বেশ কিছুদিন সীমা চিঠিপত্রে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল, তারপর হারিয়ে গেল একসময়। কিন্তু হারায়নি তার স্মৃতি, আমি তাকে ধরে রেখেছি আমার এই 'আলোর ঠিকানা' উপন্যাসে।

ফেরা

প্রঃ এক সংগীতশিল্পীর জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে আপনার 'ফেরা' উপন্যাসে আকর্ষণীয় এক আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। পড়ার শেষে মনে হল, 'অন্তরা' চরিত্রটি নিছক আপনার কল্পনাপ্রসূত নয়। আমার অনুমান কি সঠিক ?

উঃ শুধুমাত্র কল্পনার আশ্রয়ে একটি উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণ সম্ভব কি না আমার জানা নেই। আবার নিছক বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে একটি উপন্যাস গড়ে তোলাও প্রায় অসম্ভব। বাস্তব কল্পনার পরিমিত মিশ্রণেই একটি উপভোগ্য, হৃদয়স্পর্শী, স্বাদু উপন্যাসের সৃষ্টি হয় বলে আমার বিশ্বাস।

প্রঃ মূল প্রশ্ন থেকে সরে এসে আর একটি প্রশ্ন করছি। আমরা কল্পনাপ্রধান ও বাস্তবধর্মী, এই দুটি বিশেষ বিভাগের ভেতরে ফেলে উপন্যাসের বিচার করে থাকি—এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?

উঃ দুটি ক্ষেত্রে কেবল পরিমাণগত পার্থক্যই লক্ষ্য করা যায়। লেখকেরা তাঁদের স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেন, তাকে রূপদেন উপযুক্ত পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে। সবক্ষেত্রেই বাস্তব ও কল্পনার কমবেশী মিশ্রণ চাই।

এখন তোমার মূল প্রশ্নের আলোচনায় আসছি। অন্তরা একটি কোন বিশেষ চরিত্র নয়, বলা যেতে পারে প্রতিষ্ঠাকামী একাধিক শিল্পীর প্রতীক।

এ ধরনের চরিত্র সংগীত, শিল্প, সাহিত্যে ও অভিনয় জগতে বিরল নয়। প্রতিভা থাকলেই যে সে বাধাহীন, মসৃণ পথে উন্নতির শিখরে উঠতে পারবে, এমন নয়। পদে পদে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের

প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের দ্বারস্থ হতে হয় তাদের। যে সকল কর্মকর্তা কেবলি গুণগ্রাহী, তাঁরা সাধ্যমত নতুন নতুন প্রতিভাধরদের বিকাশের পথে সাহায্য করেন এবং তাদের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠানকেও সমৃদ্ধ করেন। এখানে পারস্পরিক আদানপ্রদান চলে সুস্থ সুভদ্র পরিবেশে।

কিন্তু এর উল্টো চিত্রটি ক্লেদাক্ত। স্বপ্নের মঞ্জিলে পৌঁছানোর জন্য একটি পিছল পথ।

প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও এই পথ পেরোতে হয়েছে 'ফেরা' উপন্যাসের নায়িকা অন্তরাকে। সংস্কৃতি জগতের অনেক নামীদামী শিল্পীকে অতিক্রম করতে হয়েছে এই পথ।

কোন কোন পথযাত্রী জীবনে শুধু ক্লেদাক্তই হয়েছে, আবার কেউ বা মঞ্জিলে পৌঁছে মুছে ফেলেছে তার ক্লিন্ন দাগ।

প্রশ্ন করেছেন ঃ রোমি সাহা
উত্তর দিয়েছেন ঃ লেখক

কৃষ্ণকলি

জানালার গ্রিল ধরে পথের দিকে চেয়েছিল সুচেতনা। সে আধখানা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কালী এলেন, এতক্ষণে সার্থক হল তোমাদের পুজো।

সুচেতনার টিপ্পনিতে আহত হল দিব্য। মুখে বলল, এমন করে বলনা সুচেতনা।

সে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বাইরের গেট খোলাই ছিল। কৃষ্ণকলি বাঁ হাতে লোহার গেটটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। এবার লন পেরিয়ে দরজার দিকে এগোতে লাগল।

দিব্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে একমুখ হেসে বলল, এসো কৃষ্ণা, বন্ধুরা সবাই তোমার অপেক্ষায়। মা দু'তিন বার 'হল' ঘরে এসে তোমার খোঁজ নিয়ে গেছে।

ডান হাতে প্ল্যাস্টিকের ছোট্ট একটা সাজিতে কিছু ফুল দেখা যাচ্ছিল। টকটকে লাল রঙের আভা।

দিব্য কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না, কি ফুল?

শ্যামলা মেয়েটি একমুখ সাদা হাসি ছড়িয়ে বলল, শ্যামাপুজোয় কি ফুল লাগে বল?

নিশ্চয়ই জবা।

চোখ ছোট করে হাসিতে জানিয়ে দিল কৃষ্ণা, সঠিক উত্তর।

মুখে বলল, আগে আমাকে পুজো-মণ্ডপে নিয়ে চল।

হল ঘরের ভেতর দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকল না দিব্য। সে বন্ধুদের আড্ডা এড়িয়ে বারান্দা পেরিয়ে শেষপ্রান্তের একটা ঘরে কৃষ্ণাকে নিয়ে ঢুকল।

গরদের একখানা শাড়ি পরে অন্দরের বারান্দায় কি একটা কাজে এগিয়ে আসছিলেন সোমপ্রভা দেবী।

দিব্য বলল, এই যে মা, এতক্ষণ যার খোঁজ করছিলে সে এসে গেছে।

মমতাভরা চোখ মেলে সোমপ্রভা বললেন, এস মা।

ফুলের সাজিটা বাঁ হাতে ধরে কৃষ্ণা দিব্যর মায়ের পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল, তিনি ডানহাতে কৃষ্ণাকে বাধা দিয়ে বললেন, আগে শ্যামা মায়ের চরণে ফুল দিয়ে প্রণাম করবে চল।

দেবী-প্রণামের পর দিব্যর মাকে প্রণাম করল কৃষ্ণা।

থুতনিতে হাত ছুঁইয়ে সোমপ্রভা বললেন, তোমার নানান গুণের কথা শুনেছি দিব্যর মুখে। আজ তুমি বন্ধুদের সঙ্গে আতসবাজির উৎসবে যোগ দেবে, জলসায় গান গাইবে। খুব ভাল, কিন্তু মা, আমাকে দু'একখানা অন্তত শ্যামা-সঙ্গীত শুনিও।

কৃষ্ণা বিনীত ভঙ্গীতে বলল, গাইতে চেষ্টা করব মাসিমা।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে গেলেন সোমপ্রভাদেবী, তোমার বাবার নামটি কি মা?

আনন্দরূপ বসু। দশ বছর বয়সে আমি বাবাকে হারিয়েছি। দুবছর আগে মাকে হারিয়ে এখন মামার সংসারে। ভাইবোন?

কৃষ্ণকলি মাথা নেড়ে জানাল, তার কোনও ভাইবোন নেই। মুখে বলল, মামা আর আমি ছাড়া সংসারে আমাদের আর কেউ নেই। মামা রিটায়ার্ড হেডমাস্টার।

সোমপ্রভাদেবী কৃষ্ণাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাতবুলিয়ে দিলেন।

একই কলেজের বন্ধু ওরা। কো-এড কলেজ। তবে একই ক্লাসের ছাত্রছাত্রী সবাই নয়। ফাইনাল ইয়ার থেকে ফার্স্ট ইয়ার, সবাই হাজির। অবশ্য সবাই বলতে দিব্যর নির্বাচিত বন্ধুমহলের সবাই।

দিব্য, কলেজ ছাত্র ইউনিয়ানের সেক্রেটারী। তাই নির্বাচিত কলেজ ইউনিয়ানের সদস্য সদস্যারা সবাই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। দিব্য ফাইনাল ইয়ার বাংলা অনার্সের ছাত্র।

কৃষ্ণকলি কিন্তু একই কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী হলেও ইউনিয়ানের মেম্বার নয়। তার মধুর কণ্ঠই তাকে সারা কলেজের প্রিয় করে তুলেছে।

ইলেকশানের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী দুদলই তাকে নিজের নিজের দলে টানার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে সরে এসেছে যুযুৎসু দুপক্ষের কাছ থেকেই।

তবে দিব্যের ডাককে কেন জানি না সে কোনও ভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না। কিরকম এক অদৃশ্য আকর্ষণে সে যেন জড়িয়ে পড়েছে।

দিব্য সুদর্শন পুরুষ বলে? সদ্যপ্রয়াত ধনী পিতার একমাত্র পুত্র বলে? কলেজের বহু মেয়ে তার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সচেষ্ট বলে?

এর কোনটাই তার আকর্ষণকে প্রভাবিত করেনি। সে কলেজের নবীন-বরণ উৎসবে দিব্যর গলায় জীবনানন্দের একটি কবিতার আবৃত্তি শুনে প্রথম মুগ্ধ হয়েছিল। সেই মুগ্ধবোধ হয়ত সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তার প্রচ্ছন্ন চেতনায়।

ঈশ্বরের দানে সমৃদ্ধ দেহধারীর সান্নিধ্যকে সে পরিহার করতেই ভালবাসে। কারণ সে জানে, তার মুখশ্রী স্বজনদের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত হলেও কেবলমাত্র কালো রঙের জন্য মাঝে মাঝে বান্ধবীদের তির্যক মন্তব্যের শিকার হতে হয়।

একমাত্র প্রবল আত্মসম্মানই তার রক্ষা কবচ।

একদিন কলেজের করিডোরে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল দিব্য। সেদিনটা ছিল তাদের প্রথম আলাপের দিন।

সে হয়ত বিব্রত হত, এড়িয়ে যেতে পারত, কিন্তু দিব্যর মুখের দিকে তাকিয়ে এমন এক অনাবিল ছবি দেখতে পেল, যাতে সে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অসংকোচে।

দিব্য বলল, সেদিন প্রফেসার এ কে জি-র ফেয়ারওয়েলে তুমি দুখানামাত্র গান গেয়ে সারা কলেজের হৃদয় হরণ করেছ, কিন্তু ওটুকুতে মন ভরেনি আমার।

মনে মনে খুশি হল কৃষ্ণকলি। মুখে বলল, আমার গান আপনাদের সকলের ভাল লেগেছে জেনে দারুণ উৎসাহ পাচ্ছি।

সেদিনের সেই বিদায়-সংবর্ধনা সভার শেষে সকলে উচ্ছ্বসিত হয়ে তারিফ করেছিল তার গলার।

সকলের ভালোবাসার ছোঁয়ায় সেদিন খুবই খুশি হয়েছিল কৃষ্ণকলি, কিন্তু আজকের আনন্দটা তার কাছে এলো এক ঝলক দখিন হাওয়ায় ভর করে।

দিব্য বলল, সামনে ইলেকশান, তুমি তো ফতোয়া জারি করেছ, কোন পক্ষেই যোগ দেবে না। কেবল একটা কথা দাও।

দুটো টানা টানা চোখে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিব্যর মুখের দিকে তাকাল কৃষ্ণকলি।

আমাদের দল যদি জেতে তা হলে যে বিজয় অনুষ্ঠান আমরা করব, তাতে তুমি গান গাইবে।

কৃষ্ণা কৌতুকের হাসি হেসে বলল, আগে বলুন, অন্যদল যদি জেতে আর তারা যদি আমাকে কোন অনুষ্ঠানে গান গাইতে ডাকে তাহলে আপনার কাছ থেকে আমি সম্মতি পাব?

দিব্য সহসা কোনওকথা বলতে পারল না। সে বিলক্ষণ জানে, যেখানে খুশি গান গাইবার অধিকার একমাত্র গায়িকারই আছে।

মুখে বলল, পরাজিত দলপতির কি অধিকার আছে তোমাকে সম্মতি দেওয়ার।

তবু আপনার অভিপ্রায়টা একবার মুখ ফুটে বলুন না দিব্যদা।

আমি খুব খুশি হব, কলেজের সব ছাত্রছাত্রী যদি আমার নাম ধরে ডাকে। এতে 'আপনি', 'বলুন' ইত্যাদিরও ঘটা করে বিসর্জন হবে।

কথাগুলো ভাল লাগল কৃষ্ণকলির। কোন কিছুতে খুশির ছোঁয়া লাগলে আপনি ছোট হয়ে আসে তার চোখ দুটো। তখন মনের গভীর আনন্দ তির্ তির্ করে কাঁপতে থাকে তার আধবোজা চোখের ঝিনুকে।

একটু পরে নিজের খুশিকে সামলে নিয়ে সে বলল, ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছাকেই আমি মেনে নেব দিব্য।

তাহলে তোমার প্রশ্নের জবাবটাও তুমি শুনে নাও— শিল্পীর একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকে, তাকে আমি কখনও ক্ষুদ্র স্বার্থের গিঁট দিয়ে বেঁধে রাখতে চাই না। তুমি তোমার যেমন খুশি, যেখানে খুশি গান গাইবে।

কথাটা শুনে কৃষ্ণকলির খুশি হওয়ারই কথা, কিন্তু কেন জানিনা তার এই মুহূর্তে মনে হল, দিব্য প্রতিপক্ষের আসরে তার গান গাইবার ব্যাপারে এতটা উদার না হলেও পারত। দিব্য যদি বারণ করত, তাহলে সেটাই হত তার কাছে পরম প্রাপ্তি। স্বাধীন ইচ্ছার ভেতরে যেমন অবাধ একটা আনন্দ আছে, তেমনি বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রিয়জনের বাধাও প্রচ্ছন্ন একটা আনন্দে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে।

কৃষ্ণকলি হঠাৎ বলল, তুমি ইউনিয়ান ইলেকশানে অবশ্যই জয়ী হবে।

কি করে জানলে? কেন, আমার মন বলছে।

দিব্য বলল, তাহলে তোমাকে আজ আমার একটা মনের কথা জানাই।

উৎসুক দৃষ্টি মেলে দিব্যর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণকলি।

আমি নিজের ইচ্ছায় ইলেকশানে দাঁড়াইনি।

বিস্ময় চিহ্ন চোখে এঁকে কৃষ্ণকলি বলল, তবে!

বন্ধুরা আমাকে জোর করে দাঁড় করিয়েছে।

কি রকম? তোমার ইচ্ছে না থাকলেও।

আমি বন্ধুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশি সময় প্রতিবাদ করতে পারিনি, এই আমার দুর্বলতা। তাছাড়া বিরুদ্ধ পক্ষে যারা দাঁড়িয়েছে তারাও তো আমার বন্ধু।

কৃষ্ণকলি বলল, বন্ধুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে বলেই কি তুমি যুদ্ধে নিরুৎসাহি হয়ে পড়েছ?

ঠিক তাই।

কৃষ্ণকলি বলল, আমার মামা প্রতিদিন গীতা পড়েন। তাঁর মুখেই শুনেছি, আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে বলে অর্জুন বিষণ্ণ হয়ে অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন। শেষে কৃষ্ণ তাঁকে নানা কথায় উদ্দীপ্ত করে যুদ্ধে নামিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ক্লীবত্ব ত্যাগ কর পার্থ।

দিব্য হেসে বলল, তুমিও কি তাই বলতে চাইছ?

নিশ্চয়ই। যুদ্ধ ঘোষণা যখন হয়ে গেছে তখন সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়।

বেশ তাই হবে। কৃষ্ণের উৎসাহে অস্ত্রধারণ করেছিলেন পার্থ, আর আমি কৃষ্ণার উৎসাহে দিব্যাস্ত্র নিয়ে জয়যাত্রায় যাব।

করিডোরের একটা থামের ধারে ঘনিয়ে উঠেছিল ওদের আলাপ, হঠাৎ রসভঙ্গ হল।

ফাইনাল ইয়ারের 'কল্কি' বাঁ হাতখানা নেড়ে নেড়ে হন হন করে পার হচ্ছিল করিডোর, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানা ওদের দিকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে গেয়ে উঠল, রবিঠাকুরের গানের কয়েক ছত্র।

'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহনার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয় মিলে গেছে আঁধার আলোয়
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে এপারে ওই পারে।'

দিব্য বলল, কোথায় চলেছিস কল্কি?

ব্যোমমার্গে। তুই এখন চুটিয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ কর।

কল্কি দ্রুত পায়ে হাত নেড়ে চলে গেলে কৃষ্ণকলি বলল, দারুণ মজার ছেলে তো! তোমার আমার সাদাকালো রঙকে কেমন গানের কথায় মিলিয়ে দিয়ে গেল।

দিব্য বলল, আসর মাৎ করে দেওয়ার ছেলে আমাদের ক্লাসের এই কল্কি অবতারটি।

ওর নাম কল্কি কেন?

আমরা ওকে ওই নামেই ডাকি। নামকরণের ভেতর একটু তাৎপর্য অবশ্যই আছে।

কি রকম?

কল্কেতে ওর আসক্তি আছে। নিষিদ্ধ ধূম্রপানের পর ও ব্যোমমার্গে বিচরণ করে।

এমন দিলখোলা একটি ছেলেকে তোমরা ঠিক পথে ফেরাতে পার না?

সেকেন্ড ইয়ার থেকে ওকে ফেরানোর অনেক চেষ্টা হয়েছে কিন্তু খরভাটার টানে ভেসে চলেছে ও। কল্কি বলে, আগে আমি ধূম্র পান করতাম, এখন ধূম্রই আমাকে জহ্নুমুণির মতো গণ্ডুষে পান করে বসে আছেন। এখন তিনি না ছাড়লে আমার বেরিয়ে আসার সাধ্য কি।

সেদিন আর গল্প জমল না। ইংরেজির ডাকসাইটে অধ্যাপক এ বি এ-কে দোতলার প্রফেসার্স রুম থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচের করিডোরে নেমে আসতে দেখা গেল।

মানুষটি বেশ জাঁদরেল চেহারার। গলার জোর আছে। সেক্সপিয়ারের নাটক পড়ান একেবারে নাটকীয় ভঙ্গীতে। ভিন্ন কলেজের ছেলেমেয়েরাও অনেকসময় ওঁর ক্লাসে ভিড় জমায়। কখনও ওঁর পারমিশান নিয়ে, কখনও বা না নিয়ে।

দারুণ স্মৃতিশক্তি। বহু ছাত্রছাত্রীকে নামধরে ডাকতে পারেন তিনি।

ওঁর পুরো নাম, আতঙ্কভঞ্জন আঢ্য। নামের প্রথম অংশটির সঙ্গেই কিন্তু ছেলেমেয়েদের পরিচয় নিবিড়।

তিনি যখন আত্মমগ্ন হয়ে পড়ান, বিচিত্র রেফারেন্স টেনে এনে নতুন নতুন চিন্তা আর রসের দ্বার খুলে দেন, তখন ছাত্রছাত্রীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শোনে।

কিন্তু সপ্তাহের একটি দিন তিনি মূর্তিমান আতঙ্কের মতো ক্লাসে এসে হাজির হন। সেটি বিশেষ কোনও একটি চিহ্নিত দিন নয়। তাঁর মর্জি মতো সপ্তাহের যে কোন একটি দিনকে বেছে নেন।

সেদিনটিতে ক্লাসে ঢুকেই বলেন, আজ আর পড়াব না, তোমরা কতদূর কি পড়েছ দেখি।

ব্যস, ছাত্রছাত্রীদের বুকে শুরু হয়ে গেল গুরু গুরু ধ্বনি।

এই রে, এখুনি প্রশ্নবান ছুঁড়ে মারবেন। প্রতিহত করতে না পারলে নানারকম তির্যক মন্তব্যে জর্জরিত হতে হবে।

বিশেষ করে ক্লাসের ভেতর যেসব ছাত্রছাত্রী নতুন প্রেমে মগ্ন, তারা পরস্পরের কাছে বড় বিব্রত হয়ে পড়ে।

প্রশ্নবাণে জর্জরিত প্রেমিকটি নাজেহাল হয়ে পড়লে প্রেমিকার মনে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তাই ভেবে সে অস্থির হয়ে যায়। সে সময় তার করুণ চোখের চাহনি বন্ধুদের কৌতুকের কারণ হয়।

সেদিন যারা অধ্যাপক এ বি-র প্রশ্নের হাতথেকে রক্ষা পায় তারা নিজেদের কৃতবিদ্য বলে মনে করে। এমন ভাব দেখায় যেন এসব প্রশ্নের জবাব তাদের মুখে মুখে।

ঘণ্টা পড়লেই প্রফেসর এ বি মুহূর্তকালও আর ক্লাসে অপেক্ষা করেন না। একটি লাইন শুরু করে তাকে প্রায় শেষ করারও সময় তিনি পান না। বইপত্র বাঁ হাতের মুঠোয় ধরে দরজা পেরিয়ে প্রফেসর'স রুমের দিকে গটগট করে হেঁটে যান। অমনি ক্লাস জুড়ে শুরু হয়ে যায় হইহল্লা।

নামকরণে দারুণ, অরিজিনালিটি আছে কল্কির। বন্ধুদের প্রত্যেকেরই সে এক একটি করে নামকরণ করেছে।

রামেশ্বর পাণ্ডা আর মৈথিলী পাণিগ্রাহীর ভেতর একটা হৃদয়ঘটিত বোঝাপড়া আছে। অধ্যাপক এ বি আজ রামেশ্বরকে একেবারে কাত করে দিয়ে গেছেন। প্রেমিকা মৈথিলীর দিকে তাই সে বড় করুণ চোখে তাকাচ্ছিল।

মৈথিলীকে কল্কি নাম দিয়েছে জনকনন্দিনী। সে হাত নেড়ে বলল, ওহে জনকনন্দিনী! আজ রণক্ষেত্রে সীতাপতি কুপোকাত। ভেঙে পড় না, একদিন দেখবে তোমার ওই সীতাপতি রিটায়ার আতঙ্কভঞ্জনের চেয়ার দখল করে বসে গেছে।

বন্ধুদের নামকরণে সত্যিই মুন্সিয়ানা আছে কল্কির, মানে কনককান্তি লাহার। নিজের নামটিও কিন্তু ওর নিজেরই দেওয়া। একেবারে ওর স্বভাবের সঙ্গে নামটা ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে।

দিব্য ব্যানার্জির নামকরণ করেছে ও মাকাল। দিব্য সুদর্শন পুরুষ কিন্তু পুরুষোচিত তেজগুণের অভাব তার মধ্যে। গুণহীন রূপবানকেই মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়। তবে, দিব্য কেবল

রূপবান নয়, হৃদয়বানও বটে। দিব্য এই নামকরণে কিন্তু বিন্দু মাত্র আহত হয়নি বরং উপভোগ করেছে।

ক্রৌঞ্চি কাহালী কিন্তু কল্কির নামকরণের পর বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল।

বর্ষা ভেজা রোদ্দুরের মতো তার মুখে ফুটে উঠেছিল করুণ এক টুকরো হাসি। আসলে ক্রৌঞ্চি একটু কুঁজো হয়ে হাঁটত। ক্রৌঞ্চ মানেই কুঁচ বক, তাই তার নামকরণ করেছিল কল্কি, বকেশ্বরী।

কল্কির নেশাভাঙের কড়া সমালোচক ছিল ক্লাসের লোকনাথ গুপ্ত।

কল্কি ছাড়বার পাত্র নয়। কল্কি তার মুখোমুখি হলেই দুটো হাত বুকে রেখে বলত, গুরুদেব। কখনও বা তাকে ডাকত ব্যোমভোলা বলে। বলত আত্মবিস্মৃত হয়েছ মহেশ্বর। তুমিই তো গুরু নেশার রাজা। আমি তোমার ভৃঙ্গী। ভাঙের যোগানদার।

একদিন দুটো পিরিয়ড পার করে দিলীপ কর্মকার ক্লাসে ঢুকল। অমনি চেঁচিয়ে উঠল কল্কি, এস, এস লিয়েন্ডার, প্র্যাকটিসে ছিলে বুঝি?

দিলীপ টেনিস খেলে। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল লিয়েন্ডার।

সুসিতা মিত্রকে কল্কি নাম দিয়েছিল ভীমকালী। সুসিতা-র অর্থই হল, শ্বেতবর্ণা। ভাগ্যদোষে নামটা তাকে বিদ্রূপ করত। কারণ সে ছিল একটু মোটাসোটা, আর কালো। তবে মুখখানা খুশিতে ভরা।

নামকরণের পর —সে কিন্তু একটুও ক্ষুব্ধ হয়নি, শব্দ করে হেসেছিল।

সুচেতনা চৌধুরী বিত্তবান পিতার একমাত্র কন্যা। সুন্দরী এবং নৃত্যশিল্পী। মাঝে মাঝে নির্বাচিত বন্ধুদের নিয়ে পানের আসর জমায়। তাই কল্কি তার নামকরণ করেছিল ভদ্‌কা।

নামকরণ শুনে সে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল।

শুধু বন্ধুদের নিয়েই কল্কির রসিকতা থামেনি, অধ্যাপকরাও কল্কির কৌতুকের শিকার হয়েছিলেন।

নামকরণ-বিশারদ কল্কি কিন্তু আচার্যদের নামকরণের কোনওরকম চেষ্টাই করেনি। কেবল তাঁদের চলন-বলনের অবিকল অনুকরণ করে দেখাত। তাঁদের মুদ্রাদোষগুলি পর্যন্ত তার চোখ এড়ায়নি।

কখনও কখনও ক্লাসে সে ডায়াসে উঠে অধ্যাপকদের অনুকরণে হাত পা নেড়ে পড়াতে শুরু করে দিত।

পি কে সি 'মেঘনাদবধকাব্য' পড়াতে পড়াতে নিজেই অভিভূত হয়ে যেতেন। ভাবে বিভোর মুখখানা ওপর দিকে তুলে প্রসারিত ডান হাতখানা নেড়ে বলতেন, মধুসূদন নয়, বল শ্রীমধুসূদন।

বেশ কিছু সময় এই মুদ্রায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন ডায়াসের ওপর। তারপর মৃদু হেসে ফিরে আসতেন সম্বিতে। সম্ভবত এটা ছিল তাঁর নিজের অন্তরের পরিতৃপ্তির হাসি।

সারা পিরিয়ড বসে বসেই পড়াতেন বিশ্বনাথবাবু। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তাঁর নেশার উদ্রেক হত। তিনি পকেট থেকে নস্যির কৌটোটি' বের করতেন, তর্জনী দিয়ে বার কয়েক টোকা দিতেন। তারপর সযতনে কৌটোর মুখটি খুলে চিমটি কেটে নস্য তুলে ক্রমাগত নাকে ঠুসতেন। ওই নস্য নেবার সময় নাসিকা থেকে কীরকম একটা শব্দ উঠত।

নস্য নিলেও বিশ্বনাথবাবুর কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট। অন্যদিকে নস্য না নিয়েও আনুনাসিক উচ্চারণে বলাকার কবিতা পড়াতেন অধ্যাপক এস কে সরস্বতী।

দরজার বাইরে থেকে অধ্যাপকদের মতো হাতে বই নিয়ে ঢুকত কল্কি। তারপর ডায়াসে উঠে এক-একজন অধ্যাপকের অনুকরণে সে যখন পড়াতে শুরু করত তখন সারা ক্লাসরুম ফেটে পড়ত হাসিতে।

কল্কির এই সব গুণগুলো তার পান-দোষকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছিল। দিব্যদের পুজোর রাতে প্রায় সবাই হাজির হয়েছে। কল্কিও জমিয়ে তুলেছে তার আসর।

এমন সময় অন্দরের দরজা ঠেলে হলঘরে ঢুকল দিব্য, পেছনে কৃষ্ণকলি।

কল্কি ভরাট গলায় হাত ছড়িয়ে গেয়ে উঠল ঃ

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ, চোখ।"

সারা ঘর করতালিতে ভরে উঠল।

মৈথিলী বলল, এই করতালিটা কী জন্যে?

দিব্য আর কৃষ্ণকলির যুগল আবির্ভাব উপলক্ষে, না, কল্কির গানের প্রশংসায়?

সুচেতনা বলল, এতো পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে, ও কৃষ্ণকলিকে আগমনী গানের ভেতর দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে দিল। ওটাকে বলতে পারিস নিকষ কালোর জয়ধ্বনি।

সুচেতনা কৃষ্ণকলির থেকে কিছু বড় এবং এক ক্লাস ওপরে পড়ে। ঠিক বন্ধুর মতো কৃষ্ণকলি সুচেতনাকে ভাবতে পারে না। সবাই বন্ধু—ঠিক আছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটা দ্বিধা থেকে যায়। সে ওদের কথায় মিষ্টি হাসি ছড়ায় কিন্তু কোনও মন্তব্য করতে পারে না।

কৃষ্ণা দরজার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল।

দিব্য বলল, এখন আমরা সবাই হাজির। এই মুহূর্তে এক রাউন্ড চা আর তার সঙ্গে টা হয়ে যাক।

লিয়েন্ডার বলল, টা-টা কি শুনি?

বেগুনি।

বলতে না বলতেই দরজা ঠেলে দুটি কাজের মেয়ে বড় বড় দুটো ট্রেতে চা আর গরম-গরম বেগুনি নিয়ে ঢুকল।

তেলেভাজার ওপর ক্রৌঞ্চি কাহালী-র বেশ একটা দুর্বলতা আছে।

সে বলল, ট্রে-টা যখন আমার সামনে বসানো হয়েছে তখন আমিই প্রথম উদ্বোধন করি।

অমনি, দু-তিনজন গেয়ে উঠল, তবে তাই হোক, তবে তাই হোক।

এবার ক্রৌঞ্চি একটা বেগুনিতে তর্জনীর টোকা মারল, অমনি বেগুনিটা, ফেটে গিয়ে ফোঁস করে গরম হাওয়া ছাড়ল। ঠোঁটখানা সরু করে হাওয়ায় তর্জনীটা নাড়তে লাগল বকেশ্বরী।

সর, তোদের দিয়ে আর হবে না— বলতে বলতে কল্কির গুরু লোকনাথ, বেগুনির ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। আস্ত একটা বেগুনি হাতে তুলে নিয়ে মুখে পুরে চিবুতে গেল। অমনি হাউ-হাউ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল লোকনাথ ওরফে মহেশ্বর বাবার মুখ দিয়ে।

কী করুণ অবস্থা, ফেলাতেও পারছে না, গিলতেও পারছে না।

হাসির হর্‌রা উঠল হলঘরে।

কাজের মেয়েরা ট্রে-গুলো নামিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছিল।

এবার সুসিতা এগিয়ে গিয়ে এক কাপ চা তুলে নিয়ে বলল, দেখছিস কি, যে যার কাপ নিয়ে যা।

কোণায় বসেছিল সুচেতনা। সে বলল, দে না ভাই আমারটা এগিয়ে।

কেন, নাচনির কি বাত ধরে গেল না কিরে?

— বলতে বলতে সুসিতা দুটো বেগুনিসমেত কাপটা তুলে নিয়ে গেল সুচেতনার কাছে।

নে, খা। তবে সামলে। মহেশ্বর বাবার মতো আবার বিপাকে পড়ে যাস নে যেন।

হাসি ঠাট্টার ভেতর দিয়ে একসময় চা আর বেগুনি পর্ব শেষ হল।

কল্কি এবার বলে উঠল, তেলেভাজাটা দারুণ। কারণবারির সঙ্গে যা জমত, না।

মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে মৈথিলী বলল, চুপ, মাসিমা-র কানে গেলে আর বক্ষে থাকবে না।

জিভ কেটে নিজের দুটো কান পাকড়ে ধরল কল্কি।

লোকনাথ বলল, এবার একটু গান হয়ে যাক — কী বলিস?

কাউকে কিছু বলতে হল না, অন্দরের ঠাকুরদালান থেকে দেবীপুজোর ঘণ্টা বেজে উঠল।

দিব্য বলল, চল, এখন পুজোর দালানে যাই।

সবাই অন্দরের দরজা দিয়ে এগিয়ে চলল ঠাকুরদালানের দিকে।

অন্দরের তিনদিকে প্রশস্ত দালান। সামনে পূজার মণ্ডপে মহাকালীর মূর্তি। অঙ্গনে বসার জন্য ঢালাও সতরঞ্চ পাতা । দালানে সারি সারি চেয়ার। বেশ কয়েকজন বয়স্ক ভদ্রলোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিলেন সেখানে।

সতরঞ্চির সামনের দিকে মহিলারা বসেছেন। এঁরা সব নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন।

দিব্য বন্ধুদের নিয়ে আসরের পেছন দিকে বসল।

মধ্যবয়সী মহিলাদের সকলেই প্রায় লালপাড় গরদের শাড়ি পরে এসেছেন। অল্পবয়সী মেয়েরা এসেছে যে যার মতো পুজোর দিনের সাজগোজ করে।

সোমপ্রভা দেবী গলায় আঁচল জড়িয়ে হাতজোড় করে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

ঘরোয়া পুজো, তাই বারোয়ারির মতো আড়ম্বর নেই, তবু সাজসজ্জায় কার্পণ্য ছিল না।

সুদৃশ্য চন্দ্রাতপের তলায় আলোর মালায় সুসজ্জিত মঞ্চে দণ্ডায়মান দেবীমূর্তিকে ভ্রম হচ্ছিল জীবন্ত বলে।

পূজামণ্ডপে দেবীপ্রতিমার এক ধরনের অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। সেখানে উপস্থিত দর্শকদের মনে এক অদৃশ্য দেবীমহিমার প্রভাব এসে পড়ে।

যেসব তরুণ তরুণী বন্ধুরা এতক্ষণ কৌতুক রসে মেতেছিল, তারাও পূজার আঙিনায় এসে স্থির হয়ে দেবী-প্রতিমার দিকে তাকিয়ে রইল।

পূজার প্রথম পর্যায় শেষ হলে বন্ধুরা আবার এসে ঢুকল হলঘরে। আজ সারারাত্রি জাগরণ। সবাই যে যার বাড়ির পারমিসন নিয়ে এসেছে।

দিব্য প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে বন্ধুদের সারা রাতের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিল। অনুমতি নিয়েছিল অভিভাবকদের কাছ থেকে।

দিব্যের চেহারায় এবং আচরণে এমন একটা সৌজন্য আছে, কথায় বার্তায় এমন একটা মার্জিত আভিজাত্য আছে যা বয়স্ক অভিভাবকদেরও আকৃষ্ট করে।

হলঘরে ফিরেই আবার শুরু হয়ে গেল আড্ডা। অন্দরে চলতে লাগল পুজোর কাজ।

রাত নটা নাগাদ শুরু হল বাজি পোড়ানো। তখন উঠোন খালি করে দেওয়া হয়েছে। সমানে ঝলসে উঠছে বাজির আলো। তুবড়ির সগর্জন ফোঁস-কারে নতুন বউয়ের ফেটে পড়া উপভোগ্য অভিমানের ঝিলিক।

লাল, হলুদ রঙমশাল জ্বালছে পাড়ার নিমন্ত্রিত বাড়ির কচি কাঁচারা।

তারা বড়দের নির্দেশ অমান্য করে সামনের দিকে সোজা ফুলঝুরি ধরে না রেখে উঠোনে ছুটোছুটি করছে আর চারদিকে চক্কর কেটে ঘোরাচ্ছে।

করাতকলের চাকার মতো চরকি ঘুরছে আলোর ফুলকি ছড়িয়ে।

একসময় সবাই ছাদে উঠল হাউই ছাড়ার জন্য। যদিও দিব্যের বাড়িটা শহরের একপ্রান্তে তবুও শব্দ-দূষণের আইন মেনে বোম-বাজির কোনও ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।

অত্যন্ত বিবেচক, সোমপ্রভাদেবী। প্রতিবেশিদের ভেতর বৃদ্ধ, অসুস্থ অনেকেই আছেন। কয়েকটা বোম ফাটালে হয়ত পুলিশের কর্ণগোচর হবে না, কিংবা প্রতিবেশীরা কেউ শান্তিরক্ষকদের কান ভারী করবে না, তবু বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে বলে তিনি এইসব কর্ণপীড়াদায়ক কাজ থেকে বিরত থাকেন। একান্ত মাতৃভক্ত দিব্য মায়ের প্রতিটি কথা বিনা প্রতিবাদে মান্য করে চলে।

বোমের বদলে সে মায়ের কাছ থেকে উপহার পেয়েছে বেশ দামী কতকগুলো হাউই।

প্রশস্ত ছাদ। দিব্যর বন্ধুরা ছাড়া ব্যানার্জি পরিবারের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছাদে জড়ো হলেন।

বাজি পোড়ানোতে দিলীপ কর্মকার ওরফে লিয়েন্ডারের নাম আছে।

প্রথম হাউইতে আগুন দিয়ে ছেড়ে দিল সে।

একেবারে সোজা উঠে গিয়ে ফাটল সেটা। অমনি একটা আলোর ফুলে গাঁথা মালা দুলতে দুলতে ভেসে চলল আকাশ পথে। গোলাকার মালার মাঝখানে লেখা, 'মাতৃ-প্রণাম।' লেখাটিও জ্বলজ্বল করছে আলোয়।

ধীরে ধীরে মাতৃচরণে ঝড়ে পড়ল আলোর ফুল।

এরপর অন্ধকার আকাশে কতক্ষণ ধরে চলল আলোর ঝর্ণার খেলা।

এক সময় শ্যামাপূজার প্রতিষ্ঠাতা দিব্য ব্যানার্জি পিতামহ রায়বাহাদুর দীপনারায়ণের নামলেখা

হাউই উড়ল আকাশে। কালোর বুকে জ্বলজ্বল করে উঠল, আলোর ফুলে গাঁথা দুটি শব্দ, —'দীপনারায়ণ স্মরণে।'

সবশেষে হীরের দ্যুতি ছড়িয়ে অন্ধকারে আবৃত ব্রহ্মাণ্ড আলো করে দাঁড়ালেন খড়্গধারিণী কালিকা।

এইসময় ছাদের ওপর করতালি ধ্বনির মতো চড় চড় করে বেজে উঠল কতকগুলো কালি-পটকা।

নীচে নেমে লুচি, তরকারি, মিষ্টিসহ জলযোগ হল।

কল্কি লুচির প্লেট হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরাজ গলায় শুরু করল লুচির প্রশস্তি-সংগীত।

'লুচি তোমাব মান্য ত্রিভুবনে
হে লুচি, তোমার মান্য ত্রিভুবনে।'

গাইতে গাইতে—'লুচির উপর পড়ল ডাল
বামুন নাচে তালে তাল।
লুচির উপর পড়ল চিনি
মেঘের কোলে সৌদামিনী'—

গান গাইতে গাইতে স্বরচিত আখর যোগ করতে লাগল কল্কি—

যদিও ডাল নেই, চিনি নেই।
তাতেই খুশির অন্ত নেই।
তরকারি আর মনোহরা
কিবা স্বাদ ভাই প্রাণহরা
তাই লুচির মান্য ত্রিভুবনে
রে ভাই, লুচির মান্য ত্রিভুবনে।

যুধাজিৎ ওরফে, 'কার্গিল-কেশরী' বলে উঠল, সাবাস্ সাবাস, আসর একেবারে মাৎ করে দিলে গুপী।

বলদেব ওরফে 'লাঙল ধারী' যোগ করল, ঢোল নিয়ে বাঘা বায়েনটা হাজির থাকলে আজ পাকা ফুটির মতো আসর ফেটে যেত।

বান্ধবীদের চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।

ওরা প্লেট হাতে ভিড় করে এগিয়ে এল কল্কির কাছে। নিজেদের এঁটো পাতের লুচি তরকারি চুড়ো করে সাজিয়ে দিল কল্কির প্লেটে।

গায়ক হতভম্ব, এটা কি হল?

সুচেতনা বলল, এটা তোর দারুণ গানের নিদারুণ পুরস্কার।

নিদারুণই বটে। দিলি তো পাতটা এঁটো করে?

লিয়েন্ডার বলল, অমৃত রে, অমৃত, চেঁটে পুঁটে খেয়েনে। এতগুলো সুন্দরীর অধরামৃত খেয়ে অমর হয়ে যা।

ডান হাতে প্লেট, বাঁহাত তুলে কল্কি বলল, বলছিস, তবে তাই হোক।

এবার মেঝেতে বসে পড়ে গবগব করে লুচি তরকারি গিলতে লাগল কল্কি।

মৈথিলী ওরফে জনকনন্দিনী বলল, সত্যি সশরীরে সগ্গে যাবি তুই।

ইতিমধ্যে প্লেট খালি হয়ে গিয়েছিল। এঁটো হাত জোড় করে গদগদ গলায় কল্কি বলল, সেই আশীর্বাদ করগো জননী-জনকনন্দিনী।

ভক্ত হনুমানের মতো হাঁটু গেড়ে বসে কর জোড়ে এমন ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল কল্কি, যে হাসিতে ফেটে পড়ল সারা হল।

এবার কল্কি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজকের এই মিলন মহোৎসবে যখন সকলেই উল্লাসে উন্মত্ত তখন একজনমাত্র দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বিরহিণী যক্ষবধূর মতো মুখ গোঁজ করে কেবল প্রিয়তমের স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে।

কৃষ্ণকলি উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মোটেও না।

কল্কি অমনি বলে উঠল, আমি তো কারু নাম করে বলিনি সখি। তুমিই বা উড়ন্ত শরটাকে ধরে নিলে কেন বুক পেতে।

অপ্রস্তুত হয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল কৃষ্ণকলি।

দিব্য এগিয়ে এসে রক্ষা করল পরিস্থিতি, এই আনন্দমেলায় কৃষ্ণার নিজের ভেতর সিঁধিয়ে বসে থাকার শাস্তি আমিই দিয়ে দিচ্ছি।

কল্কি বলল, তাই দাও গুরু।

ওকে আজকের আসরে অন্তত চারখানা গান গাইতে হবে।

রামেশ্বর বলে উঠল, এ যে গুরুপাপে লঘু দণ্ড হয়ে গেল রে।

দিব্য বলল, কি রকম?

মাত্র চারখানা গান গেয়ে আসামী খালাস।

সুসিতা বলল, উপস্থিত বন্ধুদের বিচারে ওকে অন্তত আরও দুখানা গাইতে হবে। অতিরিক্ত দুখানা ও কল্কির সঙ্গে ডুয়েটও গাইতে পারে।

সবাই সমস্বরে গেয়ে উঠল, 'তবে তাই হোক, তবে তাই হোক'।

কৃষ্ণকলি বলে উঠল, দেখ, কোন গানের কথা কোথায় লাগিয়ে দিলে।

যুধাজিৎ বলল, যতক্ষণ কবি কোনকিছু সৃষ্টি করেন ততক্ষণ সেটা থাকে তাঁর অধিকারে, কিন্তু প্রকাশিত হলেই সেটা চলে যায় সৃষ্টি ছাড়াদের দখলে।

তখন অতি ভালোবাসার মহাকবিদের সৃষ্টির পিণ্ডি চটকানো হয়।

অন্দরমহল থেকে সোমপ্রভাদেবীর খাস দূতী এসে দাঁড়াল।

দিব্য বলল, কি খবর মাসি?

ওপরের ঘরে তোমাদের গানের আসর পাতা হয়েছে। কল্কি গেয়ে উঠল—

'এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা
হাতে হাতে ধর গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে
সামনে মিলন স্বর্গ।'

সবাই এবার দিব্যের পেছন পেছন সারি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

প্রাচীন বনেদী বাড়ি কিন্তু সুচারুভাবে সংরক্ষিত।

তিনদিকে করিডোর, মাঝখানে প্রশস্ত হলঘর। ঋজু ঋজু, বড় বড় জানালা। নেটের পর্দা ঝুলছে, মৃদু হাওয়ায় দুলছে। হালকা হলুদ রঙের পর্দার ওপর সাদা লম্বা জাপানি পটে আর্টিস্টিক ভঙ্গীতে বাঁকানো বনসাই একটা চেরী গাছ আঁকা। ছড়ানো ডাল ভরে ফুটে আছে পিঙ্ক রঙের অজস্র চেরী ফুল।

পুবে, বড় জানালার দুদিকে দুটি প্রমাণ-সাইজ অয়েল পেইন্টি।

একটি দিব্যর পিতামহ দীপনারায়ণের, অন্যটি দিব্যর পিতা সূর্যনারায়ণের। একেবারে জীবন্ত প্রতিকৃতি। অন্য ঘরে নাকি এমনি ছবি আছে দিব্যর প্রপিতামহ অনন্তনারায়ণের।

দিব্য কিন্তু নারায়ণকে ছাঁটাই করেছে নিজের নামের থেকে।

হলঘরের পশ্চিম দেওয়ালে একটি বেদি। কাঠের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা। তার ওপর জয়পুর থেকে আনা শ্বেত পাথরের বীণাবাদিনী বাগীশ্বরী মূর্তি।

ঘরের একদিকে ঝকঝকে পালিশ করা পিয়ানো।

অনেক উঁচু সিলিং-এর মাঝখান থেকে ঝুলছে আধুনিক ডিজাইনের সুদৃশ্য ঝাড়লণ্ঠন। আলো এসে পড়েছে শ্বেত পাথরের মেঝেতে বিছানো ফুল, লতাপাতা আর বুলবুলের ডিজাইন তোলা পারসিয়ান কার্পেটের ওপর। দেবী বাগীশ্বরীর মূর্তির সামনে ঝকঝকে পেতলের ঘড়া। তাতে শোভা পাচ্ছে নানা রঙের গ্ল্যাডিওলা।

সবাই বসে পড়ল কার্পেটের ওপর। সুচেতনা কিন্তু কনুই ঠেসান দিয়ে, হাতের পাতায় লীলাভরে মাথাটি রেখে কাৎ হয়ে কার্পেটের ওপর দেহটিকে এলিয়ে দিল।

কল্কি গেয়ে উঠল,

'একি এ সুন্দর শোভা! কী মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম উৎস উথলিল আজি.....'

এটা তোর গান ভদ্‌কা, আমি কণ্ঠে তুলে নিলাম।

সুচেতনা এবার ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসল। তার রঙীন ফুলে গাঁথা লম্বা বিনুনিটা দোল খেয়ে কোলের ওপর এসে পড়ল।

মুখে বলল, দারুণ গেয়েছিস। তবে এখনও আমার হৃদয়নাথকে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি।

সকলে কথাটা উপভোগ করে হাততালি দিল।

মৈথিলী মন্তব্য করল, তোর বাঁশুরিয়া এল বলে।

ঘরের এককোণে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল।

দিব্য ফোন ধরে ওপারের কথা শুনে বলল, ধরুন, দিচ্ছি।

বাঁ হাতের ইসারায় সুচেতনাকে কাছে ডেকে ফোনটা তার হাতে ধরিয়ে দিল। নিজে এসে বসল বন্ধুদের ভেতর।

হ্যালো, সুমন! হ্যাঁ, হ্যাঁ, দারুণ এনজয় করছি, তবে মিস করছি তোমাকে।

আবার থেমে শুনল, সুমন নামক ব্যক্তিটির কথা।

হেসে উত্তর দিল, না না, একেবারে নিরিমিষ। অ্যাকোয়াগার্ডে ছেঁকে নেওয়া বিশুদ্ধ গঙ্গার জল।

এবার ওপারের কথা শুনে পেট থেকে হাসির তরঙ্গ তুলল।

মনে হল, ওপারের বক্তাটি বেশ রসিক পুরুষ।

এবার সচেতনার মুড চেঞ্জ হয়ে গেল।

স্থির গলায় বলল, কবে?

...

ঠিক আছে।

....

পাওনাগণ্ডার ব্যাপারে মিঃ চোখানির সঙ্গে তুমি যে ব্যবস্থা করবে তাতেই আমি রাজি।

....

নানা, সে ব্যাপারে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। বাপিকে আমি ম্যানেজ করে নেব।

.....

গুড নাইট, সুইট ড্রিমস।

ফোন নামিয়ে রাখল সুচেতনা।

যতক্ষণ ও কথা বলছিল, বন্ধুরা শুনছিল উৎকর্ণ হয়ে।

ভাল লাগেনি কৃষ্ণকলির কান পেতে ওর কথা শুনতে। ফোনে যখন কেউ কারু সঙ্গে কথা বলে তখন সে কথা শুনতে ওর রুচিতে বাধে।

সুচেতনার হাতে ফোন তুলে দিয়ে দিব্য আসরে এসে বসেছিল। বিজ্ঞাপনের মডেলের মতো সুন্দর মুখখানা ঈষৎ কাৎ করে, সাদা ফোনটা কানে চেপে ধরে শরীর দুলিয়ে কথা বলছিল সুচেতনা।

সবাই হাঁ করে তাকিয়েছিল সেদিকে। সেই ফাঁকে কৃষ্ণকলি অনুচ্চে দিব্যকে বলেছিল, একটা হারমোনিয়াম চাই যে।

আনছি, বলে ঘরের থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল দিব্য।

সুচেতনা ফোন রেখে ফিরে আসা মাত্র সুসিতা ওরফে ভীমকালী বলল, হাঁউ মাঁউ খাঁউ — কিসের গন্ধ পাঁউ?

সুসিতাকে বড় একটা পাত্তাই দেয় না সুচেতনা। তবু দায়সারা একটা উত্তর দিল, সুমনের ফোন।

সুসিতা আরও কৌতূহলী, সুমনটি আবার কোন রত্ন?

কিছুটা বিরক্তি গলার সুরে ঢেলে সুচেতনা বলল, তোকে কি করে বোঝাই বল। নাচ টাচ দেখিস?

মাঝে মাঝে।

সুমন দত্তগুপ্তের নাম শুনেছিস?

সুসিতা মাথা নেড়ে জানাল, সে ও নামের কাউকে চেনেনা। কস্মিনকালে কারু মুখে নামও শোনেনি।

উত্তেজিত সুচেতনা বলল, এখন নাচের আসরে সুমন একটা ক্রেজ। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের প্রোগ্রামগুলোতে ও সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে।

সুসিতা ভাবল, হবেও বা। সে আর কোনও কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বসে রইল। অন্যেরা সবজান্তা সেজে মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তাকাতে লাগল এদিকওদিক। ওদের একজনও সুমন দত্তগুপ্তের মতো কৃতি নর্তকের নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ।

সুচেতনা একটু থেমে আবার বলল, 'চিত্রাঙ্গদা'র কথা প্রায় পাকা হয়ে গেছে একটা পার্টির সঙ্গে। ও বলেই দিয়েছে, আমাকে নাম-ভূমিকায় নিয়ে ও অর্জুনের রোলে নাচবে। না হলে ক্যানসেল করে দেবে প্রোগ্রাম।

কল্কি বলে উঠল, 'জয় হোক, তব জয় হোক'।

দিব্যর সঙ্গে হারমোনিয়াম নিয়ে ঘুরে ঢুকল দুটি মেয়ে।

দিব্য বলল, বারান্দায় শ্রোতারা জড়ো হচ্ছেন।'এখন শুরু হোক্ গান। আর একটি কথা, এ আসর পরিচালনা করবে কনককান্তি লাহা, আমাদের কল্কি অবতার।

সবাই হাততালি দিল, হই হই শব্দে বরণ করল সভাপতিকে।

রামেশ্বর বলল, মালা কই?

সভাপতি গম্ভীর গলায় বলল, তুই অথবা তোর জনকনন্দিনী মৈথিলী এগিয়ে এসে নমস্কার করে সভাপতির গলায় একটা অদৃশ্য মালা পরিয়ে দিবি। আর সভাপতি সেই মালাখানা ঘাড় নিচু করে গলা থেকে খুলে সামনে রেখে দেবে। ব্যস, হয়ে গেল। মাঝে মাঝে একটু কল্পনা টল্পনা খাটাতে হয়, বুঝলি।

হাত জোড় করে বন্ধুরা গুরুগুরু বলতে লাগল।

দিব্য এরই ভেতর অন্দরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আবির্ভূত হল, হাতে নিয়ে একটি জবাফুলের মালা। নানা রঙের জবায় তৈরি মালাটি।

দিব্য বলল, কৃষ্ণা, মাল্যদান করে সভাপতি বরণ কর।

কৃষ্ণকলি মালা নিয়ে সভাপতির গলায় পরিয়ে দিলে।

কল্কি সভাপতিসুলভ হাসির রেখা মুখে টেনে মালাটা গলা থেকে খুলে বলল, তুমি যদি বালিকা হতে কন্যা তাহলে এ মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিতাম, কিন্তু একজন তরুণীর গলায় পরিয়ে দেওয়া সঠিক কর্ম হবে না ভেবে ইচ্ছা থাকলেও ক্ষান্ত হলাম।

বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠল, দে পরিয়ে।

থাক্ থাক্, ছেলে মানুষ কেঁদে ফেলবে।

ততক্ষণে কৃষ্ণকলি বসে পড়েছে। তার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত।

জবার মালাখানা দুহাতে তুলে ধরে কল্কি বলল, আমি একটি গান গেয়ে আজকের সঙ্গীত আসরের উদ্বোধন করছি।

সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল কল্কি :

'বলরে জবা বল—
কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল?
মায়া তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,

মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা জীবন হোক সফল।।
কোটি গন্ধ কুসুম ফুটে বনে মনোলোভা—
কেমনে মার চরণ পেলি তুই তামসিক জবা;
তোর মত মার পায়ে রাতুল
হব কবে প্রসাদী ফুল,
কবে উঠবে রেঙে—
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে,
কবে তোরই মত রাঙবে রে মোর মলিন চিত্তদল।।
থামল কল্কির দরাজগলার গান।

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো গান শুনছিল ঘরে বাইরের শ্রোতারা। গান থামলে চারদিক থেকে হাততালি আর বাহবা ধ্বনি উঠল।

কল্কির গানের সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে বাজাচ্ছিল কৃষ্ণকলি। গান থামলে সেও হারমোনিয়ম ছেড়ে হাততালি দিতে লাগল।

হঠাৎ জল এসে গেল তার চোখে। এমন গান গাইতে পারে জগৎ-জননী তাকে বিপদ থেকে ফিরিয়ে আনছেন না কেন।

কল্কি এবার ঘোষণা করল, এখন সঙ্গীতে মাতৃ-বন্দনা করবে আমাদের কলেজের সব থেকে প্রিয় আর কৃতি গায়িকা কৃষ্ণকলি বসু।

কৃষ্ণকলি আবার হারমোনিয়ামে হাত রাখল।

এক ফাঁকে দিব্য তাকে বলেছিল, মা তোমার গান শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে কৃষ্ণা। আমি মাকে বলেছি, তুমি কৃষ্ণার গান শুনলে খুশি হবে মা। আমার মুখ রেখ।

কৃষ্ণা আবাল্য গান শিখেছে তার গায়িকা মায়ের কাছে। তার ভেতর তালিম নিয়েছে ক্ল্যাসিকাল গানের গুরু স্বনামধন্য অজয় চক্রবর্তীর কাছে। তাই বড় মধুর আর তৈরি গলা তার। সে এবার গান ধরল— কমলাকান্তের মাতৃ-বন্দনার গান ঃ

'শ্যামা মা কি আমার কালো রে।
কালোরূপে দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে,
লোকে বলে কালী কালো, আমার মন তো বলে না কালো রে।
কখনও শ্বেত কখনও পীত কখনও নীল লোহিত রে,
(আমি) আগে নাহি জানি কেমন জননী, ভাবিয়ে জনম গেল রে।
কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি শূন্যরূপা রে,
(মায়ের) এ ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত সহজে পাগল হল রে।।
কণ্ঠ থেকে ফুলের মতো যেন নিবেদন ঝরে পড়ছিল মাতৃচরণে।

সেই হাততালি, সেই প্রশংসা, বাইরে থেকে আরও গাইবার আবেদন।

এবার কৃষ্ণকলি বলল, সভাপতির সঙ্গে আমার ডুয়েট গাইবার কথা আছে। উনি নজরুলের গান গাইতেই ভালোবাসেন। তাই এর পরের গানটা আমরা একসঙ্গে গাইব। নজরুলের বহুবিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত।

গান শুরু হল ঃ

• 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যাঁর হাতে মরণ বাঁচন।
কালো মায়ের আঁধার কোলে, শিশু রবি শশী দোলে,
'মায়ের' একটুখানি রূপের ঝলক— স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন।।
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশিথীনির দুলিয়ে কেশ
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার যে তাঁর নাইকো শেষ।।

সিন্ধুতে মার বিন্দুখানিক, ঠিকরে পড়ে রূপের মাণিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্বসন।।'

অনেকগুলি গান গাইল কৃষ্ণকলি। তবুও অতৃপ্ত থেকে গেল শ্রোতাদের হৃদয়।

গানের ফাঁকে একসময় কখন আসর থেকে উঠে, গিয়েছিল সুচেতনা আর মৈথিলী তা বিশেষ কেউ একটা লক্ষ করেনি।

প্রায় মিনিট চল্লিশ পরে যখন গান থামল তখন পাশের একটা দরজার আড়াল থেকে সভাপতিকে কি যেন ইঙ্গিত করল মৈথিলী।

কল্কি অমনি উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে হাতের ইঙ্গিতে দেয়ালের দিকে সরে যেতে বলল। তারা সরে গেলে মাঝখানে পাতা বিশাল কার্পেটটা খালি হয়ে গেল।

সভাপতি এবার বলে উঠল, এতক্ষণ আপনারা গান শুনলেন। এখন আমরা একটি নাচ দিয়ে আসরের সমাপ্তি ঘোষণা করব।

এটি দেবীর অসুর-নিধনের নাচ।

কথাগুলো বলেই আসর থেকে সরে গেল সভাপতি।

শাড়িটাকে সাপটে পরেছে সুচেতনা। ইতিমধ্যে দরকার মত মেক আপও নেওয়া হয়ে গেছে। চূড়া করে খোপা বাঁধা হয়েছে লম্বা, বিনুনিটা পাকিয়ে পাকিয়ে।

হাতে ত্রিশূল নেই, কিন্তু কে বলবে ত্রিশূল নেই। হাতের মুদ্রায় ত্রিশূলধারিনী দেবীর মূর্তি।

সুচেতনার কাজল টানা বড় বড় চোখে রুদ্র রূপ। নাচের ভঙ্গিতে যেন শুরু হয়েছে সংহারিণী মূর্তি।

একক নৃত্য, কিন্তু জমিয়ে দিল আসর। তার অঙ্গ সঞ্চালন, অভিব্যক্তি একেবারে সুদক্ষ নৃত্যশিল্পীর মত। আসরে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে কিন্তু দৃষ্টি তার সেই অদৃশ্য অসুরের ওপর।

অবশেষে ভয়ঙ্কর রূদ্রমূর্তিতে দেবী অসুর-সংহার করলেন।

তারপর অসুর বিনাশিনী দেবী দাঁড়ালেন প্রসন্ন বরাভয় মূর্তিতে।

সবার সাধুবাদে উদ্বেল হয়ে উঠল আসর।

চুড়ো করা খোঁপা ভেঙে পিঠে আগের মতো বিনুনি দুলিয়ে বন্ধুদের মাঝখানে বসে পড়ল সুচেতনা।

সম্ভবত মায়ের ইশারায় ঘরের ভেতর ঢুকে গেল দিব্য। কিছুক্ষণ পরে দুটি কাজের মেয়েকে নিয়ে দিব্যের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন সোমপ্রভা দেবী।

মেয়ে দুটির হাতে বড় আকারের দুটি কাশ্মীরী-কাজ-করা কাঠের ট্রে।

সোমপ্রভা দেবীর মুখ প্রতিমার মতো মনে হচ্ছিল। মমতাময়ী মাতৃমূর্তি।

আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, আজ তোমরা আমাদের যে আনন্দ দিলে, তার তুলনা নেই। গানে নাচে আমাদের দেবীপূজা সার্থক হয়ে গেল।

একটু থেমে আবার বললেন, শুধু নর্তকী কিংবা গায়ক-গায়িকা আজকের আসর জমায়নি, তোমাদের সকলের আনন্দ আর উচ্ছ্বাস পুজোর এই রাতটাকে, খুশি আর তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে।

তাই, আমার স্নেহ আর আশীর্বাদ মাখানো সামান্য কিছু উপহার তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাই।

সোমপ্রভা দেবী প্রথমে মেয়েদের ডাকলেন। ট্রে থেকে রঙিন শাড়ি নিয়ে এক-এক করে মেয়েদের হাতে তুলে দিলেন।

এরপর দিব্যর বন্ধুদের ডাক পড়ল। তারা পেল একখানা করে শার্টের পিস।

এবার, হলঘর মুখর হয়ে উঠল মাসীমার জয়ধ্বনিতে। সবাই একে একে সোমপ্রভা দেবীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

কল্কি বলল, দিব্য, বছরে-বছরে শ্যামাপুজোর রাতে তোর বাড়িতে যেন এমনই আসর বসাতে পারি।

গানের সূত্র ধরে মাঝে মাঝে দিব্যর মায়ের কাছ থেকে ডাক আসতে লাগল কৃষ্ণকলির। সে ডাক সে যেমন উপেক্ষা করতে পারত না তেমনি গভীর আনন্দেও তাকে গ্রহণ করতে পারত না।

আসলে কৃষ্ণকলির মনটা ছিল একটা ঝিনুকের মতো। তার, ভেতর দামি মুক্ত জন্ম নিয়েছিল অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখের মন্থনে। সে সেটিকে গোপন করে রাখতে ভালবাসত, প্রকাশের আলোয় আনার চেষ্টা করত না।

মায়ের ডাক পড়লেই দিব্য তাকে কলেজ থেকে গাড়িতে, তুলে নিয়ে যেত।

এই যাত্রাপর্বটা তার কাছে ছিল ভীষণ সংকোচের। সবার চোখের সামনে দিয়ে দিব্যর সঙ্গে গাড়িতে করে যাওয়া, কলেজের ভেতর একটা গুঞ্জনের সৃষ্টি করল।

সে পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছিল কিন্তু সহজ সরল দিব্যর আকর্ষর্ণকে সে প্রতিরোধ করতে পারছিল না।

যাওয়া আসার পথে দু-চারটি কথা দুটি হৃদয়কে বড় কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। সে নিজের মনটাকে যতই আড়াল করার চেষ্টা করছিল ততই খুলে যাচ্ছিল দক্ষিণের বাতায়ন। আর ফাল্গুনী হাওয়া ছুটে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার মন।

যৌবনের একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে। সে বেগবান অশ্বের মতো ছুটে চলে যায়। তার রাশ টেনে ধরে সঠিক পথে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তবে আবাল্য সংযত জীবনের মধ্যে যে কাটিয়েছে তার সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র একটা ক্ষমতা থাকে। সে প্রবল, ইচ্ছাশক্তির বলে যৌবনের রাশটাকে হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনার হাত থেকে টেনে রাখতে পারে।

কৃষ্ণকলি তার স্বভাবধর্মে অর্জন করেছে এ ধরনেরই একটি শক্তি।

একদিন কৃষ্ণকলিকে সঙ্গে নিয়ে দিব্য যখন বাড়ির দিকে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ গাড়িটায় ব্রেককষে সে বলল, এখন হাতে সময় আছে, আমরা কি একটু ঘুরে যেতে পারি?

কোথায়?

গঙ্গার ধারে একটা রেস্তোরাঁয়। ওখানেই আমরা কিছু খেয়ে নেব।

কেন? মায়ের হাতে তৈরি খাবারে মন বসছে না বুঝি?

'স্কুপে' বসে গঙ্গার দিয়ে চেয়ে চেয়ে আলুভাজা আর আইসক্রিম খাওয়ার মজাই আলাদা।

বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

তোমার ইচ্ছা করছে না বুঝি?

দিব্যর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল কৃষ্ণকলি, মুখে কোনও জবাব দিল না।

গাড়ি বাঁদিকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটে চলল গঙ্গার দিকে।

একসময় চোখের সামনে ঝলমল করে উঠল গঙ্গা। তার তরঙ্গে অপরাহ্নের আলো সোনা ঝরাছিল।

গাড়িটা রাস্তার ওপর পার্ক করে ট্রেনলাইন পেরিয়ে ওরা ঢুঁকে পড়ল রেস্তোরাঁয়।

ওরা নীচের কাউন্টার থেকে আলুভাজার দুটো প্লেট নিয়ে ওপরে গঙ্গামুখী দুটো চেয়ারে বসল।

দিব্য বলল, খাওয়া শুরু করি, একটু পরে আমি গিয়ে আইসক্রিম নিয়ে আসব।

ওরা মুখরোচক আলুভাজা খেতে লাগল।

দিব্য আবার বলল, জায়গাটা কেমন লাগছে কিছু বললে না তো?

ভাল লাগাকে কখনও কি বলে বোঝান যায়।

আর এক প্লেট আনি? তোমার ভাল লাগছে না?

ভাল লাগল বলে কি অনেক খেতে হবে?

সেই কখন সাত-সকালে, বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছ, আর তো তোমার খাওয়াই হয়নি। আনছি, বোস।

দিব্য এবার এক প্লেট আলুভাজার সঙ্গে আইসক্রিম নিয়ে এল।

এবার দুজন খেতে লাগল তারিয়ে তারিয়ে।

কৃষ্ণকলি প্লেটটা দিব্যর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, আলুভাজাটা তুমি খাবে।

আমি খাব বলে নিয়ে এলাম বুঝি?

তুমিও তো কলেজ পিরিয়ডে কিছু খাওনি।

বেশ, তাহলে দুজনে খাওয়া যাক।

ওরা একই প্লেট থেকে তুলে তুলে খেতে লাগল, সঙ্গে আইসক্রিম।

প্লেট প্রায় খালি হয়ে আসছিল, কৃষ্ণকলি বলল, বাকিটা তুমি মুখে পুরে দাও।

এক যাত্রায় পৃথক ফল ভাল নয়, গুণে গুণে ভাগ করে নিতে হবে।

বাবা। এত হিসেবী তুমি।

শুধু হিসেব নয়, কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব। শেষে তিন পিস থাকলে দেড়খানা করে ভাগ হবে।

কৃষ্ণকলি হেসে বলল, তোমার বাবা শুনেছি মস্ত বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী তো। হিসেবে একদম পটু।

আইসক্রিম শেষ হয়ে আসছিল। দিব্য বলল, একটু ঘুরে আসবে নাকি?

আবার কোথায়! তোমার মাথায় দেখছি ঘুর্নিতে ভর করেছে।

হঠাৎ বাঁহাতে কৃষ্ণকলির মাথাটাকে ডানদিকে ঘুরিয়ে ধরে বলল, দেখ, ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে।

হ্যাঁ, তাই তো।

গঙ্গার বুকে একটু বেড়িয়ে আসবে নাকি?

খুব ইচ্ছে করছিল কৃষ্ণকলির, তবু ইচ্ছেটাকে চেপে রেখে বলল, যাবে? ঠিক সময় বাড়ি পৌছতে পারব তো?

দিব্য বলল, আজ আর তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব না, একেবারে সরাসরি তোমার বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসব।

কী আহ্লাদের কথা! মামার বাড়িতে রাজপুত্তুর ঢুকছেন গাড়ি নিয়ে, পরের দিন পাড়াপড়শীরা আমার শ্রাদ্ধ করে ছেড়ে দেবে না।

বেশ, কিছু দূরে না হয় তোমাকে ছেড়ে দেব, বাকি পথটুকু হেঁটে চলে যাবে।

ওরা নৌকোতে উঠল। উঠতে গিয়ে কৃষ্ণকলির পা টলছিল। দিব্য তার হাত ধরে কাছে টেনে নিল।

এত রোমাঞ্চ থাকে প্রিয়জনের ছোঁয়ায়। — এই প্রথম কৃষ্ণকলি তা অনুভব করল।

ওরা প্রায় আধঘণ্টা ধরে নৌবিহার করে ফিরে এল।

এবারও নৌকো থেকে দিব্য হাত ধরে তুলল কৃষ্ণকলিকে।

গাড়িতে বসে দিব্য বলল, কেমন লাগল আজকের অভিযান?

তোমার?

দারুণ। কিন্তু তোমার কেমন লাগল বললে না তো?

কৃষ্ণকলি দিব্যর স্টিয়ারিং ধরা হাতটা ছুঁয়ে দিয়ে বলল, জানি না।

রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না কৃষ্ণকলির চোখে। তার বারবার মনে হতে লাগল কে যেন তার পাশে বসে রয়েছে। তার মৃদু নিঃশ্বাসটা এসে পড়ছে তার মুখের ওপর। উত্তপ্ত সান্নিধ্যের একটা চেনা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। কে যেন একমুঠো মহুয়া ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানার ওপর।

তার দৃঢ় ধারণা জন্মাল, কেউ চোখে দেখার পথ ধরে না এসেও অনুভবের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

এর পরের দিনগুলো কৃষ্ণকলির বর্ষাধারায় সিক্ত। বৃষ্টিভেজা দিনগুলোতে ঘরের কোণে একান্তে বসে থাকার মতো সে দিব্যর ঝড়ো হাওয়ার আকর্ষণকে এড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু ভিজতে লাগল চোখের জলে।

ইতিমধ্যে অশান্ত হয়ে উঠেছে দিব্য। কৃষ্ণকলি কেন তাকে এড়িয়ে চলেছে তা সে বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠল।

এদিকে বেশ কয়েকদিন ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল কৃষ্ণকলি।

একদিন ফেরার পথে বাসস্ট্যান্ডের কাছে কৃষ্ণকলিকে ধরে ফেলল দিব্য।

হাত বাড়িয়ে বলল, উঠে এস। ভয় নেই, নিরাপদ দূরত্বেই নামিয়ে দেব।

দিব্যকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায়ই সে পেল না, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসল।

দিব্যই বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে টেনে লক করে দিল দরজাটা।

কিছু পথ দুজনে নীরব।

একসময় গাড়ির গতিটা কমিয়ে দিব্য বলল, কী এমন অসম্মান করেছি তোমাকে যেজন্যে তুমি আমাকে এড়িয়ে চলেছ?

কৃষ্ণকলি মুখ ফুটে একথাটা বলতে পারল না, দিব্য তোমার যা আছে, আমার তা নেই। তোমার সৌন্দর্য, তোমার সম্পদ, তোমার সৌভাগ্য নিয়ে সমাজের যেখানে তুমি বসে রয়েছে, সেখানে পৌঁছবার শক্তি আমার নেই। তাই আমি স্বেচ্ছায় ভেঙে দিয়েছি দু-দিনের খেলা। শুধু নিজে বাঁচব বলে, ক্ষতবিক্ষত হওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচব বলে।

কী ব্যাপার। চুপ করে রইলে যে?

করুণ একটা হাসি হেসে কৃষ্ণকলি বলল, অধরার যত মাধুরীই থাক, তাকে ধরতে গেলে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়।

তোমার এ-হেঁয়ালির অর্থ?

আমি তোমার কাছে থেকে পালাইনি, নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

তুমি যে আমাকে আরও কুয়াশার ভেতর ঠেলে দিলে!

নিজে বড় দুর্বল হয়ে পড়ছি দিব্য, তাই সবার কাছ থেকেই আমি পালাতে চাইছি।

গলায় অভিমান ঢেলে দিব্য বলল, সবার সঙ্গে তুমি আমাকে এক করে দেখলে কৃষ্ণা!

কৃষ্ণকলি দিব্যর হাতটা চেপে ধরে বলল, প্লিজ দিব্য, তুমি আর আমাকে প্রশ্ন কোরো না।

গাড়ি এবার কৃষ্ণকলিদের বাড়ির পথ ধরল।

এ রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। বড় একটা গাড়ির ভিড় নেই, মাঝে মাঝে দু একটা বাস আর লরি আসা যাওয়া করছিল।

হঠাৎ সামনের দিক থেকে দুটো মোটর বাইককে ছুটে আসতে দেখা গেল।

দিব্য গাড়ি দুটোকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সে আরোহীদের লক্ষ করেনি।

হঠাৎ ভিউ ফাইন্ডারে দেখল, গাড়ি দুটো ব্যাক্ করে তাদের দিকেই ছুটে আসছে।

কোনও কিছু অনুমান, করার আগেই ওদের পথ আটকে দাঁড়াল মোটর বাইক দুটো।

দিব্য দেখল, তাদেরই কলেজের বিরোধী পক্ষের দুই পাণ্ডা— কৃষ্ণেন্দু আর সুকান্ত তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

দিব্যের কাছে কৃষ্ণেন্দু এবার হেরে গেছে ইলেকশানে। সে মুখ বেঁকিয়ে বলল, কি রে, চিনতেই যে পারছিস না।

তোদের দেখতেই পাইনি।

তা পাবি কী করে, তোর নজর তো এখন অন্যদিকে।

পাশ থেকে সুকান্ত বলে উঠল, কিরে, সীতাহরণ করে নিয়ে কোথায় পালাচ্ছিস?

দীর্ঘদেহী দিব্য গাড়ির থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।

কী বললি, আর একবার বল।

দিব্যর রণংদেহি চেহারা দেখে কুঁকড়ে গেল সুকান্ত।

কিন্তু কৃষ্ণেন্দু বলল, কি রে, লড়াই করবি নাকি?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে দিব্য বলল, আসল, লড়াই তো ইলেকশনে হয়ে গেছে। এখনও লড়াইয়ের সাধ মেটেনি। চলে আয়, আমি তৈরি— ততক্ষণে আস্তিন গুটিয়ে নিয়েছে দিব্য।

পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে দেখে গাড়ি থেকে নেমে এল কৃষ্ণকলি।

বলল, তোমরা অকারণে চেঁচামেচি করছ কৃষ্ণেন্দুদা। আমরা এক কলেজে পড়ি, সবাই বন্ধু।

ইলেকশানে হারজিত আছে তাতে বন্ধুত্ব নষ্ট হবে কেন? ইচ্ছে করলে আমিও তোমাদের গাড়িতে বসে যে কোনও দিন বাড়ি চলে যেতে পারি।

ওরা আর কোনও কথা না বলে মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

দিন সাতেক উভয়ের অদর্শন। হঠাৎ একদিন দিব্য এসে হাজির হল কৃষ্ণকলির ডেরায়।

এবার অবাক হওয়ার পালা কৃষ্ণকলির।

কি হল দিব্য, তোমার মুখখানা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? মাসীমা ভাল আছেন তো?

হ্যাঁ, মা ঠিক আছে।

তবে?

কৃষ্ণেন্দুটা বিপদে পড়ে গেছে।

কি রকম?

বেচারার পক্স হয়েছে। সারা গায়ে বেরিয়ে গেছে, যন্ত্রণায় অস্থির।

তাই! ওতো হোস্টেলে রয়েছে।

হোস্টেলে সুপার ওকে আর এক মুহূর্ত হোস্টেলে রাখতে রাজি নন। কারণ, রোগটা ছোঁয়াচে।

ওঁর বাড়ির লোককে কোনও খবর দেওয়া হয়নি?

নবদ্বীপে ও দিদির বাড়িতে থাকে। সংসারে আর কেউ নেই। খবর দিলে সেখানেই দিতে হয়। ইউনিয়নের সেক্রেটারি বলে দায়িত্বটা সুপার আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

কি ভাবছ, ওকে কি নবদ্বীপ নিয়ে যাবে?

কি করে সম্ভব। একে তো যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তার ওপর এতটা পথ কিভাবে নিয়ে যাব।

তা হলে?

আমি ভাবছি, ওকে আমার বাড়িতে নিয়েই রাখব।

মাসীমা কিছু বলবেন না?

তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, মা কিছু বলবে না। এখন আমার সঙ্গে একটু যেতে পারবে? তা হলে ওকে গাড়িতে করে আজই আমার বাড়িতে তুলে আনব।

দুজনে হোস্টেলে থেকে অসুস্থ কৃষ্ণেন্দুকে তুলে নিয়ে চলল দিব্যর বাড়ির দিকে।

ওদের প্রাণঢালা সেবাযত্নে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল কৃষ্ণেন্দু। সেদিন থেকে ওরাই হল ওর কাছে পরমাত্মীয়।

দুই

বেশ কয়েক রাত দিব্যর বাড়িতে কাটাতে হয়েছিল কৃষ্ণকলিকে। রাতজেগে দুজনে সেবা করেছিল কৃষ্ণেন্দুর।

এমন একটা বয়স থাকে যখন সাংসারিক অনুশাসনের ওপরে আবেগই কাজ করে।

ওরা দুজনে তাই সংসারের নিয়ম কানুন, সতর্কতার দিকে না তাকিয়ে মগ্ন হয়েছিল বন্ধুর সেবায়। নিস্তব্ধ রাত্রি সেবার ভেতর নিবিড় সান্নিধ্যে এনে দিয়েছিল দুটি মুগ্ধ হৃদয়কে।

এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে কদিনের জন্য দিদির বাড়ি চলে গেছে কৃষ্ণেন্দু। তাই একটানা রাত্রি জাগরণের পর আবার দুজনের পুরাতন জীবনে ফিরে যাওয়া।

কি এক অব্যক্ত উত্তেজনায় কেটে গেছে দুটি মিলন সমুৎসুক যুবক যুবতীর রাতের প্রহরগুলো।

এখন শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কৃষ্ণকলির শুধু স্মৃতি রোমন্থন। তার সীমারেখা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন সে। তাই অকারণে সে আর নিজেকে মেলে ধরতে চায় না।

কণ্ঠ সম্পদ তার যতই থাক না কেন, দুটো ভাসা ভাসা চোখের আবেদন যতই গভীর আর অর্থবহ হোক না কেন সে ভাল করেই জানে তার প্রার্থিত যে কোনও পুরুষই থেকে যাবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

মামার কাছে একবার তাঁর এক বন্ধু এনেছিলেন একটি পাত্রের সন্ধান।

কৃষ্ণকলির কানে কথাটা যাওয়ামাত্র সে মামাকে বলেছিল, এখুনি আমাকে বিদেয় করে দিতে চাইছ কেন মামা? আমাকে কি অনার্স গ্র্যাজুয়েট হওয়ার সুযোগটাও দেবে না ?

ছেলেটি বড় যোগ্য রে মা। ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ার, ডি. ভি. সি-তে কাজ করছে। এ রকম একটা যোগাযোগ বড় ভাগ্যে হয়। তাছাড়া শিক্ষিত ছেলে, নিজের স্ত্রীকে কি আর হায়ার এডুকেশন না দিয়ে শুধু হাউস-ওয়াইফ করে রেখে দেবে।

যদি না দেয় তাহলে যে আমার সব স্বপ্ন ভেঙে যাবে মামা।

তোর প্রবললেমটা আমি বুঝতে পারছি মা, কিন্তু আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা শোন।

কথাটা শোনার জন্য মামার মুখের দিকে চেয়ে রইল কৃষ্ণকলি।

আমি যে স্কুলে থেকে রিটায়ার করি, সে স্কুলেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের একটি অতি সুন্দরী মেয়ে ছিল। পড়াশোনাতেও ছিল তার প্রবল আগ্রহ।

অনেক বিশিষ্ট বাড়ির অভিভাবকদের নজরে পড়ে গিয়েছিল সে। তাঁরা তাঁদের ঘরে ছেলের বউ করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন মেয়েটিকে। অত্যন্ত যোগ্য সব ছেলে।

কিন্তু কোনরকমেই রাজি হল না মেয়েটি। সে পড়াশোনা শেষ না করে বিয়ে করতে চাইল না।

অগত্যা মেয়ের জেদই জয়ী হল। এম এ তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পি এইচ ডি করার পর সংসারী হতে চাইল। কিন্তু ততদিনে তার মুখ থেকে তারুণ্যের লাবণ্যটুকু মুছে গেছে। সে বড় একটা কলেজে কাজও পেল। এখন সে চায় তার যোগ্যসঙ্গী।

কিন্তু জীবনের বড় বেশি সময় খরচ করে ফেলেছে সে। এখন আর কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সুযোগ্য যুবকেরা ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে আগ্রহী হল না। তারা কান্তিময়ী একটি তরুণী মেয়েকেই বিয়ে করে নিয়ে যেতে চায়, কোন পূর্ণ যৌবনা সুপ্রতিষ্ঠিত নারীকে নয়।

কৃষ্ণকলি বলল, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।

ছেলে আর তার বাবা এসেছিলেন মেয়ে দেখতে।

কয়েকটি মামুলি প্রশ্ন করলেন ছেলের বাবা। বিনীতভাবে তার জবাব দিল কৃষ্ণকলি।

কি নিয়ে পড়ছ?

মামা অমনি বলে উঠলেন, ইংলিশে অনার্স নিয়ে।

মৃদু হেসে একটু ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে বললেন ভদ্রলোক, আমি আপনার ভাগ্নীর মুখ থেকেই শুনতে চাইছি।

আগবাড়িয়ে বলতে গিয়েই অপ্রস্তুত হলেন মামা।

পরের প্রশ্ন, পাশ করার পরে কি করতে চাও?

সুযোগ পেলে কোন একটা নার্সারী স্কুলে পড়াব।

স্কুলের উঁচু ক্লাসে কিংবা কোন কলেজে পড়ানোর স্বপ্ন দেখ না?

আমি ইউনিভারসিটির শেষ পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করলেও বাচ্চাদেরই পড়াতে চাই।

এরকম ইচ্ছার কারণ?

আমি বাচ্চাদের খুব পছন্দ করি। সুযোগ পেলেই ওদের গান গেয়ে শোনাই। নানাভাবে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি।

ভদ্রলোক কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন. বিশেষ বিশেষ রান্নার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ আছে কি?

এ বাড়ির রান্না আমিই করি।

মামাবাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না।

ও শুধু রান্না করে না, নতুন নতুন আইটেম তৈরি করে রান্নার বই দেখে। এই তো একমাসের ভেতর ও আমাকে তিন তিনটে নতুন পদ রান্না করে খাইয়েছে। আপনার বাড়িতে গেলে ও আপনাদেরও খাওয়াবে।

একটু থেমে আবার শুরু করলেন, কোন মাসে তিনদিন যদি ও গোয়ানিজ রান্না খাওয়ায়, পরের মাসে চাইনিজ, তার পরের মাসে মোগলাই — এমনি চলবে। আজকে মাংসের সিঙাড়া ও নিজের হাতে করেছে. দেখবেন কেমন লাগে।

মামার কথায় দারুণ অস্বস্তিতে পড়ছিল কৃষ্ণকলি, কিন্তু কিছুই বলতে পারছিল না।

মামাবাবুর কথা থামলে ভদ্রলোক বললেন, খাইয়ে মানুষ আপনি, চতুর্থ ইন্দ্রিয়টি আপনার বড়ই সজাগ। আপনার রসনাটি যেমন স্বাদগ্রহণে পটু তেমনি বাকবিস্তারেও পটু বটে।

এবার ভদ্রলোক ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কিছু বলার থাকলে অসংকোচে বলতে পার।

যুবকটি বলল, রবীন্দ্রসদনে আর বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে আমি আপনার গান শুনেছি। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে আপনি প্রথম অতুলপ্রসাদের যে গানটি গেয়েছিলেন, সেটি যদি একবার শোনান।

কৃষ্ণকলি একটুখানি ভেবে বলল, 'ডাকে কোয়েলা বারে বারে'—এই গানটি কি?

হাঁ হাঁ, ওটাই।

ঘরের একপাশে গানের ছোট্ট একটি আসর। অনেক দিনের পুরনো একটি কার্পেট পাতা। তার ওপর হারমোনিয়াম আর তবলা। ঘরের কোণে রাখা আছে একটা তানপুরা। এই গানের জায়গাটুকুতে বসে রিয়াজ করতেন কৃষ্ণকলির মা। এখন কৃষ্ণকলি মায়ের আসনে বসেই গান করে। সে ওখানে উঠে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরল। গান গাইতে তার কোন আড়ষ্টতা নেই।

'ডাকে কোয়েলা বারে বারে
হা মোর কান্ত, কোথা তুমি হা রে
চিত্ত-পিক চিতনাথে ফুকারে।
বাজিছে বংশী মন বন মাঝে
এমন সময়ে সে কোথা বিরাজে
পুষ্পে পরিমল ফুলবঁধূ যাচে
এসো বঁধুয়া নিকুঞ্জ দুয়ারে।'

গান শেষ হলে গায়িকার কণ্ঠের প্রশংসা করলেন ভদ্রলোক। তাঁর ছেলে স্বাভাবিক কারণেই গুরুজনদের সামনে কোনওরকম মন্তব্য না করেই নীরব রইল।

জলযোগান্তে, পরে খবর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিতাপুত্র প্রস্থান করলেন।

পাত্রপক্ষের পত্র আসতে বিলম্ব হল না। সমাচারটি কৃষ্ণকলির হাতেই এসে পড়ল।

মাননীয় মহাশয়,

সেদিনের আপ্যায়নে এবং আপনার সহজ সরল কথাবার্তায় আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছি।

আপনার ভাগ্নীর ভেতর যেমন অকারণ জড়তা নেই তেমনি সামান্যতম রূঢ়তা নেই তার আচরণে। চরিত্রের এমন ভারসাম্য সচরাচর দেখা যায় না।

ওর কণ্ঠ-মাধুর্য ভোলার নয়। হাতে তৈরি সেদিনের জলখাবারের স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে।

এবার আসল কথায় আসা যাক।

সৃষ্টিকর্তা কাউকেই তাঁর সমস্ত সম্পদ ঢেলে তৈরি করেন না। কিছু অপূর্ণতা থেকে যায়। এটি বেদনাদায়ক হলেও সত্য।

আপনার ভাগ্নীর গাত্রবর্ণ ঘনশ্যাম। এদিকে আমার পুত্রটিকে দেখেছেন, স্বাস্থ্যবান, সুপ্রতিষ্ঠিত যুবক হলেও আবলুস কালো রঙ।

পুত্র বলে তার ত্রুটিটুকুকে আমি কোনভাবেই আড়াল করতে চাই না।

যিনি এই সম্বন্ধের ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি আপনার ভাগ্নীর গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে কোনরকম ইঙ্গিত দেননি। তিনি কেবল শিক্ষিতা, সঙ্গীতজ্ঞা, সুঠাম, সুদর্শনা বলেছিলেন কিন্তু 'শ্যামা' কথাটা বলেননি। শুধু দেহবর্ণের জন্যই পিছিয়ে আসতে হল এমন ভাল একটি সম্বন্ধকে ভেঙে দিয়ে।

আপনি হয়ত অবাক হচ্ছেন আমার এই পত্রটি পাঠ করে। আপনার মনে হতে পারে আমি বড়রকমের একটা রসিকতা করছি। যার ছেলের রঙ আবলুস কাঠের মত কালো, সে কি করে একটি ঘন শ্যামলা মেয়েকে তার রঙের জন্য প্রত্যাখান করে।

আমার স্ত্রী মন্তব্য করেছেন, দুজনে কালো হয়ে একটি চোখে পড়ার মত কালো ছেলেকে পৃথিবীতে এনেছি। দোহাই তোমার, আবার দুটি কালোকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ অথবা কালীকে স্বর্গলোক থেকে নামিয়ে এনোনা।

ভাবলাম, স্ত্রীর কথায় যুক্তি আছে। উত্তরপুরুষের ব্যাপারে ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। অন্তত একজন তো ফর্সা হোক।

আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

নমস্কর জানাই।
ভবতোষ ঘোষ।

মামার হাতে খামের মুখখোলা চিঠি ধরিয়ে দিল কৃষ্ণকলি।

চিঠি পড়ে আশাভঙ্গে মলিন হয়ে উঠল মামার মুখ।। ভাগ্নীর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, পড়ে দেখ।

আমিই তো খামের মুখ খুলেছি। পড়া আমার আগেই হয়ে গেছে।

মামা বলল, লোকটা ভাল নয়।

একথা কেন বলছ মামা? তিনি তো মিথ্যে কিছুই বলেননি।

বেশ তো, তিনি মেয়ের গায়ের রঙ না জেনে কনে দেখতে এসেছেন। কিন্তু যখন দেখলেন মেয়ে কালো তখন সোজাসুজি রঙের ব্যাপারে তাঁর আপত্তির কথা জানাতে পারতেন। এতগুলো প্রশ্ন আর নানারকম বাঁকা মন্তব্যের দরকার হত না। তাছাড়া ছেলেকে প্রশ্ন করার জন্য এগিয়ে দেবারও কোন দরকার ছিল না।

যাই বল মামা, চিঠি লেখার ব্যাপারে ভদ্রলোকের মুন্‌সিয়ানা আছে। নিজের ছেলের রঙটিকে আবলুস কাঠের মতো বলে অপ্রীতিকর একটি বিষয়কে কেমন লঘু করে দিলেন।

তোর এগুণটা বড় ভাল লাগে মা।

আমার আবার কি গুণ মামা।

এই যে কারু দোষ না দেখা, কোন কিছু গায়ে না মাখা।

মেখেও বা কি করব বল। ও মলম যন্ত্রণা সারায় না, মনের জ্বালাই শুধু বাড়ায়।

মামা, ভাগ্নীর এই প্রথম পরাভবে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, দেখিস, তোর জন্যে কেমন ফর্সা, সুন্দর, শিক্ষিত ছেলে এনে দি।

মামার কথা শুনে খুব হাসি পেল কৃষ্ণকলির। সে হাসি চেপে সরল মনের মানুষটিকে আঘাত না দিয়ে বলল, যত খুশি ভাল ছেলে এন মামা, তবে রঙটা যেন তার কালো হয়।

কালো হবে কেন রে।

নিজে কালো হলে বউকে আর কালো বলে গঞ্জনা দিতে পারবে না।

শিশুর মতো হাসিতে ফেটে পড়লেন মামা দ্বিজদাস সরকার।

মনে মনে ভাবলেন, মেয়েটা আমার চির-আনন্দময়ী। গঙ্গার মতো খুশিতে বয়ে চলেছে ওর মন। কষ্ট দুঃখের যত ময়লাই পড়ুক, জমতে পারে না, ভেসে চলে যায়।

দ্বিজদাসের কাছে বিয়ের উপযুক্ত কয়েকটি ছেলের খবর এল। তিনি নিজেই যেতে লাগলেন পাত্রপক্ষের কাছে। মেয়েকে দেখানোর জন্য তড়িঘড়ি ঘরে ডেকে পাঠিয়ে শেষে প্রত্যাখ্যানের দুঃখ দিতে চান না আদরের ভাগ্নীটিকে।

তিনি ভেবে রেখেছেন, অন্ততঃ ষাট ভাগ সম্ভাবনা না থাকলে তিনি এগোবেন না।

আগেভাগে বলে রাখছেন, ভাগ্নীটি সুশ্রী এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্টার মার্কস আর দুটো লেটার পেলেও গায়ের রঙটি কালো।

শেষের দুটি অক্ষরেই কিন্তু কাজ হয়ে যাচ্ছে। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও আর একটি পাও এগোচ্ছেন না কেউ।

এবার এলাহাবাদের প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ যোগ।

দ্বিজদাসের বহুদিনের ইচ্ছা একবার কুম্ভমেলা দর্শন করেন। নানা কারণে তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হয়নি। যখন কর্মক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন তখন অবকাশ বলে তাঁর কোনও কিছু ছিল না। এখন অবসর জীবনে এই সুবর্ণ সুযোগটাকে তিনি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। যদিও তিনি গৃহকর্তা তবু ভাগ্নীর সঙ্গে পরামর্শ না করে আজকাল কোনও কাজই তিনি করেন না। যত দিন যাচ্ছে ততই তিনি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন ভাগ্নীর ওপরে।

রাশভারী হেডমাস্টার এখন যেন পরিণত হয়েছেন, সহজ, সরল, আনন্দময় একটি বালকে।

রবিবার ছুটির দিনে খাবার টেবিলে বসেছেন মামা আর ভাগ্নীতে। এই সুযোগে কুম্ভযাত্রার কথাটা পাড়লেন দ্বিজদাস।

অনেকদিনের ইচ্ছে কুম্ভমেলা দেখি, কিন্তু কাজের চাপে এতকাল যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। এখন তুই যদি রাজি থাকিস তা হলে টিকিট কাটার ব্যবস্থা করি।

কৃষ্ণকলি বলল, কিন্তু এখন তো আমার ক্লাস টেস্ট চলছে মামা, আমার পক্ষে তো যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া তুমি এইসময় টিকিটই বা পাবে কোত্থেকে?

দ্বিজদাস যেন একান্ত সঙ্গোপনে ভাগ্নীকে নিচু গলায় বললেন সুপ্রকাশ বলে আমার একটি ছাত্র ইস্টার্ন রেলওয়ের উঁচু পদে কাজ করে। দেখি না তাকে বলে, যদি ভি আই পি কোটায় একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

তোমার যখন এতই ইচ্ছে, তখন দেখ চেষ্টা করে। তবে তোমাকে একাটি ছেড়ে দিতে বড় ভরসা পাই না।

তুই আমার জন্যে বড় বেশি ভাবিস, আমি কি এখনও ছেলেমানুষটি নাকি? বাহাত্তর বছরের বুড়ো নেপাল থেকে গাড়িতে করে মানস-কৈলাস বেড়িয়ে আসছে।

আমি আর এইটুকু যেতে পারব না।

বেশ, ব্যবস্থা করতে পার তো যাও। তবে থাকবে কোথায়?

কেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তাঁবুতে কি একটু জায়গা হবে না? প্রতি মাসে চাঁদা নিতে যে স্বামীজী আসেন তাঁকে একবার বলে দেখ না?

ঠিক আছে, আমি ওঁকে বলে দেখছি।

সুষ্ঠুভাবে হয়ে গেল সব কিছু ব্যবস্থা।

সুপ্রকাশ নিজে এসে তাঁর মাস্টারমশাইকে স্পেশাল ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন। এমনকি ভাগ্নী কৃষ্ণকলিকে স্টেশন থেকে নিজের গাড়িতে করে পৌঁছে দিলেন তার বাড়িতে।

মামা এলাহাবাদে চলে যাবার পর দিব্যর সঙ্গে কৃষ্ণকলির দেখা হল কলেজে।

দিব্য একটু রসিকতা করেই বলল, এখন মাতুলবিহীন গৃহে তোমার দেখভাল করবে কে?

কেন, তুমি।

এত সহজে কি সে অনুমতি পাওয়া যাবে?

সামনের শনিবার কলেজ ছুটি। সেদিন এস, নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াব। তবে দয়া করে গাড়িতে যেন এসো না।

শুক্রবার কিছু রান্না করে ফ্রিজে তুলে রাখল কৃষ্ণকলি। পরের দিন সেগুলো গরম করে নিলেই, চলবে। আসলে গল্পের সময়টুকু রান্নায় খরচ করতে চাইছিল না সে।

পরের দিন যথাসময়ে পায়ে হেঁটে দ্বিজদাসের ডেরায় হাজির হল দিব্য।

ইতিমধ্যে টুকিটাকি রান্নার ফাঁকে কয়েকবার জানালায় উঁকি দিয়ে গেছে কৃষ্ণকলি। তার কণ্ঠে গুণগুণিয়ে উঠছে বিশেষ একটি গানের কলি —

"আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর
ওগো অনেকদিনের পর ....।"

দরজা ভেজানো ছিল। দু-হাতে দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল দিব্য। উঁকি দিয়ে

আন্দাজ করতে চাইল কৃষ্ণকলির অবস্থানটা। শেষে রান্নাঘরে দেখা পেল তার। নিবিষ্ট মনে তখন সে স্যান্ডউইচ বানাতে ব্যস্ত।

পেছন থেকে লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে ট্রেতে সাজিয়ে রাখা স্যান্ডাউইচের একপিস তুলে নিল দিব্য।

অমনি ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল কৃষ্ণকলি। খুশিতে উদ্ভাসিত মুখ। বলল, এত দেরি?

তাড়াতাড়ি এলে তুমি যদি ভেবে বসো, কি লোভী রে বাবা।

তাই বুঝি দেরি করে এলে। এখন চটপট গিয়ে ভাল ছেলের মতো ডাইনিং টেবিলে বসে পড় দেখি। সকাল থেকে আমারও কিছু খাওয়া হয়নি। আমি এখুনি স্যান্ডউইচ আর কফি নিয়ে যাচ্ছি।

ডাইনিং হল থেকে দিব্য চেঁচিয়ে বলল, মুড়ি, তেলেভাজা হলে তো জমত ভাল।

রান্নাঘর থেকে জবাব এল, তোমার মত সম্মানীয় অতিথিকে মুড়ি, তেলেভাজা দিয়ে আপ্যায়ন! হাজার হোক জমিদার বংশের ছেলে তো।

দুজনে পাশাপাশি বসে খাওয়া শুরু করল।

ঘাড় কাত করে কৃষ্ণকলির দিকে তাকিয়ে দিব্য বলল, একই কলেজে পড়ি অথচ খাবার সময় আমাকে পৃথক করে দিলে যে?

হাতে ধরা রইল স্যান্ডউইচ, চোখে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিব্যর মুখের দিকে তাকাল কৃষ্ণকলি।

দিব্য বলল, বুঝতে পারলে না?

বলতে বলতেই সে কৃষ্ণকলির প্লেট থেকে একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে কামড় দিল।

সত্যি তুমি কি পাগল! এঁটো প্লেট থেকে তুলে খেলে!

দিব্য মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'তাই তো, কি আপসোস, আজ থেকে দিব্য ব্যানার্জির জাত গেল।

কৃষ্ণকলি বলল, আচ্ছা, তোমার মতলবটা কি বল তো?

দিব্য সব খাবারগুলো একটা প্লেটে জড়ো করে বলল, এসো আমারা এক সঙ্গে খাই। আপত্তি আছে?

কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে কৃষ্ণকলি দিব্যর সঙ্গে খেতে লাগল একই প্লেটে।

অদ্ভুত এক অনুভূতি সেই মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলল কৃষ্ণকলিকে।

সজাগ হয়ে কৃষ্ণকলি এবার বলল, কফি তৈরি করি?

মাথা নাড়ল দিব্য। কফিতে চিনি কতটা দেব?

তুমি যেমন খাবে আমাকে ঠিক তেমনি দেবে। দুকাপ কফি তৈরি করে একটি কাপ দিব্যের হাতে এগিয়ে দিল কৃষ্ণকলি।

দুজনে চুমুক দিল কফিতে।

দিব্য চেঁচিয়ে উঠল, ইস, একটুও চিনি দাওনি তো!

সে কি!

নিশ্চয়ই তুমি তোমার কাপে ডবল চিনি দিয়ে দিয়েছ। দেখি, দেখি।

বলতে বলতেই সে কৃষ্ণকলিকে একেবারে হতবাক করে দিয়ে তার হাতের কাপটা টেনে নিয়ে চুমুক দিল।

ইস, আমার এঁটো কাপে তুমি চুমুক দিলে!

এবার নিজের এঁটো কাপটা কৃষ্ণকলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দিব্য বলল, দেখ, এটাতে ঠিক ঠিক চিনি হয়েছে কিনা।

দিব্যর কাপটা হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে ঢুকে গেল কৃষ্ণকলি।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল, কৃষকলির দেখা নেই।

দিব্য পায়ে পায়ে কৃষ্ণকলির শোবার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে ডিভানে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কৃষ্ণকলি।

কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে দিব্য বলল, তুমি কাঁদছ কৃষ্ণা!

মুখ তুলে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে কৃষ্ণকলি কান্নাভেজা গলায় বলল, তুমি কাঁদালে কাঁদব না।

ওর হাত ধরে তুলল দিব্য। নিটোল পদ্মের মতো মুকখানাকে অঞ্জলিতে ভরে নিয়ে চেয়ে রইল মধুলুব্ধ ভোমরার মতো।

বর্ষাধোয়া মিষ্টি রোদ্দুর ফুটে উঠেছে কৃষ্ণকলির ঠোঁটের রেখায়। চোখের তারায় তির্ তির্ করে কাঁপছে অনাস্বাদিতপূর্ব এক অনুভূতির তরঙ্গ।

ব্যাকুল, বিকশ দেহ এক বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষের সান্নিধ্যে সমর্পিত।

যখন সর্বসমর্পণের মুহূর্ত আগত — বোধ, বুদ্ধি, ভবিষ্যৎ ভাবনা আচ্ছন্ন, ঠিক তখনই ঝংকার দিয়ে বেজে উঠল বেল।

যে মিলনের লগ্নটির কাছে এসে থমকে থেমে গিয়েছিল মহাকাল সেই ভ্রষ্ট লগ্নটি পার হয়ে চলে গেল চির-প্রবহমান সময়।

নিজেকে আমন্ত্রিত দস্যুর বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে বাইরের দরজার দিকে ত্রস্ত পায়ে চলে গেল ভীরু গৃহকন্যাটি।

ক্যারিয়ারে চিঠি এসেছে এলাহাবাদ থেকে।

মামা লিখেছে ঃ

খুব চিন্তায় আছিস তো, পৌঁছে চিঠি দিইনি বলে।

ভারত সেবাশ্রমের সেবাকার্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। রোজ শত শত পুণ্যার্থী প্রসাদ পাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা সারাসময় নিজেদের নিযুক্ত রেখেছেন ক্লান্তিহীন সেবাকর্মে।

বিভিন্ন আখড়ার সন্ন্যাসী ও ভক্ত সম্প্রদায় স্নান করে চলে যাবার পর, ঘাটকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব প্রতিটি কুম্ভস্নানে গ্রহণ করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

এখানে মহারাজদের সঙ্গ লাভ করে এবং বিভিন্ন আখড়ায় সৎ প্রসঙ্গ শুনে শুনে বড় আনন্দে আমার দিন কাটছে মা।

শুভযোগে আমার স্নান হয়ে গেছে। নৌকো করে সঙ্গমে গিয়ে প্রবল শীতের ভেতরেও ডুব দিয়ে স্নান করেছি। এতে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় কিনা সে বিচারে না গিয়ে শুধু বলতে পারি অপার আনন্দ পেয়েছি।

পথে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোকের স্নানযাত্রা দেখছি। পৃথিবীতে ধর্মকে কেন্দ্র করে এত বড় সম্মেলন আর কোথাও হয় কিনা আমার জানা নেই।

কেউ কুম্ভের এই মিলন-যজ্ঞে আসেন পুণ্য সঞ্চয় করতে, কেউবা লোক-চরিত্র অধ্যয়ন করতে, কেউবা নিছক কৌতূহলে আখড়াগুলির শোভাযাত্রা ও মানুষের স্নানলীলা দেখতে।

ভারতের সমস্ত প্রদেশের মানুষজন, ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে, দুর্বার আকর্ষণে এখানে মিলিত হয়েছেন। এমন কি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকও ভিড় জমিয়েছেন এখানে। তাঁদের চোখে মুখে শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়।

কুম্ভমেলা ভারতবর্ষের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

সাবধানে থাকিস মা। জীবনের নিয়ন্তা তোকে শুভ পথ দেখান, সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

আশীর্বাদক মামা।

চিঠিপড়া শেষ হয়ে গেছে। অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর মাঝখানে ধরা আছে চিঠিখানা। কৃষ্ণকলি এখন কি যেন ভাবছে অন্যমনে।

শোবার ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দিব্য এতক্ষণ তাকিয়েছিল কৃষ্ণকলির দিকে। তার মুখের প্রতিটি রেখার পরিবর্তন সে নির্বিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করছিল। তার ভেতর থেকে সে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল চিঠির ভালমন্দটুকু।

এবার সে ঔৎসুক্য চেপে রাখতে না পেরে জানতে চাইল, কার চিঠি?

দিব্যর গলার আওয়াজ শুনে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল কৃষ্ণকলি।

বলল. মামার চিঠি, এলাহাবাদ থেকে লিখেছেন।

কুম্ভমেলার কথা লেখা আছে নিশ্চয়ই।

মুখে জবাব না দিয়ে দিব্যর দিকে মামার চিঠিখানা এগিয়ে ধরল কৃষ্ণকলি।

এবার চিঠিখানা হাতে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে পড়তে লাগল দিব্য।

পড়া শেষ হলে কৃষ্ণকলির হাতে চিঠিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, মামাবাবুর চিঠিতে মেলার আসল তাৎপর্যটি ধরা পড়েছে।

কৃষ্ণকলি অন্যমনস্কভাবে শুনছিল দিব্যর কথা। তার মাথায় কিন্তু ঘুরে ফিরছিল মামার চিঠির শেষ ছত্রটি, — 'জীবনের নিয়ন্তা তোকে শুভ পথ দেখান, সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন।'

চরম কিছু ঘটে যাবার আগে মামার এই শুভ সাবধান-বাণীটি তাকে রক্ষা করল।

মেঘে মেঘে যে আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছিল, ঘর্ষণে যে অগ্নি-বিচ্ছুরণের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল তা হঠাৎ একটা পশ্চিমে হাওয়ার ধাক্কায় উড়ে চলে গেল।

এখন আকাশ জুড়ে নির্মল প্রসন্নতা। প্রশমিত দুরন্ত আবেগের আবর্ত।

মধ্যাহ্নভোজে দিব্যের সেই ছেলেমানুষী, খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি। কৃষ্ণকলির পরিস্থিতিকে সামাল দেবার ব্যর্থ চেষ্টা।

দুটি তরুণ প্রাণের হাসি, গান, গল্প, অভিমান।

কখনো দিব্য পেছন থেকে এসে কর্মরত কৃষ্ণকলির অনাবৃত মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে বলছে,

'ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধু মঞ্জরী'।

ঘোমটা খুলে ফেলে কপট ক্রোধে বলছে কৃষ্ণকলি, কি ছেলেমানুষী করছ দিব্য।

অমনি হাত তুলে মাথা নেড়ে গানের কয়েকটি ছত্র আবৃত্তি করে গেল দিব্য :

'এবার অবগুণ্ঠন খোল।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।।...'

খুব যে মুডে আছ দেখছি, ফাইনাল পরীক্ষা ঘাড়ের কাছে দম ফেলছে না?

দিব্য করুণ গলায় বলল, দিলে তো সখি সব মাটি করে। পরীক্ষা পরীক্ষা, শুধু পরীক্ষা। মায়ের তাড়া, স্যারেদের তাড়া, শেষে 'ইউ টু ব্রুটাস!' একটু যে চুটিয়ে প্রেম করব তার উপায় রাখেনি কেউ।

পরীক্ষার পরে সে দ্বার অবারিত। ইউনিভারসিটি ঢুকে দেখবে, প্রেমের হাট বসে গেছে। তখন মনে হবে কোনটি ফেলে কোনটি রাখি।

আমার কি এতটাই এলেম আছে সখি?

তোমার কী নেই। অ্যাপোলোর মত উজ্জ্বল, পৌরুষদীপ্ত চেহারা, ধনীগৃহের একমাত্র উত্তরাধিকার, তাছাড়া...।

থামলে কেন, বলে যাও। দারুণ লাগছে শুনতে।

তাছাড়া অনার্সে একেবারে শিরোমণি পুরস্কার।

সব ঠিক ছিল, তারিয়ে উপভোগও করছিলাম, কিন্তু শেষের কথাটায় কাঁপিয়ে দিলে তো বুকখানা?

কৃষ্ণকলি এগিয়ে এসে সোজা দিব্যর সার্টের বোতাম খুলে বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, এমন বিশাল একখানা বুক, অমনি কাঁপলেই হল। তুমিই তো এখন সখা সারা কলেজের 'হার্ট থ্রব'— ছাত্রীমহলের বুকের ধুক্‌পুকুনি।

আপসোস, শুধু একজনের মনের নাগাল পেলাম না।

'সে আসে ধীরে,
যায় লাজে ফিরে।'

এবার কৃষ্ণকলি গভীর গলায় বলল, আমি আমার সীমারেখা জানি দিব্য। তুমি আমাকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছ, এটা আমার অনেক পাওয়া, আর ভাল করেই জানি, এখানেই আমার লক্ষ্মণ-রেখা।

এত সিরিয়াস হচ্ছ কেন কৃষ্ণা, দোহাই তোমার, এই নির্জন নিরালা গৃহকোণে অন্তত আজকের মতো একটু ভালবাসার অবসর করে দাও।

প্রায় ভেঙে পড়ল কৃষ্ণকলি। সে দিব্যের হাতখানা ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলল, তুমি এমন করে কাঙালের মত কথা বলছ কেন দিব্য, তুমি যে আমার রাজ রাজেশ্বর।

একটুকু কথা, একটুকু ছোঁয়ায় দুজনে সারা বিকেল ফাল্গুনী রচনা করল।

শেষে যখন অপরাহ্নের আলোয় সোনালী মধুর রঙ ধরল তখন বিদায়ের বিষণ্ণতা ঘনিয়ে উঠল দুজনের মনে।

দিব্য বলল, যাবার আগে তোমার খুব প্রিয় একটা গান শোনাবে না? সেই উপহারটুকু হবে আমার আজকের দিনে সব থেকে স্মরণীয় পাওয়া।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল দিব্য।

বাঁ হাতের পাতায় মুখখানা ঠেকিয়ে দিব্যের দিকে চেয়ে বসেছিল কৃষ্ণকলি। প্রপাতের মতো কালো চুল পিঠ বেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ধবধবে সাদা বিছানায়।

তেমনি প্রিয় মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের জলে ভেজা গানটি গাইতে লাগল কৃষ্ণকলি :

'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।।
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে, পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।।....'

গানটা পুরো গাইতে পারল না কৃষ্ণকলি, আবেগে গলা বুজে এল তার।

এগিয়ে এসে কৃষ্ণকলিকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে দিব্য বলল, আমার অনেক পাওয়া হয়ে গেছে কৃষ্ণা, চাওয়ার চেয়েও বেশি। এখন তোমার মুখের হাসিটুকু দেখে চলে যেতে দাও।

দিব্য এবার পথে নামল। বাইরের দরজায় দুদিকে দুটো হাত ঠেকিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইল কৃষ্ণকলি। মুখে তার বর্ষাভেজা একটুকরো নরম রোদ্দুরের ছোঁয়া।

কৃষ্ণকলি আবাল্য মিতবাক। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গেও সে কোনদিন হই হই করে কথা বলতে পারে না। চলনে বলনে তার একটা সংযত ছন্দ আছে।

নানাধরনের দামী রঙবাহারি পোশাকের দিকে মেয়েদের চিরদিনই একটা আকর্ষণ থাকে, কিন্তু কৃষ্ণকলি এ বিষয়ে একেবারে ব্যতিক্রম। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সাধারণ পোশাক পারে, কাঁধে শান্তি নিকেতনের পৌষ মেলা থেকে কেনা একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে সে যখন পথ চলে তখন তার সমস্ত অবয়বে আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে।

সে আপন মনে পথ চলে। অকারণে তার দৃষ্টি পথচারিদের খুঁজে বেড়ায় না।

দিব্যদের পরীক্ষার সীট পড়েছে দু'তিন কিলোমিটার দূরের একটি কলেজে।

দিব্য বলেছে, প্রতিদিন পরীক্ষায় বসার আগে তুমি গেটের সামনে এসে দাঁড়াবে। আমি তোমাকে দেখে হলে ঢুকব।

তোমার বন্ধুরা প্রতিদিন আমাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কিছু ভেবে বসবে না?

সে আমি জানি না। যেদিন দেখতে পাবনা সেদিন হলেও ঢুকব না। পরীক্ষা বয়কট।

অতএব সব লজ্জা, সংকোচ বিসর্জন।

যথাসময়ের আগেই প্রতিদিন হলের সামনের লনে হাজিরা।

প্রাঙ্গণে পাশাপাশি বিশাল দুটি আমগাছ শাখাপল্লব বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই তলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে আলোছায়ার আঁকিবুকি।

কিছু আগে এসে পড়লে কৃষ্ণকলি এই ছায়ার আশ্রয়ে দাঁড়ায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজে।

কলেজ কম্পাউন্ডে ঢুকে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে পরীক্ষার্থীরা আমগাছের পাশ দিয়ে হলের গেটের দিকে চলে যায়। ওখানেই দিব্যের সঙ্গে দেখা হয় তার।

দেখ, আজ খুব ভাল পরীক্ষা হবে। কোনভাবেই টেনসড হয়ে যেও না, কাম অ্যান্ড স্টেডি থেকো।

হলে ঢোকার আগে খাবার ভর্তি একটা টিফিন কোটো ঢুকিয়ে দেয় দিব্যের ঝোলা ব্যাগে। দিব্য পরীক্ষার হলে ঢুকে গেলে কৃষ্ণকলি বাসে করে চলে আসে তার কলেজে।

এখানে কয়েকটা ক্লাশ করে দৌড়তে দৌড়তে দিব্যের বাড়ি ঢোকার পথে বাস-স্ট্যান্ডের শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ফেরার পথে এখানেই তার দিব্যের সঙ্গে দেখা হয়। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তার উদগ্রীব দৃষ্টি দিব্যের মুখের ওপর গিয়ে পড়ে। সে দিব্যের মনের অবস্থাটা মুখের ছবিতে দেখতে পায়।

কৃষ্ণকলি কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে কোনওরকম কৌতূহলই প্রকাশ করে না।

সে শুধু বলে, খাবার খেয়েছো তো?

দিব্য লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথা নাড়ে।

এক একদিন নিজের থেকে দিব্য বলে, আজ প্রশ্ন এত লেংদি হয়েছে না, সবাই সবকটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারেনি। আমি শেষ করতে হিমসিম হয়ে গেছি।

কৃষ্ণকলি বলে, ওসব কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল তো। যা হওয়ার হয়ে গেছে, পরের পরীক্ষাটা নিয়েই শুধু ভাব।

তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

খুব হয়েছে বাড়ি যাও, মা রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন।

শেষ দিনও নিয়ম মাফিক আমগাছের তলায় আগেভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণকলি। আকাশের দিকে দুটো চোখ মেলে দেখছিল নীলকান্ত মণির মতো নীলাকাশ।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল ঃ

'বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে'।

বিরহ মধুর করতে এই এল বলে তোমার প্রাণসখা।

কৃষ্ণকলি পেছন ফিরে দেখল, কল্কি অবতার।

নাকে কান্নার সুর তুলে কৃষ্ণকলি বলল, ভাল হবে না বলছি কনকদা।

কল্কি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, কি বলছিস, পরীক্ষা আমার ভাল হবে না?

তাই বললাম বুঝি!

তোরা যাই বল, তোদের ছেড়ে, এই কলেজের মায়া ছেড়ে আমি সহজে কোথাও সরছি না। ওই যে আসছে তোর প্রাণসখা, আমি কেটে পড়ি।

মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণবাহু তুলে কপট ক্রোধ প্রকাশ করল কৃষ্ণকলি।

দিব্য হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, আমার আজকে একটু দেরি হয়ে গেল, তাই না?

কিচ্ছু দেরি হয়নি, অত ভাবছ কেন।

বলতে বলতে খাবার প্যাকেটটা ঢুকিয়ে দিল দিব্যের ঝোলায়।

এবার শান্ত হয়ে পরীক্ষায় বস, তোমার মনের মত প্রশ্ন পেয়ে যাবে।

দ্রুত পা চালাতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল দিব্য। বলল, পরীক্ষার শেষে তোমার সঙ্গে বাস স্টপেজে দেখা হবে। ওখানে নেমে তোমার সঙ্গে মামার আস্তানায় চলে যাব। গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যাবে ড্রাইভার।

মামার বাড়ির আবদার আরকি। সেগুড়ে বালি মশাই। গত পরশু মামা নানা তীর্থ ঘুরে বাড়ি ফিরে এসেছেন।

একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, তার চেয়ে তোমার সঙ্গে আমি মাসিমার কাছে চলে যাব। অনেক বার ডেকে পাঠিয়েছেন।

'তাই হবে', বলে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল দিব্য।

অনেকদিন পরে দিব্যের সঙ্গে কৃষ্ণকলিকে আসতে দেখি ভারী খুশি হয়ে উঠলেন সোমপ্রভাদেবী।

কৃষ্ণকলি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এতদিন পরে মাসিকে মনে পড়ল মা। তোমার মিষ্টি গলার গান এখনও আমার কানে বাজছে। সে তো গান নয়, প্রাণের দেবতার চরণে আত্মনিবেদন।

কৃষ্ণকলি বলল, আজ আপনাকে আমি একখানা গান শুনিয়ে যাব। মামাকে বলে আসিনি তো, তাই বেশিক্ষণ থাকতে পারব না মাসিমা।

ঠিক আছে, সেটুকুই লাভ। যাবার সময় দিব্যই তোমাকে গাড়ি করে পৌছে দিয়ে আসবে।

সেদিন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সামনে বসে মীরাবাঈ-এর একটি ভজন শোনাল কৃষ্ণকলি।

'মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই।
যাকে সিরে মৌর মুকুট মেরোপতি সোই;
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল হোই।।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই
অবতো বাত ফৈল গয়ী জানে সব কোই।
সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই।
ছাঁড় দই কুল কী কান ক্যা করেগা কোই।।
অঁসুঅন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বীজ বোই।।
মীরা প্রভু লগন লাগি, জো হোয়ি সো হোই।।'

তিন

এই যে সুনয়নী দ্রুতগামিনী কোথায় যাওয়া হচ্ছে বিনোদিনী?

চমকে পেছন ফিরে তাকাল কৃষ্ণকলি।

কনকদা! সত্যি তোমাকে দেখতে পাইনি।

আরে দেখবি কী করে, দূর থেকে দেখে আমিই তো তোর পশ্চাদধাবন করছি।

আজ তোমাদের রেজাল্ট আউট হচ্ছে না?

কল্কি বলল, তাই তো কলেজে যাচ্ছিরে।

কৃষ্ণকলি বলল, রেজাল্ট বেরুবার কথা শুনলে বুকটা কেমন ঢিপ ঢিপ করে।

তোদের মতো ভাল ছেলেমেয়েদের করে, আমাদের কিসসু করে না। হয় এস্পার নয় ওস্পার। হাঁরে, একটা কথা বলবি?

কৃষ্ণকলি তাকাল। চোখে সস্মিত জিজ্ঞাসা চিহ্ন।

আজ আমাদের রেজাল্ট বেরুবে বলে কি তোর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে?

এবার ধরা পড়ে গিয়ে আনুনাসিক গলায় কৃষ্ণকলি বলল, ভাল হবে না বলছি কনকদা।

ভাল যে হবে না সে তো আমি পরীক্ষা দিয়েই বুঝেছি।

কাঁদো কাঁদো গলায় কৃষ্ণকলি বলল, আমি বুঝি সেই কথাই বলেছি।

কল্কি বলল, চল চল, আর কাঁদতে হবে না। ওদিকে এতক্ষণে ফাঁসির মঞ্চে রেজাল্টটা লটকে দিয়েছে।

ওরা কলেজ-প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখল, ছাতিম গাছের তলায় জটলা।

কেউ কেউ গালে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, কেউবা তাদের কাছে দাঁড়িয়ে প্রবোধ দিয়ে চলেছে।

কৃষ্ণকলির বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ওদের ভেতর দিব্যকে তো দেখা যাচ্ছে না। ঐতো সুচেতনা, সঙ্ঘমিত্রা, লোপামুদ্রাদিরা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ভাবভঙ্গী হাত পা নাড়ার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওরা ওনার্স পেয়ে গেছে। কিন্তু কি হল দিব্যর?

কল্কিকে দেখতে পেয়ে সুচেতনা দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, কামাল করে দিয়েছে কল্কি অবতার! ফাঁকির চূড়ায় বসে ডিগ্রিটা চটকে নিলে গুরু।

কল্কি অমনি দৌড়ে গেল ওদের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে দুহাত তুলে বলল, প্রভু তুমি একি করলে। শেষ পর্যন্ত আমাকে আমার এই সাধের কলেজ থেকে তাড়ালে।

ওর কাণ্ড দেখে পাশ করা ছেলেমেয়েরা সব হো হো করে হেসে উঠল।

যারা এতক্ষণ হাহুতাশ করছিল তারা কল্কির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কল্কি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ভেঙে পড়া বন্ধুদের উদ্দেশে বলল, কোনরকমে সিঁকেটা ছিঁড়ে গেছে বেড়ালের ভাগ্যে। আজ তোদের অনারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বলছি, এ জীবনে কোনদিনও ইউনিভারিসিটির ছায়া মাড়াব না। তোরা প্রায় রোজ আমাকে এই কলেজের চৌহদ্দির ভেতর দেখতে পাবি। এই ছাতিমতলাই হবে আমার প্রিয়-মিলন ক্ষেত্র।

কল্কি অকৃতকার্য বন্ধুদের জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন দিতে লাগল।

বলল, এ যুগে ঐ চোঁথা ডিগ্রির কি দাম আছেরে! চাকরি পাবি? সেগুড়ে বালি। চায়ের দোকানে, পাড়ার রকে বসে আড্ডা মারা, উঠতি বয়সের মেয়েদের টিজ করার চেয়ে অন্তত কিছু সময়ের জন্য কলেজে আটকে থাকা, মন্দের ভাল। তাই ছেলেরা সব পড়তে আসে। দিগ্গজ হব, কি চাকরি পাব বলে নৈব নৈবচ। আরও কিছু বলছিল কল্কি, সেখান থেকে সরে গেল কৃষ্ণকলি। সে এখন দিব্যের খবরটা পেতে চায়। উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু সুচেতনাদের কাউকেই জিজ্ঞেস করতে পারছে না ওর রেজাল্টটা।

জানতে চাইলেই চোখ ঠারাঠারি শুরু হয়ে যাবে সুচেতনাদের বন্ধুমহলে। তোমার খবরদারি কি জন্যে অমাবস্যের চাঁদ?

আজ কি বাপু বিরূপ আলোচনা, বাঁকা মন্তব্যের মধ্যবিন্দু হয়ে।

কলেজের করিডোরে পা দেওয়ামাত্রই কৃষ্ণকলি দেখতে পেল, প্রিন্সিপালের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে দিব্য।

আবার বুকের ভেতর সেই ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে রইল দেওয়াল ঘেঁষে, কোন কথা বলতে পারল না।

পায়ে দ্রুত সাড়া তুলে এগিয়ে এল দিব্য। তোমার ইচ্ছাই জয়ী হল কৃষ্ণা। একটা ফার্স্ট ক্লাস পাই কি না পাই, সেই সন্দেহে যখন দুলছিলাম, তখন তুমিই আমাকে বলছিলে, অকারণে চিন্তা কর না, জয় তোমার সুনিশ্চিত।

শুধু ফার্স্ট ক্লাশই পেলাম না, জায়গা পেলাম সবার ওপরে। তোমার মনের গভীর ইচ্ছাই এতবড় জয় এনে দিল আমাকে।

আবেগে, আনন্দে চোখ ভিজে উঠল কৃষ্ণকলির। সুচেতনারা আসছে দেখে দ্রুতপায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল দিব্য। বিপরীত দিকে পা চালাল কৃষ্ণকলি।

কলেজের ধারেই এস টি ডি বুথ। সে আগাম খবরটা দেবে দিব্যের মাকে। যে ভুলো ছেলে, কখন যে আড্ডা ভেঙে ঘরে ফিরবে কে জানে।

ফোনটা ধরল কাজের মেয়ে বিন্দু।

হ্যালো।

বিন্দুদি, আমি কৃষ্ণা। মাসিমাকে ফোনটা দাওতো।

সোমপ্রভাদেবী কাছেই ছিলেন, ফোন ধরলেন।

ভাল আছ তো মা। কতদিন দেখিনি।

খুব ভাল আছি মাসিমা, দারুণ খবর। শিগ্‌গির যাচ্ছি, পাত পেড়ে খাব।

কি খবর মা।

অনুমান করুন।

থমকে গেলেন সোমপ্রভাদেবী। পরক্ষণেই বললেন, খোকার পাশের খবর?

শুধু পাশ! সবার ওপরে টেক্কা দিয়েছে। এ বছর অনার্স পরীক্ষায় আপনার ছেলে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট।

খোকা কোথায়?

কলেজের সবাই ওকে নিয়ে মেতে উঠেছে। সেই ফাঁকে আমি সুখবরটা আপনাকে জানালাম।

ওপার থেকে বললেন সোমপ্রভাদেবী, খোকাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এস মা। আজ এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি ফিরবে।

ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর কৃষ্ণকলি ভাবনায় পড়ল, এখন সিংহিনীদের ডেরায় ঢুকে আক্রান্ত দিব্যের কানে খবরটা কী করে পৌঁছে দেওয়া যায়।

থার্ড পিরিয়ডের বেল বাজাতে করিডোরে এসে দাঁড়াল হেড বেয়ারা বিহারীদা।

কৃষ্ণকলি ছুটল সেদিকে।

ও বিহারীদা একটা কাজ করে দেবে?

গানের জন্যে সারা কলেজে নাম কৃষ্ণকলির।

বিহারি বলল, কি কাজ দিদিমণি?

ছাতিমতলায় গিয়ে দিব্য দাদাবাবুকে খবর দাও, বাড়িতে তার মা ডাকছেন।

বিহারী খবর দিতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে দ্রুতপায়ে এসে ধরল তাকে কৃষ্ণকলি।

বলল, আমি বলেছি বলে বল না যেন। বলবে, কলেজে ফোনে খবর এসেছে।

বিহারী অত বোকা নয়, সে অন্তত কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। সে বলল, কিচ্ছু ভেব না দিদিমণি, শুধু বাড়ি থেকে মায়ের ডাক এসেছে বলব।

আড়ালে দাঁড়িয়ে ছাতিমতলার দিকে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণকলি।

বিহারী গিয়ে ভিড়ের ভেতর ঠিক খবরটা দিয়ে দিয়েছে। মাতৃভক্ত পুত্র খবর পেয়ে আর একমিনিটও দাঁড়ায়নি। হাত ওপরে তুলে নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এসেছে ঘেরাও থেকে তারপর সোজা কম্পাউন্ডের গেট পেরিয়ে নিশ্চয় উঠে বসেছে নিজের গাড়িতে।

এতক্ষণে ক্লাসে ঢুকল কৃষ্ণকলি। এই পি সির ক্লাস বলে পিরিয়ডের মাঝেও পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল সে।

পড়ানো শুরু করার পর এমনি তদ্‌গত হয়ে যান প্রফেসার হরিপদ চ্যাটার্জি মশায় যে তাঁর আর কোনদিকে নজর থাকে না। চুপি চুপি ঢুকে পড় কিংবা কেটে পড়, তাতে তাঁর কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই।

কলেজ ছুটি হলে তবেই সে যাবে দিব্যদের বাড়ি। মামা দিন চারেকের জন্যে গেছেন মেদিনীপুর। তাঁর পৈতৃক ভগ্ন বাড়িটির কিছু বিলি ব্যবস্থা করতে। যদি ওটি বেচে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে ফিরতে সপ্তাহ দুয়েকের মতো দেরি হতে পারে।

সুতরাং কলেজ থেকে সোজা বাড়ি ফেরার তাগিদ ছিল না কৃষ্ণকলির।

ছুটির ঘণ্টা পড়লে সে বাস স্টপেজের দিকে এগিয়ে গেল। একটা মিনিবাস বেরিয়ে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে। এই বাসটা দিব্যর বাড়ির প্রায় পাশ দিয়ে যায়। এখন আর একটা পেতে গেলে পনেরো কুড়ি মিনিট ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

হা পিত্যেস করে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণকলি প্রার্থিত বাসটির আগমন পথের দিকে তাকিয়ে।

পেছন থেকে হঠাৎ কঙ্কির গলা ঃ

'তিল এক হয়যুগ চারি'— সখি, কার প্রতীক্ষায়?

কৃষ্ণকলি চমকে ফিরে বলল, হতচ্ছাড়া বাসটার। একটা পালালে আর একটার দেখা পেতে কুড়ি মিনিট।

খবর পেয়েছিস?

কৃষ্ণকলি কঙ্কির হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলল, কনগ্র্যাচুলেশন।

তোমার মুণ্ডু। আমি কি আমার কথা বলছি নাকি রে।

বুঝেছি, তোমার প্রাণের বন্ধুটি তো ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।

কার মুখে শুনলি?

কেন, কলেজে সবাই বলাবলি করছিল।

কল্কি উত্তেজিত। বলল, কিছু শুনিসনি। বাংলা অনার্স পরীক্ষায় ও এ বছর সবার ওপরে। তাছাড়া আমাদের কলেজ পত্তনের শুরু থেকে কোনও বিষয়ে এত নম্বরের রেকর্ড কারও নেই।

উল্লসিত কৃষ্ণকলি বলল, সত্যি।

তবে কি আমি মিথ্যে বলছি নাকি রে।

দারুণ খবর।

প্রিন্সিপাল নিজে খাতাপত্র ঘেঁটে বলেছেন।

কৃষ্ণকলি বলল, তোমার বন্ধুভাগ্য খুবই ভাল। কনকদা।

তা যা বলেছিস, কেবল নিজের ভাগ্যটি ছাড়া।

এ কথা বলছ কেন?

যা সত্যি তাই বলছি। কল্কি নেশায় ডুবে থাকে রাতভোর, তবু একটিও মিথ্যে কথা বেরোয় না তার জবান থেকে। আমার ভাগ্যদেবতাটির সঙ্গে যদি দেখা হত তাহলে ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইতাম, আমাকে নিয়ে এরকম খেলার মানে কি!

কৃষ্ণকলি বলল, তোমার এই নেশার ব্যাপারে মাসিমা কিংবা মেসোমশাই কিছু বলেন না?

ভবিষ্যতে এই মাতালপুত্রটির মুখদর্শন করতে হবে বলে জন্ম দেওয়া মাত্রই মা আমার চোখ বুজেছেন। আর বাবা, প্রাইভেট একটি কোম্পানির কর্মচারি ছিলেন, এখন কঠিন আর্থ্রাইটিজে প্রায় পঙ্গু।

কৃষ্ণকলির মুখে বেদনার মেঘছায়া ঘনাল।

তুমি তো সারাক্ষণ বাইরে পরোপকার করে বেড়াচ্ছ, মেসোমশাইয়ের দেখাশোনা করছেন কে?

মায়ের আমল থেকে কাজের এক মাসি আছে। তারই ওপর সংসারের সব ভার চাপিয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

তাঁর সংসার নেই?

নিঃসন্তান বিধবা, গরীব বামুনের মেয়ে। মায়ের বাপের বাড়ির দিকের লোক। ওর একটা নচ্ছার ভাইপো আছে। মাঝে মাঝে এসে হুলুম জুলুম করে আমার কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা নিয়ে যায়। আমার মতো নেশাখোর। মাসি কিছু বলেন না?

মাসিই তো খাল কেটে কুমিরটাকে ডেকে এনেছে।

কি রকম?

সোহাগ করে চালচুলোহীন গুণধর ভাইপোর বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এখন ঠ্যালা সামলাতে আছে এই ফুটো কল্কি।

সংসার চালানোর দায়-দায়িত্ব সবই তোমার তা হলে?

আর কে দেখবে, বাবা তো পড়ে আছে বিছানায়। অফিস থেকে বাবার পাওনা টাকাগুলো তো ইতিমধ্যে ফুটকড়াই হয়ে গেছে।

তাহলে চালাচ্ছ কি করে?

আমি একটা কাজ করি।

প্রশ্ন নিয়ে আর এগোল না কৃষ্ণকলি। সে চুপ করে রইল।

কি কাজ জানতে চাইলি না তো।

এবার মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে মাথাটা কাৎ করে কল্কির দিকে চেয়ে রইল সে। ভাবটা, তুমি বললে আমি শুনব।

কল্কি বলল, অফিসটফিসে কোনও কাজ নয়।

সেটা বুঝেছি। কলেজ আর অফিসের কাজ একসঙ্গে সামলানো যায় না।

একজন ব্যবসাদার নেপালের নামকরা হোটেলগুলোতে প্রায় রোজ প্লেনে পোনামাছ সাপ্লাই করেন। আমার ওপর ভার রয়েছে আড়ৎদারদেব কাছ থেকে দরকার মত মাছ তুলে নিয়ে প্লেনে পৌঁছে দেওয়া।

দারুণ কাজ তো।

শুধু কাজটা দারুণ নয়, পেমেন্টও ভাল।

কৃষ্ণকলি বলল, ওতে সংসারের খরচ চলে যায় তো?

তা চলে যায়। অবশ্য মালিক আর একটা অফার দিয়েছিলেন, সে কাজটা করতে পারলে বাড়ি গাড়ি সবই দুতিন বছরের ভেতর হয়ে যেত।

তাই।

আমি কিন্তু রাজি হইনি।

কাজটা কি?

তুই জানতে চাস?

বাধা থাকলে বল না।

কল্কি বলল, নেপাল বর্ডার থেকে ড্রাগ এনে কলকাতার বিভিন্ন ঘাঁটিতে সাপ্লাই করা।

তুমি যে এ কাজে জড়িয়ে পড়নি সেজন্যে আমি ভীষণ খুশি।

ড্রাগ অ্যাডিকটেড আমি, কিন্তু মনেপ্রাণে চাই না, আর একজনও এ পথে আসুক। তাই বহু টাকার প্রলোভনেও আমি ধরা দিইনি।

কৃষ্ণকলি বলল, আমি শুনেছি, যারা নেশা করে তারা সঙ্গী বাড়াতে চায়।

আমার বেলা কিন্তু উল্টোটা। বলতে পারিস আমি জ্ঞানপাপী।

কৃষ্ণকলি চাপা একটা ব্যথার সুরে বলল, তুমি কি কোনভাবেই এ পাপকে ছাড়তে পার না?

পারি আর তার একমাত্র পথ, আমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এমন আসক্তি।

সে যে না খেয়েছে বুঝবে না।

তোমাকে কি ঐ ব্যবসাদারটা ড্রাগের নেশা ধরিয়েছিল?

তুই ঠিক ধরেছিস। আমাকে ড্রাগ চালানের কাজটা অফার করার আগে উনি আর একটি কাজ করেছিলেন!

কি কাজ?

এয়ারপোর্টে মাছ দিয়ে আসার পর একটি বিশেষ রেস্টুরেন্ট উনি আমার জলখাবারের ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

কয়েকদিন পরে দেখলাম, যেদিন কাজ নেই সেদিনও আমি সকাল ন'টায় ওখানে ব্রেকফাস্টের জন্য হাজির হচ্ছি। পরীক্ষা করে দেখলাম, আমি ওখানে না গিয়ে থাকতে পারছি না ওখানকার একটা বিশেষ খাবার না খেলে আমি যেন মরে যাব।

কৃষ্ণকলি মাঝখান থেকে বলল, কি ব্যাপার বল তো?

পরে জেনেছিলাম, ভদ্রলোকের নির্দেশ মতো রেস্টুরেন্টের মালিক পরটাতে ড্রাগ মিশিয়ে বেলতেন। ওই পরোটা খেয়ে আমি ড্রাগের ওপর আসক্ত হয়ে পড়লাম। তারপর থেকে নানা ধরনের ড্রাগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। এখন তো আমি বিষধর সাপের গরলকে কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছি।

একটুখানি থেমে আবার কল্কি বলল, তুই তো জানতে চাইলি না, কোন মহাপুরুষ আমাকে এই অমৃত পানীয়ের সন্ধান দিয়েছেন?

কৃষ্ণকলির গলায় ক্ষোভের সুর, তিনি আর যেই হোন, ওঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করে মহাপুরুষ নামটিকে কলঙ্কিত করো না।

আমাদের খুব পরিচিত একজনের বাবা, অনুমান কর।

একটুখানি এদিকে ওদিকে চিন্তা করে কৃষ্ণকলি বলল, কিছুই ভাবতে পারছি না। এমন মানুষ আমাদের পরিচিত কারু বাবা!

ভদ্কাকে চিনিস তো?

সুচেতনাদি। তুমি কি তার বাবার কথা বলছ।

কল্কি বলল, এমন গুণধর পিতা না হলে কি এমন গুণবতী কন্যার দেখা মেলে।

কৃষ্ণকলি বলল, সুচেতনাদি কিন্তু দারুণ নাচে।

কল্কি বলল, যেকোনরকম দারুতেই ওর দারুণ আসক্তি। তাছাড়া বন্ধুদের নিয়ে ও সারারাত মাতলামি করে কাটিয়ে দিতে পারে। এই বিশেষ গুণটি ওর পৈতৃক সূত্রেই পাওয়া।

কৃষ্ণকলি এবার কোনও মন্তব্য করল না।

ওকে চুপকরে থাকতে দেখে কল্কি আবার বলল, তোর পুরোপুরি বিশ্বাস হল না বুঝি?

কনকদা, তুমি যে মিথ্যে করে কারু নামে অপবাদ দেবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি শুধু ভাবছি, এমন ঈশ্বর দত্ত প্রতিভা যার সে কি করে নিজেকে এতখানি নিচে নামাতে পারে!

কল্কি বলল, স্কুল থেকেই আমরা একসঙ্গে পড়েছি। বিত্তবান বাপের মা-হারা একমাত্র মেয়ে। প্রথম থেকেই আস্কারা পেয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এখন ওকে আর কোনভাবেই রোখা যাচ্ছে না।

তুমি ওর বাবার কাছে ভিড়লে কী করে?

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় ফি দিতে পারছিলাম না। ভদ্‌কা, আমার বন্ধুদের কাছ থেকে খবরটা জেনে আমাকে ওর বাবার কাছে নিয়ে যায়। এরপর ওর বাবা ব্রজমোহন চৌধুরীর খপ্পর থেকে আমি আর বেরিয়ে আসতে পারিনি। আমার আজকের যে পরিণতি দেখছিস তার সবটাই প্রায় ব্রজমোহন বাবুরই দান। দিব্য আমাকে ভালবাসে, তাই আমার সব খবরই সে রাখে। তাছাড়া একসময় দিব্যের বাবার বিজনেস দেখাশোনা করতেন ব্রজমোহনবাবু। ওখান থেকেই ওঁর যা কিছু উন্নতি। শেষে দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন একটা বিশেষ কারণে।

এবার প্রশ্ন করল কৃষ্ণকলি, কী এমন কারণ কনকদা?

এত কথা এখানে দাঁড়িয়ে আর বলা যাবে না। তুই বরং কারণটা কোনও একসময় দিব্যর কাছ থেকে জেনে নিস।

মিনিবাসটা এসে গেল।

আমি এটাতে উঠছি কনকদা। একদিন তোমার ওখানে যাব।

কল্কি চেঁচিয়ে বলল, যে কোনও রোববার সকাল সাড়ে নটার পর আসিস।

দিব্যর মা-ই আদর করে ঘরে ডেকে নিলেন কৃষ্ণকলিকে।

দিব্য ঘরে ভাজা একটা সিঙাড়ায় কামড় দিতে দিতে অন্দরের বারান্দায় ওদের মুখোমুখি হল।

সোমপ্রভা বললেন, এরই ভেতর সব মুখে পুরে দিলি। সব ঠিক আছে তো?

মনে হচ্ছে পুরে সামান্য একটু নুন কম।

সোমপ্রভা বললেন, তুই কৃষ্ণাকে নিয়ে ওপরে যা, আমি বিস্তির কাছে রান্না ঘরে যাচ্ছি।

সিঁড়ির বাঁকের জায়গাটা আবছা একটু অন্ধকার।

দিব্য বলল, চোখ বন্ধ কর।

কেন?

করই না একবার। তোমার অগোচরে মূল্যবান কোনকিছু হরণ করে নেব না।

আজ তোমার দিন দিব্য। বিজয়ী যুবরাজের সব আদেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছি।

চোখ বন্ধ করল কৃষ্ণকলি।

হাঁ কর।

হাঁ করতেই, কামড় দেওয়া সিঙাড়ার কিছু অংশ তার মুখে পুরে দিয়ে বলল, দয়া করে সবটুকু খেয়ে নিও না।

কৃষ্ণকলি কিছুটা মুখে পুরে বাকিটুকু দাঁতে কেটে ছেড়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের বারান্দায় শোনা গেল পদধ্বনি।

মুখে সিঙাড়া, চোখ বিস্ফারিত কৃষ্ণকলির।

দিব্য চাপা উত্তেজনায় বলল, মা আসছে।

বলতে বলতেই সে কৃষ্ণকলির হাত ধরে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল ওপরে।

শ্বেতপাথরের স্নানের ঘরটা খুলে দিয়ে বলল, ঝটপট ঢুকে পড় ভেতরে। ওটা সাবাড় করে বেসিনে মুখ ধুয়ে চলে এস বসার ঘরে।

কপট ক্রোধে দিব্যর দিকে হাত তুলে তর্জনী নাচিয়ে বলল, আসুক মা, পুত্রের সব কীর্তি ফাঁস করে দেব।

স্নানঘরে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল কৃষ্ণকলি। মুখের অবশিষ্ট খাদ্যবস্তুটুকু তারিয়ে তারিয়ে খেল। এর স্বাদই আলাদা। কেমন এক ধরনের শিহরণ খেলে গেল সারা দেহে।

হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল তার।

আমি কেন দিব্যর এই খেলার সঙ্গী হচ্ছি। এ খেলা তো শুধু খেলার আনন্দেই শেষ হয় না, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয় হৃৎপিণ্ড। দৃষ্টির আড়ালে শুরু হয় রক্তক্ষরণ। ঝরে পড়ে হৃদ-কমলের পাপড়ি।

আর নয়, এবার খেলা ভাঙার খেলা। ভাল লাগা মানেই ভোগ নয়। ভালবাসা, 'হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন', এ যেমন সত্য, তেমনি সে ধন চিরচিনের করে রাখা যাবে, এ ধারণা চিরসত্য নয়।

চোখে মুখে জল দিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বসার ঘরে এসে ঢুকল কৃষ্ণকলি।

দিব্য বলল, ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে, এদিকে মা খাবার আগলে নিয়ে বসে আছে, আমাকে খেতে দিচ্ছে না।

সোমপ্রভা বললেন, প্রথম খবর তো তুই দিসনি, আমার মেয়েই দিয়েছে, তাই প্রথম খাবার ওরই মুখে তুলে দিতে হবে।

সোমপ্রভা খাবারের প্লেট আগলে সোফায় বসেছিলেন।

পেস্তা দেওয়া একটা ত্রিকোণ সন্দেশ হাতে তুলে নিয়ে কৃষ্ণকলিকে খাইয়ে দেওয়ার জন্য কাছে ডাকলেন।

কৃষ্ণকলি এস্ত পায়ে এগিয়ে এসে সোমপ্রভা দেবীর পায়ের তলায় হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে হাঁ করল।

তিনি তাকে সেই অবস্থায় সন্দেশটি খাইয়ে দিলেন।

চোখ দিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণকলির। সে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিল।

সোমপ্রভাদেবী প্লেটটা দিব্যর হাতে ধরিয়ে দিয়ে দুহাতে কৃষ্ণকলিকে আগলে নিজের বাঁদিকে সোফায় বসালেন। আজ এমন আনন্দের দিনে তোমার চোখে জল কেন মা?

প্রথমে লজ্জা পেয়ে ও মাথা নাড়ল।

আমার কাছে সংকোচ কি তোমার, আমি তো মা।

কৃষ্ণকলি বলল, আপনি যখন খাইয়ে দিচ্ছিলেন তখন আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। তাই চোখে জল এল। স্কুলে যাবার সময় মা এমনি করে আমাকে খাইয়ে দিত।

সোমপ্রভাদেবী বাইরে গম্ভীর হলেও, মমতায় ভরা একটি হৃদয় ছিল তাঁর।

তিনি বললেন, আজ তোমাকে আমি নিজের হাতে খাইয়ে দেব মা।

পাশ থেকে দিব্য বলে উঠল, আমি বুঝি বাদ পড়ব?

সোমপ্রভা বলে উঠলেন, তুই এমন মা-আঁকড়া কেন বলতো? তোর জ্বালায় কি আর কাউকে আদর করতে পারব না?

দিব্য বলল, ওর মতো আমাকেও আজ তুমি খাইয়ে দাও মা।

ওদের খাইয়ে দিয়ে সোমপ্রভা দেবী নিচে নেমে গেলেন। ওরা মুখোমুখি বসে গল্পে মাতল। এখনও তেমন রাত হয়নি, ঘণ্টাখানেক অন্তত আড্ডা দেওয়া যেতে পারে।

টুকরো কথা চলতে চলতে কৃষ্ণকলির হঠাৎ মনে পড়ে গেল কল্কির কথা।

জান, আজ তোমার বাড়ি আসার পথে বাসস্ট্যান্ডে দেখা হল কনকদার সঙ্গে। বাসও আসে না আর আমাদের গল্পও থামে না।

দিব্য হেসে বলল, তা কি এমন গল্প হচ্ছিল শুনি।

কনকদা আজ বেশ মুডে ছিল। সে তার নষ্ট জীবনের গল্প বলছিল। আর আমি শুনে অবাক হলাম, তাকে বিপথে ঠেলে দেওয়ার আসল মানুষটি হলেন সুচেতনাদির বাবা।

তুমি ঠিকই শুনেছ।

আচ্ছা সুচেতনার বাবার সঙ্গে কি তোমার বাবার ব্যবসায়িক কোনও সম্পর্ক ছিল?

কল্কি বলেছে বুঝি? হাঁ, বজ্রমোহন চৌধুরীর সঙ্গে আমার বাবার একসময় বিজনেস রিলেশন গড়ে উঠেছিল। তার পর একটা বিশেষ কারণে দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদও হয়ে গেল।

কি সে কারণ?

কেন, কল্কি কিছু বলেনি?

ঠিক সে সময়ই বাসটা এসে গেল। কনকদা চেঁচিয়ে তোমার কাছ থেকেই কারণটা জেনে নিতে বলল।

একটু কী ভেবে নিয়ে দিব্য বলল, আমার বাবার পড়ার খুব নেশা ছিল। এই বই পড়ার হ্যাবিট থেকে তিনি শুরু করলেন বুক বিজনেস।

চৌরঙ্গীতে বেশবড় মাপের সাজানো বুকশপ করলেন। বিদেশ থেকে ইমপোর্ট করতে লাগলেন নানা ধরনের ইংরেজি বই।

রমরমিয়ে ব্যবসা চলল। বাবা একজন দক্ষ ম্যানেজার খুঁজছিলেন। সেই সূত্রে ব্রজমোহন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ। তিনি ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হয়ে পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সে সময় তিনি স্ত্রী আর বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের বাড়ির আউটহাউসে থাকতে শুরু করলেন।

দু-পরিবারের ভেতর মালিক কর্মচারীর সম্পর্ক ছিল না। একই বাড়ির ভাই, বন্ধুর মতো তাঁরা বসবাস করতেন।

আমার মা আর সুচেতনার মায়ের ভেতর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সুচেতনা আমার থেকে বছরখানেকের ছোট ছিল। আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলাধুলা আর লেখাপড়া করতাম।

কৃষ্ণকলি জানতে চাইল, তোমার চেয়ে এক বছরের ছোট হয়েও সুচেতনাদি কী করে তোমার ক্লাসমেট হল?

ওর এক ক্লাস ওপরেই পড়তাম আমি। মাঝে একবছর অসুস্থ হয়ে পরীক্ষা দিতে পারিনি, তাই ও আমাকে ধরে ফেলল।

তারপর, বিচ্ছেদটা হল কী করে?

ব্রজকাকা আসার পর বাবার বিজনেসটা রমরমিয়ে চলতে লাগল। বাবা ওদিকে আর বিশেষ নজর দিলেন না।

বেশ কয়েকবছর পরে বাবার এক বন্ধু হঠাৎ আমাদের বিজনেস সম্বন্ধে বাবার কাছে বিরূপ মন্তব্য করলেন।

বিরূপ মন্তব্য! কীরকম?

তা হলে ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি ঃ

একটা সংস্থা ইস্কুলের পরীক্ষার্থীদের জন্য টেস্টপেপার বের করত। সেই টেস্টপেপার কেনার জন্য দোকানে দোকানে ভিড় জমে যেত।

ব্রজকাকা সেই সুযোগটা নিয়ে নিল। তিনি ওই সংস্থার সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন।

পেপার, প্রেস, বাইন্ডিং ইত্যাদির জন্য যা খরচ লাগে তা আগাম তিনি সংস্থাকে দিয়ে দেবেন। পরিবর্তে টেস্ট পেপারের সোল এজেন্সি নিয়ে নেবেন তিনি।

এরপর শুরু হল আসল খেলা।

ব্রজকাকা টেস্টপেপারের সব বিষয়ে মেড-ইজি বের করলো। চটি চটি এক একটা মেড-ইজির দাম হল মোটা টেস্টপেপারের দামের তিনগুণ।

টেস্টপেপার সংগ্রহের জন্য প্রচণ্ড লাইন পড়ল। ব্রজকাকা অলিখিত নিয়ম করলেন, একটি টেস্টপেপার পেতে গেলে অন্তত দু-খানা মেড-ইজি কিনতে হবে।

তাই সই, হুড়হুড় করে মেড-ইজি বিক্রি হতে লাগল। এই উপায়ে অজস্র টাকা রোজগার হল।

বাবা যখন বন্ধুর কাছ থেকে ঘটনাটা জানলেন, তখন ব্রজকাকাকে ডেকে পাঠালেন।

আমরা যেখানে বসে আছি, এখানেই অনেক রাত অবধি চেঁচামেচি, বাগ বিতন্ডা চলল।

বাবা বললেন, ব্রজ, তুমি তোমার ওই বিজনেস নিয়ে থাক, ও টাকায় আমার কোনও প্রয়োজন নেই।

ঠিখ সেইদিন থেকে দু'জনে পৃথক হয়ে গেলেন।

ব্রজকাকা আমাদের ঘর ছেড়ে সপারিবারে উঠে গেলেন অন্যত্র।

কিন্তু সুচেতনা আর তার মার সঙ্গে কোনওভাবেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারলেন না আমার মা।

আমরা দুজনে তখন পাঠভবনে একসঙ্গে পড়ি!

সুচেতনার মা যখন মারা যান তখন সে ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। আমার মায়ের হাত ধরে কাকিমা মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, আমার মেয়েটাকে তুমি দেখ দিদি। তোমার হাতে সঁপে দিলাম।

মা বলেছিল, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ও আমার চোখের আড়াল হবে না। ওর সব ভারই আমি নেব।

তাই সুচেতনা আমাদের বাড়ির সব অনুষ্ঠানে ডাকের অপেক্ষা না রেখেই চলে আসে।

ব্রজকাকা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর নানা ধরনের বিজনেসে জড়িয়ে পড়েন। বাবার মৃত্যুর সময় একবার মাত্র এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ের আসার ব্যাপারে কোনরকম বাধা দিতেন না।

বেল বাজতেই নীচে নেমে গেল দিব্য। ঘরে এসে ঢুকলেন সোমপ্রভা দেবী।

তুমি একাটি বসে আছ মা, দিব্য গেল কোথায়?

নিচে বেল বাজতে ও নেমে গেল।

বোধ হয় কেউ খবর পেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

সোমপ্রভাদেবীর হাতে ঝকঝকে পেতলের পেখম মেলা একটি ময়ূর। তার মাথায় ঝুঁটির মতো জ্বলছে বেশ মোটা একটি ধূপকাঠি।

তিনি এগিয়ে গেলেন ঘরের দেওয়ালে পাশাপাশি ঝোলানো প্রমাণ-সাইজ দুটি অয়েল পেইন্টিং-এর দিকে। একটি দিব্যের বাবার, অন্যটি তার দাদুর।

দুটি ছবির মাঝে রাখা শ্বেত পাথরের একটা টিপয়ের ওপর ফ্লাওয়ার ভাসে শোভা পাচ্ছে তরতাজা সিঁদুর লাল গোলাপ। সোমপ্রভাদেবী তারই সামনে রাখলেন ধূপদানিটি। নমস্কার করলেন গলায় আঁচল জড়িয়ে। নাচের ভঙ্গীতে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছিল ধূপের ধোঁয়া। মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিল কৃষ্ণকলি।

প্রতিকৃতি দুটিকে নমস্কার জানিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই কৃষ্ণকলির সঙ্গে চোখাচোখি হল সোমপ্রভাদেবীর।

মাসিমা, অপূর্ব এই দুটি অয়েলে পেইন্টিং। একেবারে জীবন্ত। এমন সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান পুরুষ আমি খুব কম দেখেছি। আর একটা জিনিসও আমার চোখে পড়েছে।

কৃষ্ণকলিকে থামতে দেখে সোমপ্রভাদেবী বললেন, কি জিনিস মা?

দিব্য আর তার বাবার চেহারার সাদৃশ্য। আপনার কাছ থেকে দিব্য পেয়েছে টানাটানা গভীর দুটি চোখ। আর সবই ওর বাবার মতো।

সোমপ্রভা বললেন, এ বংশের ছেলেমেয়েরা সুন্দর দেহ নিয়েই জন্মায়। একমাত্র সুন্দরী মেয়েদেরই আনা হয় বধূরূপে নির্বাচন করে। রায়বাহাদুর পরিবারের প্রায় পাঁচ পুরুষের রীতি এটি।

এবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সোমপ্রভাদেবী। বললেন, তুমি একটু বস মা, এখুনি খোকা এসে যাবে। আমি রাতের খাবারের যোগাড়টা করছি।

সোমপ্রভাদেবী নিচে নেমে গেলেন।

একটি সুন্দর সোনালী সকাল শুরু হয়েছিল। গাছের সবুজ পাতায়, মাঠের চিকন ঘাসে উড়ে এসে পড়েছিল রোদ্দুরের ওড়না। নীলকণ্ঠ পাখি কার যেন জয় ঘোষণা করতে করতে নীলাকাশের দিকে

উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একতাল কুয়াশা উঠে এসে ঢেকে দিল সবকিছু। শুরুতেই থেমে গেল রাগ-বসন্ত। *যে চঞ্চল আঁখি প্রিয়-মিলনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল, সহসা তার ওপর নেমে এল মেঘছায়া।* দিব্যের স্পর্শে যে স্বপ্ন অনুরাগের রঙমাখা প্রজাপতির মতো উড়ে এসেছিল, তা সহসা স্বপ্নভঙ্গে অলীক বলে মনে হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কৃষ্ণকলির বুক ঠেলে। তার সঙ্গে অনুচ্চে উচ্চারিত হল ক'টি শব্দ, 'হায় কালো মেয়ে, হায় তোর সাধের স্বপ্ন।'

চার

সেবার মিঃ চোখানির প্রযোজনায় 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটি সুমন দত্তগুপ্ত ও সুচেতনা চৌধুরী জুটিকে বাদ দিয়েই হয়েছিল।

আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিলেন মিঃ চোখানি। আলোচনা ভেঙে যাবার সময় তিনি একটি রূঢ় মন্তব্য করেছিলেন, মোশয়, এত টাকা যদি খরচ করবো তোবে নতুন জুটিকে লিবো কেন? অর্জুন, শুক্লা, কোপিলা দত্ত এরা আছে। বহুৎ নাম।

দত্তগুপ্তের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল কথাটা।

ক্ষিপ্ত সুচতেনা সব শুনে বলেছিল, আমাদের জুটি ঐ কলামন্দিরেই একদিন 'চিত্রাঙ্গদা' করে দেখাবে, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে সুমন, সুচেতনা জুটিই সব সেরা।

অনেকদিন সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়নি, এবার পরীক্ষার বোঝা ঘাড় থেকে নামতেই সুচেতনা উঠে পড়ে লাগল।

সুমন, প্রথমেই আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সেখানে আমরা নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের তৈরি করব।

সুমন বলল, প্রাথমিক খরচ যে অনেক সু...।

সেজন্যে তুমি ভেব না।

সুমন নাচিয়ে হলে কি হবে, খুবই হিসেবী।

বলল, উপযুক্ত একটা জায়গায় অন্তত হলঘর সমেত দুখানা রুমের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট চাই। সেলামী কত জান?

আমাকে সেলামীর অঙ্ক শুনিও না সুমন। শুধু জেনে রেখ, বাবা তার একমাত্র মেয়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য সদাই মুক্তহস্ত।

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত জায়গায় মেয়ের জন্য একটা প্রশস্ত ফ্ল্যাটই কিনে ফেললেন, ব্রজমোহন চৌধুরী।

সাইনবোর্ডে লেখা হল, 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনিকেতন'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত হল, নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'। আর তাকে মঞ্চস্থ করা হল, সেই কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে। মঞ্চসমালোচকদের সঙ্গে সংযোগ রাখল সুমন স্বয়ং।

ইচ্ছে করেই গেস্টকার্ড পাঠানো হল মিঃ চোখানির নামে।

অনার্স পাবার পর পড়াতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে একেবারে নাচে মগ্ন হল সুচেতনা।

অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকদিন আগে দিব্যের সঙ্গে ইউনিভারসিটিতে দেখা করল সুচেতনা।

চমৎকার একটি ব্যাগ থেকে সুদৃশ্য একটি কার্ড বের করে দিব্যের হাতে দিয়ে বলল, 'এই অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র, বন্ধু দিব্য ব্যানার্জিকে নৃত্য শিল্পী সুচেতনা চৌধুরীর উপহার।'

আশ্চর্য! এই ছত্রটি গোল্ডেন কালারে লেখা ছিল কার্ডের শেষে স্টার চিহ্ন দিয়ে।

দিব্য সস্মিত চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার ব্যাপার স্যাপারই আলাদা সুচেতনা। কৃতিত্ব আমার যতটুকু প্রাপ্তি হল তার চেয়ে অনেক বেশি।

দু'দিন পরের ঘটনা। দিব্য সবে মাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে। সোমপ্রভা দেবী ছেলের জলযোগের ব্যবস্থা করছেন।

হঠাৎ বেল বাজতেই দিব্য সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা ভেজানোই ছিল। দিব্য দু'হাতে গিয়ে দরজাটা খুলেই সুচেতনাকে দেখে অবাক হল। কেমন যেন উদভ্রান্ত চেহারা, রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে। মনে হল ও যেন দারুণ একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে।

দিব্য হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে, কী ব্যাপার? দাঁড়িয়ে রইলে কেন — এস, এস।

সুচেতনার হাত ধরে দিব্য তাকে বৈঠকখানায় নিয়ে এল। সোফায় পাশাপাশি বসল দুজনে।

চেঁচিয়ে বলল, মা, কে এসেছে দেখে যাও।

সোমপ্রভা দেবী বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন, সুচেতনা এসেছে।

বললেন, বস তোমরা দুজনে, আমি এখুনি আসছি।

সুচেতনা অদ্ভুত কাতর গলায় বলল, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ আলোচনা আছে দিব্য। তোমাকে একটু সময় দিতে হবে।

বেশ তো, মা এখুনি খাবার আনছে, খেয়ে নিয়ে আমরা ওপরে যাব।

খাবার পরে ওরা ওপরের ঘরে চলে গেল।

সোফায় বসে দিব্য বলল, কি ব্যাপার বল তো? তোমাকে কেমন যেন বিচলিত দেখছি?

সুচেতনা হঠাৎ দিব্যর হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, বড় বিপদে পড়ে গেছি দিব্য, তাই কোনওরকম পথ না পেয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

দিব্যও বিচলিত হল। ব্যাপারটা খুলে বল, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

আমার সমস্ত প্রোগ্রাম বান্‌চাল হতে বসেছে।

কী রকম!

শ্রীলেখা সমস্ত অনুষ্ঠানকে ভেস্তে দিয়ে চলে গেছে।

শ্রীলেখা চলে গেছে! কেন? তারই তো চিত্রাঙ্গদার গানগুলো গাওয়ার কথা।

মাসখানেক আগে সুমনের সঙ্গে একটা ব্যাপারে ওর মনান্তর হয়। তখন কিন্তু সে কিছু বলেনি। এখন একেবারে শেষ সময়ে আমাদের ডুবিয়ে দিয়ে ও চলে গেছে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে।

আহত দিব্য বলল, এ যে দারুণ রিভেনজ।

জানো, ও সুমনের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করতে চেয়েছিল। সুমনের কাছে ঘা খেয়ে সেটাই ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

দিব্য হতাশ গলায় বলল, এখন তা হলে কি হবে?

তুমিই একমাত্র ভরসা।

আমি!

হাঁ, তুমি যদি কৃষ্ণকলিকে গানের ব্যাপারে রাজি করাতে পার। কেউ পারবে না।

সময় খুবই অল্প, তবু তুমি কাল এ সময়ে একবার এস, আমি কথা বলে দেখি।

কলামন্দিরের সুশোভিত মঞ্চে দর্শকদের উচ্ছ্বাস আর ঘন ঘন করতালি ধ্বনির মধ্যে সমাপ্ত হল চিত্রাঙ্গদা নৃত্যানুষ্ঠান।

শুরুতে মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল দিব্য সুদর্শন দীর্ঘদেহী এক যুবক। পরনে ধবধবে সাদা চোস্ত, দেহ ঢেকের-সিল্কের ঝোলা গুরু-পাঞ্জাবি।

তার গভীর মাধুর্যভরা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল কবিগুরু রচিত চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের মুখবন্ধটি।

'প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর' পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ করে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়।
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।

তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণ বৈচিত্র্যে,
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।
এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনী আছে—
প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়।'

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ভাবের অভিব্যক্তিগুলি নৃত্যের ছন্দে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। কুরূপা, সুরূপা দুটো ভূমিকাতেই সুচেতনার কি স্বচ্ছন্দ মহিমা। নৃত্যনাট্যের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তারই মোহিনী মায়া। কৃষ্ণ কলির দরদভরা সুরেলা কণ্ঠে রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার কথা ও গান, দর্শকদের শ্রবণ ও মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত।

অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা চোখে চোখ রেখে যখন মোহাবিষ্ট হয়ে নাচছিল যুগলনৃত্য, আর পুরুষও নারীর দ্বৈত কণ্ঠে সেই অভিব্যক্তি ঝরে পড়ছিল অর্থবহ গানের ভাষায় তখন সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশ কুসুম চয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে।

ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা
মিটিল দোঁহার নয়নে।।'

যবনিকা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার পায়রা ওড়ার শব্দে করতালি-ধ্বনি উঠতে লাগল।

আবার যবনিকাপাত, আবার উত্তোলন।

এবার একে একে মঞ্চে আসতে লাগল কুশীলবেরা। প্রত্যেকেই উচ্ছ্বসিত করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হল।

সবশেষে মঞ্চে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণকলি। বিনীত নমস্কার নিবেদন করল দর্শকদের উদ্দেশ্যে।

অমনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দর্শকেরা। তাদের আনন্দ, আবেগ আর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিশে গেল দীর্ঘস্থায়ী করতালিধ্বনি।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল কৃষ্ণকলি। বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি এসে দেখল, তারই দিকে তাকিয়ে আছে কল্কি অবতার।

ও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কল্কির কাছে এসে বলল, কোথায় সেদিন ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে কনকদা।

নাচের শেষে গ্রীনরুমে কতলোক এল, আমার গানের তারিফ করল, কিন্তু সত্যি বলছি কনকদা, আমার মন ভরল না।

কেন, তুই তো দারুণ গেয়েছিস।

থাম। তাই বুঝি সেদিন তুমি গ্রীনরুমে এলে না? যদি দু'একখানা গানের বিরূপ টিপ্পনিও করতে তাহলেও আমি খুশি হতাম।

শোন্ তাহলে, আমার আশপাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মাথা নাড়া আর কথাবার্তা থেকে বুঝেছিলাম, তোর গানে তাঁরা একেবারে মজে গেছেন। বিশেষ করে তোর গাওয়া তিনটে গানের তো জবাব নেই।

কৃষ্ণকলি জানতে চাইল, কোন তিনটে গান কনকদা?

'বঁধু কোন আলো লাগল চোখে', 'রোদনভরা এ বসন্ত' আর 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি'।

তুই কোথায় পেলি বলতো, এত ভালো গলা আর এমন দরদ!

যতটুকু পেয়েছি সব আমার মায়ের আশীর্বাদ কনকদা।

বিয়ের আগে থেকেই মা গান গাইত, তারপর একান্নবর্তী সংসারে ঢুকে মায়ের গান বন্ধ হয়ে যায়।

কয়েক বছর পরে বাবা গাঁয়ের বাড়ি ছেড়ে মাকে নিয়ে জলপাইগুড়ির 'রাইমাতং টি এস্টেটে' কাজ নিয়ে চলে আসে। সংসারে কিছুদিন ধরে চলছিল নানা অশান্তি। তাই বাবা আমাকে আর মাকে নিয়ে চলে এলো জলপাইগুড়ি।

তুই তখন কত বড় রে?

কত আর হব, বছর চারেক বয়েস। ঐ টি-গার্ডেনে থেকেই মা আবার গান গাইতে শুরু করল।

গার্ডেনে কোন ফাংশান হলে গান গাইবার জন্য মায়ের ডাক পড়ত।

কঙ্কি বলল, মাসিমার গলা কি তোর মতো এমন সুরেলা ছিল?

শোননি তো মায়ের গান! আচ্ছা একদিন তোমাকে শোনাব।

কি করে। মাসিমা তো নেই বলে শুনেছি।

মা নেই, তার কণ্ঠের কিছু গান ধরা আছে একটিমাত্র ক্যাসেটে।

মামার এখানে আসার পর মা ক্লাসিকাল-এর তালিম নিয়েছে ওস্তাদ এক গুরুর কাছে। তাই মা সবরকম গান গাইলেও রাগপ্রধান গানই গেয়েছে বেশির ভাগ সময়। আমিও ছেলেবেলা থেকে রেওয়াজ করেছি মায়ের কাছে বসে।

তাই তোর এত সুন্দর গলা হয়েছে।

এবার অন্য কথা পাড়ল কৃষ্ণকলি।

আচ্ছা কনকদা, আজ তুমি হঠাৎ পথ বদলে উল্টো বাস স্ট্যান্ডে, যাচ্ছ কোথায়?

তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার জন্যে!

হাঁ রে, বড় বিপদে পড়ে গেছি।

হাসিখুশিতে ভরা কঙ্কির মুখখানায় হঠাৎ মেঘছায়া ঘনাল।

কৃষ্ণকলি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, বিপদটা কি?

দুদিন হল বাবা হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছে। জল পর্যন্ত মুখে দিচ্ছে না। স্বর্ণদি তো বাবাকে দেখাশোনা করে। সে-ও কিছু খাওয়াতে পারছেন না।

এরকম অনশনের কারণ কি? নিশ্চয়ই তুমি?

তুই ঠিকই ধরেছিস।

তোকে বোধহয় বলেছিলাম, বাবা আর্থরাইটিসে প্রায় শয্যাশায়ী কিন্তু যন্ত্রণা হলে কোনওরকম পেইনকিলার খাবেন না। আমি বাবার কষ্ট দেখে বলেছিলাম, বাবা, তুমি একটু একটু করে আফিম্ খাও, যন্ত্রণা কমে যাবে।

আমার কথা শোনার পর বাবার সে কী মূর্তি। বলে উঠল, তোমার সম্বন্ধে পাড়ায় যে সব কথা রটেছে তা তো সত্যি! একটা নেশাখোর ছেলের বাপ আমি। ভগবান আমাকে এসব কথা শোনার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। ছিঃ ছিঃ! তোর রোজগারে খেতে হচ্ছে আমাকে, মরণও হয় না আমার।

আমি কোনওরকম প্রতিবাদ না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

কৃষ্ণকলি বলল, তুমিই বা এমন বেফাঁস কথা বাবার কাছে বললে কেন?

বুঝতে পারিনি, ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে।

এবার বল, আমাকে কি করতে হবে?

ঠিক জানি না রে, তবু মনে হল, তোর সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলি।

কৃষ্ণকলি কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, চল, মেসোমশাই-র কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি।

তুই যাবি!

কেন কিছু বাধা আছে?

বেশ, যাবি তো চল।

এই প্রথম কৃষ্ণকলি ঢুকল কল্কির বাড়িতে।

কল্কি অনুচ্চে বলল, বাবা, ওই ঘরে আছে। আমি যাচ্ছিনে, তুই যা।

ঘরের দরজায় এসে উঁকি দিল কৃষ্ণকলি।

একটি শীর্ণ মানুষ চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন বিছানার ওপর, চোখ দুটো বন্ধ। বাঁ হাতটা কপালের ওপর ঠেকিয়ে রেখেছেন।

অতি ধীরে ঘরের ভেতর পা রাখল কৃষ্ণকলি। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধ মানুষটির মাথার কাছে।

কল্কির বাবার চোখ তেমনি বন্ধ। আস্তে আস্তে কৃষ্ণকলি শায়িত মানুষটির মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

হঠাৎ মানুষটি চোখ মেলল। সেই অবস্থায় বলল কে? স্বর্ণ?

বাবা, আমি।

অচেনা কণ্ঠস্বর শুনে বৃদ্ধ বললেন, কে তুমি?

আমি কৃষ্ণকলি, বাবা।

সম্পূর্ণ অপরিচিতা একটি মেয়ের আবেগভরা ডাক শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন কল্কির বাবা।

তিনি খুব কষ্ট করে ঘাড় বাঁকিয়ে মেয়েটিকে দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণকলি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বৃদ্ধের মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে বসল। হাতটা নিজের হাতের ভেতর তুলে নিয়ে বৃদ্ধের দিকে করুণ চোখে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বললেন, কে মা তুমি?

আমি আপনার একটি মেয়ে।

বৃদ্ধ অনেক ভেবেও কিছু মেলাতে পারলেন না। কিন্তু তার মনের গভীরে প্রবল একটা স্নেহের স্রোত বইতে লাগল।

কল্কির বাবা সুধাময় বললেন, তুমি কোথায় থাক?

সোনারপুরে আমার মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ি।

এ বাড়িতে তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি?

আমি কলেজ থেকে ফেরার পথে আপনার অসুখের কথা শুনতে পাই, তাই চলে এসেছি আপনাকে দেখতে:

বৃদ্ধ আবেগে কৃষ্ণকলির হাতটা মুঠো করে ধরলেন। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল গড়িয়ে পড়ল শীর্ণ গাল বেয়ে।

কৃষ্ণকলি আলতো করে ওড়নার প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জল মুছিয়ে দিল।

বাবা আমি শুধু তোমাকে দেখতে আসিনি, তোমার কাছে একটা জিনিস চাইতেও এসেছি।

কেঁপে উঠল বৃদ্ধের গলা, আমাব তোমাকে দেওয়ার কি আছে মা?

ছোট্ট একটা ইচ্ছা আমার পূর্ণ করতে হবে।

বল?

আগে কথা দাও?

বল মা।

আমি তোমার জন্যে লেবু এনেছি। নিজের হাতে ছাড়িয়ে দেব, তোমাকে খেতে হবে।

এ কী সমস্যায় ফেললি, তুই মা!

আমি কিছু শুনতে চাই না, তোমাকে খেতে হবে—বলেই ঝোলা থেকে কমলা বের করে ছাড়িয়ে এক একটি করে কোয়া খাইয়ে দিতে লাগল।

যাবার আগে কথা দিয়ে গেল এখন প্রায় রোজ একবার করে এসে সে সুধাময়বাবুকে দেখে যাবে এবং কথা নিয়ে গেল আজ থেকে পুরোপুরি খাবার তাঁকে খেতে হবে।

তাছাড়া একটি কঠিন কাজ কৃষ্ণকলি তুলে নিল নিজের হাতে। সে তার কনকদাকে গভীর পাঁক থেকে টেনে তুলবেই।

প্রবাদ আছে, বিপদ একাকী আসে না। কৃষ্ণকলির দিকে বিপর্যয়গুলো যেন সারি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

সে খুব শান্ত, সহৃদয় প্রকৃতির মেয়ে। অন্যের দুঃখ, বেদনার অংশও নিতে চায় সে। কিন্তু অন্তরে আছে তার আশ্চর্য এক শক্তি। সমস্তরকম বিপর্যয়েও সে সংযত, অবিচল। লড়াই করার দুর্বার এক মানসিকতা আছে তার।

গানের কণ্ঠটি সে যেমন লাভ করেছে মায়ের দান হিসেবে, ঠিক তেমনি মনের শক্তিটিও অর্জন করেছে মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে।

ত্রিবেণী-সংগমে কুম্ভস্নান সেরে ফিরে আসার পর থেকে ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন কৃষ্ণকলির মামা। নানারকম প্রাথমিক চিকিৎসার ভেতর দিয়েও যখন ফিরে পেলেন না নিজের শক্তি তখন ব্যয়বহুল পরীক্ষা নিরীক্ষা চলল তাঁকে নিয়ে।

দ্বিজদাসবাবুর সঞ্চিত টাকাগুলি ধীরে ধীরে এসে ঠেকল তলানিতে। এখন শুধু মাসিক পেনশনের কয়েকটি টাকাই সম্বল।

অবশেষে রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে পৌঁছানো গেল একটা সিদ্ধান্তে। কিছু করার নেই এই বিধ্বংসী রাজরোগে।

লাঙ্ ক্যানসারের শিকার হয়েছেন দ্বিজদাসবাবু।

দিন গোনা ছাড়া বেশি কিছু করার ছিল না কৃষ্ণকলির।

তার এই দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল দিব্য আর কল্কি।

দুহাত দিয়ে কল্কি যেন ওকে আগলে নিয়ে চলত।

দিব্যও প্রায়ই থাকত ওদের সঙ্গে।

দ্বিজদাসবাবুকে ঠাকুরপুকুরে রেখে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিল দিব্য। সমস্ত খরচ চালানোর প্রতিশ্রুতিও দিল সে। কিন্তু দ্বিজদাসবাবু নিজের ওই ছোট্ট আস্তানাটুকু ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইলেন না।

তিনি তিন বন্ধুর সামনেই বললেন, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমাকে নিয়ে আর টানাহেঁচড়া করো না বাবা, একটু শান্তিতে আমাকে চলে যেতে দাও। শুধু মা বাপ মরা মেয়েটার জন্যেই আমার ভাবনা। ওর ভেতরে যে ঐশ্বর্য রয়েছে তাকে বোঝার মতো একটি সহৃদয় মানুষ পেলাম না এই যা দুঃখ। আমি মামা হয়ে যা পারলাম না, তোমরা বন্ধু হয়ে হয়ত তা পারবে — এই আশা নিয়েই আমাকে যেতে হবে।

দিব্য বলল, বাড়িতে থাকলে কি হসপিটালের মতো সেবা পাবেন মামাবাবু? ওখানে সাময়িক স্বস্তি দেবার অনেক ব্যবস্থা থাকে।

বাবা, এ সময় আমি মনের শান্তি চাই। ঘরটাই তো আমার ধাত্রী — শান্তির নীড়। কলেজ করে, বাইরের কাজ সেরে ও যখন ফিরে আসবে তখন আমার সব জ্বালা, সব কষ্ট ভুলে যাব।

একদিন দিব্য কৃষ্ণকলিকে বলল, তোমাকে মা ডেকেছে।

কৃষ্ণকলি বলল, মামার অসুখের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় অনেকদিন আমি মাসীমার কাছে যেতে পারিনি। কাল-পরশুর ভেতরেই একবার চলে যাব।

পরের দিন দুটোর ভেতরই কৃষ্ণকলির ক্লাস শেষ হয়ে গেল। বেশ কিছুটা সময় হাতে পেয়ে সে ছুটল দিব্যর বাড়ির দিকে।

সোমপ্রভা দেবীকে প্রণাম করা মাত্রই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন কৃষ্ণকলিকে। পরে বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসালেন, নিজেও পাশে বসলেন।

কথায় কথায় বললেন, এ সময় তোমাদের জন্য কিছু করতে পারলে মা বড় তৃপ্তি পেতাম। দিব্যর মুখেই আমি সব শুনেছি। অসুখটা দুরারোগ্য সন্দেহ নেই, তবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না মা। এ সময় তোমাদের জন্য সামান্য কিছু একটু করতে পারলেও মনে শান্তি পেতাম। দিব্যরও সে রকম ইচ্ছে।

কৃষ্ণকলি বলল, মামা একটু অন্য প্রকৃতির মাসীমা। কাটা ছেঁড়া পোড়ানো জ্বালানো এ সবের একবারে বিরুদ্ধে তিনি। বলেন, তোদের দিকে তাকিয়ে শান্তিতে চলে যেতে দে।

সোমপ্রভা দেবী ভেতরে উঠে গেলেন। কিছু পরে ফিরে এসে এক বাণ্ডিল নোট কৃষ্ণকলির হাতে দিয়ে দুটো হাত চেপে ধরলেন।

মুখে বললেন, এটুকু নিতে হবে মা। এখন তোমার অনেক খরচ, তাই না বল না।

ইতিমধ্যে গানের দু-একটা টিউশনি নিয়েছিল কৃষ্ণকলি। দুটি বাড়িই বেশ অবস্থাপন্ন। খানিকটা টাকা ওখান থেকে পাওয়া যেত। এই টিউশনি দুটো যোগাড় করে দেওয়ার সব কৃতিত্বই ছিল কল্কির।

কৃষ্ণকলি এবার বেশ নরম গলায় বলল, আপনার এই স্নেহের দান ফিরিয়ে দেব এমন ক্ষমতা আমার নেই মাসীমা। এ টাকাটা বরং আমি আপনারই কাছে গচ্ছিত রেখে গেলাম, দরকার হলে ঠিক চেয়ে নেব। এখন বরং এর থেকে আপনি আমাকে একশোটা টাকা দিন।

সেদিন দিব্য কোনও কাজে গিয়েছিল, তার সঙ্গে আর দেখা হল না। কৃষ্ণাকে জলখাবার না খাইয়ে দিব্যর মা ছাড়লেন না। ফেরার সময় প্যাকেটভর্তি ফল আর মিষ্টি দিয়ে দিলেন কৃষ্ণকলির মামার জন্য।

ইদানীং দ্বিজদাসবাবুর ভাবনার ভেতর বারবার অতীতের ছবিগুলো যেন মিছিল করে চলে আসে। চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখা ছবির মত স্পষ্ট এবং চলমান চিত্রগুলি তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখতে পান। এ ধরনের অনুভূতি তাঁর আগে কখনও হয়নি।

এক সন্ধ্যায় ঘরের ভেতর একটু দূরে বসে তাঁকে গান শোনাচ্ছিল কৃষ্ণকলি। রবীন্দ্রনাথের পূজার গান : "দূরে কোথায় দূরে দূরে
আমার মন চলে গো ঘুরে ঘুরে ...."

গানটি শুনতে শুনতে দ্বিজদাসবাবুর চোখের ওপর থেকে বর্তমানটা ধীরে ধীরে মুছে গেল। সুদূরের একটা ছবি ফুটে উঠল চোখের সামনে।

তাঁর মনে হল, সামনে বসে যে মেয়েটি গান গাইছে, সে কৃষ্ণকলি নয় — সে সুতপা।

সুতপা গান গাইছে। গ্রামের মাঠ পেরিয়ে, নদীর চরে দোলায়িত কাশফুলের আড়ালে বসে সে সুতপার গান শুনছে। জলের তরঙ্গে কেঁপে কেঁপে ভেসে যাচ্ছে তার সুর। অপরাহ্নে আকাশ, আলো স্তব্ধ হয়ে শুনছে তার গান।

গান থামলে সুতপা বলল, দ্বিজদা, তুমি কালই কলকাতা চলে যাচ্ছ। সেখানে গিয়ে কি আমার কথা মনে পড়বে?

যেখানে থাকি না কেন, ভুলতে পারব না তোমাকে কোনওদিন।

ছুটি পড়লে আসবে তো? তা ছাড়া তোমার খবর পাবার আর কোনও সুযোগ তো আমার রইল না?

জ্যাঠামশাই ফরমান জারি করেছেন, বি. এ. পাশের আগে আমি যেন গাঁয়ে না ফিরি। আমাকে অনেক ভাল রেজাল্ট করে তাঁর আশা পূর্ণ করতে হবে। কেন যে আমি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় টেনথ্ স্ট্যান্ড করলাম।

হতাশ গলায় সুতপা বলল, তোমাকে না দেখে, তোমার কথা না শুনে আমি এতগুলো দিন কেমন করে কাটাব দ্বিজদা?

আমার পক্ষে চিঠি পাঠানো সম্ভব হবে না সুতপা, তবে প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার চিঠির আশায় থাকব।

আমি তোমার জ্যাঠামশাই-র বাড়িতে গিয়ে যে খবর নেব সে সুযোগও তো আমার নেই।

সত্যি আমি অবাক হয়ে ভাবি, একই গ্রামে থেকে বিভিন্ন পরিবারের ভেতর এত বিবাদ! ওঁরা কি ছেলেমেয়েগুলোর কথা একবারও ভাবেন না। সে যা হোক, প্রতি মাসে তোমার চিঠি চাই। না হলে আমার পড়ার সমস্ত উদ্যম নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রায় নিয়ম করে বছর দুয়েক চিঠি এসেছিল সুতপার। তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

অসহনীয় হল প্রতীক্ষা।

এক পুজোর ছুটিতে জ্যাঠামশাই-এর শাসনকে উপেক্ষা করে ফিরে এলাম গ্রামে। সমস্ত মন আমার তখন সুতপার জন্য দুশ্চিন্তায় অস্থির।

বড়দের কাউকে সুতপার কথা জিজ্ঞেস করার মতো সাহস ছিল না আমার। ওদের বাড়ির সঙ্গে দীর্ঘদিন জমিজমা নিয়ে আমাদের বাড়ির কোর্ট-কাছারি চলছিল। তাই যাতায়াত, মুখ দেখাদেখি প্রায় সবই বন্ধ।

রাস্তায় কয়েকবার চক্কর দিলাম। নদীর চরের গোপন ডেরায় হানা দিলাম। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠল।

স্পষ্ট মুখটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রতনের। সে ওদিকের মাঠ থেকে নদীর উঁচু বাঁধের ওপর উঠল। এখন তার পুরো চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। হাতে একটা লগি। ছোট্ট একটা ডিঙির মালিক সে। নদীর থেকে কড়ে আঙুলের মতো বেরিয়েছে যে সরু নাশিখালটা তার ভেতরে থাকে ওর ডিঙি। একটা গামা গাছের কাণ্ডে বাঁধা থাকে ওটা। জোয়ার ভাটায় মালিক না থাকলে একটুখানি জায়গার ভেতর কত্থক নাচ নাচে।

রতন পাঠশালার বন্ধু। ওর বাবা প্রহ্লাদ কাকা 'ভড়' নৌকোর মাঝি। পাট আর খড় বোঝাই করে গঞ্জের বাজারে নিয়ে যায়।

রতন চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে আসছে।

দ্বিজু, তোকে যে গরু খোঁজা খুঁজছিরে।

এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম।

রতন বলল, অনেক কথা আছে, চল ডিঙিতে বসে বলব।

ডিঙির ওপর কাঠের দুটো তক্তা পাশাপাশি রয়েছে। রতন গামছা দিয়ে শুকনো মাটিগুলো ঝেড়ে বলল, বস।

এক চিলতে গলুইয়ের ভেতর ছোট্ট একটা উনুন আর হাঁড়ি, কড়া, কলাইয়ের দু'একটা থালা বাটি ইত্যাদি দেখা যাচ্ছিল।

এগুলো কিরে?

দরকার হলে চরে নেমে রান্না করে খেয়েনি। ওই দেখ খালের মুখে জাল পেতেছি। ভাটার টানে জল নেমে যাচ্ছে। এবার জাল টেনে তুললেই দেখবি, গুলে আর খরসুলাতে বোঝাই হয়ে গেছে জাল!

ভাজা খাস তো টাটকা মাছ ভেজে দেব। তেল আছে কিন্তু চাল নেই, তাই মাছ ভাত একসঙ্গে খাওয়াতে পারব না।

বললাম, সে একদিন খাওয়া যাবে। এখন তোর কি কথা আছে বল?

সুতপার খবর জানিস?

বুকটা টিপ টিপ করতে লাগল। গলা দিয়ে ক্ষীণ উদ্বেগের একটা স্বর বেরিয়ে এল, কি খবর রে?

মাস তিনেক আগে হয়ে গেছে।

সমস্ত রক্ত যেন বুকে উঠে এলো। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

রতন যেন সবার কান এড়িয়ে এবার ফিসফিস করে বলল, জানিস, ও কাকে যেন একটা চিঠি লিখে বালিশের তলায় রেখেছিল। হঠাৎ ধরা পড়ে যায়। অনেক দাবড়ানি খেয়েও ভালবাসার মানুষটার নাম বলেনি।

তাই! — দুঃখের ভেতরেও খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

শোন না তারপর মেয়ের কাণ্ড।

কথা বলার শক্তি ছিল না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

রতন বলে চলল, রাতের বেলা ভাঙা জানলা গলে পেছনের মাঠ দিয়ে পালালো।

কোথায়?

এই নদী সাঁতরে ওপারে। কিন্তু পালাতে গিয়েও পারল না।

কেন?

আরে এতখানি সাঁতরে পার হওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

উদ্বেগে বললাম, ভেসে গিয়েছিল নাকি?

ঝাঁঝিয়ে উঠল রতন, তুই এত বড় পাশ দিলি তবু তোর বুদ্ধিটা খুলল না কেন বলত? নদীর জলে ভেসেই যদি গেল তাহলে সংসার করছে কি করে?

নদীর স্রোত থেকে ভেসে যাওয়া মেয়েটাকে হয়তো কেউ তুলে এনেছে, এ যুক্তি দিতে পারতাম, কিন্তু তা না বলে আমি চুপ করে রইলাম।

রতন বলল, ওপারের চরে পৌঁছে ও মরার মতো পড়েছিল।

তারপর?

আমার পিসি ওদের বাড়িতে থেকে কাজ কর্ম করে। সব খবরই পিসি রাখত। যে রাতে সুতপা ভাঙা জানালা গলে পালাল, সে রাতেই পিসি কেমন যেন টের পেয়ে গেল। দাওয়ায় শুয়েছিল। বুঝতে পারল, মাঠ পেরিয়ে কে যেন পালাচ্ছে। চুপি চুপি ঘরে ঢুকে দেখল, বিছানায় নেই সুতপা।

কাউকে কিছু না বলে পিসিও মাঠ পেরিয়ে নদীর দিকে ছুটল সুতপার খোঁজে।

সে রাতে না ঘুমিয়ে ভরা কোটালের মাছ ধরছিলাম আমি। হঠাৎ পিসি এসে সুতপার এদিকে পালিয়ে আসার খবরটা জানাল আমাকে।

এতক্ষণ কথা বলে রতন কিছু সময় চুপ করে আছে দেখে আমি বললাম, কি করে শেষপর্যন্ত উদ্ধার পেল সুতপা?

আমি এই খালেই তখন মাছ ধরছিলাম। বড়রকম একটা জল-খলখলি আওয়াজ কানে এসেছিল, আমল দিইনি। পিসির কথায় মনে হল, জলে ঝাঁপ দিয়ে মরল নাকি মেয়েটা।

খাল থেকে ডিঙিটা বের করে নদীতে ভাসলাম।

তখন সবে চাঁদটা তার আলো ফেলতে শুরু করেছে। ওই আলোতেই আমি ওপারের চরে ওকে পড়ে থাকতে দেখলাম।

পিসি আর আমি সেদিন ধরাধরি করে ওকে বাড়ি পৌঁছেদি।

পিসি আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিল, আমি যেন সুতপার কথা কোথাও না বলি।

ও এখন বিয়ের পর বরের সঙ্গে তার কাজের জায়গায় চলে গেছে। শুনেছি, অনেক দূরে কোথায় যেন একটা টি-গার্ডেনে কাজ করে ওর বর।

কথা শেষ করে রতন বলল, এতদিন পেটে গজগজ করছিল কথাগুলো। আজ তোকে বলতে পেরে বেশ হালকা লাগছে। কিন্তু ভাই আর কারও কাছে যেন বলিস না।

বললাম, এ কথা কি কারও কাছে বলা যায়রে।

আমার কথাগুলো দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বুক ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল।

গায়ে নাড়া দিতেই চেতনা ফিরে এলো দ্বিজদাসবাবুর।

কৃষ্ণকলি বলল, এতক্ষণ ধরে কিসব বলে চলেছ মামাবাবু?

বিষণ্ণ হাসির মৃদু কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল মুখে। তখনও বুকের দ্রুত ওঠাপড়াটা স্বাভাবিক হয়নি।

টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। সামনে ফাইনেল। এখন ঘরে বসে মামার পরিচর্যা আর পড়া দুটোই চলেছে কৃষ্ণকলির।

কল্কি প্রায় প্রতিদিন হাজিরা দিয়ে যায়। কল্কিকে মামার কাছে বসিয়ে রেখে কল্কির বাবা সুধাময়বাবুর কাছে ছুটে যায় কৃষ্ণকলি। অসহায় বৃদ্ধ মানুষটিকে কথা দিয়েছে সে, মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে বসবে।

কৃষ্ণকলিকে দেখলে উজ্জ্বল হয়ে উঠে সুধাময়বাবুর দুটি চোখ।

বিছানার ওপর বসে কৃষ্ণকলি বৃদ্ধের হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি অনাবৃত দুটি পায়ে মালিশের ওষুধ লাগিয়ে কতক্ষণ ঘষতে থাকে।

কেমন আছেন মা তোমার মামাবাবু?

উনি ওঁর কষ্টের কথা বলেন না, হয়তো আমি কষ্ট পাব বলে।

বাড়ির রান্না সবই আমাকে করতে হয়। দু'একটা পদ বেশি হলেই বলেন, তোর না মাথার ওপর পরীক্ষার খাঁড়া! সেটা টেনে নিয়েই তুই কুটনো কুটতে বসে গেলি!

আমি বলি, মামা, তুমি অতসব ভেব না তো। আমার রেজাল্ট বেরুলে নিশ্চয়ই তোমার মুখে হাসি দেখতে পাব।

সুধাময়বাবু যন্ত্রণা ভুলে হেসে ওঠেন। বলেন, মামা ভাগ্নীর সংলাপটি বেশ।

পরক্ষণেই বলেন, তোমার মামা সত্যিই ভাগ্যবান।

কৃষ্ণকলি বলে, আপনিও কম ভাগ্যবান নন।

বিস্ময়ের রেখা ফোটে সুধাময়বাবুর মুখে। জানতে চান, কি রকম?

আমার কথা বিশ্বাস করুন বাবা, কনকদা খাঁটি হীরে। বন্ধুদের জন্য ও সবকিছু করতে পারে। এ বয়সের একজন যুবক ছেলে, সকলের প্রিয়, কিন্তু আমাদের মত মেয়েদের সঙ্গে ও 'তুই-তুকারি' করে বন্ধুর মতো, নিজের ভাইবোনের মতো। সারারাত ওকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের মত মেয়েরা নির্ভয়ে কোনও জলসার আসরে কাটিয়ে দিতে পারে।

চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল সুধাময়বাবুর। ভাঙাভাঙা গলায় বললেন, এই এতটুকু বাচ্চাকে রেখে ওর মা চোখ বুজল। সেই থেকে ওকে আগলে রেখেছিলাম বুকে। কিন্তু আজ ওর এমন পরিণতি হল কেন মা?

কিছু ভাববেন না বাবা, আমি কথা দিচ্ছি, ওর ওই নেশার আসক্তি থেকে আমি ওকে মুক্ত করবই!

সুধাময়বাবু কৃষ্ণকলির হাতটা জোরে চেপে গভীর আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন।

সুধাময়বাবু আর বেশিদিন পঙ্গু দেহটাকে টানতে পারলেন না। মৃত্যুর সময় কল্কি বাবার পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। প্রতিজ্ঞা করল, সে মরে গেলেও নেশার জিনিস আর ছোঁবে না।

সুধাময়বাবুর চোখের কোনা দিয়ে গড়িয়ে পড়া শেষ অশ্রুবিন্দু আনন্দের কি দুঃখের তা বোঝা গেল না। সেই শেষ অশ্রুধারাটুকু নিজের হাতে মুছে নিল কৃষ্ণকলি।

অনেক বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে কৃষ্ণকলির পরীক্ষাটা হয়ে গেল। কাণ্ডারী সেই দিব্য।

দ্বিজদাসবাবু সম্প্রতি প্রায় একটা ঘোরের মধ্যে কাটাচ্ছেন। অতীতের স্মৃতিগুলো দিয়ে মাঝে মাঝে গাইছেন কথার মালা। টুকরো টুকরো স্মৃতি মনের ওপর ভেসে উঠছে বুদবুদের মতো। চেষ্টা করেও কৃষ্ণকলি তার ভেতর থেকে সাজিয়ে তুলতে পারছে না কোন একটা অখণ্ড কাহিনী।

তবু ওই টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে সে একটা সত্যের আভাস পেয়েছে।

দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গে তাঁর মায়ের সম্পর্কটা ঝকঝকে রৌদ্রালোকিত দিনের মতো স্পষ্ট নয়। কিছু কুয়াশার উড়ন্ত মসলিনে তা শুভ্রসুন্দর কিন্তু রহস্যময়।

সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে দ্বিজদাসবাবু তার মায়ের সহোদর ভাই নন।

যৌবনে কোন একটা সময়ে তাদের ভেতর গড়ে উঠেছিল একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, যা যেকোন কারণেই হোক জোড়া লাগেনি।

বাবার মৃত্যুর পরে মা যখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করছিল তখন তার মনে পড়েছিল চিরকুমার এই মানুষটির কথা।

সত্যই একটা আশ্রয়ের মতো আশ্রয় পেয়েছিল সদ্য স্বামীহারা তার মা।

সে এদের মাঝেই বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতেও কোনদিন তাদের ভেতর গোপন কোনও সম্পর্কের গন্ধ পায়নি। বরং স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, অপরাধ-বোধ-মুক্ত এক অমলিন সম্পর্কের ছবি দেখেছে।

মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাকে প্রায় পক্ষিণীর শাবক রক্ষার মতো মামা তাকে আগলে নিয়ে বেড়িয়েছে। সিক্ত করেছে স্নেহের অজস্র বর্ষণে।

মামা চলে গেলেন। প্রশান্ত আনন্দঘন মুখ।

মৃত্যুর আগের দিন যেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এক মানুষ। দিব্য পাশে বসেছিল, তার হাতটা ধরলেন।

রান্নাঘরে গিয়েছিল কৃষ্ণকলি, তাকে কাছে ডাকলেন।

না, কোনরকম অতি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করলেন না। শুধু বললেন, দিব্য আর কনককান্তির সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেন অটুট থাকে।

মৃত্যুর কদিন আগে কৃষ্ণকলিকে ডেকে বলেছিলেন, আমার চলে যাবার পর কোনরকম আচার অনুষ্ঠান কর না। শুধু রবীন্দ্রনাথের পূজার গান গেয়ে আমার অন্ধকার যাত্রাপথকে আলোয় ভরে দিও।

মৃতের শয্যার পাশে দিব্য আর কনককান্তিকে নিয়ে বসেছিল কৃষ্ণকলি। মায়ের কাছে বার বার যে গানটি শুনতে চাইত মামাবাবু, সেই গানটিই আজ মৃত্যুপথযাত্রীর মুক্ত আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করল সে।

'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার রয়েছে দাঁড়ায়ে।'

পাঁচ

হেমন্তের এক বিষণ্ণ বিকেলে ঘরে বসে আনমনে একটা গানের কলি ভাঁজছিল কৃষ্ণকলি। বেলের আওয়াজ পেয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কেমন যেন উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে রইল দিব্য।

সত্যি, ভয় পেয়ে গেল, কৃষ্ণকলি।

কি হয়েছে তোমার? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো।

দিব্য কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। বলল, আমার সঙ্গে এখন কি একটু বেরোতে পারবে?'

আর কোনও প্রশ্ন করল না কৃষ্ণকলি। সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিব্যর পেছনে পেছনে গাড়িতে এসে উঠল।

গাড়ি ধরল গঙ্গার পথ।

কারও মুখে কোনও কথা নেই।

একসময় ওরা এসে পৌঁছল। সেই পরিচিত রেস্তোরাঁ — 'স্কুপ'-এ। সময়টাও অদ্ভুতভাবে মিলে গিয়েছিল।

কি নেব বল?

যা খুশি, একটু কিছু নিয়ে নাও।

দুটো আইসক্রিম নিয়ে ওপরে উঠে গেল দুজনে।

পাশাপাশি গঙ্গার দিকে মুখ করে দুজনে বসল দুটো চেয়ারে।

পড়ন্ত বিকেলের সোনা ঝলকাচ্ছিল গঙ্গার তরঙ্গে। নৌকোগুলো আনাগোনা করছে।

কৃষ্ণকলি বলল, — হঠাৎ এমন করে ডাকলে যে?

আজ তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। আমি একা সে সব কথার ভার বইতে পারছি না। কথাগুলোর সঙ্গে আমার মতো তুমিও জড়িয়ে রয়েছ কৃষ্ণা।

অবাক চোখে দিব্যের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণকলি বলল. তাই! বল তোমার কথা।

কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি। তোমার বাড়িতে আসার আগে পর্যন্ত আমি কোনপথে সমস্যার সমাধান হতে পারে তাই ভেবেছি। এখন তোমার একটি কথার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।

সমস্যায় জর্জরিত দিব্য আবেগ তাড়িত হয়ে বলে যাচ্ছে তার কথাগুলো আর নিরুদ্বিগ্ন শ্রোতা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে আসল কথাটি শোনার জন্য।

কৃষ্ণকলি চিরদিনই এমনি শান্ত, স্থিরবুদ্ধির মেয়ে। সে দিব্যের কথার উত্তরে বলল, আমি আসল সমস্যাটি যে কি, তাই এতক্ষণ জানতে পারলাম না।

তাহলে শুরু থেকেই বলি শোন। তোমার সবকিছু বুঝতে সুবিধে হবে।

কাল বেলা দশটা নাগাদ সুচেতনার বাবা ব্রজকিশোর আঙ্কেল বহুকাল পরে আমার বাড়িতে এসে হাজির।

দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলে ঢুকেছেন। নীচ থেকে ডাক পাড়ছেন, বৌঠান, বৌঠান।

পাশের ঘর থেকে মা এসে বলল, ব্রজ ঠাকুরপোর গলা শুনছি, যা, ওপরে নিয়ে আয়।

আমি ওঁকে ওপরে নিয়ে এলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, তোমার এম.এ-র রেজাল্ট শুনে ভীষণ খুশি হয়েছি। সুচেতনার মুখে শুনলাম, বছর দশেকের রেকর্ড তুমি ব্রেক করেছ।

আমি চুপ করেছিলাম, কোনও উত্তর দিইনি।

ওপরে উঠে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন কি করবে ভেবেছ?

কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়মগুলো মেনে একটা চাকরি যোগাড় করতে হবে। এদিকে রিসার্চ করার ইচ্ছে আছে।

তুমি দেখছি দাদার মতো খেয়ালী। নিজের এত বড় বুক বিজনেসটা থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলে।

বিজনেস তো মা দেখছেন।

আমরা আর কতদিন। তোমাদেরই তো এরপর সব দেখতে হবে বাবা। এখন থেকে সব কিছু দেখে বুঝে নিলে ভাল হত।

আমাকে আর উত্তর খুঁজতে হল না, মা এসে গেল। আমি কাজের অছিলায় পায়ে পায়ে সরে গেলাম। এই নীতিহীন ব্যবসায়ী মানুষটা চিরদিনই আমার না-পছন্দ।

কৃষ্ণকলি আইসক্রিমের প্লেট থেকে চামচটা তুলে নিয়ে বলল, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, ওটা গলতে শুরু করেছে। ততক্ষণ তোমার ব্রজ আঙ্কেল আর মা জরুরী কথা সেরে নিন।

কৃষ্ণকলির এই হালকা মন্তব্যে দিব্যর কোনও রকম ভাবান্তর দেখা গেল না। সে গম্ভীর মুখ করে আইসক্রিম তুলে খেতে লাগল। একবারও মুখ তুলে তাকাল না কৃষ্ণকলির দিকে।

নিজের আইসক্রিম খেতে খেতে কৃষ্ণকলি আড়চোখে তাকাতে লাগল দিব্যের দিকে।

অন্য দিনগুলোতে পাশাপাশি বসে কোনকিছু খাবার সময় এঁটো প্লেট, দিব্য বদলে নেবেই। আজ কিন্তু তার অন্য ভাব। কোন রকমে যেন কবিরাজী চ্যবনপ্রাশের মতো দ্রুত চেঁটে শেষ করে ফেলল আইসক্রিমের প্লেটটা।

পাশের ঘাটে নৌ-বিহারের জন্য উঠেছে। সম্ভবত একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। গলুইয়ের পাটাতনে ওপর তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা আর ঘন ঘন চোখে চোখে চেয়ে থাকার ভঙ্গীতে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটা শনাক্ত করা যাচ্ছিল।

কৃষ্ণকলি দিব্যর মনের গুমোট ভাবটা কাটাবার জন্য বলল, যাবে নাকি নৌকোয়?

আমি ভীষণ বিভ্রান্ত কৃষ্ণা, আমার কথাগুলো দয়া করে শোন।

এবার কৃষ্ণা সত্যিই সিরিয়াস হল। দিব্যের দিকে গভীর বড় বড় দুটো চোখ মেলে বলল, বল।

সোজাসুজি বলল দিব্য, তুমি কদিনের ভেতর তোমার বাড়িটার বিলি ব্যবস্থা করে আমার সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে পারবে কি?

কৃষ্ণকলি বেশ উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কি হয়েছে আমাকে খুলে বল দিব্য।

আগে বল, তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারবে কিনা?

কেন পারব না, নিশ্চয়ই পারব। তবু জানতে চাইছি, কেন?

এবার সোজাসুজি বলল দিব্য, মিঃ ব্রজকিশোর চৌধুরী তাঁর ওই রূপবতী মেয়েটিকে সাম্রাজ্য সহ আমার হাতে সমপর্ণ করতে চান। তিনি নাকি এরপর বানপ্রস্থ নেবেন।

মাসীমা কি চান?

তুমি অবাক হবে, আমার সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শ না করেই মা কথা দিয়েছে।

তাহলে তুমি এত বিচলিত হচ্ছে কেন দিব্য? মাসীমা ধীর স্থির বিবেচক মানুষ। তিনি সব থেকে ভাল বুঝবেন তোমার শুভাশুভ।

স্তব্ধ হয়ে দিব্য তাকিয়ে রইল কৃষ্ণকলির মুখের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমার মুখ থেকে একথা শুনব, ভাবতে পারিনি কৃষ্ণা।

বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠছিল কৃষ্ণকলির। কিন্তু মুখের ওপর সে কষ্টের ছাপ যাতে না পড়ে সেজন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল সে।

এবার বলল, তুমি কি মাকে তোমার মনের কোনও ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলে?

আমি সরাসরি মাকে বলেছিলাম, এ বিয়ে হতে পারে না মা।

তুমি বিশ্বাস করবে না, মায়ের ওই রকম ফর্সা মুখখানায় মুহূর্তে ছায়া ঘনিয়ে উঠল। গম্ভীর গলায় বলল, কেন, জানতে পারি কি?

বললাম, আমি একজনকে ভালবাসি মা।

তুমি কি তাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছ?

না, সে রকম কোনও প্রতিশ্রুতি দিইনি। তবে তাকে বিয়ে করে ঘরে আনব, একথা মনে মনে ভেবে রেখেছি।

আমি কিন্তু অনেক আগে সুচেতনার মাকে কথা দিয়েছিলাম। সে তখন মৃত্যুশয্যায়। সেখানেই খেলা করছিল তিন বছরের সুচেতনা।

ওই ছোট্ট মেয়েটার মা সেদিন আমার হাত ধরে বলেছিল, দিদি আমি তোমার কাছে আমার মেয়েটাকে রেখে যাচ্ছি, তুমি দেখো।

আমি বলেছিলাম, তুমি নিশ্চিন্তে থাক ভাই, তোমার 'শুচি'র সব ভার আমি বইব। তাকে চোখের আড়াল করব না।

তাই ব্রজঠাকুরপোর প্রস্তাবকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি।

মায়ের সব কথা শুনে আমি প্রতিবাদ না করে সরে এসেছি। কাল রাতে ছটফট করেছি বিছানায়, ঘুমুতে পারিনি। আজ ভোর থেকে ঘুরে বেড়িয়েছি ঘরের বাইরে। মনস্থির করে চলে এসেছি তোমার কাছে। নিজেকে ভালভাবে যাচাই করে দেখেছি, তোমাকে আমার জীবন থেকে কোনওভাবেই মুছে ফেলতে পারব না।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলার পর একেবারে নীরব হয়ে গেল দিব্য।

ততক্ষণে বুকের রক্ত ঝরতে শুরু করেছে কৃষ্ণকলির।

এই প্রেমপিয়াসী, মঞ্জরিত শালবৃক্ষের মতো বলিষ্ঠ সবুজ সতেজ যুবকটিকে সে ফেরাবে কী করে। এর স্পর্শে শিহরণ, দৃষ্টিতে সম্মোহন আর ছায়ায় নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।

সমস্ত শুভাশুভ ভাবনা, সমাজ সংসারের চিরাচরিত অনুশাসন মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কৃষ্ণার ভেতর ধীরে ধীরে জেগে উঠল আদিম এক নারী, যে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা দিয়ে বলিষ্ঠ এক পুরুষকে একান্ত কাছে পেতে চায়। কেবল এই মন্ত্রে, বিশ্বাসী, 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব"— শুধু 'তুমি আছ আমি আছি।'

হঠাৎ গঙ্গার প্রবাহে তার চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল। হলুদ একটুকরো আলোর ঝলক ছিটকে এসে লাগল, তার চোখে। অমনি ছড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে চেতনায়। সেই শুদ্ধ আলো সমস্ত অন্তর জুড়ে জেগে রইল মাতৃমমতার মত।

মুহূর্তে কি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেল তার মধ্যে। এক জননী জন্ম নিল কৃষ্ণকলির সুপ্ত সত্তা থেকে। তার সমস্ত হৃদয় যেন বিদীর্ণ হতে লাগল সন্তান বিচ্ছেদে।

চোখে জল। দুটো হাত দিয়ে কৃষ্ণকলির চেপে ধরল দিব্যের একটি হাত।

আমি পারব না দিব্য, তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারব না। এক মায়ের কাছ থেকে তার ছেলেকে টেনে নিয়ে যেতে পারব না। একদিন যখন আমাদের দেহের তীব্র আকর্ষণ অনেকটাই শিথিল হয়ে আসবে তখন আমি জানি, মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের স্মৃতি তোমার ভেতর একটা অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলবে। আমিও সেই সঙ্গে তোমার চোখে ম্লান হয়ে যাব। আমাকে তুমি ক্ষমা কর দিব্য। আমি তোমার বিচ্ছেদের দুঃখ বইতে পারব, কিন্তু প্রচ্ছন্ন সামান্যতম উপেক্ষা সইতে পারব না।

জায়গাটি ভারি মনোরম। নির্জন নির্বাস। একটি ঢালু, সবুজ পাহাড়ের গায়ে খানিকটা জায়গা নিয়ে ছোট্ট একটা গোল কুঠি। কাচ আর কাঠের কারিগরি। কয়েক পা দূরে আর একটি কুঠি। দুটো কুঠির মাঝে মরসুমি ফুলের একচিলতে গোলাকার বেড। তার মাঝখানে দীর্ঘ সরল পত্রবহুল দুটো পাইন গাছ দাঁড়িয়ে।

কাছাকাছি মাথা তুলে আছে আরও কয়েকটা টিলা পাহাড়। পেছনে আর একটা পাহাড় উঠে গেছে সবুজ পাইন অরণ্য বুকে নিয়ে।

পাইন বনের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একটা গীর্জার চূড়ো। কখনো চোখে পড়ে সাদা পোশাকে একদল ফাদার হাতে বাইবেল নিয়ে বনের উঁচু নিচু পথ ধবে চলেছেন চার্চের দিকে। ঢেউয়ের ওঠাপড়ার মত সে যাত্রা ভারি দৃষ্টিনন্দন।

অদূরে কাঞ্চনজঙঘার শুভ্র শৃঙ্গগুলি সকাল সন্ধ্যায় রঙের খেলায় মাতে।

খেলায় মাতে আরও একজন। সে মাঝে মাঝে বাঁশি বাজিয়ে ঝম্‌ঝম্, হুস্ হুস্ আওয়াজ তুলে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কতক্ষণ লুকোচুরি খেলা দেখিয়ে যায়। এটি দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত খেলনা গাড়ি।

এই গাড়িতে চেপে প্রতি শনিবার গোলকুঠিতে আসেন এক মহিলা। কখনো কখনো রঙীন ছাতা মাথায় দিয়ে তাঁকে পাহাড়ি ওম্ পথ ধবে উঠে আসতে দেখা যায়। শনি, রবি কুঠিতে থেকে সোমবার, শিলিগুড়িতে নেমে যান। সেখানে কোন একটি নার্সারি স্কুলে চাকরি করেন।

মাঝে মাঝে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন নানা রঙের পোশাক পরা ফুলের মত মিষ্টি একদল মেয়েকে। তারা সারাদিন নাচে গায়, পিকনিক করে আর পাইন বনের ভেতর আলো ছায়া গায়ে মেখে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায়।

এ অঞ্চলে একটি রেডিও স্টেশান আছে। মহিলা মাঝে মাঝে ওখানে প্রোগ্রাম করেন। ওঁর গানের গলাটি অপূর্ব।

শুরু হয়েছে বর্ষা ঋতু। মেঘের ঘনঘটায় বিদ্যুতের চমকে, অঝোর বর্ষায় প্রকৃতি উত্তাল। ভাবুকের ভাবনাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাদল হাওয়ায়। কবির ভাষায় — "হৃদয় গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে। রসের ধরো বরষে।"

এমন দিনে প্রোগ্রাম পড়েছে গানের। ঠিক সময়ে রেডিও স্টেশনে হাজির হতে হবে। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে বর্ষার জল গড়িয়ে চলেছে প্লাবনের মতো।

উপায় নেই, গোলঘর থেকে ওয়াটার প্রুফ গায়ে চড়িয়ে ছাতা মাথায় পথে নামলেন সেই মহিলা।

সকাল দশটায় রেকর্ডিং। রেডিও স্টেশনে পৌঁছে স্টুডিওতে ঢুকে গেলেন। বাতানুকুল কাচের ঘর, চারদিক বন্ধ। গলায় দরদ ঢেলে গায়িকা গাইলেন বর্ষার গান। ভাব-সুর-নিবেদন যেন ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলে গেল।

এমন সঘন শ্রাবণ প্রাতে বন্ধুকে যে একান্ত করে পেতে চায় মন।

প্রেমিকার হৃদয়ের এই আকুতি যেন বাদল হাওয়ায় সারা প্রকৃতি জুড়ে ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল।

রেকর্ডিং শেষ হলে স্টুডিও থেকে করিডোরে বেরিয়ে এলেন মহিলা। বাইরে তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল বেয়ারা।

সে বলল, ওপরে প্রোগ্রাম একজিকিউটিভের ঘরে স্যার আছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন গায়িকা। প্রোগ্রাম এগজিকিউটিভ অনিমেষবাবু তাঁর অনেকদিনের চেনা। কিন্তু হঠাৎ ডাক পড়ল কেন!

তিন নম্বর ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে গেলেন মহিলা।

এত বিস্মিত বুঝি জীবনে কখনও তিনি হননি। অপলক দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন প্রোগ্রাম এগজিকিউটিভের মুখের দিকে।

মৃদু মৃদু হাসছিল দিব্য, কি দাঁড়িয়ে রইলে যে, বসো।

তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি কৃষ্ণকলির। বলল, তুমি! আমি ভাবতেই পারছি না!

কয়েকদিন হল এখানকার চার্জ নিয়ে এসেছি। কি হল, এখনও দাঁড়িয়ে রইলে যে।

মুখোমুখি চেয়ারে বসল কৃষ্ণকলি।

তোমাদের আজকের প্রোগ্রামগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিঃ সোম: আমি রেকর্ডিং রুমের মিউজিক শুনছিলাম। হঠাৎ বর্ষার গান ভেসে এল। এ যে ভারি চেনা গলা। বহুযুগের ওপার থেকে যেন ভেসে আসছে সেই সুর, সেই দরদ, সেই নিবেদন।

প্রোগ্রামের কাগজটা টেনে নিয়ে দেখলাম, যা ভেবেছিলাম তাই — তোমারি নাম লেখা।

কৃষ্ণকলি বলল, এখানে কোথায় উঠেছ?

একটু দূরেই আমাব কোয়ার্টার।

তোমার ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে এসেছ তো?

না, আমি একাই এসেছি। তুমি কোথায় রয়েছে?

সেন্ট মেরী হিলস-এ আমার একটা ছোট্ট কটেজ আছে। ডাও হিলের পাইন ফরেস্ট যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখানেই আমার গোলকুঠি ঘর। পারলে যে কোনো একটা রোববার চলে এসো।

রেকর্ডিং-এর জন্যে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিল কৃষ্ণকলি, সেদিনই ফিরে গেল শিলিগুড়ি। বাড়ির কেয়ারটেকার সুখিয়া তামাং তাঁকে স্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল। প্রতিবারই তার চলে যাওয়ার সময় এই পাহাড়ি মেয়েটি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে যায়।

কৃষ্ণকলি চলে যাওয়াব ঠিক পরের দিন দিব্য, ঘুরতে ঘুরতে গোলকুঠিতে এসে হাজির হল। মেঘভাঙা একটা আলো এসে পড়ছিল গোলকুঠির গায়ে। সেই আলো যেন গড়িয়ে এসে লেগেছিল মরসুমী ফুলের বেড়ে। ফুলগুলো খুশিতে দুলছিল, ঝলমল করছিল বেডের সবুজ গালচে।

পায়ে পায়ে দুটো পাইন গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল দিব্য। কেউ কোথাও নেই! হঠাৎ একটি পাহাড়ি মেয়ে কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এলো।

ফোলা ফোলা চেরাচোখে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে তাকাল দিব্যর দিকে। মুখে বলল, বাবুজি, কাউকে খুঁজছেন?

আচ্ছা, এখানে কৃষ্ণকলি বসু বলে কেউ থাকেন?

হাঁ বাবুজী, এ কোঠি তো তাঁরই।

তিনি কোথায়? তাঁকে খবর দাও, তাঁর এক পরিচিত মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

তিনি তো এখন নেই বাবুজী।

কোথায় গেছেন?

শিলিগুড়ি।

শিলিগুড়ি!

হাঁ, ওখানেই তো মেমসাব ইস্কুলে কাজ করেন। শনি, রোববার এলে দেখা হবে। আপনি ভেতরে আসুন।

দিব্যর হঠাৎ মনে পড়ল, কৃষ্ণকলি তাকে যে কোনও একটা রোববার আসতে বলেছিল।

তুমি কি এখানে থাক?

হাঁ, আমিই তো মেমসাহেবের সব কিছু দেখাশোনা করি।

বলতে বলতে মেয়েটি পাশের কুঠির দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের দাওয়ায় একটা চেয়ার পেতে দিয়ে বলল, বাবুজি, এখানে বসুন। আমি একটু চা করে আনি আপনার জন্য।

ভেতরে, চলে গেল সুখিয়া।

বাড়িটা ঘুরে দেখতে লাগল দিব্য। পশ্চিমের একটা জানালা দিয়ে ঘবের ভেতর আলো এসে পড়েছিল। হঠাৎ সেই আলোয় সে দেখল বিছানার ওপরে শুয়ে আছে একটি মানুষ।

অতি পরিচ্ছন্ন বিছানা। কিন্তু মানুষটি জরাজীর্ণ। বাঁ হাতখানায় কপাল আর চোখ ঢেকে রেখেছে। ঘুমিয়ে অথবা জেগে আছে বোঝা যাচ্ছে না।

এক কাপ চা নিয়ে এল সেই পাহাড়ি মেয়েটি।

চা-টা হাতে নিয়ে দিব্য জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোমার?

সুখিয়া বাবুজি।

বাঃ! বেশ মিষ্টি নাম তো।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, সুখিয়ার মুখ। মাথা নিচু করে বলল, মেমসাবও ওই কথাটা বলেন।

আচ্ছা, এই ঘরে কি কেউ থাকেন?

হাঁ, এক বাবু থাকেন, বহুৎ বিমার, হাঁটাচলা করতে পারেন না। আমাকে ওনার সব দেখতে হয়।

উনি কি তোমার মেমসাহেবের কোনও আত্মীয়?

বন্ধু আছেন।

কি ভেবে নিয়ে বলল, বাবুসাহেব, আপনি কি আলাপ করবেন? সারাদিন উনি একা বিছানায় পড়ে থাকেন, মানুষজন দেখলে ভারি খুশি হন।

ঠিক আছে, চল।

হঠাৎ দিব্যর মনে হল, কৃষ্ণকলির বন্ধু, কে হতে পারে।

ভাবতে ভাবতে সুখিয়ার পেছনে ঘরে ঢুকল।

সুখিয়া গায়ে হাত দিয়ে আস্তে নাড়া দিতেই কপাল থেকে হাতটা খসে পড়ল।

বিস্ময়ে চমকে উঠল দিব্য, কল্কি!

কল্কিও তাকিয়েছিল দিব্যর মুখের দিকে। তাকে বাঁ হাত নেড়ে বসতে বলল!

বিছানার পাশে চেয়ারটা টেনে বসল দিব্য।

কতদিন পরে দু-বন্ধুর দেখা। কত কথা হল।

কল্কি শেষে বলল, কৃষ্ণকলি না থাকলে আমি কবেই শেষ হয়ে যেতাম। ওই আমাকে কলকাতা থেকে এখানে এনে তুলেছে।

কল্কিকে দেখে দিব্যর মনে পড়ে গেল ওর বাবার পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহটার কথা। এমন একটি প্রাণবন্ত যুবকের এমন পরিণতি!

আহত মন নিয়ে সেদিন দিব্য ফিরে গেল তার কোয়ার্টারে।

যথারীতি কৃষ্ণকলি শনিবার শিলিগুড়ি থেকে এসে পৌঁছল তার পাহাড়ি আস্তানায়।

সুখিয়া খুশি খুশি মুখে বলল, জানো মেমসাব, এক সোন্দর মতন বাবু এসেছিলেন। দাদাবাবুর সঙ্গে বহুৎ সময় গল্প করে গেলেন।

কে হতে পারে! তাহলে কি দিব্য এসেছিল? ভাবতে ভাবতে কল্কির ঘয়ে ঢুকল কৃষ্ণকলি।

কল্কি ওকে দেখেই বলল, দারুণ খবর আছে রে।

কী রকম?

একজন এসেছিল, কে বল তো?

দিব্য?

তুই জানলি কি করে?

তোমাকে বলা হয়নি কনকদা, সেদিন রেডিও স্টেশনে দিব্যর সঙ্গে দেখা। খুব তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে ছুটেছিলাম, তাই ওর কথা বলতে পারিনি। ও রোববার আসবে বলে গেছে। কৃষ্ণকলি বলল, দেখে কেমন লাগল?

চাকরি নিয়ে এখানে এসেছে, কেমন যেন বিমর্ষ দেখলাম।

কেন বল তো?

আমি সুচেতনার কথা জানতে চেয়েছিলাম, ও বলল, ওর প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও।

জানিস, আমার মনে হল, ও যেন কিছু একটা লুকোচ্ছে। আমিও আর জোর করে জানতে চাইলাম না।

পরের দিন রোববার দিব্যর আসার কথা। মনে মনে ভাবল কৃষ্ণকলি দিব্যকে দুপুরে খাইয়ে তবে ছাড়বে। সুখিয়াকে নিয়ে ও কিছু বাজার হাট করল। সেদিন সে নিজেই রান্না ঘরে ঢুকল।

রান্না করতে করতে ভাবল, কে যেন চুপি চুপি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক যেমনটি দিব্য এসে দাঁড়াত তার কলকাতার বাড়িতে রান্নার সময়। মাঝে মাঝে রান্না চেখে দেখত সে।

বাইরে পায়ের সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল কৃষ্ণকলি। দেখল, দিব্য এসে দাঁড়িয়েছে।

ও বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে।

এস, ঘরের ভেতরে এস।

কি করছিলে?

রান্না। আমার এক বন্ধু আসবে, তাকে খাওয়াব বলে নিজের হাতে বাঁধছি।

বেশ গন্ধ বেরিয়েছে। নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুটি বেশ ভোজনরসিক।

তা আর বলতে। তুমি কিন্তু আজ এখানেই খাবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওরা দুজনে বেরোল ডাও হিলের দিকে। কথা বলতে বলতে ওবা ঢুকে পড়ল পাইন বনের ভেতর।

ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে, বনের আলোছায়া গায়ে মেখে ওরা একটা মসৃণ শিলার ওপর পাশাপাশি বসল।

এখানে পাইন বনটা বেশ নিবিড়। দুজনে কোনও কথা না বলে নীরবতাকে কিছুক্ষণ অনুভব করল।

প্রথম কথা বলল দিব্য, তুমি ঘর বাঁধলে না কেন কৃষ্ণা?

তুমি সুখে আছ তো?

চুপ করে বসে রইল দিব্য, কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

কৃষ্ণকলি বলল, সুচেতনাদি কেমন কেমন আছে? তোমার সংসারে নতুন অতিথি আসেনি?

ও সব কথা থাক কৃষ্ণা।

তোমার কি বলতে কোনও বাধা আছে?

না, বাধা থাকবে কেন, তবে তোমার শুনতে ভাল লাগবে না।

তা হোক, তুমি বল।

সুচেতনা তার মতো আছে কৃষ্ণকলি। তবে দেহে মনে তাব সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

একটু থেমে আবার দিব্য বলল, তুমি জান, চিরদিনই সুচেতনা নিজের খেয়ালে পথ চলে। সে পথটা শুভও নয়, মসৃণও নয়। সব কিছু জেনেও আমি তাকে কোনদিনই বাধা দিইনি। কারণ, বারণ করলেই তার জেদ, উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে যাবে। পার্টি, মদ, বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না।

সংসার জীবন তার জন্যে নয়। কোনওদিন সে ফিরছে মাঝরাত পার করে আবার কোনওদিন বা রাত কাবার হয়ে গেলেও তার দেখা নেই।

মাসীমা কিছু বলেন না?

মাতাল বউকে টলতে টলতে অসময়ে আসতে দেখলে তার সমস্ত কথা বন্ধ হয়ে যেত।

একদিন আমার কাছে এসে আমার বিয়ের ব্যাপারে খুব আক্ষেপ করল। শেষে বলল, 'তুই কাকে ভালবাসতিস খোকা, কৃষ্ণাকে?'

বললাম, আজ একথা তুলে কি লাভ মা।

'বড় ভুল করেছি বাবা, সে ভুলের কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই। দুটো জীবনকে আমি নষ্ট করে দিয়েছি।'

শেষ দিন পর্যন্ত মা সেই আক্ষেপ নিয়েই গেছে।

মাসীমা নেই?

একবছর হল মা চলে গেছে। শেষের দিনগুলোতে প্রায় রোজই একবার তোমার কথা বলত। 'কোথায় চলে গেল মেয়েটা, আর দেখা হল না।'

মায়ের কাজের দিনে আমাদের তিক্ততা চরমে উঠল। সেদিন আত্মীয়, অভ্যাগতদের আপ্যায়নের পর এমন একটি ঘটনা ঘটল যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

কি হয়েছিল সেদিন?

সবাই চলে যাওয়ার পর সুচেতনা তার ক্লোজ ফ্রেন্ডদের নিয়ে ঢালাও পানের আসর বসিয়েছিল। আমি সেদিন সেটা সহ্য করতে পারেনি। ওর বন্ধুদের সামনেই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম, তুমি জাহান্নামে যাও আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এই পবিত্র দিনটির শুদ্ধতা নষ্ট কব না।

আমার রুদ্ররূপ দেখে ওর বন্ধুরা ওকে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। ওর চোখ দুটো বিষাক্ত সাপের মতো জ্বলছিল। ফোস্ ফোস্ নিশ্বাসে বেরিয়ে আসছিল হিংস্র নাগিনীর গর্জন।

তুমি অবাক হবে শুনলে, সাতদিন পরে খবর পেয়ে ওকে পুলিশের হেফাজত থেকে বের করে আনি।

ও তখন বিধ্বস্ত। দীঘার ঝাউবনে ঘেরা একটা স্যুইট থেকে ছিন্নভিন্ন বেশে মাতাল অবস্থায় ওকে পাওয়া যায়। আশ্চর্য! তার পরেও কোন অনুশোচনা নেই।

কৃষ্ণকলির সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সে প্রায় রুদ্ধগলায় জানতে চাইল, এখন?

এখন সে তার বাপের বাড়িতেই লীলাকুঞ্জ বানিয়ে নিয়েছে। কাগজে কলমে না হলেও আমি এখন মুক্ত। বড় হাল্‌কা লাগছে নিজেকে। সারাক্ষণ আনন্দে ডুবে থাকি কাজের ভেতর।

আবেগে বেদনায় দিব্যর হাত ধরল কৃষ্ণা। বলল, আমার বড় কষ্ট লাগছে দিব্য।

কেন, কৃষ্ণা, আমি তো এখন পরম সুখী।

তুমি চির আনন্দময় আমি জানি। কিন্তু আমার কষ্ট সুচেতনাদির জন্য।

সুচেতনার জন্য!

হাঁ দিব্য, এত বড় একটা প্রতিভা, এমনভাবে শেষ করে দিচ্ছে নিজেকে। আমি লক্ষ্য করেছি, ও যখন নাচে তখন যোগযুক্ত হয়ে নাচে। মনে হয়, ইন্দ্রসভার দেবনর্তকী। পদবিভঙ্গে, হস্তমুদ্রায়, নয়ন কটাক্ষে কি অনন্য মহিমা তার।

দিব্য বিস্মিত। সে অবাক চোখে চেয়ে রইল কৃষ্ণকলির দিকে। তার মনে হল, এত উদারতা, হৃদয়ের এমন প্রসারতা কি করে সম্ভব হল কৃষ্ণকলির মতো প্রেমে ব্যর্থ এক নারীর মধ্যে।

কিছু সময় দুজনেই নীরব।

একসময় নীরবতা ভেঙে কৃষ্ণকলি বলল, সুচেতনাদি আর নাচের প্রোগ্রাম করেন না?

শুনেছি বাপের বাড়িতে ইদানিং নতুন বই-এর মহড়া চলছে।

এবার খুশির ছোঁয়া লাগল কৃষ্ণার চোখে মুখে। বলল, তাই। 'শাপমোচন' নাকি মঞ্চস্থ হবে রবীন্দ্র সদনে। 'বাগীশ্বরী' নামের একটি সংস্থা এই ড্যান্স ড্রামাটির নাকি প্রযোজক। অরুণেশ্বরের ভূমিকায় শুনেছি, সুমন দত্তগুপ্তের বদলে নামছে নতুন কোন এক নাচিয়ে।

আর কমলিকার ভূমিকায় নিশ্চয়ই সুচেতনাদি।

তাই তো শুনেছি।

তুমি দেখো দিব্য, আমার মন বলছে, এই নৃত্যানুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সুচেতনাদির সব ভুল ভেঙে যাবে। ওর সত্যিকারের শাপমোচন হবে। ও চিনতে পারবে ওর রাজাকে। ও গাইবে :

'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদি মাঝারে।'

দিব্য বলল, এ গান তুমিই একমাত্র গাইতে পারতে হৃদয় উজাড় করে।

না দিব্য এ গান আমার নয়। আমি তোমার চিরদিনের বন্ধু। যেখানে ভালবাসায় স্বার্থের কোনও গন্ধ নেই, শরীরের কোনও সংযোগ নেই। শুধু বন্ধুর জন্য বন্ধুর একান্ত আত্মসমর্পণ, আর পরস্পর কাছে থাকবার এক দুর্বার আকুতি।

অভিভূত দিব্য কৃষ্ণকলির হাত নিজের কোলে তুলে নিয়ে বলল, আমি আমৃত্যু তোমার বন্ধু হয়ে থাকতে চাই কৃষ্ণা।

এর উত্তর গানেই দিল কৃষ্ণকলি :

'চিরসখা ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।
সংসারগহনে নির্ভয় নির্ভর নির্জনসজনে সঙ্গে রহো।।
অধনের হওধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল।
জরাভারাতুরে নবীন করো ওহে সুধাসাগর।।'

কৃষ্ণকলির গানে দ্যুলোক ভূলোক একাকার হয়ে গেল।

গান থামল, কিন্তু গভীর গহন ঐ নির্ভরতার ধ্বনি ভেসে চলল অপরাহ্নের অরণ্যালোক ছাড়িয়ে কাঞ্চনজঙঘা লক্ষ্য করে, যেখানে সূর্যের সোনা শুভ্র তুষার শিখরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ লীলায় লীন হয়ে গেছে।

অগ্নিশুচি

মুহূর্তে কলেজ স্ট্রিট বই পাড়া বিপদের গন্ধ পেল। ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল বুক স্টলগুলোর ঝাঁপ। বড় বড় বইয়ের দোকান শাটার টেনে দিল। ফুটপাথের ওপর কাঠের বাক্সে যারা বই সাজিয়ে বসে, তারা বাক্সের দুপ্রান্ত ধরাধরি করে ছুটল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

প্রেসিডেন্সির দিকে ফুটপাথ জুড়ে যে পুরনো বইয়ের দোকান, তাদের অবস্থা করুণ। বুকে বইয়ের পাঁজা নিয়ে গোটা দুয়েক ছেলে ছুটছে ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে গোডাউনের দিকে। থুতনির ঠেকা দিয়ে প্রাণপণে ঠেকাচ্ছে বইয়ের পতন।

ট্রাম দাঁড়িয়ে, বাস দাঁড়িয়ে, চলচ্ছক্তিহীন।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক বিশেষ পার্টির ছাত্র সংসদ একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। বিষয়টি অভিনব। 'যাঁরা রক্ষক তারাই ভক্ষক'। এই যারা কারা ; তাদের রক্ষকের ছদ্মবেশে ভক্ষকের ভূমিকাটাই বা কিরূপ, এই অতি উপভোগ্য বিষয়টির রহস্য-উদ্ঘাটনের প্রয়াস নিয়েই এই সেমিনারের ব্যবস্থা।

পুলিশ জানতে পেরেছিল, তারাই এই আলোচনার প্রধান টার্গেট। অতএব তিনখানা কালো গাড়িভর্তি পুলিশ পজিসান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তিনটি বিশেষ জায়গায়। পাইথনের ল্যাজা, মুড়ো আর ধড়। আঁকা বাঁকা একটা প্রসেসান মেডিকেল কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি ছুঁয়ে এগিয়ে এসে প্রেসিডেন্সির গেটের কাছে ডানদিকে টার্ন নিয়ে ঢুকে পড়েছে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। স্লোগানহীন নীরব পদযাত্রা। পুলিশের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মেডিকেল কলেজের সামনে। দ্বিতীয়টা প্রেসিডেন্সির গেট বরাবর আর তিন নম্বরটা ইনস্টিটিউটের প্রায় মুখে।

শুচি দাঁড়িয়েছিল প্রেসিডেন্সির গেটের সামনে ফুটপাথের রেলিং ঘেঁষে। কলেজ থেকে বাইরে বেরিয়ে সে প্রসেসান দেখছিল। তখনও তাকে নিয়ে যাবার জন্য বাড়ি থেকে গাড়ি আসেনি।

একটি ছেলে হেঁটে আসছিল ফুটপাথ ধরে। লম্বা, দশাসই চেহারা। শুচির মুখোমুখি এসেই সে থমকে দাঁড়াল। শুচিও অবাক।

অগ্নি!

তুই শুচি না!

কি মনে হচ্ছে?

বছর পাঁচ ছয় তোকে দেখিনি। এরই ভেতর তুই যে একেবারে মিস ইন্ডিয়া হয়ে গেছিস রে।

নিজের চেহারাটা দেখেছিস আয়নায়? একেবারে মিস্টার ইউনিভার্স। তুই মেডিকেলে ঢুকেছিস তো?

এত খবরও রাখিস!

খবরের কাগজে নাম ওঠা ছাত্র। শুধু তাই নয়, দু নম্বরে জ্বলজ্বল করছিল তোর ছবিটা। সেখানেই তো লেখা ছিল তোর ইচ্ছেটাও। তুই ডাক্তারি পড়তে চাস।

তুই?

শুচি প্রেসিডেন্সির দিকে হাত বাড়াল। এখানে বিদেশিনীর হাত ধরে ঢুকে পড়েছি।

বিদ্যাভবনে ইংরেজিতে তোকে আমরা কেউ ডিঙোতে পারিনি।

তখন তো সবে ক্লাস এইট। তুই তো নাইনে উঠেই চলে গেলি আমাদের ছেড়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে।

কি রকম? ও হো-হো-হো-হো, বুঝেছি-বুঝেছি, আশ্রম স্কুলে যাবার কথা বলছিস তো।

এবার দুজনেই হেসে উঠল। শুচি, স্কুলের এক সময়কার বন্ধুর হাত ধরে দোলাতে লাগল। খুশিতে অগ্নির চোখও ছোট হয়ে এল। সে বলে উঠল, সত্যি তোদের ভুলতে পারিনি।

চাপা গলায় শুচি গেয়ে উঠল সেই অবিস্মরণীয় গান—

'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।

ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।'

তারপরে আরও দুলাইন সে মনে মনে গেয়ে নিল, মুখে উচ্চারণ করল না।

'আয় আর একটিবার আয়রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়

মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়।'

বিপুল শব্দে প্রেসিডেন্সি আর ইউনিভার্সিটির মাঝের রাস্তায় কোথাও বোমা ফাটল। কানের পর্দা যেন ফেটে গেল ওই আওয়াজে।

এবার সমস্ত লাইন ভেঙে গেল। ছাত্রেরা ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। তারা পুলিশের চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে লাগল। অমনি ক্ষেপে উঠল পুলিশ। লাফ মেরে বেরিয়ে এল ভ্যানের ভেতর থেকে। লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর। ভিন্ন দলের কিছু ছাত্র তালটাকে ভালভাবে জমিয়ে দিল, আশুতোষ বিল্ডিংয়ের দোতলার ওপর থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। মেঘের আড়ালে থেকে মেঘনাদের মতো করে গেল ক্রমাগত ভাঙা ইটের শিলাবৃষ্টি।

পুলিশের এক হাতে ঢাল, অন্যহাতে লাঠি। বাদ বিচার নেই, প্রায় শুইয়ে দিয়ে চলেছে অস্ত্রহীন অহিংস যোদ্ধাদের।

কাছেই একটা ছেলের কাঁধ লক্ষ্য করে যেই পুলিশ লাঠি তুলেছে অমনি বই ভর্তি ঝোলা ব্যাগখানা শুচির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে পুলিশের ঘাড়ে পড়ল অগ্নি। শুধু ঘাড়ে পড়া নয়, তাকে মাটিতে পেড়ে ফেললে; দুচারটে ঘুষিও চালিয়ে দিলে।

অবাক কাণ্ড! এ রকম অভাবনীয় দৃশ্যে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল আশপাশের পুলিশরা। পরমুহূর্তেই ছুটে এল লাঠি উঁচিয়ে। খালি হাতে একটা ছোঁড়ার এত বড় বেয়াদপি যে অপমানের চূড়ান্ত।

এক ঘা লাঠি পড়তেই ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে অগ্নি বাঁ হাত চেপে আবার বসে পড়ল। কয়েকটা ছেলে ছুটে আসছিল তাকে আড়াল করতে, কিন্তু পুলিশ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যেই অকুস্থলে প্রিজনভ্যান এসে গেছে। দুটো পুলিশ হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে অগ্নিকে সেই ভ্যানের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। ঝোলা ব্যাগটা কাঁধে ঝুলছে, চিৎকার করতে করতে ছুটে এল শুচি। ততক্ষণে ভ্যানের কাছ অবধি ঘসটাতে ঘসটাতে এসেছে অগ্নি। ব্যথায় বেঁকে চুরে গেছে মুখখানা।

শুচি ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের হাত থেকে আচমকা অগ্নিকে টেনে নিল। শক্তিমান দুজন পুলিশের থাবা থেকে শিকার ছিনিয়ে নেওয়া এত সহজ কর্ম ছিল না। মেয়েটা ক্যারাটে জানে নাকি!

তিনটি মেয়ে পুলিশ একটা কালো গাড়ি থেকে ততক্ষণে নেমে পড়েছে রণভূমিতে।

ভয় ভুলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকগুলো হাঁ করে দেখতে লাগল অতি সুন্দরী একটা তরুণী মেয়ের হাতের কসরৎ। ট্রেনিং পাওয়া তিনটি মেয়ে-পুলিশও হেরে যাচ্ছিল তার কাছে। শেষে জনা পাঁচেক পুলিশ মিলে তাকে প্রায় চ্যাং দোলা করে প্রিজন ভ্যানে ঢোকাতে সমর্থ হল।

এ দৃশ্য দেখে উত্তেজিত জনতা ছাত্রদের সঙ্গে মিলে ইটের টুকরো ছুঁড়তে লাগল পুলিশের দিকে। টিনেব চালে শিলাবৃষ্টির আওয়াজেব মত পুলিশের ঢালের ওপর শুরু হয়ে গেল ইটের ঠকঠকাঠক বাদ্যি। সমুদ্রের ঢেউ যেমন তেড়ে আসে আবার পিছিয়ে যায় ঠিক তেমনি পুলিশ আর জনতার খেলা চলল কতক্ষণ।

একসময় গাড়িভর্তি আন্দোলনকারীদের নিয়ে পুলিশরা চলে গেল থানায়। ধীরে ধীরে দুচারটে বইয়ের দোকান ঝাঁপ তুলল, কিন্তু দূরের খদ্দেররা সরে পড়ায় সেদিনের মত ব্যবসা আর জমল না।

লড়াই আর ধস্তাধস্তির সময় শুচির কাঁধ থেকে পড়ে গিয়েছিল অগ্নির বইভর্তি ব্যাগটা। উত্তেজনা আর উত্তপ্ত ঘটনাপ্রবাহে সে ভুলে গিয়েছিল তার কথা।

থানায় আন্দোলনকারী ছেলেদের সঙ্গে শুচিকে রাখা হয়নি। সে এক চিলতে একটা ঘরে বেঞ্চের ওপর বসেছিল। মেয়ে পুলিশদের ভেতর একজন এসে তার ঝোলা ব্যাগটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, চল।

কোথায়?—বলে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল শুচি।

মেয়ে পুলিশটি রূঢ় গলায় বলল, গেলেই টের পাবে।

মেয়েটির পেছন পেছন শুচি এসে ঢুকল, ও সি-র ঘরে। ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই মেয়ে পুলিশটি চলে গেল।

ও সি ভদ্রলোকটি মধ্যবয়সী বলে মনে হল। তিনি একটা ফাইল থেকে মুখ তুলে শুচির দিকে তাকালেন।

অবাক ও সি। এমন কমনীয় সৌন্দর্যেভরা আর্য-মুখশ্রী তিনি তাঁর এত বছর জীবনকালের মধ্যে আর দ্বিতীয়টি দেখেননি। এই মেয়ে কি কৌশলে তিন তিনটি মহিলা পুলিশকে নাস্তানাবুদ করল তা তিনি ভেবেও পেলেন না।

কি নাম?

শুচি বেদজ্ঞ।

থাক কোথায়?

শুচি ঠিকানা বলল।

ও সি-র চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তিনি এবার গলা নামিয়ে বললেন, গার্জেন?

শুচি বাবার নামটা উচ্চারণ করতেই ও সি উল্টোদিকের চেয়ারে শুচিকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, কি মুশকিল, তুমি যে হোম ডিপার্টমেন্টের বেদজ্ঞ সাহেবের মেয়ে তা তো ওরা আমাকে জানায়নি। ওদেরকে মনে হয় তুমি কিছু বলনি।

শুচি মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলল, আপনি কি মনে করেন আমার কাজের জন্য আমি আমার বাবাকে টেনে আনব?

এত অল্প বয়সে তোমার এ ধরনের ভাবনার জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না. দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

শুচি ও সি-র উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসল।

তুমি ক্যারাটে শিখলে কোথায়?

আমি কিন্তু ক্যারাটে জানিনা। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েই মা-বাবার সঙ্গে দু'সপ্তাহ কেরালায় বেড়াতে যাই। সেখানে কালারিতে গিয়ে দেখি গুরুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা আর আক্রমণের নানারকম প্যাঁচ শিখছে ছেলেরা। বাবার উৎসাহ পেয়ে আমিও কদিনে কিছু শিখে নিলাম গুরুজির কাছ থেকে।

তুমি নিশ্চয় শুটিং জান?

ওটা মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। মা তখন সিমলায় পোস্টেড। গরমের ছুটি পড়লেই আমি মায়ের কাছে চলে যেতাম। ওখানেই আমার শুটিং শেখা।

শুনেছি, তোমার মাও আই এ এস। উনি বাইরে কোথায় সার্ভিসে আছেন?

এইচ পি গভর্নমেন্টের সার্ভিসে।

কিছু মনে কর না মাদার, আর একটা প্রশ্ন, কৌতূহলও বলতে পার।

বলুন আঙ্কেল।

তোমার মা কি হিমাচল প্রদেশের মেয়ে?

হ্যাঁ, খোদ কিন্নরেই আমার মামার বাড়ি।

মুখে বললেন ও সি—তাই!

মনে মনে বললেন, তাই তুমি এতখানি রূপ নিয়ে জন্মেছ!

ঝংকার দিয়ে বেজে উঠল ও সি-র টেলিফোন।

হ্যালো।

ইয়েস, ও সি স্পিকিং।

ওপার থেকে মনে হল টেলিফোনটা আর কেউ ধরলেন। ও সি হঠাৎ সিধে হয়ে বসলেন, হ্যাঁ স্যার, মিস বেদজ্ঞ আমার সামনেই রয়েছেন। একটু থেমে ওপারের প্রশ্নের জবাবে বললেন, না, না একটা প্রসেসানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ গোলমাল শুরু হলে ভুল করে কয়েকজনের সঙ্গে ওঁকেও তুলে আনা হয়েছে। আমি এখুনি গাড়ি করে পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার।

ওপার থেকে কিছু নির্দেশ এল।

ও সি বললেন, ঠিক আছে স্যার, কথা বলুন আপনি।

ফোনটা এবার শুচির হাতে ধরিয়ে দিলেন ও সি।

বাপি।

ওপার থেকে বেদজ্ঞ সাহেব তাঁর কন্যাকে কি বললেন তা বোঝা গেল না। এপারে শুচি বলল, বাড়ি ফিরে তোমাকে সব বলব। গোপালদা কলেজে আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছে নিশ্চয়ই। আমি এখান থেকে বাসে করে চলে যাব।

না, না আবার ওকে এতখানি পথ দৌড় করাবে কেন? ...ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, পাঠাও। আমি বসে আছি।

টেলিফোন যথাস্থানে নামিয়ে রেখে ও সি বললেন, দেখলে তো, বাবার অনুমান কতখানি সঠিক।

শুচি বলল, বাবার কাছে আমার রুটিনের একটা জেরক্স কপি আছে। কোনদিন কটাতে আমার ছুটি তা বাবার জানা। সেইমত আমাদের ড্রাইভার গোপালদা গাড়ি নিয়ে কলেজে চলে আসে। বাবা যেখানে থাকুক, একবার কোয়ার্টারে ফোন করে জেনে নেয়, আমি পৌঁছেছি কিনা। আজ কলেজ স্ট্রিটে গোলমাল, গোপালদা খালি গাড়ি নিয়ে পৌঁছেছে, অথচ আমার হদিস নেই, তাই যথাস্থানে ফোন এসে গেছে।

ও সি হাসলেন। শুচির মুখেও স্বাভাবিক একটা হাসির উদ্ভাস।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল শুচির, অগ্নির ব্যাগটা ঝুলছে তারই কাঁধে। সে ব্যাগটা হাতড়ে একখানা মোটা বই টেনে বের করল।

ও সি কপট কৌতুকে বলে উঠলেন আর ডি এক্স প্যাকেট নয় তো? অথবা টাইম বোমাটোমা?

শুচির হাসিতে জলতরঙ্গ বেজে উঠল। সে বইখানার মলাট উল্টে বলল, গ্রে সাহেবের অ্যানাটমি। সঙ্গে সঙ্গে সে অগ্নির ঠিকানাটাও বইয়ের পাতায় দেখে নিল।

অ্যানাটমি! তুমি মেডিকেল স্টুডেন্ট?

আমি নই, আমার বন্ধু, এই বই ভর্তি ব্যাগটাই তার।

তোমার জিম্মায় বন্ধুর ব্যাগ, কি ব্যাপার?

সে একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যাবার সময় আমার হাতে ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে যায়।

কি রকম অন্যায়?

প্রসেসান ভাঙতে গিয়ে আপনাদের পুলিশ একটি নিরীহ ছাত্রের ওপর লাঠি চার্জ করতে যাচ্ছিল। আমরা প্রেসিডেন্সির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। ও ব্যাগটা আমার হাতে তুলে দিয়েই পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পেছনের পুলিস লাঠি মেরে ওর হাতটাই বুঝি ভেঙে দিয়েছে। সে সময় একটা প্রিজন ভ্যান এসে ওদের কজনকে তুলে নিল। ও কিন্তু প্রসেসানে ছিল না। তাই আমি ওকে টেনে ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিলাম।

তাই তুমিও প্রসেসানে না গিয়ে জালে জড়িয়ে পড়লে।

ঠিক তাই।

তুমি কোথায় পড়?

প্রেসিডেন্সিতে।

বন্ধুটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র?

হ্যাঁ। জানেন, আমরা বিদ্যাভবনে ক্লাশ এইটে একসঙ্গে পড়তাম। তারপর ছ'বছর পরে আজই হঠাৎ দেখা। দুজনে গল্প করছিলাম, হঠাৎ কেমন করে যেন জড়িয়ে পড়লাম।

বন্ধুটিও এখানে এসেছে নিশ্চয়, কি নাম?

অগ্নি চৌধুরি।

ও সি-র বাঁ হাতখানা টেবিলের ওপর পড়েছিল, হঠাৎ হাতের পাতাটা সাপের ফণার মত আকার ধরল।

কি নাম বললে, অগ্নি চৌধুরি?

কেন, আপনি ওকে চেনেন নাকি?

হা হা করে হেসে উঠলেন ও সি। বললেন, চিনি মানে। আমাকে চিনে নিতে হয়নি, এক একজন আছে যারা নিজেকে চিনিয়ে দিতে জানে। তোমার বন্ধুটি সেই গোত্রের।

অগ্নি তাহলে আপনার পূর্ব পরিচিত বলুন?

অবশ্যই। ওর সঙ্গে দেখা আমার একাধিকবার হয়েছে। বলতে পার আমি ওর অ্যাডমায়ারার।

কি রকম?

কে ওর নাম রেখেছিল জানি না, কিন্তু তাঁকে সত্যি বাহবা দিতে হয়। ওর ভেতরে সত্যিকারের আগুন আছে। আমি জানি, অন্যায় দেখলেই ওর ভেতর দপ করে আগুনটা জ্বলে ওঠে।

আর একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন আঙ্কেল?

পুলিশের কাজ হল শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন। চোর জোচ্চোর, খুনি ডাকাতের হাত থেকে সৎ মানুষের ধন সম্পদ, মান প্রাণ বাঁচান। কিন্তু ওগুলো এখন নীতির ভাষা হয়ে গেছে, বাস্তবে আমূল বদলে গেছে আগেকার সামজিক ধ্যানধারণা। চোর পুলিশের এখন বহুক্ষেত্রে হোলি অ্যালায়েন্স।

আঙ্কেল, আপনি নিজে পুলিশের একজন পদস্থ অফিসার হয়ে একথা বলছেন।

না, পুলিশের অফিসার হিসেবে এ কথা আমি বলতে পারি না। তবে একজন মোটামুটি সৎ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলছি।

এইসব নোংরামোর ভেতর আপনাদের মত মানুষ থাকেন কি করে?

হাসলেন ও সি। বললেন, প্লেগ মারাত্মক রোগ বলে কি সিস্টার নিবেদিতা নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছিলেন? না, মাদার টেরিজা গলিত কুষ্ঠ রোগীদের দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন?

শুচি বলল, নিশ্চয়ই নয়।

তোমার বাবার মত একজন সৎ অফিসার হোম ডিপার্টমেন্টের ওপরে রয়েছেন, তাই আমাদের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্ভয়ে, মান মর্যাদা নিয়ে কাজ করে যেতে পারছি। উনি কখনও তাবড় তাবড় পলিটিক্যাল লিডারদের অন্যায় আদেশ পালনের জন্য নিজের বিবেককে বিসর্জন দেননি। অবশ্য কতদিন এভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন জানি না। পুলিশ যদি ওপরওলার আদেশে সারা দেশজুড়ে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাহলে ওঁদের মত পরিচ্ছন্ন চরিত্রের মানুষ কি করে টিকবেন ভেবে পাই না।

অল্প সময় চুপ করে থেকে বললেন, এই দেখ, কি কথায় কোথায় চলে গেলাম। হচ্ছিল তোমার বন্ধু অগ্নির কথা, তাই না?

শুচি মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

ওর সঙ্গে প্রথম দেখা আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটা লরির কেসে। ওভারলোড নিয়ে নাকি মোড় পেরিয়ে সরে পড়ছিল। পুলিশ আটকাল। তাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে লাগল পুলিশ। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু খানিক পরেই দুজনের একজন এসে লরির সঙ্গে শুরু করল দরদাম।

শুচি বলল, তার মানে ঘুষের টাকা নিয়ে দর কষাকষি?

তাই।

তারপর?

তোমার বন্ধু অগ্নি যাচ্ছিল লরির গা ঘেঁষে ফুটপাথ দিয়ে। সে ড্রাইভার আর পুলিশের টাকা নিয়ে টানাপোড়েনের ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছিল লরির ফাঁক দিয়ে। ওরা কিন্তু অগ্নিকে দেখতে পায়নি।

অবশেষে একটা রফা হয়ে ড্রাইভার যেইটাকা বের করে দিতে গেছে, অমনি চেঁচিয়ে উঠল অগ্নি, খবরদার দেবে না।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল অগ্নি।

লরির ড্রাইভারকে বলল, বে-আইনি কিছু আছে তোমার লরিতে?

না স্যার।

তবে অতিরিক্ত মাল নিশ্চয় বইছ?

একেবারে নয় স্যার।

তবে ঘুষ দিতে যাচ্ছিলে কেন?

লরির ড্রাইভার পুলিশের সামনে সত্যি কথাটা বলতে পারছিল না। ওই এতটুকু বয়সের ছেলে বাঘের মত গর্জন করে উঠল, কেন ঘুষ দিচ্ছ? আজ্ঞে না হলে লরি আটকে যাবে, সময়ে পৌঁছতে না পারলে আমাদের বেবাক ক্ষতি। ক'টা টাকা দিলে যদি এত বড় ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়—তাই...।

ট্রাফিক পুলিশটি এতক্ষণে সজাগ হয়ে গেছে। সে চোখ রাঙিয়ে বলল, আপনি কে মশাই? এটা আইনের ব্যাপার। আমি ফাইন নিচ্ছিলাম।

রসিদ নেই, কিচ্ছু নেই, করকরে টাকাটা হাতিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন, বেমালুম বলে দিলেন ফাইন নিচ্ছেন।

যান, যান আমাদের কাজ করতে দিন, বলেই পুলিশটি সুড়সুড় করে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওই লরিটা নিয়ে থানায় এসে হাজির শ্রীমান অগ্নি চৌধুরি।

জান মাদার, সব ঘটনাটা মোড়ের পানের দোকানি পরে আমাকে সবিস্তারে জানিয়েছিল। ও আমার বিশ্বস্ত ইনফর্মার।

অগ্নি আপনাকে কি বলেছিল?

পুরোপুরি ঘটনাটি বলে ট্রাফিক পুলিশ দুজনের শাস্তি চেয়েছিল।

আমি বাইরে গিয়ে লরিওলার কাছ থেকে একই ইনফর্মেশন পেলাম। মাপজোক করে দেখলাম সে অতিরিক্ত মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। তাকে বললাম, এ এরিয়াতে কোনও দিন কোনও অসুবিধায় পড়লে তুমি সিধে চলে আসবে আমার কাছে। অন্যায় না হলে তোমার সময় নষ্ট করার জন্যে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করব।

এই হল তোমার বন্ধু ইন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার।

শুচি ততক্ষণে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সে বলল, আঙ্কেল, আপনার অনেক কাজ, তবু অগ্নির সঙ্গে আপনার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের কথাটা যদি বলেন সংক্ষেপে।

অন্যায় দেখলে ওর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। শিয়ালদহ ফ্লাইওভার যেখানে হ্যারিসন রোডের মুখটায় এসে মিশেছে সেখানে অটোগুলো রাস্তাটাকে একেবারে জ্যাম করে রাখে। ওইটুকু পথ ক্রস করতে গাড়িগুলোর ভারি অসুবিধে হয়। দু-চারদিন বাসে আসার সময় বেশ খানিকক্ষণ ওখানে আটকে পড়েছিল সে। যাত্রীরা বলাবলি করছিল, ওই অটো-রিকশাগুলোর কাছ থেকে পুলিশ ঘুষ নেয়, তাই ওরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

অগ্নি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, নামুন তো মশাই, নামুন, ওদের একবার দেখে নিই।

বিশেষ কেউ ঝুঁকি নিয়ে নামতে চাইল না। ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। সবাই কিন্তু ওই গাড়ির ভেতর বসেই অটোগুলোর মুণ্ডপাত করতে লাগল, অগ্নি ছাড়া একজনও নিচে নেমে এল না।

হঠাও, হঠাও বলতে বলতে অগ্নি দু-চারটে অটোকে রাস্তার একেবারে প্রান্তে ঠেলে দিল।

এখন ট্রাফিক-পুলিশ নীরব দর্শক। অটোওয়ালারা প্রথম বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কী ঘটতে

চলেছে। তারপর যেই বুঝল একটা মাত্র ছেলে তাদের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য হম্বিতম্বি করছে তখন সবাই একজোট হয়ে রে রে করে তেড়ে এল।

সেদিন তোমার বন্ধু যত মার দিয়েছে তার চতুর্গুণ মার খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়েছিল রাস্তায়। আমার কাছে খবর আসতেই আমি গাড়ি ভর্তি পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা ওকে থানায় তুলেও এনেছিল।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওকে আমি ছেড়ে দিই। যাওয়ার সময় বলেছিলাম, ওগুলো ঘুঘুর বাসা, পুলিশ থেকে পলিটিকাল লিডার সবার মদতেই ওসব চলছে। ওকে ভাঙতে গেলেই নিজের মাথা ভাঙবে।

ও কি বলল জান? একজন মানুষকেও যদি আমি সঙ্গে না পাই তাহলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার লড়াই থামবে না।

শুচি বলল, সত্যি ওর কথা যত শুনছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।

গাড়ি এসে গেল।

ব্যাগটা ও সি-র কাছে গচ্ছিত রেখে শুচি বলল, আঙ্কেল, অনুগ্রহ করে ওটা আমার বন্ধুকে দিয়ে দেবেন। তবে, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।

বল কি জানতে চাও?

ওরা ছাড়া পাবে তো?

নিশ্চিন্তে থাকতে পার, তবে নিয়মমাফিক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ আর রিপোর্ট লিখে ছেড়ে দেওয়া হবে। এজন্যে কিছুটা সময় লাগবে।

কি মনে করে শুচি বলল, ওর ব্যাগটা বরং আমাকে দিন, ওর বাড়িতে ওটা আমি পৌঁছে দেব।

অ্যানাটমি বইয়ের থেকে ঠিকানাটা আগেই পেয়ে গিয়েছিল শুচি। গাড়িতে বসেই ড্রাইভার গোপালদাকে বলল, রুবি হসপিটালের একটু আগে গাড়িটা রেখ গোপালদা। আমি 'নন্দনলোক' অ্যাপার্টমেন্টে আমার বন্ধুর ব্যাগটা দিয়ে আসব।

সল্টলেক থেকে কলেজে আসা যাওয়ার পথে অ্যাপার্টমেন্টটা মনে হল সে দেখেছে। প্রায় কাছাকাছি এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল শুচি। পাশের একটা দোকানে জিজ্ঞেস করে সে সঠিক হদিশটা পেয়ে গেল।

হালকা গোলাপি শালোয়ার কামিজ পরে মনে হল এক দীর্ঘাঙ্গী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। শুচি খুশি হল বাড়ির সুশ্রী চেহারাখানা দেখে। সে খোলা গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। দরোয়ানজি সম্ভবত কাছে পিঠে কোথাও গিয়ে থাকবে।

ঠিকানায় লেখা আছে, সেকেন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট নাম্বার টু। শুচি উঠে গেল তিনতলায়। ডান দিকে দু'নম্বর ফ্ল্যাট লেখাই আছে। সে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বেল বাজাল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বাজাল। কিন্তু দরজা খুলতে কিংবা আই-হোল নাড়াচাড়া করতে কাউকে দেখা গেল না। শুচি দরজার দিকে এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল, লক সিস্টেমের দরজা। নিশ্চয় বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করে ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা কাজে বেরিয়ে গেছে।

শুচি সামান্য সময় দরজার দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে থেকে যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখল পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা একটি মেয়ে ওপরে উঠে আসছে।

শুচির কাছে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। শুচির থেকে বছর দুয়েক বড়ই হবে। কেমন যেন ভুটিয়া, ভুটিয়া মুখের গড়ন। হনু দুটো একটু উঁচু, সরু চেরা চোখ, ঝকঝকে সোনার মত রঙ।

শুচিকে দেখে মেয়েটি যেন অবাক হয়েছে, এমনি গলায় বলল, আপনি!

আমার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে এসেছিলাম একটুখানি প্রয়োজনে, কিন্তু এসে দেখি ফ্ল্যাট বন্ধ।

আপনি কি তিনতলায় অগ্নির ফ্ল্যাটে এসেছিলেন?

এবার অবাক হওয়ার পালা শুচির। কারণ পাঁচতলা বাড়ির কমন সিঁড়ি। কিছুটা নেমে আসার পর মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাই তার জানার কথা নয়, শুচি কোন ফ্ল্যাটে কার খোঁজে এসেছিল।

শুচি মাথা নেড়ে জানাল, প্রশ্নকর্ত্রীর অনুমান ঠিক। কিন্তু তার মুখ থেকে বিস্ময়ের ভাবটি মুছে গেল না।

এবার মেয়েটি বলল, চলুন আমার সঙ্গে।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে শুচি আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলতে খুলতে মেয়েটি বলল, আমরা তিনটি প্রাণী এই ফ্ল্যাটে থাকি। মায়ের সঙ্গে দু'ভাইবোন।

দরজা খুলে গেল।

আসুন, আসুন, বলতে বলতে মেয়েটি ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। প্রথমে বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিল। এখন ঘরের ভেতর শেষ বিকেলের রোদটুকু খেলা করছে।

ঘর ছিমছাম, পর্দা সুরুচিসম্মত। তবে বসার ঘরে কৌচ সোফার বাহুল্য নেই, কয়েকখানা চেয়ার পাতা একটা মাঝারি ধরনের টেবিলের চারদিকে। বসুন ভাই।

শুচি একটা চেয়ারে বসল।

মেয়েটি এবার একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, বলুন তো, আমি কি করে বললাম, আপনি অগ্নির খোঁজে এসেছেন?

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুচি।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আপনার কাঁধে অগ্নির ব্যাগটা দেখেছিলাম তাই।

শুচি বলল, অগ্নির ফিরতে একটু দেরি হবে। আমার কাছে ওর ব্যাগটা থেকে গিয়েছিল, তাই ওর ঠিকানা খুঁজে দিতে এলাম।

মেয়েটি বলল, আমি পাশেই রুবি হসপিটালে কাজ করি। ওর ঘরে ফেরার সময়গুলো মোটামুটি আমি জানি। ঠিক ওই সময়গুলোতে ওকে খাবার দিতে আমি চলে আসি। মেডিকেল কলেজের কাজ সেরে মার ফিরতে সেই রাত নটা হয়ে যায়। এই দ্যাখ, তোমার নামটাই এতক্ষণ আমার জানা হয়নি, আমি সুজাতা।

আমি শুচি।

তোমার নাম কিন্তু কোনও দিন আমি ভায়ের মুখে শুনিনি।

ক্লাশ এইটে একসঙ্গে পড়তাম বিদ্যাভবনে, তারপর প্রায় ছ'বছর ছাড়াছাড়ি। এতদিন পরে আজই ওর সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল। আমার হাতে ওর ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে ও একটু কাজে জড়িয়ে গেল। এদিকে আমার ঘরে ফেরার গাড়ি আসতেই আমি উঠে পড়েছি। বইয়ের ভেতরে ওর ঠিকানাটা পেয়ে সিধে চলে এসেছি এখানে।

সুজাতা বলল, ও নিশ্চয় কোনও মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছে।

আপনি জানলেন কি করে?

মৃদু হেসে সুজাতা বলল, ও আমার ভাই, এক রক্ত বইছে শরীরে, ওকে আমি চিনব না। আসল ব্যাপার কি বলত?

একটা প্রসেসনে নিরীহ একজন ছাত্রের ওপর পুলিশকে লাঠি তুলতে দেখে ও আমার হাতে ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পুলিশও তাকে প্রিজন-ভ্যানে তুলে নিয়ে থানায় চলে গেল।

সুজাতা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, এই দ্যাখো তো, থানায় আবার মারধর না খায়।

আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, আমি থানা থেকেই আসছি।

একটু থেমে আবার বলল, ও সি খুব ভাল মানুষ। উনি আমাকে কথা দিয়েছেন, ছেলেদের রিপোর্ট লিখে নেবার পর ছেড়ে দেবেন।

তোমাকেও কি সেখানে যেতে হয়েছিল?

শুচি চোখ ছোট করে মৃদু হাসল।

সুজাতা বলল, বুঝেছি, স্কুলের বন্ধুর ওপর ভালবাসার টান এড়াতে পারনি।

সামান্য সময় চুপ করে থেকে সুজাতা আবার বলল, এতটুকু অন্যায় কোথায় দেখলে ও স্থির থাকতে পারে না। কারও সাহায্য পাক বা না পাক, ও ঝাঁপিয়ে পড়বেই। এই করে ক'বার তো হাত-পা ভেঙেছে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি যন্ত্রণায়, মা আর আমি জেগে বসে সেবা করেছি। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে ভাই, মা কিন্তু কোনও দিনই এসব কাজে ওকে বাধা দেয়নি।

শুচি বলল, ও শুধু পড়াশোনাতেই ভাল নয়, ওর মনের জোর অসাধারণ। একটু থেমে শুচি আবার বলল, আমার ঘরে ফেরার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, বাবা চিন্তা করবেন, আজ আমি উঠি দিদি।

তুমি কিছু খেয়ে যাবে না ভাই, অগ্নির জন্যে তো খাবার তৈরিই আছে।

শুচি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ নয়, আর একদিন তোমার হাতে খেয়ে যাব দিদি, সেদিন অনেক গল্প করা যাবে। তুমি কিছু ভেব না, ও এখুনি এসে যাবে তোমার খাবার খাওয়ার জন্যে।

শুচি বাধা দিলেও সুজাতা তার সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত নেমে এল। হাত ধরে বলল, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগল ভাই। ছুটির দিনে এলে মায়ের সঙ্গেও তোমার দেখা হয়ে যাবে। মা খুব খুশিই হবে।

মাসিমা মেডিকেল কলেজে...।

হ্যাঁ, মা ওখানকার সিনিয়ার নার্স।

শুচি গাড়িতে উঠে বসল। এরই ভেতর কখন সে সুজাতার আপনজন হয়ে গেছে।

সল্টলেকের কোয়ার্টারে পৌঁছে শুচি পিসিমণির মুখ থেকে শুনল, ইতিমধ্যে বাবার দু-বার ফোন এসে গেছে।

সত্যিই বাবার সময়ের কী হিসেব। থানা থেকে সল্টলেকে পৌঁছতে কত সময় লাগে তা তার নখদর্পণে।

বাবার বড়দিদি অল্পবয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতেই চলে আসেন। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর এতদিন ভাইকেই আগলে আছেন।

বেদজ্ঞ পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল বেনারস। তিন পুরুষ আগে তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন। তাই মণীশ বেদজ্ঞ নিজেকে পুরোপুরি বাঙালি বলেই পরিচয় দেন। তাঁর বাবার আমল থেকেই পরিবারে হিন্দি বলার চল নেই। পুরোপুরি বাংলা ভাষাভাষি।

পিসি খাবার নিয়ে এসে খেতে দিল। পাশের চেয়ারে বসে বলল, তুই মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে এত দেরি করিস কেন বলতো? তোর বাবা ফোন করলে আমি কাঁহাতক বানিয়ে কথা বলি।

শুচি পিসির গা ছুঁয়ে দিয়ে বলল, তুমি আমাকে কত ভালবাস পিসি, সব দিক থেকে আড়াল করে রাখ। তবে এইটুকু জেনে রেখো, তোমার শুচি কখনও এমন কাজ করবে না যাতে তোমাদের কোনও অসম্মান হয়।

সে আমি জানিরে পাগলি। তোর মা আর তোকে কতটুকু নিজের কাছে রেখেছে, তুই তো এই বুকেই মানুষ হয়েছিস। ছোটবেলা তোর বাবাকে হাত ধরে ইস্কুলে নিয়ে গেছি। বড় হয়ে ও রাত জেগে পড়ে পরীক্ষা দিত। আমি সারারাত জাগতাম। ওর পাশে আমি না থাকলে ওর পড়াই হত না। এখন ভাই বড় হয়ে গেছে, তাই তোকে আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। আমার আর নিষ্কৃতি নেই।

শুচি বলল, তোমাকে পাশে দেখতে না পেলে আমি বাঁচবই না।

খুব হয়েছে, থামত।

ফোন বাজল, পিসি উঠে গেল।

কান খাড়া হল শুচির। নিশ্চয়ই বাবার ফোন।

হ্যালো।

হ্যাঁরে, এসে গেছে।

ওপার থেকে মণীশ বললেন, এত দেরি কেন?

এপার থেকে পিসির উত্তর শুধু শোনা গেল, তোদের রাস্তায় যা ভিড় না, কি করে তোদের ট্রাফিক পুলিশ?

ওপার থেকে কি যেন বললেন মণীশ।

হ্যাঁরে, আজকাল বাইপাসেও জ্যাম হচ্ছে। খালি তো শুনি অ্যাক্সিডেন্ট আর ভাঙচুর। দুর্গা দুর্গা, মেয়েটা যে ঘরে পৌঁছেছে, এই যথেষ্ট। মুখখানা একেবারে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ক্ষিদে তেষ্টায় অস্থির। তুই ফোন রাখ।

ফোন ছেড়ে দিল পিসি।

শুচি পিসির দিকে হাত বাড়িয়ে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল—

বাঁচালে তুমি মোরে
ভালবাসারই দায়ে...।

পিসি আক্ষেপের সুরে বলল, তোর জ্বালায় বুড়ো বয়সে মিথ্যে বলতে বলতে আমার পরকালটাও গেল।

শুচি বলল, আমিই তো তোমার ইহকাল পরকাল পিসি।

তুই থামবি।

শুচি উঠে দাঁড়িয়ে পিসির কোমর জড়িয়ে ধরে একপাক ঘুরে নিল।

সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে পিতাপুত্রী মুখোমুখি।

মিঃ সোমের সঙ্গে তোর আলাপ হল?

কে বাপি?

ও সি রত্নেশ্বর সোম।

খু-উ-ব ভাল মানুষ। কথাবার্তায় চমৎকার। আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করলেন।

এমনও তো হতে পারে, আমার মেয়ে বলে তোকে একটু অন্য চোখে দেখেছে।

তা হয়ত হতে পারে, কিন্তু অন্য একটি আহত ছেলে সম্বন্ধে উনি দারুণ প্রশংসা করলেন।

কি রকম?

প্রসেসানে একটা ছেলেকে অন্যায়ভাবে পুলিশ লাঠি চার্জ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মেডিকেল কলেজের একটি ছেলে পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অমনি আর একজন পুলিশ পেছন থেকে তার ওপর লাঠি চার্জ করে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। ছেলেটিকে আমি চিনতে পারি। আমরা বিদ্যাভবনে ক্লাস এইট পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছিলাম। তারপর ও নরেন্দ্রপুরে চলে যায়। তোমার হয়তো মনে পড়বে বাবা, আমাদের সময় হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করা যে কটি ছেলের ইন্টারভিউ নিচ্ছিল দূরদর্শন, তাদের ভেতর অন্যতম ছেলেটি হল অগ্নি। তুমি আমাকে বলেছিলে, এই ছেলেটি সব থেকে ভাল ইন্টারভিউ দিল।

মণীশ বেদজ্ঞ বললেন, খুব মনে পড়ছে। পরের দিন খবরের কাগজেও ওর ছবি বেরিয়েছিল, আমিই তো তোকে দেখালাম রে।

শুচি বলল, ওকে যখন প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছিল, আমি তখন ওকে ছাড়িয়ে আনার জন্য টানাটানি করি। পুলিশ তাই আমাকেও তুলে দেয় প্রিজন ভ্যানে। সেখানে ও সি-র ঘরে যাবার পর হঠাৎ তোমার ফোন এল। রত্নেশ্বর সোম তার আগেই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছিলেন আমি তোমার মেয়ে। কথায় কথায় আমার বন্ধু অগ্নির কথা উঠতেই উনি তার একরাশ প্রশংসা করলেন। তিন চারবার অগ্নির সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছে। সবসময়েই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ও ধরা পড়েছে। প্রধানত পুলিশের অন্যায় দেখলেই নাকি ও ক্ষেপে ওঠে। ওর মতে অধিকাংশ পুলিশ আকণ্ঠ ডুবে আছে দুর্নীতির পাঁকে। বেশ কিছু পুলিশ সুযোগ বুঝে রুলিং পার্টির দাস হয়ে যায়।

মণীশ বেদজ্ঞ বললেন, ওর কথা সম্পূর্ণ মিথ্যে একথা আমি বলব না, তবে এমন বিবেকবান

পুলিশও আছেন যাঁদের দেখলে ওর উগ্র মনোভাবটার কিছু পরিবর্তন হ'তে পারে। যেমন ও সি রত্নেশ্বর সোম।

শুচি অমনি বলে উঠল, আমার বাপিও কোনও দিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে না।

হেসে উঠলেন বেদজ্ঞ সাহেব। বললেন, সবেতেই বাপিকে টানিস কেন?

কারণ, আমার বাপি সেন্ট পার্সেন্ট খাঁটি একজন মানুষ বলে। বিবেকের বাইরে একটি কাজও তাকে দিয়ে কোনওদিন ওপরওলা করিয়ে নিতে পারেনি বলে।

এবার মেয়ের কাছে রত্নেশ্বর সোমের একটি কীর্তির কথা উল্লেখ করলেন মিঃ বেদজ্ঞ।

শুরু করলেন এইভাবে—বছর পাঁচেক আগে কলকাতা বইমেলায় আমার সঙ্গে গিয়েছিলি, মনে আছে?

আমি তো প্রতিবছরই যাই।

না না, আমার সঙ্গে যেবার গিয়েছিলি।

ও, সেই যেবার 'সোনা' বুক কোম্পানির স্টলটাকে রাজহাঁসের আকারে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম?

শুধু তাই নয়, রাজহাঁসের দুটো পাখায় আর বডিতে ছিল চমৎকার বেতের কাজ।

মনে পড়ছে বাবা, যাঁরা দেখছিলেন তাঁরা খুব তারিফ করছিলেন।

ওটার মূলে যে মানুষটি ছিলেন তিনি রত্নেশ্বর সোম।

বিস্ময় শুচির স্বরে, কি রকম? উনি নিজে তৈরি করেছিলেন?

না না নিজের হাতে নয়, ওঁর একটা ছেলের দল আছে, তারাই তৈরি করেছিল।

ওঁর আবার ছেলের দল, কোথায় ছিল বাপি? উনি কি কোনও ক্লাবের প্রেসিডেন্ট?

তা বলতে পারিস, তবে সে এক বিচিত্র ক্লাব। মিঃ সোমই তার প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক। মেম্বারদের উনিই রিক্রুট করে এনেছেন।

রিক্রুট করে এনেছেন? কেন, কেউ স্বেচ্ছায় সভ্য হতে চাইলে হতে পারবে না? এ কি পুলিশ ক্লাব কিংবা অফিসার্স ক্লাব নাকি?

প্রায় তেমনি একটা কিছু।

শুচি বলল, ওই বিশেষ ক্লাবের মেম্বার কারা হতে পারে?

চোর ছ্যাঁচোড়, পকেটমার কিংবা সমাজবিরোধীরা।

সে কি! চোখ কপালে উঠল শুচির। তুমি নিশ্চয়ই মজা করছ বাপি।

একেবারেই না। এক ঝাঁক ওই শ্রেণীর বদ যুবককে একবার পাকড়াও করে এনেছিলেন সোম। তাদের কাছে একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। হয়, মার খেয়ে জেলে পচে মর, নয়তো আমার তৈরি ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাও। একজন বুকে সাহস সঞ্চয় করে বলল, মেম্বার হলে কি হবে স্যার।

সোম বললেন, পাঁকে পদ্ম ফুটবে।

আর একজন বলল, বুঝলাম না স্যার, যদি একটু খোলসা করে বলেন।

টিভি, টিভি দেখিস?

সকলেই এবার বলে উঠল, হ্যাঁ স্যার।

রামায়ণ দেখেছিস।

হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ সার—প্রায় কোলাহল পড়ে গেল থানার ভেতর।

রামায়ণ বইটা কার লেখা?

সব চুপ।

রত্নাকরের নাম জানিস?

একজন বলল, পাড়ার ঠাকুমার মুখে এরকম একটা নাম শুনেছিলাম। লোকটা নাকি ডাকসাইটে একটা ডাকাত ছিল।

তারপর তার কি হল?

আর কিছু জানি না স্যার। জেলেটেলে যেতে পারে।

ক্ষেপে গিয়ে সোম নাকি চেঁচিয়ে উঠেছিলান, তোর মুণ্ডু।

ওরা ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল। তখন সোম রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি মুনিতে রূপান্তর এবং রামায়ণের মত মহাকাব্য রচনার কাহিনী বলেছিলেন।

ওদের চোখে মুখে বিস্ময়ের ছবি দেখে সোম আবার বলেছিলেন, তোরাও ওসব বদভ্যাস ছেড়ে দিলে অনেক ভাল কাজ করতে পারবি।

টাকা পয়সা পাব কি করে স্যার?

সে ভার আমার। আমি যা বলব তা করতে পারলে তোদের টাকা পয়সার ভাবনা থাকবে না।

ওরা এক কথায় রাজি হয়ে গেল। সোম এক জাঁদরেল লোককে ধরে ওদের থাকার একটা জায়গা সংগ্রহ করলেন। নিজের পয়সায় খাইয়ে পরিয়ে ওদের বেতের কাজ শেখালেন। শেষে ওদের কয়েকজনকে হায়দরাবাদের দিকে পাঠিয়ে উন্নততর বেতের কাজ শিখিয়ে আনলেন। ওরা এখন বেতের কাজ করে হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে। ওদের স্বভাবই একদম পাল্টে গেছে।

শুচি বিস্ময় ভরা চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, আশ্চর্য!

মণীশ বেদজ্ঞ বললেন, আমরা কেবল পুলিশের অপরাধটাই দেখি, কিন্তু নানান বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে ওদের কর্তব্যনিষ্ঠার ছবিটা দেখতে পাই না। অবশ্য মিঃ সোমের মত বিশাল হৃদয়ের একটি মানুষকে পুলিশ বিভাগে দেখতে পাওয়া সত্যিই এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

শুচি আবেগভরা গলায় বলল, সোম আঙ্কেল সম্বন্ধে আগে এত কথা জানলে আমি ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আসতাম।

মণীশ বেদজ্ঞ বললেন, আমার সঙ্গে মিঃ সোমের সম্পর্ক উঁচু নিচু পদাধিকারীর নয়, ভালবাসার।

শুচি বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি নিজে ভাল আর নিরহঙ্কার বলে এমন একটা কথা বলতে পারলে।

মণীশ বেদজ্ঞ মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য একটি প্রসঙ্গে চলে গেলেন, সামনে তো লম্বা ছুটি, চল না ঘুরে আসি তোর মায়ের কাছ থেকে।

আমি বার তিনেক গরমের ছুটিতে সিমলা গেছি বাপি। একবার কিন্নরে মামার বাড়িও ঘুরে এসেছি। এবার আর গরমে নয়, গেলে পুজোর ছুটিতেই যাব।

মণীশ, গলায় কিছুটা আক্ষেপের সুর তুলে বললেন, তখন তো আমার ছুটি থাকবে না।

কেন, আমি কি একা মাকে দেখতে যেতে পারি না? তুমি আমাকে কি ভাব বাপি, আমি কি এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিনি? সেই ইস্কুলে পড়া মেয়েটি বলে ভাব নাকি তুমি আমাকে?

মণীশ হেসে বললেন, তা কেন রে। তুই যে এখন অনেক বড় হয়ে গেছিস। তা কে না জানে। তবে আমি যাচ্ছি, তাই ভেবেছিলাম তোকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাই তোর মার কাছে।

শুচি বলল, এবার তোমরা দুজনে খুব ঘুরে ঘুরে এনজয় কর. পুজোর ছুটিতে একা আমি যাব।

মণীশ বললেন, ঠিক আছে, আমি মেয়েদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তোমার ভাবনায় তোমার স্বাধীনভাবে চলাফেরায় আমি বাধা দেব না। তবে তোমার মা কাছে নেই, তাই খানিকটা দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়েছে।

তুমি নিশ্চিন্তে থেক বাপি। আমি কখনও ভুলিনি আমি বেদজ্ঞ পরিবারের মেয়ে। আমার মা আর বাপিই আমার আদর্শ। এমন কোনও কাজই আমি করব না যাতে তাঁদের সম্মানহানি হয়।

মণীশ মেয়ের মুখখানা দুহাতে চেপে ধরে বললেন, তোকে নিয়েই আমাদের আনন্দ আর গর্ব মা।

মণীশ বেদজ্ঞের জীবনটা আর পাঁচজনের থেকে খানিকটা আলাদা। পড়াশোনায় ভাল ছাত্র ছিল, তাই বোর্ড আর কলেজের পরীক্ষাগুলোতে স্কলারশিপ ছিল তার বাঁধা।

বিজ্ঞানে ভাল ছাত্র ছিল মণীশ, কিন্তু বাবার আদেশে তাকে পড়তে হয়েছিল আর্টস। বংশধারায় সংস্কৃত চর্চাটা অক্ষয় থাক, এটাই ছিল মণীশের বাবার ঐকান্তিক বাসনা।

বাবার অবাধ্য হবার কথা সে কল্পনাও করতে পারত না। আর্টসে ইংরেজি অনার্স নিয়ে সে রেকর্ড মার্কস পেল। তারপর বাবারই নির্দেশে আই এ এস পরীক্ষায় বসল।

বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। পুলিশের অকথ্য অত্যাচারের শিকার ছিলেন তিনি। তবু কেন যে তিনি তাঁর ছেলেকে শাসকের ভূমিকায় দেখতে চাইলেন তা সবার কাছেই অজ্ঞাত থেকে গেল।

হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, ওই ডিপার্টমেন্টে যত সাহসী আর ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ আসবে, ততই দেশের মঙ্গল।

মণীশ বেদজ্ঞের বাবা কিন্তু পুত্রের শেষ সাফল্যের খবর পাবার আগেই মারা গিয়েছিলেন।

পিতৃভক্ত পুত্র কিন্তু বাবার শেষ ইচ্ছাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন।

পরের দিন শুচি কলেজ যাওয়ার পথে গাড়ি নিয়ে নন্দনলোকে হাজিব। গাড়ি থেকে নেমেই সে তাকাল বাড়িটার দিকে।

ওই তো দোতলার বারান্দায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে অগ্নি। পাশের খোলা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট হয়ে কী যেন দেখছে। তার দিকে চোখই পড়েনি।

শুচি এই প্রথম খোলা গায়ে অগ্নিকে দেখল। সুঠাম, সুন্দর এক তরুণ যুবক। ও পায়ে পায়ে দোতলায় উঠে গেল। বেল দিয়ে আর অপেক্ষা করতে হল না। দরজা খুলে গেল।

শুচি ঠিক বুঝল অগ্নির মা এসে দাঁড়িয়েছেন, অগ্নির সঙ্গে মুখের আদলে মিল আছে।

তুমি কি শুচি?

শুচি এগিয়ে গিয়ে অগ্নির মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল।

এস মা, বস।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্নি, অগ্নি বলে ডাক দিলেন।

বারান্দা থেকে একটা ঘর পেরিয়ে অগ্নির আবির্ভাব।

বিস্ময় চোখে মুখে, তুই!

শুচির উল্টো প্রশ্ন, তোর কলেজ নেই নাকি?

আজ ফার্স্ট পিরিয়ড হবে না বলেই শুনে এসেছি।

শুচি মাথা নেড়ে বলল, শোনা কথায় বিশ্বাস করিস কেন? এক পিরিয়ড বসে থাকলে কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু ক্লাসটা যদি হয়, তাহলে তুই খুব মিস করবি।

অগ্নির মা বললেন, দেখলি তো কেমন বুঝদার মেয়ে।

অগ্নি চেঁচিয়ে উঠল, আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি, এর ভেতরে আমি কি করে রেডি হব? স্নান, খাওয়া কিছুই হয়নি।

শুচি বলল, তুই নম নম করে সব সেরে নে আমি ঠিক তোকে টাইমলি পৌঁছে দেব।

অগ্নি ছিটকে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। শুচি ঘরে বসে শুনতে পেল শাওয়ারের শব্দ।

অগ্নির মা বললেন, তুমিও মা খোকার সঙ্গে বসে দুটি খেয়ে নাও।

আমি খেয়ে এসেছি মাসিমা, আর একদিন এসে খেয়ে যাব।

শুচি বাথরুম থেকে অগ্নিকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বলল, এত তাড়াতাড়ি! কতটুকু জল খরচ করলি রে! তুই যেরকম জলের সাশ্রয় করলি, দেখ কর্পোরেশন না তোকে পুরস্কার দিয়ে বসে।

ও হাসতে হাসতে তোয়ালেতে মাথা ঘষতে ঘষতে আর একটা ঘরে ঢুকে গেল।

একসময় ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, তুই যখন খাবি না তখন আমি রান্নাঘরে বসেই খেয়ে নিচ্ছি।

অগ্নির মা বেরিয়ে এসে শুচির হাতে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটুকু খেয়ে নাও।

প্রায় কুড়ি মিনিটের ভেতর মেডিকেল কলেজের গেটে শুচির গাড়ি অগ্নিকে পৌঁছে দিল।

পরের দিন আবার গাড়ি নিয়ে অগ্নির অ্যাপার্টমেন্টে শুচির আবির্ভাব।

শুচিকে ঘরের দরজা খুলে দিল অগ্নি।

মাসিমা, দিদি এঁরা সব কোথায়?

আজ সব কাজে বেরিয়ে গেছে।

শুচি বলল, তুই কি রেডি?

হ্যাঁ, কিন্তু কেন?

আমার সঙ্গে যাবি।

হঠাৎ বোধহয় অগ্নির মাথাটা গরম হয়ে গেল। সে বলে উঠল, তুই আমাকে কি ভেবেছিস বল তো? বড়লোকের গাড়ি চড়ে রোজ আমি কলেজে যাব?

শুচি কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, তুই এভাবে বলছিস কেন? আমি এ পথ দিয়ে যাই, তাই...।

অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে। জানিস তো, গরিবের ঘোড়া রোগ ভাল নয়। শুচি আর কোনও কথা না বলে ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে নিচে নেমে গেল।

দিন সাতেক পরে মণীশ বেদজ্ঞ ছুটি কাটাতে উড়ে গেলেন হিমাচলপ্রদেশে।

ঠিক দশ দিনের দিন আবার দু বন্ধু মুখোমুখি।

গেট থেকে বেরিয়ে আসছিল শুচি।

ইউনিভার্সিটির দিক থেকে একটা ডাক শুনে সে থমকে দাঁড়াল। হনহন করে পা চালিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছিল অগ্নি। একমুখ নির্মল হাসিতে শুচিকে অভ্যর্থনা জানাল সে।

দে দেখি তোর হাতটা, খুব খেপে গিয়েছিলিস বুঝি।

শুচি হাতটা বাড়িয়ে দিল। সেই হাত ধরে আনন্দে নাড়া দিল অগ্নি।

শুচি বলল, কি রে, আজ বড়লোকের গাড়িতে যাবি নাকি?

যাব, কিন্তু আজ তা হলে আমার বাড়িতে দিদির হাতের টিফিন খেয়ে যেতে হবে। আজ দিদি ফ্রেঞ্চ-টোস্ট খাওয়াবে বলেছে।

গাড়ি এসে থামল নন্দনলোক অ্যাপার্টমেন্টে। দু বন্ধুতে পাশাপাশি পা ফেলে সিঁড়িতে শব্দ তুলে দোতলায় উঠে গেল।

টেবিলে দুজনের খাবার সার্ভ করেই অগ্নির দিদি শুচির দিকে চেয়ে বলল, তোমরা গল্প করতে করতে খাও, আমার তাড়া আছে ভাই, আমি হসপিটালে চললাম।

খেতে খেতে অগ্নি বলল, গরমের ছুটিতে তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?

শুচি বলল, কলকাতায় থেকে গরমের আগুন উপভোগ করব। বাপি কিন্তু ইতিমধ্যেই সিমলায় মায়ের কাছে হাওয়া বদল করতে চলে গেছে।

আমিও দার্জিলিঙে যাচ্ছি রে—সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল অগ্নি।

আনুনাসিক গলায় শুচি বলল, বাব্বাঃ! তোরা সবাই আমাকে একা ফেলে দিয়ে চলে যাবি?

চল না আমার সঙ্গে। কার্শিয়ং-এ আমাদের ছোট্ট একটা বাড়ি আছে, বেশ কয়েক বছর সেখানে যাওয়া হয়নি।

কে দেখাশোনা করে?

একটি পাহাড়ি মেয়েকে মা বাড়িটা দেখার ভার দিয়ে এসেছিল। প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকাও পাঠাতে হয়। এবার ভেবেছি, পৈতৃক বাড়িটা একবার সরেজমিনে দেখে আসি।

শুচি বলল, মা আর দিদি যাবে না?

তাদের দম ফেলার ফুরসুতই নেই। মা বলেছে, তুই বড় হয়েছিস, এবার বাড়িঘর সামলা।

কি মজা রে, দিব্যি একা একা তুই আনন্দে কাটাবি।

বলছি তো, চল না আমার সঙ্গে।

তোর মা কিছু বলবে না? আমার যেতে কোনও আপত্তি নেই। আমার গার্জেন পিসিমণি দিলদরিয়া।

ঠিক আছে, আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলে তোকে জানাব। আমার মাও ভীষণ লিবারেল। ছেলের ওপর বিশ্বাসে অটল।

শুচি অমনি ফুট কাটল, মাসিমা স্বয়ং গঙ্গা, তাই তিনি ভাল করেই জানেন তাঁর পুত্র ভীষ্ম চির ব্রহ্মচারী।

দেখ, ঘাঁটাসনে, আমি এখন অ্যানাটমি পড়ছি।

এবার শুচি আর অগ্নি দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

জানালার ওপারে কার্নিসের ওপর বসে থাকা দুটো পায়রা প্রেমে বিঘ্ন ঘটায় পাখায় শব্দ তুলে উড়ে গেল।

দুই

দার্জিলিঙ মেলে অর্ডিনারি সেকেন্ড ক্লাশে গুঁতিয়ে উঠে পড়ল দুজনে। কামরার একটা কোণে জায়গাও করে নিল তারা। বসতে হল ঠ্যাসাঠেসি। কুছ পরওয়া নেই। উদ্দাম হাওয়ায় এ বয়সটা ওড়ে। নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডারের বাঁধনে এ দিনগুলোকে বেঁধে রাখা যায় না।

যাবার কদিন আগে কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে মিট করেছিল দুজনে।

অগ্নি বলেছিল, রিজার্ভেসান ছাড়া কি তুই যেতে পারবি?

কেন নয়?

দেখ রাগ করিস না। অবস্থাপন্নদের অভ্যেস একটু অন্যরকম হয়।

শুচি বলল, যারাই নিজেদের কারে ঘোরাঘুরি করে তাদের সকলেই যে অলস একথা ভাবলি কী করে? বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাকে কত কাজ করতে হয় তা জানিস?

হেঁসেল সামলাস নাকি রে?

শুচি বলল, দুবেলা জলখাবার তৈরির ভার আমার ওপর। বাবাকে পাশে বসে ব্রেকফাস্ট আর সন্ধ্যার জলখাবার খাওয়ানোর কাজ আমার। পিসিমণির পুজোর যোগাড়, গেস্ট সামলানোর দায় এ সবই এই শর্মার ওপর। তবে ফুল ফোটানো থেকে ঘর সাজানো, এই বড়লোকের বেটির কাজ।

অগ্নি বলল, সাবাস, তাহলে টিকিট কাটার ঝামেলা মিটল।

শুচি সংশোধন করে দিয়ে বলল, বল, রিজার্ভেসনের।

অগ্নি বলল, দ্যাটস রাইট।

সারাটা রাত ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে কাটাল দুজনে। ব্যাগ থেকে ইংরেজি, বাংলা খানকতক ম্যাগাজিন বের করে পাতা উল্টে, ছবি দেখে, কিছু পড়ে না পড়ে, নানা রকম সরস মন্তব্য করে আবার ব্যাগে পুরে দিল। হু হু করে ছুটে চলেছে গাড়ি। ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে যাচ্ছে কতকগুলো স্টেশন। ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে উঠছে প্ল্যাটফর্মের আলোগুলো। কম্পার্টমেন্টের একটা কোণায় জানলার ধারে বসেছে শুচি। আধখানা তোলা কাচের জানলা। গাড়ির গতি ঝড় তুলছে। তাতে গরম হাওয়া কিছুটা নরম হয়ে কম্পার্টমেন্টের ভেতর ঢুকছে।

জানালায় মুণ্ডু ঠেকিয়ে কেশবতী কন্যা অন্ধকারের বুকে চোখ পেতে বসে আছে।

দেখ দেখ, এক ঝাঁক জোনাকি কেমন ঝিকমিক করছে।

ওগুলো বাইরের আলো, গাছপালার ভেতর দিয়ে আসছে বলে ওরকম দেখাচ্ছে।

শুচি তারিফের গলায় বলল, দারুণ চোখ তো তোর।

নিজের মাথায় টোকা দিয়ে অগ্নি বলল, বল, মগজ।

গালের ওপর হাওয়ার ঝাপটায় এসে পড়া এক গোছা চুল বাঁ হাতে সরাতে সরাতে বলল, তুই একটা জিনিয়াস।

তুইও, তবে হতে হতে থেকে গেছিস।

শুচি হাসি ছাড়িয়ে বলল, কেন বলতো?

অগ্নি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, বিধাতার কিচেনে ঘিলুর পাক হচ্ছিল। তখনও পুরো পাকটা

হয়নি, বাইরে থেকে বিশ্বকর্মা হাঁক পাড়লেন, কই হল ঠাকুর? এদিকে যে দুটো অপগণ্ডকে গড়ে পিটে উঠোনে ফেলে রেখেছি। মগজ ঢুকিয়ে দিলেই কাজ শেষ। তুমি তো জান, এক একটা ঘিলু সঠিক জায়গায় সেট করে দিতে কত সময় লাগে।

বিশ্বকর্মার তাড়ায় অস্থির হয়ে ঠাকুর বললেন, এখন কাজ চালাবার মত খানিকটা নাও। একটা শেষ হোক, পরে আর একটার জন্য দেব।

ওই কাঁচা পাকের ঘিলুটাকে নিয়ে বিশ্বকর্মা ভাবলেন, কোনটার মাথায় ঢোকাই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বিধাতার বাক্য, 'লেডিজ ফার্স্ট'। অতএব তোর মগজেই ওই নরম পাকের ঘিলুটা ঢুকল। আমার বেলা কিন্তু ঘিলুর পাক, একদম কড়া।

বলার শেষে একটু থেমে অগ্নি মন্তব্য করল, কি রে ব্যাপারটা বুঝলি? শুচি গালে আঙুল ঠেকিয়ে কাৎ হয়ে বলল, বদ্যি বুড়ো, তুই অ্যাতও জানিস।

উল্টোদিকের একটা সিট থেকে আধাপ্রবীণ এক ভদ্রলোক বললেন, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

শুচি আদুরে গলায় বলল, দার্জিলিং যাবার ইচ্ছে মেসোমশাই।

অনেকে অপরিচিত মানুষদের কাকু অথবা জেঠু বলে। খানিকটা চুল পেকে গেছে যাঁর তিনি বাবার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও জেঠু হয়ে যান। আবার বাবাব থেকে বয়সে কিছু বেশি হয়েও যদি স্মার্ট দেখায় তাহলে কাকু হয়ে যান।

এরকম গোলমেলে ব্যাপারে আঙ্কেল কিংবা মেসোমশাই একদম লাগসই। কারু কিছু মনে করার নেই। বড় ছোটর তফাৎটা ঢাকা পড়ে গেল।

আধপ্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, এ সময় দার্জিলিং বেশ এনজয় করবে। নীচের গরম হাওয়ার হাত থেকে অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য নিষ্কৃতি।

পাশে বসে তাঁর স্ত্রী। বললেন, তোমরা কি পিঠোপিঠি ভাইবোন?

শুচি মিষ্টি হেসে ভদ্রমহিলাকেই প্রশ্ন করে বসল, আপনি কি করে বুঝলেন মাসিমা?

পিঠোপিঠি ভাইবোনেরা এমনি তুই তুকারি কবে।

অগ্নি সোজাসুজি বলল, আমবা ছোটবেলা এক ইস্কুলে একসঙ্গে পডতাম মাসিমা।

একটা বজ্র কীট যেন অগ্নির থাই বিদীর্ণ করে ঢুকে ব্রহ্মতালু ভেদ করে বেরিয়ে গেল। একেই কি বলে রামচিমটি।

সবার অলক্ষ্যে শুচি চিমটি কেটে জানিয়ে দিল, আর যাই হোক, সবকিছু ফাঁস করে দেওয়াটা অগ্নির পাকা মাথার কাজ হচ্ছে না।

অগ্নি এখন চুপ। এবার আসবে নামল কাঁচা মাথার শুচি পরিস্থিতি সামাল দিতে।

সে হেসে বলল, আমার এই পিঠোপিঠি দাদাটা অসুখে ভুগে একবছর পরীক্ষা দিতে পারেনি, তাই ইস্কুলে আমরা একই ক্লাসে পড়তাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, কেমন, ঠিক ধরেছি কিনা?

শুচি বলল, একেবারে সঠিক অনুমান মাসিমা।

উৎসাহিত হয়ে ভদ্রমহিলা আর একটু এগোলেন, আমার মামাতো ভায়ের দুটো ছেলেমেয়েকে এমনি তুই তোকারি করতে শুনেছি।

এবাব সবার চোখের আড়ালে চিমটি কাটা জায়গাটায় হাত বুলিয়ে দিল শুচি।

অগ্নি বলল, এক আধখানা গান যদি কেউ গান, তাহলে গরম হাওয়ার গুমোটটা, কেটে যায়।

কম্পার্টমেন্টেব অনেকে বলে উঠল, তোমরাই গাওনা।

আমাদের গান আপনাদেব ঠিক মনপসন্দ হবে না।

কেন? কেন?

ওসব গবমা গরম হিন্দি ছবির চটুল গান।

কেউ কেউ বলে উঠলেন হয়ে যাক---হয়ে যাক।

অমৃতে কখনো অরুচি হয় না। গান নয়তো, গানামৃতম্। যে যুগে যেমন।

অগ্নি ফিসফিস করে বলল, কিরে কি ধরবি?

তুই বলেছিস, ঠ্যালাটা তুই সমলা।

প্লিজ, প্রেসটিজ পাংচার করিস নে।

আরে এমন কি গান আছে, যা আমরা দুজনেই জানি আর গাইতে পারি?

কেন, 'দিলওয়ালা দুলহানিয়া'র গান জানিস না? কিংবা 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'।

ওগুলো কেনা জানে। মুড়িমুড়কির মতো সকলেই চিবোয়।

ঝাল, চানাচুরের মত ছেলেবুড়ো সকলের প্রিয়।

দাঁড়িয়ে গাওয়া হবে, না বসে?

আগে দাঁড়িয়ে শুরু করা যাক, না জমলে তো বসে পড়তেই হবে।

সবাই ভাবল, গাইবার আগে ওরা পরামর্শ করে নিচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল দুজনে। হাসিখুশি দুটি প্রাণবন্ত তরুণতরুণী সকলের হৃদয় হরণ করতে পারে।

শুচি অবাক হয়ে দেখল, অগ্নি হাতের তালিতে তাল রেখে গান জুড়ে দিল। ও হাত আর শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ তালের সঙ্গে মিল রেখে এমন দোলাতে লাগল, দেখে মনে হল শাহরুখ অঙ্গভঙ্গি করে গান ধরেছে। যদিও নাচের জায়গা ছিল না।

পাশে বসা দু-চারজন বলল, আমরা একটু সরে যাচ্ছি, নাচটা আর বাকি থাকে কেন?

অগ্নি বলল, না, না, এতেই হবে। — বলে সে গান ধরল—

'তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম্,
প্যার হোতা হ্যায় দিবানা সনম্।'

এতক্ষণে শুচির গলাও মিলে গেছে অগ্নির সঙ্গে।

'অব ইহাঁ সে কহাঁ যায় হম্
তেরি বাহো মে মর্ যায়েঁ হম্'

টিভিতে হাজার বার দেখা কাজল শাহরুখের গাওয়া গানটা ওরা দুজনে গেয়ে জমিয়ে দিল।

হাতের তাল, গলার সুর আর অভিনব অঙ্গভঙ্গিতে আসর জমে উঠল।

এক যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে'—ওই গানটা হয়ে যাক।

দারুণ গান ভাই, দারুণ!

শুচি চেঁচিয়ে বলল, কোন গানটা দাদা?

ওই যে সাগাইতে যে গানটা অনেকে গেয়েছিল।

আর বলতে হল না, দুজনে ধরে ফেলল।

'মেহেন্দি লগা কে রাখনা
ডোলি সাজা কে রাখনা,
লে নে তুঝে ও গোরি
আয়েঙ্গে তেরি সজনা।'

দু-চারজন অল্পবয়সী ছেলে ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কম্পার্টমেন্টটাকে মাতিয়ে তুলল। যারা ইতিমধ্যেই খাওয়া দাওয়া সেরে নেবার আয়োজন করছিল, তারা সব সরিয়ে রেখে গান শোনায় মত্ত হল।

একটা শেষ হয় তো আর একটা ফরমাশ আসে।

'তুম পাস আয়ে
যুঁ মুসকুরায়ে
তুম নে ন জানে
ক্যায়া স্বপনে দিখায়ে
অব তো মেরা দিল জাগে
ন সোতা হ্যায়,

ক্যা করু হায়,

কুছ্ কুছ্ হোতা হ্যায়।'

সারা আসর জুড়ে তোলপাড়। এতক্ষণ যারা তালি দিচ্ছিল তারা এখন চচ্চড়িয়ে হাততালি দিতে লাগল।

অগ্নি দেখল, দু-চারজন প্রবীণ মাথা নিচু করে বসে আছেন। তাঁদের ভাল না লাগলেও তাঁরা ভাল করেই জানেন, যৌবনের তরঙ্গ রুধিবে কে।

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি বলল, এখন বৈশাখ, রবীন্দ্রপক্ষ চলছে। এবার আমরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করে আসর শেষ করব।

ও ধরল— 'এস, এস, হে বৈশাখ...

যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি,

অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জ্বরা,

অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।...'

এ গানটা একাই গাইল অগ্নি। দারুণ দরাজ গলা ওর।

ততক্ষণে নিজের সিটে বসে পড়েছে শুচি।

সে আগে কখনও অগ্নির গলায় গান শোনেনি। এ যে একেবারে তৈরি গলা!

গান শেষে এবার প্রবীণবাও কিন্তু মুখ খুলে বাহবা দিলেন।

এখন কম্পার্টমেন্টের বিভিন্ন দিক থেকে তাদের সঙ্গে ডিনারে যোগ দেবার জন্য ডাক আসতে লাগল।

শুচি হাত নেড়ে নেড়ে সবাইকে জানাতে লাগল, আমাদের সঙ্গে প্রচুর খাবার আছে, আপনারা খান।

কিন্তু কে শোনে কাব কথা। কেউ কেউ তো শূন্যে খাবার তুলেই ধরলেন।

অগ্নি বলল, তুই বরং একটা প্লেট নিয়ে সবার কাছে চলে যা। কুছ কুছ নিয়ে নে।

এবার সবার দিকে তাকিয়ে অগ্নি বলল, প্রসাদ কণিকা মাত্র হলেও অমৃতসমান। আপনারা অনুগ্রহ করে সেই কণিকামাত্র প্রসাদ আমাদের দেবেন।

শুচি কম্পার্টমেন্ট পরিক্রমা শেষে ঘুরে এলে দেখা গেল, প্লেট উপচে পড়েছে।

খাওয়ার শেষে গাড়ির দোলায় সবারই ঝিমুনি এসে গেল একসময়। এ এমন একটা রোগ, অন্যের দেখলেই নিজের ঝিমুনি এসে যায়। হাই তোলার মত।

গাড়ির কোণায় ঠেস দিয়ে বসেছে শুচি। তার গায়ে গা লাগিয়ে স্বভাবতই বসতে হয়েছে অগ্নিকে।

শুচি বলল, শেষ গানটা দারুণ সিলেকশন করেছিস তুই।

অগ্নি বলল, চটুল গানের পর রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুদ্ধ করে নিলাম।

শুচি বলল, ওই গানের ভেতর দারুণ একটা মজা আছে।

অগ্নির বিস্ময়, মজা!

এই তো, কড়া ঘিলুর যে বড় বড়াই করছিলি রে।

বল না কী মজা?

ওই গানের ভেতর আমাদের দুজনের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন কবিগুরু।

একটু থেমে মৃদু হেসে বলল, সেটা কি মগজে ঢুকেছে?

সামান্য সময় মাথা চুলকাল অগ্নি।

ও হো হো, ধরেছি, ধরেছি— 'অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'।

শুচি বলল, আমাদের দুজনের কি মিল দেখলি তো। গভীর দূরদৃষ্টি মহাপুরুষদের, তাই না?

অগ্নি বারবার মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটাকে সমর্থন জানাতে লাগল।

একটা স্টেশানে গাড়ি থামল। একটি যুবক নেমে যাবার আগে ওদের হাতে একটা কার্ড দিয়ে

গেল। যুবকটি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। সে লিখেছে, গান গাওয়ার সময়েই বুঝেছি, আপনারা ছদ্মবেশী। শুভদিনে যেন একটা নেমন্তন্ন পাই। রতনে রতন চেনে।

হাসতে গিয়েও ওরা ঘুমন্ত যাত্রীদের কথা ভেবে থেমে গেল।

সকাল পৌনে ন-টা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দার্জিলিং মেল এসে ঢুকল। প্লাটফর্মে নেমেই শুচি বলল, হাঁ রে, এখান থেকে নাকি প্রচুর ট্যাক্সি যায়?

মাথা খারাপ। বেঁচে থাক আমাদের দার্জিলিং-হিমালয়ান টয় ট্রেন। তাতে যাবার মজাই আলাদা।

ওরা ছুটোছুটি করে ব্যাগপত্র ঘাড়ে বয়ে একটি টয়ট্রেনে উঠে পড়ল। টিকিট কাটল কার্সিয়াং অবধি।

শুচি এই প্রথম দার্জিলিং চলেছে। যা দেখছে তাতেই ঘোর লাগছে চোখে। পাহাড়িরা ঘর থেকে বেরিয়ে গল্প করতে করতে একটুখানি দৌড়ে ট্রেনের হাতল ধরে উঠে পড়ছে।

দ্যাখ দ্যাখ অগ্নি, দুটো পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে একটা ঝরনা কেমন এঁকেবেকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে।

ওই তো পাহাড়ি মেয়েগুলো পাথরে আছড়ে কাপড় ধোলাই করছে।

অগ্নি আঙুল তুলে দেখাল, ওই রে, টুসটুসে গালওলা পাঁচটা বাচ্চা ঘরের দাওয়ায় বসে কেমন রোদ পোহাচ্ছে।

ওরা হাত নাড়তেই ওরাও ওদের ছোট ছোট নরম হাতগুলো নাড়তে লেগে গেল।

যত ওপরে উঠছে তত বেশি স্পষ্ট হচ্ছে পাইন গাছের ছবি।

এক তাল মেঘ হালকা তুলোর মতো ভাসতে ভাসতে পাইনের সবুজ মুছে দিয়ে, ট্রেনের খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

কী খুশি! কী খুশি! শুচি আনন্দে জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। সে এই প্রথম দূর আকাশের মেঘকে ছুঁয়ে দেবার রোমাঞ্চ অনুভব করছে। মেঘে সব হারিয়ে গেলেও গাড়ির ঝিক্‌ঝিক্ বন্ধ হয়নি। গাড়ির চাকার ঝিক্-ঝিক্ আওয়াজের সঙ্গে রেলের হুইসেল মিশে গিয়ে কু-ঝিক-ঝিক শব্দ উঠছে। বাতাসিয়া লুপটাকে প্রায় চক্কর দিয়ে ঘুরল ট্রেনটা। মাঝে দাঁড়িয়ে আছে পাইন অথবা দেওদার জাতীয় কী একটা গাছ। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে ট্রেনটার ল্যাজা মুড়ো দেখতে পেয়ে শুচির আর খুশি ধরে না।

কারা যেন কাঠের বোঝা নিয়ে ওম্ পথ ধরে ওপরে উঠছে। শুচিকে হাত নাড়তে দেখে ওরাও হেসে হাত নেড়ে ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

কার্সিয়াং স্টেশনে এসে গাড়ি থামল।

অগ্নি বলল, এখানেই আমাদের নামতে হবে। খানিকটা চড়াই ভেঙে আমাদের উঠে যেতে হবে। সেন্ট মেরী হিল্স-এ। অবশ্য এই টয় ট্রেনটা ওই পর্যন্ত গিয়ে আবার ব্যাক করবে। তারপর শক্তি সঞ্চয় করে দার্জিলিং-এর সবচেয়ে উঁচু 'ঘুম' স্টেশনে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে খানিক নামলেই দার্জিলিং— যাত্রা শেষ।

শুচি বলল, এই খানিকটা এগিয়ে যেতে পারতাম।

অগ্নি বলল, ও ওখানে দাঁড়াবে না। ব্যাক করতে করতে আবার এই কার্সিয়াং-এ ফিরে এসে দার্জিলিং-এর রাস্তা ধরবে।

অগ্নি শুচির ভারী ব্যাগটা তার হাত থেকে টেনে নিল।

কী করছিস?

তুই আয় না আমার সঙ্গে। আমি শর্টকাট রাস্তা ধরে ওপরে উঠে যাব। তুই শুধু আমাকে ফলো করবি। এই ব্যাগ নিয়ে ওই চড়াই ভাঙা তোর কর্ম নয়।

অবস্থা বুঝে মেনে নিতে হল শুচিকে।

সেন্ট মেরী হিল্স-এর ওপর ছোট্ট বাড়িটা একটা ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তার

চারিদিকে কাচ দিয়ে ঘেরা। ছোট্ট উঠোন ঘিরে ফুলের বেড। উঠোনের মাঝখানে একটি মাত্র পাইন গাছ। সেখানে মেঘ এসে তাকে স্নান করায় ; রোদ্দুরের, সোনালি ওড়না তার গা মুছিয়ে দেয়।

শুচিকে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে আউট-হাউসের দিকে কেয়ার-টেকার মেয়েটির খোঁজে চলে গেল অগ্নি।

ভাগ্য ভাল, আউট হাউসের বাইরে পেয়ে গেল রিখি তামাং-কে। সে তখন পেছন ফিরে সোয়েটার বুনছিল।

অগ্নি বলল, অসময়ে গরম পোশাক বুনছ মাসি?

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল রিখি। অগ্নিকে দেখে হাতের সোয়েটারটা দরজার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই বিস্ময়ে আনন্দে বলে উঠল— কখন এলে ছোটে সাহেব?

মিষ্টি হেসে অগ্নি হাত পেতে দাঁড়াল। মুখে বলল, এই মাত্র।

রিখি বুদ্ধিমতী মহিলা। সে অমনি ঘরে ঢুকে চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে এস বলল, চলো, আমি খুলে দিচ্ছি। একটা চিঠিও তো দিতে হয়।

তুমি তো জা· মাসি সে অভ্যেস আমার নেই।

তোমার মা-ও তো পোস্টকার্ডে একছত্র লিখে জানাতে পারতেন। প্রতি মাসে মানি অর্ডার ফর্মের নিচে একছত্র লিখে খবরাখবর নেন।

ওরা বাংলোয় এসে পৌঁছল।

অগ্নি বলল, মাসি, এ আমার বন্ধু শুচি। আমরা কদিন এখানে থাকব, তোমার হাতের ভালমন্দ রান্না খাব।

ঘর খুলে দিল রিখি। প্রতিদিনই সে ঝাড়পোছ করে রাখে। এমন কি অগ্নির বাবার দেওয়ালে টাঙানো ফোটোগ্রাফটার তলায় প্রায়ই সে একটা গ্লাসে বাগানের ফুল সাজিয়ে রেখে দেয়।

দুটো চেয়ার নিয়ে বাইরের উঠোনে গাছতলায় পেতে দিল রিখি। বলল, দু-দশ মিনিট বস, আমি বাথরুমে গরম জল দিয়ে দিচ্ছি, স্নান সেরে নেবে। আমি আজ ওই আউট-হাউসেই খাবার তৈরি করে নিয়ে আসব।

গরম জল স্নানের ঘরে দেওয়া হয়েছে জানিয়ে দিয়েই এক ফাঁকে রিখি নেমে গেল স্টেশানের দিকে। ছিপছিপে আঁটোসাটো গড়নের রিখিকে কে বলবে চল্লিশ বছরের মহিলা। সর্টকাটে রাস্তা ধরে সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেমে যাচ্ছিল অবলীলায়।

ছোটেসাহেব আর তার বন্ধুর জন্য কিছু স্পেশাল বাজারের ব্যবস্থায় বেরিয়ে গেল সে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সারা হলে রিখির পরামর্শে তারা ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বিশ্রাম নিতে চলে গেল।

রিজার্ভেসান ছিল না, তাই রাত কেটেছে প্রায় নিদ্রাহীন।

এ বয়সে একটা রাত জাগা কোনও ব্যাপারই নয়। তবু মাসির পরামর্শের মর্যাদা রাখতে কিছু সময়ের জন্য ওরা বিশ্রামের প্রস্তাবকে মেনে নিল। বাংলোতে থেকে গেল অগ্নি, আর মাসির সঙ্গে আউট হাউসে চলে গেল শুচি। ওখানেই শুচির একান্ত নিজস্ব জিনিসপত্র রাখা ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা।

দুপুরেব বিশ্রামে ঝরঝরে হয়ে শুচি আর অগ্নি আবার মিলিত হল মূল বাংলোতে।

এখন উঠোনে পাইন গাছের তলায় দুটো চেয়ারের মাঝখানে একটি টিপয় রাখা। বৈকালিক চা পান এখানেই হবে।

অগ্নি জানতে চাইল, নতুন জায়গাটা কেমন লাগছেরে?

চোখে বিস্ময়ের ঘোর, শুচি বলল, দারুণ। সিমলা সুন্দব কিন্তু অনেকখানি ছড়ানো। আর এই টুকরো জায়গাটার যেদিকে তাকাই সেদিকেই স্বপ্নের ছবি দেখছি বলে মনে হয়।

পেছনের পাহাড়টা সারি সারি সবুজ পাইনগাছ নিয়ে উঠে গেছে ডাওহিল অব্দি। আলোয, ছায়ায় আলপনা, সে এক অনুপম আলেখ্য।

সাদা পোশাকে আবৃত হয়ে ফাদাররা সারি দিয়ে চার্চের দিকে এগিয়ে চলেছেন উঁচু নিচু রাস্তা

ধরে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাইবেল হাতে নিয়ে তাঁদের এই তরঙ্গিত যাত্রা দর্শকের মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে।

আবার অনেক নিচে উপত্যকার বুকের ওপর বইছে এক নদী। সূর্যের আলো পড়ে রূপোর হাসুলির মত ঝলকাচ্ছে। দূরে দূরে নীলাভ পাহাড়ের শৈলরেখা ধরে পাইনের সারি উপত্যকার দিকে নেমে গেছে। হালকা মেঘের ওড়না উড়িয়ে যেন একদল নর্তকী নাচতে নাচতে থমকে থেমে গেছে।

শুচি বলল, এ জায়গাটা কি মেসোমশাইয়ের নির্বাচন?

বাবা এখানে ডাক্তারি করতেন। পাহাড়ি মানুষদের সেবা করার ব্রত নিয়ে তিনি এ অঞ্চলে এসেছিলেন।

সত্যি, জয়গাটা এত ভাল লাগছে যে কি বলব।

অগ্নি কান পেতে বলল, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস?

শুচিও কান পাতল।

ঝিকঝিক শব্দ উঠছিল। শব্দটা এগিয়ে আসছিল ক্রমে ক্রমে।

ওই দেখ, টয় ট্রেনের মাথা দেখা যাচ্ছে।

শুচি দেখল, একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ট্রেনটা। শব্দ আরও জোরালো হয়ে প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে পাহাড়ে। আবার পাশের একটা পাহাড়ে আত্মগোপন করল। এ যেন 'কু' দিয়ে দিয়ে লুকোচুরি খেলা। দলে দলে মেঘ ভ্যালি থেকে উঠে আসছে পুতুল ট্রেনের খেলা দেখবে বলে। ওদিকে সেন্ট মেরী হিলস আর ডাও হিলস-এর সারি সারি পাইন গাছ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শেষ সূর্যের সোনালি জলে ভাসা মেঘগুলোকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

রিখি চা আর পকৌড়া নিয়ে এসে ওদের সামনে টিপয়ের ওপর রাখল। শুচি চমৎকার গন্ধওয়ালা দার্জিলিং টি-এর কাপে চুমুক দিয়ে বলল, যেমন গন্ধ তেমনি স্বাদ।

অমনি অগ্নি বলল, যে চা তৈরি করেছে তার হাতের গুণের কথাটা বল।

শুচি হাত থেকে কাপটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তে সে জড়িয়ে ধরল রিখি মাসিকে।

দুপুরে তোমার রান্না খেয়েছি, এ বেলা চা, তোমার জবাব নেই মাসি।

রিখি, শুচির সুন্দর মুখখানাতে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, এই সুন্দর মুখখানা যা কিছু খায়, স্বাদে ভরে ওঠে।

চা-পর্ব শেষ হলে ওরা পাইন বনের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

সত্যি তুলনা নেই এই পাইন ফরেস্টের। ওরা দুজনে বেলা শেষের হলুদ আলো গায়ে মেখে, হাতে হাত বেঁধে বনের ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। স্বপ্নের দেশ, স্বপ্নের সঙ্গী।

বনের ভেতর দিয়ে অনেকটা ওপরে ওরা উঠে গেল। পাইন বনের শেষে একপ্রান্তে চার্চ। ওদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঐশ্বর্যে ঝলমল রূপরেখা।

সন্ধ্যা নামছে, এ সময় বনের পথ ধরে ফেরা ঠিক হবে না। পাহাড়ে ওঠার সময় পায়ের ওপর যে নির্ভরতা থাকে, নামার সময় তা থাকে না। একটু অসাবধানতা, বিপদজনক পতন ডেকে আনতে পারে।

অগ্নি বলল, একটু ঘুরপথে বাঁধানো রাস্তা ধরে যাই চল। তারপর সামান্য খানিকটা পথ বনের ভেতর দিয়ে গেলেই বাংলোতে পৌঁছে যাব।

তোর এ অঞ্চলের ম্যাপটা মুখস্থ আছে মনে হচ্ছে।

থাকাই তো স্বাভাবিক রে। তাছাড়া...

তাছাড়া কি?

আজ তিথিটা কি জানিস?

হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল শুচি। কি যেন ভাববার চেষ্টা করল। পরে বলল, তিথি টিথি মগজে নেই!

আজ শুক্লা চতুর্দশী। ওই দেখ পাহাড়ের আড়াল টপকে চাঁদটা কেমন বেরিয়ে আসছে। এরপর ওর আলো এসে পড়বে বনের ভেতর ওম্ পথের ওপর।

বাঁধা রাস্তা থেকে বনের পথে নেমেই অগ্নি হাত ধরল শুচির। শর্টকাট পথগুলো একটু উঁচুনিচু হয়, তাই সাবধানতা। পথের ওপর আলো এসে পড়লেও, আবছা। শুচি প্রায় পায়ে পায়ে নির্ভর করছিল অগ্নির ওপর। বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী এক তরুণ নিয়ে চলেছে তার রূপবতী বান্ধবীকে নির্জন বনপথে। কোনও অঘটনই ঘটছে না, এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

পথের দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ওদের মুখে কোনও কথা ছিল না। মাঝে মাঝে কেবল জুতোর সঙ্গে পাথরের ঠোকাঠুকির আওয়াজ নির্জন বনপথকে সচকিত করছিল।

ওরা এসে পৌঁছল একটা টিলার ধারে। টিলার তলায় অর্ধবৃত্তাকার একটি অংশ সবুজ ঘাসের চাদরে ঢাকা। ওই বৃত্তকে ঘিরে নানা রঙের মরসুমি ফুলের বেড।

আকাশে চাঁদ ঝকঝক করছে। শুচি ভাল করে চেয়ে দেখল টিলার গায়ে আলোছায়ার আবরণে একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে।

অগ্নি এগিয়ে গিয়ে মূর্তির সামনে নতজানু হল। শুচি পায়ে পায়ে গিয়ে দেখল, মেরিমাতার মূর্তি। সেও অগ্নির দেখাদেখি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসল। এই লতাগুল্ম সমাচ্ছন্ন অরণ্য প্রদেশে এমন মনোরম একটি মূর্তি দেখে অভিভূত হল শুচি।

মেরিমাতাকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করে একে একে উঠে দাঁড়াল দুবন্ধু।

অগ্নি আঙুল তুলে বলল, ওই দেখ, আমাদের আউট হাউসের আলো দেখা যাচ্ছে।

শুচি ভারি খুশি হয়ে বলল, এই তো আমরা বাংলোতে পৌঁছে গেছি। দেখ, দেখ, জানলার ধারে মাসি নড়াচড়া করছে।

ওরা এবার দ্রুত পা চালিয়ে বাংলোর কম্পাউন্ডে এসে ঢুকল।

দিনের ভোজপর্ব হয়েছিল মূল বাংলোতে, এখন রাতের খাবার ব্যবস্থা আউট হাউসে।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি শীত জাঁকিয়ে পড়তে শুরু করল। রাত যত বাড়ল, ততই বাড়তে লাগল অসহ্য শীতের দাপট।

খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে অগ্নি চলে গেল তার বাংলোতে। অতিথি নিবাসে গোটা তিনেক কম্বলের তলায় আত্মগোপন করল শুচি। রান্নাঘরের এক চিলতে জায়গায় দিব্যি আরামে আশ্রয় নিল রিখি মাসি।

রাত তখন বেশ গভীর। হিমালয় থেকে বয়ে আসছে হিমশীতল হাওয়া। চরাচরে সে হায়েনার মত ঘুরে ফিরছে জীবন্ত কোনও প্রাণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

হঠাৎ একটা রাতচরা পাখি তীব্র আর্তনাদ করে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের শক্ত বাঁধনটা ছিঁড়ে গিয়ে বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসল শুচি।

শীত যতই কামড় দিক ভোরের স্নান আর রাতের জানালা খুলে রাখা শুচির বহুদিনের অভ্যেস। এখানেও সে জানালা পুরোপুরি বন্ধ না করে একটুখানি ফাঁক রেখে শুয়েছিল। ওই ফাঁক দিয়েই হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল বাইরে। সেই মুহূর্তে অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য সে দেখতে পেল। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় সে ছবি এমনই স্পষ্ট যে তা চিনে নিতে এতটুকু অসুবিধে হল না শুচির।

এই হাড় কাঁপানো, ঘিলু জমে যাওয়া শীতের রাতে যে কোনও মানুষ সামান্য একটা পোশাক গায়ে জড়িয়ে খোলা আকাশের নিচে থাকতে পারে তা তার স্বপ্নেরও বাইরে।

বিস্ময় সীমাহীন হল, যখন সে দেখল মানুষটি আর কেউ নয়, তার অকৃত্রিম বন্ধু অগ্নি। সে তখন নতজানু হয়ে বসেছিল ওই মেরিমাতার মূর্তির সামনে। কতক্ষণ ধরে ওইভাবে অগ্নি বসে আছে তা বোঝার উপায় ছিল না শুচির। ওর ব্যাপারটা চোখে পড়ার পরও প্রায় পৌনে একঘণ্টা কেটে গেল তবুও কোনও রকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না অগ্নির মধ্যে।

শুচি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, বিছানার তিনখানা কম্বলই নিয়ে সে ছুটে যায় উন্মাদ বন্ধুটিকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু

রিখি মাসি হঠাৎ যদি দেখে ফেলে, সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে, তাহলে আর তার লজ্জা ঢাকার ঠাঁই থাকবে না।

ওই তো উঠে পড়ল অগ্নি। সে এখন ধীরে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল বাংলোর দিকে। এক সময় শুচির দৃষ্টির আড়ালে সে ঢুকে গেল বাংলোর ভেতর।

পুরানো দেওয়াল ঘড়িতে তখন শব্দ করে রাত তিনটে বাজল।

ভোর হতে না হতেই পোশাক আশাক বদলে মূল বাংলোতে গিয়ে হাজির হল শুচি। তার মুখ চোখ থেকে কৌতূহল আর বিস্ময় উপচে পড়ছিল। অগ্নি তখনও বিছানায়, কিন্তু জেগে। সে জানালাটা খুলে দিয়ে পূবের আকাশকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ওপরে পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে আলো ঝরে পড়ছে সেন্ট মেরী হিলসের তলা অব্দি।

নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল শুচি। দরজা ভেজানোই ছিল। অগ্নির মুখ উল্টো দিকে তাই আগন্তুককে দেখতে না পাওয়ারই কথা। তবু মুখ না ফিরিয়েই কথা বলল সে, এত ভোরে, কি খবর রে? রাতে নতুন জায়গায় ঘুম হয়নি বুঝি?

অবাক হল শুচি, এতটুকু কোনও আওয়াজ হয়নি ঘরে ঢোকার সময় তবু তার সঙ্গে কথা বলছে অগ্নি।

রহস্যভেদ হল। আবছা আলো অন্ধকারে যে আয়নাটা ছিল, তাতেই অস্পষ্ট ছবি পড়েছিল শুচির। আর সেই প্রতিকৃতি দেখেই কথা বলতে শুরু করেছিল অগ্নি। এখন ওই আয়নায় নিজের প্রতিকৃতি দেখে সবকিছু বুঝতে পারল শুচি।

তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে অগ্নি পাশ ফিরল।

কিরে, ঘুম হয়েছিল কিনা বললি না তো?

তোর নিশ্চয়ই ভাল ঘুম হয়েছিল। নিজের বাংলো, চেনা জায়গা।

যতটা হওয়া দরকার প্রায় ততটা।

প্রায় কেনরে, পুরোপুরিই তো হবার কথা।

অগ্নি বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, তুই বসবি, না ওরকম দাঁড়িয়ে থাকবি?

শুচি বসে পড়ে দুটো হাতের পাতা ঝিঁঝি পোকার মত বিদ্যুৎ বেগে ঘষতে ঘষতে নিজের গালে কয়েকবার ঠেকিয়ে বলল, যা ঠাণ্ডা না, জমে যাবার যোগাড়।

যা বলেছিস।

শুচি অমনি চোখেমুখে বিস্ময়ের ছবি ফুটিয়ে বলল, তোরও ঠাণ্ডা লাগে নাকি রে?

শীতের জায়গায় ঠাণ্ডা লাগবে না!

আমি তো জানতাম, মুনি ঋষিদের শীত গ্রীষ্মের বোধ নেই।

অগ্নি বলল, আমাকে তুই মুনি ঋষি ঠাওরালি নাকি রে?

তুই সুপারম্যান— 'শক্তিমান'।

অনাবিল হাসিতে ঘর ফাটিয়ে অগ্নি বলল দারুণ কমপ্লিমেন্ট।

এবার শুচি বলল, শীতের দিনে ঘুমকাতুরেদের ছবি কি রকম হয় জানিস?

কি রকম?

পিসিমণি বেশ মজার একটা শ্লোক বলে—

'প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার,
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টংকার,
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলি,
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলি।'

শ্লোকটি শুনে অগ্নি হেসে গড়িয়ে পড়ল।

মানুষের ঘুমের দারুণ একটা স্কেচ আঁকা হয়েছে এতে।

শুচি বলল, আমি ঘরে ঢুকে দেখি, তুই সিধে একপাশে কাৎ হয়ে শুয়ে আছিস। পিসির বলা চারটে পোজের কোনটার সঙ্গেই মিল নেই।

আরে তখন তো আমি জেগে। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় কি মূর্তি ধরেছিলাম তা কে জানে।

শুচি বলল, চতুর্থ প্রহরে তুই যে বেনের পুঁটুলির মত হাত পা মুণ্ডু বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকিসনি তা অন্তত আমি হলপ করে বলতে পারি।

অগ্নি অবাক হয়ে তাকাল শুচির মুখের দিকে।

কি ব্যাপার বল তো? শেষ রাতে কি তুই আমার বাংলোতে এসেছিলি?

তা কেন, মেয়েদের একটা অতিরিক্ত চোখ আছে জানিস তো, তাই দিয়ে তারা অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণের কাজ সারতে পারে।

অগ্নি অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

শুচি ওর হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলল, আর তোকে ধাঁধায় রাখব না। এখন বল, শেষ রাতে তুই খালি গায়ে মেরি মাতার কাছে গিয়েছিলি কেন?

তুই দেখেছিস?

তৃতীয় নয়নে নয়, এই সাদা দুটো চোখে।

নির্বাক অগ্নি কিছু সময় স্থির হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ চোখ নামাতেই দু ফোঁটা জল পড়ল বিছানার ওপর।

শুচি বিছানাতেই হাঁটু ভেঙে বসে প্রায় জড়িয়ে ধরল অগ্নিকে।

তুই কাঁদছিস। বল কি হয়েছে তোর?

না, কিছু না।

সোজাসুজি শুচির কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। তাগ্‌দা যাবি?

আমি কি বলব, তুই যেখানে নিয়ে যাবি...।

কার্শিয়াং স্টেশানে ওরা একটা জিপ ভাড়া করে তাতে উঠে বসল।

জিপ দার্জিলিং ছেড়ে ছুটে চলল সিকস্‌থ মাইলের দিকে। পাহাড়ি পথ। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে গভীর গিরিখাদ। যেদিকে খাদ সেদিকে রাস্তার ধারে সারি সারি গাছ। মাঝে মাঝে গাছের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার মত মেঘ উড়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাচ্ছে সামনের পথের চিহ্ন। জিপের আলো জ্বলে উঠছে, কিন্তু তাতে সামনের পথ একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। ও আলো সম্ভবত উল্টোদিকের গাড়ির জন্য সংকেত।

অগ্নির হাত জাপটে ধরে সিঁটিয়ে বসে আছে শুচি। ওই প্রায় অদৃশ্য পথের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলেছে ড্রাইভার। কোনও গিরিখাদে কখন এই তিনটি প্রাণীকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পডবে গাড়ি তা কে জানে!

বহু আঁকবাঁক পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। ড্রাইভার কি ঈশ্বর। সে কি করে দেখছে অদৃশ্য পথ।

হঠাৎ জোর ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি থেমে গেল। অগ্নির ওপর ঘুরে ছিটকে পড়ল শুচি। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, গাড়ি রাখ, একদম চালিও না, নিজেও মরবে, আমাদেরও মারবে।

চালক নেপালি হলেও দিব্যি বাংলা বলতে পারে।

সে বলল ডরো মাৎ, এ পথ হামার মুখস্থ, আঁখ বন্ধ করেও চালাতে পারি। অগ্নি আশ্বাস দিয়ে বলল, প্রথম যাত্রা বলে তুই ভয় পাচ্ছিস, আমার অভিজ্ঞতা আছে। এরা এক একটা কম্পিউটার ব্রেন নিয়ে কাজ করে।

সিকস্‌থ মাইলে পৌঁছে নিচের দিকে নামতে লাগল গাড়ি। ঘুরে ঘুরে নামছে, গর্জন নেই। হুড় হুড় শব্দে আপনি নেমে যাচ্ছে। স্টিয়ারিং ধরে গাড়িকে সঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার। ব্রেক কষছে দরকার মত।

ক্ষণে কুয়াশা ক্ষণে ফর্সা। সূর্য অপরাহ্নের আকাশ ছুঁয়েছে। সোনা গলে ঝরে পড়ছে দেওদার আর পাইনের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে।

কিরে, এখন আর ভয়ের ভূতটা ঘাড়ে চেপে নেই তো?

দুম দুম করে অগ্নির কাঁধে কটা কিল কষিয়ে দিলে শুচি।

অগ্নি বান্ধবীর কিল খেয়ে একটু বেঁকে চুরে বসল। মুখে বলল, আমি যেদিন পুলিশের ভ্যানে উঠি, সেদিন তোকেও কেন তুলেছিল, এখন বুঝতে পারছি।

কেন রে?

সেদিন তোর হাতের এই মিষ্টি কিলগুলো খেয়েছিল।

কিল খেলে কেউ ভ্যানে তুলতে যায় নাকি?

যায়, আবার খাবে বলে।

শুচি খিলখিল হাসির সঙ্গে আরও দুচারটে মিষ্টি কিল অগ্নিকে উপহার দিল।

গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা বাড়ির সামনে।

অনেকখানি এরিয়া নিয়ে বিশাল বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। সামনে, প্রায় অযত্নে রক্ষিত কিছু মরসুমি ফুলের গাছ।

কাঠ আর কাচের তৈরি বিশাল ফরেস্ট হাউসটার অঙ্গে প্রাচীনত্বের ছাপ। সব থেকে আকর্ষণীয় তার পেছন দিকের জমি-সংলগ্ন দুটো গগনচুম্বি দেওদার।

জিপের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অগ্নি বলল, তুই এখানে একটুখানি দাঁড়া, আমি ফরেস্ট অফিস থেকে পারমিশানটা নিয়ে আসি।

দুটো ব্যাগ সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুচি। পাথর বাঁধানো চমৎকার রাস্তা ধরে একটু নীচে বনাচ্ছাদিত একটি ফরেস্ট হাউস লক্ষ্য করে নেমে গেল অগ্নি।

শুচি দেখল, জায়গাটা ছবির মতো। খানিকটা নীচে পাহাড়, জঙ্গলের ভেতরে একটি সমতল ক্ষেত্র। চমৎকার বিশাল কলকার আকারে জায়গাটিকে সাজানো হয়েছে। পরে ও জেনেছিল, এটি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্কিড ব্রিডিং সেন্টার। কাচের ঘরের ভেতরে কত রকম যে রঙবাহারি অর্কিড ওখানে আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এটি সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরিকল্পনাতেই নাকি তৈরি।

অগ্নি পারমিশান জোগাড় করে নিয়ে ফিরে এল।

নীচ থেকে হাত নেড়ে নেড়ে তার বিজয়-বার্তা জানাতে লাগল।

অনেকগুলি ঘর, আপাতত কোনও লোক নেই। যেন নির্জন প্রাসাদে দুটি মাত্র প্রাণী এসে পড়েছে। একমাত্র চৌকিদার খাবারের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

শুরু হল বৃষ্টি। কি বৃষ্টি! কি বৃষ্টি! আকাশ ভেঙে অঝোরধারায় ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। পাশাপাশি দুটো ঘর নিয়েছে ওরা। এখন শুচির ঘরেই আসর বসেছে। গান, গান, শুধু গান, কত গানই না জানে অগ্নি।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুক্ত হচ্ছিল নজরুলেরও বর্ষা সঙ্গীত।

নজরুলের শেষ গানটি মাতিয়ে দিল বর্ষাঝরা সন্ধ্যার আসর।

যুগ যুগান্তরের বিরহ, গানের পাখায় ভর করে উতল হাওয়ায় ঘুরে ফিরতে লাগল বনে বনে মনে মনে।

'শাওন আইল ফিরে সে ফিরে এল না,
ধানি রঙ গাগরি মেঘ রঙ ওড়না...।'

বর্ষাধারার সঙ্গে সুরটা সারা ঘরে গুনগুনিয়ে ফিরতে লাগল।

অগ্নি যতক্ষণ গান গাইছিল তার দিকে প্রায় পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল শুচি। গান থামলে সে বলল, মন ভরে গেল অগ্নি। কতদিন পরে যে এমন গান শুনলাম তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না।

হঠাৎ চরাচর কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠল কতক্ষণ। শুচি চমকে পানপাতার মতো দুটো হাত কানে চাপা দিল।

অগ্নি অমনি গলায় সুর তুলল— 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি...।'

এবার জানালার পাশে এসে দাঁড়াল দুজনে। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমকে বৃষ্টিভেজা দুটো দীর্ঘদেহী ফার গাছকে আদিম যুগের কোনও পাষাণপুরীর প্রহরী বলে মনে হচ্ছিল।

তারই ভেতর চৌকিদার এক সময় ডাইনিং হলে রাতের খাবার দিয়ে গেল। স্যালাড, ভাজা, ডাল, চিকেন কারি, সরু চালের ভাত আর চাপাটি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে বৃদ্ধ চৌকিদারের রান্নার সদ্ব্যবহার করল দুজনে।

প্রচণ্ড শীত। রাত তখন প্রায় এগারটা। শুচি তার ঘরে রাতের বিশ্রামের জন্য চলে গেল।

কখন বৃষ্টি থেমে গেছে। স্বপ্নের ভেতর শুচি যেন শুনতে পেল একটা বাঁশির সুর। ধীরে ধীরে তন্দ্রা থেকে জাগরণে ফিরে এল সে। সত্যিই তো বাঁশি বাজছে। 'বনমাঝে, মনমাঝে'।

বিস্ময়ের শেষ নেই শুচির। বাঁশির সুর ভেসে আসছে অগ্নির ঘর থেকে। বিছানা ছেড়ে একটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে ধীরে ধীরে অগ্নির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শুচি।

অন্ধকার ঘরে বাঁশি বাজছে। রবীন্দ্রনাথের সেই 'কিং অব দ্য ডার্ক চেম্বার'। রাজা-কে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর বীণার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বাঁশিতে বাজছিল রবীন্দ্রনাথেরই গানের সুর। সে সুরের প্রার্থনাটি শুচির প্রাণে এসে লাগল।

'সর্ব খর্বতার দহে তব ক্রোধদাহ—

হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহ।'

ভেজান দরজাটাকে দু-হাতে খুলে দিল শুচি। সামান্য শব্দে বাঁশি বন্ধ হয়ে গেল।

অন্ধকার ঘর থেকে শোনা গেল অগ্নির কণ্ঠস্বর, কে?

আমি শুচি, থামলি কেন, বাজা।

অগ্নি বলল, এত রাতে তোর ঘুম ভাঙালাম, খুব খারাপ লাগছে।

দেখ, তোর বাঁশি যদি না শুনতাম, তাহলে আমি অনেক কিছুই হারাতাম।

অগ্নি বলল, ও আমার একটা পাগলামি। ডানদিকের দেওয়ালে আলোর সুইচটা আছে, অন করে দে।

শুচি বলল, 'আমার আঁধার ভাল।' অন্ধকারে আমার কিছু ঠাহর হচ্ছে না, তুই ধরে নিয়ে যা।

অগ্নি এগিয়ে এসে শুচির হাত ধরল। ওরা দুজনে এসে বসল বিছানার ওপর।

হাতে হাত রয়েছে দুজনের কিন্তু মুখে কোনও কথা নেই।

হঠাৎ অগ্নির কণ্ঠ বেজে উঠল। শুচির মনে হল, এ কণ্ঠস্বর তার অচেনা। কাল আমি শেষ রাতে ওই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভেতর অতি সামান্য পোশাকে মেরিমাতার সামনে নতজানু হয়ে কেন বসেছিলাম, তা তুই জানতে চেয়েছিলি,— তাই না? আমি কাল তোকে কোনও উত্তর দিতে পারিনি। সেই উত্তর দেব বলে আমি আজ তোকে এখানে ডেকে এনেছি।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে সতেরো বছরের একটি অসহায় কন্যা সারারাত অল্প পোশাকে ওই মেরিমাতার মূর্তিকে আগলে ধরে নতজানু হয়ে বসেছিল। কাল রাতের মতো সেদিনও ঝকঝকে চাঁদ উঠেছিল আকাশে। হঠাৎ কেউ যেন এক হৃদয়বান মানুষকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন। তোরই মতো তিনিও জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন এক তরুণী কন্যাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। মেয়েটিব কাছে এসে প্রশ্ন করেছিলেন, এই বরফের মতো ঠাণ্ডা রাতে কি করছ তুমি এখানে?

মেয়েটির কথা বলারও কোনও শক্তি ছিল না। সেই হৃদয়বান মানুষটি, সেদিন তাকে তুলে এনেছিলেন নিজের ঘরে। সেবা, যত্নে, উত্তাপে সেই মৃতপ্রায় কন্যাটির প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

শুচি জানতে চাইল, আচ্ছা, এত রাতে ওই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার মধ্যে মেয়েটি ওখানে গিয়েছিল কেন?

অগ্নি বলল, সে এক সরল, নির্বোধ মেয়ের জীবনেব অতি করুণ কাহিনী। সিকিমের এক সম্ভ্রান্ত হোটেল মালিকের প্রায় কিশোরী মেয়েকে জলপাইগুড়ি ফরেস্টের একজন ঠিকাদার বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ঘরছাড়া করে।

দু'একদিন কালিম্পঙে কাটানোর পর লোকটা যখন জানতে পারে পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, তখন সে রাতারাতি একটা জিপ ভাড়া করে মেয়েটিকে নিয়ে জলপাইগুড়ির দিকে রওনা দেয়।

ধরা পড়ার ভয় তাকে এমনভাবে তাড়া করছিল যে সে ওই মেয়েটিকে কার্শিয়াঙের কাছাকাছি একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে পালায়। স্যুটকেশ বোঝাই পোশাক পরিচ্ছদ সবই থেকে যায় জিপে।

সামান্য পরনের যে পোশাক মেয়েটি পরেছিল তাই নিয়ে সে আত্মগোপনের জন্য এই বনে ঢোকে। চাঁদের আলোয় একসময় সে দেখতে পায় মেরিমাতার ওই মূর্তি! মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। হয়তো সেই সময় তার শীতগ্রীষ্মের বোধও চলে গিয়েছিল।

শুচি বলল, তারপর সেই মেয়েটির কি পরিণতি হল? আর সেই সহৃদয় মানুষটিই বা তার জন্য সে সময় কি করলেন?

তিনি সব শুনে মেয়েটিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে লজ্জায়, ভয়ে কিছুতেই তার ঘরে ফিরতে চায়নি। সে ভদ্রলোকের করুণার আশ্রয়ে থেকে তাঁর সমস্ত কাজ করে দিতে চেয়েছিলেন।

এইভাবে সেই মানুষটির আশ্রয়ে তার দু-মাস কেটে যায়। ক্রমশ মেয়েটি বুঝতে পারে তার দেহে নতুন প্রাণের সাড়া জেগেছে।

আশ্রয়দাতার অসম্মান করতে সে চায়নি। সে জানত, ওই প্রতারকই তার এই পরিণতির জন্য দায়ী। দেবতুল্য মানুষটিকে অকারণ অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মেয়েটি আত্মহত্যার পথই বেছে নেয়। কিন্তু যে কোনও ভাবেই হোক ওই মানুষটি জানতে পারেন মেয়েটির এই মানসিক অবস্থার কথা।

তিনি তাকে একান্তে ডেকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়ে বলেন, তোমার কোনও ভাবনা নেই, নিশ্চিন্তে থেক।

পরের দিনই ভদ্রলোক এখানকার চার্চের ফাদারের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। স্থির হয়, মেয়েটিকে ওই ভদ্রলোকই গ্রহণ করবেন এবং অনাগত সন্তানের পিতা হিসেবে তিনি নিজেকে পরিচয় দেবেন।

ফাদারের কথামাতো ওঁরা দুজনেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

কথায় ছেদ টেনে দিয়ে অগ্নি এবার শুচিকে প্রশ্ন করল, এখন ওই মেয়েটি সম্বন্ধে তুই কিছু অনুমান করতে পারিস কি?

আমার মনে হয়, ওই হৃদয়বান মানুষটি তোর নিকট সম্পর্কের কেউ। কিন্তু মেয়েটি সম্পর্কে আমি কিছু অনুমান করতে পারছি না।

হ্যাঁ, ওই মানুষটিই আমার জন্মদাতা পিতা আর ওই মহিলাই আমার মা। অন্ধকারে অগ্নির হাত ধরে কতক্ষণ বসে রইল শুচি। একসময় সে বলল, তুই ছেলে হয়ে এ সত্য জানলি কি করে?

অগ্নি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, কেন, সত্যকাম আর জাবালার কাহিনী পড়িসনি। জাবালা যেমন করে সত্যকামকে তাঁর জীবনের কথা অকপটে বলেছিলেন, আমার মা-ও একদিন আমাকে তাঁর জীবনের সত্যটি কোন রকম দ্বিধা না রেখে বলেছিলেন। তিনি কোনভাবেই চাননি তাঁর সন্তানের কাছ থেকে এই সত্যকে গোপন করতে।

শুচি বিস্ময় ও আবেগে অভিভূত হয়ে বলল, অসাধারণ।

মা কিন্তু দিদির কাছে তার জন্মবৃত্তান্ত আজও গোপন রেখেছে।

কেন অগ্নি?

আমরা যখন খুব ছোট তখন বাবা দিদিকে নাকি আমার চেয়েও বেশি ভালবাসত আর দিদিও বাবাকে সবসময় জড়িয়ে থাকত। তাই বাবার ওপর দিদির আকর্ষণকে কোনও ভাবেই আঘাত দিতে চায়নি মা।

শুচি অভিভূত হয়ে বলল, তোর মা-বাবার এই কাহিনী আমার কাছে অমৃত-কথা বলে মনে হচ্ছে।

তিন

কলকাতায় ফিরে আসার পর পিসিমণির কাছে বকুনি খেল শুচি। তুই যে কি করে বেড়াচ্ছিস তার ঠিক নেই, মাঝখান থেকে আমিই দোষের ভাগী হচ্ছি।

শুচি পিসিমণিকে জড়িয়ে ধরে বলল, কি হল আবার। বাপি তো অনেক দূরে।

কেন, ফোন নেই? দুদিন ছাড়া সিমলা আর কিন্নর থেকে ফোন আসছে। শুচি কোথায়? শুচি কি করছে? শুচিকে দাও।

সমানে আমি বলে যাচ্ছি, শুচি বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা গেছে, রবীন্দ্রসদনে নাচ দেখতে চলে গেছে, তার বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দিতে গেছে। কখনও আবার বলি, এই ছিল, এই বেরিয়ে গেল।

শেষে তোর বাবাকে ধমক দিয়ে বললাম, অত ঘনঘন ফোন করিস কেন? আমি কি মরে গেছি, না তোর মেয়ে জলে পড়ে আছে। ওই একরত্তি মেয়েটাকে আগলাতে পারব না। তোরা তো ঠাণ্ডার জায়গায় আরামে আছিস। আর আমরা এখানে ভ্যাপসা গরমে পচে মরছি।

শুচি বলল, তুমি একজন জাঁদরেল অফিসারকে ধাপ্পা দিচ্ছ পিসি।

তুই থাম তো। ছোটবেলায় দুষ্টুমি করলে কান ধরে কত ওঠবস করিয়েছি। স্বামী হারানোর পর বাপের বাড়ি এসে ওকে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়ে কলেজে পাঠিয়েছি। এত বড় ছেলে অথচ দিদির কাছে তার মনের কথা না বললে, চলতই না। তোর বাপ এখনও আমার কাছে সেই ছোট্টটি থেকে গেছে রে।

শুচি মন্তব্য করল, একেবারে দিদি অন্ত প্রাণ।

*　　　　*　　　　*

ছুটিতে পাহাড়, প্রান্তর চষে মণীশ বেদজ্ঞ কলকাতায় ফিরে এলেন। মেয়েকে মুখোমুখি দেখে মনের খুশি আর চেপে রাখতে পারেন না।

সারা ছুটিটা তুই কি করে কাটালি বল তো?

কেন বাপি, ঘর বার করে।

ফোনের বিল দিতে দিতে হদ্দ হয়ে গেলাম কিন্তু একদিনও তোকে ধরতে পারলাম না।

কেন, তোমার গুণনিধি দিদিটির সঙ্গে তো দিব্যি জমিয়ে কথা বলেছ।

হা হা করে হেসে উঠলেন মণীশ। শুনছ দিদি?

ঘরের ভেতর থেকে শুচির পিসি বলে উঠলেন, ওসব আমার শোনা আছে। এতদিন তুই জ্বালিয়েছিস, এখন আবার ও জ্বালাচ্ছে। তোদের বাপ বেটির জ্বালায় আমার আর রেহাই নেই। দেখছি, মরেও তোদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব না।

এবার পুরো ছুটিটা কেমন এনজয় করলে বাপি?

তোর মাও বেশ ক'দিন ছুটি নিয়ে নিয়েছিল।

তোমরা কি ছুটিটা সিমলাতেই কাটালে?

একসময় হোম সেক্রেটারি ছিলেন মিঃ মিত্র। তোর মাকে তিনি তো নিজের মেয়ের মত স্নেহ করেন। যে কোনও অসুবিধে হলেই হেলপ করেন তিনি। তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেলাম একদিন। তাঁর কর্মজীবনের অনেক কাহিনীও শুনলাম। অত্যন্ত শিক্ষিত ফ্যামিলি।

আমি আগেই মায়ের চিঠি থেকে ওঁদের সম্বন্ধে জেনেছিলাম।

তাই?

হ্যাঁ বাপি। ওঁর স্ত্রী অনেক মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওঁর মেয়েটিও নাকি ব্রিলিয়ান্ট।

ঠিক বলেছিস। কিন্তু তোর মায়ের ওই চিঠির কথা তো আমাকে আগে বলিসনি।

শুচি বাপির মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, তুমি কি মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সব চিঠির খবর আমাকে দাও?

ঘরের ভেতর থেকে পিসি বললেন, তুই ভারি বকবক করিস, থাম তো।

মণীশ হেসে উঠলেন।

শুচি বলল, এবার আর কোথায় কোথায় গেলে বাপি?

ছোট সিমলায় এক ডি. এফ. ও থাকেন। তাঁর স্ত্রী তোর মায়ের এক সময়কার ক্লাশ মেট ছিলেন। তাঁরাও একদিন আমাদের ডিনার খাওয়ালেন। সন্ধ্যায় ওঁদের বাড়িতে যাবার পথে একটা চমৎকার দৃশ্য দেখলাম, আগে কোনও দিন দেখিনি।

শুচি অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি দৃশ্য বাপি?

ছোট সিমলায় একটা ভিউ পয়েন্ট আছে। সেখানে দাঁড়ালে আলোয় ভরা সিমলা শহরটাকে মনে হয়, নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশ। দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

এবার গেলে আমিও দেখব বাপি।

মণীশ বেশ জোর দিয়ে বললেন, সত্যি দেখার মত জিনিস, নিশ্চয় দেখবে।

শুচি বলল, কিন্নর কিংবা কুলুতে যাওনি এবার?

কিন্নরে তোর মামার বাড়িতে এবার পুরো দশদিন কাটিয়েছি।

শুচি কাঁদুনে গলায় নাকি সুরে বলল, আমাকে ফেলে তোমরা কেমন মজা করলে ওখানে।

মণীশ বললেন, কেন, আমার সঙ্গে যেতে তোকে সাধিনি?

ঠিক আছে বাবা, এখন বল, ওখানে কি রকম কাটালে? ভাল করে বর্ণনা দিয়ে গুছিয়ে বলবে কিন্তু, একটুও যেন বাদ না যায়।

যেবার আমরা প্রথমে ট্রেনিংয়ের জন্যে পঁচিশ জনের একটা ব্যাচ কিন্নরে যাই সেবারে আমাদের সঙ্গী ছিল পাঁচটি মেয়ে। তোর মাও সে দলে ছিল। তখন সে মিস সুরঞ্জনা নেগী।

সিমলা থেকে আমরা পঁচিশজন পরস্পর গভীর বন্ধুত্বে বাঁধা পড়েছিলাম। রক ক্লাইম্বিং ইত্যাদি নানারকম ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেবার নানা ব্যাপারে মেয়েরা আমাদের যেভাবে হেল্প করেছে তা ভোলার নয়। তাপ্‌রির রেস্ট হাউসে বুড়ো চৌকিদারকে রেস্ট দিয়ে নিজেরাই তরিতরকারি যোগাড় থেকে রান্নাবান্না সব কাজ করেছে।

শুচি বলল, এ অন্যায়, তোমরা শুধু বসে বসে তাস পিটলে, হাত লাগালে না?

আরে সুযোগ দিলে তো।

তারপর?

তোর মা মেয়েদের লিড করছিল। সেই শুধু ছিল কিন্নরের মেয়ে। পথঘাট, পাহাড় জঙ্গল, সবই তার নখদর্পণে। তাই তাকে মান্য না করে উপায় ছিল না। তাছাড়া ওখানকার 'কিনৌর' ভাষাটা ওর মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল। তাই লোকাল লোকদের সঙ্গে দরকারি কথাগুলো ও সহজে সেরে নিতে পারত।

তাপ্‌রিতে একদিন ঝামেলায় পড়লাম।

কি রকম?

হঠাৎ মেন পাইপ লাইন দিয়ে জল আসা বন্ধ হয়ে গেল। স্নান, পান, রান্না, নিত্যকর্ম সবই বন্ধ।

ওখানে জলের বন্দোবস্ত কিভাবে হয় বাপি?

মোটা, সরু রবারের সব পাইপ লাইন আছে।

রবারের কেন?

উইনটারে বরফ জমতে থাকলে ধাতুর পাইপ অনেক সময় ফেটে যায় কিন্তু রবারের পাইপ ফুলে ওঠে, ফাটে না।

ওখানে জলের সোর্স কি?

পাহাড়ের ওপর থেকে ঝর্ণা ঝরে পড়ছে। দূষণমুক্ত ঝর্ণার প্রবাহের সঙ্গে পাইপ লাগানো আছে। পরপর মোটা সরু পাইপের ভেতর দিয়ে জল চলে আসছে স্বাভাবিক গতিতে।

তাহলে তোমাদের প্রবলেমটা হল কোথায়?

মণীশ বললেন, সেই প্রবলেমের খোঁজেই সুরঞ্জনা একা বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি তার সঙ্গী হলাম। গিয়ে দেখি, মাঝপথে পাইপটার ওপর এসে পড়েছে একটা পাথর। তার চাপেই রবারের পাইপ চ্যাপটা হয়ে জলের স্রোত বন্ধ।

সুরঞ্জনা বলল, একটু আগে ওপরের পাহাড়ে পথ তৈরিব জন্য যে ব্লাস্টিংয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল তার পরিণতি এটা। একটা মাঝারি সাইজের পাথর গড়িয়ে এসে পড়েছে।

বললাম, এখন কি কর্তব্য?

লোক ডেকে পাথরটা সরাতে হবে।

আমার কড়ে আঙুলে মায়ের একটা আংটি পরতাম। অনামিকাতে হত না, তাই। ওটা খুলে সুরঞ্জনাকে রাখতে দিয়ে বললাম, একবার দেখি চেষ্টা করে।

ঠেলা দিতেই সরে গেল পাথরটা। অত সহজে কার্যসিদ্ধি হবে ভাবিনি। সুরঞ্জনা তো দারুণ খুশি, হাততালি দিতে লাগল।

কার্যসিদ্ধির আনন্দে আমরা উঁচু নিচু অনেকটা পথ পেরিয়ে, বোল্ডার ডিঙিয়ে ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে তাপ্রি রেস্ট হাউসে এসে পৌঁছলাম। ঘরে ঢুকতেই জলের খল খল আওয়াজ শুনলাম। মনের খুশিতে ওরা ট্যাব খুলে হাততালি দিচ্ছে। আমরা দুজনে ঢুকতেই বন্ধু-বান্ধবীরা হই হই করে আমাদের স্বাগত জানাল।

হঠাৎ একটি মেয়ে সুরঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলল, তোব হাতে ওই নতুন রিং-টা কোত্থেকে এল।

বলতে বলতেই সে এগিয়ে এসে আমার হাতটা তুলে ধরল। বিস্ময়ে তখন তার চোখ কপালে উঠেছে।

কি ব্যাপার! তোমার কড়ে আঙুলে ওই আংটিটা ছিল না?

আমি তখন কিছুটা অপ্রস্তুত। সত্য ঘটনাটা বলতে চেষ্টা করছিলাম। পাথর সরাবার জন্য আঙটিটা ওর কাছে জমা রেখেছিলাম, একথাও বললাম। কিন্তু তখন কে শোনে কার কথা। হইচই ফেলে দিল সবাই।

ওটাই কি তাহলে তোমার এনগেজমেন্ট রিং হল বাপি?

হাসতে হাসতে মণীশ বললেন, তা বলতে পারিস। ও আমাকে সেদিন ওদের সামনেই আংটিটা ফিরিয়ে দিয়েছিল। তাতে কিন্তু অনেক রাত অবধি ওদের হুল্লোড় বন্ধ হয়নি।

তোর মা শেষে ক্ষেপে গিয়ে বলল, মণীশ যদি রাজি থাকে, তাহলে ওকে পার্টনার করতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

তখন সবাই মিলে আমাকেই চেপে ধরল।

আমি বললাম, ওর এই বৈপ্লবিক প্রস্তাব আমি সানন্দে অ্যাকসেপ্ট করছি। কিন্নরে আমাদের ট্রেনিং শেষ হয়ে যাওয়ার পর বন্ধুরা সব চলে গেল। আগেই ঠিক হয়েছিল সুরঞ্জনা কয়েকদিন তার পিত্রালয়ে কাটাবে। আমার ওদের সঙ্গে ফিরে যাবাব কথা। কিন্তু ওরা আমাকে কিছুতেই ওদের দলে নিল না। বলল, তুমি বরং এখানে আর কয়েকটা দিন কাটিয়ে একেবারে সুরঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে।

আমি সাংলার রেস্ট-হাউসে থেকে যেতে বাধ্য হলাম। প্রতিদিন কিন্তু কামরু পাহাড়ের ওপর ওদের বাড়িতে গিয়ে লাঞ্চ, ডিনার সব সারতাম।

শুচি অমনি বলল, মামার বাড়িটা সত্যি দারুণ জায়গায়। একদিকে ধবধবে সাদা ধৌলাধার, অন্যদিকে আকাশছোঁয়া কিন্নর কৈলাস। মাঝে কামরু শৈলশিবায় মামার বাড়ি। বাস্পার নীল জল হু হু শব্দে বয়ে যাচ্ছে। তীরে সেই পাইনের বন। সত্যি বাপি চোখ জুড়িয়ে যায়। একবার দেখেছি, মনে ছবি হয়ে আছে। সে সময় তুমি নিশ্চয়ই তোমার বান্ধবী সুরঞ্জনার সঙ্গে খুব ঘুরে বেড়িয়েছ।

ঘরের ভেতরে কাজ করতে করতে পিসির কান পড়েছিল পিতা-পুত্রীর সংলাপের ভেতর। তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন, তুই থামবি এবার।

শুচি কিন্তু পিসির কথায় কান দিল না। সে বলতে লাগল, সে সময় আর কি হল, বল না বাপি?

মণীশ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ওখানে সে সময় তোসিমিগ উৎসব চলছিল। আমাদের যাবার আগে থেকেই ফেস্টিভ্যালের শুরু। প্রায় বার দিনের উৎসব। তখন বাকি ছিল আরও পাঁচদিন। আমাদের দুজনকেই উৎসবের আয়োজকরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল।

শুচি সাগ্রহে বলল, তোসিমিগ উৎসবটা কিরকম বাপি?

মণীশ বললেন, সাধারণত আনম্যারেড মেয়েরা একসঙ্গে মিলে এই উৎসবের আয়োজন করে। গ্রামের একটা বাড়ি ওরা সিলেক্ট করে। সেই বাড়ির বড় একটা হল তারা বাড়ির ওনারের কাছ থেকে ভাড়া নেয়। ওখানেই এই বার দিন ওদের উৎসব চলে। নাচ, গান, খাওয়া-দাওয়া সব কিছু।

শুচি খুব উল্লসিত হয়ে বলল, বাঃ! বেশ মজা তো!

মজা আরও আছে।

শোনার আগ্রহে শুচি বাবার মুখের দিকে চোখ তুলে বসে রইল।

মণীশ বলে চললেন।

ওরা ওদের লাভারদের ওই উৎসবে নেমন্তন্ন করে। সারা দিন আর রাতের অনেকখানি সময় ছেলেমেয়েরা নাচ-গান হই-হুল্লোড় করে কাটায়। ছেলেরা হাজির থাকার জন্যে ওই উৎসবের নাম হয় তোসিমিগো-কন্যা। উদ্যোক্তারা ইচ্ছে করলে যেকোনও যুগল-অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

আমি একটা কথা বলব বাপি?

কি?

— তোমরা যোগ দেওয়াতে ওরা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছিল?

ঠিক বলেছিস। আমাকে আর তোর মা-কে পেয়ে ওরা দারুণ মেতে উঠেছিল।

মা নয়, বলো সুরঞ্জনা। তখনও ওই সুন্দরী বিদূষী মহিলা আমার মা হননি।

পিসি ভেতর থেকে চাপা ধমকের সুরে বললেন, তোরা আজকালের ছেলেমেয়েরা হলি কিরে, বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি! তোকেও বলিহারি যাই মণি, মেয়ের কাছে ঘটা করে ফিরিস্তি দিচ্ছিস।

মণীশ কোনও কথা না বলে মিঠি মিঠি হাসতে লাগলেন।

শুচি চেঁচিয়ে বলল, তুমি থাম তো পিসি। হাঁ, তারপর কি হল বাপি?

আমরা ওদের সঙ্গে কদিন খুব এনজয় করলাম।

শেষদিনে ছেলেরা প্রত্যেকে মেয়েদের কিছু কিছু করে টাকা দিল। আমিও কিছু ডোনেট করলাম। এতদিনের আনন্দের পর বিচ্ছেদের কথা ভেবে ছেলে-মেয়েদের মন ভারী হয়ে উঠল।

প্রতিটি মেয়ে তার প্রিয়জনের হাতে একটি করে চম্বক ফুল তুলে দিয়েছিল।

ফ্যানটাসটিক। আচ্ছা, এ তো তোমার গেল ফ্যামিলিপত্তনের গোড়ার কথা। এবারে গিয়ে তুমি নতুন কি দেখে এলে বল?

কিন্নরে তো বার মাসে তের নয়, একশ-রও বেশি পার্বণ। আমি গ্রীষ্মকালের 'বীশ' উৎসব দেখে এলাম। এর মাসখানেক আগে চৈত্রের 'চিত্রল' উৎসব হয়ে গেছে।

'বীশ' উৎসবটা কিরকম বাপি?

এ ফেস্টিভ্যালটাকে 'হলকর্ষণ' উৎসবও বলা যায়। কারণ, এই উৎসবের আগে জমিতে লাঙল পড়ে না। কৃষকরা ঘর থেকে লাঙল বের করে তার পুজো করে। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিপুজোও করতে হয়। তাছাড়া, সব উৎসবের মতো এখানেও বাদ্যি-বাজনা, নাচ-গান আছে।

কিন্নরে প্রচুর ফুল ছাড়া কোনও উৎসবই হয় না। কিন্তু গ্রীষ্মে ওখানে ফুল প্রায় দুর্লভ। একমাত্র খুবানি গাছের ডাল ভরে অজস্র পিঙ্ক রঙের ফুল ফোটে। আর সেই ফুল ঝুড়ি ঝুড়ি নিয়ে এসে পুজো হয়।

বাপি আমার কি মনে হচ্ছে জান, মামার বাড়ি দু-একবছর থেকে ওখানকার সব ফেস্টিভ্যালগুলো এনজয় করে আসি।

মণীশ ভাবে বিভোর হয়ে বললেন, সত্যি, কিন্নর-রূপের দেশ, উৎসবের দেশ।

চার

শরতের আকাশ গাঢ় নীল। দিগন্তের কোণে থমকে আছে ধবধবে সাদা মেঘ। গাড়িতে সোনারপুরের দিক থেকে এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টি সেরে ফিরছিল শুচি।

সবুজ শস্যভরা মাঠ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্লটের ভেতর বাড়িঘর গাছপালা। একটা নীলকণ্ঠ পাখি ডানায় অপূর্ব রং ছড়িয়ে ঝলক দিয়ে উড়ে গেল। ভারি খুশি হয়ে উঠল শুচি। আকাশের দিকে চোখ তুলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে কাকে যেন নমস্কার করল।

নীলকণ্ঠ পাখির দর্শন, মনে হল শুচির কাছে কোন শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে শুচি গাড়ির ড্রাইভার গোপালদাকে রুবি হাসপাতালের দিকে চালিয়ে নিতে যেতে বলল। এই মুহূর্তে কেন জানি না তার অগ্নিকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। কোন মুহূর্তে মন কোথায়, কখন, কার কাছে চলে যায় তার ঠিক ঠিকানা নেই।

একসময় গাড়ি এসে দাঁড়াল নন্দনলোকের গেটের সামনে। ও চোখ তুলে দেখল, বারান্দাতে কেউ নেই। অগ্নি বাড়ি আছে তো? সিঁড়ি কটা টপকে পেরিয়ে সে দাঁড়াল তার ফ্ল্যাটের সামনে।

বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। সামনেই মূর্তিমান অগ্নি।

কি রে তুই অসময়ে?

শুচি বন্ধুর বাড়ি থেকে সদ্য ভালমন্দ খেয়ে আসা হাতের পাতা ওর নাকের সামনে চেপে ধরল।

কি করছিস?

বল গন্ধটা কিরকম?

ভাল মন্দ সাঁটিয়েছিস মনে হচ্ছে।

তোরও অর্ধেক ভোজনের ব্যবস্থা করে দিলাম।

ঘ্রাণেন... বলে হো হো করে হেসে উঠল অগ্নি। তারপর বেশ সিরিয়াস হয়ে বলল, তুই এসে পড়েছিস, খুব ভাল হয়েছে।

কেন রে?

সামনে পুজো। তার কদিন পরেই আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মেম্বাররা ভুবনেশ্বরে একটা কনফারেন্সে যাচ্ছি।

কি বিষয় নিয়ে?

অগ্নি বলল, আমাদেব বিজ্ঞান ছাড়াও সাক্ষরতা ইত্যাদি নানারকম কর্মসূচি রয়েছে। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রভিন্স থেকে বিশিষ্ট বক্তা এবং গেস্টরা আসছেন। দু-দিনের কনফারেন্স। তারপর সারা ওড়িশার দর্শনীয় জয়গাগুলো দেখার ব্যবস্থা আছে।

শুচি গলায় কান্নার সুর তুলে বলল, তুই আমাকে আগে বলিসনি কেন?

অগ্নি বলল, তুই কি আমাকে আগে বলেছিস, তোর বাবা ছুটিতে যাচ্ছে?

শুচি অবাক হয়ে বলল. কই, না তো!

তবে তুই কি করে যাবি?

দৃঢ়তার সঙ্গে শুচি বলল, কেন, বাবা থাকলে আমি যেতে পারি না।

আজকাল দেখছি, তুই দারুণ সাহসী হয়ে উঠেছিস।

শুচি বলল, সাহসের কোনও ব্যাপারই নয়, তুই জানিস না আমার বাবা কীরকম লিবারেল।

তুই কার সঙ্গে যাচ্ছিস বলে বলিব?

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বন্ধুদের সঙ্গে। হে সাহসিকা, এখন বাড়ি গিয়ে বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে ফেল! আর দেরী নয়।

শুচি জানতে চাইল, যাওয়া হচ্ছে কত তারিখে?

সম্ভবত ২৭ অক্টোবর।

তোদের বিজ্ঞান-মঞ্চের মেম্বাররা কি আমাকে সঙ্গে নেবে?

সে ভার আমার। তোকে একজন মেম্বার করে নেব।

শুচি বলল, দয়া করে টিকিট-টা এবার আমাকে কাটতে দিও।

অগ্নি বলল, সে কি রে, টিকিটের ব্যবস্থা করবেন বিজ্ঞান-মঞ্চের সেক্রেটারি।

টাকাটা আমি দেব।

তা দিস। ডেলিগেট ফি কত হবে সেটা জেনেনি, তারপর তোকে বলব।

ওখানে থাকার ব্যবস্থা কি হবে?

ভুবনেশ্বরে একটা বড় হোটেল বুক করা হচ্ছে, তারই কনফারেন্স রুমে সেসনগুলো হবে। সেখানে কিছু ডেলিগেট থাকবে। বাকিরা যাবে একটু দূরে 'যাত্রীনিবাস'-এ।

যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে আমার ঘুম-টুম সব চলে যাবে।

অগ্নি শুচির মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, এখন তো পুজো দেখ, তারপর ওড়িশায় উড়ে যাবার কথা ভাববি।

খুশিতে শুচি ওর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিল। হ্যাঁ রে, মা, দিদি এঁরা সব কোথায়?

কাজ থেকে ফেরেনি।

তোকে কে খেতে দিল?

দিদি বলে গিয়েছিল, আমি খেয়ে নিয়েছি।

শুচি আর একটা কিল পিঠে বসিয়ে দিয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল।

গাড়িতে উঠে দেখল, বারন্দায় দাঁড়িয়ে অগ্নি হাত নাড়ছে। সেও গাড়ি থেকে হাত বের করে নাড়তে লাগল।

শুচির সেই মুহূর্তে মনে হল, আরও আগে কেন অগ্নির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। বাড়ি না পৌঁছানো অব্দি একটা 'ভাললাগা' তাকে আবিষ্ট করে রাখল।

সন্ধ্যায় ফ্রায়েড প্রণের সঙ্গে চা খেতে খেতে মণীশ বললেন, পরীক্ষা তো এগিয়ে আসছে, প্রিপারেশান কেমন চলছে রে?

সবকটা পেপার ঝালাই করে উঠতে পারিনি। এখনও গোটা চারেক পেপার বাকি।

মণীশ বললেন, দরকার হলে দেরী না করে টিউটর নিয়ে নাও।

সবাই সব পেপার পড়াতে চাইবেন না বাপি। যে পেপারটি নিজে পড়ান শুধু সেই পেপারটি তৈরি করে দিতে পারেন।

তাহলে নিজেকেই সব তৈরি করতে হবে।

তাই তো করছি বাপি। তবে আমাদের কলেজে অক্সফোর্ড ফেরৎ এক অল্পবয়সী অধ্যাপক এসেছেন, দারুণ পপুলার তিনি। তাঁর সাবজেক্টের বাইরেও ছেলেমেয়েরা যখন কিছু জানতে চায়, তখন বন্ধুর মত তাদের সব বুঝিয়ে দেন।

তাঁর কাছেই তো পড়তে পারিস।

একে তো ওঁদের টিউশনি না করাটাই রেয়াজ, তারপর আমি বললেই যে উনি রাজি হবেন এমন কোনও কথা নেই।

মণীশ বললেন, তুই ওঁর নাম ঠিকানাটা লিখে দে, আমি চেষ্টা করে দেখি।

তুমি এ ব্যাপারে একদম নাক গলাবে না বাপি, দরকার হলে আমিই বলব।

শুচি একদিন একান্তে পেয়ে গেল তাদের সেই প্রিয় অধ্যাপক হীরক দত্তগুপ্তকে।

কলেজ স্ট্রিটে পুরানো বইয়ের দোকান ছাত্রাবস্থা থেকেই হীরককে টানত। এখনও সে অভ্যেস ত্যাগ করা অধ্যাপক হীরকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মগ্ন অধ্যাপকটিকে একখানি পুরনো বইতে মুখ গুঁজে থাকতে দেখে শুচি দ্রুত পায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

নমস্কার স্যার।

হীরক বই থেকে মুখ তুললেন, খুশি হলেন।

এক একটি মুখ আছে, যার এক্সপ্রেশান মানুষকে আকর্ষণ করে। যার হাসি, চোখের উদ্ভাস, মানুষের কাছে বড় প্রীতিপদ মনে হয়। শুচি তেমনি একখানা মুখের ঐশ্বর্য নিয়েই জন্মেছে।

হীরক বললেন, কি খবর, কোথায় চলেছ?

বাড়ি ফিরব বলে গেট দিয়ে বেরিয়েই আপনাকে দেখতে পেলাম।

হীরক, পড়ানোর ফাঁকে অত্যন্ত তদ্‌গত মাধুর্যে ভরা সুন্দরী মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছেন। যে তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য, উগ্রতা আর অকারণ লাস্যের জন্ম দেয়, মেয়েটির ভেতরে তা একেবারে অনুপস্থিত। সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক আচরণে মেয়েটি নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে জানে।

হীরক জানতে চাইলেন, তুমি থাক কোথায়?

সল্টলেকে স্যার।

হীরক বিস্ময় চিহ্ন চোখে ফুটিয়ে বললেন, তার মানে আমার বাড়ির গায়ে বলো।

পুলকিত শুচি বলল, আপনি তাহলে সল্টলেকে থাকেন স্যার?

ঠিক সল্টলেকে নয়, ওর উল্টোদিকে ভি আই পি রোডের গায়ে লেকটাউনে থাকি।

শুচি বলল, এখন বাড়ি ফিরবেন?

পুরনো বই দেখার অভ্যেস, তাই নাড়াচাড়া করছিলাম। এবার ফিরব। এখন ট্রাম, বাসের যা অবস্থা।

চোখে করুণ মিনতির ছবি ফুটিয়ে শুচি বলল, আমার গাড়িতে কি আপানাকে পৌঁছে দিতে পারি স্যার?

তুমি গাড়িতে ফিরবে বুঝি, ঠিক আছে চল একই দিকে তো যাচ্ছি।

ইউনিভারসিটির উত্তর দিকে চওড়া রাস্তাটায় গোপালদা গাড়ি রাখে। শুচির সঙ্গে হীরক সেখানে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

গাড়ি ভিড় ঠেলে বিবেকানন্দ রোড ধরে মানিকতলা ক্রস করে বাইপাস ধরল।

সল্টলেকের সামনে এসে শুচি বলল, যদি কিছু মনে না করেন স্যার, আমার বাড়িতে একবার যাবেন? খুব কাছেই বাড়ি, আপনাকে গাড়ি করে আবার পৌঁছে দিয়ে আসব।

হীরক ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঠিক পাঁচটা। বললেন, চল, আজ কিন্তু আর বেশি সময় বসতে পারব না।

শুচি মিষ্টি হেসে বলল, তা হলে অন্যদিন একটু বেশি সময় থাকবেন আশা করতে পারি।

হীরক হেসে বললেন, খুব ইন্টেলিজেন্ট তুমি।

ভি আই পি রোড থেকে একটুখানি ঢুকেই ডানদিকে রাস্তার কর্নারে ওদের বাগানওয়ালা দোতলা বাড়িটা। রং থেকে জানলার গ্রিল পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটার গায়ে রুচির প্রকাশ।

সামনের বাগানে মরসুমি ফুলের বেড। বাড়ির পোর্টিকোর দু-দিকে দুটো ম্যাগনোলিয়া গাছ, সমানভাবে দোতলা অবধি উঠে গেছে।

হীরক গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে দেখলেন। মুখে বললেন, বাঃ।

শুচি আগে আগে পথ দেখিয়ে হীরককে ভেতরে নিয়ে গেল।

সাজানো ড্রয়িংরুমে বসিয়ে দ্রুত পায়ে পিসির খোঁজে চলে গেল শুচি। পিসি বিকেলের চা ও জলযোগের আয়োজন করছিলেন। শুচি ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, আমার কলেজের প্রফেসর এসেছেন।

আনন্দ উত্তেজনা যেন উপচে পড়ছিল শুচির চোখেমুখে।

কি খাবার করছ পিসি?

কি করব বল?

আগে বলো, তুমি কি করেছ?

চিংড়ি দিয়ে চাউমিন করেছি। চিংড়ির বড়াও হয়েছে।

ওতে চলবে। ফ্রিজে কি আছে?

কি আবার থাকবে।

মিষ্টিটিষ্টি কি আছে?

তোর বাবার আনা নকুলের সন্দেশ আছে।

চলবে, চলবে। শেষে কফি চাই কিন্তু।

সব হবে, তুই এখন গিয়ে তোর প্রফেসরের সঙ্গে কথা বল।

শুচি ছিটকে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ পাওয়ার আনন্দে সে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

অল্প সময় কথাবার্তার ভেতর অধ্যাপক হীরক দত্তগুপ্ত বারবার ওদের রুচির প্রশংসা করলেন।

একসময় হীরক বললেন, বাবা মা—।

বাবা হোম ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। মা কিন্নরে পোস্টেড।

অবাক কাণ্ড।

কেন স্যার?

একজন কলকাতায়, অন্যজন কিন্নরে।

আমার মা কিন্নরের মেয়ে, বাবা বাঙালি। দুজনেই আই. এ. এস। মা এইচ. পি. তে-ই রয়ে গেছেন।

বুঝলাম।

ড্রয়িংরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন পিসি। নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করা।

শুচি বলল, আমার পিসিমণি।

হীরক উঠে দাঁড়িয়ে নত হয়ে নমস্কার করল।

শ্যামলা রঙ, সুশ্রী ছেলেটিকে দেখে ভাল লাগল পিসির।

একটু চায়ের আয়োজন করেছি।

হীরক মৃদু হাসলেন।

শুচি বলল, আসুন স্যার। প্রথমদিন এসেছেন, একটু চা না খাইয়ে পিসি ছাড়বে না।

ওরা ডাইনিংরুমে গিয়ে ঢুকল। এখানেও টেবিল চেয়ারের সম্ভ্রান্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট। বসার ঘরের মতো এখানেও ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল।

হীরক একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট কার?

ও ভারটা আমার ওপর। খাবার-দাবারের চার্জে পিসিমণি।

ফ্রক পরা একটি কিশোরী মেয়ে একটা বড় প্লেটে দু গ্লাস জল নিয়ে এসে টেবিলে রাখল। পেছনে ট্রেতে খাবার নিয়ে এলেন পিসি।

হীরক বিস্মিত হয়ে বললেন, এরই মধ্যে এত আয়োজন।

কাজের শেষে এ সময় বাবাও ফিরে আসেন। আমরা একসঙ্গে সন্ধ্যার জলযোগটা সারি। আজ আপনি এসে পড়েছেন, খুব ভাল লাগল স্যার।

খেতে খেতেই বাইরে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল।

শুচি বলল, ওই বাবা এল।

হীরক দরজার দিকে তাকালেন। নিঃশব্দে ঢুকলেন মণীশ।

চোখ-মুখে খানিকটা বিস্ময়। পরমুহূর্তেই মৃদু হেসে অজানা অতিথিকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন।

পিসি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ইনি শুচির প্রফেসর। তুইও বসে যা। আমি খাবার আনছি।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া, আলাপ-আলোচনার পর গাড়ি গিয়ে লেকটাউনে ছেড়ে দিয়ে এল হীরককে। শুচিও কিন্তু তার অধ্যাপককে পৌঁছে দিতে সঙ্গে গিয়েছিল।

দু-তিনদিন পর পর ফেরার সময় শুচি হীরককে লিফট দিতে লাগল।

হীরক কিন্তু সল্টলেক পর্যন্ত এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়ত।

শুচি সাগ্রহে বলত, স্যার, এটুকু পথ গোপালদাকে ছেড়ে আসতে দিন।

হীরক হেসে বলতেন, থাক, এটুকুই যথেষ্ট।

গাড়িতে বসেই হীরক কোনও কোনদিন তাঁর পড়ানোর দারুণ প্রশংসা শুনত।

সিনজের 'রাইডারস টু দি সি' পড়ানোর আগে হীরক সমুদ্রের ওপর জেগে থাকা দ্বীপ এবং তার মানুষজন সম্বন্ধে যে পটভূমি রচনা করেছিলেন তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় ওই সব দ্বীপে গিয়েছিলেন তিনি। দুঃসাহসী হীরক ফিশারম্যানদের নৌকোতে যাত্রা করেছেন সমুদ্রের ওপর জেগে ওঠা দ্বীপগুলিতে। তাই বর্ণনাগুলো দিতে পেরেছিলেন দক্ষ আর্টিস্টের মতো।

ছাত্রছাত্রীরা এই ইয়ং প্রফেসরের বর্ণনা দারুণভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করত।

একদিন পথে আসতে আসতে শুচি বলল, আপনার দু-চারটে কথাতেই আজ সিনজের ভাবনার চমৎকার একটি স্কেচ ফুটে উঠেছিল।

হীরক শুচির দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, যেমন?

শুচি বলল— একটি দ্বীপের আদিম গন্ধে আপ্লুত সিনজ সেখানকার জীবনযাত্রার নানা ছবি আঁকতে লাগলেন। ভাষার ভেতরেও প্রয়োগ করলেন সে অঞ্চলের অসংস্কৃত চাষাভুষো মাঝি মাল্লাদের মোটা দাগের কথাগুলো, যা মাটি আর সমুদ্রের নোনা গন্ধে ভরা।

বাঃ! ড্রামাটার সঙ্গে চমৎকার একাত্ম হয়ে যেতে পেরেছ তো! ইংরেজিতে যা বলেছিলাম, তার সুন্দর বাংলা করলে। তুমি বাংলাতেও অনার্স নিতে পারতে।

শুচি সলজ্জ হাসি হাসল।

একদিন মণীশ মেয়েকে পড়ানোর প্রস্তাবটা রাখলেন।

হীরক কিন্তু অমত করলেন না। শুধু বললেন, পড়াতে পারি কিন্তু একটি শর্তে।

বলুন।

পড়ানোর ফিস আমি নিতে পারব না।

সে কিরকম হয়।

এ নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না, ভাল ছাত্র-ছাত্রীর কাছে কিছু বলে আনন্দ পাওয়া যায়।

একদিন পড়াতে পড়াতে হীরক বললেন, পুজোর ছুটিতে কি মায়ের কাছে কাটাবে নাকি?

এবার আমার মায়ের কাছে যাওয়া হবে না স্যার।

ছুটিতে কোথাও যাবে না?

'ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতির' একটা কনফারেন্স হচ্ছে ভুবনেশ্বরে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চও তাতে যোগ দিচ্ছে। আমি বিজ্ঞান মঞ্চের ডেলিগেট হয়ে ভুবনেশ্বর যাব ভেবেছি। ওঁরাই সারা ওড়িশা ট্যুরের ব্যবস্থা করবেন।

দারুণ। আমি একবার মাত্র গেছি। মন্দিরের মূর্তিগুলো দেখে আশ মেটেনি। ফটো তুলেছি অনেক। কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য অনেক মূর্তির ফটো বাদ পড়ে গেছে। এসব দু-তিন দিনের কর্ম নয়।

এবার আপনি কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

এখনও ঠিক করিনি। তোমরা কত তারিখে যাচ্ছ?

পুজোর পরে ২৬, ২৭ অক্টোবর হতে পারে।

ক্যামেরা সঙ্গে নিচ্ছ নিশ্চয়।

বাবার একটা পুরনো আশাহি পেনট্যাক্স আছে, ওটাই নিয়ে যাব ভাবছি।

হীরক খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, আরে আমারও তো আশাহি পেনট্যাক্স। অনেকদিন থেকেই ভাবছি, আর একটা মিনলটা সঙ্গে রাখব। এখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

রাতে ডিনার টেবিলে শুচি বলল, আশিসকাকু জাপান থেকে কবে আসছে বাপি?

পুজোর আগে, কেন?

মণীশের বন্ধু আশিস সেন জাপানের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কর্তা। উনি এলে অনেকগুলো দিনই মণীশ বেদজ্ঞর বাড়িতে কাটান।

শুচি বলল, বাপি, স্যারের ফটো তোলার দারুণ সখ। উনি একটা মিনলটার খোঁজ করছেন। তাই বলছিলাম, আশিসকাকুকে বলে একটা মিনলটা আনান যায় না?

কেন যাবে না? আমি কালই ওর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করব।

শুচি বলল, উনি তো আমাদের কাছ থেকে কিছু নেন না। একটা ক্যামেরাই না হয় প্রেজেন্ট করে দেব, কি বল বাপি?

ঠিক বলেছিস, ও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

যথাসময়ে ক্যামেরা এসে গেল। উপহারও দেওয়া হয়ে গেল।

হীরক প্রথমে নিতে চাননি কিন্তু শুচি যখন কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, তা হলে স্যার আপনার কাছে আর আমার পড়া হবে না।

কেন?

সামান্য একটা ক্যামেরা আমি আপনাকে উপহার হিসেবে দিতে পারব না, তাহলে কি করে আমি আপনার কাছে পড়ি?

ঠিক আছে, তোমার প্রথম দান আমি নেব, কিন্তু আর কোনও কিছু আমাকে দেবার চেষ্টা করো না।

ও প্রসঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে শুচি বলল, আপনার তোলা ছবিগুলো কিন্তু আমি দেখব।

অবশ্যই।

হীরক বললেন, দুটো ক্যামেরা কেন রাখতে চাই বলো তো?

শুচি বলল, একটা ফুরিয়ে গেলে আর একটা লোড করা রয়েছে।

হীরক হেসে বললেন, সেটাও তো ফুরিয়ে যাবে একসময়, তখন? আসলে দুটো ক্যামেরাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলবে।

সে কিরকম?

একটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, অন্যটি কালার।

ইতিমধ্যে একদিন শুচি অগ্নিকে কথা দিয়েও তার বাড়িতে যেতে পারল না। ওড়িশায় দুজনে কিভাবে কাটাবে তারই প্ল্যানিং করার কথা ছিল। আসলে সেদিন যে হীরকের পড়ানোর ডেট সেটা তার আগে মনে ছিল না। সে তার পড়াটাকে মিস করতে চায়নি।

হীরক সেদিন চলে যাবার পর অগ্নির কাছে যাবার সময় ছিল না শুচির। পরের দিন ছুটির পর সে অপরাধীর মতো অগ্নির ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হল। দরজা খুলে অগ্নিই তাকে পড়ার ঘরে বসাল।

কাল এলি না কেন?

কোনও একটা কথা বানিয়ে বলতে শুচির গলায় আটকাচ্ছিল। আবার এদিকে কেন জানি না, হীরকের কথাও সে গোপন রেখেছিল অগ্নির কাছ থেকে। তাই শুধু মৃদু হাসল কিন্তু অগ্নির কথার সঠিক জবাব দিতে পারল না।

এবার অগ্নি হঠাৎই বলল, কাল আমি যখন তোর অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, তখন তোর গাড়িটা হুশ করে বেরিয়ে গেল। একজন কেউ যেন বসেছিল তোর গাড়িতে, কে রে?

আরও সংকুচিত হল শুচি। কিন্তু এবার আর নীরব থাকা যায় না। আবার বানিয়ে বলাও তার রুচির বাইরে। সে আমনি বলল, কাল আমার এক স্যার সঙ্গে ছিলেন। লেকটাউনে উনি থাকেন, ওঁকে তাই লিফট দিয়েছিলাম।

ও, তাই আসতে পারিসনি, তা বেশ করেছিস। এখন বোস, আমাদের ভ্রমণের প্ল্যানিংটা ঠিক করেনি।

দুজনে মিলে আগাম প্লান আর প্রোগ্রাম ঠিক করল সন্ধে অব্দি।

মোটামুটি স্থির হল, দু'একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করবে শুচি। বাকিগুলোতে তার না থাকলেও

চলবে। সেই অবকাশের সময়গুলোতে সে তার কেনাকেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মেয়েদের রাত্রিবাস যাত্রীনিবাসে, আর পুরুষ ডেলিগেটরা থাকবেন, কয়েক কিলোমিটার দূরের এক হোটেলে। বিশিষ্ট অতিথি বক্তারা থাকবেন আর একটি হোটেলে, যার তলায় অ্যাসেমব্লি হলে বিজ্ঞান মঞ্চের অনুষ্ঠানগুলো হবে।

শুচির পীড়াপীড়িতে দুদিন আগেই ওরা পুরী এক্সপ্রেসে পুরী চলে গেল। এ দুদিন দুবন্ধুতে কাটাবে পুরী হোটেলের আকাশ ছোঁয়া সবচেয়ে উঁচু তলার দুটো পাশাপাশি ঘরে। সেখানে থেকে নির্দিষ্ট দিনে ভুবনেশ্বর যাত্রা। শুচি বলেছিল, দার্জিলিঙে তুই আমাদের সমস্ত খরচ যুগিয়েছিস, এবার পুরীর সব খরচ আমার। তুই আমাকে পাহাড়ে সৌন্দর্য দেখিয়েছিস, আমি তোকে সমুদ্রের শোভা দেখাব।

অগ্নিকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুই এবার আর গোঁয়ার্তুমি করিসনা প্লিজ।

অগ্নি হেসে বলেছিল, দার্জিলিঙের কথা তুলে তুই আমার মুখ বন্ধ করে দিলি।

বারান্দায় তুফান তোলা হাওয়ায় রেশমি কোমল চুল উড়িয়ে বন্ধুর হাত ধরে বসে রইল শুচি।

দিগন্তে নীল আকাশের সঙ্গে নীল সমুদ্র মিশে গেছে। ঢেউয়ের দোলনায় দুলতে দুলতে নুলিয়াদের নৌকোগুলো চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

ওরা সবার সঙ্গে ঢেউ ভেঙে স্নান সারল। এখন চনচনে ক্ষিদে নিয়ে ঢুকল ডাইনিং হলে।

শুচি বলল, মেনু কার্ডে তুই পছন্দমাফিক অর্ডার দে।

আমি কেন, তুই।

না, না নির্বাচনের কাজটা তোর, পেমেন্টটা আমার।

দুপুরে আবার সেই ব্যালকনিতে বসা। কিছু গান, কিছু আবৃত্তি, কিছু টুকরো টুকরো কথা। আর সারাক্ষণ সেই চিরপুরাতন তবু নিত্যনবীন সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকা।

শুচি উত্তেজিত হয়ে অগ্নির পিঠে আলতো হাতের ছোঁয়া রেখে বলল, দেখ, দেখ দূরে ময়ূর নাচছে।

সত্যি তাই। ভায়োলেট, নীল, নীলাভ সবুজ মিলে সমুদ্র দিগন্তে ময়ূরের পেখমের বাহারী নীল ছড়িয়েছে।

অগ্নি বলল, বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখ, বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ছুটে আসছে ময়লা এক চিলতে শাড়ি পরা একটা ছোট্ট নুলিয়া মেয়ে। একরাশ চুল উড়ছে, কি খুশি, কি খুশি। সাদা কুন্দ ফুলের মতো হাসি ছড়াচ্ছে।

দু-হাতে অগ্নিকে ঠেলে দিয়ে শুচি বলল, তুই যে কবি হয়ে গেলি রে।

আর একটি দৃশ্যপট উন্মোচিত হল। সাদা সাদা পালতোলা অন্ধ্র নুলিয়াদের বড় বড় নৌকোগুলো সারি বেঁধে চক্রতীর্থের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। ওরা বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রকে অর্ধচক্রাকারে ঘিরে চলল। হয়তো সারারাত ধরে ওরা সমুদ্র চষে মণ মণ মাছ তুলবে। এটাই ওদের যাত্রা লগ্ন। তেলেগু নুলিয়াদের ছোট্ট নৌকোগুলো এখন তীরে বালুর বিছানায় শুয়ে আছে। সীগালগুলো উড়ছে। সাদা পাখায় অপরাহ্নের রঙ মেখে অপরূপা হয়ে উঠেছে।

পুরীর সমুদ্রতীর ছেড়ে আর কোথাও বেরোল না ওরা। অলস দিনগুলো গড়িয়ে চলল আনন্দের নক্সীকাঁথা বুনতে বুনতে।

দু-দিন পরে বাসে যাত্রা, রাজধানী ভুবনেশ্বর। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ, সর্বপ্রদেশের ডেলিগেটরা নির্দিষ্ট হোটেলে এস হাজির। কলরব মুখরিত প্রাঙ্গণ। ওরা দুজনও সেই ডেলিগেট সমুদ্রে মিশে গেল। অগ্নি শুচির হাতে নাড়া দিয়ে বলল, একে সুন্দর, তার ওপর যেরকম সেজেছিস, তাতে না ডেলিগেটদের মাথা ঘুরে যায়।

তুইও মেয়েদের দিকে তাকাসনে। নাকটা যদি একটু সরু হত না তুইও মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড হয়ে যেতিস। যে রকম রমণীমোহন স্ট্রাকচার তোর।

সেদিকে এগিয়ে গেল দুজনে।

অগ্নি, তোমরা এসে গেছ। ওর নামটা যেন কি?

শুচি।

ওকে যাত্রীনিবাসে নিয়ে যাও। সব মেয়েরা ওখানে চলে গেছে। শুচি, তুমি ওদের একটু দেখাশোনা কোর।

শঙ্করদা জনারণ্যে মিশে গেলেন।

দিনে দু-একবারের বেশি দেখা হয় না অগ্নির সঙ্গে শুচির। কেউ সেমিনার অ্যাটেন্ড করছে আবার কেউ কাজের ফাঁকে মার্কেটিং করছে।

সম্বলপুরের তিনখানা শাড়ি কিনেছে শুচি। সালোয়ার-কামিজ বানাবার জন্য কয়েক পিস ম্যাচিং কট্‌কি সিল্কও সংগ্রহ করেছে সে।

গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়ামে সে তখন তার ব্যাগে জিনিসগুলো ভরে রাখছিল, এমন সময় হঠাৎ তাকিয়ে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন হীরক দত্তগুপ্ত।

এ যে দেখি 'বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলনা' কিনে ফেলেছ।

উদ্ভাসিত হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল শুচি।

স্যার আপনি।

ছুটিতে তুমি ডানা মেলতে পার, আমি পারি না।

সে কি স্যার নিশ্চয়ই। কোথায় উঠেছেন আপনি?

স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে।

শুচি খুব উল্লসিত হয়ে বলল, দারুণ আনন্দ হচ্ছে আমার। ওমা, সেই মিনলটাই তো দেখছি আপনার কাঁধে ঝুলছে।

আমি কিন্তু তোমার উপহার দেওয়া ক্যামেরায় একটিও ছবি তুলিনি।

কেন স্যার?

উপহারদাতার ছবি সবার আগে তুলব বলে।

সে তো স্যার আমার বাড়িতেই তুলতে পারতেন?

তা কি হয়? উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া সাবজেক্ট খুলবে কি করে। কাল তোমার কি প্রোগ্রাম?

এমন কিছু প্রোগাম নেই, আমি মাঝে মাঝে সেমিনারে যোগ দেব ভেবেছি।

হীরক বললেন, কাল রাতের গাড়িতে আমি কলকাতা ফিরব। কাল ভোরবেলা তুমি এখানে থেক, আমি তোমাকে গাড়িতে পিক আপ করে নেব। সারাদিনের প্রোগ্রাম কিন্তু। ফিরে এসে আবার আমাকে কলকাতা ফেরার গাড়ির জন্যে তৈরি হতে হবে।

কোথায় যাওয়া হবে স্যার?

যেতে কোনও আপত্তি আছে কি?

শুচি বলল, না না, একথা বলছেন কেন স্যার, আমি তো সেমিনারের নামে বেড়াতেই এসেছি।

তা হলে এখন আসি— বলেই হীরক চলে গেলেন।

সেদিন ও সেমিনার অ্যাটেন্ড করল। অগ্নির সঙ্গে দেখাও হল। কিন্তু হীরকের কথা একটিবারও উচ্চারণ করল না।

পরের দিন গাড়ি ছুটে চলল প্রথমে রাজারানী মন্দিরের দিকে। মন্দিরটি ছোট, কিন্তু তা অযত্ন রক্ষিত। গায়ের কাজগুলি কালজয়ী শিল্পের নিদর্শন হয়ে আছে।

হীরক বললেন, ওই দেখ মন্দিরের গায়ে 'অলসকন্যা'-র মূর্তি। কি অপূর্ব দেহভঙ্গিমা।

হীরক এবার তাকালেন শুচির দিকে। সি-গ্রিন রঙের আটোসাটো একটা সালোয়ার কামিজ পরেছে শুচি।

হীরক বললেন, এবার মিনলটার উদ্বোধন হোক। তুমি আমাকে একটা উপহার দিয়েছ, এবার আমি তোমাকে একটা উপহার দিই।

শুচি কথাটার সঠিক অর্থ অনুমান করতে না পেরে হীরকের দিকে তাকাল।

তুমি ওই মূর্তির পাশে ওরই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাক। তুমি এনজয় করছ কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ।

শুচি কোনও প্রতিবাদ না করে, মৃদু হেসে তেমনি 'অলসকন্যা'-র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইল।

নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ক্লিক ক্লিক করে কতকগুলো ফোটো তুলল হীরক।

রোমাঞ্চিত শুচি। ফোটো তোলা শেষ হয়েছে ভেবে সে নেমে আসছিল, হীরক মাথা নেড়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে ইঙ্গিত করল।

আবার তেমনি মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে দাঁড়াল শুচি। বিশেষ ভঙ্গিতে সে হাতে ধরে রইল তার হলুদ ওড়নাখানা।

এবার এই মুদ্রাটি শুচি নিজের থেকেই দিল।

হীরক বলল, চমৎকার।

সে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে ছবি তোলার আয়োজন করছিল কিন্তু এবারও মিনলটাতেই এই বিশেষ ভঙ্গির কালার ছবিটি তুলল।

ঝটপট ক্যামেরাগুলো ব্যাগে পুরে হীরক বলল, চল এখন রূপতীর্থ কোণারকে যাই।

কোণারক, সে তো অনেক দূর স্যার?

তুমি আগে গেছ?

না স্যার। এখানে এসে শুনেছিলাম। তাছাড়া সেমিনারের শেষে সবাই মিলে কোণারক যাওয়ার প্ল্যান আছে।

আর একবার না হয় যাবে। সুন্দর জিনিস বারবার দেখলেও আশ মেটে না।

শুচি হীরকের সঙ্গে গড়িতে গিয়ে উঠল।

গাড়ি ছুটে চলল অজানা পথের রোমঞ্চ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

দূরে সমুদ্র ঝিলিক দিচ্ছে। হাওয়ায় বন ঝাউ শব্দ তুলছে সেতারের মতো। সবুজ গাছপালা ঘেরা দু-একটি ছবির মতো সি-রিসর্ট। ভারী আনন্দময় উজ্জ্বল সূর্যালোক।

কিছু সময়ের ভেতরে পুরনো পিপ্‌লি টাউনে এসে পড়ল গাড়ি।

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন হীরক।

শুচির দিকে তাকিয়ে বললেন, নেমে এস শুচি।

বাধ্য ছাত্রীর মতো শুচি নেমে দাঁড়াল।

হীরক রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছেন, শুচি তার পাশে পাশে।

হীরক বললেন, এ অঞ্চলটির নাম পিপ্‌লি। প্রাচীনকাল থেকে এখানকার শিল্পীরা অসাধারণ সব এপ্লিকের কাজে দক্ষ। আগেকার দিনে জমিদারবাড়ির অনুষ্ঠানে বড় ছোট নানা ধরনের সামিয়ানার ব্যবহার হত। তার ভেতরে ফুল লতা পাতা পাখির নানা রং বাহারি কাজ এই পিপ্‌লির শিল্পীরাই করতেন। গার্ডেন আম্ব্রেলাতে ওদের রঙিন কারুকাজগুলি বিখ্যাত।

কথা বলতে বলতে পাশের একটা দোকানে ঢুকে পড়লেন তিনি। দড়িতে ঝুলছে নানা রঙের, নানা আকারেব বটুয়া ব্যাগ। চমৎকার সব কাজ করা। একটা হলুদ বটুয়া হীরকই পছন্দ করলেন। তার গায়ে লাল ঠোঁট সবুজ রঙের টিয়াপাখি।

পছন্দ হয় তোমার?

মুখে সম্মতির ভাব ফুটিয়ে টাকা দেবার জন্য পার্স খুলল।

এই প্রথম, হীরক শুচির হাত ধরে তাকে টাকা বের করতে বারণ করল। এই একটুকু ছোঁয়াতে শুচির ভাবান্তর ঘটল। সে আর টাকা দিতে পারল না।

তুমি আমাকে এতবড় উপহার দিয়েছ, আমি তোমাকে এই সামান্য একটু উপহার দিতে পারব না?

একটু থেমে আবার বললেন, বন্ধুদের জন্য যদি কিছু কিনতে চাও তা'হলে এবার তোমার পার্সের সদ্ব্যবহার করতে পার।

শুচি বড়, ছোট তিন চারখানা নানা রঙের ব্যাগ কিনল।

এরপর গাড়িতে উঠে দুজনে সিধে চলে গেল কোণারক।

গাড়ি থেকে নেমে হীরক বলল, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, গভর্নমেন্ট রেস্ট হাউসের ক্যান্টিনে চল। লাঞ্চ শেষ করে মন্দির দেখব।

ওরা লাঞ্চ সারল। শুচি সাহস করে এবার আর ব্যাগ খুলতে পারল না।

বিশ্ববিখ্যাত সূর্যমন্দির। কালের আঘাতে অনেক কিছু ভাঙছে। এখন বেশ কিছু অংশে সারাইয়ের কাজ চলছে।

কোণারক মন্দির সম্বন্ধে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাটি হীরকের জানা ছিল।

তিনি শুচির দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মন্দির একটি রথের আকারে পরিকল্পিত। এর দু-দিকের বারটি চক্র বার মাসের প্রতীক। সাতটি অশ্ব সপ্তদিবসের প্রতীক। এই রথের সারথী দেব দিবাকর, জ্যোতির্ময় সূর্য।

তিনি সপ্ত অশ্ববাহিত রথটিকে মহাকাল সিন্ধুর দিকে চালনা করে নিয়ে চলেছেন।

অভিভূত হয়ে শুচি বলল, চমৎকার ব্যাখ্যা স্যার।

হীরক বললেন, এস আমরা মন্দিরটা ঘুরে ঘুরে দেখি। সমস্ত মন্দিরে জীবনের শোভাযাত্রা দেখতে পাবে। সূর্যই আমাদের বিপুল প্রাণের উৎস। তাই সূর্যের রথে সেই প্রাণেরই আলেখ্য আঁকা। জীবনের এমন কোনও রূপ নেই যা এই মন্দিরগাত্রে চিত্রিত হয়নি। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্রিয়াকর্ম থেকে ধ্যানস্তব্ধ জীবনের মহিমা পর্যন্ত এই চিত্রাবলীর মধ্যে প্রকাশিত।

শুচি মন্দিরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজগুলি গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগল।

এবার মন্দিরের ওপরের দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করলেন হীরক।

অনেক উঁচুতে মন্দিরের চূড়া স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে মৃদঙ্গবাদিনী, মুরলীবাদিনী আর মন্দিরাবাদিনী কন্যার দল। অসাধারণ দেহভঙ্গিমা তাদের।

এক জায়গায় দেখা গেল, প্রেমিক পুরুষ মুগ্ধ আবেগে তুলে ধরেছে তার প্রেমিকার স্বপ্নমুদ্রিত মুখখানি।

ঠিক সেই জায়গাটিতে এসে হীরক বললেন, ওই মূর্তির নীচে কার্নিশের ওপর দাঁড়াও। ভাব, ওই মূর্তির নারীর সঙ্গে তুমি অভিন্ন।

সত্যি আজ কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে শুচি। সে তেমনি প্রেমভাবনায় প্রস্তরের নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

নীচ থেকে একটা শট নিয়ে হীরক বললেন, দারুণ। এ ছবি এনলার্জ করে একখানা তোমাকে দেব, আর একখানা আমার কাছে থাকবে। না, না, অমনি দাঁড়িয়ে থাক, আর দু-চারখানা তুলেনি।

সম্ভবত ছবি তুলতে তুলতে পেছনের দিকে সরে যাচ্ছিলেন হীরক। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে শুচির ধ্যান ভেঙে গেল। সে তাকিয়ে দেখল, হীরক কোথাও নেই। সে দ্রুত নেমে এল কার্নিশ থেকে সিঁড়ি বেয়ে।

অল্প নিচুতে হলেও হীরক পিছোতে পিছোতে গিয়ে পড়ে গেছে পাথরের মেঝের ওপর। বুকের মাঝে ক্যামেরাটি ধরা আছে। মুখে যন্ত্রণার কাতরতা।

দৌড়ে গিয়ে সে হীরককে সাধ্যমতো শক্তিতে তুলে ধরল তার কোলের ওপর।

হীরককে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে দু-একজন কৌতূহলী দর্শক এগিয়ে এল। তাদের সাহায্যে হীরককে ধরাধরি করে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলা হল।

ড্রাইভার ছেলেটি খুবই ভাল। সে হীরকের এই অবস্থা দেখে গা-হাত-পা টেনেটুনে ম্যাসাজ করে দিল।

এখন সারাটা পথ শুচির কোলে মাথা রেখে ভুবনেশ্বরের দিকে ফিরে চললেন হীরক। সে কথা বলছিল। কিন্তু কথার ভেতরেও মাঝে মাঝে প্রকাশ পাচ্ছিল যন্ত্রণার কাতরতা।

এই মুহূর্তে শুচির বড় প্রয়োজন অগ্নিকে। সে গাড়িটা হীরকের হোটেলের দিকে নিয়ে যাওয়ার আগে তাদের হোটেলের সামনে এনে রেখে ছুটল অগ্নির খোঁজে।

শুচি অ্যাসেমব্লি হলের সামনে পেয়ে গেল তার বন্ধুকে।

বড় বিপদ অগ্নি, তুই একবারটি আয়।

'বিপদ' শুনেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল অগ্নি। সে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। কোনও প্রশ্ন না করে শুচির পেছন পেছন দ্রুত পা ফেলে চলে এল হীরকের গাড়ির কাছে।

শুচি বলল, ইনি আমার স্যার। কোণারককে ফটো তোলার সময় এক ধাপ সিঁড়ির নিচে পড়ে গিয়ে ডানদিকের পায়ে চোট পেয়েছেন। ওঁর আজই পুরী এক্সপ্রেসে কলকাতা ফেরার কথা।

শুচির কথা শুনতে শুনতেই অগ্নি গাড়ির ভেতর হাত বাড়িয়ে দিয়ে হীরককে সাবধানে নীচে নামাল।

মসৃণ পাথরের সমতল একটা জায়গায় সে শুইয়ে দিল হীরককে।

এবার পাটাকে ঘুরিয়ে, টেনে উঁচু করে নানারকম পরীক্ষা করল সে। কণ্ঠের কাতরোক্তি, চোখমুখের এক্সপ্রেশান, সবই সে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করল।

শুচির দিকে তাকিয়ে বলল, ইনি আছেন কোথায়?

এবার অগ্নি হীরককে আশ্বস্ত করে বলল, আপনার হাড়ে ফ্রাকচার হয়নি, মাংস পেশিতে চোট লেগেছে। আপনার এখন বেড-রেস্টের দরকার। চলুন আপনার হোটেলে, ওখানেই ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হবে।

ওরা তিনজনেই হীরকের হোটেলে এসে ঢুকল। দোতলার ঘরটা বাতিল করে একতলার একখানা ঘরে শিফট করল হীরক।

অগ্নি একটা প্রেসক্রিপশান লিখে শুচির হাতে দিয়ে বলল, নিয়ে আয়। ওতে খাওয়ানোর ইন্সট্রাকশান দেওয়া আছে। আমি কিছু পরে এখানে আসব, তুই স্যারের কাছে থাক এখন।

হীরক কাতর গলায় বললেন, আমাকে যে আজ রাতেই ফিরতে হবে, টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

নিশ্চয় ফিরবেন, আমি একটু পরেই আসছি।

হীরক বেরিয়ে গেল তাদের হোটেলের দিকে। সেখানে অবস্থা কিছু সামাল দিয়ে আবার ফিরে এল।

ইতিমধ্যে হীরককে পেইন-কিলার জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়ে গেছে। তিনি চোখ বুজে পড়ে আছেন। তাঁর পাশেই বসে রয়েছে শুচি। তার একখানা হাত ছুঁয়ে আছেন হীরক।

একটু আগেই কথা হচ্ছিল শুচির সঙ্গে।

কিছুটা ওপরে উঠে যখন ফটো নিচ্ছিলাম তখন যদি পিছোতে গিয়ে পড়ে যেতাম তাহলে আজ আর এখানে এসে শুয়ে থাকতে হত না। কোণারক হত আমার শেষ শয্যা।

শুচি বেশ কাতর গলায় বলল, ও কথা বলবেন না স্যার।

হীরক এবার অন্য কথা পাড়লেন, ভাগ্যিস ক্যামেরাটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পাথরে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি, তাহলে অনেক কিছু হারাতে হত।

শুচি বলল, ঈশ্বরের কৃপায় আপনি যে প্রাণে বেঁচেছেন, এটাই আমাদের সব থেকে বড় পাওয়া। ক্যামেরা ভাঙল কি রইল সেটা আমার কাছে একেবারে অবান্তর।

ঠিক সেই সময়েই হীরক শুচির হাতটা ছুঁয়ে দিয়ে বললেন, ও কথা বল না, আমার কাছে ওর মূল্য অপরিসীম। ওটা আমার স্মৃতির ট্রেজারহাউস।

শুচি কোনও উত্তর করল না।

একটু থেমে হীরক আবার বললেন, ওই যুবকটি কে?

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের একজন অ্যাকটিভ মেম্বার। ডাক্তারি পড়ছে।

তোমার পরিচিত মনে হল?

শুচি এবার ঘুরিয়ে বলল, ও কার না পরিচিত। যে কোনও মানুষের বিপদ জানতে পারলেই ও দৌড়ে এসে তার পাশে দাঁড়াবে।

তুই তোকারি করে কথা বলছিল, তাই ভাবলাম, তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের কেউ।

হীরক দত্তগুপ্ত যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেও কৌতূহল চরিতার্থ করার পথ খোঁজেন।

অগ্নি প্রায় সমবয়সী সকলের সঙ্গেই তুই তোকারি করতে ভালবাসে।

এতক্ষণ পরে 'উঃ' বলে মুখটাকে বিকৃত করলেন হীরক দত্তগুপ্ত।

খুব লাগছে স্যার?

চোখ কুঁচকে মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে হীরক অন্য কথা পাড়লেন, কবে ফিরছ?

একত্রিশে অক্টোবরে ফেরার ব্যবস্থা করেছে বিজ্ঞান মঞ্চ।

হীরক বললেন, তুমি ছুটিতে ভুবনেশ্বরে আসবে বলেছিলে, তাই আমিও দুদিনের জন্য চলে এলাম। একসঙ্গে ফিরতে পারলে ভাল লাগত, কিন্তু কি আর করা যায়।

শুচি বলল, আপনি যদি ছুটিতে আর কোথাও না যান তাহলে আগামী সপ্তাহে চলে আসুন আমাদের বাড়িতে।

হ্যাঁ পড়াশোনার কাজটা তাড়াতাড়ি শুরু করে দেওয়াই ভাল। ইতিমধ্যে কোণারক পর্বের ফটোগুলো পেয়ে গেলে সঙ্গে নিয়ে যাব।

ফটোগুলো দেখার জন্য আমিও উৎসুক হয়ে রইলাম স্যার।

তুমি আমাকে ক্যামেরা উপহার দিয়েছ, আমি তোমাকে ফটো উপহার দেব।

শুচি বলল, দারুণ খুশি হব আপনার তোলা ছবি পেলে।

কথা বলতে বলতে ভেজানো দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে শুনতে পেয়ে উঠে গেল শুচি।

দরজা খুলে দিয়েই বলল, এসো অগ্নিদেব।

পেসেন্টের অবস্থা?

ও.কে.।

অগ্নি এগিয়ে গিয়ে বলল, কেমন আছেন স্যার?

ততক্ষণে হীরকের মুখের স্বাভাবিক আকারটাই পাল্টে গেছে। মুখে ফুটে উঠেছে বিকৃতির চিহ্ন।

আবার একবার পাটা নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করল হীরক।

বলল, ভাবনার কিছু নেই, তবু কলকাতা ফিরে গিয়ে আপনি একটা এক্সরে করিয়ে নেবেন।

গাড়ি ভুবনেশ্বরে ইন করবে দশটার পর। অগ্নি কিন্তু সব কাজ ফেলে শুচির সঙ্গে বসে রইল হীরকের রুমে। যথাসময়ে হোটেল থেকে খাইয়ে দাইয়ে গাড়িতে করে দুবন্ধুতে হীরককে নিয়ে গেল স্টেশানে। ভাগ্যিস লোয়ার বার্থে জায়গা পেয়েছিল হীরক।

শুচির সঙ্গে অগ্নি ধরাধরি করে চটপট বিছানা পেতে দিল।

অগ্নি বলল, যন্ত্রণাটা বাড়লে যে ওষুধ খেতে বলেছি সেটা হাতের কাছে রেখে দিন। মনে হয়, ওটার আর কোনও দরকারই হবে না। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি, আরামে ঘুমোবেন।

গাড়ি ছাড়ার হুইসেল বাজতেই ওরা প্ল্যাটফর্মে নেমে গিয়ে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল। কেন জানিনা, ওদের দুবন্ধুকে একসঙ্গে দেখে খুশি হতে পারলেন না প্রফেসর দত্তগুপ্ত।

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে গতি নিয়ে ধাতব শব্দ ছড়াতে ছড়াতে অদৃশ্য হল।

রাত হয়েছিল, শুচি বলল, চল, একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে কিছু খেয়েনি।

অগ্নি বলল, কিছু কিরে, সাঁটিয়ে খাব। আর সেটা তোর মানিব্যাগ উজাড় করে।

শুচি বলল, চল পেটুক, কত খেতে পারিস দেখব।

ওরা পাশের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল।

শুচি বলল, তুই যে এতক্ষণ এখানে রয়ে গেলি, তোর ডিউটি কে করছে রে?

আমার এক বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এসেছি।

তোর কাজ করবে যে, তার ঘাড় নিশ্চয় খুব শক্ত।

অগ্নি বলল, ওর ঘাড় নয়, সহ্যশক্তি।

সহ্যশক্তি!

হাঁরে, বসুন্ধরা যেমন আমাদের সমস্ত আবদার অত্যাচার নীরবে সহ্য করে এও তেমনি সর্বংসহা।

বড় হেঁয়ালি করছিস, খোলসা করে বল।

অগ্নি বলল, ওর নাম বসুধা, আমার ক্লাশ মেট। বিজ্ঞান মঞ্চের সভ্য।

শুচি এবার চেপে ধরল, তুই তো আগে কখনো ওর কথা আমাকে বলিসনি।

কি বলব বল, এরকম পরিচিত বন্ধু আমার একডজন আছে। কাকে ফেলে কার কথা বলি।

শুচি আবার বলল, তুই সত্যি করে বলবি একটা কথা?

তোর কি ধারণা, আমি কখনও কখনও মিথ্যে করে বলি?

ওটা একটা কথার কথা।

এখন বল, কি জানতে চাস?

শুচি সোজাসুজি বলল, আমি তোর কি রকম বন্ধু রে?

তুই কি বুঝতে পারিস না?

তবু শুনি তোর মুখে। তোর ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনাটা মিলিয়ে দেখি।

সবচেয়ে বড় বন্ধু বললে অনেক কম বলা হয়।

শুচি বলল, তুই আমার ভেতর কি দেখলি রে?

তোর মনটা জলের মত, শুকনো মাটিকে স্নিগ্ধ সরস করে তোলে। আবার দরকার হলে সে দপ্ করে জ্বলে ওঠে আগুনের মত।

শুচি বলল, তুই বোধহয় বসে বসে এসব কথা ভাবিস?

বসে বসে ভাববার মত অঢেল সময় আমার হাতে নেই। একটা ক্যামেরা মনের ভেতর ফিট করা আছে। ছবির মত ছবি সামনে এলে সেটা আপনি ক্লিক করে। তুই একটা ছবির মত ছবি, তাই কখন উঠে গেছিস। আর, একবার উঠে গেলে সে কখনো মুছে যায় না।

শুচি বেশ মজা করে বলল, তোর কথায় আমি বিগলিত।

তারপর কাঁটার একটা খোঁচায়, বাটারে সেদ্ধ মুর্গীর একটা কলজে নিজের প্লেট থেকে তুলে নিয়ে অগ্নির প্লেটে ফেলে দিয়ে বলল, এই কল্জেটা, আমার দিক থেকে তোর জন্যে তোফা।

অগ্নি বলল, খাবার দ্রব্য হাজার আছে, কিন্তু হৃদয়কে চর্বণ করে গিলে ফেলার খবর আমার জানা নেই।

শুচি হঠাৎ বলে উঠল, ওরে সর্বনাশ, ঘড়ির কাঁটা বারটা ছুঁই ছুঁই।

ঝটপট দাম চুকিয়ে দিয়ে ওরা একটা অটো ধরে হুস্ করে উড়ে গেল যাত্রীনিবাসের দিকে।

শুচি বলল, আমাকে যাত্রীনিবাসে পৌঁছে দিয়ে তোর হোটেলে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। সেখানে পৌঁছেই শঙ্করদার কাছে যা ঝাড় খাবি না।

অগ্নি বলল, ওসব বনেদী ঝাড়ের কি বুঝিস তুই। যত বড় ঝাড় তত আলোর রোশনাই।

পরের দিন মহাসমারোহে সেমিনারের কাজ চলল। কোনও বক্তা সাক্ষরতার বিষয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। কেউ বা গ্রাম্য জীবনের বিকাশে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা চালাতে লাগলেন। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান গবেষণার নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করলেন কেউবা।

গ্রামের মানুষদের কাছে চিকিৎসার সবরকম সুবিধা কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি আলোচনা করলেন ডাঃ কল্যাণব্রত ব্যানার্জী।

তরুণ ডাক্তাররা আজকাল গ্রামে যেতে চান না, এই সমস্যা নিয়েও তিনি চমৎকার একটি পথ নির্দেশ করলেন।

ডাঃ ব্যানার্জির বক্তৃতাটি দারুণভাবে অ্যাপ্রিসিয়েটেড হল।

প্রশ্নোত্তর পর্বে উঠে দাঁড়াল অগ্নি। সে বলল, তরুণ ডাক্তারদের গ্রামের হাসপাতালগুলিতে না যাবার বিশেষ কারণ আছে। শহরে চিকিৎসার যে সব ফেসিলিটি আছে তা অধিকাংশ গ্রামে নেই। এখনও বেশির ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ যায়নি। তাছাড়া গ্রামের মেডিকেল সেন্টারে প্রয়োজনীয় ওষুধের স্টক নেই। এতে অনেক সময় চিকিৎসা বিভ্রাট হয় এবং ডাক্তাররা বদনামের ভাগী হন। সরকারি হেলথ ডিপার্টমেন্ট এ বিষয়ে সজাগ না হলে অযথা তরুণ ডাক্তারদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

ডাঃ ব্যানার্জি উত্তরে বললেন, আমার প্রিয় ছাত্র এবং বিজ্ঞান মঞ্চের সভ্য যে সমস্যাটি তুলে ধরেছেন তা আমাদের নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ দিনে দিনে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয় সুফল আমরা পেয়ে যাব। এখানে ভোটকেন্দ্রিক সরকারি গড়িমসির সমস্যা যদি না থাকে তাহলে অচিরে বিদ্যুৎ পেতে আমাদের অসুবিধা হবে না।

দ্বিতীয় সমস্যাটি গুরুতর এবং বিশেষভাবে ভেবে দেখার। গ্রামের হেলথ সেন্টারে ঠিক ওষুধটি ঠিক সময়ে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। জীবনদায়ী ওষুধপত্রের স্টক নেই বললেই চলে। ডিস্ট্রিক্ট হেলথ সেন্টারে লেখালেখি করেও চাহিদার তুলনায় অনেক কম ওষুধই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরকে সচেতন করার দায়িত্ব জনসাধারণের। তাঁরা দলমত নির্বিশেষে জনপ্রতিনিধিদের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন।

একটু থেমে ডাঃ ব্যানার্জি তাঁর একটি স্মৃতি রোমন্থন করলেন।

আমি সেবার নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মায়াবতী, আর শামলাতাল গিয়েছিলাম। এই দুটি জায়গাতেই রামকৃষ্ণ-মিশনের আশ্রম আছে। তুষার পর্বতের মহিমা এবং অরণ্যে ঘেরা পাহাড় পর্বতের শোভা দুর্গম পথযাত্রীদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু দেখে বিস্মিত হলাম পাহাড়ি গ্রামগুলিতে সরকারি চিকিৎসার বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেই। পথঘাটও সহজগম্য নয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের দু জায়গাতেই দুটি হাসপাতাল আছে। রোগীরা আসে উপত্যকা পেরিয়ে, পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, দূর-দূরান্ত থেকে। পাহাড়ি পথঘাটের অব্যবস্থায় রোগীদের নিয়ে আসে কাপড়ের ঝোলায় বাঁশ বেঁধে। দূর দূর গ্রাম থেকে, এমনকি নেপাল থেকেও পাহাড় ডিঙিয়ে ওইভাবে রোগীদের হাসপাতাল চত্বরে এনে তোলা হয়।

দেখলাম, কয়েকজন ডাক্তার এবং নার্স মিলে এই দুটি চিকিৎসাকেন্দ্রকে তাঁদের অক্লান্ত সেবায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরা শহর ও গ্রামের সমস্ত সুখ সুবিধাকে বিসর্জন দিয়ে ওই নির্জন প্রদেশে কেবলমাত্র সেবার মনোভাব এবং কর্মনিষ্ঠা নিয়ে রাত্রিদিন কাজ করে চলেছেন।

সেখানে দুটি তরুণ ডাক্তারকে দেখে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল।

আমি তাঁদের প্রশ্ন করেছিলাম আপনাদের শহরে কিংবা বাড়ির কাছাকাছি প্র্যাকটিস করতে ইচ্ছে করে না?

ওঁরা বলেছিলেন, করে না বললে মিথ্যে বলা হবে স্যার। কিন্তু আমরা চলে গেলে এই শত শত অসহায় মানুষকে কার হাতে তুলে দিয়ে যাব।

এক তরুণ ডাক্তার ডিসপেনসারির নিচে বসে থাকা একটি বার তের বছরের মেয়ে এবং একটি বছর সাতেকের ছেলেকে দেখিয়ে বলল, ওরা ভাইবোন। ওই দূরে যে ভ্যালিটা দেখছেন, ওখান থেকে ছোটদিদিটি তার ছোটভাইকে পিঠে করে বয়ে এতখানি পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠে এসেছে। ভাইটির

পা ভেঙেছে, তাই তাকে বয়ে এনেছে দিদি। এখন, প্লাস্টার করে দেবার অপেক্ষায় বসে আছে, কাজ শেষ হলে আবার ফিরে যাবে ভাইকে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে।

এই অসহায় মানুষগুলোকে ফেলে ওই দুই ডাক্তার সুখ ঐশ্বর্যের সন্ধানে শহরে নগরে আসতে পারছেন না। তাছাড়া মিশনের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা তাঁদের ভেতর জীবসেবার আদর্শটিকে জাগিয়ে তুলেছেন। তাই আমার তরুণ বন্ধুদের বলি, সব ঝড় ঝঞ্ঝা ক্ষয়ক্ষতির ভেতরেও সেবার দীপটিকে সারাক্ষণ মনের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

অগ্নি তার সিটে বসে পড়তেই পাশ থেকে শুচি বলল, ডাঃ ব্যানার্জি ভারি সুন্দর বললেন কিন্তু। মনে দাগ টানার মত উদাহরণ।

ফিসফিস করে অগ্নি বলল, উনিই তো বসুধার বাবা রে।

সবার অলক্ষ্যে ওকে একটা খোঁচা দিয়ে শুচি বলল, বল, তোর প্রাণের বন্ধুর বাবা।

ডাঃ ব্যানার্জিদের কয়েকজন একটা দূরের গেস্টহাউসে উঠেছেন। সভা ভেঙে যাবার পর ডাঃ ব্যানার্জি অগ্নিকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি চলে এস আমাদের সঙ্গে, ওখানে তোমার থাকার অসুবিধে হবে না।

ঠিক আছে স্যার, বলে অগ্নি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল শুচির কাছে। বলল, আজ আমি আর এই হোটেলে থাকব না। স্যার আমাকে ওঁদের গেস্ট হাউসে থাকার জন্য ডেকেছেন। তুই তো যাত্রীনিবাসে যাচ্ছিস, সন্ধ্যায় শেষ সেমিনারে দেখা হবে।

কৌতুক করে শুচি বলল, যা প্রেমিকার শ্যাম্পুর সুরভিটা নিয়ে আয়।

অগ্নি বলল, ফিরে এলে তুই আমার গা শুঁকে দেখিস।

সবে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে, হঠাৎ কোথা থেকে ধেয়ে এল ঝড়। সংবাদ মাধ্যমের খবর ছিল, ঝড় বঙ্গোপসাগরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যে কোনও মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে সমুদ্র উপকূলগুলোতে। কিন্তু সকাল থেকে সেমিনারে ব্যস্ত থাকায় কারো দৃষ্টি আকাশের দিকে পড়েনি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার ছোঁয়ায় সকলের দৃষ্টি আকাশের দিকে চলে গেল। দ্রুতবেগে দক্ষিণসাগর থেকে এগিয়ে আসছে তালতাল মেঘ। দেখতে দেখতে গ্রাস করে ফেলল সূর্যকে। হাওয়ার বেগ ক্রমশ বাড়তে লাগল। এখন ভেঙে চুরে তাল পাকিয়ে মেঘগুলো সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। রোদ্দুরকে শুষে নিয়েছে মেঘ, মুছে দিয়েছে আকাশের নীল।

ঝোড়ো বাতাস বইছে। নিরবচ্ছিন্ন একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শুচিরা হোটেলেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছে। সপাসপ বৃষ্টি নামল।

যাত্রীনিবাসের যাত্রীরা ঝড় মাথায় নিয়েই ছুটল তাদের আস্তানায়। পথ চলতে পায়ের ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলছে। ঝড়ের ঝাপটায় ছিটকে পড়ছে কেউ কেউ।

দৌড়ে, বসে, গড়িয়ে তারা একসময় এসে ঢুকল যাত্রীনিবাসে।

মনে হল যেন বিশাল বাড়িখানা থরথর করে কেঁপে উঠছে।

ওরা যে যার ঘরে ঢুকে পড়ল। আগে থেকেই জানালাগুলো বন্ধ করা ছিল কিন্তু গোঁ গোঁ আওয়াজ কোনভাবেই আটকান গেল না।

কিছুক্ষণের ভেতরেই মনে হল, কোথায় যেন প্রলয় হচ্ছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

শুচি ঘড়ি দেখল। বেলা সোয়া একটা।

কাচের জানালায় সপাসপ চাবুক মারছে বৃষ্টি। এ কি! দেড়টা বাজতে না বাজতেই চরাচর ঢেকে নেমে এসেছে অন্ধকার।

বিদ্যুতের চমকে, মেঘের গর্জনে, বাতাসের আর্তনাদে মনে হল প্রলয় ঘনিয়ে আসছে।

কোনও কোনও ঘরে ঝম ঝম করে ভেঙে পড়ল কাচের শার্সি। ডানা ভাঙা ছিটকে পড়া পাখির মত ঘরের ভেতর বইগুলো টেবিল থেকে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়তে লাগল মেঝেতে। যেগুলোতে কাঠের শার্সি ছিল সেগুলোই কেবল কাঁপতে কাঁপতে ঠেকাতে লাগল সাইক্লোন।

সবরকম ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে একটা আতঙ্ক সুপার সাইক্লোনের মূর্তি ধরে এগিয়ে আসতে লাগল। তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে। বাতাস বইছে প্রায় দুশো তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটার বেগে।

মড় মড় করে ভেঙে পড়ছে যাত্রীনিবাসের আশপাশের বড় বড় গাছগুলো। বাতাস এখন হুঙ্কার ছাড়ছে। মনে হচ্ছে পুরো বাড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে দিগন্তের কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

প্রতিটি ঘরের বাসিন্দাই প্রকৃতির এই অভাবনীয় ভয়ঙ্কর রুদ্ররূপ দেখে মূক হয়ে গেছে।

শুচির ঘরে আরও দুটি মেয়ে। তারা ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুধু বাকি রেখেছে।

শুচি তাদের প্রবোধ দিয়ে বলল, ভয় কি দুর্যোগ কেটে যাবে।

একটি মেয়ে বলল, আমার দাদা হোটেলে থেকে গেছে। সে কেমন আছে কে জানে?

শুচি বলল, বিরাট হোটেল, আমাদের এ যাত্রীনিবাসের থেকে অনেক শক্তপোক্ত। ভাবনার কোনও কারণ নেই।

রাত বাড়তে লাগল। ঝড় বৃষ্টি থামার কোনও চিহ্নই নেই। এ যেন এক মহাপ্লাবনের আর্তনাদ।

বাইরের বন্ধ দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা শুরু হয়েছে। সবাই সিঁধিয়ে আছে ঘরের ভেতর। কে খুলবে দরজা?

শুচি ছিটকে বেরিয়ে গেল। প্রবল চেষ্টায় খুলে ফেলল দরজা।

খোলা দরজা দিয়ে তোড়ে ঢুকে এল শয়ে শয়ে মানুষ। ছেলে, বুড়ো, যুবক, যুবতী। বাক্স, প্যাঁটরা মাথায় বয়ে এনেছে। এরই ভেতর নিচু জায়গা ডুবে গেছে প্রবল বৃষ্টির তোড়ে। তাই ওরা আশ্রয়ের জন্য উঁচু যাত্রীনিবাসে উঠে এসেছে।

হাওয়ার প্রবল শক্তিতে দরজার পুরু পাল্লা, খোলা বন্ধ করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। এদিকে বিরাট যাত্রীনিবাসের কোথাও আর তিল ধারনের ঠাঁই নেই। মনে হচ্ছিল, পুরো যাত্রীনিবাসটাই না যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে।

দরজাটা এবার অনেক কষ্টে ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর যে সব আর্ত মানুষ আশ্রয়ের জন্য আসবে তারা যাত্রীনিবাসের বাইরের দেওয়ালে পিঠ রেখে ঝড়ের সঙ্গে মৃত্যু পণ লড়াই চালিয়ে যাবে।

ঘরের ভেতর প্রতিটি আশ্রয়প্রার্থী নির্বাক, আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রয়েছে। কেউ জানে না, কিভাবে এই মহাপ্রলয়ের সমাপ্তি ঘটবে।

হঠাৎ যাত্রীনিবাসের এক প্রান্তের একটি ঘর থেকে কোন যুবতী মেয়ের কাতরানির শব্দ শোনা গেল।

ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতে ভিড় ঠেলে সেদিকে এগিয়ে গেল শুচি। হাতে টর্চ। ঝড়ে বিদ্যুৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

যাত্রীনিবাসের শেষপ্রান্তে রান্নাঘর। সেই রান্নাঘরের লাগাও এক চিলতে জায়গায় বাক্স প্যাঁটরা ডাঁই করে তিন চার জনের একটি পরিবার মাথা গুঁজেছে। ওই পরিবারের তরুণী বউটি প্রথম প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে অসহায় হয়ে পড়েছে সবাই।

শুচি তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল, তোমরা মাথা চাপড়ে, চিন্তা করে কিছু করতে পারবে না। শান্ত হয়ে থাক, আমি দেখছি কি করা যায়।

যাত্রীনিবাসের রিসেপশান রুমে একটা টেলিফোন, যাওয়া আসার পথে চোখে পড়েছিল শুচির। সে মানুষ ঠেলে ছুটল সেই ঘরের দিকে।

এক চিলতে ঘর। বাইরে থেকে বন্ধ করে রিসেপশনিস্ট মেয়েটি দুর্যোগ বুঝে সম্ভবত নিজের বাড়িতে চলে গেছে।

তালাবন্ধ নয়, শেকলটাই শুধু তোলা ছিল। শুচি শেকল খুলে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। জানালার বালাই নেই ঘরটায়, তাই বাইরের তাণ্ডব এ ঘরে তার হুঙ্কার পাঠাতে পারছিল না।

বিদ্যুৎ চলে গেছে, ফোনের আণ্ডার গ্রাউণ্ড লাইন কি বেঁচে আছে এখনও। কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা তুলে কানে লাগাতেই ডায়েল টোন এসে গেল। এখন সমস্যা, সিটি ব্যাঙ্কের গেস্ট হাউসের নম্বর কত। ওখানেই তো ডাঃ ব্যানার্জিদের সঙ্গে অগ্নিও রয়েছে।

টেবিলের তলায় ড্রয়ারটা টানতেই ফোন ডাইরেক্টরি পাওয়া গেল। টর্চের আলোয় গেস্ট হাউসের নম্বরটা খুঁজে পেল শুচি।

সে ডায়েল করতেই ওপারে বেজে উঠল ফোন।

একটি মেয়ে ফোন তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কে? কাকে চাই?

অগ্নি-অগ্নি চৌধুরিকে একটু ডেকে দেবেন?

কিছুক্ষণের ভেতরেই অগ্নির গলা শোনা গেল, কে বলছেন?

কাতর গলায় শুচি বলল, তোরা কেমন আছিস?

একটা বড় গাছ ভেঙে পড়ে গেস্ট হাউসের একটা রুমকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভাগ্যিস কোন লোক ছিল না। তুই কেমন আছিস?

আতঙ্কে।

মন শক্ত করে থাক। কোনও কিছুতে ভেঙে পড়বি না।

একটা সমস্যা।

কি?

একটা মেয়ে ডেলিভারি পেইনে কষ্ট পাচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড টেলিফোন নীরব। হঠাৎ অগ্নির গলা বেজে উঠল। হাতের কাছে যদি থাকে, একটা মোটা কাচের গ্লাস ভেঙে নে, নিদেনপক্ষে একটা বোতল। ভাঙা ধারাল অংশটা স্টেরিলাইজড করে নে গরম জলে। ওইটাতে বাচ্চার নাড়ি কাটবি। আর হ্যাঁ, যাত্রীনিবাসে নিশ্চয়ই একটা ফার্স্ট এড বক্স পেয়ে যাবি। দরকার মত ডেটল ইত্যাদি ব্যবহার করিস। সব অন্ধকার। পথঘাট জলে থৈ থৈ। গাছপালা কত যে ভেঙেছে তার হদিশ নেই। এখানকার সকলেই ভয়ে সিটিয়ে আছে। বৃষ্টি আর ঘূর্ণির বেগ একটুখানি কমলেই আমি তোর ওখানে চলে যাব।

কথা বলতে বলতেই ফোনের কানেকশনটা কেটে গেল।

শুচি ফোন রেখে দিয়ে আবার তুলল। ডেড।

ও এখন ছুটল একটা কাচের গ্লাসের খোঁজে। রান্নাঘরেই পেয়ে গেল। একজন বয়স্কা মহিলা ওই মেয়েটির কাছে বসেছিল। শুচি তাকে রান্নাঘরে ডেকে নিল।

দুজনে মিলে সব ব্যবস্থা করে গ্যাসের ওভেনে সসপ্যানটা বসিয়ে দিল। তাতে গ্লাসটা ভেঙে বড় একটা টুকরো জলে ফেলে দিল।

ফুটন্ত জল থেকে একসময় তুলে নিল ধারাল কাচের টুকরোটা।

ঈশ্বরের কৃপায় সেই দুর্যোগের রাতে তরুণী বধূটি নির্বিঘ্নে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিল। তখন তুফান ছুটেছে চরাচব ব্যপ্ত করে।

যা কিছু করণীয় শুচি ধীরে ধীরে সবটুকু করে গেল। কে যেন তার হাত ধরে দক্ষ নার্সের মত সব কাজটা করিয়ে নিলে। মা আর ছেলেকে পরিচ্ছন্ন করে একটা ধোয়া কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দিয়ে প্রবীণা মেয়েটিকে ওদের পাশে থাকতে বলল।

এখন বড় ক্লান্ত লাগছে শুচির। তবু মনে শান্তি প্রসবকারিণীর কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

রাত শেষ হয়ে আসছে। ঝড়ের বেগও মনে হল, কমে আসছে ধীরে ধীরে।

বাইরের দরজায় কে যেন পাথরের টুকরো ঠুকে জোরে জোরে আওয়াজ তুলছে।

এতগুলো লোক বসে আছে কুঁকড়ে সুকড়ে। কেউ উঠে গিয়ে যে দরজা খুলবে সে বোধটুকুও তাদের নেই। কি এক আতঙ্ক তাদের যেন গ্রাস করে রেখেছে।

শুচি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে পড়ল ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো মানুষ। প্রথমটা যেন চেনাই যাচ্ছিল না। কেটে ছিঁড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে হাত মুখ, জামা, প্যান্ট।

শুচি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল অগ্নিকে। অগ্নির পেছনে আর একটি ছেলে। তারও প্রায় ওই একইরকম অবস্থা।

শুচি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তোকে তো আমি এখুনি আসতে বলিনি, তুই কেন এলি?

দুজনকে রিসেপশন রুমে টেনে নিয়ে গিয়ে শুচি অগ্নির নির্দেশমতো ফার্স্ট এড দিয়ে দিল।

অগ্নি বলল, আমি তোর ফোন পাবার পর গেস্টহাউসে আর থাকতে পারলাম না রে। এই বন্ধুটিই কিন্তু প্রাণের মায়া ছেড়ে এত দুর্যোগের ভেতরেও আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছে। গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার ভুবনেশ্বরবাবুর ছেলে।

শুচি ছেলেটির দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল। এই দুর্যোগে প্রাণের মায়া না করে একজন অপরিচিত যুবককে সাহায্য করার জন্য যে বেরিয়ে এসেছে সে ঈশ্বর প্রেরিত।

শেষ রাতে ঝড়ের গতি কিছুটা স্তিমিত হল। কিন্তু একেবারে থামল না। মেঘলা আকাশ, দমকা হাওয়ার ভেতর দিয়ে ভোরের আবছা আলো ফুটে উঠল। ঘড়ির হিসেবে অন্তত একঘণ্টা সূর্যোদয় হয়েছে। কমে গেছে বৃষ্টির প্রবল ছাট।

রিসেপশন রুমের সামনে এসে দাঁড়াল ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়ে। তখন ঘড়িতে প্রায় আটটা। মেয়েটির কোলে কাপড়ে জড়ানো একটি বাচ্চা। ছোট্ট মুখখানা, পিটপিট করছে দুটো চোখ। মনে হল, মেয়েটি লাল পাড় নতুন একটা কাপড় পরেছে।

শুচি উঠে দাঁড়াল, আরে, তুমি! অগ্নি, এই সে মা আর তার বাচ্চা।

মনে হল বধূটির শাশুড়ি পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দুটো হাত জোড় করে।

নতুন লাল পাড় শাড়িতে তরুণী মা-টিকে বেশ মানিয়েছে।

অগ্নি মেয়েটিকে দরকারি কতকগুলো কথা বলে দিল।

ইতিমধ্যে বাচ্চার বাবা এসে গেছে। এই দুর্যোগেও তার মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত।

মেয়েটি তার শাশুড়ির কোলে ছেলেটিকে তুলে দিয়ে কৃতজ্ঞতায় মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করতে যেতেই শুচি তাকে তুলে ধরল। অগ্নিকে দেখিয়ে বলল. ইনি কিন্তু ডাক্তার। কাল রাতে আমার ফোন পেয়ে কি কি করা জরুরি তা বলে দিয়েছিলেন। তবুও স্থির থাকতে না পেরে এই দুর্যোগের ভেতরেও ছুটে চলে এসেছেন।

অগ্নি বলল, থাক, খুব হয়েছে।

ততক্ষণে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে গেছে সেখানে। দুর্যোগ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে দেখে স্বস্তি ফিরে এসেছে সকলের মনে। অন্তত ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছাপটা আর মুখে নেই।

হঠাৎ অগ্নি বলল, তোমার ছেলের একটা যুৎসই নাম রাখা দরকার।

সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝড়ের ভেতর ও এই পৃথিবীতে এসেছে, তাই ওর নাম থাক 'তুফান'।

ওরই মধ্যে কয়েকজন হৈ হৈ করে উঠল। দারুণ নাম। এর চেয়ে লাগসই নাম আর হয় না।

খাবার দাবারের ভাঁড়ার শূন্য। দু-দশজন কিছু চাল, ডাল ব্যাগে ভরে এনেছিল। কেউ বা কিছু তরি-তরকারি। টিন ভর্তি মুড়িও এনেছিল কেউ কেউ।

শুচি বলল, যাঁরা খাবার এনেছেন, তাঁরা সব এই ঘরে রেখে দিন। দুর্যোগে একমুঠো করে হলেও সকলকে কিছু খেতে হবে।

একজন বলল, এখুনি আমি ভাঙা শার্সির ফুটো দিয়ে দেখেছি, চারদিকে জল থৈ থৈ করছে, গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই।

শুচি টিন থেকে মুড়ি বের করে আগে বাচ্চাদের, তারপর সবাইকে এক মুঠো করে দিল।

এগারটা বারটার সময় আকাশ থেকে সরে যেতে লাগল মেঘ। তিরিশে অক্টোবর দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়ল আকাশের নীল। ঝলমল করে উঠল সূর্যের আলো।

মনে হল, জল নেমে যাচ্ছে। সারে সারে মৃত জীবজন্তুকে ভেসে যেতে দেখা গেল।

চাল ডাল আর সবজিতে খিচুড়ি তৈরি করা হয়েছিল, তাই এক হাতা করে সকলের ভাগ্যে জুটল।

যারা এসেছিল, দুটো বাজতে না বাজতেই তারা জল ভেঙে ছুটল নিজেদের আস্তানায়।

তিরিশের রাতটাও যাত্রীনিবাসে কাটাল বিজ্ঞান মঞ্চের কয়েকজন ডেলিগেট। এর ভেতর অগ্নি খবর নিয়ে জেনে এসেছে, জলপথ, স্থলপথ, স্টিমার, ট্রেন, বাস সবই বন্ধ। চারদিকের খবর যতটুকু পাওয়া গেছে অতি ভয়াবহ।

একত্রিশে অক্টোবর জল অনেকটা সরে গিয়ে কুমীরের পিঠের মতো জলের ওপর পিচ রোডগুলো খানিক খানিক জেগে উঠল।

তখন ঘরে ফেরার পালা। গুজরাট, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্টেটের ডেলিগেটরা বহু অর্থের বিনিময়ে একটি বিরাট বাস যোগাড় করে বেরিয়ে গেলেন। স্থলপথে তাঁরা ওড়িশা ছেড়ে চলে যেতে চান।

এদিকে ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গের ডেলিগেটরাও চঞ্চল। তারাও দৌড় ঝাঁপ করে একটি বাস জোগাড় করলেন।

ডাক্তার ব্যানার্জিরা উঠে পড়লেন সেই বাসে। কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই ভর্তি হয়ে গেল বাসটি। আর গোটা দুয়েক সিট ঠেলেঠুলে হতে পারে। অগ্নি তার স্যার এবং ডাঃ ব্যানার্জির কন্যা বসুধাকে দুটো জানালার ধারের সিটে বসিয়ে নিজে নেমে এল বাসের বাইরে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাঃ ব্যানার্জি বললেন, নেমে গেলে কেন, উঠে এস, উঠে এস।

বাইরে থেকে অগ্নি বলল, স্যার, যাত্রীনিবাসে আমার কয়েকজন বন্ধু রয়েছে। একসঙ্গে এসেছিলাম তাই ছেড়ে যেতে পারছি না।

বসুধা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, একটা বাসে তো সবার জায়গা হবে না, ওঁরা নিশ্চয়ই অন্য বাসে আসবেন, তুমি উঠে এস।

অগ্নি বসুধার মুখের কাছাকাছি সরে এসে অনুচ্চ গলায় বলল, প্লিজ, আমাকে অনুরোধ কোর না। ওদের কেউ কেউ আমার ভরসাতেই এসেছে, আমার সঙ্গেই ফিরে যেতে চায়। কয়েকদিনের ভেতরেই আমাদের আবার কলেজে দেখা হবে।

মনে হল, বসুধার মুখখানা শুকিয়ে গেল। তার ভাবি ইচ্ছে ছিল, সারা পথ সহপাঠীর সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলতে বলতে যাবে। তাছাড়া সে অনেক ব্যাপারেই দেখেছে, অগ্নি সব দিক থেকেই নির্ভরযোগ্য। যে কোন কাজ করে একটা দৃঢ় মনোভাব নিয়ে।

কি আর করা যায়। অগ্নি যখন যেতেই চাইছে না তখন মনের ইচ্ছা মনে চেপে রেখে হতাশ মুখখানা জানালা থেকে সরিয়ে নিল বসুধা।

গাড়ি ছেড়ে দিল। দু চাকায় জল ছড়িয়ে বাস ছুটে চলল টাটার দিকে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল অগ্নি।

আদ্দেক জলের ওপর দিয়ে একটা জিপ ছুটে এসে দাঁড়াল অগ্নির সামনে। দাদা, উঠে আসুন, কোথায় যাবেন পৌঁছে দিই।

সহদেব, জিপ পেলে কোথায়?

উঠে আসুন, বলছি।

সহদেব নামের এই তরুণটি অগ্নির সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাত্রীনিবাসে উনত্রিশ তারিখের শেষ রাতে এসেছিল।

অগ্নি উঠে বসল সহদেবের জিপে।

দিদি কোথায়?—সহদেব জানতে চাইল।

যাত্রীনিবাসে।

যাত্রীনিবাসের দিকে জিপ চালাতে চালাতে সহদেব বলল, অনেকেই দেখছি বাসভাড়া করে বিভিন্ন দিকে চলে গেলেন। আপনারা নিশ্চয়ই পরিস্থিতি বুঝে যাবেন।

কি করব ভেবে পাচ্ছি না সহদেব, বিরাট বিপর্যয়।

আমি যতক্ষণ আছি, আপনাদের বড়রকম কোন অসুবিধায় পড়তে দেব না।

অগ্নি বলল, জিপ নিয়ে কোথায় বেরিয়েছ?

আমি আমার গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি, কে কেমন আছে জানার কোন উপায় নেই, তাই বেরিয়েছি।

কাছে পিঠে তোমার গ্রাম?

বেশ খানিকটা দূরে, সমুদ্রের ধারে। আমার মা নেই। বাবা গেস্ট হাউস ছেড়ে যেতে পারবেন না। তাই গাঁয়ের মানুষের খবর নিতে বেরিয়েছি। পঁচিশ বস্তা চিড়ে আর বিশ কেজি মত গুড় যোগাড় করেছি একটা গোডাউন থেকে। তাই নিয়ে চলেছি।

অগ্নি বলল, আমি আর আমার বন্ধু শুচি যদি তোমার সঙ্গে যাই, তাহলে ...।

কথা আর শেষ করতে দিল না সহদেব। বলল, এত বিপর্যয়েও আমি তাহলে দারুণ শক্তি পাব দাদা।

একটু হেসে আবার বলল, এক বস্তা চাল, দশ বস্তা ডাল, কিছু আলু এক কৌটো রান্নার তেল আর একটিন কেরোসিনের সঙ্গে একটি স্টোভও আছে।

অগ্নি বলল, তুমি সব আঁটঘাট বেঁধে এসেছ বলে মনে হচ্ছে।

উৎসাহ এখন বেড়ে গেছে সহদেবের। সে বলল, দুটো পেটমোটা প্লাস্টিকের কৌটোয় খাবার জলও ভরে নিয়েছি।

জিপ এসে দাঁড়াল যাত্রীনিবাসের গেটের সামনে।

অগ্নি জিপ থেকে লাফ দিয়ে নেমে দেখল, গেটের ধারে বোগেনভিলিয়া ঝাড়ের একদিকে দাঁড়িয়ে আছে শুচি।

অগ্নিকে দেখে সে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল।

হলুদ রঙের সালোয়ার কামিজের ওপর জড়িয়েছে ডার্ক গ্রিন রঙের দোপাট্টা।

সকাল থেকে সেই যে স্যারের খোঁজ নিতে বেরিয়ে গেলি, তারপর এত বেলা অবধি পাত্তাই নেই, আমি ভেবে মরি আর কি।

অগ্নি বলল, ওঁরা প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি জন একটা বাসে করে টাটার দিকে চলে গেলেন।

তুই গেলি না কেন? বসুধা তোকে ডাকেনি?

মারব এক গাঁট্টা, উঠে আয় জিপে। সহদেবের জিপ। ও সমুদ্রতীরে ওর গাঁয়ের হালককিকৎ জানতে যাচ্ছে। আমরাও ওর সঙ্গী হব।

শুচি বলল, খবর তো জবর। তুই দাঁড়া, সকাল থেকে চার প্যাকেট বিস্কুট এ তল্লাট ঢুঁড়ে যোগাড় করেছি, নিয়ে আসি।

আরে, সহদেবের স্টোর রুমে খাবার অভাব নেই, অভাব শুধু সময়ের, উঠে আয় জলদি।

ওরা জিপে উঠে পড়তেই সহদেবের জিপ গর্জন তুলে ছুটল।

জিপ চালাতে চালাতে সহদেব বলল, দিদি, দু'একটা দিন একটু ঘুরপাক খেতে হবে, পারবেন তো ধকলটা সইতে।

শুচি জোরের সঙ্গে বলল, তোমরা পারলে আমিও ঠিক পেরে যাব।

ভুবনেশ্বর সিটি পেরিয়ে একটু ঢালু পথে নামতেই জিপের তলায় জল এসে গেল। জিপ ছুটল তারই ওপর দিয়ে সরসর শব্দ করতে করতে। পথের চিহ্ন অল্পই দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু ওস্তাদ ড্রাইভার সহদেব বেশ দক্ষতার সঙ্গে ওই রাস্তায় জিপ চালিয়ে নিয়ে চলল। এসব পথ তার বহু চেনা।

পথের বেশ কয়েকটা জায়গায় বড় বড় গাছ পড়েছে। সহদেব কুড়ুল, টাঙি, কাটারি সবকিছু সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। তাই দরকার মত পথ পরিষ্কার করে চলতে তার একটুও অসুবিধে হল না। সারাক্ষণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল অগ্নি আর শুচি।

পথে শুধু ধ্বংস চিহ্ন। প্রান্তর যেন একাকার সমুদ্র। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সৈনিকের মত গাছপালা সব ধরাশায়ী। চালাসমেত মাটির ঘরগুলো পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। ঠিক যেন চুড়ো আর চাকাভাঙা ভগ্নরথ।

কয়েকটা কোঠা বাড়ির আলসে ঝড়ের দাপটে ইট সমেত উড়ে গেছে। সামান্য কিছু চিহ্ন বর্তমান। দুচারটে বিষণ্ণ চেহারার মানুষ ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে প্রকৃতির পরিহাস।

সহদেব বোধকরি কোনকিছুই ভোলে না। সে বলল, আপনি প্রথমেই জানতে চেয়েছিলেন জিপটা আমি কোথায় পেলাম, তাই না দাদা?

অগ্নি বলল, ঠিক। এখনও কিন্তু তার কোনও উত্তর পাইনি।

আমার বাবা আমাকে এটা কিনে দিয়েছে। স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পাবার পর, খুশিতে।

তারপর পড়াশোনা করনি?

আর কে পড়ে দাদা, জিপ নিয়ে এই দু'বছর চষে বেড়াচ্ছি।

শুধু চষা, না কিছু কাজকর্মও হচ্ছে?

তা হচ্ছে বইকি। দূরপাল্লার ট্যুরিস্টরা অনেক সময় আমার গাড়িতে পুরী, কোণারক, চিল্কা যেতে পছন্দ করেন। তাছাড়া ভুবনেশ্বর ঘুরে দেখাই ট্যুরিস্টদের।

অগ্নি বলল, এতক্ষণে বুঝেছি, তোমার জিপের সিটগুলো কেন এমন আরামদায়ক।

দাদা, গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় মালপত্রও বয়ে নিয়ে যাই।

শুচি বলল, গাড়িটার বয়স কত ভাই?

সহদেব হেসে বলল, কেন বলুন তো দিদি?

ঝকঝক তকতক করছে নতুনের মত।

দু'বছর আগে যখন কিনি তখন বেহাল অবস্থায় ছিল। কেনার পর মেজে ঘষে হাল ফিরিয়েছি। আসলে নতুন গাড়িটা গত ইলেকশানে খেটে খেটে হাড়পাঁজর বের করে ফেলেছিল। ইলেকশানের শেষে নিলামে চড়ল আর আমি কিনে নিলাম। বলতে পারেন, একবারে জলের দরে। তাছাড়া গাড়িটা আমারই প্রাপ্য ছিল। আমি একটি বিশেষ পার্টির ক্যাণ্ডিডেটকে প্রায় তিনমাস ঘুরিয়েছিলাম এই গাড়িতে।

শুচি বলল, ভদ্রলোক কি ইলেকশানে জিতেছিলেন?

জিতেই গাড়িটা নিলামে তুলে দিয়েছিলেন। আমি গাড়িটার মায়া ছাড়তে পারিনি।

ঘণ্টা দুয়েক চলার পর সমুদ্র-বায়ুর এক ধরনের গন্ধ পাওয়া গেল।

এদিকে ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। উত্তাল সমুদ্র সবকিছু গ্রাস করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে জেগে আছে বন ঝাউয়ের ছোট ছোট গাছ। জলের তলায় পুরো একদিন এক রাত থাকার ফলে সবুজ রঙ মুছে গিয়ে কেমন একরকম তামাটে রঙ ধরেছে।

এরপর বিধ্বস্ত কতকগুলো বড় বড় ঝাউগাছের কাণ্ড দূর থেকে দেখা গেল। ডাল নেই, পাতা নেই, সবুজের চিহ্নমাত্র নেই।

কাছাকাছি গিয়ে সহদেবের জিপটা আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়াল। সে লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে।

দেখ, দেখ দাদা কি অদ্ভুত ব্যাপার!

ততক্ষণে ওরাও লাফিয়ে নেমে পড়েছে।

একটা বিরাট ঝাউগাছের কাণ্ড ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ডালপালা সহ মুণ্ডুটা ভেঙে ভেসে গেছে ঝড় আর তুফানের তোড়ে। কিন্তু যেটা বিস্ময়ের সেটা হল, গাছের উঁচু কাণ্ডে দুটো মানুষের মৃতদেহ।

কাছে গিয়ে ওরা দেখল, মানুষ দুটোর পিঠের ছাল কে যেন নির্মমভাবে পিটিয়ে তুলে দিয়েছে।

নাইলনের লম্বা একটা জালে দুটো দেহ গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বাঁধা। ঘাড় আর মুণ্ড ঝুলে পড়েছে।

সহদেব দেখা গেল, এসব অঞ্চলের মানুষজন সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

সে বলল, দাদা, এরা নুলিয়া।

শুচি বলল, তুমি কি করে জানলে সহদেব?

নীল নাইলনের সুতোয় বোনা জালে জড়িয়ে বেঁধেছে নিজেদের। মনে হয়, এ পর্যন্ত ওরা নৌকোতে ভেসে এসেছিল। তারপর নৌকো ছেড়ে গাছে জড়িয়েছে দুটো দেহ। বাঁচার শেষ চেষ্টা কিন্তু বাঁচাতে পারেনি নিজেদের।

অগ্নি বলল, এদের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিল কে?

সামান্য সময় চিন্তা করে সহদেব বলল, প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো লোহার তৈরি ঝাঁটার মতো পিঠে এসে আঘাত দিয়েছে সপাসপ, তাতেই মনে হয় এই হাল।

শুচি ভাবল, কাছে পিঠে ওদের নৌকো তো দেখছিনে। বোধহয় জলের তোড়ে ভেসে গেছে।

গাড়ি চলেছে, ওদের কারও মুখে কথা নেই। প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডব থেমে গেছে, এখন নিস্তব্ধ চরাচরে প্রশান্ত মহিমায় বসে আছেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি।

প্রায় জনশূন্য হাট মাঠ ঘাট, পথ প্রান্তর।

কিছুদূর গিয়ে সমুদ্রের একটা খাঁড়ির ধারে গাড়িটা দাঁড়াল।

হঠাৎ সমুদ্র-হাওয়ায় ভেসে এল একটা দুর্গন্ধ।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল তিনজনে।

সহদেব বলল, খাঁড়ির বাঁকটা দেখে আসছি, আপনারা এখানে দাঁড়ান।

অগ্নি বলল, এ গন্ধ মৃত জীবজন্তুব। হসপিটালে এই গন্ধের ভেতর আমাদের কাটাতে হয়। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই। তুই এখানে দাঁড়া শুচি, আমরা এখুনি ফিরে আসছি।

শুচি আনুনাসিক গলায় বলল, আহারে. আমি একা এখানে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকি আর তোমরা দৃশ্য দেখে বেড়াও।

অগ্নি পা চালাতে চালাতে বলল, আসবি তো চলে আয় চটপট।

শুচি দৌড়ে গিয়ে ওদের সঙ্গ ধরল।

খাঁড়ির বাঁকে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা মেয়েপুরুষের লাশ নীচে এক জায়গায় জড় হয়েছে। অধিকাংশের শরীর অনাবৃত। কোন কোন মেয়ের হাতে রূপোর বালা, কারু বা পায়ে মল, গলায় হাঁসুলি, কানে সোনার মাকড়ি চিক চিক করছে।

সহদেব বলল, সমুদ্র তীরের বাসিন্দা প্রায় কেউ আর বেঁচে নেই। থাকলে, এই মরা মেয়েদের গা থেকে সবকটা গয়না খুলে নিয়ে পালাত।

শুচি বলল, আমি ভাবতে পারছি না কোথা থেকে এতগুলো লাশ এসে এখানে জড়ো হল।

সহদেব বলল, দিদি, সমুদ্র তীরে কোথাও এদের ডেরা ছিল, প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে ওরা অনেকেই একসঙ্গে এখানে এসে ঠেকেছে। ওই যে সামনে একটা বালিয়াড়ি। ওর ওপর পর্যন্ত ঢেউ একসময় ওদের তুলে দিয়েছিল। ঢেউ সরে যেতে ভারি দেহগুলো নীচে পড়ে গেছে। ওই দেখুন, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোগুলো এখনও বালিয়াড়ির গায়ে লেপটে উড়ছে।

মৃতদেহগুলো সৎকারের ইচ্ছে থাকলেও কোনরকম উপায় ছিল না। ওরা বালিয়াড়ির ওপারটা দেখার জন্য বালি ভেঙে উঠতে লাগল। সহদেব সবার আগে উঠে গিয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে।

তারপর পেছন ফিরে বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে মুখে আঙুল রেখে কথা বলতে বারণ করল।

বালিতে পায়ের সাড়া ওঠে না। ওরা নিঃশব্দে সহদেবের ইঙ্গিতে প্রায় হামা দিতে দিতে তার কাছে গিয়ে পৌঁছাল।

এবার তিনজনেই আত্মগোপন করে দেখতে লাগল অভূতপূর্ব এক দৃশ্য। নীচে ঝোপঝাড়ের পাশে সমতল বালির বিছানায় শুয়ে আছে বছরখানেকের একটি ছেলে। একটা মাদি কুকুরের দুধভরা স্তনে মুখ লাগিয়ে সে দুধ টেনে খাচ্ছে। কুকুরটার তিনটে বাচ্চা শুয়ে বসে আছে মার কাছে পিঠে।

একটু পরেই কুকুরটা ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে বালিয়াড়ির আড়ালে অদৃশ্য হল। তার গমনপথের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে তাকাতে লাগল সহদেব। একসময় সে আবিষ্কার করল, বালিয়াড়ির দক্ষিণ দিক ঘুরে কুকুরটা নেমে গেছে নীচে। সে এখন শবদেহে তার কামড় বসিয়েছে।

সহদেবের ডাকে তিনজনই একসঙ্গে এই দৃশ্য দেখল। ঘৃণা নয়, কুকুরের মহানুভবতায় ততক্ষণে অভিভূত হয়ে গেছে ওরা।

শুচি বলল, এখন চল, ছেলেটাকে উদ্ধার করে গাড়িতে তুলি। কুকুরটা ফিরে এসে যদি দেখে বাচ্চাটাকে আমরা নিয়ে পালাচ্ছি তাহলে কামড়ে দিতে পারে।

খুবই যুক্তিযুক্ত কথা।

ওরা তিনজনে অতি দ্রুত নীচে নেমে গেল। শুচি ছেলেটাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

অগ্নি বলল, চল, জিপের দিকে ছুট লাগাই।

ওরা দুজনে আগে আগে ছুটল। পেছনে সহদেব আসতে আসতে একটা কাঠের টুকরো আর ছেঁড়া রবারের টিউব পেয়ে হাতে তুলে নিল। কাঠটা আকারে যতখানি সে তুলনায় অনেক হালকা। পুরীতে নুলিয়ারা ভোরবেলা যে সব খোল ছাড়া ছোট ছোট নৌকো সাগরে ভাসায় তারই ছোট একটা অংশ এই কাঠ। এ কাঠ জলে ডোবে না।

জিপের ভেতর কাঠ আর রবারের টিউবটা রেখে জিপ চালিয়ে দিল সহদেব।

শুচি হৈ হৈ করে উঠল, দেখ, দেখ কেমন হাসছে।

পাশে বসে অগ্নি ছেলেটাকে কাতুকুতু দিয়ে আরও খানিকটা হাসাল।

শুচি বলল, কি হল সহদেব ভাই, তুমি যে চুপ?

ভাবছি।

অগ্নি বলল, কি ভাবছ?

ভাবছি, সবাই মরল কিন্তু এ ছেলেটা বাঁচল কি করে? যে দলটি নীচে মরে পড়ে আছে তাদেরই কারু ছেলে এটি।

শুচি বলল, দেখ কি অবাক ব্যাপার, সবাই রইল নীচে, ও কিন্তু উঠে এসেছে ওপরে!

অগ্নি বলল, আর একটা তাজ্জব জিনিস দেখেছিস?

কি?

কুকুর মায়ের মানুষের বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে বাঁচানো! একদিকে সে শবদেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে, অন্যদিকে নিজের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে একই মমতায় পালন করছে এই বাচ্চাটাকে! সত্যি, মায়ের হৃদয়ের তুলনা নেই।

শুচি বলল, এ এক বিরল অভিজ্ঞতা।

গাড়ি চালাতে চালাতে ব্রেক কষল সহদেব। চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি দাদা পেয়েছি।

কি পেয়েছ?

ছেলেটা বাঁচল কি করে তার হদিস।

শুচি সাগ্রহে বলে উঠল, কি করে বাঁচল সহদেব? এটা তো মিরাকল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।

সহদেব বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, ওই হালকা কাঠের টুকরো আর সাইকেলের টিউবটা ওকে বাঁচিয়েছে।

শুচি ভারি অবাক হয়ে জানতে চাইল, কি রকম?

তুফানের ধাক্কায় বেগতিক বুঝে ওর বাবা নিশ্চয় ওকে ওই কাঠের টুকরোয় রবারের টিউব জড়িয়ে বেঁধেছিল। তারপর তুফানের তোড়ে সবাইকে এনে ফেলেছিল এই খাঁড়িতে। প্রবল একটা ঢেউ ওই ভেসে থাকা কাঠের টুকরোয় বাঁধা বাচ্চাটাকে একসময় ছিটকে ফেলে দিয়েছিল বালিয়াড়ির ওপারে। বালির ওপর পড়েছিল বলে বাচ্চাটার একটুও লাগেনি। কুকুরটা রবারের টিউবের বাঁধন দাঁতে কেটে ওকে বাঁচিয়েছে।

অগ্নি বলল, দারুণ ধরেছ সহদেব। আমার কাছে দুটি ব্যাপার বড় বিস্ময়ের বলে মনে হচ্ছে। একটি, বাচ্চাটার অদ্ভুতভাবে বেঁচে যাওয়া, অন্যটি কুকুর মায়ের প্রতিপালন।

শুচি বলল, দেখ, এটা দেবতার কৃপা কি কোনও আকস্মিক ঘটনা সে রহস্যের সমাধান আমি করতে পারব না। তবে এটা যে বিস্ময়ের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর সহদেব জিপ থামাল।

এইটা আমার গ্রাম দাদা। চেনার কোনও উপায় নেই। ঘরবাড়ি গাছপালার কিছুমাত্র দেখা যাচ্ছে না।

শুচি বলল, তাহলে গ্রামটাকে চিনলে কি করে?

এই যে বাঁদিকে পথের ধারে ঘন ঝোপঝাড় দেখছেন, এখানেই কিন্তু পাকা রাস্তার শেষ। তারপর ডানদিকে মাটির বাঁধ আমাদের গাঁ অবধি চলে গেছে। এখন দেখতে পাচ্ছ, পিছল বাঁধটা দুদিকে থৈ থৈ জলের ভেতর সিঁথির মতো জেগে আছে। ওই যে দাদা দেখ, রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা দীঘি।

অগ্নি বলল, ঐ তো অনেক উঁচু পাড় দিয়ে ঘেরা।

হাঁ দাদা, ওটা আমাদের তাল দীঘি। সবকটা তালগাছ নিশ্চয় ঝড়ে পড়ে গেছে। ওই তো দীঘির পাড়ে কতকগুলো মানুষ হাঁটা চলা করছে। আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসছি, চিঁড়ের বস্তাগুলো বয়ে নিয়ে যাবে।

আধঘণ্টার ভেতর গাঁয়ের জীবিত প্রায় সবকটা মানুষ ঝেঁটিয়ে চলে এল জিপের ধারে।

যেখানে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেখানে এই গ্রামের বহু মানুষ বেঁচে গেছে আশ্চর্যভাবে।

ঝড় আর তুফানের সময় তালপুকুরের উঁচু পাড়ের আড়ালে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল। দশ বিশ জন মেয়ে পুরুষ আর বাচ্চা মরেছে তালগাছগুলো চাপা পড়ে, বাকিরা বৃষ্টির মার খেয়েও বেঁচে গেছে।

লোকগুলো দুদিন তালপুকুরের জল খেয়ে কাটিয়েছে। অবশ্য তার সঙ্গে ছিল শালুক নাল। রাশি রাশি লাল সাদা শাপলায় ভর্তি তালপুকুর। ওদের ক্ষিদের সামান্য উপশম হয়েছিল সেই শালুকের নাল খেয়ে।

ওরা সবকটা বস্তাই তুলে নিয়ে চলে গেল। এবার ওদের সঙ্গে গেল সহদেব আর অগ্নি। ওষুধের বাক্স অগ্নির হাতে। ভুবনেশ্বরে বাংলোর ধারে একটা ওষুধের দোকান থেকে ডায়েরিয়া ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক কিছু ওষুধ কিনেছিল অগ্নি। সেগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে ব্যবহার-বিধি বুঝিয়ে দেবার জন্য তালদীঘির দিকে গেল সে। জিপে রইল শুচি বাচ্চাটাকে নিয়ে। কাদা পেরিয়ে এতটা পথ যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

ওরা চলে যাওয়ার প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে সিটের ওপর শুইয়ে দিয়ে শুচি নামল রাস্তার ওপর। বাঁদিকে পথের ধারে বেশ কয়েকটা কেয়াগাছের ঝোপ। তার ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল শরবন। নিশ্চয় ওখানে কোন জলা জায়গা আছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে শুচি দেখল, চিকচিক করছে জল।

হঠাৎ একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ ঝোপঝাড়ের ওপার থেকে ভেসে এল তার কানে।

কে কাঁদে!

তারই বয়সী একটি মেয়ে দেহের অর্ধেকটা জলে ডুবিয়ে বাকি অর্ধেকটা ডাঙার কাদামাটিতে ছড়িয়ে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছে। একটা ক্ষীণ কান্নার মত সুর মাঝে মাঝে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে।

শুচি সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সে টেনে তুলল ওই মেয়েটিকে জলের থেকে। তারপর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় নিজের সালোয়ার কামিজটি খুলে ফেলে পরিয়ে দিল নিরাবরণ মেয়েটিকে। নিজের দেহটি তখন প্রায় নগ্ন। শুধু ডার্ক গ্রিন রঙের ওড়নাটা জড়িয়েছে কোনরকমে শরীর ঘিরে।

কিছুক্ষণ পরেই শুচি, শুচি ডাক শোনা গেল।

পাতাপত্রের ফাঁক দিয়ে শুচি দেখল, অগ্নি তাকে অবাক চোখ মেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধারে কাছে সহদেবের দেখা নেই। হয়তো সে গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে আরও কথা বলে ফিরবে।

শুচি গা থেকে তার শেষ উত্তরীয়খানা টেনে নিয়ে পাতাপত্রের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে পথের ওপর ছুঁড়ে দিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেই মুহূর্তে যেন কায়াধারণ করল।

'অরণ্য আড়ালে রহি কোন মতে

একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে

বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে...।'

ওড়নাটা পথের ওপর ফেলে দিয়ে শুচি কান্নাভেজা গলায় চেঁচিয়ে বলল, তুই আমার ওড়নাটা লুঙ্গির মত করে পরে নিয়ে তোর টি-শার্ট আর ট্রাউজার্সটা আমাকে দিয়ে দে।

কিছু আন্দাজ করতে পারল না অগ্নি। সে শুচির কথা মত তার গা থেকে প্রথমে সাদা ফুল স্লিভ রাউণ্ডনেক টি-শার্টটা খুলে ফেলল। তারপর শুচির উত্তরীয়টা ট্রাউজার্স খুলে পরে ফেলল লুঙ্গির মত করে।

ঝোপের বাইরে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল শুচি। সেই হাতে অগ্নি তার ছেড়ে ফেলা পোশাকগুলো তুলে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ঝোপ ফাঁক করে বেরিয়ে এল শুচি। ট্রাউজার্সটা গুটিয়ে পরেছে, সাদা টি-শার্টে ওকে মানিয়েছে চমৎকার।

ও পথের ওপর এসেই হাঁক দিল, বেরিয়ে এস দময়ন্তী।

শুচির পোশাকে সারা অঙ্গ ঢেকে একটি তরুণী ওড়িয়া মেয়ে ঝোপ চিরে বেরিয়ে এল। চোখ থেকে আতঙ্কের ভাব তখনও কাটেনি। ক্লান্ত শরীর টলছে। সে দাঁড়াতে পারছিল না। শুচি তাকে জড়িয়ে ধরে জিপের পেছনে তুলল।

এখন জিপ থেকে বস্তাগুলো সরে যাবার ফলে অনেকখানি জায়গা খালি হয়ে গিয়েছিল। লম্বা একটা সিটের ওপর দময়ন্তীকে শুইয়ে দিল শুচি। দুটো কম্বল ছিল গাড়িতে। একটা পাশ বালিশের মত পাকিয়ে ওর মাথার তলায় দিয়ে দিল। মুহূর্তে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল মেয়েটি।

এবার অগ্নির কাছে চলে গেল শুচি। রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল অগ্নি। হাঁটুর ওপরে লুঙ্গি। চওড়া খালি গায়ে রোদ্দুর পড়ে ঝকঝক করছে।

এতক্ষণ মনের উত্তেজনাকে চেপে রেখেছিল শুচি। এবার অগ্নির বুকের ওপর ভেঙে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অগ্নি তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কি হল তোর? কাঁদছিস কেন?

জলে ভেজা চোখ তুলে শুচি বলল, মেয়েটার কি দুর্ভাগ্য রে? সবে একটা চাকরি পেয়েছিল গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। বিয়েরও সব ঠিক। কার্তিকের শেষে অঘ্রাণে বিয়ে। পাশের গ্রামের পরিচিত ছেলে। দুজনে যুক্তি করে সবার চোখেব আড়ালে বেরিয়েছিল কিছুদূরের একটা টাউনে বিয়ের শাড়ি পছন্দ করতে।

ফেরার পথে শুরু হয়ে গেল প্রকৃতির তাণ্ডব। মাঝপথে গাড়ি থেমে গেল। যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল।

ওরা দুজনে ছুটে ছুটে, হামা দিয়ে প্রায় গ্রামের কাছে এসে গিয়েছিল, হঠাৎ পথের ওপর মড় মড় করে বিশাল একটা গাছ ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। বিরাট মোটা একটা ডালের তলায় চাপা পড়ে গেল ছেলেটা। মুহূর্তে সব শেষ।

পাগলের মত গ্রামের সীমানায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই বিশাল একটা ঢেউ সারা গ্রামটাকে উপড়ে নিয়ে পাক দিতে দিতে ছুটে চলল।

প্লাবনের জল খেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় কিভাবে যে ও গড়াতে গড়াতে এই ঝোপের আড়ালে পড়েছিল, তা আর জ্ঞান ফেরার পর মনে করতে পারেনি।

সহদেব ফিরে আসতেই স্টোভ জ্বেলে চাপান হল খিচুড়ি। ততক্ষণে জেগে উঠে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে দময়ন্তী।

শুচি তাকে চায়ের জন্যে আনা কিছু গুঁড়ো দুধ গুলে খানিকটা গুড়ের সঙ্গে খাইয়ে দিল। বাকি দুধটা রাখল বাচ্চাটাকে খাওয়ানোর জন্যে।

দময়ন্তী ভারি কাজের মেয়ে। সে কারোর বারণ না শুনে খিচুড়ি তৈরি করে সবাইকে খাওয়াল। বাচ্চাটাকে দুধ গুলে খাইয়ে বুকে চেপে বসে রইল। সহদেবের বাবা দুর্যোধন জেনা অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ, তিনি তাঁর বাড়িতে সাদরে আশ্রয় দিলেন দময়ন্তী আর ওই বাচ্চাটিকে।

ওরা কলকাতা ফেরার কিছুদিন পর একটা চিঠি এল অগ্নির ঠিকানায়। ওড়িশা থেকে সহদেব লিখেছে ঃ

প্রিয় দাদা ও দিদি

অঘ্রাণে দময়ন্তীর বিয়ের কথা ছিল, সে লগ্ন পার হতে দিইনি। বাবার অনুমতি নিয়ে দময়ন্তীকে আমি বিয়ে করেছি। বাচ্চাটি আমাদের বুকে পিঠেই মানুষ হবে। তোমাদের দুজনের শুভ কামনার জন্য আমরা দুজনে চেয়ে রইলাম।

তোমাদের সহদেব ও দময়ন্তী

পাঁচ

নতুন ফোন এসেছে ফ্ল্যাটে। রিং করতেই ফোনটা ওঠাল অগ্নি। এ সময়টা মোটামুটি ও বাড়িতে থাকে। আরও পরে ফেরে মা আর দিদি।

হ্যালো।

পরশু সন্ধ্যেটা আমার জন্য রাখিস।

উদ্দেশ্য?

একটু কিছু আছে নিশ্চয়ই, আর সেটা আমার বাড়িতে।

কিসের অনুষ্ঠান বলবি তো? হঠাৎ খালি হাতে গিয়ে বেকুব বনে যাব।

হাত খালি থাকলে ক্ষতি কি, স্মৃতিসুধায় তো হৃদয়ের পাত্র ভরে আছে।

হেঁয়ালি রেখে আসল সত্যিটা কবুল কর দেখি। জন্মদিনটিন নয়তো?

বাপি কখনও জন্মদিনের কেক কাটা, ফুঁ দিয়ে বাতি নেভানো কিংবা 'হ্যাপি বার্থ ডে...' বলে চিল্লানোর পক্ষপাতি নয়।

সে কি রে!

হাঁ মহাশয়। বাপি বলে, তুমি যেদিন দশজনের একজন হতে পারবে সেদিন লোকেই তোমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান করবে।

তাহলে তো আমাকেই তোর জন্মদিনের আয়োজন করতে হয় রে।

সে শুভ লগ্ন কি এসে গেছে?

বৈ কি।

কি রকম?

মেসোমশাইয়ের কথা মত, তুই দশজনের একজন নয়, একেবারে দুজনের একজন হয়ে গেছিস।

আর একটু খোলসা করে...।

অনার্সে ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড।

তাহলে তো তোরও জন্মদিন পালন করতে হয়রে। যে হারে বছর বছর প্রফেসারদের নজর কাড়ছিস, শেষে দেখিস, একটা রেকর্ড ব্রেক করে বসবি।

আগে তো ব্রেক করি, তারপর না হয় জন্মদিন করিস। এখন আসল কথাটি গোপন না রেখে চটপট বলে ফেল দেখি সখী।

অমনি গান বেরিয়ে এল অগ্নির সুরেলা কণ্ঠ দিয়ে—

'তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখ না মনে।

শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে।।'

শুচি ওপার থেকে বলল, কথা দে, সেদিন তুই আমার বাড়ির মিলন মেলায় এ গানটাই গাইবি।

আচ্ছা সে দেখা যাবে। মোটামুটি বুঝলাম, তোকে কেন্দ্র করে একটা মিলনমেলা বসছে। জন্মদিন নয়, একটা এনগেজমেন্টের ঘোষণা হতে পারে।

তোর মুণ্ডু।

ঠিক আছে, এখন দয়া করে বল, কি নিয়ে যাব?

আমার প্রিয় ফুল তো তোর জানা, তাই আনবি।

আলোকিত সন্ধ্যা। সুসজ্জিত হলঘর। বান্ধবীদের কলকণ্ঠ হলঘর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাইরের লনে। মখমল সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন। তিনদিকে ফুলের কেয়ারি। লাল গদিওয়ালা সাদা রঙের কয়েকটা লোহার কাজকরা চেয়ার পাতা আছে। চতুর্দশীর চাঁদের রূপা-ঝরা জলে স্নান করছে গাছপালা, লতাপাতা ফুল, চরাচর।

কন্যার চমৎকার একটা রেজাল্টের জন্য মণীশ বেদজ্ঞ সাহেবের এই আয়োজন। তিনি কিন্তু সন্ধ্যে থেকেই আত্মগোপন করে আছেন দোতলার একটি ঘরে।

বয়স্কদের প্রবেশাধিকার নেই এই আনন্দযজ্ঞে। কেবল শুচির পঁচিশ জন নির্বাচিত বান্ধবীই অংশ নিয়েছে এই অনুষ্ঠানে। একমাত্র ব্যতিক্রম দুই পুরুষ। তরুণ অধ্যাপক রজত দত্তগুপ্ত আর শুচির প্রিয়বন্ধু অগ্নি চৌধুরি।

রজতকে ঢুকতে দেখে হৈ হৈ পড়ে গেল হলঘরে। চারদিকে প্রায় ছাত্রীর মেলা। অক্সফোর্ডের একটা আলাদা মেজাজ, আলাদা গন্ধ আছে। ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ প্রিয় অধ্যাপক।

সবাই নমস্কার করল, যে যেখানে দাঁড়িয়ে। রজতশুভ্র হাসি হেসে রজত হাত নাড়লেন।

এবার তাঁর কাছে এগিয়ে গেল শুচি। সে বারণ না শুনে প্রণাম করল পা ছুঁয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে রজত পকেট থেকে বের করে আনলেন, ছোট্ট গোলাকার সিঁদুরে লাল রঙের একটি সুদৃশ্য কৌটো।

শুচির হাতে ওটি তুলে দিয়ে বললেন, আজ সন্ধ্যায় তোমার জন্যে এটি আমার বিশেষ উপহার।

বান্ধবীদের দিকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল বলে উপহার-প্রদান অনুষ্ঠানটি ওদের নজর এড়িয়ে গেল।

হাতের মুঠোয় কৌটোটিকে গোপন করে ও রজতের দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন স্যার, বসুন এই সোফায়, ওরা আপনার সঙ্গে কথা বলবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।

রজত নির্দিষ্ট সোফায় বসতেই ছাত্রীরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। তারই ফাঁকে নিঃশব্দে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল শুচি। দৌড়ে দোতলায় বাবার সামনে গিয়ে বলল, স্যার কি উপহার এনেছেন, খুলে দেখতো বাবা।

তোকে দিয়েছেন, তুই দেখিসনি?

বন্ধুদের সামনে খুলতে সংকোচ হল।

এখন আমার সামনে খোল।

বাবার সামনে কিন্তু অসংকোচে কৌটোর ডালা খুলে ফেলল শুচি।

রজত ঝকঝকে, চোখে লাগার মত সুন্দর একটি সোনার আংটি শুচিকে উপহার দিয়েছে। মাঝে সোনার পাপড়ির ভেতরে মাঝারি আকারের এক টুকরো পান্না, তার দু-দিকে ছোট ছোট দুটি করে হীরের সেটিং।

বাবার হাতে কৌটোটা তুলে দিল শুচি।

মণীশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, একসিলেন্ট। তোর স্যারের টেস্ট কিন্তু দারুণ। তুই স্যারের ফেভারিট ছাত্রী তো, তাই এই উপহার। তোর পিসি রজতকে খুব পছন্দ করে।

বন্ধুরা নীচে অপেক্ষা করছে বলে শুচি নেমে গেল।

অবাক কাণ্ড! হলে ঢুকেই ও দেখতে পেল, দরজা দিয়ে ঢুকছে শ্রীমান অগ্নি।

দারুণ লাগছে ওকে। গাঢ় ব্লু রঙের জিনসের প্যান্ট পরে তার ওপর চাপিয়েছে একটা গোল্ডেন রঙের গেঞ্জি। এই বয়সে ওর চেহারার ভেতরে একটা প্লিজিং পার্সোনালিটি দেখা দিয়েছে।

ওর হাতে ধরা আছে সাদা ঘটির আকারে একটা ড্রাগনের ছবি আঁকা চাইনিজ ফ্লাওয়ার ভাস। তাতে মাল্টি-কালার গোলাপের সঙ্গে একগুচ্ছ ডবল রজনীগন্ধা।

ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে শুচি দু-হাতে ধরে নিল উপহারটি।

হল ঘরের মাঝখানে একটা টিপয়ের ওপর রেখে দিল সেটি।

হাঁটু মুড়ে বসে মুখখানা ফুলগুলোর কাছে নিয়ে গিয়ে বুক ভরে তার গন্ধ নিতে লাগল।

ওঠার আগে ঘাড় কাত করে তাকাল একবার অগ্নির দিকে, চোখে তিরতির করে কাঁপছে খুশির ঝিলিক।

ততক্ষণে বান্ধবীদের অনেকেই রজতের কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখছে নতুন অতিথিকে।

শুচি এগিয়ে গিয়ে অগ্নির হাত ধরে তার স্যারের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, একে চিনতে পারছেন স্যার?

সামান্য সময় অগ্নির দিকে তাকিয়ে রজত উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরলেন, ওড়িশায় আপনার সাহায্যের কথা ভুলব না। সে রাতে আপনি আর শুচি কত যত্ন করে আমাকে ট্রেনে তুলে দিলেন। ভাগ্যিস তুলে দিয়েছিলেন, নইলে সেই সুপার-সাইক্লোনে খোঁড়া পা নিয়ে আমি কোথায় তলিয়ে যেতাম।

অগ্নি বলল, আপনি বসুন স্যার।

রজত সোফায় বসে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির হাত ধরে বসালেন।

উৎসবের পুরো আমেজ শুরু হয়ে গেল গান আর নাচ দিয়ে।

শুচি কত্থক নাচল, তার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করল অগ্নি।

মেয়েরা হৈ হৈ করে উঠল। যেমন নাচ, তেমনি সঙ্গত।

বেশ কয়েকজন মেয়ে গান গাইল। রজত আবৃত্তি করলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি মরমিয়া কবিতা।

সবশেষে শুচি সবার সামনে অনুরোধ জানাল অগ্নিকে একটি গান গাইবার জন্য।

এ সময় নির্বাক হলঘর। এতক্ষণ যে তবলা সঙ্গত করেছে সে গান গাইবে শুনে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। হাসি এবং হাততালিতে আগাম অভিনন্দন জানাল অগ্নিকে।

যে গান সেদিন ফোনে সম্পূর্ণ করা যায়নি, শুচির আগ্রহে আজ এই হলঘরে সেই গানটিই কণ্ঠে তুলে নিল অগ্নি।

'তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখ না মনে।
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে।।
ওগো ধীরমধুরহাসিনী, বোলো ধীরমধুরভাষে—
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে।।
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তি মগন বিহগ-নীড় কুসুমকাননে,
বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিত স্মিতহাসে—
বোলো মধুরবেদনবিধুর হৃদয়ে শরমনমিত নয়নে।'

সপ্রশংস উচ্ছ্বাসে হলঘর ভরে উঠল। খাবার পর্ব শেষ হলে বিদায় নিল সকলে।

অগ্নি ঘরে ফিরে এলে দেখল, তার প্যান্টের পকেটে ছোট্ট একটি কার্ড রয়েছে। কার্ডটা বের করে সে দেখল, তাতে দু-ছত্র লেখা।

'উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে।'

এবার যাত্রা কিন্নর দেশে। অগ্নিকে শুচি আগাম ইনভিটেশান দিয়ে রেখেছে। চিঠি লেখালেখি হয়ে গেছে মায়ের সঙ্গে। সানন্দে সম্মতি দিয়েছে বাপি। কিন্নর কিন্নরীদের কণ্ঠ-মাধুর্য যেমন বহুবিদিত, তেমনি তাদের পুষ্প প্রীতিও। দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে যেসব দুর্লভ ফুল ফোটে, তা তারা বহু শ্রমে সংগ্রহ করে এনে নিবেদন করে দেবতার চরণে। এরপর উদ্বৃত্ত ফুলে প্রেমিকরা সাজায় তাদের প্রেমিকাদের!

সারা বছর ধরে শতাধিক উৎসবে আনন্দমুখর এই হিমাচল-কন্যাটি। ফুল, নাচ ও গান এই উৎসবগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু ফুলেচ বা উখাং উৎসব কিন্নর কিন্নরীদের পুষ্পপ্রীতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এ উৎসবে দুর্লভ পুষ্পেরই প্রাধান্য। উ-মানে ফুল আর খাং-মানে দেখ। ফুলের সৌন্দর্য দেখ, তার সৌরভ গ্রহণ কর। ফুলকে অন্তর দিয়ে ভালবাস।

শুচি কিন্নরে ঘুরেছে মায়ের সঙ্গে কিন্তু উখাং উৎসব দেখেনি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, এই দু'মাস ধরে কিন্নরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন তারিখে তিন চার দিন ধরে এ উৎসবটি হয়।

এবার এই উৎসবটি দেখার প্রলোভন তাকে পেয়ে বসেছে। সে এই যাত্রায় সঙ্গী হিসাবে পেতে চায় তার গত দুবারের ভ্রমণসঙ্গী অগ্নিকে।

পড়ার চাপের অজুহাত দিয়ে অগ্নি একটু টালমাটাল করছিল, শুচি তিনদিন ওর সঙ্গে কথা বলল না, ফোনেও ধরা দিল না।

অভিমানী শুচির কাছে চতুর্থ দিনে আত্মসমর্পণ করতে হল অগ্নিকে।

ক্লাশ শুরুর আগে থেকেই ইউনিভাবসিটির উত্তর দিকের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইল অগ্নি। ওটাই শুচির প্রবেশপথ।

গাড়ি থেকে নেমে ওর পাশ দিয়ে মুখ নীচু করে চলে যাচ্ছিল শুচি। অগ্নি ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, আমার পরীক্ষা খারাপ হলে কিন্তু আমি দায়ী থাকব না। যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে, তবে সব দায় তার। আমি কিছু জানি না।

খুশি চাপতে পারল না শুচি। সে ফিরে দাঁড়িয়ে অগ্নির দিকে তাকাল। এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল, দেখিস তোকে কেউ টপকাতে পারবে না, বিধাতা জন্মলগ্নেই জাতকের কপালে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন।

এবার হাসিমুখে ওর হাত ধরে নাড়া দিতেই অগ্নির সব প্রতিরোধ ভেঙে ঝরে গেল।

* * *

সিমলাতে এসে ওরা হোটেলে উঠল না। ছোট সিমলাতে মায়ের বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে উঠল সবান্ধবে শুচি। মেসো মাসির আদর, বন্ধুত্বের উত্তাপ, ঘন পাইনের গান আর রাতের সিমলার তারা-ঝিলমিল আলো ওদের ছুটির প্রথম সাতটি দিনকে স্বপ্নময় করে তুলল।

শুচি চিঠিতে মাকে আগেই বারণ করে রেখেছিল, তাদের কিন্নর পৌঁছবার জন্য সিমলা থেকে যেন কোনরকম ব্যবস্থা না রাখা হয়। তারা নিজেদের খুশি মত কিন্নরে পৌঁছবে।

ফুলেচ উৎসবের আগের দিন ওরা সাংলা তহশীলের কামরু মোনে পৌঁছবে, এমনি প্ল্যান ছিল ওদের, কিন্তু বাদ সাধল প্রকৃতি।

হঠাৎ কড়া ঠাণ্ডার ছোঁয়ায় শুচি একটু কাবু হয়ে শয্যা নিল। মাসীকে বলল, দোহাই মাসী, মাকে খবরটা জানিও না। তাহলে মা সব কাজ ফেলে এখুনি ছুটে আসবে।

ডি. এফ. ও মেসোটি সরকারি ডাক্তার ডেকে আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, শুচি তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, কিছু ভাববেন না মেসোমশাই, সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা দুদিনেই সেরে যাবে।

মনে মনে বলল, ডাক্তার তো আমার বিছানার ধারে সারাক্ষণ বসে রয়েছে, ওকে ছেড়ে আর কোন ডাক্তারের ওষুধ খেতে যাব আমি।

নাওয়া খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া অগ্নি বসে থাকে শুচির পাশে। এক ফাঁকে কিছু ওষুধ আর ফল নিয়ে এসেছে বাজার থেকে।

শুচি অগ্নির একখানা হাত প্রায়ই জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। তার মনে হয় এক পরম নিশ্চিন্ততা রয়েছে অগ্নির ছোঁয়ায়।

শুচির ওষুধ খেতে যত আপত্তি। বলে, সর্দি জ্বর তো বিছানায় কদিন শুতে বসতেই কেটে যায়, তবে ওষুধ কেন?

কথাটা মিথ্যে নয়, তবে বাইরে বিভুঁইয়ে এলে সবদিক থেকে একটু প্রিকোসান নিতে হয়।

কি রকম?

ওষুধ দিয়ে খানিকটা গার্ড করে রাখা, যাতে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে না চলে যায়। এখানকার আবহাওয়াটা আমাদের গা সাওয়া নয়, তাই নতুন আবহাওয়াকে একটু সমঝে চলতে হচ্ছে। সবদিক থেকে সচেতন থাকা আর কি।

স্টেথিসকোপ বুকে পিঠে বসিয়ে শ্লেষ্মার সন্ধান করে অগ্নি।

শুচি বলে, কিছু পেলি?

অগ্নি মাথা নেড়ে জানায়, কোনও দুর্ঘটনার খবর নেই।

তবু বুকের ভেতর কোন শব্দ?

অগ্নি হেসে বলল, শুধু ডিবডিব ডিবডিব।

তার মানে?

তোর বুকের ভেতর বিয়ের বাদ্যি বাজছে।

বাজতেই পারে, তুই কি ভাবিস আমি চিরদিন আইবুড়ো থাকব।

পরমাসুন্দরী, ইংরাজী অনার্সে ফার্স্টক্লাশ প্রাপ্ত, এম. এ. পাঠরতা, কথক নৃত্যশিল্পী, পিতার একমাত্র কন্যা আইবুড়ো থাকবে, এমন ভাবনা কোন পাগলের মাথাতেও আসবে না।

শুচি অগ্নির হাতটা জড়িয়ে ধরে পাশ ফিরল। মুখে বলল, তুই তো পাগল নয়, বদ্ধ পাগল।

তাই?

তাই নয়তো কি? নিজের ভেতর তুই সারাক্ষণ ডুবে থাকিস। তোর ভালবাসা, তোর পরোপকারের ইচ্ছায় এতটুকু ফাঁকি নেই, কিন্তু সবকিছুতে তোর আসক্তি বড় কম।

মাসী বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। বেশ মুক্ত মনের মহিলা।

দুটি তরুণ বন্ধুর সান্নিধ্যকে স্বাভাবিক বলে মনে করেন। আর মেসোটিও তথৈবচ। বয়স হলে কি হবে, কথাবার্তায় যেন মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড। কাজে কাজে সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু সন্ধ্যে সাতটার ভেতর অবশ্যই কুলায় ফিরে আসেন। এ বিষয়ে স্ত্রীর কড়া নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য তাঁর নেই। আজই কেবল বেরিয়েছেন বাইরের ট্যুরে, ফিরবেন তিন দিনের পর।

মাসী বিছানায় বসে শুচির কপালে হাত রাখলেন। পাশের চেয়ারে বসেছে অগ্নি। সামান্য টেম্পারেচার আছে বলে মনে হচ্ছে।

অগ্নি মাথা নেড়ে মাসীর কথা সমর্থন করল।

তুমি বাবা তেমন কিছু মনে করলে একজন ডাক্তাব ডাকতে পার।

অগ্নি উত্তর দেবার আগেই শুচি বলল, তুমি মিথ্যে ভাবছ মাসী। ও আমাদের ওখানকার মেডিক্যাল কলেজের নামকরা ছাত্র। ওর বাবাও ডাক্তার ছিলেন। ওর মা আর দিদি নার্সিং-এর কাজে যুক্ত আছেন।

মাসী হেসে বললেন, তবে নির্ভয়ে এই তরুণ ডাক্তারের হাতে তোমার দায়িত্ব তুলে দেওয়া যায়।

অগ্নি ভাবল, ডাক্তার হিসেবে তার দক্ষতাকে সমর্থন জানালেন মাসী। আর শুচি উপভোগ করল মাসীর কথার অন্য এক তাৎপর্য।

মেসো ট্যুর থেকে ফিরে এসে দেখলেন, শুচি সুস্থ হয়ে উঠেছে। তিনি বেশ রিলিভড্ বোধ করলেন।

মাসী বললেন, ধন্যবাদ জানাও শুচির বন্ধুটিকে। সারাক্ষণ বন্ধুর সেবা করে, তার সঙ্গে গল্প করে, গান শুনিয়ে একেবারে ওর রোগের চিন্তা ভুলিয়ে দিয়েছে।

মেসো মন্তব্য করলেন, একথা শুনলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন তোমার বান্ধবী।

দুদিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে মেসো মাসির কাছে বিদায় নিয়ে শুচি বন্ধুর হাত ধরে চলল সিমলা বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে। কমিশনারের পার্মিশান আগেই যোগাড় করা ছিল। গতকাল কিন্নরের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে।

কলকাতা ছাড়ার আগে সরকারী কাজে নিযুক্ত কোনও অফিসারের স্ট্যাম্প দেওয়া পরিচয় পত্র সঙ্গে করে আনতে হয়। ওটি সিমলায় কমিশনারের অফিসে দেখালে কিন্নর প্রবেশের অনুমতি পত্র মেলে।

বেদজ্ঞ সাহেব নিজেই তাঁর কন্যা এবং কন্যার বন্ধুর জন্য এসব ব্যবস্থা পাকা করে দিয়েছিলেন, তাই কমিশনারের ছাড়পত্র যোগাড় করতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। ওরা ছোট সিমলা থেকে হালকা দুটো ট্যুরিস্ট ব্যাগ হাতে সিমলা বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ উল্টোদিক থেকে সামনে এসে দাঁড়ালেন হীরক দত্তগুপ্ত। বিস্ময়ের অন্ত নেই শুচির।

স্যার আপনি!

বেড়িয়ে বেড়ানো আমার একটা হবি। তোমাদের বাড়িতে গিয়ে যখন শুনলাম, তুমি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে কিন্নর যাত্রা করেছ, তখন আমারও ইচ্ছে হল কিন্নরটা দেখে আসি।

অগ্নি বলল, চলুন স্যার, বেশ জমবে।

হীরক বলল, আমার যাবার কোনও উপায় নেই। আমি জানতাম না যে কিন্নরে ঢুকতে গেলে

এখানকার কমিশনারের পারমিশান নিতে হয়। আর সে পারমিশান পেতে গেলে ওখান থেকে আনতে হয় কোনও সরকারী অফিসারের সই করা আইডেনটিটি কার্ড।

শুচি বলল, আপনি কিন্নরে আসবেন বলে বাপি জানতো?

তোমার আসার কথা জেনেছিলাম ওঁর কাছ থেকে কিন্তু আমার আসার খবর উনি পাননি।

তাই আপনার এই ঝঞ্ঝাটটা ঘটেছে। বাপি যদি জানতো তাহলে আপনার সব ব্যবস্থাই করে দিত।

প্রফেসার দত্তগুপ্ত বললেন, তোমাদের যাত্রা আনন্দের হোক, শুধু প্রফেসার নয়, বন্ধু হিসেবে আমার শুভকামনা রইল। আজ থেকে ভাবতে পার, আমি তোমাদের আর এক বন্ধু। তোমরা দুজনেই আমাকে দাদা বলে ডাকলে খুশি হব।

আবেগে শুচি এগিয়ে গিয়ে রজতের একখানা হাত ধরে বলল, আমার কোনও ভাইবোন নেই, আজ থেকে আপনি আমার দাদা।

রজতের চোখ খুশির অশ্রুতে চিকচিক করে উঠল। তিনি দাদার স্নেহে শুচিকে কাছে টেনে নিলেন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে এই প্রীতি মধুর দৃশ্যের কয়েকটি ছবি তুলল অগ্নি।

রজত বললেন, ছবি প্রিন্ট হলে আমাকে এক কপি দিও কিন্তু।

অগ্নি সঙ্গে সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই আপনাকে দিয়ে আসব দাদা।

এই প্রসঙ্গের জের টেনে রজত বললেন, কিন্তু তুমি ক্যামেরা নিয়ে কিন্নরে ঢুকবে কি করে?

কেন দাদা?

পথে চেকিং হয় বলে শুনেছি। এবং কিন্নরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া বারণ।

হতাশ গলায় অগ্নি বলল, এখন তাহলে ক্যামেরা নিয়ে কি করি।

শুচি বলল, দাদার হাতে দিয়ে দে, কলকাতায় ফিরে নিয়ে নিবি।

রজত বললেন, আমার ওটুকু ক্যামেরা বয়ে নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধেই হবে না। তবে তোমরা একটা চান্স নিতে পার। ড্রাইভার সাহেবকে ধরে পড়ে অনুরোধ জানিয়ে দেখ না, তিনি কোনও রকম ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা। নইলে চেকিং অফিসাররা ওটা জমা রেখে দেবেন। তোমরা ফেরার পথে নিয়ে নিও।

অগ্নি বলল, তাই ভাল, একবার ট্রাই করে দেখি।

কিন্নর যেন অন্য জগৎ অন্য দেশ। ওরা রামপুর বুশেহার অব্দি সিমলা থেকে বাসে এল। ওখানে রাত কাটাল পাহাড়ী নদীর ধারে নির্জন একটি ডাকবাংলোতে। ওখানকার চৌকিদারের সঙ্গে কথা বলে তারই সাহায্যে একটি জিপ যোগাড় করল। জিপ ওদের পৌঁছে দেবে কারছাম অব্দি। তারপর ফিরে আসবে জিপ। ও আর সতের আঠার কিলোমিটার পেরিয়ে সাংলার দিকে যাবে না। কারছামে কিছু মাল তুলে নিয়ে ও বুশেহারেই ফিরে আসবে।

ওরা দুপুরের আহারটা কারছামে সেরে নিল। ওরা আজই ওদের গন্তব্যস্থল সাংলাতে চলে যেতে চায়। কিন্তু ওরা একটিও জিপ কিংবা বাস পেল না। একরাত্রি কারছামে কাটানোর কোনও ইচ্ছাই ছিল না ওদের দুজনের।

অগ্নি বলল, মাত্র সতের কিলোমিটার পথ। সামনে শুক্লাতিথির চাঁদ। আমরা হেঁটে ঠিক সাংলা পৌঁছে যাব। মাসীমা নিশ্চয়ই ওখানে তোর মামার বাড়িতে আছেন, বেশ সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে।

এ বয়সের তরুণ তরুণীরা আনডন্টেড। তারা কোনও বিপদ বিপর্যয়ের কথা ভাবতে একেবারেই নারাজ।

পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল দুজনে। সরু পথ তাই আগে পিছে ওরা চলতে লাগল।

প্রথম বিপর্যয় এলো অপরাহ্নের দিকে। হঠাৎ সাদা ধুলোর মেঘ সামনের পাহাড়ের ভেতর থেকে

যেন বুলবুলিয়ে উঠতে লাগল। যেন হাজারটা তুরপুন পাহাড়টাকে ছিদ্র করছে এমন একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

দুধের মতো সাদা মেঘ সামনের দৃশ্যকে একেবারে মুছে দিল। মেঘের উল্টোদিকে মুখ করে একটা কেলমাং (দেওদার) গাছের তলায় বসে ওরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল।

হুড়মুড় করে কতকগুলো পাথর পড়ার শব্দ হল। কিছু পরে উড়ে গেল ধুলোর মেঘ। অপরাহ্নে প্রকৃতি প্রসন্ন।

ওরা কয়েকটা বোল্ডার পেরিয়ে প্রায় আধ কিলোমিটার হাঁটার পর বাঁদিকে দেখতে পেল কয়েকটা সুউচ্চ বিচিত্র বর্ণের পাহাড়। মনে হবে ময়দানব যেন এই যক্ষপুরীটিকে তৈরি করেছে। পাহাড়ের ভেতর থেকে বিপুল জলধারা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একেবেঁকে অনেক নীচে শতদ্রুর সঙ্গে মেলবার জন্য ধাবিত হচ্ছে।

অগ্নি শুচির হাত ধরে পথের ওপর প্রবাহিত সেই জলধারাকে পেরিয়ে এল। কিছুটা দূরে দেখা গেল একটা প্রায় গেরুয়া রঙের পাহাড়ের চূড়াকে ঘণ্টাকৃতি বৌদ্ধস্তূপের মতো কাটা হয়েছে। শেষবেলার তাম্রাভ আভাটি স্তূপের ওপর পড়ে একটা ধ্যানের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

অগ্নি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে বলল, দেখ শুচি, বৌদ্ধ ধর্মকে বৌদ্ধাচার্যরা কিভাবে পর্বতে, কন্দরে, প্রান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

শুচি বলল, আমাদের একবার ওখানে যেতে হবে।

কেন?

ওখানে আমার মাসী থাকেন।

ওই বৌদ্ধমন্দিরে?

হাঁ, তিনি ওখানকার জোমো (শ্রমণী)।

তাই?

শুচি বলল, কিন্নরে একাধিক ভাই একটি মেয়েকে বিয়ে করে। তাই অবশিষ্ট মেয়েদের অনেকেই বৌদ্ধ-শ্রমণী হয়ে যায়।

বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে শুচি বলল, চল, মাসীর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

অগ্নির কি মনে হল, সে বলল, শ্রমণীরা ওখানে থাকেন, তুই দেখা করে আয়। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

শুচি কি ভেবে বলল, ঠিক আছে, তুই দাঁড়া, আমি আসছি।

শুচি নীচের দিকে নামার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ শব্দে পাহাড়ের দু-জায়গা থেকে বড় বড় শিলাখণ্ড গড়িয়ে আসতে লাগল।

এখানে নদী গরজ্-এর সৃষ্টি করে পাহাড় কাটতে কাটতে অনেক নীচে নেমে গেছে। তার ফলে ছোট বড় পাথর মাটি বেশ বড় বড় পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে। বাতাসের ঘূর্ণিতে মাটি আলগা হয়ে ঝরে পড়লে বড় বড় শিলাখণ্ড ওপর থেকে নীচে ভয়ঙ্কর বেগে গড়িয়ে আসে। তখন যা কিছু পথে পড়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

এই বিপর্যয়ের জন্য ওরা প্রস্তুত ছিল না। পথ ভেঙে যেন পাথরের নতুন পাঁচিল উঠে গেল। তখন দুদিকে দুজন, কার কী অবস্থা হল কেউ বুঝতে পারল না। সূর্যের লাল আভা তখন কিন্নর কৈলাসের শুভ্র চূড়াকে রাঙিয়ে দিয়েছে। পার্বতীর ললাটের সিঁদুরে যেন রঞ্জিত হয়ে গেছেন কৈলাসপতি।

অগ্নি মুখ ঢেকে ফেলেছিল। এত বড় বিপর্যয় ছিল তার কল্পনার বাইরে। সামনের পথঘাট সব ভেঙে গেছে। এখন ওপারে পৌঁছতে গেলে পাহাড় ডিঙোতে হবে। কয়েক মিনিট তাণ্ডব চালিয়ে প্রকৃতি এখন নিস্তব্ধ।

অশান্ত হয়ে উঠেছে অগ্নির মন। শুচির কি পরিণতি হল তাই জানবার জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে সে।

ওই আবছা আলোতে অগ্নি পাগলের মতো পাহাড়ের পাঁচিল আঁচড়ে উঠতে লাগল। আকস্মিকভাবে বেঁচে গিয়েছে সে কিন্তু এই পাথরের সামান্য একটু টুকরোও ছিটকে এসে মাথায় পড়লে মানুষের মৃত্যু প্রায় অবধারিত।

বহু চেষ্টায় পাথরের তৈরি পাঁচিলের ওপর উঠে সে ওপারে চোখ চালিয়ে দেখতে লাগল। সামনে আরও দু-তিনটে পাহাড়ের পাঁচিল তৈরি হয়ে গেছে।

প্রভু বুদ্ধকে হাত তুলে প্রণাম জানাল অগ্নি। তাঁর কৃপায় এই বিপর্যয়ের ভেতরেও বেঁচে গেছে শুচি। সে শ্রমণীদের আশ্রমে যেতে পারেনি ঠিক কিন্তু দুটি পাঁচিলের মধ্যে বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার উদভ্রান্ত দৃষ্টি সামনের পাঁচিলের দিকে নিবদ্ধ। তার বিহ্বল দৃষ্টিতে সঙ্গীকে অন্বেষণের আকুলতা।

হঠাৎ দুজনের দৃষ্টি মিলিত হল। অগ্নি হাত তুলে চিৎকার করে বলল, ভয় পাসনি, প্রভু বুদ্ধের কৃপায় আমরা দুজনেই বেঁচে গেছি।

অগ্নিকে সুস্থ দেখে আবেগে সে ততক্ষণে দু-হাতের পাতায় চোখ ঢেকে ফেলেছে। অগ্নি কয়েক মিনিটের চেষ্টায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে ওপারে নামল।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ।

একসময় বাঁধন শিথিল করে দিয়ে অগ্নি বলল, সামনে আর একটা প্রাচীর আমাদের ডিঙিয়ে যেতে হবে। আমি যেখানে যেখানে পা রাখব তুই সেখানে স্টেপ ফেলে ফেলে উঠে আসবি।

আগে উঠে অগ্নি শুচির হাত ধরে টেনে নিল। ওপারে নামল আরও সাবধানতার সঙ্গে।

এপারে ধবধবে সাদা ধৌলাধার তখন চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

বৌদ্ধস্তূপে প্রবেশের চিত্রিত কঙ্কনীটা (তোরণদ্বার) তার রঙের ঔজ্জ্বল্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শুচি বলল, বাধা পড়েছে, থাক, আজ আর মাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাব না।

বেশ চল্‌ বাকি পথটুকু জ্যোৎস্নার আলোয় হেঁটে চলে যাই।

শুচি বলল, এখানকার পাহাড়ের এই রীতি। মোরেনের জমা মাটি পাথর বলে, মাঝেমাঝেই ওগুলো ভেঙে পড়ে। একটু পরেই দেখবি পি. ডব্লুউ. ডি.-র কুলিকামিনরা পথ সারাইয়ের কাজে বেরিয়ে পড়েছে।

রাত প্রায় দশটায় ওরা সাংলার ডাক বাংলোতে এসে পৌঁছল। তখন ওই বাংলোতে কারোর জেগে থাকার কথা নয়।

কিন্তু ওরা দেখল, আধভেজানো একটা জানালার ফাঁক দিয়ে আলোর একটুকরো রশ্মি এসে ঘাসের লনের ওপর পড়েছে।

শুচি হঠাৎ বসে, দাঁড়িয়ে, মাথা এদিক-ওদিক কাত করে কি যেন দেখল। তারপর দৌড়ে চলে গেল বাংলোর দিকে।

দরজায় ঘা দিতে দিতে চেঁচাতে লাগল, মা দরজা খোল, আমরা এসে গেছি।

দরজা খুলে গেল। দূর থেকে অগ্নি দেখল, মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছে।

পরক্ষণেই মাথাটা কাত করে অগ্নি, অগ্নি এদিকে আয় বলে ডাকতে লাগল শুচি।

অগ্নি এগিয়ে গেল।

এস, এস, তোমাদের দেরী হচ্ছে দেখে আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।

শুচি বলল, তুমি জানলে কি করে যে আজ আমরা আসব।

তোদের সিমলা ছাড়ার পর তোর মাসি আমাকে ফোনে আসার কথা জানিয়েছে। সেজন্য হিসেবমতো তোদের আজ সকালে পৌঁছবার কথা। এত রাত্রি হবে ভাবতে পারিনি।

শুচি বলল, আমরা কারছাম্ থেকে হেঁটে এসেছি মা।

আমি জানলে জিপ পাঠিয়ে দিতাম।

পথের যে হাল, তোমার জিপটা না ভেঙেচুরে নদীতে পড়ে যেত।

কি করার আছে বল, কিন্নরের প্রকৃতিই এরকম খেলা খেলছে। এখন কথা থাক, এখানে খাওযা-দাওয়া করে শুয়ে পড়। কাল সকালে মামার ওখানে গিয়ে উঠবি। ওরা সব তোদের দেখবে বলে ব্যগ্র হয়ে আছে।

রাত ভোর হতে না হতেই ওদের আর কামরু পাহাড়ে মামার বাড়িতে যেতে হল না।

শুচির মামা তপোনাথ নেগির ছেলে প্রীতম আর তার বউ সুনীলা এসে হাজির।

হাসি আনন্দে মহামিলনের একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেল।

সুনীলা শুচির হাত ধরে বলল, কত আশা করে ছিলাম, তোমরা উখাং মেলায় আসবে।

শুচি বলল, আমি সিমলায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম ভাবী। মা চিন্তা করবে বলে কোনও খবর দিইনি।

প্রীতম অগ্নির কাছে এসে বসল, তুমি শুচির বন্ধু বলে শুনেছি, আজ থেকে তুমি আমাদেরও বন্ধু। যে কদিন এখানে থাকবে, আমাদের বাড়িতেই থাকতে হবে।

শুচির মা সুরঞ্জনা বললেন, তোরা এদের নিয়ে যা, আমি কিছু পরে কাজ সেরে যাচ্ছি।

পথের ধারে আপেলের বাগানে আপেল ফলে আছে। কোথাও বা পিঙনিয়ারা আর খানো-র গাছ সবুজ ডালপাতা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা কয়েকটা ছোট ছোট ঝোরা পেরিয়ে বসন্ত ঝোপকে বাঁয়ে রেখে ডাইনে মোহরো ঝোপের গা ঘেঁষে কামরু পাহাড়ের তলায় এসে দাঁড়াল।

প্রীতম ডানদিকে একটা পাঁচতলা কাঠের বাড়ি দেখিয়ে অগ্নিকে বলল, এটা আগে বুশেহারের মহারাজের দুর্গ ছিল। এখন সরকারী অফিস হয়েছে। আর ওই বাঁদিকে তিনতলা কাঠের বাড়িটা আমাদের।

শুচি যোগ করল, বলো দুদান পরিবারের বাড়ি। নেগিরা মহারাজের আমলে মন্ত্রী ছিলেন।

সত্যি, আগেকার দিনের মন্ত্রীদের মতোই রাজকীয় বাড়ি। বিশাল বিশাল কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে এই বাড়ির কাঠামো। নীচ থেকে পেতলের চেন বাঁধা ঘণ্টাগুলো বড় থেকে ক্রমশ ছোট হয়ে তিনতলা অব্দি উঠে গেছে।

প্রীতমের বউ সুনীলা নীচের ঘণ্টা ধরে নাড়া দিতেই অপূর্ব টুংটাং আওয়াজ করতে করতে খবরটা ওপরে চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে কয়েকটা পায়ের শব্দ বেজে উঠল সিঁড়িতে। আর সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল।

ভোরের সোনালি রোদ্দুরের মতো হাসি ছড়াল তিন চারজন দেবকন্যা।

কি আন্তরিক আতিথেয়তা। সবাই প্রায় জড়িয়ে ধরে ওপরে নিয়ে চলল অতিথিদের। অগ্নি অপরিচিত বলে তাদের প্রীতির ছোঁয়া থেকে বাদ গেল না। বসার ঘরটি কাঠের কাজ করা সিংহাসনের মতো চেয়ারে সাজান। নীচে পুরু দামী কার্পেট পাতা।

পাশের ঘরটি আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিল অগ্নির জন্যে।

পরিচ্ছন্ন শোবার ঘর। ঝকঝকে অ্যাটাচড বাথ। দু-দিকের দুটো জানালা খুলে একদিকে কিন্নর কৈলাস অন্যদিকে ধৌলাধার দেখা যায়।

ধৌলাধারের গা ছুঁয়ে নীল বাস্‌পা নদী এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে কারছামের দিকে শতদ্রুর সঙ্গে মিলনের আশায়।

বাস্‌পার তীরে ঝকঝকে সবুজ পাইনের বন ধৌলাধারের গা বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। এপার থেকে ওপারে যাবার ব্রিজটাও ডানদিকের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে। অগ্নিকে তার ঘরে বসিয়ে মামার বাড়ির দলটি শুচিকে নিয়ে অন্দরমহলে চলে গেল।

জায়গাটা ভারী ভাল লেগে গেল অগ্নির।

আদর আপ্যায়ন, আন্তরিকতার ত্রুটি ছিল না কোথাও। প্রীতমের বউ সুনীলা কেবল তরুণী নয়, পরমাসুন্দরী এক কিন্নরী। সে এক ফাঁকে এসে অগ্নিকে বলে গেল, উখাং উৎসবে তোমরা আসতে পারলে না ঠিকই, কিন্তু সে দুঃখ তোমাদের ভুলিয়ে দেব।

অগ্নি মৃদু হেসে বলল, কি রকম?

কৌতুকময়ী সুনীলা মিষ্টি হেসে বলল, ঠিক সময়ে জানতে পারবে।

পরের দিন একটা উৎসব হল সাংলার ময়দানে। সবাই মিলে চলল সেই উৎসব প্রাঙ্গণে। এ উৎসবের নাম জাগ্‌রো।

জাগ্‌রো উৎসব কোনও কোনও জায়গায় উখাং-এর সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে থাকে। কিন্তু কামরুতে উখাং-এর কয়েকদিন পরেই হয়।

এ উৎসবে মাহাসুর গ্রোকচের ওপর দেবীর ভর হয়। সে একসঙ্গে দুটো তিনটে, এমনকি চারটে শাণিত তলোয়ার নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করে।

সূর্যের আলো লেগে শূন্যে ছোঁড়া তলোয়ারগুলো ঝলসে উঠছিল। আর সে সেগুলো এক একটা ধরে নিচ্ছিল দক্ষ সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত।

খেলা দেখতে ময়দান পূর্ণ হয়ে গেছে। মেয়ে এবং পুরুষে কিন্নরের বিচিত্র পোশাকে সেজেছে। তাপ্রু-সে-সুতান, তাপ্রু-সে-ছোবা, তাপ্রু-সে-ছানলি, তাপ্রু-সে-পোনু ইত্যাদি কাজ করা মূল্যবান পোশাক আর নাগরা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকের মাথায় টুপি—কিন্নরের থেপাং।

কথা রেখেছিল সুনীলা। সে আর প্রীতম তাদের কজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শুচি আর অগ্নিকে নিয়ে বাস্‌পার ব্রিজ পেরিয়ে জ্যোৎস্নাধোয়া পাইন বনে ঢুকেছিল। সেখানে তারা পাহাড়ী ওম পথ ধরে উঠে গিয়েছিল কিছুটা ওপরে। তারা এসে ঢুকেছিল একটা ডগ্‌রির ভেতর। ডগ্‌রি হল কামরুর বিশিষ্ট পরিবারের মানুষজনের গ্রীষ্মাবাস।

সেখানে বসে সবাই শুচি আর অগ্নিকে ঘিরে উখাং-এর গান গাইল। কিন্নর-কিন্নরীদের মধুর কণ্ঠের সুরধ্বনি সেই জ্যোৎস্নারাতে মায়াময় এক পরিবেশের সৃষ্টি করল।

ওরা সেই ঘরের খানিকটা সমতল উঠোনে কোমরে হাত জড়িয়ে পৌরাণিক কিন্নর-কিন্নরীর মহিমায় নাচতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় সেই সুরম্য পরিবেশ থেকে এক ঝাঁক চিত্রিত মুনাল পাখির মতো ছেলেমেয়েরা উড়ে চলে গেল বাস্‌পা নদীর ওপারে সেই বাঁধা সেতু পেরিয়ে কামরুর দিকে।

ডগ্‌রির ভেতর থেকে একঝুড়ি ফুল আর মালা এনে অগ্নির কাছে বসিয়ে দিয়ে সুনীলা বলল, উখাং উৎসবে সবচেয়ে প্রিয়জনকে ফুলের অলঙ্কারে সাজায় তার প্রেমিক। তুমি যাকে তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষ বলে মনে করো আজ তাকে তুমি একান্ত আপনভাবে এই ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়ে দাও। আমরা এখানে আর কেউ থাকব না। থাকবে তোমরা দুজনে, থাকবে ধৌলাধারের ওপর

জেগে থাকা চাঁদ, শতদ্রুর সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক বাস্পা আর এই আলোছায়ার আলপনা আঁকা পাইন অরণ্য। নিশিভোরে আমরা আবার তোমাদের এখানে এসে নিয়ে যাব।

সর্বশেষ মুনালটিও ওদের একান্তে রেখে উড়ে গেল। কিন্নরীর পোশাকে সেজে আজ অপরূপা হয়ে উঠেছে শুচি। তাকে এক একটি করে মালায় সাজাল অগ্নি। ফুলে পাতায় সাজানো মালা জড়িয়ে দিল তার লম্বা বিনুনিতে। সুসজ্জিত শুচিকে দু-হাত ধরে তুলল। তারপর দুজনে হাত ধরে আলোছায়ার আলপনা আঁকা পাইন বনের ভেতর দিয়ে দুটি ঝিকিমিকি জোনাকির মতো বাস্পা নদী লক্ষ্য করে নামতে লাগল।

কি আশ্চর্য! নেমেই দেখল এক ঝাঁক ছোট ছোট হলুদ প্রজাপতি হাওয়ায় পাখা ভাসিয়ে ওদের ছুঁয়ে নাচতে নাচতে উড়ে গেল।

সেখানে বাস্পার কূলে মসৃণ ঘাসের জমিতে বসল অগ্নি। তার কোলে মাথা রেখে তার দিকে চেয়ে রইল শুচি।

একসময় অগ্নি দু-হাতের অঞ্জলিতে তুলে ধরল শুচির চম্বক ফুলের মতো মুখখানা। ধৌলাধারের মাথায় তখন পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করছে।

●

মাধবী

মাধবী,

কংসাবতীর কূলে অমৃতের সঙ্গে আর কোনদিন তোমার দেখা হবে না। কথার ওপর কথা গেঁথে যে মানুষটি একদিন তোমার বকুলতলায় আসর জমাতো, সে আর চুরি করবে না তোমার কাজের সময়গুলো। দূর গাঁয়ে পুঁথির খোঁজে গিয়ে আর কেউ বাড়াবে না তোমার উদ্বেগ। তোমার অকারণ পথচাওয়ার দুঃখ শেষ হোক।

তোমার মাধবীকুঞ্জ এখন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। বকুল ঝরেছে অতিথিভবনের পথে পথে। আমি দূর থেকে দেখছি, তুমি রোজকার মতো অন্যমনে ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে চলছ সেই পথের ওপর দিয়ে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তোমার ধবলী শ্যামলী আসছে পথের ধুলো উড়িয়ে। তাদের হাম্বারবে ধ্বনিত হচ্ছে সন্ধ্যার আকাশ। দীপ জ্বালবে না? রাধামাধবের মন্দিরে বাতি জ্বালার সময় হয়ে গেছে, এবার যাও মাধবী তোমার সন্ধ্যারতির কাজে।

মনে পড়ছে আজ আমার আচার্য দীনদাসের কথা। অন্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। বলছেন, তাকাও আকাশের দিকে, ছোটর ভাবনা, ছোটর দুঃখ ঘুচে যাবে।

রামদাস দাদু এলে বোলো তিনি যেমন করে তাঁর জীবনের দুঃখকে ভুলেছিলেন, অমৃতও তেমনি করে ভোলার চেষ্টা করছে। আজও কানে বাজছে তাঁর কথা, 'স্রোতে কি ময়লা জমে। মন যে কংসাবতীর স্রোত গো। ওতে ময়লা জমবে কী করে। ময়লা পড়ে তো ভেসে যায়।'

আর কোনওদিন চিঠি দিয়ে চঞ্চল করব না তোমার ভাবনা। তোমার হৃদয় মাধবের মন্দিরে তার শান্তি, তার আনন্দ খুঁজে পাক, দুঃখের মাঝেও তোমার অমৃত রোজ সেই প্রার্থনা জানিয়ে যাবে।

'অমৃত'

পুনশ্চ ঃ তোমার দেওয়া পুঁথির পাতা আজও খুলতে পারিনি। জানি না আর কোনওদিন খুলতে পারব কিনা।

চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেছে। পাশে পড়ে আছে প্রাচীন সাহিত্যের মহামূল্যবান পুঁথিখানা, যা অমৃতের হাতে বিদায়ের দিনে তুলে দিয়েছিল মাধবী। অমৃত দেখছে সেই গীতগোবিন্দখানি। মনে হচ্ছে তার, কংসাবতীর কূলে আচার্য দীনদাসের আশ্রমে রাধামাধবের মন্দিরে গান হয়ে বেজে উঠছে গীতগোবিন্দের পদগুলি। মাধবী গাইছে তার সেই প্রিয় পদটি ঃ

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নম্ সচকিত নয়নম্
পশ্যতি তব পন্থানম্।।

এ আকুলতা তো কৃষ্ণের? একদিন মাধবীকে প্রশ্ন করেছিল সে।

তোমার মনের কথা আমাকে বলতে দাও অমৃত।

কখনো না, কিছুতেই কারো জন্যে এমন করে পুরুষে অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে না।

হেসে বলেছিল মাধবী, নিজের বুকের কাছে কান পেতে শুনেছ কি কোনওদিন?

কোনও উত্তর সেদিন দিতে পারেনি অমৃত। কারণ এই হৃদয়ের ধ্বনি সে শুনেছে, আর শুনতে পেয়েছে প্রথম মাধবীর দিকে তাকিয়ে, আর তার মুখে পূর্বরাগের কথা শুনে।

আজ, সব ভুলে যাওয়া কথার মিছিল, হারিয়ে যাওয়া ছোট ছোট ঘটনা ফিরে ফিরে আসছে অমৃতের স্মৃতির পথ বেয়ে। অমৃত দেখছে সেই ছবি, তার জীবনের মাত্র ছয়টি ঋতুর হাসিকান্নার দোল দোলানো ছবি।

সাহস দাও তো একটা কথা বলি? অমৃতের স্বরে গাঢ়তা।

কিসের সাহস গো?

মাধবীর কথার সহজ সুরে অমৃতও সহজ হল— তোমার কাছে আমার দুর্বলতাটুকু প্রকাশ করার সাহস।

এবার আর মিষ্টি করে হাসল না মাধবী। বোধকরি এমন মুহূর্তগুলোতে হাসি আপনি সরে দাঁড়ায়।

কিছু সময় চুপচাপ বসে রইল সে। খুব বেশিক্ষণ নয়, তারপর আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ তুলে বলল, তুমি তো দুর্বল নও অমৃত যে সাহস চাইবে। তুমি সবল তাই সহজ করেই কথা বল।

অমৃত পারল না নিজের সেটুকু শক্তি সঞ্চয় করতে, অন্তত যেটুকু নইলে একটি মেয়ের মনের দরজায় হাত দেওয়া যায় না। অমৃত নীরব হয়েই রইল কিছুক্ষণ। নীরবতাকে ভাঙল মাধবী। নদীর জলের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, দেখ অমৃত, কেমন স্বচ্ছ ছায়া পড়েছে আমাদের জলের ওপর।

অমৃত জলের দিকে তাকিয়ে বলল, তাইতো, কত স্পষ্ট!

মুহূর্তে মাধবী একমুঠো বালিমাটি ছুঁড়ে দিল তার ওপর। জলের ওপরটা ছলকে উঠল। দুজনের ছায়া যেখানে পড়েছিল সেটুকু জায়গা কেঁপে কেঁপে অস্পষ্ট হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে অমৃত বলল, এ আবার কি খেলা তোমার?

হাসল মাধবী—মনের ওপর আমাদের এমনি ছায়া পড়ে অমৃত। আবার আমরাই তাকে ঘোলাটে করে তুলি, তাই না?

অমৃত তাকিয়ে রইল মাধবীর দিকে। আজ নিজের মনে কেন জানি না বড় সংকোচ বোধ হল অমৃতের। সে সহজ করে তার মনের কথাটুকু বলতে পারছে না, তাই কি মাধবীর এই শাসন। তার কাপুরুষতাকেই কি মাধবী আঘাত করতে চায়, না তার গোপন মনের অস্বচ্ছ কামনাকে।

দেখ, দেখ অমৃত, ঘোলা জলটুকু স্রোতের টানে কোথায় সরে গিয়ে আবার কেমন স্বচ্ছ হয়ে গেছে।

মাধবীর কথায় অমৃত তাকিয়ে দেখল সত্যই তাই। জলে কোনও চিহ্নমাত্র নেই। শুধু তাদের ছায়া দুটি আগের মতোই স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে।

যেন স্বগতোক্তি করল মাধবী—মাটি দিয়েই তো ঠাকুর তৈরি হয়, তা বলে ঠাকুরের গায়ে কি সারাক্ষণ মাটির গন্ধ লেগে থাকে।

হাসল অমৃত। এতক্ষণ মনে তার যে মেঘ জমে উঠেছিল তা দক্ষিণের হাওয়ার ছোঁয়ায় যেন মুহূর্তে কোথায় উড়ে চলে গেল। মনে রোদ ছড়িয়ে পড়ছে তার। এতক্ষণে বেশ প্রসন্ন লাগছে। মাধবীর শেষের কথাটুকু কত সহজ করে দিয়েছে আজকের এই অস্বস্তিকর পরিবেশটাকে।

এবার মাধবীর নীরব হবার পালা। কতক্ষণ সে চুপ করে রইল। একসময় তাকাল অমৃতের দিকে। বলল, কই, কিছু বললে না তো?

কৌতুক করে বলল অমৃত, তোমাকে শোনাবার মতো কথার সঞ্চয় তো আমার নেই মাধবী।

হেঁয়ালি রাখ ঠাকুর, যা বলতে চেয়েছিলে বল।

অমৃত এবার জোর পেয়েছে মনে। তাই সে বলল, দেখ, হেঁয়ালিটুকুই তো সার। আলপনার আঁকাবাঁকা রেখার বাঁধনে বেঁধে না দিলে পুজোর মণ্ডপের শ্রী ফোটে কি?

সহজের শ্রী যে আরও সুন্দর অমৃত।

এবার তদ্‌গত হয়েছে মাধবী।

ছেলেবেলার একটা কথা বলি শোন। মাটি নিয়ে রোজ শিবমূর্তি গড়ে পুজো করতাম এই আশ্রমে। বাবাই শিখিয়েছিলেন। মনে মনে বলতাম, ঠাকুর তোমার মত যেন বর পাই! কি অদ্ভুত বিশ্বাসে সেদিন

ঐ কথাগুলি বলে যেতাম! আর দিনে দিনে ঐ মাটির মূর্তিকেই মনে হত অপরূপ। তারপর কত উৎসবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, কত আনন্দের রঙবাতি জ্বলতে নিভতে দেখেছি, কিন্তু আমার সেই সামান্য মাটির দেবতাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারলাম কই! তাই সহজ সাধনার পথে পা বাড়িয়ে আজ আমার আনন্দের সীমা নেই অমৃত।

সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে। উঠে পড়ল মাধবী। হয়ত আরও কোন কথা হত। কথার টানে টানে কখন নিভৃত মনের আর কোনকথা বেরিয়ে আসত। তবু একসময় কথার ঝাঁপি বন্ধ করতে হল। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাতে হবে। অন্ধ দীনদাসকে আরতির সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

মাধবী বলল, এস ঠাকুর, সাঁঝের দীপ জ্বালি।

অমৃত উঠল। আজ অনেক কথা বলবে বলে সে এসেছিল। কোনও কথাই তার বলা হল না। তবু কোনও নিরাশা নিয়ে ফিরল না সে। আগামী কোনও একটি দিনের আরও কথা বলার সঞ্চয় কে যেন রেখে দিয়ে গেছে তার মনে।

নদীর বাঁক ফিরতেই দেখা হল ঝুমরীর সঙ্গে। সে আসছিল ওদেরই খোঁজে। কাছাকাছি হতেই মাধবীকে বলল, রামদাস দাদু আশ্রমে এসেছেন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মুহূর্তে কিশোরী মেয়ের মতো সারা অঙ্গে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল মাধবীর।

এসো গো ঠাকুর, এসো, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কি, আমার দাদুভাই এসেছে।

কথা বলতে বলতে চঞ্চল চরণ ফেলে চলতে লাগল মাধবী।

আশ্রমের কাছাকাছি আসতেই রামদাস বাবাজীর গলায় গান শোনা গেল। জয়দেবের পদ। মাধব প্রতীক্ষা করছেন শ্রীমতীর জন্যে—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নম্ সচকিত নয়নম্
পশ্যতি তব পন্থানম্।।

শ্রীমতীর আশাপথ চেয়ে বসে আছেন মাধব। শয্যা প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু এখনও এল না কেন, তাই অস্থির হয়ে পড়েছেন তিনি। কুঞ্জের বাইরে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। চকিত হয়ে ভাবছেন— ওই বুঝি বধূ এল।

দূর থেকে অমৃত দেখল গেরুয়া আলখাল্লা গায়ে, একতারা হাতে একটি বৃদ্ধ বসে বসে গান করছেন। সাদা দাড়িটি তাঁর নেমে এসেছে বুকের ওপর।

আশ্রমের আশপাশের কয়েকটা ছেলে তাঁর চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা কেউবা মাথায়, কেউবা কোমরে হাত নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল তাঁর গান।

মাধবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উথলে উঠল সুরের সাগর।

ফিরে ফিরে পদটি গাইতে লাগলেন। 'পততি পতত্রে—'

মাধবী যোগ দিল সেই গানে। ছুটল সুরের সুরধুনী।

গান থামলেই প্রশ্ন— আমার নয়নভোলানো এলে? কিন্তু সঙ্গের সঙ্গীটি কে দিদিভাই? কই আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

দেখ দাদু, এই তো এলে একটি বছর পরে, আমার যে আর কাল কাটে না। 'মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।'

তা ভাল থাকব কি করে দিদি। আমার রাধারানী রইল বৃন্দাবনে, আর আমি থাকব সুখের সনে।

এবার মাধবী অমৃতের দিকে ফিরে বলল, এ হল অমৃত, আমাদের নতুন সখা। তোমার সঙ্গী শ্রীদাম, সুদামের কেউ হবে।

রামদাস দাদু অমৃতের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন কতক্ষণ। বললেন, কিবা সে দ্যুতি, মোহন মুরতি। একই অঙ্গে রাধামাধব।

তারপর আবেগে বলে উঠলেন, তোমার সঙ্গীভাগ্য বড় ভাল দিদি।

সর্বসুলক্ষণযুক্ত, অতীব উপযুক্ত কান্তিমান মদনমোহন দাঁড়িয়ে আছে সামনে যে গো।

মাধবী অমৃতের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

অপ্রস্তুত হল অমৃত। কিন্তু এই সদানন্দময় মানুষটি মুহূর্তে তার মনে দাগ টেনে দিয়ে গেল। সে দেখেছে অন্ধ দীনদাসকে, সে আর এক মূর্তি। বাইরের দেখা শেষ করে তিনি যেন চোখ দুটি বন্ধ করেছেন অন্তরকে দেখবেন বলে। তাঁর মূর্তি গম্ভীর, কিন্তু বড় গভীর। আর এ মানুষটি যেন সেই কবির কথার প্রতিধ্বনি তুলছেন, 'তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।' এখানে ঈশ্বরের জন্যে কোনও সন্ধান নেই। ভাবটা বেপরোয়া। পেলাম পেলাম, না পেলাম নাই, তোমার আনন্দেই তো মেতে আছি, এমনি একটা ভাবের ভাবী।

অমৃত এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ো রামদাস বাবাজী বললেন, যতই প্রণাম কর ভাই, ভাগের বেলা আমার নাই, লুটেপুটে সেই তো সবই নেয়। এত লোভী আমি কোথাও দেখিনি। আড়ালে লুকিয়ে থাকে চোরের মতো, সুযোগ বুঝে সব নেয় লুট করে।

একটু থেমে বললেন, সেই চোরটিকে ধরার জন্যেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছি। তা ভাই, তোমার লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, আমি যদি হই চৌকিদার, তুমি তবে হলে বড় দারোগা। আর, একবার যদি দুজনে মিলে ধরতে পারি ঐ চোরটিকে তাহলে অনেক ধনের বখরা পাওয়া যাবে। তখন চোরে পুলিসে মিল গো, ভাগবাটোয়ারার মিল।

প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন রামদাস বাবাজী।

আশ্রমে ক'দিন রইলেন রামদাস বাবাজী। গানের ছাড় নেই। যখন তখন বাজছে তাঁর ডুগডুগি একতারা। সারা আশ্রম জুড়ে ডেকেছে আনন্দের বান। রঙ্গ রসিকতা চলেছে সমানে।

দিদিভাই, নতুন মানুষ পেয়ে বুড়োটাকে ভুলে গেলে?

মাধবী অমনি বলল, আমার বুড়ো মাধবের দাঁত পড়েছে, তাইতো চাই নবীন মাধবকে গো।

কথা শুনে অমনি ভাব। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

বললেন, আমাদের চুল পাকে, আর দাঁত পড়ে। তিনি যে চিরযুবা গো। আমাদের যে মাটির দেহ, মনের দেহ তাঁর। তাইতে তো তাঁর গড়নগাড়ন এমন চমৎকার।

কথায় কথায় রামদাসের মিল। যত বাজে ডুগডুগি, তত ফোটে কথার ফুল।

কেবল সন্ধ্যেটি যখন হয়ে আসে, তখন একবার যান মাধবের মন্দিরে। সারাদিনের কথার ফুলে গাঁথা মালাখানা যেন তাঁর পায়ে নিবেদন করে চুপচাপ হয়ে যান। তারপর একবার যান বাঁধানো বিশ্রাম বেদিতে। রামদাস বাবাজী বাউল হলেও বৈষ্ণব দীনদাসের গুরু। তাই বেদি ছেড়ে উঠে দাঁড়ান দীনদাস। গুরুকে বেদির ওপর বসান পরম সমাদরে। পায়ের ধূলি নিয়ে পবিত্র হন। পায়ের তলায় চাটাই বিছিয়ে বসেন। রামদাসের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। আশ্রমের পরিচালনার কথা, সাধনভজনের কথা।

আশ্রমের প্রায় প্রতিটি উৎসবে হাজির থাকতে হয় রামদাস বাবাজীকে। তিনি যেবার অসুস্থ থাকেন, উৎসবে যোগ দিতে পারেন না সেবার আনন্দের আদ্ধেক মাটি।

এসব কথা অমৃত শুনেছে মাধবীর মুখে।

রামদাস বাবাজীকে নিয়ে মাধবী নদীর ধারে বেড়াচ্ছিল। কংসাবতী বয়ে চলেছে। শীতে শীর্ণা। বড় স্বচ্ছ জলের ধারা। তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে জল। দাঁড়িয়ে গেলেন রামদাস। তীরের কাছে এসে দেখলেন জলের ঘূর্ণি। পাতাপত্তর ঘুরছে তার ভেতর পড়ে। কতক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলেন রামদাস। মাধবীও দেখতে লাগল। এবার একটা স্রোত এসে সেই পাতার রাশকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। স্রোতের ওপর ভাসতে ভাসতে তারা চলে গেল কতদূর।

রামদাস মাধবীর দিকে তাকালেন।

দিদিভাই! মন কোথাও বাঁধা পড়ে না। যেখানে বাঁধন সেখানে সে শুধু ছোট গণ্ডির ভেতর ঘুরে ঘরে মরে। তারপর এ বাঁধন তার একদিন কেটে যায় বাইরের টানে।

কথা বলতে বলতে আনমনা হয়ে গেলেন রামদাস। তারপর গান ধরলেন গুন গুন করে ঃ

ও তোর কিসের ঠাকুর ঘর
(যারে) ফাটকে তুই করলি আটক
তারে খালাস কর।

এবার নেচে নেচে একতারা বাজিয়ে গাইতে লাগলেন রামদাস।

রাধামাধবকে আমার মন্দির থেকে ছেড়ে দিলে আর কি রইল দাদু?

মাধবীর চোখে আকুলতা।

ছাড়তে তো বলিনি দিদি। সাধ্য কি তাঁকে ছাড়া যায়। শুধু ঠাকুরঘর থেকে তাঁকে বের করে আনতে হবে বাইরে, পথের মাঝখানে। একদিন মাধবকে মথুরায় যেতে হয়েছিল দিদি, সেদিন বৃন্দাবন শূন্য হয়েছিল, শূন্য হয়ে গিয়েছিল শ্রীমতীর হৃদয়মন্দির। শত চেষ্টাতেও তাঁকে বাঁধা যায় না। ঠাকুরকে কি ফাটকে আটক করা যায়? তিনি যে সবার, সবখানের।

এইটুকুতেই মাধবী চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। সে এবার গান ধরল ঃ

তোমরা যে বল শ্যাম
মধুপুরে যাইবেন—
বল বঁধু কোন্ পথে যাবে?
হৃদয় চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে শ্যাম মধুপুরে যাবে।

গান গাইতে গাইতে মাধবীর গলা কাঁপল। চোখ উঠল ছলছলিয়ে।

রামদাস বললেন, তবু ছেড়ে দিতে হবে দিদি। পাখিকে পিঞ্জরে রেখে দিলে তাকে পাওয়া যাবে কেমন করে। তাকে ছেড়ে দিয়ে তবেই তো তাকে পেতে হয়।

মাধবীর স্বরে কান্না — ছেড়ে দিতে হবে তা জানি, তবু ছেড়ে দিতে প্রাণ চায় কই।

এবার রামদাসের গলায় সান্ত্বনার সুর — সব জানি দিদি! ছেড়ে দিতে গেলে মন পোড়ে। তবু তাঁকে দিতে হয় ছেড়ে।

দূরে শালের বনে আগুন ধরেছে। আদিবাসীরা আগুন ধরাবার চেষ্টা করছিল শুকনো পাতায়। তাই বনে লেগেছে আগুন। মাধবী রামদাসের চিন্তাটা সেদিকে ফিরিয়ে দিলে—দেখ দাদু, বনটা কেমন জ্বলছে।

মাধবী চেয়ে রইল সেইদিকে। বনদেবীর রাঙা অঞ্চলটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। গুনগুন করলেন রামদাস। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর গলা ছেড়ে গান ধরলেন ঃ

বন পুড়ে যায় সবাই দেখে,
আমার মন পোড়ে তা কেউ দেখে না,
বন পুড়ে যায় ..... ।

ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্ ডুগডুগি বাজতে লাগল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। মাধবী বলল, চল দাদু ফেরা যাক।

রামদাস গান থামিয়ে বললেন, তুমি যাও দিদি, আমি এই আসছি বলে।

মাধবী ফিরে চলল নদীর পথ ধরে। ওপারে শালের বনে আগুনটা দাউদাউ করে জ্বলছে। চড়চড় একটা শব্দ উঠছে তার থেকে। রামদাস আবার গান ধরেছেন ঃ

ওরে—বন পুড়ে যায় সবাই দেখে,
আমার মন পোড়ে তা কেউ দেখে না।

দূরে চলে যেতে যেতেও মাধবী অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সেই গান। প্রাণের ঠাকুরের কাছে রামদাসের এ যেন এক অভিমানের কান্না।

যেমন হঠাৎ এসেছিলেন রামদাস বাবাজী, তেমনি হঠাৎ যাবার তাড়া।

যেদিন তিনি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন তার আগের দিন থেকেই মাধবী গম্ভীর। রামদাস দাদু কথায় কথায় তাকে সাধ্যসাধনা করছেন। মানভঞ্জনের চেষ্টা করছেন কখনো বা কথায় বা গানে।

দিদিভাই, এবার এসে আমার ঝোলা ভরে একটা জিনিস নিয়ে গেলাম।

মাধবী কথা না বলে মুখ তুলে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি মেলে তাকাল।

দুঃখ, কেবল দুঃখ।

এবার কথা বলল মাধবী, দুঃখ কেন দাদু?

আমার যে সতীন জ্বালা গো। তাও দেখতে পাও না? ঐ যে পুঁথি নিয়ে বসে আছে গো আমার সতীন। কত বিদ্যে! বিদ্যের একেবারে জাহাজ। তোমার মন মজাবে যে, দিদিভাই, আমার সতীন সে।

মাধবী তো হেসে কুটিপাটি। ততক্ষণে অমৃত এসে হাজির হয়েছে পায়ে পায়ে।

কি কথা হচ্ছে তোমার দাদুর সঙ্গে?

মাধবী কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, বলছি, দাদু তোমার বোষ্টমী ছিল ক'জন?

রামদাস অমনি বললেন, মিছে বলব না দিদি, একজন নিয়েই ঘর করেছি আমি। তবে আমার কাছ থেকে চলে গিয়ে তিনি আর একটি সংসার করেছিলেন।

সে কি গো দাদু, চিরদিনের করে তাকে বেঁধে রাখতে পারলে না?

বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছিলাম বলেই তো পালাল গো। ছাড়া রাখলে আর পালাতো না।

আচ্ছা দাদু, সত্যি করে বল, বৈষ্ণবী দিদি চলে যেতে তোমার মন কেমন করেনি?

তা আবার করেনি। কংসাবতীর জলে চোখ ধুয়েছি কতবার তার কি লেখাজোখা আছে দিদি।

তারপর এ দুঃখ ভুললে কী করে দাদু?

স্রোতে কি ময়লা জমে দিদি। মন যে কংসাবতীর স্রোত গো। ওতে ময়লা জমবে কী করে। ময়লা পড়ে তো ভেসে যায়।

একটু থেমে বললেন, দুঃখের ভোগ ছিল যতকাল, ভুগেছি ততকাল। তারপর একদিন মনে হল আমার মতো সুখী নেই কেউ। পাখির মতো হালকা মনে হল নিজেকে। হাতে তুলে নিলাম একতারা। বাজাতে বাজাতে মা কংসাবতীর কূল ধরে বরাবর চলে গেলাম কৃষ্ণদাসের আখড়ায়।

মাধবী বলল কার আখড়ায়?

কৃষ্ণদাস গো। ওরই আখড়াতেই তো ঠাঁই নিয়েছিল আমার বোষ্টমী।

অমৃত বলল, সে কি রকম! সীতা উদ্ধারের জন্যে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধে যাওনি তো দাদু?

যুদ্ধ বইকি। ঘোরতর যুদ্ধ। তবে মনের যুদ্ধ ভাই। বলি শোন কথা। আখড়ায় সেদিন ছিল না কৃষ্ণদাস। সাঁঝের বেলা বোষ্টমীর নাম ধরে হাঁক দিতেই দরজা খুলে গেল। চমকে উঠল বোষ্টমী। দরজা খুলে যাকে দেখবে ভেবেছিল, তার বদলে আর এক মুখ। কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল ও।

মাধবী উৎসুক, বলল, তারপর কি হল দাদু?

আমি তার ভাবনা দিলাম ভেঙে। বললাম, বেশ করেছ রাধাপ্যারী মনের মানুষ খুঁজে ফেরাই তো বাউল বোষ্টমের কাজ গো। তুমি মনের মানুষ পেয়েছে, তাই দেখতে এলাম তাকে। আহা তোমার মতো পুণ্যবতী কে আছে সংসারে!

অমৃত বলল, এ কি তোমার সত্যিকারের মনের কথা ছিল দাদু?

রামদাস যে মনে মুখে এক ভাই।

মাধবী বলল, তারপর বৈষ্ণবী দিদি কি বললেন?

পড়ল এসে পায়ে। বলল, নিয়ে চল তোমার সঙ্গে। ভুল করেছি বলে ক্ষমা কি নেই তার।

বললাম, ক্ষমা তাঁর, যিনি দেখছেন জগৎসংসার। আমরা তো পথের পথিক গো। পাপ পুণ্যি মনের কাছে। মন যা চায় তাকে পেতে দাও তা। পেলে তৃপ্তি, না পেলে আক্ষেপ। সব খেলাই থেমে যাবে

মনের, যখন সে উঠে যাবে তরতরিয়ে চাওয়া পাওয়ার ওপরে। আগে পাওয়া, তবে তো পাওয়ার শেষ। তোমার তো শুরু হয়েছে সুলক্ষণ। অস্থির হলে মন, স্থির হতে কতক্ষণ।

কে শোনে কার কথা। হাপুসনয়নে কান্না।

বললাম, কেঁদো না প্যারী, তোমার চোখের জলে পিছল হবে আমার পথ। আজ যদি ফিরে নিয়ে যাই তোমাকে, তাহলে তোমার আমার মতো কাঁদবে আর একটা লোক। তাকে আবার কাঁদালে তোমার চোখ যে আর শুকনো থাকবে না গো। তাকে চলে আসাব সময়ে মাথায় হাত রেখে বললাম, আমার নাম রামদাস, আর ওর নাম কৃষ্ণদাস। রামে কৃষ্ণে ভেদ রেখো না। সব নরই নারায়ণ গো। দেহের খোলস তফাৎ হলে হবে কি, প্রাণে প্রাণে সব সমান।

চলে এলাম সেখান থেকে। মনে মনে শান্তি পেলাম খুব।

মাধবী বলল, তুমি বড় নিষ্ঠুর দাদু, কাঁদিয়ে এলে তো তাকে।

রামদাস বললেন, কাঁদিয়ে দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে এলাম তার। কান্নাতেই তো বেলের কুঁড়ি ঝরে গো। আর ঐ ফুলের মালাতেই তো প্রেমের ঠাকুরের লাভ বেশি।

রামদাস একতারা বাজাতে বাজাতে চলে গেলেন। যেন শরতের আকাশে একটি লঘু স্বচ্ছ মেঘের উদয় হল। আলোর লেখন লেখা হল তার অঙ্গে। তারপর নীল আকাশে ভাসতে ভাসতে একসময় তা মিলিয়ে গেল।

মধ্য-হেমন্তের বিষণ্ণ দুপুর। দূর একখানি গ্রামে গিয়েছিল অমৃত পুঁথির সন্ধানে। ফিরে এসে আশ্রমে ঢুকতে গিয়েই দেখতে পেল মাধবীকে। সামনের ফসল-তোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। অমৃতের আসার সাড়া পেল না সে। কতক্ষণ অমৃত দেখল মাধবীর তন্ময়তা। কি দেখছে ও! নির্জন ফসল তোলা ধূ ধূ প্রান্তর। কোথাও জনমানুষের চিহ্নই নেই। পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। মাধবী একবার চোখ তুলে তাকাল অমৃতের দিকে। বর্ষার সজল ধারাপাতের পর যেমন জলে স্থলে এক স্নিগ্ধ আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনি মনে হল মাধবীর দুটি চোখ।

অমৃত কথা বলল, এমন অসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে যে?

মাধবী কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল অমৃতের মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ অমৃতের দৃষ্টি ঐ ধূ ধূ প্রান্তরের দিকে আকৃষ্ট করে বলল, দেখ্ দেখ সারা মাঠে কেমন আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি সারাদিন অভুক্ত, তাই তোমার আসার পথ চেয়ে ছিলাম। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেল, তবু তুমি এলে না। তোমার ক্লান্ত কাতর মুখখানার কথা বার বার মনে পড়তে লাগল। তারপর জননী বসুন্ধরা আমাকে কি আশ্চর্য এক ছবি দেখালেন অমৃত!

সারা মাঠ জুড়ে রৌদ্রের আঁচলখানা মেলে রেখেছেন জননী। দু'চারটে ফসলের কণা ফেলে রেখেছেন তার ওপর। এক ঝাঁক চড়ুই এসে সেই ফসলের কণাগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। কি আদরে জননী সে ক্ষুধার্ত চড়ুইগুলোকে কণা কণা শস্য খাওয়াচ্ছেন! মন থেকে আমার সব ভাবনা দূর হয়ে গেল। এই ছোট ছোট পাখিগুলোর জন্য যে জননী এমন করে শস্যের কণা ছড়িয়ে রাখেন তিনি কি তাঁর অমৃতকে অভুক্ত রাখবেন।

অমৃত বলল, সত্যিই আমি পরম তৃপ্তিতে আজ খেয়েছি মাধবী। গোবিন্দবাবুর স্ত্রী আমাকে পাশে বসে খাওয়ালেন। আর কি বললেন জান? আমি নাকি তাঁর ছেলে শিবনাথের মতো। তেমনি নাকি আমার কথা বলার ভঙ্গি, চলনবলন, সব কিছু। শিবনাম আজ তিন বছর বিদেশে তাই আমাকে কাছে পেয়ে ভদ্রমহিলা আর ছাড়তেই চান না।

অমৃতের কথা শুনতে শুনতে মাধবীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, বোধহয় মনে মনে যা ভাবা যায় তাই সত্য হয়ে ওঠে।

অমৃত অমনি বলল, তার জন্যে মাধবীর মতো একনিষ্ঠ ভাবনা চাই।

মাধবী এবার লজ্জা গেল — এমন করে আমার অক্ষমতাকে নিয়ে কৌতুক কোর না ঠাকুর!

নইলে আমার ভাবনাগুলো রূপ হয়ে ধরা দেয় না কেন মাধবী। সব কল্পনা যে আমার অধরা পাখি হয়ে কোথায় যেন উড়ে যায়।

বিষণ্ণ একটা বেদনার সুরকে অমৃত ম্লান হাসি দিয়ে ঢাকতে চাইল।

মনের মাঝে বড় গাছের বীজ ফেল। তাকে যত্ন কর। জল মাটি আলো হাওয়ার সন্ধান দাও। সে ডালপালা মেলুক। তখন দেখবে সব পাখি নির্ভয়ে ফিরে এসে তোমার মনের গাছে বাসা বেঁধেছে।

আশ্চর্য উপমা দিয়ে কথা বলতে পারে মাধবী। অমৃত মুগ্ধ হয়, বিস্মিত হয়। কিন্তু পরিস্থিতিকে এখন সে আর গভীর আর জটিল হতে দেবে না। তাই হেসে বলল, একটা গান শুনবে মাধবী?

মাধবী অবাক।

তুমি গান জান!

জানি না বলেই বুঝি এতকাল নির্ভয়ে গাইতে?

অমৃতের চোখে মুখে কপট কৌতুহল।

মাধবী বলল, কথা রাখ কথকঠাকুর, গান গাও।

অমৃত ধীরে ধীরে গান ধরল ঃ

আমি পূর্ণ কুম্ভ নইকো সখি
শূন্যকুম্ভ হই,
আমি স্নানের বেলায় ঢেউ-এর দোলায়
তোমার বুকের তলায় রই।

ভরা গলা, কাজও নিখুঁত। মাধবী মুগ্ধ হল, কিন্তু তার চেয়েও মুগ্ধ হল গানের-কথাগুলির মনে মনে তলিয়ে দেখতে গিয়ে। শূন্য হতে এত সাধ। মাধব বলছেন, শ্রীমতী, তোমার অঙ্গের পরশ যদি পাই তাহলে আবার সব শূন্য পূর্ণ হয়ে যাবে। ভাবতে মাধবীর চোখে জল এল।

অমৃত বিচলিত হল, একি মাধবী তুমি কাঁদছ!

ধরা গলায় মাধবী বলল, আমার সব অভিমান ভেঙে দিলে ঠাকুর। নিজেকে পূর্ণ করে তোলার সাধনাই করেছি এতকাল, কিন্তু তাঁর ছোঁয়া পেতে গেলে যে সব শূন্য করে দিতে হয় তা তো ভাবিনি কোনদিন।

মাধবী গানের কথাগুলি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে লাগল ঃ

আমি পূর্ণ কুম্ভ নইকো সখি
শূন্যকুম্ভ হই,
আমি স্নানের বেলায় ঢেউএর দোলায়
তোমার বুকের তলায় রই।

আবৃত্তি শেষ করে আবার তাকে সুরে ফেলে গাইতে লাগল। অমৃত মাধবীর মিষ্টি গলার পরিচয় আগেই পেয়েছিল, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হল। চারছত্রের গান ঠিক, কিন্তু অমৃত তা একবারই মাত্র গেয়েছিল। আর মাধবী সেই গানের একটি শব্দও ফেলল না, একটুখানি সুরও ভাঙল না। অনায়াসে কথার ভোল খানা নিয়ে সুরের ঢেউ তুলতে লাগল।

দিন শেষ হয়ে এল। একটা কুয়াশার চাদর চরাচরের বুকে বিছিয়ে দিলেন হেমন্তলক্ষ্মী। আশ্রমের গরুগুলি মাঠ থেকে ফিরে এল। মাধবী এবার গান ভুলল। তাকিয়ে রইল গরুগুলির আসা পথের দিকে। প্রতিটি গরু তারপাশ দিয়ে যাবার সময় সে ডাকল তাদের নাম ধরে। আশ্চর্য সুন্দর দুটি সহজ চোখের চাহনি মেলে তাকাল তারা। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল তাদের। বাছুরগুলো বড় চঞ্চল। তাই বসন অঞ্চল দিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরে সোহাগে চুম্বনে অস্থির করে তুলল।

অমৃত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে দৃশ্য। মাধবীকে নতুন করে সে দেখল। এ যেন মাধবীর আর এক রূপ। মাতৃমমতায় ভরা একটি মনের ছায়া পড়েছে মাধবীর চোখে মুখে।

অমৃত বলল, তুমি ধবলীব চেয়ে শ্যামলীকে বেশি ভালবাস — তাই না?

মাধবী তখন শ্যামলীর গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। অমৃতের কথায় সে অল্প হাসল, শ্যামের ছায়া পড়েছে এর অঙ্গে। তাই শ্যাম গরবিনীর এত আদর।

এবার কৌতুক করার পালা অমৃতের — হায় বিধি আমাকেও যদি শ্যামলীব বর্ণ করে গড়তে, তাহলে এমনি করে আর একজনের চোখের মণি হয়ে থাকতে পারতাম।

মাধবী বলল, ক্ষোভ কেন ঠাকুর, তুমি যে গৌরাঙ্গ। রাধা মাধব এক হয়ে বিরাজ করছেন তোমার মধ্যে। তোমাকে সোহাগ করব কি, তোমার ওপর ঈর্ষায় অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তুমি আমার ঠাকুরের সবচেয়ে বড় ভক্ত। এ দুঃখ কি আমি সহজে ভুলতে পারব!

ঈর্ষার শাস্তি কি জান? অমৃত বলল।

মাধবী চোখ তুলে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল।

শাস্তি হল, তার মনের যন্ত্রণা। চিরদিন জ্বলতে থাকবে মনের আগুন।

অমনি উত্তর হল মাধবীর — সেই আগুনেই তো আমি পুড়তে চাই ঠাকুর। আগুন যত জ্বলবে ততই যে মনের খাদ গলবে গো। আমি শান্তি চাই না ঠাকুর, আমাকে দুঃখ আর জ্বালা দাও। কথা বলতে বলতে মাধবীর চোখ সহসা জলে ভরে এল।

অমৃত ব্যস্ত হয়ে উঠল, অন্যায় হয়েছে আমার মাধবী, এই সাঁঝের বেলা তোমার চোখে জল আনলাম।

মাধবী হাসল। চোখের জলের ওপর সে হাসি বড় স্নিগ্ধ আর করুণ বলে মনে হল।

এ তো চোখের জল নয়, এ কংসাবতীব জল। এতে স্নান করে শুদ্ধ হলাম অমৃত।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাধবী চলল পুজোর আয়োজন করতে। অমৃত বসে রইল পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে। রঙ ফিরছে আকাশে। কত বিচিত্র রঙের খেলা। স্মৃতির পাতায় সেই রঙ আলোছায়ার খেলা খেলে চলল।

মনে পড়ছে অমৃতের প্রথম দিনের পরিচয়ের কথা। কলকাতা থেকে সে প্রায় হঠাৎই বেরিয়ে পড়েছিল বিষ্ণুপুরের পথে। পুরনো পুঁথির খোঁজেই সে বেরিয়েছিল এদিকে। প্রাচীন ইতিহাস, পুরনো মন্দির বিষ্ণুপুরকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। তাই অমৃত বিষ্ণুপুরকেই তার সন্ধানের উপযুক্ত জায়গা বলে বিবেচনা করে নিয়েছিল।

সে যেদিন বিষ্ণুপুরে পা দিল সেদিন বর্ষাব আকাশে ঘনঘটা। লাল মাটিতে হোলির দিনের ঢেউ চলেছে। একটি ওয়াটারপ্রুফ আর সুটকেশ নিয়ে স্টেশন থেকে সে হাঁটতে হাঁটতে চলেছিল। পথে দেখা হল এক অদ্ভুত মানুষেব সঙ্গে।

দিন মশায়, দিন আপনার সুটকেশটা। নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে আসছেন।

অমৃতের পাশেই হাঁটছিলেন ভদ্রলোক।

এমনভাবে কথা বললেন, অমৃত বাধা দিতে গিয়েও দিতে পারল না। তিনি নিজেই অমৃতের হাত থেকে সুটকেশটা প্রায় কেড়ে নিলেন।

সামলে চলুন। নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বিষ্ণুপুরকে যেন কটুকাটব্য করবেন না মশাই।

হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক।

ভদ্রতার খাতিরে অমৃত নাম জিজ্ঞেস কবল।

আমার নাম সদাশিব তেওয়ারি, মহাশয়ের নাম?

অমৃত দাশগুপ্ত।

তা খাসা নামটি আপনার। কিন্তু এ বাদলে বিষ্ণুপুরে আসা কেন তা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

অমৃত সংকুচিত হল — এই এমনি একটু আসা। মানে পুরনো সব কীর্তি ইত্যাদি দেখার ইচ্ছে।

এখানে কি আপনার কোনও আত্মীয় আছেন?

আজ্ঞে না।

তাহলে উঠছেন কোথায়?

অমৃত বলল, এখানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা আছে। সেই শাখা অফিসের এক বিশিষ্ট কর্মীর সঙ্গে আমার পরিচয়, আপাতত তাঁর কাছেই চলেছি।

বুঝেছি, আপনি পুঁথিপত্রের পাগল।

আশ্চর্য হল অমৃত। বলল, আপনি সত্যিই আমাকে অবাক করলেন।

অবাক কিসের, ওসব যে আমার জানা কথা ভাই। রাঢ় বাংলায় পুঁথিপত্র থাকবে না এও কি হয়। আর সাহিত্য পরিষদে যখন চলেছেন তখন এই ব্যাপারে যে কারবারী তাতে আর সন্দেহ কি।

হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক।

পরে বললেন, পুঁথি চাই? সন্ধান দিতে পারি।

হাতে যেন স্বর্গ পেল অমৃত।

আপনি আমাকে পুরনো পুঁথি দিতে পারবেন?

পুঁথি দিতে পারব না মশায়, তবে সন্ধান দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে।

একটু ভেবে বললেন, আসতে পারবেন আজ? আমার বাড়িতে চলে আসুন। কথকতার আসর বসবে। এমন কথা এমন গান কলকাতাতে শুনতে পাবেন না মশায়। আর তা ছাড়া ঐ দলটির কাছে শোনা যায় অনেক পুরনো পুঁথি আছে। আলাপ করিয়ে দেব, পারেন তো নিজেই সুযোগ করে নেবেন।

ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে লালবাঁধের তীর ধরে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন।

অমৃত তার পরিচিত ভদ্রলোকের আস্তানায় বিশ্রামাদি করে যথাসময়ে বের হল সদাশিব তেওয়ারী মশায়ের বাড়ির উদ্দেশে।

তেওয়ারী মশায়ের বাড়ির সামনে অতিথিদের ভিড়। প্রশস্ত আঙিনা জুড়ে আসর পাতা হয়েছে।

বিশেষ সমাদরে গৃহস্বামী অতিথিদের নিয়ে গিয়ে আসরের সামনে বসিয়ে দিচ্ছেন। হাতে দিচ্ছেন এক একটি করে বেলফুলের মালা। কথকতার আসরে বিশিষ্ট অতিথিরা হাতে মালা জড়িয়ে অথবা গলায় পরে বসবেন —এই রীতি।

অমৃত একবার তাকাল চারদিকে। আরও অনেকে বসে রয়েছেন। সভার একদিকে একটা পিঁড়ি পাতা রয়েছে, তাতে সাদা পিটুলি আর গেরুয়া মাটির আলপনা দেওয়া। পিঁড়ির পাশাপাশি দুটি আসন পাতা।

পিঁড়ির ওপর পুঁথির মতো একটা কিছু পড়ে আছে মনে হল। কতক্ষণ পরে তেওয়ারী মশায়ের সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে আসরে এসে নামলেন একটি বৃদ্ধ। তাঁর হাত ধরে নিয়ে আসছেন যিনি পরনে তাঁর সাদা একখানি কাপড়। উর্ধ্বদেহ জড়ান একটি উত্তরীয়ে। কোনও দিকে না তাকিয়ে বৃদ্ধের হাত ধরে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন মেয়েটি। একটি আসনে বৃদ্ধকে বসিয়ে অন্যটিতে নিজে বসলেন। তারপর তাকালেন দর্শকদের দিকে। আবার মাথাটি ঈষৎ নত করলেন, মৌন নমস্কার নিবেদন। গলায় সাদা মল্লিকার গোড়ে মালা বুকে নেমে এসে কোলের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কপালে তিলকমাটির ফোঁটা। অমৃত তাকিয়ে দেখছে। মেয়েটি বিংশতি হবে বলেই মনে হয়। কাকচক্ষু দীঘির জলের মতো লাবণ্যে টলটল করছে মুখখানা। একবার চোখ তুলে দর্শকদের দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটি। তাতেই অমৃত দেখেছে চোখ দুটিতে সকরুণ এক প্রশান্তি মাখানো। অমৃত আগেই শুনেছিল, কথক পুরুষ নয়, মহিলা। সে পথে আসতে আসতে কথক সম্পর্কে মনে মনে একটা কল্পনাও করে রেখেছিল। কিন্তু তার কল্পনাকে এমনভাবে যে হার মানতে হবে তা সে একেবারেই ভাবেনি। সত্যি, সবকিছু মিলিয়ে সে অবাকই হল না শুধু, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। সদাশিববাবু কাছে এসে হেসে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, সুধা দিয়েই তৈরি, কি বলেন? অমৃত কথা না বলে মাথা নামিয়ে সায় দিল। অনেক কথা বলেও বোধকরি অমৃত এই মুহূর্তের মনোভাবটি বোঝাতে পারত না।

শুরু হয়েছে কথকের কথা।

বন্দনা করি আমার পিতাকে যিনি আমার গুরু — সুরের গুরু — আমার সাধনার গুরু। তারপর বন্দনা করি আমার পরমপ্রিয় মাধবকে যিনি আজ সহস্র দর্শকের চোখ দিয়ে আমাকে দেখছেন. সহস্র শ্রবণে আমার কথা শোনার জন্য কান পেতে রয়েছেন।

অল্প কয়েকটি কথায় বন্দনা শেষ হল। মেয়েটি পিঁড়ির ওপর পড়ে থাকা পুঁথির পাতা মেলে ধরল।

সকল শ্রোতাই শ্রীকৃষ্ণমাধব! অল্প এই কথাটুকুর ভেতর এত যাদু। অমৃত আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আজ পূর্বারাগের পালাগান। কথা শুরু হয়েছে। কথক বলে চলেছেন, আলোয় ছায়ায়, আভাসে ইঙ্গিতে যার ছোঁয়া এসে লাগল আমার প্রাণে, তার জন্যে আমার মনের কান্নাই তো পূর্বরাগ।

চিরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণমাধব। তিনি যে আনন্দময়। আনন্দের বাঁশিখানিতে ফুঁ দিয়ে ভক্তকে ডাকছেন — এসো, এসো। শ্রীমতী রাধা ভক্তশিরোমণি। তাই সে ডাক শুনতে পেলেন তিনি। যমুনার ঘাটে গিয়েছিলেন কলস ভরে জল আনতে। কিন্তু অদৃশ্য বাঁশির মোহন সুরেভরে গেল তাঁর মন। মাটির কলস আর ভরা হল না। শূন্য হয়ে পড়ে রইল যমুনার কুলে। ধীরে ধীরে ভরে উঠল তাঁর মন-কুম্ভ। কিন্তু এই কুম্ভে যে সুধা জমল তার জ্বালায় শ্রীমতীর অঙ্গ হল অস্থির। মন হল উদাস।

'সখি এ কি রে দারুণ জ্বালা—
ঘরে গুরুজন অতি দুরুজন
আমি সে কুলের বালা!'

কূলের বালা কিশোরী রাধার আকুল হল প্রাণ। যে একবার শ্যামের বাঁশি শুনেছে, সে কি আর স্থির থাকতে পারে! শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে শ্রীরাধার ভুল হয়ে গেল ঘরের কাজে। ভুলে গেলেন, ঘরে রয়েছে বাঘিনী ননদিনী। মনের অধীশ্বরের বাঁশি শুনলে, প্রেমাস্পদের ডাক শুনলে ঘর হয়ে যায় বাহির, আর বাহির হয়ে যায় ঘর।

তখন — 'গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন।'

গুরুজনের শাসনের ভয় থাকে না। দুর্জন লোকের নিন্দাবাদেরও কোনও ভয় থাকে না। রাধার অন্তরে আজ যে পূর্বরাগের ছোঁয়া লেগেছে। কৃষ্ণ প্রেমেব প্রথম পরশ যে তিনি পেয়েছেন বাঁশির সুরে। বাঁশি শুনে আকুল হয়েছে তাঁর প্রাণ। এ বাঁশির সুর তো শুধু কানের বাইরে থেকেই ফিরে যায় না, এ যে কানের ভেতর দিয়ে প্রাণে এসে পৌছয়। তাই আকুল শ্রীমতী সখীকে মনের দুঃখের কথা জানিয়ে বলেছেন।

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম—
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।'

প্রেমাস্পদের নাম জপ করতে করতে আকুল হল শ্রীমতীর মন। শ্যাম নামে কি আছে? শ্যাম নামে আছে মধু। আকাশে মধু, বাতাসে মধু, জলে মধু, স্থলে মধু—মধু আছে সব জায়গায়। তবু মধুর চেয়ে মধু আছে — সে হল শ্যাম নামের মধু। এ মধু যে একবার পান করেছে, তার মন হয়েছে মধুময়।

'না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।'

যাঁর নাম জপ করতে গিয়েই অঙ্গ হল অবশ, তাঁর ছোঁয়া লাগলে না জানি কি হবে। কৃষ্ণপ্রেমের যে দারুণ জ্বালা। শ্রীমতী তাই ভুলতে চেষ্টা করছেন সে নাম। কিন্তু যে নাম হয়েছে জপের মালা, তাকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়।

'পাসরিত করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।'

কবি চণ্ডীদাস বলছেন, এই কৃষ্ণনাম শত চেষ্টাতেও ভোলা যায় না। যে কুলবতী সাধ্বী কোনও কিছুর বিনিময়ে আপনার রূপযৌবন বিলিয়ে দেয় না, সেই কুলরমণীই কৃষ্ণপ্রেমের কাছে আপনার সব কিছু সঁপে দেয়। ভগবানের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক করতে গেলে যে এমনি করে সব কিছু সঁপে দিতে হয়। শ্রীমতীর মনে গুরুজনের তর্জন গর্জনের কোনও ভয়ই আর নেই। এখন তাঁর একটি মাত্র ইচ্ছা — কিরূপে তিনি লাভ করবেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ। কৃষ্ণ যদি একবার তাঁর দিকে ফিরে তাকান তাহলে তাঁর সব দুঃখের কাঁটা সরিয়ে আনন্দের ফুল ফুটে উঠবে।

শ্রীমতী দেখছেন, কৃষ্ণের পা দু'খানি যে মাটিতে স্পর্শ করছে সে মাটির কি পুণ্য। প্রভুর চরণে বাজছে যে সোনার নূপুর, সে সোনা যে ধন্য হয়ে গেল। আহা বনমালার কি সৌভাগ্য, সে প্রভুর গলায় দুলে দুলে শোভা পাচ্ছে। বাঁশের কি সৌভাগ্য, সে আজ বাঁশি হয়ে ছুঁয়ে আছে বঁধূর মুখখানি। শ্রীমতী আজ ধরণীর মাটি, সোনাব নূপুর, বনফুলের মালা আর বাঁশের বাঁশিকে ঈর্ষা করছেন।

'ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া।
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া।
বনমালা হল পুষ্প কি পুণ্য করিয়া
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া।
মুরলী হইল বাঁশকি পুণ্য করিয়া
বাজেও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া।'

এ কি ইচ্ছার আগুন জ্বলছে শ্রীমতীর মনে। আর মাধবকেও দূরে রাখা যায় না। এখন অঙ্গের জন্য কাঁদছে অঙ্গ। হৃদয়ের পরশ যে চাইছে হৃদয়।

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়াব পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরান পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।'

এই হল পূর্বরাগ। প্রেমাস্পদের বাঁশি শুননাম, তাঁর ছোঁয়া পেলাম, অমনি মন ভরে উঠল কান্নায়। যাঁর পরশ পেলাম, তাঁকে পাই না কেন চিরদিনের করে। শ্রীমতী রাধিকার কান্না যে সব মানুষের মনের কান্না। ভক্তের মনে ভগবান আভাসে ইঙ্গিতে ছোঁয়া দিয়ে চলেছেন, তাকে আকুল করে তুলছেন কিন্তু ধরা দিচ্ছেন না কোনওরকমে। তাই ভক্তেব মনটি প্রদীপ হয়ে নিত্য তাঁকে অন্ধকার এই সংসারের পথে আকুল হয়ে খুঁজে চলেছে।

কত গান হল, কত কথা হল, অমৃত কতক শুনল, ভাবল আরও বেশি। কিন্তু সব ভাবনাই এলোমেলো, অথচ কেমন আশ্চর্য এক রোমাঞ্চে ভরা।

আসর ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনামে, ফুল, চন্দন, ধূপ, গুগগুলেব সুবাসে সদাশিববাবুর গৃহটি ব্রজভূমি বৃন্দাবনে রূপান্তরিত হয়ে গেল। গৃহস্বামী সমবেত শ্রোতাকে গলবস্ত্র হয়ে প্রীতিসম্ভাষণ করে বিদায় দিলেন।

সভা যখন শূন্য হল সদাশিববাবু এলেন অমৃতের কাছে।

চলুন, অমৃতবাবু, এখন দীনদাস বাবাজীর কাছে আপনাকে নিয়ে যাই।

দীনদাস সভাশেষে বিশ্রাম করছিলেন একটি ঘরে। পায়ের সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালেন। বললেন, আসুন সদাশিববাবু। সঙ্গে নতুন আগন্তুক এলে মনে হচ্ছে!

সহাস্যে সদাশিবাবু বললেন, আশ্চর্য আপনার ক্ষমতা গোস্বামীজী। চোখে না দেখে পায়ের ধ্বনিতে আপনি মানুষ চেনেন।

দীনদাস হেসে বললেন, এই তো আমার কাজ সদাশিববাবু। সবার চরণধ্বনি চিনে রাখলে একদিন তাঁর চরণের ধ্বনি চিনে নিতে কষ্ট হবে না।

সদাশিববাবু বসলেন। তাঁর ইঙ্গিতে অমৃতও গোস্বামীজীর পাশে বসল।

এই সুযোগ। লালবাঁধের ধারে দাঁড়িয়ে সদাশিবাবুর কথাগুলো বার বার বাজতে লাগল অমৃতের কানে।

'আমি সুতোর খেইটুকু ধরিয়ে দেব আপনার হাতে, জট খুলবেন আপনি। জট যদি একবার খুলতে পারেন মালাও পারবেন গাঁথতে।'

এই তরুণের কথাই আজ সকালে আপনাকে বলেছিলাম গোস্বামীজী। বৈষ্ণবঅন্ত প্রাণ এঁর। এসেছেন কলকাতা থেকে। ঘুরে দেখেছেন সারা বিষ্ণুপুব। উনি বলেন, বিষ্ণুপুর জুড়ে বিষ্ণুর পদচিহ্ন আঁকা।

কি বললেন, দীনদাস অভিভূত হয়েছেন বলে মনে হল. বিষ্ণুপুরে বিষ্ণুর পদচিহ্ন!

দীনদাস কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন আপন ভাবনার মধ্যে। আপন-মনেই যেন বললেন একসময়-তাঁর বাস বনে বনে, মনে মনে, আর ভক্তজনের অঙ্গনে।

মহাশয়ের নাম? — সংবিৎ ফিরে পেয়ে বাস্তবে ফিরে এলেন দীনদাস।

অমৃত দাশগুপ্ত।

কি ভেবে বললেন দীনদাশ — আপনার মধ্যে আছে দাসের দীনতা, গুপ্তের গোপন লীলা, আর সবার ওপর অমৃতত্ত্ব। সদাশিববাবু, এ অমৃত আপনি কোথায় পেলেন?

বন্ধুজন—হেসে বললেন সদাশিববাবু, যদিও অসমবয়সী।

মহাশয়ের কি করা হয়? প্রশ্ন করলেন দীনদাস।

বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করি, আর খুঁজে বেড়াই ছেঁড়া পুঁথিপত্তর যার ভেতর আছে গোবিন্দের নামগান।

যথার্থ মহাজন বাবা। নাহলে কেউ এমন করে খোঁজে। তদ্গত হলেন দীনদাস। বললেন, শ্রীমতী এমনি করেই খুঁজতেন। ময়ূরের নীল কণ্ঠে দেখতেন নীলমাধবকে। কালো মেঘের মাঝে দেখতেন সজল জলদাঙ্গ কৃষ্ণকে। সদাশিববাবু, একদিন এঁকে নিয়ে আসুন না আমাদের আশ্রমে। পুরনো পুঁথিশালা দেখে যাবেন। ইচ্ছে হলে ক'দিন থেকে রাধামাধবের প্রসাদও গ্রহণ করবেন।

সদাশিববাবু বললেন, গোস্বামীজী, শুনেছি আপনি যে পুঁথিখানা পুজো করেন, তা নাকি বেশ কয়েকশ' বছর আগেকার?

পুঁথিখানা যাঁর কাছ থেকে পাই, তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত মানুষ। তাঁর কাছে এমনি একটি কথা শুনেছি বটে। আর তাছাড়া আমার আশ্রমের সবকটি পুঁথিই দেহরক্ষার আগে তিনি আমাদের দিয়ে যান।

অমৃত মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মনে হল, বিধাতা যখন দেন, তখন এমনি করেই রত্নের সন্ধান দিয়ে দেন।

গোস্বামীজীর সঙ্গে সেইদিনই চলে এসেছিল অমৃত তাঁর আশ্রমে। গরুর গাড়িতে করে ফিরছিলেন দীনদাস। মাধবী ছিল সেই গাড়িতে। তাই অমৃত হেঁটে এসেছিল সারা পথ। অন্ধ দীনদাস অবশ্য নানাভাবে বলেছিলেন অমৃতকে গাড়িতে উঠে বসার জন্যে, কিন্তু শোনেনি অমৃত তাঁর কথা।

সে বলেছিল, বর্ষায় পথের অবস্থা খুব ভাল নয়, তাই একই গাড়িতে এতগুলি লোক গেলে বলদদুটির নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হবে। আর তাছাড়া পুঁথির ব্যাপার ঘুরে ঘুরে হাঁটার অভ্যেস তার খুবই আছে।

পথের একজায়গায় চটিতে গাড়ি থামিয়ে তারা বিশ্রাম করেছিল রাতের মতো। সেখানে তার প্রথম আলাপ মাধবীর সঙ্গে।

রাতের খাবার পোঁটলা করে বেঁধে দিয়েছিলেন সদাশিববাবু। মাধবী খাবার খুলে পরিবেশন করল। যত্ন করে আসন পেতে, পাতা ভরে অমৃতকে খেতে দিল। গোস্বামীজী রাতে একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। অমৃতের পাশে বসে খাওয়াতে লাগল মাধবী।

বলল, এত পথ পায়ে হেঁটে আসছেন, খুব ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

ভাল লাগার পাল্লা অনেক আগে শুরু হলেও আলাপচারী এই প্রথম। অমৃত পাতার ওপর চোখ রেখেই বলল, পথকষ্টে ক্ষিধে বাড়ে না, কমে যায়।

মাধবী মনে মনে অমৃত সম্বন্ধে সেদিন নিশ্চয়ই খুব কৌতুক বোধ করেছিল।

মাধবী বলল, আপনাকে পায়ে হেঁটে আসতে বারণ করা হোল, তবু আপনি শুনলেন না। একটা কথা রাখেননি, আর একটা রাখুন।

কি কথা বলুন? মৃদু হাসল অমৃত।

এই প্রসাদটুকু কাল আর থাকবে না, আজ যতদূর সম্ভব উঠিয়ে ফেলতে হবে।

কেন, আপনারও কি আজ উপবাস?

এ কথা বলছেন কেন?

অমৃত হেসে বলল, যে পরিমাণ প্রশংসা পেযেছেন আজ, হজম করাই শক্ত। তাই ভাবলাম হয়ত আপনার উপবাস। নইলে নিজের জন্যে না রেখে আমার পাতে প্রসাদের পুঁটলিখানা উজাড় করে দিচ্ছেন কেন?

মিষ্টি হাসি হাসল মাধবী। অমৃতের কথায় সত্যিই সে খুব মজা পেয়েছে।

বলল, নিছক প্রশংসা হলে হজমের অসুবিধে বইকি, একটু নিন্দে হলে তাও বেঁচে যাই।

নিন্দের লোক পাবেন না কিন্তু।

মাধবী বলল, যেমন কপাল করে এসেছিলাম। আপনিও কি ও দলে নাকি?

আপনার দলে হতে পারলে হয়ত সুখী হতাম, কিন্তু তাহলে সত্যকে ছাড়তে হয়।

শেষের পাতে পায়েসটুকু উজাড় করে দিতে গিয়ে মাধবী বলল,কপাল আমার, একজনকেও নিজের দলে টানতে পারলাম না আজ অবধি।

ভাবনা নেই, বিশ্বে নিন্দুক এখনও আশা করি উজাড় হয়ে যায়নি। সময়ে উপযুক্ত নিন্দুকের দেখা পাবেন।

সব গোছগাছ করে রাখতে গিয়ে বলল মাধবী, ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন যে।

এই না একটু আগে আপনি বলেছিলেন, নিন্দে আপনি ভালবাসেন?

এমন করে কথার জাল পাতলে অসহায় মৃগের আর পালাবার পথ কোথায় থাকে বলুন।

হার মানলেন তো?

হার আমি মেনেই থাকি। যেহেতু জয় বড় একটা আমার হয় না।

সেই চটিতে শোয়া হল সে রাতে। ঘুম এলো না অমৃতের চোখে। সে দেখতে লাগল ছবি। যেমন করে শরতের আকাশ টুকরো টুকরো ছবি দেখায়। সাদা মেঘের ছবি, নীল আকাশের ছবি, কাশবন, নদনদীর ছবি।

অমৃতের বার বার মনে হতে লাগল মাধবীর কি ঘুম এলো দু'চোখ জুড়ে, না সেও তার মত এলোমেলো ভাবনার হাওয়ায় ঘুম ভুলেছে।

পরে অবশ্য এ কথার উত্তর পেয়েছিল অমৃত মাধবীর মুখ থেকে। যখন আশ্রমে থেকে পুঁথি সংগ্রহের জন্য দীনদাসের উৎসাহ পেয়েছিল অমৃত, আর টুকরো টুকরো আভাস-ইঙ্গিতে ভরা সহচার্য লাভ করেছিল মাধবীর, তখন একদিন সুযোগ হয়েছিল তার মাধবীর প্রথমদিনের মনটিকে জানবার।

মাধবী বলেছিল, একান্ত অসংকোচেই বলেছিল, সেদিন আমারও ঘুম আসেনি অমৃত। সারারাত বৃষ্টি ঝরেছিল, প্রকৃতি ছিল নিদ্রাহারা, আমার কেমন করে ঘুম আসে বল।

মাধবী ঐভাবেই কথা বলতে অভ্যস্ত। মনের কথাকে সে সাজিয়ে বলে, যেমন করে পাতার ওপর বা থালিতে করে সাঁজিয়ে আনতে হয় ফুল।

একটি নারীর কাছাকাছি যদি একটি যুবক থাকে, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে তারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়।

আর যদি পরিবেশ হয় নির্জন, প্রকৃতির ঋতুগুলি তাদের ফুল ফোটাবার, লীলা দেখবার সুযোগ পায়, তাহলে তারা হয় একান্ত ঘনিষ্ঠ।

অমৃত আর মাধবী তেমনি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল একদিন। কিন্তু মাধবীর মনের কাছে চিরকালের লক্ষ্মণ টেনে দিয়েছিল এক গণ্ডি। সেখানে অদৃশ্য তুলি দিয়ে লেখা হয়েছিল, 'প্রবেশ নিষেধের' নির্দেশনামা।

একটু দূরের থেকে অমৃতকে কবতে হয়েছে লেনদেন। ধরবার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হয়েছে, তখন কি জানি কেন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে মাধবী। আহত হয়েছে অমৃত, কিন্তু অভিযোগ করার মতো পায়নি কিছুই। চিরঅচেনা রমণীর মন, কিন্তু চেনা হয়েও এতখানি অচেনা বুঝি মাধবী একাই।

মানা ছিল মাধবীর ঘরে কোনও পুরুষের প্রবেশের। কিন্তু মানা ছিল না মাধবীর দিক থেকে কোনও পুরুষের কাছে যাবার।

তাই বকুলতলার অতিথিনিবাসে মাধবীর চরণধ্বনি শোনা গেলেও, মাধবীকুঞ্জের তলায় অমৃতের কোনওদিন কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়নি।

এলাম তোমার কাছে।

মাধবী এল। পুরনো পুঁথির পাঠোদ্ধার আর চলবে না। অভিনব এক জীবন-পুঁথির পাতা এবার খোলার পালা।

মিথ্যে কথা, তুমি আসনি—কপট অভিমানের ভান করল অমৃত।

মাধবী বলল, চেয়ে দেখ, এই বুকলতলা, বকুলফুলের রাশ আমার হাতে, এখুনি বকুলের মালা গাঁথা হবে, তবু বলছ আমি আসিনি।

আসা যাওয়ার পথের ধারে দু'দণ্ড দাঁড়িয়েছ মাত্র। একটু তাকানো, একটু কথা বলা।

জীবনটা তো এমনি টুকরো টুকরো ছায়াছবির মিছিল অমৃত। এখানে অখণ্ড, নিরেট এক বলে কি কিছু আছে?

অমৃত হেসে বলল, পুরনো পুঁথির ভেতর মাথাটা আমার ঘুলিয়ে উঠেছিল, তাই তুমি এসেছ ঠিক বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি, তুমি এসেছ।

অমৃতের কথা শুনে মাধবীও হাসল। এবার সে উঠে বসল বকুলতলার বেদির ওপর। মালা গাঁথা শুরু হল তার।

অমৃত বলল, মহাভারতের কচ আর দেবযানীকে চেন মাধবী?

মাধবী মালা গাঁথার কাজে ব্যস্ত থেকেই বলল, কি বললে তুমি খুশী হও?

জানা না জানা তোমার ব্যাপার, এতে আমার শুধুই কৌতূহল।

চিনি কিনা জানি না, তবে পড়েছি ওদের কাহিনী।

আমাদের একালের কবি ঐ কাহিনীরই একটি অভিনব রূপ দিয়েছেন।

মাধবী চোখ তুলে তাকাল।

শুনবে মাধবী?

যদি বলি তোমার কথা শোনার লোভেই আমার এখানে আসা।

এ তোমার অতিশয়োক্তি জেনেও বলি শোন ঃ

বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে কচ চলে যাচ্ছে দেবলোকে। স্মৃতির ব্যথায় বিদ্ধ দেবযানী তাকে একে একে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাদের অতীত মধু-স্বপ্নের কথা।

দেবযানী ॥ 'সুন্দর অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে বল্লভ ছায়া, পল্লব মর্মর—
শুনায়েছে বিহঙ্গকূজন — তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে? তরুরাজি
ম্লান হয়ে আছে যেন, হেরো আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কেঁদে উঠে বায়ু, শুষ্ক পত্র ঝরে পড়ে
তুমি শুধু চলে যাবে সহাস্য অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্ন সম?'

কচ ॥ 'দেবযানী,
এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি,
হেথা মোর নবজন্মলাভ। এ 'পরে
নাহি মোর অনাদর — চিরপ্রীতিভরে
চিরদিন করিব স্মরণ।'

এমনি করে কলস্বনা স্রোতস্বিনী, ছায়াঘন বনস্পতি, হোমধেনু সকলের কথা একে একে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল। তারপর সব স্মৃতি চয়ন শেষ করে দেবযানী দাঁড়াল কচের মুখোমুখি। গভীর ব্যাথাভরা দুটি চোখ নত করে বলল —

'হায় বন্ধু এ প্রবাসে
আরো কোন সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রিদিন ধরে —
হায়রে দুরাশা!'

কচ ॥ 'চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।'

এরপর দেবযানী উচ্ছ্বসিত আবেগে কচকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল তাদের প্রতিদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার কথা। রোমাঞ্চ, আবেগ, উদ্বেগ। সবশেষে দেবযানী কচকে জানাল—

'রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন।'

তবে আর দেবলোকে ফিরে যাওয়া কেন?

'বল যদি সরল সাহসে
বিদ্যায় নাহিকো সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী—
তোমারেই করিনু বরণ, নাহি ক্ষতি,
নাহি কোন লজ্জা তাহে।'

এত আকুলতা, এত আকাঙক্ষা, এমন অভিমান সবকিছু ধীরে ধীরে দু'পাশে সরিয়ে রেখে তবু চলে যেতে হল বৃহস্পতিসুত কচকে দেবলোকে। কর্তব্যের টানে ছিন্ন হল প্রেমের ডোর। নিঃসঙ্গ তপোবনে স্মৃতির শায়কবিদ্ধ হরিণীর মতো ইতস্ততঃ যন্ত্রণায় ঘুরে বেড়াতে লাগল দেবযানী।

থমথমে মুখে মাধবী বলল, এমন দুঃখের কথা আজ শোনালে কেন অমৃত! আমার বকুলমালা যে আর গাঁথা হবে না।

কেন মাধবী!

সে তুমি বুঝবে না অমৃত। তোমার কবির কথাতেই বলি–

রমণীর মন

সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন।

বর্ষাশেষের আকাশে রোদের ঝিলিকের মতো মাধবীর সজল চোখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটে উঠল।

ধীরে ধীরে আঁচলে কুড়োনো বকুলের কেমন যেন কান্নাভরা গন্ধ ছড়িয়ে সে চলতে লাগল মাধবীকুঞ্জের পথে।

শুনে যাও, ডাকল অমৃত।

থমকে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু কাছে এল না মাধবী।

এ কাহিনী কি শুধু কবির কথা মাধবী?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল মাধবী — এ জীবনের কথা অমৃত, কিন্তু এ জীবন বড় দুঃখের, অসহ্য যন্ত্রণার।

যন্ত্রণা তো নিজেদের সৃষ্টি মাধবী।

নিজেদের জ্বেলে দেওয়া যন্ত্রণার আগুনে নিজেদেরই পুড়ে মরতে হয়। তবু মানুষ আগুন জ্বালে, কারণ আগুন নইলে যে মানুষ চলতে পারে না।

অমৃত বলল, কেন তুমি নিজের চারদিকে এমন করে রহস্যের একটা আড়াল দিয়ে রাখ মাধবী? কোনদিন কি খুলবে না তোমার সেই আবরণ? কোনও ঝড়ো হাওয়া কি উড়িয়ে দিতে পারবে না তাকে?

বড় করুণ হাসি হাসল মাধবী — রহস্যের কি দেখলে তুমি অমৃত? মানুষের কি থাকবে না মনের কোণে একটুখানি নিভৃত জায়গা — যেখানে সে নিজের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলতে পারে। দুঃখকে লালন করতে পারে। আর পারে কান্নায় বুক ভাসাতে। দোহাই তোমার, অমৃত, আমার সেটুকু জায়গা তোমরা কেউ কেড়ে নিও না। খুলতে চেও না সেই নিভৃত কোণের দরজা।

চলে গেল মাধবী। স্থাণুর মতো অতিথিশালার দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে রইল অমৃত।

আজ কয়েক মাস অমৃত এসেছে এখানে। এই আশ্রমে সে দেখেছে একাধিক ঋতুর আবর্তন। ফুল ফোটা পাতা ঝরার খেলা। পেয়েছে রমণীর সংকোচহীন সান্নিধ্য। কিন্তু কোথায় যেন পরাভূত হয়েছে তার পৌরুষ। সে পারেনি একটি রমণীর হৃদয়ের দ্বার খুলতে। উত্তাপ পেয়েছে সে কিন্তু পরক্ষণেই কঠিন শীতলতা।

তার বিদ্যার্জনের কোনও বাধাই পায়নি সে এ আশ্রমে। পুরনো পুঁথিঘর তার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আচার্য দীনদাস। মাধবী তার প্রাপ্যের বাইরেও সেবা প্রীতিতে পূর্ণ করেছে তার হৃদয়। তবু কোথায় যেন এক শূন্যতা। কোথায় যেন হাহাকার করে পুরুষ-হৃদয়। শুধু স্নেহপ্রীতি, কিছু নহে আর!

একদিন অমৃত মাধবীর কাছে জানাল একটি মনোবাসনা।

একটিবার শুধু তুমি মঞ্জুর করবে আমার একটি প্রার্থনা?

প্রার্থনা নয় অমৃত, বল চাওয়া।

অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম এখানে, কিন্তু আজও সে আশা পূর্ণ হল না আমার।

বল অমৃত, সাধ্যমত চেষ্টা করব তোমাকে সাহায্য করতে।

তুমি পারবে মাধবী। চিরদিনই নারী অন্নপূর্ণা, পুরুষ ভিক্ষুক শিব।

হেসে বলল মাধবী, কিন্তু মা অন্নপূর্ণার কাছে থেকেও মনে রেখ পণ্ডিতমশায় শিবের ভিক্ষুকবৃত্তি ঘোচেনি কখনো।

সে যে মহৎ ভিক্ষা মাধবী।

আবার হাসল মাধবী, বলল, কি মহৎ ভিক্ষাটা তোমার একবার শোনাও দেখি মহেশ্বর।

মাধবের আসনতলে পড়ে থাকা জয়দেবের গীতগোবিন্দখানি। একবার, শুধু একটিবার দেবে আমাকে ঐ পুঁথিখানা দেখতে।

গম্ভীর হল মাধবী। অপার বিষাদে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বলল, শাস্তি দাও আমাকে অমৃত। যেকোনও কঠিন শাস্তি। মাথা পেতে নেব। আমার অক্ষমতার জন্যে শাস্তি।

কেন জানি না, মাধবী ঐ পুঁথিখানা রাধামাধবের আসন থেকে অন্যত্র সরিয়ে আনতে চায় না। মাধবী যত অক্ষম হয়েছে অমৃতের কৌতূহল বেড়েছে ততখানি! কতবার কতভাবে ঐ একই প্রার্থনা জানিয়েছে। বলেছে, সারা সারস্বত-সমাজে সাড়া পড়ে যাবে। তুমি আমাকে শুধু একটিবার পেতে দাও ঐ গ্রন্থখানা।

মাধবী তার অক্ষমতার জন্যে চোখের জল ফেলতেও বাকী রাখেনি, কিন্তু তবুও সে শুধু মাথা দুলিয়েছে না-না বলে। ক্ষমা কর অমৃত, পারব না, পারব না আমি।

অমৃত মাধবীর এ ধরনের আচরণে স্তব্ধ হয়ে গেছে, বিষণ্ণ হয়েছে, কিন্তু তার ইচ্ছাপূরণের কোনও পথই সে খুঁজে পায়নি।

মাঝে মাঝে অমৃতের মনে হয়েছে, মাধবী নারী। তার হৃদয় একদিন তার আশ্রমের সংস্কারের বাইরে এসে সংসার রচনার জন্যে তৃষ্ণা অনুভব করবে। সেদিন যদি মাধবী হৃদয়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারে সে তাহলে মাধবীর সঙ্গে সঙ্গে লাভ করবে ঐ মহামূল্য গীতগোবিন্দখানি। বিদ্যা ও বনিতা দুটির জন্যে সে সেদিন পাবে সবার সাধুবাদ। অমৃত প্রতীক্ষা করতে লাগল সেই শুভ মুহূর্তগুলির।

ঝরে পড়ছিল অপরাহ্নের বকুল। সেই বকুলতলায় দাঁড়িয়ে অমৃত সহসা বলল, চিরদিনের একটি প্রশ্নই আমি তোমাকে করতে চাই মাধবী।

চোখ তুলে মাধবী তাকাল অমৃতের দিকে। ছায়া কাঁপছে। অমৃতের প্রশ্ন মাধবীর আয়ত চোখে তার ছায়া ফেলেছে।

তোমার প্রশ্ন আমার অজানা নয় অমৃত।

তবু আমি নিজের মুখে তা বলতে চাই। প্রেমের ভিক্ষায় চিরদিন পুরুষ ভিক্ষুকের মতো নারীর কাছে এসে দাঁড়ায় মাধবী।

মাধবী কোনও কথাই বলল না। তেমনি তাকিয়ে রইল অমৃতের দিকে। আজ অমৃত তার পৌরুষের পরাভব কিছুতেই ঘটতে দেবে না। তার রক্ত তার মন নারীকে কামনা করে। এই সত্যকে সে আজ কোনমতেই অস্বীকার করবে না। প্রেমের ক্ষেত্রে ভালবাসার খেলা আছে একথা যেমন সত্য তেমনি এই খেলার একটা শেষ আছে, তা আরও সত্য। খেলা আজ তার শেষ চাইছে। অমৃত ফলাফলের মুখোমুখি আজ দাঁড়াতে চায়।

আমি তোমার কাছে দান চাই। পুরুষ নারীর কাছে যে দান চায় সেই দান।

মাধবীর আয়ত চোখে কানায় কানায় জোয়ারের জল।

ভিক্ষুণীর কাছে তুমি কেন ভিক্ষা চাইলে অমৃত? কেন তুমি তাকে ইন্দ্রাণীর মর্যাদা দিতে চাও? ভাণ্ডার যে আমার শূন্য হয়ে গেছে। আমার যে আজ কিছু নেই গো। ভাঙা দেউলে তুমি কেন ফিরে আসতে চাইছ অমৃত?

চোখ বন্ধ হল মাধবীর। অমনি টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল মাটিতে। সারা শরীরটা তার থরথর করে কাঁপতে লাগল। অমৃতের সামনে সে আর বসে থাকতে পাবল না। প্রবল একটা কান্নার ঢেউকে কোনরকমে চাপতে চাপতে সে অমৃতের সামনে থেকে উঠে গেল। মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল অমৃত মাটির দিকে, যেখানে মাধবীর কয়েক ফোঁটা চোখের জল ছায়া ছায়া দাগ ফেলে গেছে।

দুপুর গড়িয়ে গেল অপরাহ্নের দিকে। আজ হাটবার। ভিন্ন গ্রামে হাট বসে। দীনদাস ঝুমরীকে সঙ্গে নিয়ে মাসে একবার করে হাটে যান। ঐখানে বহুজনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কোথাও কোন পালাগানের আমন্ত্রণ থাকলে তিনি ঐ হাটেই তা গ্রহণ করেন।

আজ দীনদাস নিজেই গেছেন হাটে। সামনে পুণ্যমাস বৈশাখ। বারব্রত করবে মানুষ। ওই সময়ে অনেকেই কীর্তনের আসর বসিয়ে ঠাকুরের নামগান শুনতে চায়। এখন আশ্রম নির্জন। ঝুমরীর ভাই মুনিয়া আশ্রমে গরু বাছুরের কাজ করে। সে একসময় অমৃতের ঘরে ঢুকে খবর দিল মাধবী তার ঘরে তাকে ডাকছে। অমৃত অবাক হল। আশ্রমে নিয়ম অনুযায়ী মাধবীর ঘরে প্রবেশের অধিকার নেই। তবু মাধবী যখন নিজে ডেকেছে তখন অমৃতের আপত্তির কারণ রইল না। এতক্ষণ নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত হয়েছিল। সে ডুবে ছিল গভীর চিন্তার ভেতর। আজকের প্রণয়ের প্রস্তাব তার মনকে পীড়িত করে তুলেছিল। কিন্তু একটি কথা সে বার বার ভেবেও কোনও উত্তর পায়নি। যে প্রণয়কে নারী প্রশ্রয় দিতে চায় না তাকে সে আঘাত হেনে ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু যেখানে সে প্রতিবাদ করে না সেখানে থাকে তার নীরব আমন্ত্রণ। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে তার ক্ষেত্রে।

অমৃত ধীরে ধীরে উঠোন পেরিয়ে মাধবীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

হয়তো নতুন কোন কথা তাকে শোনাবে মাধবী। অবাক লাগে অমৃতের মাধবীকে দেখে। কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো এই মুহূর্তে যার মনের মাতন শুরু হল ঠিক পরমুহূর্তেই আকাশে আর মেঘ নেই, একচিলতে রোদে সেখানে চিকচিক করছে।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এসো। ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে মাধবী অমৃতকে ডাকল।

অমৃত ঢুকল। এই প্রথম সে ঢুকল মাধবীর ঘরে। ঘরখানি পরিচ্ছন্ন। মেঝেতে একটি মাদুর বিছানো। ঘরের দেয়ালের চারদিকে পিটুলি আর গেরুয়া মাটির আলপনা আঁকা। একটি তোরঙ্গ রয়েছে এক পাশে। ধূপের ক্ষীণ মিষ্টি একটা ধোঁয়া উঠে আসছে দক্ষিণের কুলুঙ্গি থেকে। সম্ভবত-রাধামাধবের বাঁধানো ছবিতে ধূপ দেওয়া হয়েছে।

কি দেখছ, বসো।

মাধবীর কথায় অমৃতের চমক ভাঙল। অমৃত বসল মেঝেতে বিছানো মাদুরের ওপর। তারপর মাধবীর দিকে তাকিয়ে বলল, আশ্রমের নিয়ম ভেঙে অনধিকার প্রবেশ করলাম না তো?

মাধবী বলল, যে সব নিয়ম মেনে চলে তার কাছে ঘরে না ঢোকার একটা নিয়ম আছে, কিন্তু যে কোনটাই মানে না তাকে ঐ সামান্য একটা আইনে আটকে রেখে লাভ কি?

এ মাধবীর কৌতুক কি ভর্ৎসনা তা বুঝতে পারল না অমৃত। দেয়ালের একটা আলপনার দিকে তাকিয়ে সে নীরবে বসে রইল।

আমার মাধবীকুঞ্জে আজ তুমি প্রথম অতিথি, বড় পুণ্যের দিন আজ আমার। বল কি দিয়ে তোমার সেবা করব। মাধবীর গলায় এবার মিনতির সুর।

এই মুহূর্তে মাধবীর কাছে বুঝি অদেয় কিছুই নেই। অমৃত অনুভব করল মাধবীর উত্তাপ। সে এখন হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবে তার কামনার ধন। কিন্তু কাতর উন্মুখ মনটাকে সে সরিয়ে দিল। মাধবীর কথার উত্তর দিল অমৃত — সেবা পেতে গেলে তার অধিকার অর্জন করতে হয় মাধবী। অক্ষমকে মর্যাদা দিয়ে অপরাধী কোর না।

মাধবী বুঝল এ অমৃতের অভিমান। সে বলল, বুঝলাম তুমি মাধবীর সেবা নিতে চাও না। কিন্তু বৈষ্ণবীকে দান নেবার অধিকারটুকু দাও।

অমৃত বলল, আমার অক্ষমতাকে এমন করে উপহাস কোর না মাধবী। কিছু দেব এমন ধন আমার যেমন নেই, কিছু নিয়ে রাখব এমন পাত্রও কই আমার। তাই দেওয়া নেওয়ার সব হিসেব চুকিয়ে বসে আছি।

মাধবীর গলা এবার ভারী হয়ে উঠল — আমাকে দুঃখ না দিলে কি তুমি শান্তি পাও না অমৃত!

কথা শেষ করতে পারল না মাধবী। চোখের জল ছাপিয়ে উপচে পড়ল।

পৃথিবীতে দ্রব করবার যত বস্তু আছে তার ভেতর মেয়েদের চোখের জল বুঝি সবচেয়ে সেরা দ্রাবক। মাধবীর চোখের জল অমৃতের সব অভিমান মুহূর্তে গলিয়ে ঝরিয়ে দিল।

আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না মাধবী। তোমাকে আঘাত দিতে গেলে সে আঘাত আমার কাছেই ফিরে আসে। — গাঢ় হল অমৃতের স্বর। তারপর ম্লান হেসে বলল, মনের অশান্ত আশাগুলোকে কোনওরকমে ঢেকে রাখতে পারি না, তাই যত অঘটন ঘটে।

সহজ করে যে নিজেকে তুলে ধরতে পারে তাকে ভোলা সহজ নয় অমৃত। তুমি সহজ তাই তোমার টান এত প্রবল। আর তাই আমার সমস্ত মনের ওপর তোমার অধিকার।

অমৃত সাহস পেল, বলল, আমি তো তোমাকে ডাক দিয়েছি মাধবী, তাহলে সঙ্গে চলতে তোমার দ্বিধা কেন?

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মাধবী। তারপর ধীরে ধীরে বলল, বোঁটার থেকে মাটির ওপর যে ফুল খসে পড়ে তাকে তুলে কি দেবতার পুজোয় নিবেদন করা যায় অমৃত?

মাধবীর মনের একটা গোপন দরজা হঠাৎ কোথা দিয়ে এলোমেলো হাওয়ায় খুলে গেল। অমৃতের চোখ গিয়ে পড়ল সেখানে। মাধবীও সে খোলা দরজা বন্ধ করার কোন চেষ্টাই করল না। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব হয়ে রইল।

অমৃতের নীরবতাকে একসময় ভাঙল মাধবী — উচ্ছিষ্ট ভালবাসাকে নিবেদন করব এ অধিকার আমার নেই অমৃত। বার বার আমার মনের মুখোমুখি এসে তুমি দাঁড়িয়েছ। বিশ্বাস কর অমৃত, আমি অধীর আকুলতায় ছুটে এসে সমস্ত মনের দ্বার খুলে দিতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে গেছে আমার মন। তুমি ফিরে গেছ ক্ষোভে অভিমানে।

কথা বলতে বলতে মাধবীর চোখে মুখে ফুটে উঠল কেমন এক যন্ত্রণার ছবি।

অমৃত বলল, কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে মাধবী। কাছে এসে বস।

মাধবী বসল অমৃতের কাছে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল সে। তারপর একসময় বলল, যাকে ভালবাসি অমৃত তাকে প্রতারণা করব কী করে। তুমি আমাকে ডাক দিয়েছ। তোমার সে ডাক উপেক্ষা করি এমন শক্তি আমার যেমন নেই, তেমনি সে ডাকে সাড়া দিই এমন শক্তিই বা কোথায়। কি আশ্চর্য মন অমৃত। যে টানে সেই আবার ফিরিয়ে আনে। মন নয় তো সাগরের ঢেউ। আকুল হয়ে কুলে আছড়ে পড়ে আবার দূরে সরে যায়।

অমৃত বলল, তুমি তোমার ঝরাপাতাকে উড়িয়ে দাও মাধবী, আমি জানতে চাই না তোমার অতীত? এসো আমরা নতুন করে বর্তমানকে রচনা করব।

দিনশেষের একটা ম্লান হাসি জেগে উঠল মাধবীর মুখে। তারপর সমস্ত মুখে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল। — একদিন সংসারের কাজে তোমার চোখে যখন আমার কোনও একটুখানি ভুল ধরা পড়বে তখন তুমি খুলতে চাইবে আমার অতীতের এই বন্ধকরা পাতা। একদিন তুমি নিজেই যা বন্ধ করে দিয়েছ, সেদিন সহস্র অজুহাতে তাকেই তুমি মেলে ধরতে চাইবে চোখের সামনে। আমার ভুলের মাসুল দিতে গিয়ে সেদিন আমি হারাব আমার অমৃতকে। চাই না অমৃত, তোমার মাঝে বার বার মরে আমি বাঁচতে চাই না।

তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না মাধবী?

তোমাকে বিশ্বাস না করলে তোমার স্মৃতির পুজো কি করে করব। অবিশ্বাসের মাঝে পাছে জড়িয়ে পড়ি আমরা তাই দূরে সরে থাকতে চাই অমৃত।

এ অবস্থায় অমৃত নতুন কোনও কথাই খুঁজে পেল না। যে ধরবার নাগালের একেবারে কাছে এসে বলে, কেমন করে ধরবে আমাকে ধর, তাকে ধরবার সমস্ত চেষ্টাই যে শেষ হয়ে যায়।

আবার নীরবতার মাঝে দুজনে বসে রইল কতক্ষণ। ফাল্গুনে মাধবীফুল ফুটেছে। মৃদু মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে ঘরের ভেতর। অমৃত কথা খুঁজে পেল। সে এই গভীর পরিস্থিতিকে সহজ করবার চেষ্টা করল, বড় মিষ্টি গন্ধ পাঠিযেছে মাধবী। শুধু গন্ধেই তুষ্ট থাকতে হল, কাছে পাওয়া গেল না।

মাধবী উঠে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মাধবীলতাটা টেনে আনল। বলল, নাও তুলে নাও, মাধবী নাগালের বাইরে আর নেই।

কি অপরূপ এই ফুলের স্তবক! এ ফুল কাছে পেতে ইচ্ছে করে, আবার হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে গেলে নিজের মনের মাঝেই কেমন ব্যথা লাগে।

নাঃ, পারলাম না মাধবী। হেরে গেলাম তোমার কাছে। — অমৃতের গলায় হার মানার সুর।

মাধবী লতাটা ছেড়ে দিয়ে হেসে বলল, তোমার মাধবী যে মাধব-প্রিয়া। কলঙ্কের দাগ ওর কপালে। তাই নিতে গিয়ে ফিরে আসতে হয়।

দোহাই তোমার মাধবী, তুমি সহজ করে কথা বল, আমাকে হেঁয়ালির আড়ালে ফেলে অস্থির করে দিও না।

মিনতির সুর অমৃতের কথায়।

মাধবী কি মনে করে উঠে গেল ঘরের এক কোণায়। একটা বিরাট তোরঙ্গ রাখা ছিল সেখানে। তোরঙ্গখানার ডালা সে খুলল। তার ভেতর থেকে একটি একটি করে বের করল কয়েকখানা পটে-আঁকা ছবি। সেগুলোকে বয়ে নিয়ে এল অমৃতের কাছে। মাদুরের ওপর একে একে ছবিগুলো বিছিয়ে রেখে বলল, চিনতে পার অমৃত এদের?

ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে অমৃত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। ভুলে গেল সে মাধবীর কথাব জবাব দিতে। এ যে মাধবী। বিচিত্র ভাবের লীলায় মাধবী ধরা পড়েছে পটের বুকে। ছবিতে কি এমন করে মানুষকে ধরে রাখা যায়। ছবিগুলো দেখতে দেখতে মুগ্ধ অমৃত বলল, আশ্চর্য, এ ছবি, না তুমি মাধবী!

আমি নই অমৃত এ আর এক মাধবী। সে মাধবী মরে গেছে।

নিজেকে এমন করে আঘাত করছ কেন মাধবী?

মাধবী অমৃতের কথাগুলো শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না। সে তন্ময় হয়ে নিজের ছবিগুলো দেখতে লাগল। কিছু পরে চোখ তুলে বলল, এ ছবি নয় অমৃত, এ আমার জীবনের কথা। সেই কথাই শোনাব বলে আমার অতীতকে তোমার সামনে মেলে ধরেছি।

অমৃত তাকিয়ে রইল মাধবীর দিকে।

মাধবী বলল, এই ছবির চিত্রকরের সঙ্গে একদিন মাধবী নামের একটি মেয়ের জীবন জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের জীবনের ভাল লাগার আর দুঃখ পাওয়ার কথাতেই ভরে আছে এই ছবির পটগুলো।

আজ তোমাকে তাদের কাহিনী শুনতে হবে অমৃত। তুমি লেখক, মানুষের মন নিয়ে তোমার সৃষ্টি। এ কাহিনী তুমি রূপ দিতে পারবে তোমার লেখায়। দেখবে কি বিচিত্র এ জীবন।

নির্বাক অমৃত নিষ্পলক তাকিয়ে রইল মাধবীর দিকে।

পটগুলির থেকে একটি ছবি তুলে ধরল সে অমৃতের সামনে। ছবিখানি কিশোরী মাধবীর। সারা অঙ্গে ফুলের অলঙ্কার। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে। কিসের ধ্বনি যেন শুনেছে। সারা অঙ্গে তার অনুরাগের ছোঁয়া। ছবিখানির তলায় চন্দনের রঙে লেখা আছে—

'মরি কোন বিধি আনি সুধা-নিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী অবশ তখনি
মুরছি' পড়ল হামে।।
সব কলেবর কাঁপে থর থর
ধরনে না যায় চিত।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি
শুনহ পরান-মিত ॥'

সারঙগড়ের মেলায় সেই আমার প্রথম যাওয়া। সঙ্গে ছিল দাদুভাই। সারাদিন মেলায় ঘুরে বেড়ালাম। রেশমী চুড়ি কিনব বলে বায়না ধরলাম দাদুর কাছে। দাদু বলল, ছিঃ দিদি, বাউল বোস্টমদের কি ওসব কিনতে আছে! তুমি আমার কিশোরী রাধা, এসো তোমাকে আমি ফুলের মালা কিনে সাজিয়েই দিই।

ফুলের মালা কেনা হল। হাতে পরলাম কাঁকন, গলায় দুলিয়ে দিলাম গোড়ে। আর মাথার চুড়োয় পাকে পাকে জড়িয়ে নিলাম মালা। আমার দিকে তাকিয়ে দাদুর খুশী আর ধরে না। একতারা বাজিয়ে গান জুড়ে দিল ঃ

'থির বিজুরি বরণ গোরী
পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে
নব মল্লিকার ফুলে।।
সই, মরম কহিলুঁ তোরে।
আড় নয়ানে ঈষত হাসিয়া
আকুল করিল মোরে।।'

একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাদু গান গাইতে লাগল, আর আমিও গাইতে লাগলাম তার সঙ্গে। কত বাউল বোষ্টম আমাদের ভিড় করে দাঁড়াল। মেলার লোক জমল আমাদের আশেপাশে। গান গাইতে গাইতে চোখে পড়ল ভিড়ের থেকে একটু দূরে সুন্দর মুখের দিকে। মাটিতে বসে কি যে আঁকছে। এক একবার তাকাচ্ছে আমার দিকে। মরে গেলাম লজ্জায়। গান থামলেই দাদু বলে, গাও দিদি, গাও, এতগুলি নারায়ণ দাঁড়িয়ে আছেন তোমার গান শোনার আশায়। আবার গান ধরলাম। এতক্ষণ যেন গান গাইছিলাম তার ভেতর আমার কোনও ভাবনাই ছিল না, তাই সহজেই সুরে বের হচ্ছিল গলা দিয়ে। এখন মনে হল, যদি ওই সুন্দর মানুষটির কানে আমার গান ভাল না লাগে। যদি গান শেষ হতে না হতেই ও উঠে চলে যায়। ভয়ে ভয়ে গান গাইছিলাম আর তাকাচ্ছিলাম ওর দিকে। গান শেষ হল, লোকে বাহবা দিয়ে একে একে চলে গেল। কিন্তু ঐ মানুষটি যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে বসে কাগজের পাতায় কি সব আঁকিজুঁকি করতে লাগল।

ভয় কেটে গেল আমার। তাহলে আমার গান ওর খারাপ লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা মনে এলো, আমি যেমন করে ওর কথা ভাবছি ও যদি তেমনি করে আমার কথা ভাবত। আচ্ছা ওর মনের ভাবনাগুলো যদি আমি জানতে পারতাম।

এইসব এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সারা শরীরটা কেমন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। শালের কচি পাতাগুলো মিঠে ফাগুনের হাওয়ায় যেমন শিরশিরিয়ে কাঁপতে থাকে ঠিক সেরকম। এই আমার প্রথম ভাল লাগা।

এই ভাল লাগা যে কি তা সঠিক বুঝলাম না। তবে এটুকু জানলাম যে এই মানুষটিকে দেখলে মনটা আমার হঠাৎ খুশীতে ভরে উঠবে।

সাঁঝ ঘনিয়ে মেলা ভাঙল। বাউল বোষ্টমদের সঙ্গে কতক্ষণ দাদু করল তত্ত্ব আলোচনা। মন বসল না তত্ত্বকথায়। কেবল চোখের সুমুখে ভাসতে লাগল ঐ সুন্দর মানুষটির মুখ। মনে হল, আর একবারটি যদি আমি ওকে দেখতে পেতাম। ভাবতে ভাবতে কখন চারদিকের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মাথায় কার হাতের ছোঁয়ায় সংবিৎ ফিরে এলো। তাকিয়ে দেখি সাধনদলের একটি বৈষ্ণবী। বয়স হয়েছে তাঁর। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, আহা, সারাদিন মেলায় ঘুরে ঘুরে ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখদুটি। এসো মা আমার সঙ্গে এসো।

বৈষ্ণবী মাকে বেশ ভাল লাগল আমার। শিশুকাল থেকেই আমি হারিয়েছিলাম আমার মাকে। জ্ঞান হবার পর থেকেই বাবার সঙ্গে আর এই আশ্রমের সঙ্গে আমার যোগ।

শুধু মায়ের অস্পষ্ট দু'একটা স্মৃতি আমার মনে পড়ে। মা একটা ছোট ঘরে দীপ জ্বেলে গান গাইত। আমি শুনতাম সে গান, কি ভাল যে লাগত আমার! মায়ের মুখটা আর এখন স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু সেই মধুর সুরের স্মৃতিটা আজও মনে জড়িয়ে আছে।

সেদিন বৈষ্ণবী যখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন তখন কেন জানি না আমার হারান মাকে মনে পড়েছিল।

মেলার ধারে একটি ছোট ঘর। খড়ের চালা। সামনে তুলসীমঞ্চ। টগর, গাঁদা করবীর কয়েকটা গাছ। বৈষ্ণবীর হাতের আলোয় দেখলাম ঘর আর আঙিনা ছবির মতো নিকোনো। ভেতরে আলো জ্বলছিল। বৈষ্ণবী এবার আমার হাত ধরে নিয়ে এলেন ঘরের ভেতর। ঘরে ঢুকেই দেখলাম একটি মহিলা। খুব ভদ্রঘরের বলেই মনে হল। বিধবার বেশ, কিন্তু গায়ে দামী একখানা চাদর। তাঁর সমস্ত চেহারায় এমন একটা ভাব ছিল যা তাকিয়ে দেখতে হয়।

আমিও দেখছিলাম। উনি বৈষ্ণবীকে লক্ষ্য করে বললেন, মেয়েটি কে বিষ্ণুপ্রিয়া?

বৈষ্ণবী বললেন, আচার্য দীনদাসের আশ্রম থেকে এসেছে।

এবার আমার দিকে তাকালেন মহিলাটি। মুখে প্রসন্ন হাসি টেনে বললেন, মুখের ভাবটি বড় মিষ্টি। কি নাম মা তোমার?

আমি-মাধবী।

বাঃ ভারি মিষ্টি নামটি তো!

ওঁর কথা শুনে খুব ভাল লাগল আমার।

দাঁড়িয়ে কেন, বস মা।

বসে পড়লাম তাঁর কাছ ঘেঁষে। বৈষ্ণবী এবার কথা বললেন, সেই কখন এসেছে, সারাদিন হয়তো তেমন করে খাওয়াই হয়নি, তাই এখানে আনলাম দিদি।

বেশ করেছ ভাই। বলেই তিনি আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। — মেয়েটি বেশ সুলক্ষণা, কথাটা যেন স্বগতোক্তি করলেন তিনি। তারপর বৈষ্ণবীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আমাদের ঘরে যদি এমন একটি মিলত তাহলে .....

শেষের কথাটি কুড়িয়ে নিয়ে বৈষ্ণবী বললেন, তাহলে কি করতে দিদি?

তাহলে আমার আনন্দের বউ করে ঘরে তুলে নিতাম।

কথা শুনে বৈষ্ণবী প্রথমে হেসে উঠলেন। তারপর কেমন যেন হঠাৎ চুপ করে গেলেন। লজ্জায় আমি চোখ নামালাম।

আর ঠিক সেই সময়েই ঘরের বাইরে টুংটাং গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ পেলাম। কে যেন হাঁক দিয়ে বলল, মা, তিলকদা গাড়ি নিয়ে এসেছে।

ভেতর থেকে মহিলাটি হেঁকে বললেন, সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়ালি তুই, কি যে হয়েছে ছেলের ছবির বাতিক!

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ছেলে বলল, আজ যা এঁকেছি মা তা দেখে তুমি বলবে—

কথা আর শেষ হল না। আমি চোখ তুললাম।

কিন্তু যেমন সহজে চোখ তুললাম তেমন সহজে নামিয়ে নিতে পারলাম না। সেই ছবি-আঁকিয়ে মানুষটি আমার সামনে এসে কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

খুব লজ্জা পেয়ে গেল ও। ওর কথাটা শেষ হতে পারেনি ঠিক, কিন্তু তার শেষটুকু আমার কাছে আর অস্পষ্ট রইল না। আবার আমার সারাটা শরীর তেমনি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, কিছু আগে ওকে দেখে যেমন করে কাঁপছিল। এই প্রথম মনের ভেতর পুরুষের ছোঁয়া পেলাম। এতদিন পুরুষের সঙ্গেই আমার কেটেছে, কিন্তু সেখানে পেয়েছি স্নেহ। আজ নতুন এক স্বাদ পেলাম।

বৈষ্ণবী বললেন, এস বাবা, আনন্দগোপাল। কতক্ষণ মাকে ছেড়ে রয়েছে। ছেলেকে ছেড়ে কতক্ষণ মা থাকতে পারে বাবা।

বলতে বলতে কেন জানি না বৈষ্ণবীর চোখ ছাপিয়ে জল এলো। তিনি চোখ মুছতে মুছতে পাশের আর একখানা ঘরে উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ মা আর ছেলেতে কথা হল। আমি লজ্জায় আর কারও দিকে তাকাতে পারলাম না। কিন্তু আমার কান সবটুকু কথা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। ওঁদের ভেতর যে কথা হল তাতে বুঝলাম ওঁরা যাবেন অনেক দূর। গরুর গাড়িতে এসেছেন আবার ফিরে যাবেন গাড়িতেই। সারারাত গাড়ি

চলবে, তারপর ঘরে পৌঁছবেন সেই পরের দিন দুপুরে। রাতে এসব পথে ভয়ডর আছে। ডাকাতের লুঠতরাজের ভয়। তবে একসঙ্গে চলবে কয়েক শ' যাত্রী বোঝাই গরুর গাড়ি। গাড়োয়ানদের প্রায় সকলেই লাঠিয়াল। এখানে গাড়ি চলার এই রীতি।

বুকের ভেতর দুরদুর করতে লাগল। একটা বোবা ভয়ে সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কার জন্যে আমার এ ভাবনা। খানিক আগে তো কারও জন্যে আমার কোন চিন্তা ছিল না। হঠাৎ কেন এমন হল। আর একজনের অশুভ চিন্তা কেন আমাকে এমন উতলা করে তুলল।

ঘরে এসে ঢুকলেন বৈষ্ণবী। হাতে দুটি রেকাবিতে কিছু ফল মিষ্টি আমাদের দুজনের কাছে রেখে জল নিয়ে এলেন। বললেন, খাও মা, সেই কখন খেয়েছ, মুখ শুকিয়ে গেছে।

তারপর ওর দিকে ফিরে বললেন, মাসীকে আর আনন্দের মনে পড়ে না তাই না?

একটা নাড়ু মুখে পুরে আনন্দ বলল, মাসীকে মনে না পড়ুক ক্ষতি নেই, কিন্তু তার এই নাড়ুকে যেন না ভুলি।

বৈষ্ণবী আনন্দের মায়ের দিকে ফিরে বললেন, মনে পড়ে দিদি, এই ক'বছর আগেও আনন্দ নাড়ুর লোভে আমার পিছু পিছু ঘুরত, মেলায় যেতে চাইত না।

বৈষ্ণবীর কথায় হাসতে লাগলেন আনন্দের মা।

কথাটা শুনে আমার চোখ মুখে বোধ করি চাপা কৌতুকের একটা হাসি ফুটে উঠেছিল, আনন্দ তা লক্ষ্য করে বলল, মাসীর হাতের তৈরি নাড়ু খেলে তুমিও গান ছেড়ে সারাদিন এইখানেই বসে রইবে।

তুমি গান কর মা? আনন্দই তোমার গান শুনল, কই মাকে তো একটা শোনালে না?

আনন্দের মা আমারও মা — এই অনুভূতি আমাকে সেদিন আচ্ছন্ন করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ভয়ও।

ওঁর কথায় লজ্জা পেলাম। গলা আমার খারাপ নয় ঠিক, তবু আমার ভাল লাগার লোকটি যদি এ গান পছন্দ না করে।

ভাল লাগার পেছনে এমনি একটা অহেতুকী ভয় ঘুরে বেড়ায় তাহলে। তবু গাইলাম —

'বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা নিয়া রাখি বুকে।
আনের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবলি তুমি।
আমার পরান হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি।।'

গান শেষ হতে না হতেই দেখলাম ও ঘরের বাইরে চলে গিয়ে বোধকরি গাড়ির ভেতর থেকে ছবির কাগজপত্তর নিয়ে এলো। এসে বলল, তুমি এমনি করে বসে গান গেয়ে যাও। একটুও নড়ো না যেন। আমি তোমার ছবি আঁকব।

গান আমার থেমে গেল। লজ্জায় মাথাটা নত হয়ে এল। আমার ছবি কেউ আঁকবে, আর তার সামনে বসে স্বাভাবিকভাবে গান গেয়ে যাব এমন শক্তি মনের মধ্যে পেলাম না।

আনন্দের মা বললেন, লজ্জা কি মা, ও এমনি আঁকার পাগল। আমাকেই কাজকর্ম করতে দেয় না। বলে, তুমি কাজ করে যাও মা আমি তোমার ছবি আঁকি।

বৈষ্ণবী এতক্ষণ মৌনী হয়ে বসে আমার গান শুনেছিলেন। এবার বৈষ্ণবী বললেন, তুমি গান শোনাও মা। আহা কি কথা, প্রভু গৌরব দিয়েছেন তাই রাধার এত গরব। প্রভু তার দিকে তাকিয়েছেন তাই রাধার দেহে রূপ আর ধরে না। নিজেই গানটা ধরলেন। আমার গাওয়া গান। চমৎকার গলা, আমিও তাঁর সঙ্গে গাইতে লাগলাম—

'বঁধূ তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে ....'

আনন্দ বসে বসে একটা বাঁধানো ফ্রেমের ওপর এই ছবিখানা আঁকতে লাগল।

মাধবী অমৃতের দিকে একখানা ছবি এগিয়ে দিলে। অমৃত দেখল মুগ্ধা রাধার ছবি। একটি ময়ূরের পালক হাতে নিয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখে মুখে অনুরাগ আর আত্মসমর্পণের ভাবটি চমৎকার ফুটে উঠেছে।

মাধবী বলতে লাগল, এই আমার দ্বিতীয় ছবি। ছবিখানা কখন আঁকা শেষ হল তা আমি আর দেখতে পেলাম না। গান গাইতে গাইতে চোখ আমার জলে ভরে এলো বার বার। চোখের সামনে দেখলাম মাধবকে, শ্রীমতীর ছবি আঁকছেন পটের ওপর।

গান শেষ হল। আনন্দের মা বললেন, মাধব তোমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন মা। তোমার গানে তিনিও তৃপ্ত হবেন।

কি এক বিদ্যুৎ আমার সারা শরীরটাকে ছুঁয়ে দিয়ে গেল। এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কেঁপে উঠলাম। বৈষ্ণবীর দিকে তাকালাম। চোখ-দুটি তাঁর বন্ধ। বোধকরি তিনি ধ্যান করছেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে।

একসময় বৈষ্ণবী চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চাহনিতে কেমন যেন মায়া ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই যদি মা রাধা না হয়ে কৃষ্ণ হতিস তাহলে এই বুকে তোকে সারাদিন জড়িয়ে রাখতাম।

কথা শেষ করেই গান ধরলেন, গোষ্ঠলীলার গান। কানু গোষ্ঠে যাবে, মায়ের প্রাণ আকুল হয়েছে।

'আমার শপতি লাগে   না ধাইহ ধেনুর আগে
পরানের পরান নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু   পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি।

আমি বৈষ্ণবীর গলায় মা যশোমতীর আকুলতা শুনতে পেলাম। আর বৈষ্ণবীর সুর শুনে মনে হল, আশ্রমে বসে বাবা যেমন করে গান করেন ঠিক তেমনি সুরের টান। শুধু মানুষ দুটি আলাদা হয়ে গেছে। সুরে তারা কত কাছে।

গান শেষ হলে আমার কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। বৈষ্ণবীকে বললাম, আশ্রমে বসে যেন আমার বাবা গাইছেন বলে মনে হচ্ছে মা।

আমার কথা শুনে বৈষ্ণবী কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আচার্য দীনদাসকে আমার প্রণাম জানিও মা। তাঁর তুল্য গায়ক এ অঞ্চলে আর কে আছে।

পথের ওপর থেকে গাড়োয়ানের ডাক শোনা গেল। গাড়ি ছাড়ার নাকি সময় হয়ে গেছে। আনন্দের মা উঠে পড়লেন। তারপর কি ভেবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, অম্বিকানগরের কাছেই যে আশ্রমটি পড়ে সেটাই কি তোমার মা?

হ্যাঁ মা, সেই আশ্রমই আমাদের।

এবার বৈষ্ণবীর দিকে চেয়ে বললেন, রাত হয়েছে, এখন পায়ে হেঁটে না গিয়ে আমাদের গাড়িতে গেলে মেয়েটিকে আশ্রমে নামিয়ে দিয়ে যাই।

আবার তেমনি একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল সারা শরীরের ভেতর দিয়ে। একই গাড়িতে, তা যত কম সময়ই হোক না কেন, আনন্দকে কাছে পাব। এ আমার কাছে অভাবনীয় বলেই মনে হল।

বৈষ্ণবীর দিকে তাকালাম। তিনিও আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, তা যাও না মা দিদির সঙ্গে। সাধুবাবা তত্ত্বে বসেছেন। সংসারের কোন ভাবনাই এখন আর নেই তাঁর। আমি তাঁকে বলে দেব। কোনও ভাবনা না রেখে তুমি যাও মা ওঁর সঙ্গে।

দাদুর জন্যে মনটা কেমন করল। বুড়ো মানুষ, একসঙ্গে এসেছি, আবার তাঁকে একা ফিরতে হবে। কিন্তু এঁদের আর সময় নেই।

বাউল বৈরাগীরা যেখানে আলোচনাচক্রে বসেছেন সেখান দিয়ে গাড়ি যাবে না। গাড়ি চলবে তার উল্টো মুখে।

যত কম সময়ই হোক না কেন আনন্দের সঙ্গে থাকার লোভ আমি ছাড়তে পারলাম না। জীবনের এই একটিমাত্র মুহূর্ত যেখানে সব কর্তব্য শিথিল হয়ে যায়।

গাড়িতে উঠলাম। অন্ধকার রাত। গাড়ির ভেতরও অন্ধকার। গাড়োয়ানের পায়ের তলায় একটা হেরিকেন গাড়ি সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় দুলছিল। সেই আলোয় বাইরের পথের কিছু অংশ দেখা গেলেও গাড়ির ভেতর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমরা চালার ভেতর দিকে সেঁধিয়ে বসলাম। আমাদের সামনে বসল আনন্দ। গাড়ি ছাড়ছিল। থামালেন বৈষ্ণবী মা। ঘরের ভেতর থেকে একটি কাপড় নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বললেন, চৈতে দোল আসছে। পরো মা এই কাপড়খানা। বেশ মানাবে। রাধার অঙ্গে হলুদবাস। পলাশফুলের বরণ রাঙা পাড়। আমি এখান থেকেই দেখব মা তোমার সেই রাঙা অঙ্গের রূপ।

প্রথমে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল। আর ঠিক সেই ঝাঁকুনিতে কার একখানা হাত এসে পড়ল আমার কোলের ওপর। পরক্ষণেই হাতের মালিক হাতটা সরিয়ে নিল। অমনি অঙ্গে যেন অনঙ্গরস উপচে পড়ল। বুঝলাম, আমার জগতে দাদু, বাবা ছাড়াও আরও কেউ একজন আছে, যাকে এতদিন কাছে পাইনি। কিন্তু একবার যার ছোঁয়া পেল আর তাকে ছাড়া যায় না।

কীর্তনের সুর ভেসে উঠল সমস্ত মনে। এতদিন এ গান গেয়েছি। সুর বেজেছে কানে, কথার মানে বুঝিনি। আজ কথা সুরঝংকার দিয়ে উঠল।

'নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কি বা হয়—
যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়।'

পথ উঁচুনীচু। একসঙ্গে বহু গাড়ি চলেছে। পেছনের পর্দাটার ফাঁক দিয়ে দেখলাম আঁকাবাঁকা পথে অনেকগুলো গাড়ি আসছে। প্রতিটি গাড়ির থেকে ঝুলছে এক একটা হেরিকেন। চারদিক অন্ধকার। মনে হল. আঁধারের স্রোতে এঁকেবেঁকে ভেসে আসছে যেন একটি আলোর মালা। সেই মালার চিন্তায় আরও কত কথা মনে এলো। কত স্বপ্ন দেখলাম। একটি সুন্দর পুরুষ মূর্তি। গলায় তার টগরের মালা। কপালে চন্দনের টিপ। গায়ে উত্তরীয় জড়িয়ে সে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, এতকাল তুমি আমার পটের ছবি ছিলে, এখন মূর্তি ধরে এসেছ। আমি তোমার জন্য বাউল হলাম। কই তোমার মালা দাও।

চোখের জল ঝরল। বললাম, আমার চোখের জলের ফুল দিয়ে যদি মালা গাঁথতে পারতাম তাহলে তাই পরাতাম তোমার গলায়।

গাড়ি থেকে নামতে হবে এবার। নদীর কাছে এসে পড়েছি। শীতে বড় বেশি জল থাকে না এসব নদীতে। গাড়ি পার হয়ে যায়। যাত্রীরা জলে হেঁটে গিয়ে ওপারে আবার গাড়িতে উঠে। গাড়ির ভার কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়।

চোখের জল সত্যিই ঝরে পড়ছিল। আঁচলে মুছলাম। আঁধার রাত, তাই সে জল দেখতে পেল না কেউ। আনন্দের মা গাড়িতে রইলেন। রাতে ঠাণ্ডায় তিনি আর নামতে চাইলেন না নদীর জলে। গাড়ি থেকে আমি আর আনন্দ নেমে পড়লাম। শীতের কামড় লাগল পায়ে। নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে এগোতে লাগলাম। আনন্দ আগে চলছিল, হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। আমি তার কাছাকাছি এসে পড়তেই সে আমার দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে। কি জাদু ছিল সে হাতের, শত চেষ্টা করেও না বলতে পারলাম না। বলতে পারলাম না যে আসার সময়ে আমি একাই নদী পার হয়ে এসেছি। নদীর সঙ্গে আমার চিরদিনের পরিচয়। কুমারী আর কংসাবতী আমার দুই সখী. ললিতা আর বিশাখা। ধরলাম তার হাত। পাশাপাশি চলতে লাগলাম দুজনে। আমার সমস্ত মনটা ঐ হাতে এসে বাঁধা পড়ল। একটিও

কথা বলতে পারিনি। আনন্দও বলেনি। বোধকরি সে সময় চুপ করে থেকেই বেশি কথা বলতে পেরেছিলাম। পারে উঠেই আনন্দ হঠাৎ বলল, আমাদের চলা ফুরিয়ে গেল।

মনে মনে বললাম, যদি এটা নদী না হয়ে সাগর হত তাহলে কতকাল ধরে তোমার হাতে হাত রেখে এমনি পার হতে পারতাম।

পেছনে কয়েকটি যাত্রী এসে গেল। হাত ছেড়ে দিলাম আনন্দের। একে একে গাড়িগুলো এপারে এসে পৌঁছল। আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে লাগল উঁচু-নীচু পথ ধরে। বড় বেশি ঝাঁকুনি এ পথে। ফসল-তোলা মাঠেও ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। আলের কাছে ঠিক দুটি চাকা পার হবার মতো কাটান আছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ছোঁয়া লাগছে গায়ে গায়ে। টাল সামলে নিতে গিয়ে দেখি কখন আনন্দ আমার কাছে সরে এসেছে। আমি নিজেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। আনন্দের মায়ের অনেক কাছে সরে যাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মনটা আমার ছুঁয়ে ছিল আনন্দকে। ভাগ্যিস অন্ধকার বোবা, তাই জানতে পারল না কেউ আমাদের এই কাছে পাবার খেলাটুকু।

এবার কথা কইলেন আনন্দের মা। — দীনদাস তোমার কে মা?

বাবা—বললাম আমি।

মা কি আশ্রমেই আছেন?

বললাম, আমার মা নেই মা।

কথাটা বলতে গিয়ে বোধকরি গলার স্বরটা একটু কেঁপে থাকবে, আনন্দের মা আমার মাথায় হাত রাখলেন। তারপর অন্ধকারে অনুভব করলাম সে হাতের স্নেহ আর সান্ত্বনা গড়িয়ে আমার সারা অঙ্গ বেয়ে।

জন্ম থেকেই কি মা আশ্রমে রয়েছে?

কোথায় যেন ছিলাম আমি। অস্পষ্ট মনে পড়ে আমার। খুব ছোট তখন। একটা ঘরে আমাকে বন্ধ করে রেখে মা কোথায় বেরিয়ে যেত। আমি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়তাম।

কোন কোনদিন মা আমাকে খুব আদর করত। চোখ বেয়ে ঝরত জল। অস্পষ্ট ছবির মতো মনে আছে সে কথাগুলো। মা গান গাইত। বাবা গান গাইত। তারপর কবে যেন বাবা আমাকে নিয়ে এলেন এখানে। ধীরে ধীরে এই আশ্রমেই বড় হলাম। বুঝলাম, আমি মাতৃহারা হয়েছি।

এসব কথা ঠিকমত গুছিয়ে বলা যায় না, তাই আনন্দের মাকে বললাম, আগে যেন কোথায় ছিলাম মনে পড়ে না ঠিক। জ্ঞান হওয়া অবধি এই আশ্রমেই আমার কাটছে।

কৌতূহল নিয়ে আনন্দের মা প্রশ্ন করেন, কি করতে হয় তোমাকে আশ্রমে?

বাবা অন্ধ, তাঁর সেবা করি। মাধবের সজ্জার ভার আমার ওপর। তারপর রোজ বাবার কাছে কীর্তন শেখা। শ্যামলী ধবলীর জন্যে রয়েছে ঝুম্‌রী। সে আমার সঙ্গে যেমন খেলা করে তেমনি আমাকেও তার কাজে সাহায্য করতে হয়।

আমি এক এক করে সব কাজের হিসেব দিয়ে যেতে লাগলাম, আনন্দের মা চুপচাপ শুনতে লাগলেন।

আনন্দ একসময় কথা বলল, মা, আশ্রমে থাকতে আমার বড় ভাল লাগে।

মা হেসে বললেন, কোথায় থাকতে না তোমার ভাল লাগে বাবা। শ্যামরায়ের মন্দিরে বসে বসে ছবি আঁকতেও তোমার যেমন ভাল লাগে, অম্বিকানগরের মেলায় বৈষ্ণবী মাসীর হাতে নাড়ু খেতেও তোমার তেমনি ভাল লাগে। কই কোন কিছুতে খারাপ লাগতে তো তোমাকে দেখিনি কোনদিন।

আনন্দ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা আর হল না। একটা খাদে গাড়িটা হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। আমি টাল রাখতে গিয়ে কোন কিছু না পেয়ে আনন্দকেই ধরে ফেললাম। গাড়িটা খাদ থেকে আপনার গতিতে মুহূর্তে উপরে উঠে আবার কিছুটা পথ ছুটে চলল। সে সময়টুকু আমি আনন্দকে ছেড়ে দিতে পারলাম না। আমার সমস্ত লজ্জা সমস্ত ভয় কোথায় চলে গেল। পরম নিশ্চিন্তে আনন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে রইলাম।

সেদিন আমার সেই একান্ত করে সঁপে দেওয়ার দৃশ্যটুকু দেখছিল রাতের ঘন আঁধার, আর অনুভব করছিল একজন, যার কাছে সঁপে দিয়েছিলাম সেদিন আমার সারা মণ প্রাণ।

ভোররাতে বাবা আমার কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন। শাস্ত্রপাঠের সময় প্রায়ই বলতেন, মাধবী; একমাত্র পুরুষ রয়েছেন ত্রিলোকে, তিনি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণমাধব। তাঁকে ভজনা কর। তোমার বিত্ত তাঁকে অর্পণ কর। তোমার চিত্ত তাঁতে সমর্পণ কর। পড়াতে পড়াতে আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে বলতেন, ঐ দেখ মা কেমন স্বচ্ছ নীল আকাশ। নীল আকাশে সূর্যের উদয় হচ্ছে। মনটাকে এমনি স্বচ্ছ আর মুক্ত করতে হবে মা, তবেই সেই পুরুষ তোমার মাঝে আলোর মূর্তি নিয়ে উদিত হবেন।

আমি মাঝে মাঝে যখন একা আমার ঘরে বসে থাকতাম অথবা কংসাবতীর কূলে গিয়ে বসতাম তখন বাবার কথা মনে হত। বলতাম, মাধব, তুমি আমার মনকে আকাশ করে দাও, নাহলে তোমাকে আমি কেমন করে আমার এই ছোট্ট মনে ধরে রাখব।

মন আমার আকাশ হল কি না জানি না, তবে মাধবের মূর্তি ধরে আনন্দ এসে একদিন আমার মনের মাঝে আসন পাতল।

সেদিন মেলা থেকে আশ্রমে ফিরে এসে আমি সব ঠাঁই আনন্দকে দেখতে লাগলাম। মাধবের পুজো করতে গিয়ে আনন্দকে দেখলাম। মাধবের মূর্তিতে টগরের মালা দোলাতে গিয়ে নিজেই চমকে উঠলাম। এ যে আনন্দের গলায় আমাব দেওয়া মালা। এ খবর আর কেউ জানল কি না তাই দেখতে লাগলাম চারদিকে তাকিয়ে।

আনন্দময় হল আমার আশ্রম, আমার ভুবন। কিন্তু এত ব্যথা কোথায় ছিল! আনন্দের সঙ্গে কি এমনি দুঃখ থাকে ! অসহ্য একটা বেদনা আমার মনকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রইল।

পদাবলী গান করতাম আর চোখের জলে মুখ বুক ভাসাতাম।

এক একসময় মনে হত, কেন আমি আনন্দকে দেখলাম। কেন মেলায় গেলাম।

ওকে যদি দেখলাম তাহলে চিরদিন চোখের সামনে ধরে রেখে দিতে পারলাম না কেন।

পদাবলী গান করতে গিয়ে নিজের মনের ভেতরে শুনলাম শ্রীমতীর আক্ষেপ।

'যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে।।
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যায় নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।'

এমনি করে একদিন আমি মনে মনে আনন্দের প্রেমের সাগরে ডুব দিলাম।

তুমি কি ভাবছ অমৃত তা আমি জানি না, কিন্তু আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত মনটা মেলে দিতে চাই। আমার সব কিছু পরিচয় গোপন করে তোমাকে আর বঞ্চনা করতে চাই না।

ও কথা কেন বলছ মাধবী! যে নিজের মনকে স্বচ্ছ কাচখণ্ডের মতো মেলে ধরে তার মন একদিন ভেঙে গেলেও সহজ স্বচ্ছতাটুকু হারায় না।

ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল মাধবীর মুখে, বর্ষাদিনের ক্ষণিক আলোর আভাসের মতো। একসময় বলল, মন আমার কাচ কি না জানি না, তবে কংসাবতীর ধারা আমার মন। যা একবার তার মাঝে এসে পড়ে তাকে লুট করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোথায় যেন আছে একটা অভিশাপ। যাকে চাই তাকে চিরদিনের করে পাই না। বলতে পার অমৃত এ কিসের অভিশাপ?

মাধবীর এ কথার উত্তর দিতে পারল না অমৃত, তাই নীরবে বসে রইল। কতক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। বাগান থেকে ফুলের মৃদু মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। দুটো মৌমাছি জানালার ওপর দিয়ে কোথায় যেন উড়ে গেল।

তারপর একসময় তুলে ধরল মাধবী আর একখানা পট।

চারদিকে রাঙা রঙের সমারোহ। অশোকের ফুল ফুটেছে গুচ্ছ গুচ্ছ; তার তলায় বাঁধানো বেদিতে বসে আছেন রাধা। এ রাধা না মাধবী! রাধার মুখে চোখে মাধবীর তনুশ্রী।

সামনের পথে পদচিহ্ন। সেইদিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাধা। পথে ছড়ান ফাগচূর্ণে বুঝি

রাঙা হয়ে গেছে ঐ চরণ দুখানি। রাধার আঁখির সুমুখ দিয়ে পায়ের চিহ্ন এঁকে এঁকে কোথায় গেলেন শ্রীকৃষ্ণমাধব? পটের নীচে সে উত্তর লেখা আছে—

'আবিরে অরুণ সব বৃন্দাবন
উড়িয়া গগন ছায়
বঁধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেন না দেখিতে পায়।।'

অমৃত ছবি দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, সহস্য মাধবীর কথায় সে স্বাভাবিক হল।

দোলে আবার তার দেখা পেলাম। ভাবিনি সে আসবে। তবু এলো। ক'দিন থেকে আশ্রমে চলেছিল দোলের আয়োজন। এ আশ্রমে দোলাই সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। তৈরী হল ষোড়শ স্তম্ভ। মণ্ডপের ওপর ঝালর- দেওয়া চাঁদোয়া টাঙান হল। মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হল বেদি। শ্রীপর্ণী কাঠের ভদ্রাসনে চলল ফাগের উৎসব।

রামদাস দাদু বাবার দীক্ষাগুরু। তাঁকেই প্রথমে করা হল বরণ। তারপর গন্ধ তোয় দিয়ে অভিষেক করা হল। মাধবের স্নান শেষে মাধবকে বস্ত্র মালা চন্দন দিয়ে সাজান হল। দোলায় করে নিয়ে যাওয়া হল দোলমঞ্চে। আশ্রমের সামনে যে অশোকগাছটি দেখছ তার থেকে আমি ফুল নিয়ে এলাম। কিন্তু মাধবের গলায় মালা দিতে পারলাম না। তুমি জান রামদাস দাদু আমাকে খুবই ভালবাসেন। তিনি বলেন আমি নাকি শ্রীমতী রাধারানীর অংশ। দাদু একটি নিয়ম করেছিলেন। মাধবকে বাইরে দোলমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে যে ক'দিন পুজো হবে সবাই গেলেও আমি যেতে পারব না। আমাকে থাকতে হবে আশ্রমে। তারপর যেদিন মাধব ফিরে আসবেন সেদিন আমি বসব গিয়ে মন্দিরের ভেতর। খুলব না দ্বার। মাধব ভাঙাবেন আমার মান। গোবিন্দ তাঁর মনপ্রাণ আমাকে দেবার পণ করলেই আমি কপাট খুলব। তারপর মাধবের চরণে আবির আর মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেব মন্দিরে।

রামদাস দাদুর এ এক লীলা। কত ভক্তজন মাধবের সঙ্গে আমার এই মানলীলা দেখতে আসেন। আমি কিন্তু আশ্রমের ঘরে বসে বসে এ ক'দিন চোখের জলে ভাসি। কবে আসবেন আমার মাধব। কেন আমাকে ছেড়ে তিনি একা চলে গেলেন। অভিমানে ভরে যায় আমার মন। রোজ মালা গাঁথি, রোজ শুকোয়। বাইরে পুজোর কাঁসর ঘণ্টা, খোল করতাল বাজে।

সেবারও বসে বসে অশোকফুলের মালা গাঁথলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম মাধব এলে কিছুতেই দ্বার খুলব না। মন্দিরের বাইরে দরজায় কে আঘাত করল। ভাবলাম মাধব এসেছেন। বসে রইলাম চুপচাপ। আবার আঘাত হল। হঠাৎ মনে হল, দাদুর গলার আওয়াজ শুনছি না কেন? তিনিই তো মাধবের পক্ষে কথা বলবেন। কিছু সময় নিঃশব্দে কেটে যাবার পরে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

ফিরে যাচ্ছিল সে, দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল। একি, চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। আনন্দ আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আনন্দের চোখে মুখেও বিস্ময়। সবাই মাঠের মণ্ডপে গিয়েছে উৎসবে। শূন্য আশ্রমে আগন্তুক মানুষটি কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল।

আশ্রমে ও আজ অতিথি। ওর পরিচর্যার ভার আমাকেই তো নিতে হবে। এ আশ্রমে তাই নিয়ম। কিন্তু আমি একটি কথাও বলতে পারলাম না। শুধু নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। চোখ বেয়ে বুঝি জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, আনন্দ এগিয়ে এল আমার কাছে।

তুমি কাঁদছ?

সংবিৎ ফিরে পেলাম। কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেলাম নিদারুণ লজ্জায়। এতক্ষণে মনে হল আনন্দ আশ্রমে এসেছে। কতদূর থেকে কত ক্লান্ত হয়ে এসেছে সে। তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এখুনি।

আঁচলে চোখ মুছে তাড়াতাড়ি মাধবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আচমনের জল আর চৌকি এনে দিলাম। কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম তার পাশে।

ও চারদিকে তাকিয়ে বলল, আশ্রমে আর কাউকে দেখছিনে কেন?

বললাম, আশ্রমের দক্ষিণে মাধবীকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা চলছে। সবাই সেখানে গেছেন।

তুমি একা আশ্রমে! — আনন্দের প্রশ্নে কৌতূহল।

বললাম, মাধব দোলমঞ্চ থেকে ফিরে এলে তবেই আমি খুলব মন্দিরের দ্বার। এই নিয়ম চলে আসছে এখানে।

আনন্দ নিজেকে কেমন অপরাধী মনে করল। বলল, আমি না জেনেই তোমার দ্বারে আঘাত দিয়েছি মাধবী!

আনন্দের কথা শুনে মনটা আমার অসহ্য আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মনে মনে বললাম, তুমি ঠাকুর আমার মনের কপাটে ঘা দিয়েছ, তাই দ্বার খুলে গেছে। কোনদিকে না ভেবে হঠাৎ আমি এক কাণ্ড করে বসলাম। আনন্দকে ডাক দিয়ে নিয়ে গেলাম মন্দিরের ভেতরে।

তারপর মাধবের জন্যে তুলে রাখা আবিরে রাঙিয়ে দিলাম আনন্দের দুটি পা। অশোকফুলে গাঁথা মালাটি তার পায়ের ওপরেই রেখে দিলাম। ইচ্ছে করছিল গলায় পরিয়ে দিই কিন্তু পারলাম না। তারপর প্রদীপ জ্বেলে আমার আনন্দ মাধবকে আরতি করলাম।

আনন্দ মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথাই সে বলতে পারল না।

একসময় আনন্দ বলল, আসি মাধবী।

উত্তেজনায় ও কাঁপছিল। কিছু বলতে পারলাম না। দুটি চোখ মেলে শুধু তাকিয়ে রইলাম।

ধীরে ধীরে আবির-রাঙা পায়ের চিহ্ন এঁকে ও বেরিয়ে গেল।

কেন এলো, কেনই বা কারও সঙ্গে দেখা না করে চলে গেল তা বুঝতে পারলাম না। কয়েকটি মুহূর্তে যা ঘটে গেল তারই উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম।

আশ্রম ছেড়ে পথে নামল ও। একবার ফিরে তাকাল আমার দিকে। সে চোখের চাওয়ায় কি লেখা ছিল তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না তবে এটুকু বুঝলাম, আমার মনের ঢেউ তার মনের কূল ছুঁয়েছে। ও চলে গেল। আমি মন্দির ঢুকে আবার দ্বার বন্ধ করলাম। মাধবের শূন্য আসনের তলায় কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

এ আমি কি করলাম ঠাকুর! তোমার মালা আমি আজ কার হাতে তুলে দিলাম! তোমার আবিরে আজ রাঙিয়ে দিলাম কার চরণ!

কতক্ষণ কাঁদলাম। তারপর একসময়ে মনে হল ঐ শূন্য আসন থেকে মাধব উঠে এসে আমার মনে আনন্দের মূর্তি ধরে বসেছেন।

বাবার শেখানো গানের দুটি পদ অমনি আমার গলায় এসে গেল।

> ‘কি কহব রে সখী আনন্দ ওর—
> চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।’

আমি গাইতে লাগলাম। গাইতে গাইতে প্রাণের আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

দোল উৎসবের শেষে ওরা কখন আশ্রমে ফিরে এসেছে তা জানতে পারিনি। দাদু কতক্ষণ মাধবকে নিয়ে আমায় ডাকছেন। একসময় দাদুর ডাকে চমকে উঠলাম—দরজা খুললাম। চোখে আমার তখনও জলের ধারা। দাদুর গলা আবেগে কাঁপছিল, রাধার এত মান। দেখ দেখ আমি কাকে ফিরিয়ে এনেছি তোমার কাছে।

মাধবকে আবার বরণ করলাম। সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ হল, কিন্তু মন আমার আনন্দের প্রতীক্ষায় ঐ খোলা মাঠের দিকে চেয়ে রইল।

বসন্তের বনে বনে ফুটল শাল, পলাশ আর কুড়চির ফুল। আকাশ থেকে নামল ধবল জ্যোৎস্না। মহুয়ার মধু খেয়ে আদিবাসী মেয়েরা শুরু করল ‘বাহা’ উৎসব। ফুলের সাজে কালো দেহে জ্বালল লাল আগুনের শিখা। পথে পথে ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি ফুলের পাপড়ি। আমি তাকিয়ে রইলাম। তার আসার পথ চেয়ে। তারপর শাখা থেকে খেসে খসে পড়ল ফুল। শেষ হল বসন্তের খেলা। খর গ্রীষ্মের আগুন জ্বলল এবার। তার সঙ্গে জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল আর একটি মন।

নামল বর্ষা। অঝোর ধারায় কাঁদল আকাশ, কাঁদল আমার মন। চোখের জলে ঝাপসা হল আমার জগৎ। কংসাবতীর বান ডাকল বুকের মধ্যে।

শরতে সব কিছু আবার শান্ত হল। আমার এই ঘরের বাইরে থেকে শিউলিফুলের গন্ধ পেলাম। মনে হল কার যেন ডাক এল। ডাক এলো সত্যি। যা ভাবতেও পারিনি তাই হল। বিষ্ণুপুরের রানীমা লোক পাঠিয়েছেন আমাদের আশ্রমে। বিজয়ার বিসর্জনের শেষে মাথুর গাইতে হবে।

থামল মাধবী। যতক্ষণ সে কথা বলছিল অমৃত তাকিয়ে ছিল তার দিকে। কি এত উত্তেজনায় জীবনের পাতাগুলো মাধবী এক এক করে মেলে যাচ্ছে তার সামনে। কতদিনের কতটুকুই বা পরিচয় তার সঙ্গে মাধবীর, তবু জীবনকে সে কোথাও প্রচ্ছন্ন রাখতে চায় না। আজ নতুন করে যে মানুষ তার মনের অধিকার চাইছে, তাকে সে বঞ্চনা করতে পারবে না। মনের সব কটি গোপন দ্বারই সে খুলে দেবে তার সামনে। কতক্ষণ চুপ করে বসে থেকে মাধবী বলল, জানতাম না যে বিষ্ণুপুরে গেল তার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।

দাদুর সঙ্গে গেলাম বিষ্ণুপুর। বাবা আশ্রমে ছিলেন না। পুরীর মহারাজ হাতি পাঠিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুনেছিলাম বিষ্ণুপুরের রাজপরিবার বৈষ্ণব। বীর হাম্বিরের রাসমঞ্চ দেখব, আর দেখব মদনমোহন, শ্যামরায়ের মন্দির। কতদিন শুনেছি এসব জায়গার কথা। মনে মনে কত ছবি এঁকেছি। আশায় আনন্দে মন আমার কাঁপতে লাগল। এক সন্ধ্যায় পৌছলাম বিষ্ণুপুর রাজবাড়িতে। রাজা কিছুকাল আগে গত হয়েছিলেন, তাই এখন রানীর ওপরই সব ভার পড়েছিল। দাসী এসে আমাকে ভেতরে রানীমার কাছে নিয়ে গেল, দাদু বাইরে রইলেন। অন্দরমহলে গিয়ে যাঁকে দেখলাম কোনদিন ভাবিনি তিনি এমনি করে আমাকে দেখা দেবেন। একটি পালঙ্কের ওপর বসেছিলেন আনন্দের মা। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি পালঙ্ক থেকে নেমে এসে আমার হাত ধরে বললেন, এসো মা।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। তিনি আমাকে কতক্ষণ বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে রইলেন। আমি কাঁদলাম। কেন কাঁদলাম আজ তা আর মনে এই। হয়ত হারান মায়ের মুখ মনে নেই, নয়তো আমার রূপকথার রাজপুত্রকে আবার দেখতে পাব বলে।

নির্দিষ্ট দিনে মাথুর গাইলাম। আজকাল আসরে আমি নিজেই যেমন ব্যাখ্যা করি তখন তা করতাম না। দাদু কিংবা বাবা কথকতার ভার নিতেন, গানের পালা এলে আমি গাইতাম। কেবল আখর যোগ করে গানের পদকে কখনো বাড়াতাম।

খুব আড়ম্বর করে আসরটি সাজান হয়েছিল। মাধার ওপরে কত ফুল লতাপাতার কাজ করা শামিয়ানা। ঝাড়ের আলো সেই আমি প্রথম দেখলাম। কত রঙবেরঙের আলোর ঝিলিক দিচ্ছিল। একধারে রূপোর রেলিঙ ঘেরা জায়গায় ফরাশের ওপর বসেছিলেন রাজবাড়ির আত্মীয়স্বজনেরা। তার দু'পাশে বিষ্ণুপুর ভেঙে পড়েছিল। দক্ষিণের দালানের সামনে চিক ফেলা। তার ভেতরে মেয়েরা বসে আছেন। লম্বা লম্বা বাঁশের খুঁটিগুলো ফুল দিয়ে সাজানো। তার মাঝে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির ছবি।

এত আলো, এত আয়োজন, কিন্তু আমার আনন্দ কই! মুখে মুখে শুনেছিলাম, কলকাতা থেকে আজ তার আসার কথা। কই তাকে তো দেখছি না। আমার সব আনন্দ সব আশা যে ম্লান হয়ে গেল। এত সাজ এত সজ্জা সব নিষ্ফল বলে মনে হল। দাদু বলে চলেছেন, মথুরায় রাজা হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ মুরারি। দুখিনী রাধার কথা কি আর তাঁর মনে পড়ে। বৃন্দাবনে তেমনি সাজান রয়েছে কুঞ্জ। গোচারণে চরে বেড়াচ্ছে ধেনু। যমুনা বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সব থেকেও কিছু নেই। চোখ আছে তাই জগতের সব আলো, সব রূপ দেখতে পাচ্ছি। চোখ বুজলে আর তো কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার দুটি নয়নের তারা। তারাহারা হয়ে কেমন করে তিনি বৃন্দাবনকে দেখবেন। তাই বৃন্দাবন অন্ধকার। শ্রীমতীর সব থেকেও কিছু নেই আজ।

এ কার কথা বলে চলেছেন দাদু। এ যে আমারই মনের কথা। আনন্দ ছবি আঁকত, তার সেই পরিচয়টুকু আমার কাছে সব ছিল, কিন্তু বিষ্ণুপুরে এসে বারবার মনে হল আনন্দ রাজার ছেলে। মনে মনে কাঁদলাম। শ্রীমতী যেমন করে কেঁদেছিলেন। ব্রজেব বাঁশুরিয়াকে তিনি চিনতেন। সেই বাঁশুরিয়ার সঙ্গে ছিল তাঁর মনের যোগ। মথুরার রাজাকে তো তিনি চেনেন না। তাঁর নাগাল কেমন করে পাবেন

তিনি। রাধা তাই কাঁদছেন, তার সঙ্গে কাঁদছি আমি গান গাইতে গাইতে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছি। আনন্দ রাজার ছেলে, তাতে এ জগতে কার কি ক্ষতি। তবু কাঁদছি আমি। কি এক অভিমানে কাঁপছে আমার গলা। বিষ্ণুপুর বৃন্দাবন হয়ে গেছে। কংসাবতী হয়ে গেছে যমুনা। শ্রীমতীর কান্না আমার বুক জুড়ে।

মাথুর পালা শেষ হল। আমাকে ঘিরে গানের কত সুখ্যাতি করতে লাগল লোকে। বিষ্ণুপুরবাসীরা বললেন, স্বয়ং রাধাঠাকুরানী নইলে এমন ভাবের ভাবী হয় নাকি!

গানের শেষে অন্দর থেকে ডাক এল। রানীমা ডাকছেন। দাদুর সঙ্গে আমি গেলাম। মেয়েরা একে একে দাদুকে নমস্কার করলেন। আমার চিবুক ধরে তুলে আনন্দের মা বললেন, মা আমার স্বয়ং রাধাঠাকুরানী। মায়ের মধ্যে রাধা লীলা করছেন।

মাধবী একটু থামল। তারপর বলতে লাগল, আনন্দকে আমি পালাগানের আসরে দেখতে পাইনি। কিন্তু সে সেদিন সেখানেই ছিল। আর এঁকেছিল আমারই একখানা ছবি।

মাধবী একটি ছবি বের করল। কপালে হাত রেখে বসে আছে মাধবী। চোখে জল। ঠিক যেন বিরহিণী শ্রীরাধা। কদম্বের ফুল ফুটেছে। আকাশের কালো একখণ্ড মেঘ।

মাথুরের ছবি এঁকেছে আনন্দ। হঠাৎ অমৃতের মনে একটা প্রশ্ন এলো। সে অমনি বলল, আচ্ছা মাধবী, আনন্দ তোমাকে নিয়ে কতবার কত ছবিই তো এঁকেছে, কিন্তু তার সব কটি তোমার সঞ্চয়ে এলো কী করে?

সেই কথাতেই এবার আমাকে ফিরে আসতে হবে অমৃত।

বিষ্ণুপুরে কয়েকটা দিন কেটে গেল। আনন্দ আমি আর দাদু বিষ্ণুপুরের চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। মনে হল আনন্দের সঙ্গে স্বপ্নের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একদিন ফিরে আসতে হল আশ্রমে। আনন্দময় তখন আমার মন। দুটি দিন যেতে না যেতেই লোক এলো বিষ্ণুপুর থেকে। রানীমা দাদুর কাছে গোপন চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠি পড়ে দাদু আমাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

বললেন, আচ্ছা দিদিভাই, তুই কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসিস?

বড় সংকটে পড়লাম। দাদু, বাবা কাউকেই কম ভালবাসিনে আমি। তারপর আমার মনের গোপনে নতুন যে মানুষটি এসেছে তাকে তো মনপ্রাণ সঁপে দিয়েই বসে আছি।

দাদু বললেন, বল দিদি, সত্য করে বল আমাকে।

মিথ্যা বলি কি করে। কিন্তু মুখে যে তার নাম একেবারেই আনা যায় না। চোখ পড়ল মন্দিরের দিকে। রক্ষা করলেন মাধব। বললাম, আনন্দ মাধব আমার সবচেয়ে প্রিয় দাদু।

দাদু খুশি হলেন। বললেন, আচ্ছা দিদি, মীরা তাঁর গিরিধারী গোপালকে কি রূপে দেখতেন?

বললাম, স্বামীরূপে।

দাদু হেসে বললেন, আমি যদি এমনি মাধবের সঙ্গে তোর বিয়ে দিই!

বুকটা কেঁপে উঠল। এ কথার ইঙ্গিত আমার কাছে স্পষ্ট না হলেও কিছু একটা যে ঘটতে চলেছে তা আমি অনুমান করলাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে দাদু বললেন, চুপ করে রইলি কেন দিদিভাই, আমি রাজার ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।

আনন্দে চোখ ভরে জল এলো। এবার মনে হল সমস্ত ঘটনাটি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে।

দাদু মাথায় হাত রেখে বললেন, সুখী হবি দিদি, শান্তি পাবি মনে। তারপর যেন আপনমনেই বলে গেলেন, সংসার ছেড়ে তাঁর খোঁজ পাওয়া বড় কষ্টের দিদি, সংসারে থেকে চিনতে জানলে তাঁকে সহজে বাঁধা যায়।

এবার মুখ তুলেই বললাম, রাজবাড়ি থেকে লোকটি কেন এসেছে দাদু?

সেই কথাই তো বলছি দিদি, দাদু বললেন, আনন্দকে তোর কেমন লাগে দিদিভাই?

কথার কোন উত্তর মুখে এল না। শুধু রাঙা হল আমার মুখ, রাঙা হল অন্তর।

দাদু হেসে বললেন, মাধবের আবির লেগেছে আমার দিদিভাইয়ের মুখে। কেমন করে তাকে গোপন করবে রাই।

বললাম, আমাকে আশ্রম থেকে সরিয়ে দিলে আমিও তোমার একতারাটা নিয়ে পালাব কিন্তু।

দাদুর চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল। বললেন, তুই চলে গেলে এ বুড়োর যে আর কিছুই রইবে না দিদি।

তবে কেন তুমি আমাকে পাঠাতে চাইছ?

আমি বেঁধে রাখতে চাইলেই কি রাখতে পারব। মাধব যে টান দিচ্ছে ওপার থেকে দিদি।

খানিক সময় কি ভাবলেন। তারপর আপনমনেই বললেন, দীনদাস আমাকে সমস্যার ভেতর ফেলে দিয়ে গেল। রানীমার ইচ্ছে সামনের অগ্রহায়ণেই আনন্দের বিয়ে দেন। এখন আমি কি করি দিদি! দীনদাসের ফিরে আসতে সেই পৌষের শেষ। কিন্তু এ সম্বন্ধ হাতছাড়া করতে প্রাণ যে চায় না।

আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে দাদু বললেন, যা মাধবের ইচ্ছে তাই হবে। দীনদাসেরও ইচ্ছে ছিল তোকে সংসারী দেখতে দিদি। সবার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।

বাবা আসবার আগেই বিয়ের ব্যবস্থা হল। দাদু আশ্রমের গুরু। তাই বাবার ওপরেও চলত তাঁর কথা।

বিয়ের ব্যবস্থা চলতে লাগল আশ্রমে। বিষ্ণুপুরের রাজাদের প্রতিপত্তি নিভে এসেছিল, কিন্তু খ্যাতি ছিল এ অঞ্চলে। তাই সমারোহ করে হাতির পিঠে চেপে, রোশনাই জ্বালিয়ে, বাদ্যি বাজিয়ে বরযাত্রীরা আমাদের এই আশ্রমে।

দাদুও ফুলে পাতায় মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন আশ্রম। আমার মনে এলো এক নতুন অনুভূতি। যাকে মনে মনে বরণ করেছিলাম সে আজ চিরদিনের করে আমায় ঘরে তুলে নিতে এসেছে। এ আনন্দের ভার যেন আমি আর বইতে পারছিলাম না।

হলুদছোপানো শাড়িখানা পরে, হাতে রুপোর কাজললতাখানা নিয়ে বসেছিলাম, হঠাৎ আশ্রমের ঝি ঝুমরী এসে বললে, বাবা এসেছে।

আনন্দে মন নেচে উঠল। কিন্তু বাবাকে দেখতে পেলাম না। কি হল, বাবা আমার কাছে আসছেন না কেন! বাবা কি রাগ করেছেন! কত কথা মনে এল।

একসময় ঝুমরী এসে খবর দিলে, বরযাত্রীরা নাকি দলে দলে ফিরে যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে কি সব কথা হয়েছে তাদের। মুহূর্তে কোথা দিয়ে যেন এক বিপর্যয় ঘটে গেল। ঘুরতে লাগল চারদিক। নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ পরে চোখ মেলে দেখি বাবার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। দাদু একটা পাখা নিয়ে বাতাস করছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাধবী বলল, সব ফুরিয়ে গেল অমৃত। আমার আনন্দ চিরদিনের মতো সরে গেল আমার কাছ থেকে।

কেন এমন হল মাধবী? অমৃতের গলায় সহানুভূতির সুর।

উদাস হল মাধবী — আজও তা আমার কাছে রহস্য হয়ে আছে অমৃত। এখনও আমি জানতে পারিনি কেন এমন হল। আর চেষ্টাও করিনি কোনদিন।

আনন্দ আর কোন খবর পাঠায়নি তোমার কাছে?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মাধবী মাটির মেঝের ওপর ছড়ানো পটগুলো দেখিয়ে বলল, এইগুলো পাঠিয়েছিল সে। আমাকে নিয়ে যে ক'টি ছবি সে এঁকেছিল তার সবকটিই পাঠিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে দিয়েছিল একটুকরো চিঠি। তাতে শুধু লেখা ছিল — 'দুর্গম হিমালয়ে চললাম। সেখানে পথ চলতে চলতে শান্তি খুঁজে পাব হয়তো। তুমি দুঃখ পেও না। বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও মিলনই সম্ভব নয়।'

মাধবী থামল। সারা ঘরে একটা চাপা বেদনা গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।

অমৃত বলল, না বুঝে তোমার মনে কতদিন আঘাত দিয়েছি মাধবী, ক্ষমা কর আমাকে।

এ কথা কেন অমৃত?

অমৃত কতক্ষণ তাকিয়ে রইল মাধবীর দিকে। তারপর বলল, যে ক্ষত তোমার মন থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল তাকে আমি বারবার আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করেছি। তাই আজ আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। নিজেকে আজ বড় অপরাধী মনে হচ্ছে মাধবী।

অমৃতের কথাগুলো বসে শুনল মাধবী। তারপর বলল, অপরাধ আমারই অমৃত। বার বার আমাকে আমি ডাক দিয়ে এনেছি আমার মনের কাছে, আবার ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কোনদিন খুলিনি আমার মনের দরজা।

আজ ভাবছি প্রেমে প্রতারণার ঠাঁই নেই অমৃত। তাই তোমাকে আমার সবকিছু সঁপে দেওয়ার আগে আমার অতীতের সব ছবি মেলে ধরতে চাই। তুমি আমাকে সত্য করে চিনে নাও। এর পরেও যদি আমাকে তোমার জীবনের সঙ্গে জড়াতে চাও তাহলে আর বাধা দেবার শক্তি থাকবে না আমার।

কোন কথা বলতে পারল না অমৃত। পটে-আঁকা ছবির মত সে শুধু বসে রইল। জয়দেবের একটি পুঁথির লোভেই একদিন সে এসেছিল এ আশ্রমে। আজ প্রায় একটি বছর হতে চলল, কিসের আশায় সে থেকে গেল এই জনহীন প্রান্তরের প্রান্তে! শুধু কি পুঁথির আকর্ষণ না আর কিছু?

অমৃত কুড়িয়ে নিতে পারল না ফুলটিকে। যে ফুল একদিন নিবেদিত হয়েছিল কোথাও, তাকে কুড়িয়ে নিতে গেলে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কাঁটার আঘাত লাগে। যতদিন মাধবীর অতীত গোপন ছিল তার কাছে, সে মনেপ্রাণে কামনা করে গেছে মাধবীকে। কিন্তু আজ তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আর একটি মানুষ, যে আড়ালে থেকে নিঃশব্দে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে। তার দুটো আকাঙক্ষায় অনির্বাণ চোখকে সে ভুলবে কি করে!

আজ মাধবী তার অনেক কাছে সরে এসেছে, অমৃত হাত বাড়ালেই তাকে পেতে পারবে নাগালের ভেতর। কিন্তু তবু সে তাকে নেবে কি করে? অতীত স্মৃতির একটা অভিশাপ কি সারাক্ষণ জেগে রইবে না তাদের ভালবাসার মাঝখানে? ভাললাগার মধুতে যখন কানায় কানায় ভরে উঠবে তাদের মন, তখন মাধবীর অতীত স্মৃতির মধুকর এসে তাকে নিঃশেষে পান করে নেবে। কি হবে তাহলে এ মধু সঞ্চয় করে?

ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল অমৃতের মন। মাধবীর কাছ থেকে বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলেও অবুঝ মনকে তার আকর্ষণ থেকে মুক্ত করবে সে কি করে? ষড়ঋতুর সুখদুঃখ ভোগ করেছে তারা একসঙ্গে। একটি বছরের অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছে যে মন, মুক্তির টানে কি তাকে মুহূর্তে মুক্ত করে নেওয়া যায়।

অমৃত বসে রইল। কোন কথাই সে আজ বলতে পারল না মাধবীকে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠল। আশ্রমে সন্ধ্যারতির সব আয়োজন করতে হবে মাধবীকে। ঝুমরী এসে ডাক দিয়ে গেল। অমৃত উঠে গেল নিজের ঘরে। মাধবী চলল সন্ধ্যার দীপ জ্বালাতে। কোন কথাই আর বলতে পারল না কেউ। তুলসীতলায় জ্বলল প্রথম প্রদীপ, তার থেকে জ্বলল আর এক দীপ। সে শিখা কাঁপতে কাঁপতে চলল মাধবের মন্দিরের দিকে।

হাট থেকে ফিরে এলেন আচার্য দীনদাস। সঙ্গে এক বৈষ্ণবী। নামাবলী গায়ে জড়ান। অতিথিশালায় বসে অমৃত দেখল তাঁদের। মহিলাটি দীনদাসের পেছন পেছন গিয়ে ঢুকলেন আশ্রমের একেবারে ভেতরে।

সে রাতে অমৃতের সঙ্গে দেখা হল না মাধবীর। ভোরবেলা উঠেই অমৃত চলে গেল কাজে। এখানে থাকার সময় তার ফুরিয়ে এসেছে। ডঃ সেন ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে। চিঠি এসেছে, যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে তাই নিয়েই অমৃত যেন চলে আসে। অমৃত লিখেছিল, ধর্মমঙ্গলের কয়েকখানা প্রাচীন পুঁথির সে সন্ধান পেয়েছে। আর একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের কথাও সে লিখেছিল। সেখানে নিয়ে যেতে পারলে প্রাচীন সংগ্রহশালায় স্মরণীয় একটি উপহার সে দিতে পারবে। পুঁথিখানি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের নকল। সদাশিববাবুর বাড়িতে যেদিন প্রথম অমৃত মাধবীকে দেখল, তার মুখে শুনল

পূর্বরাগের গান, সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল ঠিক, কিন্তু তার চেয়েও অবাক হয়েছিল যখন শুনল আচার্য দীনদাস জয়দেবের যে পুঁথিখানা তাঁর আশ্রমের মন্দিরে রেখেছেন তা জয়দেবের দেহাবসানের দু'একশ বছর ব্যবধানের অনুলিপি।

সেই সূত্র ধরে অমৃত একদিন এসেছিল এই আশ্রমে। কিন্তু গীত-গোবিন্দখানা তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হল না? এই গ্রন্থখানা থাকে মাধবের মূর্তির ঠিক নিচেই। রোজ মাধবের সঙ্গে গ্রন্থখানিরও পুজো হয়। নিত্য সন্ধ্যারতির শেষে অন্ধ দীনদাসকে এই গীতগোবিন্দ থেকে কয়েক ছত্র গান করে শোনাতে হয় মাধবীকে। গ্রন্থখানি জীর্ণ, কিন্তু সেই গ্রন্থখানি সামনে রেখে মাধবী গান করে যায়। কেমন করে অমৃত নেবে সেই দুর্লভ গ্রন্থ? কতদিন সে মাধবীর কাছাকাছি এসেছে এই গ্রন্থখানি পাবার লোভে, কিন্তু ফিরে যেতে হয়েছে তাকে। মাধবীর প্রেমে তপস্যার আগুন জ্বলছে। সেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনার ছদ্মবেশ নিয়ে গেলেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে। তাই কতবার চেষ্টা করতে গিয়েও ফিরে এসেছে অমৃত। এখন আর তার গীতগোবিন্দের জন্যে কামনা নেই। শুধু একটি মনের মধুতে ভৃঙ্গ হয়ে ওড়ার সাধ ছিল তার। মাধবী বার বার তাকে ফিরিয়েছে। কিন্তু আজ নিজেই এসেছে ধরা দিতে।

অতীতের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার বর্তমানকে আজ মাধবী তুলে দিতে চেয়েছে অমৃতের হাতে। কিন্তু কি করে গ্রহণ করবে অমৃত সেই দান! অতীত স্মৃতির জ্বালায় মাধবী যেদিন ক্ষতবিক্ষত হবে সেদিন তার পাশে দাঁড়িয়ে অমৃত শুধু অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকবে। প্রেমের অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পারবে না সে বোঝাপড়া করতে। সেদিন শুধু শূন্য হয়ে যাবে তার বুকখানা। কারো কাছে সে জানাতে পারবে না প্রতিবাদ। সে সব জেনেও বুকে তুলে নিয়েছে তার আঘাত।

আশ্রমের একদিকে একটি বড় উঠোন। ঝকঝক তকতক করছে। মালতী, টগর, চাঁপা, কদম্ব, কত গাছ, কত রকমের ফুল। তার মাঝে একটি কদম্বের তলায় বাঁধান বেদি। ওপরে সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপ।

দীনদাস রোজ সন্ধ্যায় আরতির শেষে এই বাঁধান বেদির ওপর এসে বসেন। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অন্ধ চোখের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পৌঁছয় প্রাণের এক অদৃশ্য আকুলতা।

দীনদাস বলেন, অন্ধ হয়েছি বলে কোনও দুঃখ নেই মা আমার। মানুষের দৃষ্টি কতটুকুই বা। আমাদের এই চোখে দেখার পরেই তো অদেখার রাজত্ব। সেখানে রাজার রাজা বসে থাকেন। চোখে যখন দেখা যেত, তখন মনে ছিল গর্ব, অনেক দূরের জিনিস আমি দেখতে পাই। কিন্তু হায়, সেদিন যে কিছুই দেখতে পাইনি, আজ তা কিছু কিছু বুঝতে পারি। আমার রাখালরাজ আমার চোখ দুটিকে সবার থেকে সরিয়ে নিয়ে তাঁর দুটি চরণে ধরে রেখেছেন।

মাধবী এসময় দাঁড়িয়ে থাকে দীনদাসের কাছে। হাত বুলিয়ে দেয় গায়ে মাথায়। এই সন্ধ্যাটুকু তার কাছে বড় আকর্ষণের। সে নীরব হয়ে শোনে দীনদাসের হৃদয় থেকে ঝরে পড়া কথাগুলো।

আজও দীনদাস বসেছেন সেই কদম্বের তলায় বাঁধান বেদির ওপর। নিচে পরিষ্কার উঠোনে চাটাই পাতা। চাটাই-এর ওপর তাঁর ঠিক পায়ে। কাছে বসে ছিলেন বৈষ্ণবী।

মাধবী রোজকার মতো দাঁড়িয়ে ছিল দীনদাসের পাশে। সাঁঝের আকাশ নীলকান্তমণির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। অগুনতি তারা-ফুল ফুটে উঠল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় গন্ধ ছড়াতে লাগল নানা রকমের ফুল।

দীনদাস কথা শুরু করলেন—আজ তোমাকে একটা কাহিনী শোনাতে চাই মা। কতদিন বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ সময় এসেছে। বড় আশ্চর্য এ কাহিনী মা। বৈষ্ণবীকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি আজ পাশে রয়েছেন। আমার না-বলা অনেক কথাই উনি নিজে তোমাকে শোনাতে পারবেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ তুলে বললেন, কই অমৃত কই? একবার ডাক তো মা তাকে। তারও থাকা চাই, সব কিছু শোনা চাই তার। গোপনীয়তা পাপ। প্রকাশই সত্য।

মাধবী চলল অমৃতকে ডেকে আনতে। কি সত্য আজ প্রকাশ করতে চান দীনদাস! মাধবী ভেবে কোনও কিনারাই পেল না। সে এসে দাঁড়াল অতিথিশালায় অমৃতের ঘরে জানালার ধারে।

একটি আলোর সামনে বসে অমৃত কতকগুলো সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি নিয়ে পাঠোদ্ধার করছিল। মাধবীর পায়ের সাড়া পেল না সে। অমৃতের ধ্যানের মূর্তিখানা দেখল মাধবী।

কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। চাঁদের আলো এসে পড়েছিল অমৃতের ঘরের সামনে গন্ধরাজ গাছটার ওপর। ফুল ফুটিয়েছে গন্ধরাজ। একটি সাদা ফুল তুলে মাধবী খোঁপায় গুঁজে নিল। কি ভেবে খোঁপা থেকে সেই ফুলটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ল অমৃতকে লক্ষ্য করে। চেতনা ফিরে এলো অমৃতের। মাধবী ততক্ষণে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়? অমৃত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। অতিথিশালায় সন্ধ্যার পর সে মাধবীকে এমনভাবে কোনদিন আসতে দেখেনি।

কথা নয় অমৃত, শুধু আমার সঙ্গে এসো। বাবা তোমার সামনে কিছু বলতে চান।

মাধবীর ভেতর প্রবল আকর্ষণী শক্তির সঙ্গে সমাহিত এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিল, যা অমৃতকে অভিভূত করত।

কোন কথা না বলে অমৃত মাধবীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলল। অতিথিশালা থেকে উদ্যানবাটিকার মাঝের পথটুকু নানাধরনের আশ্রম-তরু তাদের শাখাপল্লবের দ্বারা ছায়াস্নিগ্ধ করে রেখেছিল। চাঁদের আলো গাছপালার পত্রান্তরালের ভেতর দিয়ে পথের ওপর পড়ে কেমন এক আলোআঁধারি রহস্যময়তার সৃষ্টি করেছিল।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল মাধবী। থামল অমৃত।

অমৃত, তুমি আমাকে ভালবাস?

এ কথা কেন মাধবী!

একটিবার শুধু তোমার মুখ থেকে অতি পুরাতন এই কটি অক্ষর শুনতে চাই।

ভালবাসি মাধবী।

আর একবার উচ্চারণ কর অমৃত। দেখছ না স্তব্ধ হয়ে শুনছে তোমার চারদিকে তরুলতা, আলো অন্ধার। অধীর আগ্রহে ওরা কান পেতে আছে তোমার প্রেমের মন্ত্রোচ্চারণ শুনবে বলে।

আজ এত উতলা কেন মাধবী! অমৃতের গলায় বিস্ময়ের সুর।

পথ ফুরিয়ে এসেছে অমৃত, দোহাই তোমার প্রশ্ন নয়। শুধু হাতে হাত রেখে একটিবার বল, মাধবী এই দেখ আমি প্রেমের পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরেছি, শুধু তোমাকে প্রদক্ষিণ করবে বলে আমার হৃদয়ের শিখাগুলি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।

অমৃত বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল. কোনও কথাই বলতে পারল না সে, শুধু মন্ত্রচালিতের মতো বাড়িয়ে দিল তার হাতখানা মাধবীর দিকে। সে এই প্রথম স্পর্শ করল এমন একখানি হাত, যার তরঙ্গ সে অনুভব করল আপন হৃদয়সমুদ্রে।

মাধবী তার সেই হাতখানা নিয়ে মাথায় ঠেকাল। তারপর যেন সহসা সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, চলো অমৃত, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে।

যেতে যেতে অমৃত ভাবল, কখনো কখনো এমন মুহূর্ত আসে, যখন অতি সাবধানী দুর্গরক্ষীও আপন দুর্গের অর্গল মুক্ত করে দিয়ে বাইরের জগৎকে আহ্বান জানায়। শত্রু মিত্র তখন একাকার হয়ে যায়। মাধবীর এ লীলার খেলা সত্যই আজ তাকে বিস্মিত করে দিল।

কিন্তু এর চেয়েও বড় একটি বিস্ময় তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, যে বিস্ময়ের দ্বার খুলে দিলেন দীনদাস গোস্বামী আর বৈষ্ণবী মা।

অমৃত আর মাধবী এলো দীনদাসের বেদির সামনে। বৈষ্ণবী মা তাদের কাছে টেনে এনে বসালেন। এমন স্নেহময়ী নারীর সাহচর্য মা ছাড়া জীবনে আর অমৃত কোনখানেই পায়নি। এ'কদিন তাঁর কাছে থেকে অমৃত এক নতুন আস্বাদ উপলব্ধি করেছিল।

তারা বসল পাশাপাশি। দীনদাস অন্ধ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজলেন। তারপর তাঁর মুখভাবের পরিবর্তন ঘটল। কি এক প্রশান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। বৈষ্ণবী মার দিকে ফিরে বললেন, হিরণ্ময় আবরণে যে সত্যের মুখ ঢাকা রয়েছে তাকে অনাবৃত কর আজ। সন্তান বলে সংকোচ কর না, তাহলে সত্যের যথার্থ প্রকাশ হবে না।

ধীরে ধীরে বললেন বৈষ্ণবী— আজ একটা কাহিনী শোনাব তোমাদের। অনেকদিন ভেবেছি এ কাহিনী নিয়ে, কিন্তু কাউকে শোনাতে পারিনি। তবু আজ শোনাতে হবে। একদিকে আমার গুরুর আদেশ অন্যদিকে আমার মনের তাড়না।

মাধবীর দিকে ফিরে বললেন বৈষ্ণবী — সংসার তোমাকে একদিন করতে হবে মা। তাই সংসারে ঢোকার আগে নিজেকে যতদূর সম্ভব চিনে নাও। এ কাহিনীর ভেতর দিয়ে জানতে পারবে নিজেকে, আর জানবে সত্যের ঠিক ঠিক পরিচয়। অমৃতের দিকে ফিরে বললেন, অমৃত আমার সন্তান। বৈষ্ণবীর চোখে সকলেই বালগোপাল। কুণ্ঠা নেই, আমার আজ কোনও বাধা নেই বাবা।

কথাগুলো বলে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে গেলেন বৈষ্ণবী। মনে হল ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করেছেন। কতক্ষণ পরে যখন মাটির থেকে চোখ তুলে তাকালেন, তখন মনে হল বৈষ্ণবী যেন অন্য কোনও নারী। সুদূর অতীত থেকে এইমাত্র উঠে এলেন তিনি।

বিষ্ণুর লীলাভূমি বিষ্ণুপুর। মন্দিরে মন্দিরে শ্যামরায়ের বিচিত্র লীলার ছবি খোদাই করে রেখেছে চিত্রকরেরা। ভক্তজন সংকীর্তনে বিষ্ণুবন্দনা করেন। প্রদক্ষিণ করেন রাসমঞ্চ।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ এই প্রাচীন বিষ্ণুভূমি।

তবু প্রদীপের তলার অন্ধকারের মতো এই আনন্দময় বিষ্ণুপুরের একপ্রান্তে ছিল পথহারা নারীদের দেহব্যবসায়ের এক আস্তানা।

স্থানটা ছিল শহরের উপান্তে, কিন্তু রাত্রিকালে তার জলুস ছিল সবচেয়ে বেশি। বেলোয়ারী লণ্ঠন জ্বলত। শোনা যেত বিষ্ণুপুর ঘরানার গান। দিনের আলোয় যে সব গণ্যমান্য সমাজপতিরা দূর থেকে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে ঐ জায়গাটাকে এড়িয়ে চলতেন, তাঁরা রাতের অন্ধকারে হতেন সে অঞ্চলের অতিথি। মানুষের বহু অপূর্ণ কামনা, তার বাইরের খ্যাতি পোশাকটাকে খুলে সেখানে পথ খুঁজি ফিরত।

সেই রূপনগরের সবেচেয়ে সেরা আকর্ষণের বস্তু ছিল চম্পাবতী। অঙ্গে অঙ্গে তার নদী কংসাবতীর যৌবন-জোয়ার। সে জোয়ারে ভেসে আসত বণিক ব্যবসায়ী, রাজা মহারাজার বজরা। হাসি, গান, গল্প, আপ্যায়নে তার জুড়ি ছিল না সে অঞ্চলে।

এত মোহময়ী হয়েও কিন্তু চম্পাবতী মনে মনে ছিল বড় নিঃসঙ্গ। সারারাতের ক্লান্তির শেষে সে স্নান করে এসে বসত পুজোর আসনে। জয়পুরের পাথরের সে গড়িয়েছিল শ্যামরায়ের এক বিগ্রহ। সেই বিগ্রহের সঙ্গে সে সুখদুঃখের কথা বলত। এমনি করে চেষ্টা করত রাতের গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেলতে।

একদিন চম্পাবতী ভোরে গেল কংসাবতীর জলে স্নান করতে। স্নানশেষে সে যখন তীরে উঠছিল, তখন তার চোখে পড়ল কিছু দূরে এক সৌম্যদর্শন যুবক পূর্ব দিকে তাকিয়ে দিবাকরকে প্রণতি জানাচ্ছেন। ধীরে ধীরে সুর বেজে উঠল তাঁর কণ্ঠে।

সে তো সুর নয়, প্রাণের এক আশ্চর্য আকুলতা। ভোরের আকাশ প্রার্থনায় ভরে গেল। চম্পাবতীর ভেতর কি এক পরিবর্তন ঘটল। সে এগিয়ে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে সেই পুরুষকে প্রণাম করল।

কিন্তু পাপী বলে বুঝি সেই সৌম্য পুরুষের চরণ ছুঁতে পারল না। তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চম্পাবতীর দিকে তাকিয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল চম্পাবতী—পাপী আমি, আপনার চরণ স্পর্শ করার অধিকার আমার নেই।

তিনি মৃদু হেসে পুবের আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, সব অন্ধকার যিনি দূর করেন, তাঁর রাজ্যে পাপ বলে কিছু নেই। পাপ তো মনের অন্ধকার।

ভোরের আকাশ রাঙিয়ে সূর্যোদয় হচ্ছিল, চম্পাবতী সেদিকে তাকিয়ে রইল। মন যেন তার আলোয় ভরে গেল।

যখন সংবিৎ ফিরে এলো তখন চম্পাবতী দেখল সেই পুরুষপ্রধান অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। গানের সুর ভেসে আসছিল! সেই গানের সুরকে প্রাণের সুর করে ধরে রাখল চম্পাবতী। তাঁরই গাওয়া চরণ দু'তিনবার করে গাইল। সুরের আশ্চর্য গলা ছিল তার। রাতের অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করতে হত তাকে। কিন্তু একি সুর, একি গানের কথা! এ যে প্রাণের ভেতর মহল থেকে উঠে আসে। চম্পাবতি বার বার করে গাইতে লাগল সেই প্রার্থনার গান—

আলোকময় কর তনু
এ অতনু উৎসবে
দাও বঁধু মনমধু,
ভর হৃদি প্রেমাসবে।

চলতে লাগল সে নদীতীর ধরে। বালুর ওপর যেখানে আঁকা হয়েছিল প্রাণের মানুষটির চরণ-চিহ্ন তাকে স্পর্শ করে মাথায় ঠেকিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল চম্পাবতী।

সেদিন চম্পাবতী ঘরে ফিরল অন্য মানুষ হয়ে। সারাদিন কথা বলল না কারো সঙ্গে। সঙ্গিনীরা রাতের অতিথিদের কৌতুককথা বলতে এসে ফিরে গেল। সারাদিন আপনমনে শ্যামরায়ের পুজো করল চম্পাবতী। ঐ একটিমাত্র গানের কয়েক ছত্র ফিরে ফিরে গাইল।

সূর্য অস্ত গেল। ধীরে ধীরে সাঁঝের আঁধার তার ছায়া ফেলতে লাগল ঘরের ভেতর, পথের ওপর। কি আশ্চর্য ক্ষমতা এই অন্ধকারের, সে চম্পাবতীর মনের ওপর ছায়া ফেলতে লাগল। সারাদিন আলোর সঙ্গে সঙ্গে থেকে যে মন শক্তি সঞ্চয় করেছিল, সে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে লাগল। চাঁদ উঠল মাঠের ওপারে তরুশীর্ষে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল চম্পাবতী। কেমন এক আলোছায়ার লুকোচুরি। কেমন যেন রহস্যময় মদির আবেশ। আচ্ছন্ন হল চম্পাবতীর মন। কখন ধীরে ধীরে সে উঠে এলো, জলসাঘরে জ্বালতে লাগল একটি একটি করে ঝাড়লণ্ঠনের বাতি। মন্ত্রচালিতের মতো গেল সাজঘরে। সাজল মোহিনী মূর্তিতে। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে দর্পিতা নারীর মতো সে মনে মনে বলতে লাগল, আমি এই রূপনগরের রানী। আমি আগুন জ্বালতে পারি আমার অঙ্গে। পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে পারি আমার প্রেমের ভিখারী পতঙ্গদের।

সে মঞ্জীরের ঝংকার তুলে লীলাভরে গিয়ে বসল জলসাঘরে। তুলে নিল তানপুরোখানা। গাইতে লাগল বসন্তবাহার।

ভুলে গেছে চম্পাবতী ভোরের কংসাবতীর কথা! ভুলে গেছে, ভোরের আকাশ জুড়ে বেজে উঠেছিল যে প্রার্থনার সুর।

সে এখন মদন-উৎসবে পঞ্চশরের অঙ্কে সমর্পিত-তনু রতি।

এলো রাতের অতিথির দল। সোহাগে চুম্বনে, সঙ্গীতে সাহচর্যে উতলা হল মধুযামিনী। রাত্রি যখন ক্লান্ত হল, একে একে চলে গেল অতিথি, নিভে এলো দীপ, কি এক নিদারুণ অবসাদে ভেঙে পড়ল চম্পাবতীর দেহ মন। কতক্ষণ সে মূর্ছাহতের মতো পড়ে রইল জলসাঘরের ফরাশের ওপর। কখন ভোর হয়েছে। সূর্যের তেজ তীব্র হয়েছে। একসময় আলোর খরতেজের জ্বালায় চমকে উঠে পড়ল চম্পাবতী। আজ আর তার অঙ্গ থেকে গেল না রাতের গ্লানি। শ্যামরায়ের মূর্তির কাছে কি এক অজানা ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে সে আর যেতে পারল না।

মানুষের জীবনে বোধহয় এমন কতকগুলো মুহূর্ত আসে যখন সে পবিত্রতার ছোঁয়া পেয়েও মনের দাস হয়ে আরো গ্লানি, আরো অন্ধকারের বশীভূত হয়ে পড়ে। চম্পাবতীর ভেতর যে সৎ মনটা ছিল তা যেন হঠাৎ জ্বলে উঠে মুহূর্তে নিভে গেল। আলোর পথে চলার যে সুযোগ তার কাছে এসেছিল,

তার মনের সামান্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেল। আর দিশাহারা চম্পাবতী তলিয়ে গেল অন্ধকার, অতি গাঢ় অন্ধকারের অতলে।

ভোগবিলাসের বন্যা বইল চম্পাবতীর বিলাস-ভবনে।

এমন দিনে আর একটি ঘটনা ঘটল।

ভোরে কংসাবতীর জলে আজকাল স্নান করতে যেত না চম্পাবতী, কিন্তু তার খেয়াল হল গভীর রাতে লালবাঁধে সে স্নান করতে যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। রাতের অতিথিরা ফিরে গেলে সে নির্ভয়ে একা চলে যেত লালবাঁধে। জ্যোৎস্নালোকে তার মনে হত লালবাঁধ এক রহস্যের সাগর হয়ে গেছে। ওপারে, যেখানে তীরের গাছপালা আঁধার সৃষ্টি করে আছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হত কারা যেন ছোট্ট পানসি ভাসিয়ে লালবাঁধের জল টেনে টেনে আসছে। গলায় তাদের বাজছে মিঠে মহুয়ামাতাল সুর। জলে সারাদেহ ডুবিয়ে সে দেখত এই ছবি। যখন ঐ পানসিখানা আরো কাছে এগিয়ে আসত তখন সে জল ছেড়ে উঠে আসত ধীরে ধীরে। একটা গাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে সে দেখত তার স্বপ্নের ছবি। কতক্ষণ পরে সে দেখত ঐ পানসিখানা একটি রাজহাঁসের আকার ধরে তরতর করে জল টানতে টানতে মিলিয়ে যাচ্ছে। পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে চম্পাবতী দেখতে দেখতে পেত শুকতারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে লালবাঁধের ওপারের তরুশীর্ষে। অমনি জোরে পা চালিয়ে সে চলে যেত তার আস্তানায়।

এক রাতে স্নানশেষে সে সবেমাত্র উঠেছে লালবাঁধের তীরে, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সে কান খাড়া করে রইল। এক রাতে কে কোথায় চলেছে ঘোড়ায় চড়ে! কিছু পরে তার মন হল, শব্দ এগিয়ে আসছে তারই দিকে। আর একটি নয়, একাধিক ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ বলে মনে হল তার।

সভয়ে চম্পাবতী তাকিয়ে দেখল দূর প্রান্তরে দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি, একে তীব্রবেগে অনুসরণ করছে অন্যকে। চম্পাবতী গাছের আড়ালে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে তাদের দেখতে লাগল। কাছাকাছি আসতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল ছবি। সামনের সাদা ঘোড়ার সওয়ার সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, আর পেছনে কালো একটি ঘোড়ায় চড়ে একটি লোক খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে তাকে তাড়া করে আসছে। চম্পাবতীর পাশ দিয়ে প্রথম পুরুষটি তীরবেগে বেরিয়ে গেল। দেখে চিনতে পারলও, স্বয়ং রাজা। পরে কালো ঘোড়ার সওয়ার বিদ্যুৎবেগে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। চম্পাবতী দেখল, ব্যবধান অত্যন্ত কম। আর চিনতে পারল সেই তলোয়ারধারী অনুসরণকারীকে। শ্রেষ্ঠীপুত্র হিরণ্ময়, চম্পাবতীর প্রেমের প্রদক্ষিণকারী এক পতঙ্গ।

হিরণ্ময়, হিরণ্ময়, ডাক দিল চম্পাবতী। মুহূর্তে থেমে গেল কালো ঘোড়ার সওয়ার। চিঁহি চিঁহি শব্দ করে দুটো পা ওপরে তুলে অদ্ভুতভাবে ঘোড়াটা তার সওয়ারকে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল চম্পাবতীর দিকে।

এগিয়ে এলো হিরণ্ময়। ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল চম্পাবতীর পাশে।

তুমি, এত রাতে, এখানে চম্পা!

আমিও তো তোমাকে এই প্রশ্ন করতে পারি হিরণ্ময়?

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল শ্রেষ্ঠীপুত্র।

হিরণ্ময়কে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কপট হাসিতে চম্পাবতী বলল, তাই আজ ক'দিন হল রূপনগরে সখার অদর্শন।

হিরণ্ময় প্রথমে একটু সংকুচিত হল। পরক্ষণেই বলল, কিন্তু তুমি?

যদি বলি তোমারই খোঁজে এসেছি!

বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমাকে অবিশ্বাস করলে তুমি শান্তি পাবে হিরণ্ময়? —চম্পাবতীর চোখে কৌতুক।

হিরণ্ময় বলল, কথা রাখ, ঘরে চল।

এবার চম্পাবতীর গলায় হাসি বেজে উঠল।

কার ঘরে হিরণ্ময়, তোমার না আমার?

হিরণ্ময় আরো সংকুচিত হল।

আমাকে দোষ দিও না চম্পা। তোমাকে আমার ঘরে তুলতে পারিনি, সে কি কম দুঃখ আমার।

হাসি চেপে চম্পাবতী বলল, আমার জন্যে এত দুঃখ তুমি সইছ জেনে আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে সখা।

তারপর অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে বলল চম্পাবতী —ছিঃ ছিঃ, তুমি না শহরের বিচারপতি ধর্মদাসের ছেলে! আমার মত পাপিষ্ঠার মোহে পড়ে নিজেকে নষ্ট করেছ, তার ওপর নরহত্যাতেও তোমার কুণ্ঠা নেই!

হিরণ্ময় বলতে যাচ্ছিল, তুমি যদি জানতে চম্পা— । কথা শেষ করতে দিল না চম্পাবতী।

কিছু জানতে চাই না আমি হিরণ্ময়, আজ শুধু মনে হচ্ছে, মন নিয়ে খেলা তোমার শেষ হয়েছে, এখন শুরু হয়েছে খুন নিয়ে খেলা। যদি তুমি আমাকে সত্যিই ভালবেসে থাক, তাহলে আর এসো না আমার কাছে। তোমার এ খেলায় এখনও অভ্যস্ত হতে পারিনি হিরণ্ময়।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হিরণ্ময় বলল, রাগ করো না চম্পাবতী, ক্ষমা করো আমাকে। এই তোমার সামনে তলোয়ার ছুঁড়ে দিলাম লালবাঁধের জলে।

সবই জানত চম্পাবতী। কিন্তু ঘটনা যে এতদূর গড়িয়েছে তা জানত না। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী চিরঞ্জীব কর্মকার। চিরঞ্জীবের একমাত্র কন্যা বিদ্যুন্মালা। তাকে নিয়েই প্রতিযোগিতা। এতদিন এ শহরের যুবকেরা তাকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। বিদ্যুন্মালা বিদ্যুতের ঝলক দিয়েছে কখনো ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের এপ্রান্তে, কখনো বা ওপ্রান্তে। কিন্তু চিরদিনের হয়ে ধরা দেয়নি কারো কাছেই। বিদ্যুতের চমকের পর যেমন অন্ধকার ঘনতর হয় তেমনি অন্ধকার ঘনিয়েছে প্রতিটি যুবকের মনে। বিদ্যুন্মালা শুধু দাহ দিয়েছে, দিতে পারেনি তৃষ্ণার শান্তি।

তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরে দুটিমাত্র প্রতিযোগী থেকে গেছে একজন শহর পঞ্চায়েতের বিচারক, বণিক ধর্মদাসের পুত্র হিরণ্ময়, অন্যজন প্রতাপহীন রাজা অনঙ্গদেব।

হিরণ্ময়ের কোনও শিক্ষাদীক্ষা কিংবা আচারবিচারের বালাই ছিল না। পিতার অজস্র অর্থ আর প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে সে সারা বিষ্ণুপুর শহর তোলপাড় করে বেড়াত। ছেলেবেলা থেকেই সে তাই বড় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয়েছিল। কিন্তু এমন দুর্দান্ত যুবক একটিমাত্র জায়গায় এসে নিজের ক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেলত। চম্পাবতীর চাহনির কাছে সে আত্মসমর্পণ করত অসহায়ের মতো। চম্পাবতীর কেমন এক জাদুকরী ক্ষমতা ছিল। তার মুখের হাসি আর চোখের দৃষ্টির কাছে হার স্বীকার করেনি, এমন শক্তিমান পুরুষ বিষ্ণুপুর শহরে বড় কেউ একটা ছিল না। অবশ্য যারা চম্পাবতীর সাহচর্যে আসত।

এখন হিরণ্ময় পিতার সম্মানের সুযোগ নিয়ে গড়ে তুলেছিল চিরঞ্জীবের বাড়ির সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। চিরঞ্জীব এ আত্মীয়তাকে সুনজরে দেখত। কারণ ধর্মদাস গোষ্ঠীপতি হলেও ব্যবসায়ী। চিরঞ্জীবকে নিজের ব্যবসার সুবিধের খাতিরে যোগাযোগ রাখতে হত ধর্মদাসের সঙ্গে।

বিদ্যুন্মালা বাইরের কৃপাদৃষ্টি হিরণ্ময়ের ওপর হানলেও মনের দৃষ্টি তার পড়েছিল আর একজনের ওপর। তিনি থাকতেন আড়ালে। প্রভাব না থাকলেও রাজা খেতাবের মর্যাদা ছিল তাঁর। তাই ধর্মদাসের বাড়িতে কিংবা চিরঞ্জীবের লীলাভবনে রাজা অনঙ্গদেবকে দেখা যেত না।

বিদ্যুন্মালার সঙ্গে মিলন হত তাঁর কখনো নদীতীরের নির্জন বালুবেলায়, আবার কখনো লালবাঁধের তরুগুল্মের আড়ালে।

বিদ্যুন্মালা সত্যই হৃদয় দিয়েছিল রাজা অনঙ্গদেবকে। যদিও অনঙ্গদেব ছিলেন বিবাহিত, তবুও বিদ্যুন্মালার মোহ থেকে তিনি নিজেকে পারলেন না মুক্ত করতে। এমনও হতে পারে, সামাজিক

প্রতিষ্ঠার অভাবে রাজা অনঙ্গদেব বিদ্যুন্মালাকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়েছিলেন। পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী কন্যা যদি তার বিপুল বিত্ত নিয়ে অনঙ্গদেবের পাশে এসে দাঁড়ায় তা হলে অনঙ্গদেব হয়তো ফিরে পাবেন তাঁর হারানো সম্মান আর প্রতিপত্তি।

রাজার গৃহে ছিলেন লক্ষ্মীরূপা বধূ আর অতি সুদর্শন একটি শিশুপুত্র। রাজা অনঙ্গদেব তাদের প্রাণ দিয়ে আগলে রাখতেন। কিন্তু মোহ এমন জিনিস যা প্রিয়কে দূরে সরিয়ে দেয়। পথের সমস্ত বাধাকে নির্মমভাবে নির্মূল করে দেয়।

একদিনের প্রিয়তম পতি, স্নেহময় পিতা অন্যদিন হয়ে যায় নিষ্ঠুর। আপনজন বুঝতে পারে না এই পরিবর্তনের কারণ। চোখের জলই হয় সম্বল। রানীর চোখের জল যত পড়তে লাগল রাজা অনঙ্গদেবের অধঃপতনও তত শীঘ্র ঘনিয়ে এলো।

রাজা মত্ত হলেন বিদ্যুন্মালার প্রেমে। কিন্তু আর একজনের সাপের মতো ক্রুর দৃষ্টিকে এড়াতে পারল না ওরা। ছায়ার মতো সে আড়ালে থেকে অনুসরণ করতে লাগল তাদের। জ্বলতে লাগল তার মন। যে বিদ্যুন্মালা একদিন তার হৃদয়কে প্রেমের আগুনে দগ্ধ করেছে, আজ সেই দগ্ধহৃদয়ের দহনশক্তি দিয়ে সে জ্বালাতে চাইল সবাইকে। বনে যখন আগুন লাগে তখন জ্বলন্ত গাছের আগুনেই অন্য গাছ জ্বলতে থাকে।

হিরণ্ময় সন্ধ্যায় আবছায়ায়, রাতের অন্ধকারে সাপের মতো এঁকেবেঁকে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। সুযোগ পেলেই সে ছোবল মারবে। মনের বিষে জ্বালিয়ে দেবার শক্তি ছিল না তার বিদ্যুন্মালাকে। সে শুধু সুযোগ খুঁজছিল পথের কাঁটা অনঙ্গদেবকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলার।

একদিন চম্পাবতীর প্রেমের ভিখারী ছিল হিরণ্ময়। বিদ্যুন্মালাকে সে কামনা করলেও চম্পাবতীর দ্বারে ছিল তার নিত্যকার আগমন। এ ঘটনা চম্পাবতীর অজানা ছিল না। এ সকল কাহিনী হাওয়াতেই ভেসে বেড়ায়। চম্পাবতী প্রথমে সামান্য ঈর্ষা অনুভব করত মনে মনে। কিন্তু পরে সে মনেব এটুকু দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলেছিল। কারণ সে বহুবল্লভা। তার কাছে একমাত্র পুরুষের আমন্ত্রণ ছিল না। বহু পুরুষের সঙ্গসুখে সে ছিল অত্যন্ত গর্বিতা।

কিন্তু আজ তার চোখের সামনেই ঘটে গেল এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। ঠিক ভয়ঙ্কর হতে পারেনি, শুধু সে দৈবক্রমে এদের মাঝে এসে পড়েছিল বলে।

হিরণ্ময় তলোয়ার লালবাঁধের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে চম্পাবতী এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল হিরণ্ময়ের। হিরণ্ময় তাকিয়ে রইল চম্পাবতীর দিকে।

চম্পাবতী বলল, হিরণ্ময়, আমরা পতিতা, লোকালয়ের বাইরে আমাদের বাস, কিন্তু আমরা হৃদয় চিনি। তলোয়ার দিয়ে রাজ্য জয় করা চলে কিন্তু তলোয়ারের শেষপ্রান্ত যত সূক্ষ্মই হোক তা দিয়ে মনকে ছুঁতে পারা যায় না।

মাথা নীচু করে সেদিন ঘোড়ায় চড়ে ফিরে গেল হিরণ্ময়। শেষ রাতের আলোআঁধারি পথ ধরে ফিরতে লাগল চম্পাবতী একা। রাজা হাম্বিরের রাসমঞ্চ। কৃষ্ণের রাসলীলা হত এখানে। এখন অযত্নে অন্ধকারে ভগ্নস্তূপ বলে মনে হচ্ছে। থমকে দাঁড়াল সেখানে চম্পাবতী। মনে হল তার, অন্ধকারেব বুকে যেন চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কুঞ্জ সাজানো হয়েছে। গাছে গাছে ফুলের দোলনা। কৃষ্ণ ধা দুলছেন! এক, দুই, তিন, শত শত যুগলমূর্তি। চম্পাবতী গুণে শেষ করতে পারল না।

কে! কে! আতঙ্কিত হয়েছে চম্পাবতী। সামনে এসে কে যেন দাঁড়াল তার। শেষ রাতে চাঁদ ডুবে গেছে। দিকচিহ্ন প্রায় অস্পষ্ট।

আমাকে তুমি চিনবে না চম্পাবতী!

কিন্তু আপনি, আপনি আমাকে—

কথা শেষ করতে পারল না চম্পাবতী।

আমি তোমাকে চিনি চম্পা। রোজ রাতশেষে লালবাঁধের জলে তোমাকে আমি স্নান করতে দেখি। কিন্তু সে কথা থাক। আজ তোমাকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

কিসের কৃতজ্ঞতা? —কণ্ঠে খানিক সাহস সঞ্চয় করে বলল চম্পাবতী।

তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ আজ।

চম্পাবতী বুঝল এতক্ষণে সে কার সঙ্গে কথা কইছে।

প্রণাম নিন রাজা অনঙ্গদেব। যদি অনুমতি করেন তাহলে দাসী একটি প্রশ্ন করবে আপনাকে।

কি সে প্রশ্ন চম্পা? তোমার সকল কিছু প্রশ্নের উত্তরই তুমি পাবে।

আচ্ছা রাজাবাহাদুর, আপনি কোনদিন কারও প্রাণরক্ষা করেছেন?

চিন্তিত হলেন রাজা অনঙ্গদেব। এ কি ধরনের প্রশ্ন তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

তবু বললেন, এ ধরনের পরিস্থিতির ভেতর আমি কোনদিন পড়িনি চম্পা।

অপরাধ নেবেন না রাজাবাহাদুর, বলল চম্পাবতী, তলোয়ারের আঘাত থেকে কাউকেরক্ষা করাই কি শুধু প্রাণরক্ষা করা! কোনও একটি অসহায় মনকে তার দুঃখ থেকে টেনে তোলা কি প্রাণরক্ষা নয় রাজাবাহাদুর?

কিছু সময় চিন্তিত থেকে রাজা অনঙ্গদেব বললেন, তোমার মুখে এ-ধরনের কথা শুনব আমি আশা করিনি। তবু যখন প্রশ্ন করেছ তখন বলি, মনের দুঃখ থেকে কেউ কাউকে টেনে তুলতে পারে বলে আমার মনে হয় না চম্পা।

পারে রাজাবাহাদুর। সহানুভূতির ছোঁয়াটুকু ঠিকমত দিতে পারলে সব না হোক কিছু দুঃখ লাঘব করা যায়। আর আপনি তা অবশ্যই করতে পারেন।

কি বলছ চম্পা! বিস্ময়ে অভিভূত হলেন রাজা অনঙ্গদেব—কার কথা বলছ তুমি?

ক্ষোভে কাঁপছে চম্পাবতী। সে ভুলে গেছে সমাজে তার কোনও পরিচয় নেই। স্থান তার সমাজের বাইরে।

কেবল নিজের ঘরের বাইরেই কি তাকাবেন রাজাবাহাদুর! ঘরের কোণের কান্না কি শুনতে পাবেন না কোনদিন!

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন অনঙ্গদেব — তুমি তোমার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ চম্পা। আজ তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, না হলে তোমার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি তুমি পেয়ে যেতে। নিরস্ত্র ছিলাম, না হলে ঐ কুকুরটাকে আমার কাছ থেকে ফিরে যেতে হত না। একদিন ঐ ধর্মদাসের ছেলেকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমার হাতে।

চম্পাবতী দেখল, অনঙ্গদেবের হাতে একখানা তলোয়ার। এইমাত্র বোধহয় রাজাবাহাদুর সেখানা নিয়ে এসেছেন ঘর থেকে।

হাসল চম্পাবতী—হিরণ্ময় একটা ভীরু মহারাজ। সে এতবড় একটা মানুষকে সরিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েও একটা পতিতার কথায় থেমে গেল। হিরণ্ময়কে কোন মেয়েই পুরুষ বলে মনে করবে না। কিন্তু মহারাজ, একটা সাধারণ মেয়ের কাছে বীরত্ব দেখাচ্ছেন আপনি। লোকে আপনাকে কিন্তু হিরণ্ময়ের চেয়ে বেশি কিছু ভাববে বলে মনে হচ্ছে না।

কথা বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে উঠল চম্পাবতী।

আমার ভুল হয়েছে। যা যার প্রাপ্য নয় তাই তাকে দিতে এসেছিলাম। আর দিতে এসেছিলাম একটা সমাজছাড়া মেয়েকে।

ঘোড়ার মুখ ফেরালেন রাজা অনঙ্গদেব।

থাকুন রাজাবাহাদুর, কৃপা করে পতিতার একটা কথা শুনে যান।

ঘোড়া থামালেন রাজা অনঙ্গদেব, ফিরে কিন্তু তাকালেন না।

আমরা পতিতা, একথা বলার মতো সাহস আমাদের আছে, কিন্তু যাঁরা সমাজের ওপরতলায় থেকেও পতিত তাঁদের সেটুকু গোপন করার কৌশলটুকুই জানা আছে মাত্র, প্রকাশ করার সাহস নেই।

রাজা একবার মুখ ফেরালেন। পরক্ষণেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চম্পাবতী কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি জানি কেন, মনে মনে সে আজ বড় তৃপ্তিবোধ করল। তার মনে হল উঁচুতলার মানুষদের চেয়ে তারা মোটেই নিচু নয়। যারা তাদের একঘরে করে রেখেছে, তারা শুধু নিজেদের ভাঙা ঘরটুকুকে অন্যের চোখ থেকে আড়াল করে রাখার জন্যেই করেছে।

সূর্য উঠেছে, আলোয় ভরে গেছে চারিদিকে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই আজ চম্পাবতীর। সে শহরের পথ ধরে চলেছে। অন্যদিন পুব আকাশে শুকতারা ওঠার আগেই সে সংকোচে শহরের পথ ছেড়ে ফাঁকা প্রান্তরে সরে যেত। দ্রুত পা চালিয়ে চলে যেত আস্তানায়। তারা যে অসূর্যম্পশ্যা। সূর্যের আলোর দিকে দেখার অধিকার তাদের নেই। কিন্তু আজ কি এক তৃপ্তির স্বাদে ভরে গেছে তার মন। সমাজের ওপরতলার মানুষেরা শহরের যে পথ ধরে চলে আজ তাকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে চলতে চম্পাবতীর মন থেকে একটা প্রবল সাধ জেগে উঠেছে।

প্রভাতের পথিক অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে দেখল। চলার পথে ফিরে ফিরে চাইল। চম্পাবতী মাথা উঁচু করে আশপাশের ঘরবাড়িগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে শহর ছাড়িয়ে চলে এলো নিজের আস্তানায়। আজ সবার চলার পথে চলতে গিয়ে সে দেখল আকাশ অনেক উঁচু। তার কাছে বড় বড় বাড়ি, আর বাসিন্দা বড় মানুষগুলো কত নগণ্য।

আজ আসার পথে একটি মানুষ একবার তার স্মৃতিপথে জেগে উঠেছিল। বড় সৌম্য তাঁর মূর্তি, স্নানশেষে তিনি চলেছেন দীর্ঘ চরণ ফেলে ফেলে। কণ্ঠে তাঁর প্রার্থনার সুর—

আলোকময় কর তনু
এ অতনু উৎসবে
দাও বঁধূ মনমধু
ভর হৃদি প্রেমাসবে।

রাতে চম্পাবতীর ঘরে এলো অতিথি। সাঁঝের চাঁদ উঠেছিল আকাশে, বাতি জ্বলছিল তার ঘরে। চম্পাবতী কিন্তু বসেছিল জানালার পাশে। আনমনে আজ বসেছিল সে।

দাসী এসে খবর দিল, নতুন মানুষ এসেছে।

নতুন মানুষ! একটু অবাক হল চম্পাবতী।

সে দাসীকে একে একে সম্ভাব্য নামের তালিকাগুলো বলে যেতে লাগল, আর দাসী একটির পর একটি মাথা নেড়ে নস্যাৎ করতে লাগল।

কপট ক্রোধে বলল চম্পাবতী — তবে রাজপুত্র এসেছে। যা যা এখন সরে যা আমার চোখের সামনে থেকে। তোদের জ্বালায় একটু যে নিরিবিলিতে বসতে পারব তার উপায় নেই।

উঠে পড়ল চম্পাবতী। যেতে হবে তাকে জলসাঘরে। সাজঘরে গিয়ে আজ মনের মতো করে নিজেকে সাজাল সে। নতুন অতিথি হলে বেঁধে রাখতে হবে তাকে চিরদিনের করে।

জলসাঘরে ঢোকার আগে সে রোজ একটি করে মালা গেঁথে কালো পাথরের রেকাবিতে পদ্মপাতায় ঢেকে নিয়ে যায়। প্রতি ঋতুর বিশেষ বিশেষ ফুলে সে মালা গাঁথে। যাবার আগে সেই রেকাবিতে রাখা ফুলের মালা ছুঁইয়ে নেয় শ্যামরায়ের পায়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে কোনও পাপবোধ থাকে না। নিজেকে তার মনে হয় কৃষ্ণপ্রেমে কাতর গোপবালা।

আজ সে লাল অশোকের ফুলে মালা গেঁথেছে। তার কালো খোঁপায় পরেছে অশোকগুচ্ছ।

বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ চম্পাবতীকে। প্রথামত সে দৃষ্টি নত করে ঢুকল জলসাঘরে। স্পষ্ট করে দেখল না অতিথিকে। মেঝের ওপর কালো পাথরের রেকাবি রাখল সযত্নে। তারপর পদ্মের পাতা সরিয়ে তুলে নিল অশোকের মালা। অতিথির সঙ্গে শুভদৃষ্টি করতে গিয়ে চম্পাবতী চমকে উঠল। সরে এলো সে পেছনে। হাতের মালা হাতেই রইল তার।

থেমে গেলে কেন চম্পা, আমি কি সত্যিই অস্পৃশ্য?

রাজা অনঙ্গদেবের গলায় ব্যথার সুর বেজে উঠল।

আপনি, আপনি রাজাবাহাদুর!

হাঁ চম্পা, আমি অনঙ্গদেব। তোমার তিরস্কার আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এ কথাটুকু তোমাকে না জানালে আমি শান্তি পাব না চম্পা।

চম্পাবতীর চোখে জল এলো। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে বলল, রাজাবাহাদুর, এই সামান্য পতিতার ঘরে এসে আপনি কিন্তু সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি। পথের সহস্র চোখ। লোকের অপবাদকে আপনি বন্ধ রাখবেন কী করে।

অনঙ্গদেব বললেন, যা সত্য নয়, তার থেকে ভয় পাব কেন।

কৌতুকের হাসি হেসে চম্পাবতী বলল, সমাজের মানুষ তো সত্য অসত্য নিয়ে যাচাই করে না। তারা কল্পনাকে বড় ভালবাসে। তাই একটা উল্লেখ করার মতো ঘটনার সূত্র পেলে তাই দিয়ে অদ্ভুত সব জাল তৈরি করে। আর সেই জালে এমন সব মাছ ধরা পড়ে যাদের সাদা চোখে কখনো দেখা যায় না।

রাজা অনঙ্গদেব বললেন, তোমার কাছে আমাব জন্মান্তর ঘটেছে চম্পাবতী। তুমি জান না কি সম্পদ তুমি আমার জীবনে এনে দিয়েছ।

ও কথা থাক রাজাবাহাদুর। আপনার মনের পরিবর্তনে আপনি তৃপ্তি পেলে আমার চেয়ে বেশি খুশী কেউ হবে না। কিন্তু আমার মনে হয় মানুষের পরিবর্তন তার নিজের ভিতর থেকে না এলে বাইরের কেউ এনে দিতে পারে না।

রাজা অনঙ্গদেব চুপ করে রইলেন কতক্ষণ।

বললেন ধীরে ধীরে, —আমার অতীত পুরুষের বোধহয় কোনও চিহ্নই আজ আর আমার মধ্যে নেই, কিন্তু আজ আমি তোমার ঘরে এসে নিজেকে যথার্থ পুণ্যবান বলে মনে করছি।

প্রণাম করে বলল চম্পাবতী, —ওকথা বলে এই পতিতাকে আর পাপের ভাগী করবেন না মহারাজ।

তোমার চোখে জল চম্পাবতী!

রাজা অনঙ্গদেবের গলায় বিস্ময়ের সুর।

উঠে গেল চম্পা সেখান থেকে। ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল কতক্ষণ। তারপর জল দিল চোখে মুখে। একসময় হাসতে হাসতে আবার এসে ঢুকল জলসাঘরে।

রাজাবাহাদুর, আমাদের রূপনগরে হাসির হুল্লোড়ই শোনা যায়। কান্না, হাসির দাপটে বুকের থেকে বেরোতে পারে না। তাই আজ কান্নার একটু স্বাদ পেতে ইচ্ছে হল।

রাজা অনঙ্গদেব কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে মগ্ন রইলেন। তারপর একসময় বললেন, জান চম্পা, আজ আমার মোহ ভেঙেছে।

চম্পাবতী সপ্রশ্ন চোখে তাকাল রাজাবাহাদুরের দিকে।

তোমাকে বলতে আজ আমার কোনও কুণ্ঠা নেই চম্পাবতী, কারণ তুমি যে করেই হোক আমার জীবনের কিছু কিছু ইতিহাস জেনেছে।

তেমনি নিবিষ্ট মনোযোগের সঙ্গে রাজার মুখে দিকে তাকিয়ে রইল চম্পাবতী।

হিরণ্ময় যখন তোমার পরিচিত তখন শ্রেষ্ঠী চিরঞ্জীব তোমার অপরিচিত নাও হাতে পারে। আর বিদ্যুন্মালা যে শ্রেষ্ঠী চিরঞ্জীবের কন্যা তাও বোধকরি তোমার অজানা নয়।

ওরা কেউ আমার অপরিচিত নয় রাজাবাহাদুর।

সেই বিদ্যুন্মালার ওপর থেকে চলে গেছে আমার সবটুকু মোহ।

আমার কৌতূহলকে ক্ষমা করবেন রাজাবাহাদুর। যদি বাধা না থাকে তাহলে কারণটা জানতে পারি কি?

তুমি আমাকে এ নিয়ে ধিক্কার না দিলে আমি সে মোহ হয়তো ছাড়তে পারতাম না চম্পা। তাই সে মোহভঙ্গের কথা শুধু তোমাকেই আজ জানাতে চাই।

গালে হাত দিয়ে চম্পাবতী রাজাবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে রইল একাগ্রদৃষ্টিতে।

আমি বিদ্যুন্মালাকে ভালবাসতাম চম্পা। আর ভালবাসা এমন জিনিস যা যথার্থই মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আমি একদিন ভুলে গেলাম নিজেকে। নিজেকে ভোলার সঙ্গে সঙ্গে ভুললাম আমার সমস্ত সংসারকে।

আমার মন, আমার দৃষ্টি, আমার স্পর্শ, আমার শ্রবণ সবই হল বিদ্যুন্মালাময়। আমি তাকে ছাড়া কোনও কিছু ভাবতেই পারতাম না।

তুমি শুনলে হয়ত অবাক হবে চম্পা, রাতের পর রাত আমি গোপনে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছি কংসাবতীর কূলে, অথবা লালবাঁধের তীরে।

শ্রেষ্ঠী চিরঞ্জীবের কি এতে কোনও সম্মতি ছিল?

না তা ছিল না, আর ওঐ না থাকার জন্যেই আমাদের মিলনের ইচ্ছাটা বেড়ে গিয়েছিল। পরিচারিকার সাহায্যে ও বেরিয়ে আসত প্রতি রাতে। তারপর রাত্রিশেষে ওকে রেখে আসতাম ওর ঘরে। একই ঘোড়াতে করে আমরা ঘুরে ফিরতাম আমাদের গোপন লীলার জায়গাগুলোতে।

আপনার কাহিনীর বাইরের একটা প্রশ্ন করব রাজাবাহাদুর?

অবশ্যই করতে পার।

আমাকে আপনি চিনলেন কি করে?

বিদ্যুন্মালাই তোমাকে চিনিয়ে দেয়।

অবাক হল চম্পাবতী।

বিদ্যুন্মালা! সে কি করে চিনতে পারল আমাকে?

সম্ভবতঃ হিরণ্ময়ের কাছ থেকে সে জেনেছিল তোমার কথা। তারপর সে জানত হিরণ্ময়ের গতিবিধি আছে ওখানে। হয়ত কোনদিন গোপনে সে দেখে থাকবে তোমাকে।

কিন্তু আপনি তো আমাকে আগে কখনো দেখেননি, তাহলে সেদিন চিনলেন কি করে?

একরাতে লালবাঁধের থেকে আমাদের অভিসার শেষ করে ফিরছিলাম, এমন সময় দেখলাম, কে যেন আসছে লালবাঁধের দিকে। আমরা একটা গাছের আড়ালে থমকে দাঁড়ালাম। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম একজন রমণী। সে গিয়ে দাঁড়াল লালবাঁধের তীরে, তারপর ঝাঁপ দিল জলে। সম্ভবত আত্মহত্যা মনে করে আমি দৌড়ে যাবার জন্যে তৈরি হতেই হাত ধরে টানল আমাকে বিদ্যুন্মালা। —যেও না, ও বিলাসিনী চম্পা। হিরণ্ময়ের অনুরাগের পাত্রী ও। ভাল করে চিনে নিলাম সেদিন তোমাকে।

কি লজ্জা রাজাবাহাদুর, একটা সামান্য মেয়ে, আপনি দেখলেন তার স্নানপর্ব!

উপায় ছিল না সেদিন আমার তোমাকে পেরিয়ে চলে যাবার। যদি তুমি আমাদের দেখতে পাও। যদি তুমি হিরণ্ময়ের কাছে বলে দাও আমাদের গোপন অভিসারের কথা। তাই সেদিন তোমার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাদের। আর তাই দেখেছিলাম তোমার স্নানলীলা। ভাল করে চিনে নিয়েছিলাম তোমাকে।

কৌতুকের দৃষ্টি হেনে বলল চম্পাবতী, — ভাল করে চিনে রেখেছিলেন কেন রাজাবাহাদুর?

আমি সেদিন দেখছিলাম তোমাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখ দিয়ে। হিরণ্ময়ের নির্বাচন আর রুচি দেখছিলাম।

খুব খুশী হয়েছিলেন নিশ্চয়ই মহারাজ?

এ কথা কেন বলছ চম্পা?

হিরণ্ময়ের রুচির বহরখানা দেখে।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন রাজা অনঙ্গদেব। বললেন, সেদিন তোমাকে বুঝতে পারিনি চম্পা, কিন্তু আজ বুঝেছি। সেদিন তোমাকে দেখেছিলাম। মনে মনে তারিফ করেছিলাম বিধাতার দেওয়া তোমার দেহের গঠনের, কিন্তু সেদিন তোমার পরিচয় আমি পাইনি। শুধু বিদ্যুন্মালার মুখে শুনেছিলাম তোমার অকথ্য দুর্নামের কাহিনী।

বিদ্যুন্মালা গুণের কদর জানে রাজাবাহাদুর।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন রাজা অনঙ্গদেব।

ওর নাম উচ্চারণ করো না চম্পা। গত রাতে এই বিদ্যুন্মালাই করেছিল আমার বধের আয়োজন।

চমকে উঠল চম্পাবতী। পাগলের মতো চেঁচিয়ে বলে উঠল, না রাজাবাহাদুর, না। বিদ্যুন্মালা কখনো একাজ করতে পারে না। এ আমি বিশ্বাস করি না রাজাবাহাদুর। এত ভালবাসা কখনো মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। তাহলে যে কংসাবতী নদী, লালবাঁধ সবই মিথ্যে হয়ে যায়।

আমিও কি বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম চম্পা। যখন জানতে পারলাম তখন চোখে আমার অন্ধকার নেমেছিল, আর অন্ধকারের আবছায়ায় ঢেকেছিল চরাচর।

চম্পাবতী দু'হাতে চোখ ঢেকে বসে রইল কতক্ষণ। পরে যখন মুখ তুলে চাইল, তখন রাজা অনঙ্গদেব দেখলেন চোখ দুটি তার রক্তের মতো লাল।

আমার কাহিনী আজ থাক চম্পা। তুমি খুবই বিচলিত হয়েছ বলে মনে হচ্ছে।

ভাঙা ভাঙা গলায় বলল চম্পাবতী,— শুরু করেছেন যে কথা, শেষ করুন তা রাজাবাহাদুর। আজ শুধু মনে হচ্ছে কত গভীর শান্তিতে আমরা এই সবার ঘৃণ্য জায়গাটুকুতে বাস করছি।

রাজা অনঙ্গদেব বলে চললেন, —রোজকার মতো গত রাতেও আমি বেরিয়েছিলাম। কথা ছিল লালবাঁধের তীরে আমরা মিলিত হব। সময়ের সীমা পার করে একসময়ে ও এসে পৌঁছল। আমি অধীর আগ্রহে ওর জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম।

একটু থেমে অনঙ্গদেব বললেন, ও এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। মনে হল যেন কি এক উত্তেজনায় ও কাঁপছে। আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম না ওর মনোভাব। বললাম, এত দেরি হল তোমার মালা?

ও আমার দিকে কেমন যেন অদ্ভুত চোখ মেলে তাকাল, তারপর বলল, বাবা জেগেছিলেন, তাই দেরি হল আসতে।

এত রাতে তোমার বাবা তো কোনদিন জেগে থাকেন না মালা!

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ আমাদের বাড়িতে ছিল একটা অনুষ্ঠান। আর সে অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত হয়ে যায়।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের এমন অনুষ্ঠান?

কোনও সংকোচ, কোনও গোপনতা নেই। সে স্পষ্ট করে বলল, ধর্মদাস এসেছিলেন তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করতে।

এ খবর বিদ্যুন্মালা তাহলে আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছিল এতকাল! হিরণ্ময়ের ওপর চিরদিন ঘৃণার মনোভাবই প্রকাশ করেছে সে। আর তাছাড়া বিদ্যুন্মালার মতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করার ক্ষমতা ছিল না তার বাবার। মাতৃহারাই এই মেয়েটিই ছিল সংসারের কর্ত্রী।

বললাম, সুখবর, আগে বললে তোমার পাকাদেখার উৎসবে হয়তো যোগ দিতেও পারতাম।

ও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পাশে পড়ে থাকা আমার নিত্য সহচর তলোয়ারখানা হাতে তুলে নিয়ে খেলা করতে লাগল।

ওর ভাবান্তর আমাকে আরো বিস্মিত করে তুলল।

বললাম, এ ঘটনায় কি তুমি সুখী হতে পারনি মালা?

ও বলল, সুখ-দুঃখের প্রশ্ন নয় রাজা, যা ললাটের লেখা তা সবাইকে মাথা নত করে মেনে নিতে হবে।

আগুন জ্বলে উঠল আমার মনে। যার জন্যে আমার সোনার সংসারে জ্বেলেছি আগুন, সে কিনা নির্বিকার মনে মেনে নিচ্ছে ললাটের লিখন।

বললাম, তাহলে আজ তুমি এখানে এলে শুধু কি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের আনন্দ-সংবাদটুকু শোনাবে বলে।

যদি তাই হয়? বিদ্যুন্মালার চোখেও আগুন ঝলসে উঠল।

বললাম, তাহলে আমার করবার কিছু নেই। শুধু একটি প্রশ্ন করব তোমাকে, উত্তর দেবে কি?

কেমন যেন ক্রুর দৃষ্টি মেলে তাকাল আমার দিকে। কিছু বলল না।

আমি বলে চললাম— তুমি তোমার নতুন জীবনে প্রবেশের পথ পেলে, কিন্তু বলে দেবে কি আমি আমার পুরনো জীবনে ফিরে যাব কোন্ পথে?

হাসল বিদ্যুন্মালা। তুমি ভাবতে পারবে না চম্পা, সে হাসি কত ক্রুর, আর কত নিষ্ঠুর তার আঘাত।

তীক্ষ্ণ হাসির রেখা মুখে টেনে বলল বিদ্যুন্মালা— আমি তোমার ঘরের দ্বার কোনদিন বন্ধও করিনি, তাই আমার খুলে দেবার প্রশ্নও আসে না।

তখন আমার শিরা উপশিরায় রক্তের মতো জ্বলতে লাগল লাল আগুন।

চিৎকার করে উঠলাম — আমার সঙ্গে শঠতা করে তুমি পার পাবে ভেবেছ?

এই বলে ওর হাত থেকে আমার তলোয়ারখানা ছিনিয়ে নিতে যেতেই ও বিদ্যুৎবেগে সেখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল লালবাঁধের অগাধ জলে। চিৎকার করে একটা নাম ধরে ও ডাকতে লাগল। ভাবতে পার চম্পা, কি সে নাম?

না রাজাবাহাদুর — চম্পাবতীর স্বরে বিস্ময়।

হিরণ্ময়, হিরণ্ময় বলে রাতের আঁধার কাঁপিয়ে ডাক দিল বিদ্যুন্মালা।

লালবাঁধের জলে ও কাঁপন ভেসে ভেসে চলে গেল বহুদূর।

আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছি। কয়েক গজ দূরে একটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক ঘোড়-সওয়ার। হাতে তার শাণিত তলোয়ার। দূর থেকে দেখে বুঝলাম, হিরণ্ময়।

সামনে লালবাঁধের অথৈ জল। একমাত্র আত্মরক্ষার পথ বুঝি ওর বুকে আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু মুহূর্তে মনে হল, এত দীর্ঘ পুষ্করিণী আমি পার হব কেমন করে। আর তিলে তিলে যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ব তখন আমাকে প্রাণের মায়ায় কূলের দিকে সরে আসতে হবে। আর সেই সুযোগে ঐ কালো ঘোড়ার সওয়ার আমাকে টুকরো টুকরো করে আবার জলে ভাসিয়ে দেবে।

মুহূর্তে আমি কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। 'সাথী' বলেডাক দিলাম অনুচ্চে। আমার ঘোড়ার নাম রেখেছিলাম সাথী। ও বিপদের গন্ধ পেয়ে পায়ে পায়ে সরে এলো আমার কাছে।

আমি হাত দিয়ে জোর করে ধরে রেখেছিলাম বিদ্যুন্মালাকে। তলোয়ার নিয়ে ছুটে এলো হিরণ্ময় একটা হিংস্র বাঘের মতো।

আঘাত দেবার আগেই আমি ধাক্কা দিয়ে লালবাঁধের জলে ফেলে দিলাম বিদ্যুন্মালাকে।

মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটে গেল। হৃত চকিত হয়ে গেল হিরণ্ময়। ঘোড়া থেকে নেমে তলোয়ার হাতে নিয়েই সে ছুটল বিদ্যুন্মালাকে উদ্ধার করতে।

ততক্ষণে আমি সাথীর ওপর উঠে বসেছি। জল থেকে ডাঙায় উঠতে উঠতেই বিদ্যুন্মালাকে চেঁচিয়ে বলতে শুনলাম, মুর্খ, আমাকে বাঁচাতে হবে না! নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার আছে। শেষ করে ফেল ওকে।

থামলেন রাজা অনঙ্গদেব। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এর পরের ইতিহাস তো তোমার অজানা নয় চম্পাবতী। আজ সারাদিন আমি শুধু ভেবেছি, যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলাম, সে চাইল প্রাণ নিতে, আর যাকে পতিতা বলে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখি, ঘটনাচক্রে সেই হল আমার প্রাণদাত্রী।

চম্পাবতী প্রশ্ন করল — রাজাবাহাদুর, বলতে পারেন বিদ্যুন্মালার এ পরিবর্তনের কারণ কি?

আমি আজ সারাদিন বসে ভেবেছি চম্পা, কিন্তু কোনও কূল পাইনি। ওর ভালবাসা যে মিথ্যা ছিল এ কথাও বা বলি কি করে। প্রতিদিনের ঘটনা যে আমার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমার মনে হয় রাজাবাহাদুর, বিদ্যুন্মালার চরিত্রের মধ্যে খাদ ছিল। যার সম্বন্ধে তার নিজের কোনও চেতনা ছিল না। আপনি যখন আপনার রূপ আর পৌরুষ নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন সে আপনাকে কোনকিছু না ভেবে শুধু চোখের দেখাতেই বরণ করে নিল।

তারপর দীর্ঘদিন গেছে। প্রেমের অভিসারে সে নতুন নতুন উত্তেজনা অনুভব করেছে। কিন্তু মনের যে গভীরতা প্রেমকে স্থায়ী করে সে গভীরতা ছিল না বিদ্যুন্মালার মধ্যে। তাই আপনার প্রেমে তাকে

আপনি যতই ভরে দিতে চেয়েছেন, ততই কোন্ ছিদ্রপথে সে প্রেমের সুধা বের হয়ে গেছে। শেষে সে একই প্রেমে আর জ্বালা অনুভব করতে পারেনি। ভেতরের ভেতরে নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে উঠেছিল। তার জীবনের এই মুহূর্তে সে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হিরণ্ময়ের মধ্যেও নতুন কিছু উত্তেজনা পাবার আশা করল। কিন্তু পথের বাধা আপনি। আপনাকে না সরালে তার এ ইচ্ছা ফলবতী হবার কোনও সুযোগই ছিল না। তারই ফল ফলেছে গতরাতে।

বিচিত্র নারীর মন চম্পা।

প্রতিটি রমণীকে একইভাবে বিচার করবেন না রাজাবাহাদুর।

আমরা বিচার করব, সে ক্ষমতা কই আমাদের চম্পাবতী। যেখানে এক নারী সবচেয়ে বড় আঘাত হানল, সেখানে সম্পূর্ণ অযাচিত অন্য এক নারী তার ক্ষতে মমতার হাতটি বুলিয়ে দিলে।

একটু থেমে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বললেন রাজা অনঙ্গদেব—তুমি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট চম্পা, কিন্তু তুমি আমার নমস্য।

চম্পাবতী সহসা এক কাণ্ড করে বসল। অশোকের মালাটি রাজা অনঙ্গদেবের চরণে রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল।

রাজা হাত ধরে তুললেন চম্পাবতীকে।

থরথর করে কাঁপছে চম্পাবতী।

আমাকে স্পর্শ করলেন রাজাবাহাদুর! আমরা যে সমাজে অছুৎ। সকলেই যে আমাদের ছায়া এড়িয়ে চলে।

হেসে বললেন, রাজা অনঙ্গদেব — আমি তো ছায়া মাড়াইনি, আমি যে কায়াকে স্পর্শ করেছি।

একটু থেমে বললেন, একটা কথা তোমাকে বলব চম্পা?

বলুন রাজাবাহাদুর।

কোনদিন যদি ক্লান্ত হয়ে তোমার কাছে আসি, তাহলে কি তুমি ফিরিয়ে দেবে?

আমাকে কেন অপরাধী করছেন রাজাবাহাদুর। আমি আপনার কাছে কত ছোট। এতটুকু ছোট্ট বাসা কি বিরাট পাখির ডানার আশ্রয় দিতে পারে।

আমি এলে তুমি কি আমাকে ফিরিয়ে দেবে চম্পা?

সে ক্ষমতা আমার নেই রাজাবাহাদুর।

তারপর ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি টেনে বলল, অতিথিকে কাছে ডেকে নেওয়াই তো আমার কাজ, ফিরিয়ে দেওয়া নয়।

চম্পাবতীর ঘর থেকে সেদিন বেরিয়ে এলেন রাজা অনঙ্গদেব। পথে যেতে যেতে তাঁর মনে হল পৃথিবী কত বিচিত্র। আর কত বিচিত্র এই মন।

এদিকে বিছানার ওপর যেখানে ফুল ছড়ানো ছিল, তার ওপর চম্পাবতী এলিয়ে দিল তার দেহ। চাঁদের একফালি আলো এসে পড়েছিল শয্যার ওপর, তার দিকে তাকিয়ে রইল সে। কতকগুলো অশোকের ফুল পড়ে ছিল সেখানে। চম্পাবতী তাই নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

কতদিন চলে গেল, রাজা অনঙ্গদেব আর পতিতা চম্পাবতীর ঘরে এলেন না। বসন্ত পার হল। রাঢ় বাংলার আদিবাসীর ঘরে ঘরে শুরু হল বাহা পরব। কুড়চির ফুল ফুটল। মহুয়া মাতাল হল। শালে এলো নবমঞ্জরী। চম্পাবতী তার ঘরটিতে বসে বসে দূরের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাঢ় বাংলায় গ্রীষ্ম চলে গেল আগুনের ফুলকি তুলে। বর্ষা নামল অঝোরধারায়। শালের বনে ঝড় দোলা দিল, অমনি থৈ থৈ করে উঠল কংসাবতীর বুক। চম্পাবতীর চোখের জল মিশল বর্ষাধারার সঙ্গে।

এক সন্ধ্যায় বৃষ্টি হচ্ছিল অঝোরধারে। শহরের পথে একটি লোকেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। লাল ধুলি বর্ষাধারার সঙ্গে মিশে যেন দোলের দিনের রাঙা স্রোত বইয়ে দিচ্ছিল।

সেদিন রূপনগরে কেউ কোনও অতিথির আশা করেনি। তাই বুঝি জলসাঘরে এতদিন পরে এসে বসল চম্পাবতী। একে একে নিজের হাতে জ্বালল ঝাড়ের আলো। মল্লারে ধরল গান। যখন প্রাণের

সুরে বান ডেকেছে, তখন হঠাৎ থেমে গেল গান। ছিঁড়ল তানপুরোর তার জলসাঘরের দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন রাজা অনঙ্গদেব।

চম্পাবতী, আমি এসেছি।

একি! —চম্পাবতী ছুটে গেল রাজা অনঙ্গদেবের কাছে।

একি হল, রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে পোশাক।

বল চম্পা, আজ কি তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে?

চম্পা হাত ধরে বসাল রাজাকে। ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল। তারপর শুইয়ে দিল বিছানার ওপর। বহুদিন পরে রাজা যেন গভীর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সারারাত বাইরে চলল ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব। ভেতরে নিদ্রাহীন রাত্রি বসে রইল চম্পা রাজা অনঙ্গদেবের শিয়রে।

শহরে চলেছে চাপা গুঞ্জন। বিখ্যাত ব্যবসায়ী চিরঞ্জীবের কন্যা বিদ্যুন্মালাকে কে যেন ডুবিয়ে মেরেছে লালবাঁধের জলে। আবার কেউ কেউ বলছে, বিদ্যুন্মালা আত্মহত্যা করেছে। রাজা অনঙ্গদেব যে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এ কথাও কারো কারো মুখে শোনা যাচ্ছে। এদিকে সমাজপতি ধর্মদাসের পুত্র হিরণ্ময় গুরুতর আহত হয়ে পড়ে আছে নিজের ঘরে। রাজা অনঙ্গদেবকে নাকি দেখা যাচ্ছে না স্বগৃহে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কি করে চাপা পড়ে গেল সব গুঞ্জন, সকল কাহিনী। চিরঞ্জীব কন্যার মৃত্যুর জন্য বিচার প্রার্থনা করল না। কারণ বিচারসভা বসানোর অর্থই হল বহু কলঙ্কের ঢাকা খুলে দেওয়া। চতুর চিরঞ্জীব নীরবে সহ্য করল কন্যার মৃত্যুর দুঃখ।

এদিকে চম্পাবতী দিনরাত্রি সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলতে লাগল রাজা অনঙ্গদেবকে।

সারাদিন রাজা অনঙ্গদেব থাকেন চম্পার ঘরে। রাতে চলে যান আপন নিবাসে। আবার ভোরের আকাশে শুকতারা উদয়ের আগেই ফিরে আসেন চম্পাবতীর আস্তানায়।

কৌশলে আপন অনুরাগী লোকেদের দিয়ে রটনা করেছিল চম্পাবতী যে বিদ্যুন্মালার মৃত্যুর আগেই রাজা অনঙ্গদেব কার্যব্যপদেশে মেদিনীপুর চলে গেছেন।

এরপর দ্রুত ঘটে চলল কতকগুলি ঘটনা।

চম্পাবতীর সেবায় রাজা হলেন মুগ্ধ। দিনরাত্রির সান্নিধ্য নরনারী পরস্পরকে কাছে টানে। যুক্তি দিয়ে, বিচার দিয়ে ঠেকানো যায় না পঞ্চশরের অব্যর্থ লক্ষ্য। চম্পাবতী পতিত হলেও সাধারণ ছিল না। তার ছিল বিশিষ্ট একটি মন আর গভীর অনুভূতি। সে এতদিন যে বৃত্তি করে এসেছে তাতে ছিল না তার মনের যোগ। এতদিনে সে যেন দেখতে পেল নতুন আলো। খুঁজে পেল সার্থক জীবনের পথ।

অনঙ্গদেবের সান্নিধ্যে চম্পাবতীর ঘটল জন্মান্তর। সে হল এক কন্যা সন্তানের জননী। সম্প্রতি সে ত্যাগ করেছিল পতিতাবৃত্তি, তবু তার মনে সংশয়, কন্যার দেহে কার রক্ত? রাজা অনঙ্গদেবের রক্ত কি? এখন একমাত্র চিন্তা চম্পাবতীর, কি করে সে ত্যাগ করে যাবে এই পতিতা নিবাস। কেমন করে এই পাঁকের ভেতর থেকে টেনে তুলবে তার কন্যাটিকে, কেমন করেই বা তাকে ফুটিয়ে তুলবে পদ্মের মত। গায়ে তার লাগতে দেবে না সে রূপনগরের বিষাক্ত নিশ্বাস।

রাজা উন্মত্ত হয়েছেন চম্পাবতীর প্রেমে। প্রকাশ্যে তিনি আর এখন চম্পাবতীর কাছে আসতে দ্বিধা করেন না। রাতে চম্পাবতীকে জ্বালতে হয় জলসাঘরের আলো। রাজাকে শোনাতে হয় গান। সারারাত রাজা চম্পাবতীকে দেন সান্নিধ্য।

চম্পাবতী একদিকে রোধ করে রাজার মত্ততা, অন্যদিকে স্নেহের আড়ালে পালন করে শিশুকন্যা।

একরাতে চম্পাবতীর চোখ গেল খুলে। রাজাকে গান শোনাচ্ছিল সে এমন সময় কোথা দিয়ে তার ঘরে ঢুকে এলো কন্যাটি।

বলল, আমার বাবা কই মা?

শিশুর মনে জেগেছে প্রশ্ন। চম্পাবতী কন্যাকে রাজার চোখের আড়ালেই রাখত। কারণ রাজা অনঙ্গদেব কন্যার কথা জানলেও কোনদিন দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না।

আজ রাজার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে হয়তো তাঁরই সৃষ্টির সার্থক-মূর্তি।

কন্যার প্রশ্নে নীরব হয়ে মাথা নিচু করে রইল চম্পাবতী।

মাকে অন্যমনস্ক দেখে মেয়েটি রাজা অনঙ্গদেবের দিকে ফিরে বলল, তুমি আমার বাবা, নাগো?

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাজা অনঙ্গদেব। চোখদুটো তাঁর জ্বলে উঠল। বলতে লাগলেন, আস্পর্ধা, কে শেখাল এই মেয়েটাকে আমি তার বাবা বলে!

পাথরের মত বসে রইল চম্পাবতী। একটি কথাও সে বলল না।

অনঙ্গদেব চলে গেলেন নিজের ঘরে।

চম্পাবতী সেই দুর্দিনে ত্যাগ করল বসনভূষণ। অতি সাধারণভাবে ভদ্র নারীর মতো সে দিনগুলি কাটাতে লাগল। কিন্তু মন থেকে তার গেল না পাষাণভার। রাজা অনঙ্গদেবের উপেক্ষা নির্মম হলেও সে ধীরে ধীরে তা সহ্য করে নিল, কিন্তু সহ্য করতে পারল না তার পরিবেশকে। এতদিনের পরিবেশ তার কাছে মনে হল সম্পূর্ণ নতুন, ভয়ঙ্কর আর অপরিচিত। শিশুকন্যাকে নিয়ে এই রূপনগর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে সে মনে মনে কৃতসংকল্প হল।

কিন্তু কেমন করে সে পথে বেরোবে। এই রূপনগরের অন্ধকার ছাড়া তার কাছে যে বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ অজানা।

এমন দিনে একটি আলোর রেখা দেখতে পেল সে।

কংসাবতীর জলে আবার স্নান শুরু করল চম্পাবতী। কি পবিত্র এই জলের প্রবাহ! শরীর শীতল হয়, মনের তাপও জুড়িয়ে যায়।

সহসা একদিন দেখা হল তার সেই সৌম্য পুরুষের সঙ্গে।

নদীর জলে দাঁড়িয়ে সে সূর্যোদয় দেখছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে গান এলো তার কণ্ঠে :

আলোকময় কর তনু
এ অতনু উৎসবে
দাও বঁধু মনমধু
ভর হৃদি প্রেমাসবে।

ধীরে ধীরে গাইতে গাইতে কখন সে কণ্ঠ ছেড়ে গাইতে শুরু করেছিল। তার প্রাণের কান্না মিশে যাচ্ছিল সুরের প্রবাহে, আর সুরের ধারা কংসাবতীর স্রোতের সঙ্গে মিশে বয়ে যাচ্ছিল কোন জ্যোতির্ময় লোকে।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি সিক্ত বসনে। গান শেষ করে ফিরে তাকাতেই চম্পাবতীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হল।

চম্পাবতী হতবাক। স্মিত হেসে তিনি বললেন, ঈশ্বরের প্রসাদ আছে তোমার কণ্ঠে।

প্রভু, আমি যে পতিতা।

একটু থেমে তিনি বললেন, কর্মেই মানুষ পতিত হয়, জন্মে নয়।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল নদীর কূলে। তাকে সেই সৌম্য পুরুষের কাছে নিয়ে এলো চম্পাবতী

বলল, এও পতিতার কন্যা প্রভু।

চম্পাবতীর কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি স্নেহচুম্বনে ভরে দিলেন।

এরপর সেই সৌম্য পুরুষ আসতে লাগলেন পতিতা চম্পাবতীর ঘরে। চম্পার জীবনে খুলে গেল আর এক দ্বার।

কিন্তু মানুষেব কৌতূহল সীমাহীন। তারা অকারণে পথেঘাটে উত্যক্ত করতে লাগল সাধুকে।

শেষে একদিন বললেন তিনি, —চম্পাবতী, কিছুদূরে কংসাবতীর কূলে আমার আশ্রম। যদি

তোমার অসুবিধে না থাকে তাহলে সেখানে তুমি থাকলে আমি বোধ করব না কোন বাধা, কোন বিক্ষেপ।

কৃতজ্ঞতার প্রণাম জানিয়ে বলল চম্পাবতী, —প্রভু, আপনার করুণার কথা আমি ভুলতে পারব না কোনওদিন। আমি কোনওরকমেই বাধা হয়ে দাঁড়াব না আপনার সাধনপথের। আপনি কৃপা করে যদি এই নিষ্পাপ শিশুকন্যাকে আপনার চরণে ঠাঁই দেন, তাহলে এই পঙ্ক থেকে সে মুক্তি পাবে।

সাধু সেই কন্যাকে সস্নেহে নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রমে। চম্পাবতী তার জীবনের সামান্য যা কিছু সম্পদ অবশিষ্ট ছিল তাই নিয়ে শহর থেকে দূরে তৈরি করল এক আশ্রম। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আরাধনায় মগ্ন হল পতিতা চম্পাবতী।

স্তব্ধ হয়ে গেছে আশ্রমের বাতাস। গাছের পাতাগুলিও মনে হচ্ছে স্থির হয়ে আছে।

বৈষ্ণবীকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল মাধবী।

এতদিন কেন বলনি, তুমি আমার মা! কেন, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে এতদিন দূরে সরে ছিলে মা।

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল মাধবী।

দীনদাস উঠে এসে হাত রাখলেন মাধবীর মাথায়।

বললেন, শান্ত হও মা, শান্ত হও। পতিতাকে জননী বলে স্বীকার করে নিতে গেলে মনের যে শক্তি চাই মা, তারই শিক্ষা আমি তোমাকে দিতে চেয়েছি এতকাল ধরে। আমার সে সাধনা আজ সার্থক হয়েছে মা।

মাধবী কান্নাভেজা গলায় বলল, আমি পিতা বলে আর কাউকে জানি না, শিশুকাল থেকে আপনাকেই পিতা বলে জেনেছি, আমার এ ভুলটুকু আপনি ভেঙে দেবেন না বাবা!

মাধবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন দীনদাস — শকুন্তলার জন্মদাতা ছিলেন বিশ্বামিত্র, কিন্তু শকুন্তলা ছিল যথার্থ কণ্বেরই কন্যা।

একটু থেমে আবার বললেন, মা, আনন্দের সঙ্গে তোমার মিলনে বাধা দিয়েছিলাম আমি। সেদিন নীরবে, অপ্রতিবাদে তুমি মেনে নিয়েছিলে আমার কথা। আমি জানতাম তোমার হৃদয়ের পাষাণভার। আমিও যে মা পাষাণ হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন কোনও পথে তোমাকে কোনও সান্ত্বনাই দিতে পারিনি।

কিন্তু আজ তুমি বুঝেছ আমার সেদিনের বাধার কারণ। আনন্দ যে তোমার ভাই নয়, এ প্রমাণ দেওয়া তোমার মায়ের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। রাজা অনঙ্গদেব তাঁর চিন্তার থেকে একমুহূর্তে তোমাকে ঝেড়ে ফেলে দিলেও প্রবল সংশয় থেকে যাচ্ছে মা।

শুকতারা জ্বলজ্বল করছে আকাশে। আচার্য দীনদাসের আশ্রম, চরাচর সবই স্তব্ধ। ঘুমের আচ্ছাদনে সব কিছুই ঢাকা।

পায়ে কার ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠল অমৃত।

কে, কে তুমি!

বড় অচেনা, বহুদূরের একটি মেয়ে অমৃত। চিনতে পারবে না একে।

মাধবী, তুমি এখানে, এ সময়ে!

করুণ হাসি হাসল মাধবী, —মহাকালের বুকে স্থান, কালকে সীমা দিয়ে কি রাখা যায় অমৃত।

অমৃত শুধু মাধবীর দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু থেমে বলল মাধবী, — একদিন তুমি আমার কাছে কচ আর দেবযানীর কাহিনী শুনিয়েছিলে না?

হাঁ, কেন মাধবী, সে কথা এখন কেন?

ভারী সুন্দর লেগেছিল তোমার কণ্ঠে সেই কাহিনীর আবৃত্তি। কিন্তু অমৃত আমি দেবযানী নই, তাই

গুরুগৃহের বিদ্যার্থীকে বেঁধে রাখতে চাই না। তার বিদ্যা ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে।। যশে পূর্ণ হোক তার পাত্র, সেদিন বহুদূরে থেকেও সুখী হবে তোমার মাধবী। এই নাও তোমার সেই বহু আকাঙ্ক্ষার গীতগোবিন্দ।

চাই না, চাই না মাধবী, মান চাই না, সম্পদ চাই না, শুধু চাই একটুখানি প্রাণের উত্তাপ।

এমন করে আমাকে ফিরিয়ে দিও না অমৃত। এই গ্রন্থ আমার প্রাণ, আমার সব। একদিন তোমাকে দিতে চাইনি এ গ্রন্থ। তোমার প্রার্থনা সেদিন পূর্ণ করতে পারিনি বলে তোমার চেয়ে কম ব্যথা আমি পাইনি অমৃত। আমার কথা শোন। আমি তোমাকে আমার মনের কাছে টানতে চেয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু একদিন আনন্দের অনুরোধে পড়ে তাকে ছবি আঁকার জন্য এই গ্রন্থখানি দিই, আর তারপর থেকেই তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ। তাই আমার মনে হয়েছিল, এ গ্রন্থ রাধামাধবের চরণছাড়া করলে রাধার মতো অনন্ত বিচ্ছেদের দুঃখে পড়তে হবে আমাকে। সেদিন এ গ্রন্থ তাই তোমার হাতে তুলে দিতে পারিনি। কিন্তু অমৃত, আমি আজ অনন্ত দুঃখের রূপ দেখতে পেয়েছি। আমি ফিরে পেয়েছি আমার জননীকে। দেখেছি দুঃখের অপার মহিমা। আমাকে দুঃখের পথের পথিক করে দাও অমৃত। তুমিই পার আমার ললাটে সেই বিচ্ছেদ-বেদনার তিলক পরিয়ে দিতে। সেই হবে আমাদের মিলন অমৃত। দুঃখের মাঝে এত আনন্দ, এত অসহনীয় আনন্দ! আমি পাগল হয়ে যাব অমৃত। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে, স্মৃতির পাতা মেলতে মেলতে যত চোখের জল পড়বে আমার, এই বকুলের ডালে ডালে তারাই ফুটবে বকুল হয়ে। তুমি এখনি চলে যাও অমৃত। শুকতারা এখনও নেভেনি। তুমি চলে গেলে ঐ শুকতারা আমার চোখের জলে টলমল করবে।

●

অপরাহ্নে অরুণোদয়

তিন বৃদ্ধের কাহিনী :

দোতলার জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলেন নিশিকান্তবাবু। তাঁর দেওয়ালঘড়িতে তখনও পাঁচটা বাজতে তিন মিনিট বাকি।

সুপর্ণের সময়ের ভুল হয় না। ঠিক পাঁচটায় সুপর্ণ রাস্তা পেরিয়ে এসে বেল টিপল। নিশিকান্তবাবু লম্বা দড়িটাতে টান দিলেন। অমনি উঠে গেল ছিটকিনি, দরজা খুলে গেল। এ সময়ে কাজের মেয়েটি থাকে না। সুপর্ণ ছিটকিনি লাগিয়ে ওপরে উঠে এল।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে আসতে আসতে রোজকার মতো সুন্দর এক টুকরো হাসি উপহার দিল সুপর্ণ। কেমন আছেন?

নিশিকান্তও হেসে জবাব দিলেন, দিব্যি।

ডানদিকের কোমরের তলা থেকে সারা পা-টা বাতে পঙ্গু। একজন রিটায়ার্ড মিলিটারি ম্যান পায়ে মোম গরম করে লাগিয়ে দেন, পায়ে পাউডার দিয়ে মালিশও করেন। ঘণ্টা দেড়েক পরিচর্যার পর তিনি চলে যান। এটা প্রভাতী অধিবেশন। তখন কাজের মেয়েটি থাকে। সে সময় খোলা-বন্ধের কোনও অসুবিধা হয় ন। মেয়েটি কিন্তু ঠিক চারটেতে চলে যায়। আটটাতে রাতের জন্য অন্য একটি আয়াজাতীয় মেয়ে আসে। সকাল আটটায় আবার আসে কাজের মেয়েটি। তখন আয়ার প্রস্থান।

সুপর্ণ চেয়ারটা টেনে নিয়ে নিশিকান্তের মুখোমুখি বসল।

একটু ঠাণ্ডা পড়েছে তাই না?

আমি তো ভীষণ উত্তাপ দেখছি চারদিকে।

তুমি ঠাণ্ডার কথা বলছ কি করে ইয়ংম্যান!

বেশ শব্দ করে হেসে উঠল সুপর্ণ। তা যা বলেছেন, রাজধানীর রাজনীতি একদম গরম হয়ে উঠেছে।

কে বলবে নিশিকান্তবাবু বাতে পঙ্গু। বাতের যন্ত্রণা শুরু হলে মুখখানা বেঁকেচুরে যায়। কিন্তু তিনিও আওয়াজ করেই সুপর্ণর হাসিতে যোগ দিলেন।

সুপর্ণ বলল, আর বলবেন না। পার্টির নেতারা এক একটা মশাল হাতে নিয়ে প্রবল তাণ্ডবে অগ্নিনৃত্য শুরু করে দিয়েছে। সারা দেশটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। কোন দমকলবাহিনী এ বিধ্বংসী আগুন নেভাবে!

নিশিকান্তবাবু আর রাজনীতিতে গেলেন না। তিনি বললেন, ওসব বুড়োখোকাদের কড়চা বন্ধ থাক। এখন বলো, আগামী শীত অধিবেশনে ডোভার মিউজিক কনফারেন্সে কে কে আসছেন?

এখন 'শুধু বাঁশি শুনেছি', কিছু কিছু হোর্ডিং চোখে পড়েছে, কিন্তু কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঠা হয়নি। তবে শুনেছি, আলি আকবর আর রবিশঙ্কর বাজাবেন।

কিছু সময়ের জন্য জানালা দিয়ে নিশিকান্তবাবু দৃষ্টিটাকে পাঠিয়ে দিলেন সুদূরে। আবার চোখ রাখলেন সুপর্ণের চোখে।

সেবার নেতাজি ইনডোরে প্রথমে সেতার নিয়ে বসলেন রবিশঙ্কর। আলাপ শুরু করলেন, রাগ আশাবরী। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল রাগের রূপ। 'রক্তজবার অনুরাগ ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে। আশাবরী তার দুটি হাতে ধরে রেখেছে নীল পদ্ম। পট্টবস্ত্রে সংবৃত তার দেহ। রত্নময়ী আশাবরী দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন এক বিদ্যাপ্রতিমা।' রবিশঙ্কর তাঁর সূক্ষ্ম ঝঙ্কারে আশাবরীকে ঘিরে যেন

সুরের বলয় সৃষ্টি করে চলেছেন। তা, অনেক সময় ধরে বাজালেন। শেষ হলে সারা প্রেক্ষাগৃহে করতালির ধ্বনি আর থামতেই চায় না।

এবার সরোদে রাগ পূরবী বাজালেন আলি আকবর। সুরের যাদুকর আলাউদ্দীনের যোগ্য পুত্র। এবারও রাগিণী রূপ ধরল। 'দূর্বাদলের মতো শ্যামকান্তিময়ী অপরূপ তনুশ্রী। যেন সাক্ষাৎ রতি-প্রতিমা। নিভৃত নির্জনে পূরবী বক্ষে এঁকে চলেছে পত্রাবলী।'

সুপর্ণের চোখে মুগ্ধতা। বলল, আপনি গায়ক না হলেও একজন সমঝদার শ্রোতা।

নিশিকান্ত বললেন, ওতে নিজের শোনার আনন্দ ছাড়া আর কি লাভ বল।

ও কথা কেন বলছেন, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটার কথা ভাবুন,

'একাকী গায়কের নহে তো গান
গাহিতে হবে দুইজনে,
একজন গাবে খুলিয়া গলা
আর একজন গাবে মনে।'

সুতরাং গায়কের সঙ্গে সমঝদার শ্রোতার তফাৎ বড় কম। দুজনের আসন হৃদয়ের বড় কাছাকাছি, একেবারে মুখোমুখি।

নিশিকান্ত বললেন, তোমার কথা শুনে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল সুপর্ণ। ছেলেবেলা থেকে কোনও নেশাই আমাকে ছুঁতে পারেনি, শুধু একটি ছাড়া।

নেশাটা গানের নিশ্চয়ই।

ঠিক ধরেছ তুমি। গ্রামে মানুষ। এদিকে-ওদিকে যাত্রাগান প্রায়ই লেগে থাকত। বন্ধুদের সঙ্গে যাত্রা শুনতে প্রায়ই বাড়ি থেকে পালাতাম।

পালার ভেতর যুদ্ধবিগ্রহ যখন চলত তখন বন্ধুরা নড়েচড়ে বসত আর বড় বড় চোখ করে দেখত। কিন্তু বিবেকের গান শুরু হলেই হাই উঠত ওদের। আর ঠিক তখনই যেন আমার প্রাণটা জেগে উঠত। আমি কান পেতে গান শুনতাম। মগ্ন হয়ে যেতাম সুরে। 'অন্ধমুনির পুত্রবধ' পালার মৃত সিন্ধুকে বয়ে এনে রাজা দশরথ রেখে দিয়েছেন অন্ধ পিতামাতার পদতলে। দুঃসংবাদ শোনামাত্র হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন মুনি আব মুনিপত্নী। সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট থেকে বেহালাবাদক উঠে দাঁড়িয়ে করুণ সুরে বেহালা বাজাতে লেগে গেল। যত বেহালা কাঁদে আমিও কেঁদে অস্থির হই। সেদিন ফেরার পথেও আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারিনি।

একটু থেমে সুপর্ণ বলল, কাব্য করে বলতে গেলে আপনার হৃদয়ের আকাশে সুরের পাখিগুলো রোজ উড়ে উড়ে গান শুনিয়ে যায়।

বড় কষ্ট সুপর্ণ।

কেন!

এখন আর গান শুনতে যেতে পারি না।

বিছানায় শুয়ে মনে মনে গান করেন নিশ্চয়।

স্মৃতিচারণ করি সুপর্ণ। বড়ে গোলাম আলির সুরের টানে ঝাঁক বেঁধে উঠে আসছে নন্দনের পাখিরা। তারা ঠুংরির ছড়ানো দানাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আবার চলে যাচ্ছে ব্যোমপথে নন্দনলোকে।

নিশিকান্তবাবুর হাতে হাত রাখল সুপর্ণ। বলল, আকণ্ঠ সুরের সুধা পান করেছেন, সাধ্য কি জরা আপনাকে জীর্ণ করে।

হঠাৎ মুখখানা বেঁকে গেল নিশিকান্তবাবুর। কোমর থেকে ডান পায়ের তলা পর্যন্ত একটা বিদ্যুতের শক খেলেন। মাঝে মাঝে এরকম হয়। বললেন, দেহ থাকলেই তার চারদিকের উপসর্গগুলোকে এড়ানো যায় না। শরীর সুস্থ থাকলেই আনন্দ, অসুস্থ থাকলে বিষাদ।

সুপর্ণ বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। শরীর যদি বিগড়োয় তাহলে তাকে উপেক্ষা কবে আনন্দে মেতে উঠা যায় না। মহাপুরুষরাও সব সময় শরীরের কষ্ট ভুলতে পারেননি।

নিশিকান্তবাবুর কনকনানিটা ধীরে ধীরে কমে এলো। মুখ থেকে কষ্টের রেখাগুলো মুছে যেতে লাগল।

এই একটি মানুষ! সুপর্ণ দেখেছে, একটুখানি কষ্টও সহ্য করতে পারেন না নিশিকান্তবাবু। কিন্তু দেহ থেকে যন্ত্রণা সরে গেলে সহাস্য বদন। বলে চলেছেন। ঘুরে বেড়াচ্ছন যেন বসন্তের উপবনে, ফুরফুরে হওয়ায়। কে বলবে আজ সাত বছর তিনি বাতের আক্রমণে আংশিকভাবে পঙ্গু। শয্যাগত।

নিশিকান্তবাবু বিপত্নীক আজ এগার বছর। একমাত্র মেয়ে তৃষা বিবাহসূত্রে এলাহাবাদে। ঘোরতর সংসারী। ছেলেমেয়ে স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ি, আত্মীয়স্বজন সামলে তার পক্ষে একদিনের জন্যও কলকাতায় বাবাকে দেখতে আসা আজকাল প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রাণ চাইলেও পেছনে আঁচল টেনে রেখেছে পরিস্থিতি। তবে ফোন আসছে প্রায়ই। প্রথম ইন্দ্রিয় বঞ্চিত থাকলেও দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় মোটামুটি তৃপ্ত। চোখে না দেখুন, গলাটা তো শুনতে পান।

খুবই মর্যাদার সঙ্গে সংসার করছে মেয়েটা। বাড়ির বড় বৌমা। দেওর, ননদ, জায়েরা সামান্য সমস্যাতেও তৃষার পরামর্শ চায়। সর্বদা নির্মল হাসিটি লেগে আছে মুখে।

ছোট দেওরটি বৌদি ছাড়া চারদিকে অন্ধকার দেখে। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় তার টিফিন গুছিয়ে দেওয়া থেকে, সিনেমার পয়সা যোগানো পর্যন্ত সবই করেছে তৃষা।

একবার কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেকিংয়ে গিয়েছিল উত্তরকাশী। উৎসাহ জুগিয়েছিল তৃষা। ছেলেরা একটু ডাকাবুকো হবে, এটাই তার চিরদিনের ইচ্ছে। নিজের ন'বছরের ছেলেকে স্বামীর সঙ্গে ক্রিকেট মাঠে পাঠিয়ে দেয় তৃষা। এখন থেকে তৈরি হোক, বুঝুক, খেলুক। মনে আর গায়ে জোর আসুক।

হ্যাঁ, তার উৎসাহে উত্তরকাশী গিয়েছিল দেওরটি।

ঠিক সাতদিন পরে ভোরবেলা হাতে খবর কাগজটি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালেন তৃষার শ্বশুরমশায়।

বৌমা?

বাবা!

কাগজের এই জায়গাটায় একটু পড়ে দেখ তো মা।

কাজ ফেল উঠে দাঁড়াল তৃষা। শ্বশুর মশায়ের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে তাতে চোখ রাখার সঙ্গে সঙ্গে তৃষার শ্বশুরমশায় আঙুল ঠেকিয়ে পড়ার জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

তৃষা পড়ে দেখল, উত্তরকাশীর পাহাড়ে প্রচণ্ড ধস নেমেছে।

ধক করে উঠল বুকটা। কিন্তু মুখে ফুটল না কোনও উদ্বেগের ছবি। বৃদ্ধ মানুষটি বিচলিত হয়ে পড়েন, এটা একেবারে চাইছিল না তৃষা।

সে পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য বলল, বিয়ের আগে উত্তরকাশী গিয়েছি বাবার সঙ্গে। সে কি এক-আধটা পাহাড়! সারি সারি পাহাড় ঘিরে রেখেছে জায়গাটিকে। তার কোন পাহাড়ের কোন অংশে ধস নেমেছে তা কে বলবে। সুতরাং সামান্য কারণে উদ্বেগ বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই।

শ্বশুরমশায় বৌমাকে কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন দেখে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানা হাতে নিয়ে সামনের বাগানে স্বামীর কাছে চলে গেল তৃষা।

কাগজটার বিশেষ জায়গায় পড়তে ইঙ্গিত করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

যখন স্বামীর পড়া শেষ হলো, তখন তৃষা বলল, আমি উত্তরকাশীর ট্যুরিস্ট অফিসের ম্যানেজার আর বি যোশীর ফোন নাম্বার দিচ্ছি। আমি যখন ওদিকে বেড়াতে যাই তখন ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তুমি জান, গত মাসেও আমি উর্মিলা যোশীর চিঠি পেয়েছি। ওঁকে ফোনে ধর, আমি কথা বলব।

ফোনে পাওয়ামাত্র তৃষা বলল, দাদা কেমন আছেন, আমি তৃষা বলছি। চিনতে পেরেছেন তাহলে?

ভাল ভাল, সবাই ভাল আছি। উর্মিলা, সোনা মোনা, এরা সব কেমন আছে?

সবাই ভাল আছেন জেনে ভাল লাগল। আচ্ছা দাদা, ওখানে পাহাড়ে নাকি খুব ধস নেমেছে?

তিন দিন বন্ধ ছিল রাস্তা! মানুষজনের কোনও ক্ষতি হয়নি তো?

ও, দু'পারে যাত্রীবোঝাই গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাতে মানুষজনের তো কষ্ট হবেই। তবে ধসে যে কোনওরকম প্রাণহানি ঘটেনি, সেটাই মহাদেবের অশেষ কৃপা।

আচ্ছা আমার দেবরটি কি দেখা করেছিল আপনার সঙ্গে?

সে কি, আপনি ওদের দশজনকে একদিন ডিনার খাইয়ে দিয়েছেন!

এখন ওরা কোথায় বলবেন? গঙ্গোত্রীর দিকে চলে গেছে।

সেখানকার ট্যুরিস্ট লজে আপনি ওদের একদিন থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?

ছেলেরা আপনাকে ওখান থেকে ফোন করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে? আপনি যা করেছেন দাদা, তাতে আমিই কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

যাব দাদা যাব, আপনাদের জামাইবাবু আর ভাগনেকে নিয়ে একবার ওদিকে যাবার খুব ইচ্ছে আছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কোয়ার্টারেই উঠব। প্রণাম দাদা প্রণাম। বাচ্চাদের আদর আর ঊর্মিলাদিকে নমস্কার জানাবেন।

অভিনয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে নিশিকান্তবাবুর। উনি মেয়ের বিষয়ে এমনি অভিনয় করেই জানিয়েছেন সুপর্ণকে। আচ্ছা, নিশিকান্তবাবু....

কথা শেষ করতে না দিয়েই নিশিকান্ত বললেন, আমাকে তোমার মেসোমশাই বলে ডাকতে কি খুব আপত্তি আছে সুপর্ণ?

না না, একটুও না। আমি কিছুদিন থেকেই এরকম একটা ইচ্ছা মনে মন পোষণ করছিলাম।

ডেকে ফেললেই খুশি হতাম।

অল্প হেসে সুপর্ণ মাথা নেড়ে বলল, এবার থেকে মেসোমশাই বলেই ডাকব।

এবার বল, কি বলতে চেয়েছিলে?

আমি বলতে চাই মেসোমশাই, আপনি শুধু সঙ্গীতপ্রেমীই নন, অভিনেতাও। এখন আপনার দেখা একজন শেষ্ঠ অভিনেতা সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকেই আমি কিছু শুনতে চাই। আর কেনই বা তাকে আপনার শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে?

একজন তো নয় সুপর্ণ আমাদের রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনেতাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন। আবার বিশেষ এক এক ধরনের অভিনয়ে এক একজনেব তুলনাহীন দক্ষতা। তবু একজনের কথা এই মুহূর্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে, যিনি কিছু সময়ের জন্য মহাকালের প্রবাহকেও অনেকটা পেছনে হটে যেতে বাধ্য করেছিলেন।

মহাকালের প্রবাহকে শুধু স্তব্ধ করে দেননি, তাকে পিছু হটতেও বাধ্য করেছিলেন, সেটা কি রকম মেসোমশাই? কথাটা শুনে খুবই অবাক লাগছে।

তাহলে শোন, আমরা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে একবার উপস্থিত হয়েছি একটা নাটক দেখতে। কবি মধুসূদনকে নিয়েই নাটক। নামভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন তিনি স্বনামধন্য এক নট।

সবই প্রায় ঠিক ছিল কিন্তু বয়সের দিক থেকে মাইকেলের ভূমিকাভিনেতা ছিলেন একেবারে বেমানান। খ্যাতনামা মানুষটির মুখে তখন অতি বার্ধক্যের বলিরেখা। চড়া মেকাপ দিয়ে তাকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা মনে মনে কিছুটা কৌতুক বোধ করেছিলাম। ভাবছিলাম, এই মানুষটি কিভাবে সুন্দরী যুবতী রেবেকার কাছে প্রেম নিবেদন করবেন।

সুপর্ণ বলল. এইসব দেখেই বোধকরি বহুদর্শী মানুষেরা বলেছেন, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।

নিশিকান্তবাবু বললেন, এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে আকচার ঘটে চলেছে। তবে নাটক দেখতে গিয়ে প্রেমিক যুবককে যদি ওরকম বৃদ্ধের মূর্তিতে দেখতে হয় তালে মধুর রস আর মধুর থাকে না, একেবারে তিক্ত রসে পরিণত হয়।

সুপর্ণ বলল. রেবেকা আব মধুসূদনের প্রেম-দৃশ্য আপনারা কিভাবে উপভোগ করলেন?

সুপর্ণ, শুনলে অবাক হয়ে যাবে, সেদিন আমাদের কৌতুকের ভাবনা একেবারে মহাবিস্ময়ে পরিণত হলো!

কি রকম?

সেই বলিরেখা, দৃষ্টিকটু চড়া মেকআপ, মুহূর্তে কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমরা চোখের সামনে দেখলাম, অদৃশ্য এক যাদুকরের ছোঁয়ায় সেই বৃদ্ধ রূপান্তরিত হয়ে গেছেন এক পূর্ণ যুবকে। অসাধারণ আবেগ ভরা গলায় তিনি তাঁর হৃদয়ের কথা উজাড় করে চলেছেন প্রেমিকার কাছে। তখন চোখের সামনে কোনও বৃদ্ধ নেই, যুবতী নেই, কোনও মধুসূদন কিংবা রেবেকা নেই, অনন্ত কালের এক প্রেমিক, অনন্তকালের এক প্রেমিকার কাছে প্রেম নিবেদন করে চলেছেন।

সারা হল হাততালিতে উত্তাল। আমিও তাদের সঙ্গে করতালি দিয়ে চলেছি। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা সুপর্ণ। তাই বলেছিলাম, ঐ অভিনেতা মহাকালের এঁকে দেওয়া বার্ধক্য-চিহ্নকে মুছে ফেলে বেশ কয়েক বছর আগে ফেলে আসা যৌবনের দিনগুলোতে কিছু সময়ের জন্যে হলেও ফিরে গিয়েছিলেন।

সুপর্ণ সাগ্রহে জানতে চাইল, কে সেই কালজয়ী অভিনেতা মেসোমশাই?

অনুমান কর।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সুপর্ণ বলল, হার মানলাম।

নাট্যাচার্য...

তাঁকে শেষকরতে না দিয়ে সুপর্ণ বলল, শিশির কুমার ভাদুড়ী!

হ্যাঁ, ক্ষমতা কাকে বলে তা তিনি দেখিয়েছেন। একেবারে জাত অভিনেতার যাদু ছিল তাঁর মধ্যে।

একটুখানি থেমে বললেন, অনেক দেখেছি তাঁর বই। শাজাহান নাটকে দ্বৈত রোল করেছেন।

কি রকম?

পিতাপুত্রের ভূমিকায়। একই নাটকে শাহাজান আর ঔরঙ্গজেব। দু'একটি দৃশ্য বাদে বাদে কখনো পিতা কখনো পুত্র মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে চুল দাড়ি গোঁফ, ফেজ আর জোব্বা। সাদার জায়গায় কালো আর কালোর জায়গায় সাদা।

সুপর্ণ জানতে চাইল, এত বড় নাটকে কোথাও কি পিতাপুত্রের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি?

আমার যদ্দূর মনে পড়ছে, শেষ অঙ্কের কোনও একটা দৃশ্যে দেখা হয়েছিল।

সুপর্ণ কৌতূহলী হয়ে উঠল, এবার তো ধরা পড়ে যাবার কথা।

না, সেই দৃশ্যে শাজাহানের ঘরখানা ছিল প্রায়ান্ধকার। মঞ্চের একটি কোণের দিকে মুখ করে অনুতাপের ভান করছে ঔরঙ্গজেব। দর্শকরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না তার মুখ। তবে অনুতপ্ত পুত্রের আত্মসমালোচনার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল দর্শকেরা।

সুপর্ণ বলল, এবার অভিনয়ের কথা বলুন।

ভায়েদের ভেতর সব থেকে সুপুরুষ ঔরঙ্গজেব। কিন্তু সে যখন কারো দিকে তাকায় তখন তার চোখে ফুটে ওঠে সাপের ক্রূরতা। কারও মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার সময় তার গলার স্বরে উত্তাপ আর উত্তেজনার লেশমাত্র থাকে না। বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকে বাগজাল বিস্তার করে নিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে তার।

একদিকে ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের এই কপটতা, নিষ্ঠুরতা; অন্যদিকে স্নেহশীল, নিরুপায়, হতভাগ্য পিতার হাহাকার একই শরীরে ভিন্ন অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করছেন অভিনেতা। এটি সামান্য শক্তির পরিচয় নয় সুপর্ণ। অল্প সময়ের ভেতরেই আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে একটি মানুষের স্বভাবচরিত্র। শক্তিমান না হলে কি এই পরিবর্তন সম্ভব?

ঠিকই বলেছেন মেসোমশাই। শিশির ভাদুড়ীদের মতো প্রতিভা ঘন ঘন রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ান না।

আর একজনের অভিনয় দেখেছিলাম সুপর্ণ।

যাকে বলে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর অভিনয়ের ক্ষমতা দেখে। প্রায় সারাটা নাটক নেপথ্যে

থেকেছেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরের ওঠানামা আর সংলাপের অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগে মনে হচ্ছিল অভিনেতা আমাদের সামনে মঞ্চের ওপর বিচরণ করছেন।

এসব আলোচনার সময়ে নিশিকান্তবাবু শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে থাকেন। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে কাব্যগন্ধময় ভাষায়।

সুপর্ণ বলল, আমি চিনতে পেরেছি অভিনেতাকে।

বল তাঁর নাম?

রক্তকরবীর রাজা শম্ভু মিত্র।

সঠিক উত্তর।

সুপর্ণ হেসে বলল, মেসোমশাই, বাংলা কুইজের পরিচালক যেমনভাবে বলেন, 'সঠিক উত্তর' আপনিও ঠিক সেই স্টাইলে বললেন।

ঠিক বলেছ। ঐ যে টি, ভি, খানা রয়েছে, প্রায় সারাক্ষণ তো ওর ওপর চোখ পেতে পড়ে আছি। প্রভাব আসবে না?

আচ্ছা মেসোমশাই, বর্তমান সমাজের ওপর টি. ভি. র প্রভাব ভাল কি মন্দ?

আমার মতে, মিশ্র।

আপনি বলতে চাইছেন, ভালমন্দ মেশানো।

অবশ্যই।

একটা অন্তত মন্দের দিক তুলে ধরুন।

যখন-তখন অপরিকল্পিত নাচ। তাল, সুর ছন্দ সবই আছে, নেই সুপরিকল্পিত বৈভব আর বিন্যাস।

সুপর্ণ বলল, আমার ভুল হলে ক্ষমা করে দেবেন মেসোমশাই, কিন্তু আমি টি. ভি. র ঐ নাচগুলোকে অপরিকল্পিত বলতে পারছি না।

কি রকম? ব্যাখ্যা কর।

একটা ধুরন্ধর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে এই নাচগুলো হচ্ছে। তাই এ নাচগুলো সুপরিকল্পিত।

আরও একটু স্পষ্ট করে বল।

প্রতিটি জাতির মেরুদণ্ডই তরুণ সমাজ। এই সময়টাই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তোলার সময়। অনাবিল আনন্দ, অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্যের ভেতর দিয়ে ওদের যৌবনশক্তি জেগে উঠবে, এটাই তো কাম্য। কিন্তু সুস্থ পরিবেশের ভেতর দিয়ে তাদের পরিচালিত না করে যদি প্রথম রিপুর প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা হয় তাহলে অল্পদিনের ভেতরেই তাদের মেরুদণ্ড নুয়ে আসবে, তারা বিকৃত স্বপ্ন দেখতে থাকবে। দেশব্যাপী নবনব জাগরণের পরিবর্তে আসবে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর সুপ্তি।

এর জন্য তুমি কাকে দায়ী বলে মনে কর?

অবশ্যই বিদেশী শক্তির সূক্ষ্ম, সুচারু পরিকল্পনায় দক্ষ এজেন্টের মাধ্যমে এ কাজ চলছে।

আমাদের দেশের সরকার কি এটা জানেন না?

খুব জানেন। তবে তাদের ভেতর সৎ ও বীর্যবান ব্যক্তি লাখে একটি। নিজেদের সিংহাসন বাঁচাতে আর আখের গোছাতেই তাদের সব ভাবনা শেষ। দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবার সময় কোথা! বেকার তরুণ-তরুণীদের ওরা আশার আলো দেখাচ্ছে। দূরে আগুন জ্বেলে দিয়ে বলছে, ওটাই তোমার লক্ষ্যবস্তু, যাও ঝাঁপিয়ে পড়।

লক্ষ লক্ষ পতঙ্গের মতো ওরা উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই রাজনীতির আগুনে।

নিশিকান্তবাবু বললেন, আমরা বোধহয় আমাদের আলোচনায় বিষয় থেকে একটু দূরে সরে যাচ্ছি। কথা হচ্ছিল, দূরদর্শনে দেখানো নাচ নিয়ে। তরুণ-তরুণীদের ওপর তার বিকৃত প্রভাব সম্বন্ধে। সাধারণত দূরদর্শনের ঐ নাচগুলো সিনেমা থেকে তুলে এনে দেখানো হয়। সিনেমাতে তো সেন্সারের ব্যবস্থা আছে। সেখানে বোর্ডের মেম্বাররা কি করছেন?

সুপর্ণ বলল, আমি একটি কথা হলফ করে বলতে পারি, ঐ ধরনের সিনেমার প্রযোজকরা কখনও প্রকাশ্যে মেম্বারদের উৎকোচ কিংবা উপাহর দেন না ঐসব নগ্ন, উত্তেজক, নোংরা দৃশ্য পাশ করিয়ে

নেবার জন্য। আর একথাও আমরা বুকে হাত রেখে বলেত পারি, মেম্বাররা এতই নিবিষ্ট হয়ে ঐসব দৃশ্য দেখেন আর উপভোগ করেন যে, সমাজ-সংসার, এমনকি নিজের ছেলেমেয়েদের কথা ভুলে যান সে সময়ে।

নিশিকান্তবাবু হেসে উঠলেন। তাঁর পাশ ফেরার দরকার হতেই মুখখানা বেঁকে গেল।

সুপর্ণ তাঁকে সাবধানে ধরে একপাশ করে দিল। কিছুক্ষণ পরে পাশ ফেরার কষ্টটা সয়ে নিলেন তিনি।

খুব কষ্ট হলো মেসোমশাই?

'না' বললে যে মিথ্যে বলা হয়ে যাবে সুপর্ণ। তবে প্রতিদিন কষ্ট পেতে পেতে একটি উপকার হয়েছে।

কি?

সহ্যশক্তি বেড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আগে একটুতেই কাতর হয়ে পড়তাম, এখন তেমনটি হই না।

নিচে বেল বাজল।

নিশিকান্তবাবু বললেন, এ সময় আবার কে এলো!

সুপর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি দড়ি টেনে ছিটকিনি খুলতে যাবেন না, আমি যাচ্ছি।

না না, তুমি যাবেকেন. আমি টানছি, তুমি বরং সিঁড়ির কাছ গিয়ে দেখ, কে আসছে।

ছিটকিনি খুলে গেল। সুপর্ণ সিঁড়ির ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, পোস্টম্যান ঢুকেছে। নিচ থেকে ছেলেটি হেঁকে বলল, ক্যুরিয়ারের চিঠি। নিশিকান্ত বসুকে সই করতে হবে।

সুপর্ণ বলল, আপনি একটু উঠে আসুন ওপরে।

যুবকটি তর্‌তর্ করে উঠে এলো সিঁড়ি বেয়ে।

নিশিকান্তবাবু দেহটাকে বেঁকিয়ে সই করার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, যুবকটি সুপর্ণের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি সই করে দিলেও চলবে।

তাই হলো।

নিশিকান্তবাবু বললেন, যাবার সময় বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিয়ে যাবেন বাবা।

যুবকটি মাথা নেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

বালিশের একপাশে রাখা চশমাটা তুলে নিয়ে চোখে পরলেন নিশিকান্তবাবু। লম্বা খামের ওপর তাঁর নামটা টাইপ করে লেখা।

কাঁপা কাঁপা হাতে উনি চিঠিটা ছিঁড়তে যাচ্ছিলেন, সুপর্ণ বলল, ঐ তো টেবিলে ছুরি রয়েছে, আমাকে দিন, আমি বের করে দিচ্ছি।

সুপর্ণ ছুরি চালিয়ে মুখটা কেটে দুটি চিঠি বের করল। একটি ফোল্ড করা খোলা চিঠি, অন্যটি আর একটা খামে ভরা।

কি আশ্চর্য! সুপর্ণ দেখল, বড় খামের ভেতরে মাঝারি একখানা খাম। তার ওপরে তার নাম লেখা।

সে বেশখানিক অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার বলুন তো! আপনার খামের ভেতর আমার নাম লেখা একটা খাম কেউ পাঠিয়েছেন। এ কি করে সম্ভব হলো!

ভেতর থেকে খামে ভরা চিঠি আর পাটকরা চিঠি বের করে নিশিকান্তবাবুর হাতে ধরিয়ে দিল সুপর্ণ।

নিশিকান্তবাবু ফোল্ডকরা চিঠিখানার ভাঁজ খুলে পড়লেন। পড়ার পর সহাস্যে বললেন, খামের চিঠিখানা তুমি খুলে পড়, সব জানতে পাবরে।

খাম খুলে প্রথমেই পাওয়া গেল একটি পাঁচশো টাকার নোট। তার সঙ্গে রয়েছে টুকরো একটি চিঠি।

শ্রদ্ধের দাদা,

আপনাকে আমি কোনওদিন দেখিনি কিন্তু আপনি আমার একান্ত আপনজন। সহোদর ভাইয়ের মতো। রাত দশটার পর বাবার সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়। তখন বাবার মুখ থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনি।

আমি এলাহাবাদে থেকে বাবার কিছুই করতে পারি না, আপনি রক্তসম্পর্কের বাইরের মানুষ হয়েও রোজ কতক্ষণ করে বাবাকে সঙ্গ দেন। আপনার এ ঋণ আমরা শোধ দেব কি করে!

মা থাকলে আপনাকে ছেলের মতো আদর-যত্ন করত। আজ যখন মা নেই তখন দূর থেকে বোন দাদার জন্য একটুখানি প্রণামী পাঠাল। সামনে ভাইফোঁটা। মুখোমুখি বসে ফোঁটা দিতে পারলে আনন্দ আর তৃপ্তির সীমা থাকত না। সে সুযোগ যখন নেই তখন ঐ প্রণামীতে আপনি একটা কিছু কিনে নিলে দারুণ খুশি হব। আপনি যদি কিছু দিতে চান তাহলে একটা ভাল বাংলা উপন্যাস দেবেন। সঙ্গে অবশ্যই আশীর্বাদ।

বোন তৃষা

সুপর্ণ বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল। চিঠিখানা পড়ে সে অভিভূত হয়ে গেল। কিন্তু বাইরে তার আবেগের কোনও প্রকাশ ঘটল না। সে তার চিঠিখানা এগিয়ে ধরল নিশিকান্তবাবুর দিকে। নিশিকান্ত চিঠি হাতে নিয়ে পড়লেন। খুশিতে ঝলমল করে উঠল তাঁর মুখ।

বললেন, নিজের মেয়ে বলে বলছি না সুপর্ণ, একটা বড় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে চালাবার ক্ষমতা রাখে সে। তার স্বভাবেব ভেতর এমন একটা মাধুর্য আছে যা চুম্বকের মতো সবাইকে কাছে টেনে নেয়। তাছাড়া অকৃত্রিম সরলতাটুকু ওর সম্পদ।

তৃষাকে চোখে দেখিনি কিন্তু তার চিঠি পড়ে তার স্বভাবের ভেতর মাধুর্যটুকু আমার চোখে পড়েছে। আপনি আমাকে ওর ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবেন, আমি কথা বলে নেব।

নিশিকান্তবাবু বললেন, ঐ তো আমার ফোন, তুমি ওটা ব্যবহার করতে পার যখন খুশি। আমি নিজে আজকাল আর ব্যবহার করতে পারি না। ডাক্তার ডাকতে হলে কিংবা কোথাও খবর দিতে হলে কাজের মেয়েটি অথবা আয়াটি ডায়েল করে আমার হাতে ফোন ধরিয়ে দেয়। তৃষা একবার আমাকে দেখতে এসে বেশ কয়েকদিন ছিল। সে সময় দুজনকে টেলিফোনের ব্যাপারে পাকা ট্রেনিং দিয়ে গেছে।

টি. ভি. র ওপরে ডায়েরিটা আছে। 'টি'তে তৃষা মিত্র খুঁজে পাবে।

সুপর্ণ ডায়েরিটা এনে নাম্বার বের করে ডায়েল করল।

আমি নিশিকান্ত বসু মশায়ের বাড়ি থেকে কথা বলছি। ওঁর মেয়েকে একটু ডেকে দিন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি ভালই আছেন।

কিছু সময় ফোন ধরে রইল সুপর্ণ। ওপারে তৃষা এসে গেছে।

আমি সুপর্ণ দিদিভাই। এইমাত্র তোমার চিঠি এলো। সঙ্গে ভাইফোঁটার সওগাত।

না না, সামান্য কি বলছ, ওটি অসামান্য। আমি ঐ টাকা কোনও কিছুতেই খরচ করতে পারব ন। আমার বোনের ভাইফোঁটার প্রথম উপহার, ওকে খরচ করে কি নষ্ট করা যায়! ওটি আমৃত্যু ব্যাঙ্কে জমা থাকবে। নমিনি, শ্রীমতী তৃষা মিত্র।

এটাকে আমার খেয়াল বলতে পার, আনন্দেব প্রকাশ বলতে পার।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা শুধু প্রথমবারেব জন্য। দ্বিতীয়বার যদি তুমি দাদাকে মনে রেখে কিছু পাঠাও তাহলে তা অবশ্যই সবান্ধব ভোজনে অথবা মনোমতো পরিচ্ছদে খরচ হবে। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বল!

কি বললে, তোমার 'বৌদির জন্য প্রণাম'। ওটি জমা রেখে দেব পরজন্মের জন্য।

না না, আমার নিজের কোনও সংসার নেই। পেছনের কোনও টান থাকবে বলে আমি পৈতৃক বাড়িখানাও বেচে দিয়েছি। এখন দক্ষিণ কলকাতার একটি বাড়িতেই পেইং গেস্ট।

দিব্যি আছি। ভাবখানা, 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।'

মেসোমশাই, এই ধরুন, অনেক বিল উঠে গেল।

দুই

এবার সুপর্ণ যাবে সদানন্দবাবুর বাড়ি। নামের সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে মানুষটির। ভাল মানুষ, আনন্দময় মানুষ। সদানন্দবাবু প্রায় নিরোগ, তবে বয়সের ভারে আজকাল হাঁটাচলা করতে কষ্ট হয়। তিনি নিচের তলাতে থাকেন, নিজেই দরজা খোলেন। কাজের মেয়েটি দু'বেলা আসে। বাসন মেজে, কাপড় কেচে, তরিতরকারি কেটেকুটে, রান্না সেরে চলে যায়। বাজার-হাট ও-ই করে, আবার ফ্রিজেও গুছিয়ে রেখে যায়। সন্ধ্যের দিকে আবার আসে, এঁটো বাসন খোয়। কাপড়-জামা ইস্ত্রি করার থাকলে নিজেই করে ফেলে। তারপর চা পর্ব সেরে বাড়ি চলে যায়।

রাতে সদানন্দবাবুর কাছে কেউ থাকে না, আবার থাকেও বটে। বাড়ির সামনে লাল সিমেন্টে মাজা একটা বারান্দা। ওপরে শেড আছে। দু'তিনজন বিহারী রিকশাওয়ালা রাত দশটার পর ডান দিকের গলিতে রিকশা রেখে লোহার গেট তালাবদ্ধ করে দাওয়ায় উঠে আসে। ওখানেই রাতের বিশ্রাম। গেটের চাবি দেওয়া-নেওয়ার জন্য রাত দশটা, সাড়ে দশটা অবধি জেগে থাকেন সদানন্দবাবু।

বাঁ দিকের পাঁচিলের গায়ে একটা ফলন্ত বাতাবিলেবুর গাছ আছে। রাতে এই তিনটি বিহারীর জন্য ওগুলো রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। দারুণ বাতাবি। টক যেটুকু মিষ্টি তার তিনগুণ। সদানন্দবাবু বাতাবি খেতে বড় ভালবাসেন। আবার অকাতরে ঐ ফল জনে জনে বিতরণ করে আনন্দ পান। রিকশাওলারা খুশিমতো খায়।

ভোরে ফুটপাথে যে মেয়েটি পুজোর জন্য কুচো ফুল বেচে, তার কাছে থেকে ফুল কেনেন সদানন্দবাবু। স্ত্রী লক্ষ্মীর একটি পট প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন পুজো করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁর প্রয়াণের পর পটটিতে কিন্তু ধুলো জমেনি, সেটি ঝাড়পোঁছ করেন স্বয়ং সদানন্দবাবু। ফুল বেলপাতা বাতাসা দিয়ে মনে মনে পুজোও করেন।

ফুলওয়ালী মেয়েটি একদিন বলল, আপনার বাতাবি গাছটিতে সোনার মতো বাতাবির রঙ ধরেছে।

পরের দিন তিন-তিনটে বাতাবি দান কবলেন ফুলওয়ালীকে। স্ত্রীর লাগানো গাছ। তিনি মানুষকে দিতে ভালবাসতেন, খাওয়াতেও ভালবাসতেন। তাঁর দিল ছিল দরাজ, হাত দানের জন্য প্রসারিত। সমপর্যায়ের মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য কখনও কিছু দিতেন না। সত্যিকারের অভাবগ্রস্ত, দুঃখী মানুষকে তিনি ঠিক চিনে নিতে পারতেন। অর্থের অভাব নেই সদানন্দবাবুর। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া টাকা অঢেল নাহলেও কম নয়। নিজে বেশকয়েক বছর সরকারি মৎস্যবিভাগের পরিদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। সে টাকার অঙ্কটাও ছিল বেশ আকর্ষণীয়।

একমাত্র ছেলে আনন্দবর্ধন আমেরিকায়। ইন্টারন্যাশনাল এক বুক কোম্পানির সংযোগ-রক্ষাকারী অফিসার হিসেবে কাজ করছে। এ ব্যাপারে বছরে অন্তত একবার করে তাকে ওয়ার্ল্ড ট্যুর করতে হয়। দু'বছর বাদ দিয়ে তৃতীয় বছরে সে কলকাতায় আসে মাত্র তিন-চারটি দিনের জন্য। প্রথম বছরটি মুম্বাই ছুঁয়ে চলে যায়, দ্বিতীয় বছর দিল্লি, তৃতীয় বছর কলকাতা। হিসেব কষে যাওয়া-আসা। সারা দুনিয়া ট্যুরের প্রোগাম নিয়ে বেরোয় সে। এক জায়গায় বেশি সময় দেবার সময় কোথা তার।

কিন্তু আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটতে দেখলেন সদানন্দবাবু। স্ত্রী কমলা মাত্র চার দিনের জ্বরে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। জ্বরের দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলেন সদানন্দবাবু, কিন্তু বাধা দিলেন কমলা।

তোমার একটুতেই অস্থিরতা। কোথায় সামান্য একটু গা ছ্যাঁক ছ্যাঁক অমনি ছুটলে ডাক্তার ডাকতে। পারও বটে। প্রবল জ্বর আসেনি, কাঁপুনি দিয়েও নয়, সুতরাং তোমার হুট করে ডাক্তার ডাকার কোনও মানেই হয় না।

চতুর্থ দিনে জ্বর একেবারে চড়চড় করে চড়ে গেল। হুঁশ নেই রোগীর।

সদানন্দবাবু একেবারে দিশাহারা। ডাক্তার এলেন। একগাদা ওষুধের ব্যবস্থাপত্র রচনা করা হলো, নানারকম রক্ত পরীক্ষার নির্দেশ।

স্ত্রীর যে হাল তাঁকে একা ফেলে যান কি করে!

এ সময় হাল ধরল ঐ রিকশাওলারা। তারা পালা করে থাকতে লাগল। ডাক্তারবাবুকে রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে এলো, আবার ছেড়েও দিয়ে এলো। রক্তেব রিপোর্ট, ওষুধ সবই এনে দিল ওরা।

মুল্লুক থেকে রিকশাওলা লাল্লুরামের একটা ভাইপো এসেছিল। বছর পনেরো বয়েস। খুড়োদের জন্যে খানা পাকাবে আর রিকশা চালানো শিখবে কলকাতার রাস্তায়। তাকে লাগিয়ে দেওয়া হল দিনরাতের কাজে। দুটি নার্স রইল পালা করে। এবেলা-ওবেলা বড় ডাক্তার আসতে লাগলেন গাড়ি চড়ে।

কিন্তু রোগী রইল চৈতন্য-রহিত।

সদানন্দবাবু আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। ফোন তুললেন ছেলেকে খবর দেবার জন্য।

বেল বাজল। বাধা পড়েছে, তাই ফোনটা আপাতত রেখে দিয়ে দরজা খুলতে গেলেন।

দরজা খুলেই হকচকিয়ে গেলেন সনান্দবাবু। আনন্দবর্ধন দাঁড়িয়ে।

বাবাকে দেখে সে পায়ের ধুলো নিতে যেতেই সদানন্দবাবু পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

আনন্দবর্ধন বলল, দিল্লিতে এসেছিলাম, কেন জানি না মায়ের জন্যে মনটা বড় অস্থির হল, তাই এক ফাঁকে চলে এলাম।

সদানন্দবাবু আর কোনও কথা না বলে ছেলের হাত ধরে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

কেমন যেন একটা অশুভ ছায়া দেখতে পেল আনন্দবর্ধন। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, মা কই?

ততক্ষণে সদানন্দবাবু ছেলের হাত ধরে এনে তুলেছেন তার মায়ের ঘরে।

সংজ্ঞাহীন দেহটি পড়ে আছে বিছানায়। আনন্দবর্ধনের বুক ঠেলে উচ্ছ্বসিত কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু রোগীর ঘর ভেবে সে বহু কষ্টে কান্না রোধ করল।

সদানন্দবাবু সংক্ষেপে তাঁর স্ত্রীর অসুখ ও চিকিৎসার ব্যাপারটা বললেন। এবং এইমাত্র যে উনি আনন্দবর্ধনকে ধরার জন্য ফোন তুলেও কলিং বেল বাজায় ফোনটি রেখে দিয়েছেন, সে কথা বলতে ভুললেন না।

আনন্দবর্ধন হাঁটু গেড়ে বসে মায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কাতর গলায় বলতে লাগল, মাগো, চেয়ে দেখ তোমার আনন্দ এসেছে।

দু'তিন বার বলার পরে একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। চোখে না দেখলে শুধু মেডিকেল সায়েন্সের উপর নির্ভর করে বিশ্বাস করা কঠিন।

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন সদানন্দবাবুর স্ত্রী। প্রথমে যেন একটা কুয়াশার পর্দার ওপার থেকে তাকাচ্ছেন বলে মন হল। পরে দৃষ্টি স্বচ্ছ হল। আনন্দবর্ধনের মুখের ওপর স্থির হল সে দৃষ্টি। মুখে অপাব শান্তি আর আনন্দের আভাস দেখা গেল।

আনন্দবর্ধন আবেগে আবার মা মা বলে ডেকে উঠল। শৈশবের একটি স্মৃতি ছবি হয়ে উঠল তার চোখের ওপর।

স্কুলবাস তাকে গেটের বাইরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। মা কতক্ষণ দরজা খুলে তাকিয়েছিল পথের দিকে। তাকে বাস থেকে নেমে দাঁড়াতে দেখে দৌড়ে এসে বুকে চেপে ধরল। লেবুর সরবৎ ছিল তার খুব প্রিয়। হাতে ধরা বোতল থেকে সেটি আগে তাকে খাওয়ালো, তারপর বুকে তুলে নিয়ে গালে চুমু দিয়ে ঢুকে এল ঘরের ভেতর।

কতদিনের কত স্মৃতি. সে কি ভোলা যায়। মায়ের স্নেহসাগরের তল কে কবে কোথায় পেয়েছে!

সেই রাতেই ছেলের কোলে মাথা রেখে, স্বামীর হাতে হাত রেখে পবম শান্তিতে চলে গেলেন সদানন্দবাবুর স্ত্রী।

আজ পুরনো স্মৃতির ঘোরে ছিলেন সদানন্দবাবু। সুপর্ণ এল সন্ধ্যে ঠিক সাড়ে ছটায়।

গল্প করতে বসলেন দুজনে মুখোমুখি।

আজকি সংবাদ মেসোমশাই?

হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ার উনি উঠলেন।

ঘর থেকে একখানা খাম বেরকরে এনে সুপর্ণের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ে দেখ, আমার সুখ-দুঃখের সব খবর ওর ভেতরেই পাবে।

আশ্চর্য! সুপর্ণের মনে হল, একই দিনে দু'বাড়ি থেকেই চিঠির প্রসঙ্গ উঠল, কিছুটা অভাবনীয় বইকি।

এখন খামের থেকে চিঠিখানা টেনে বের করল সে। ইউ, এস. এ-র টিকিট আঁটা খাম।

ছোট্ট এক টুকরো চিঠি। আঁকাবাঁকা লাইন। বড় ছোট হরফে সাজানো।

প্রিয় দাদাই,

তুমি কেমন আছ? আমরা সবাই ভাল আছি। তোমাকে অনেকদিন আগে দেখেছি, আবার তোমার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে কবছে। এবার গেলে তোমার কোলেবসে আমি বাতাবি লেবু খাব।

মা তো জানে না, তাই বাবার কাছে আমি বাংলা পড়ি, লিখি আর কথা বলি। অনেক ছড়া শিখেছি, গেলে শোনাব।

ভাল থেক, আমার হাপি নিও।

তোমার কনককেতন।

সুপর্ণ বলল,দাদুর জন্যে নাতির মন কেমন করা একখানা চিঠি।

অবশ্য, কিছু কিছু আবেগ ওর নিজস্ব হলেও বাক্যের গঠনে ও এখনও বাবার সাহায্য নিচ্ছে।

তা হোক ধীরে ধীরে ও নিজেই লিখে ফেলবে আস্ত একখানা চিঠি। আচ্ছা মেসোমশাই, কনককেতন নামটি ওর কে দিয়েছে?

আমি দিয়েছি সুপর্ণ। একদিন তোমার মাসিমা বললেন, ছেলের নাম তোমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখলে। দুজনেই রইলে আনন্দময়। এখন আমি কি আমার নাতির ভেতর বেঁচে থাকতে পারি না?

সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কনককেতন। তোমার মাসিমার নাম কনক, তাই মিল দিয়ে নাম রাখলাম।

মাসিমা নিশ্চয়ই নাতির নাম শুনে খুশি হয়েছিলেন?

উনি কিছু সময় মৌন হয়ে বসে থেকে আঁচলে চোখ মুছেছিলেন।

সুপর্ণ বলল, উনি যে নাম শুনে অভিভূত হয়েছিলেন, এটা তারই প্রমাণ।

দেখ সুপর্ণ, 'স্নেহ নিম্নগামী' কথাটা যে কত সত্য তা আমি এখন গভীরভাবে উপলব্ধি করছি।

কি করম?

নাতি চলে গেছে সেই কবে, কিন্তু যাবার আগে এই বৃদ্ধের গলা জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছিল, সে স্পর্শ এখনও আমি মুছে ফেলতে পারিনি। প্রায় সব সময় মনে হয় সে আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। তার কচি গায়ের একটা গন্ধ পাচ্ছি। বাবার গাঢ় পীতাভ রঙ আর মায়ের দুধসাদা রঙের মিশ্রণে ওর রঙটা হয়েছে ঝকঝকে কাঁচা সোনার মতো। ও যাবার দিন যখন বিদায় নেবার জন্য হাত নাড়ছিল তখন পতাকার মতো ওর হাতটাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সত্যিই ও কনককেতন। একেবারে সার্থকনামা।

সুপর্ণ বলল, নামটি সত্যিই সুন্দর। আচ্ছা মেসোমশাই, একটা কথা অভয় দেন তো বলি।

নিঃসংকোচে বল।

এ বয়সে নিঃসঙ্গ থাকতে আপনার কি খুব ভাল লাগছে?

কার লাগে বল?

তাহলে আপনার এমন দরদী ছেলে আর নাতি থাকতে আপনি ওদের সঙ্গছাড়া কেন?

স্বেচ্ছায় বাবা! হঠাৎ আকাশে আষাঢ়ের মেঘ ঘনিয়ে উঠল, বকের পাতি ভেসে গেল, ঝর ঝর করে ঝরেপড়ল এক পশলা বৃষ্টি মুক্তোর দানার মতো, ফুটে উঠল কদম কেয়া. অমনি মনটা নেচে উঠল। কিন্তু সারা বছর যদি ক্রমাগত বৃষ্টি ঝরতে থাকে, আর ঐ সুন্দর ছবিগুলো বারবার ফিরে ফিরে আসে, তাহলে কি ভাল লাগবে?

তা লাগবে না।

তেমনি সারাক্ষণ কারও কাছে জড়িয়ে থাকলে তার ভাল লাগার কথা নয়। হঠাৎ দেখাসাক্ষাৎ শীতের রোদ্দুরের মতো বড় মিঠে সুপর্ণ। দীর্ঘক্ষণ রোদ্দুরে থাকলে উপভোগটা জ্বালা হয়ে উঠবে। তাই নিঃসঙ্গতা একদিকে যেমন শূন্যতা অন্যদিকে তেমনি স্বস্তি।

সুপর্ণ বলল, এরপর কোনও কথা বলতে গেলে কেবল তর্কের খাতিরে তর্ক করতে হয়। আপনার ফিলজফিটা আপাতত মেনে নিলাম।

সদানন্দবাবুর অভিজ্ঞতার পরিধি অনেকখানি। নিশিকান্তবাবু যেমন সঙ্গীতে অনুরাগী, সদানন্দবাবু তেমনি কাব্যে। একবার তাঁদের বিয়ের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে এক বন্ধু তাঁর হাতে গীতবিতানখানি ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, সুখে-দুঃখে, বিরহ-মিলনে যে পথটুকু তোমরা পার হয়ে এসেছ, আবার বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতে যে পথটুকু পার হবে তারই সঙ্গীতালেখ্য এই গ্রন্থ। প্রকৃতির অনুভূতি, প্রেমের অনুভূতি, ধ্যানের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে এই গীত সুধারসমধুর কাব্যে।

সেদিন থেকে গীতবিতান তাঁর অবসর সময়ের সঙ্গী। সংগীতের সাহায্য ছাড়াই তিনি গীতবিতানের কাব্যরস গ্রহণ করেন। সদানন্দবাবু বলেন, দুঃখও যে সুখের মতো আস্বাদ্য হতে পারে তা আমি গীতবিতান পাঠ করেই জেনেছি।

সুপর্ণ এবার প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে বলল, ওড়িশা সরকারে ফিশারী ডিপার্টমেন্টে আপনি বহুদিন কাজ করেছেন, সমুদ্রতীরবর্তী মানুষজনকে অনেক নিকট থেকে দেখেছেন, তাদের সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

. তুমি কি সমুদ্রতীরবর্তী জেলেদের কথা জানতে চাও?

না, তেমন কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষজনের কথা নাও হতে পারে। ঐসব অঞ্চলে বসবাসকারী যে কোনও মানুষের কথা বলুন, যাকে আপনি অনেক কাছ থেকে দেখেছেন।

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক হাতড়ালেন সদানন্দবাবু। তাঁর চোখে-মুখে অনুসন্ধানের ছবিটিই ফুটে উঠল। একসময় খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ঝিলিক দিল তাঁর চোখে।

সুপর্ণ, একটি মজার মানুষের কথা তোমাকে বলতে পারি। না, মানুষটি ঠিক মজার নয় বরং বিস্ময়ের।

জিজ্ঞাসু চোখ সুপর্ণের, কি রকম?

আমি একটা বোটে চড়ে সার্ভে করতে বেরিয়েছিলাম। খাঁড়িগুলো দেখে দেখে মাছের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আঁচ করছিলাম। ওখানে জেলেদের কোনও আড্ডা আছে কিনা, অথবা কোনও বসতি না থাকলেও নুলিয়াদের বসানো যায় কিনা, সে সবের খোঁজ করছিলাম। কিন্তু কোথাও বিশেষ কোন মানুষজন দেখতে পেলাম না। নদী যেখানে সমুদ্রে এসে মিশেছে, তার একপারে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। ঐ জঙ্গল ছিল কর্ণিকা রাজস্টেটের অধীনে।

জঙ্গলের চরিত্র ছিল একটু অভিনব। লোকালয় ছেড়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার পথ আসার পর জঙ্গলের শুরু। লম্বায় দীর্ঘ হলেও চওড়ায় বেশ কম। ঐ প্রস্থ ভেদ করেই বনের ওপারে পৌঁছনো যায়। যারা গোপনে কাঠ কাটে, মধু সংগ্রহ করে অথবা শশক, সজারু, হরিণ মারে, তারা বনের ভেতর সুঁড়ি পথ তৈরি করে রেখেছে। ঐ পথে দুঃসাহসী ভবঘুরে কেউ ঢুকে পড়লেই বন চিরে বেরিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু বন থেকে বেরুলেই দেখা যাবে দূরে আর একটা বন। একটি বন থেকে আর একটি বনের মাঝখানে যে প্রান্তর, সেটি বিচিত্র এক তৃণভূমি।

বিচিত্র কেন?

ঐ প্রান্তরে যে সব হরিণ, বুনো মহিষ ইত্যাদি পশুর পাল কয়েক যুগ ধরে বিচরণ করেছে তাদের বর্জিত পদার্থে সৃষ্টি হয়েছে ঐসব তৃণভূমি। দূর্বা ঘাস যেন সেলাই করে রেখেছে সারা প্রান্তর। পর পর ঘাসের আস্তরণ সৃষ্টি হতে হতে অনেক পুরু গদির আকার নিয়েছে। অবশ্য কোথাও কোথাও এখনও রয়েছে ধুলোর প্রান্তর।

একমাত্র রাজাবাহাদুরই লোকলস্কর নিয়ে মাঝে মাঝে শিকারে আসেন এই বনে। তখন বন্দুকের

গুলিতে, মানুষ, পশুপাখির চিৎকারে সারা বন কেঁপে ওঠে। তারপর বেশ কিছুকাল আবার নিস্তব্ধ।

এই বন এলাকার বাইরে একটা অদ্ভুত জায়গা ছিল।

সুপর্ণ জানতে চাইল, অদ্ভুত কেন?

নদী যেখানে এসে ধারা মিলিয়েছে, সেখানে বহুকাল থেকে উঠেছে একটা অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ধীরে ধীরে গাছপালা গজিয়ে জায়গাটা বনের আকার নিয়েছে। কয়েকটা বন্য শূকর আর এক ঝাঁক মৎস্যভুক বক জাতীয় পাখি ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর দেখা ছিল না সেখানে।

রাজস্টেটের ফরেস্ট আর ঐ দ্বীপের মাঝখানে কোথাও হাঁটু, কোথাও বা বুক সমান জল। নদীর মূল খাত থেকে উপচে পড়া জলের সঞ্চয় ওটি?

একসময় একটি সৎ দরিদ্র মানুষ ঘটনাচক্রে রাজবাড়ির তাড়া খেয়ে এই জল ভেঙে দ্বীপে গিয়ে ওঠে। সেখানে ধীরে ধীরে সে এক বসতি পত্তন করে। একটি পোষ্যপুত্র যোগাড় করে আনে গোপনে লোকালয়ে গিয়ে। সেই দ্বীপের রাখাল রাজা দুর্যোধনের একদিন মৃত্যু হয়। তার পোষ্যপুত্রটি একসময় সংসারী হয়ে এই দ্বীপেই তার জীবন কাটায়। একটি কন্যাকে উত্তরাধিকারী রেখে সেও একদিন বিদায় নেয় সংসার থেকে।

এরপর যাযাবর স্বভাবের এক তরুণ-কিশোর ঐ কিশোরী কন্যাটির উদ্ধার-কর্তা হিসেবে হাজির হয় রঙ্গমঞ্চে। তাকে সে নৌকোযোগে রাজার লোলুপ দৃষ্টির বাইরে অন্য এক জনহীন দ্বীপে নিয়ে চলে যায়। সেখানে কালে তাদের বহু সন্তানসন্ততি ভূমিষ্ঠ হয়। এখন তাদের নয়া বসতি নদীর বাঁকের মুখে।

আমি যখন মৎস্যজীবীদের সন্ধানে ফিরছিলাম তখনই হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ঐ মানুষটির সঙ্গে।

একটা অতি বিশাল বটগাছের গুঁড়িতে সে বসেছিল হেলান দিয়ে। তার চারদিক ঘিরে চলেছিল বেশ বড় রকমের একটা কর্মযজ্ঞ।

সুপর্ণ জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন মানুষটির বয়স কত?

ওর নাতির বড় ছেলে আমার প্রশ্নের উত্তর বলেছিল, কত্তাবাবার হিসেব অনুযায়ী সাড়ে পাঁচ কুড়ি। অর্থাৎ একশো দশ বছর।

সুপর্ণ অবাক হয়ে বলল, এতো বছর! সদানন্দবাবু বললেন, আমি মানুষটির মুখে মাকড়শার জালের মতো প্রচুর রেখা ফুটে উঠতে দেখেছি। কানে বেশ কম শোনে। চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের তীক্ষ্ণ। গলার স্বর শুনলে মনে হবে, দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে। উচ্চারণ স্পষ্ট, বেশ কমেণ্ডিং ভয়েস।

আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, বাবুলোক এসেছে, বসতে দাও।

অবশ্য লোকটি ওড়িশা ভাষায় কথা বলছিল, আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছিল না।

ওরা খেজুর পাতার চাটাই এনে আমাকে ঐ বৃদ্ধের কাছে বসতে দিল।

নানা বয়সের মেয়ে-পুরুষ মিলে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন আমাকে ঘিরে ধরেছে। ওদের ঘরবাড়ি কিছু দেখলাম না, কেবল একখানা বড় আকারের নৌকো এই বিশাল বটগাছের সঙ্গে বাঁধা আছে দেখলাম। তারই ভেতর ঘর-গৃহস্থালির নানারকম জিনিস ডাঁই করা।

রোদ জল আর মাটির সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষগুলোর গায়ের কাপড় লালচে-ধূসর।

একটি বেশ স্বাস্থ্যবান যুবক ছেলে এতক্ষণ বৃদ্ধের কাছে বসেছিল। তাকে ইঙ্গিতে আরও কাছে টেনে নিয়ে বৃদ্ধ যেন কিছু বলল।

যুবকটি এবার আমার দিকে ফিরে বলল, আজ বড় একটা শুভদিনে আপনি আমাদের এখানে এসেছেন বাবুমশায়। আজ আমাদের পড়ি-ঠাকুর্দা নতুন ঘরে ঢুকবেন আজ্ঞা। সেজন্যে সামনের জঙ্গলের ভেতর মেয়েরা রান্নাবান্না করছে। আপনি কৃপা করে দুটি ভোজন করলে কেতার্থ্য হই।

বললাম, অবশ্যই। তবে আমাদের নৌকোয় আরও চারজন রয়েছে, তারা নিজেরাই রান্নাবান্না করে খাবার ব্যবস্থা করছে।

আজ্ঞা, তা কি হয়। ওরা সবাই এখানে খাবে। রান্নার জায়গায় খবর চলে গেছে।

বললাম, তোমাদের যা ইচ্ছে তাই হবে। তবে তোমাদের পড়ি-ঠাকুর্দা যে নতুন ঘরে ঢুকবেন, সেটা কি রকম? এখানে নতুন পুরাতন কোনও বাড়িরই তো চিহ্ন দেখছি না।

যুবকটি বলল, আমরা এতকাল সকলে মিলে ওই নৌকোতেই থেকে এসেছি, কিন্তু কিছুকাল হলো কত্তামশাইয়ের ইচ্ছে হয়েছে, একা থাকবেন।

বললাম, ঘরটি কি ঐ বনের ভেতরে কোথাও তৈরি করে রাখা হয়েছে?

যুবকটি বটগাছের ওপর দিকে হাত তুলে দেখাল।

আমি ওপরদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কাণ্ড আর মোটা দুটো ডালের খাঁজে পাখির বাসার মতো একটা আস্তানা তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য বাসাটি একটি মানুষের বসবাসের উপযোগী। বনের কাঠ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়েছে বাসাটির দেওয়াল আর মাথার কাঠামো। ছাউনি চাপানো হয়েছে তালপাতার।

আমি বললাম, দিব্যি বাড়িখানা বানানো হয়েছে, কিন্তু একশো দশ বছরের একজন মানুষ একা কি করে ওখানে থাকবেন?

ওঁর ইচ্ছে তাই, তার ওপর আর কথা নেই। নিচ থেকে কপিকলের সাহায্যে ওঁর খাবার আর জল ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। নদীর দিকে ঘরের একটি পাশ ঝুঁকে রয়েছে। ওদিকের নালিপথে সব আবর্জনা নদীতে চলে যাবে।

বললাম, যদি কর্তার কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে?

উনি পাঁচটা নানা আকারের কাঠি নিজের কাছে রেখেছেন। সেগুলোর কোনটাতে কি প্রয়োজন বোঝায় তাও বলে দিয়েছেন। এখন কপিকলে যে কাঠি নেমে আসবে সেই অনুযায়ী কত্তার প্রয়োজন মেটানো হবে।

এখন ঐ যুবকটির সঙ্গে আমি সামনের জঙ্গলের দিকে চললাম। ওখানেই বনের মধ্যে রান্নার কাজ চলছিল। আমার ঐ বনের ভেতরের অংশটা দেখার ইচ্ছা ছিল। তাই চলেছিলাম যুবকটির সঙ্গে।

ওর কাছে জানতে চাইলাম, এই যে এখানে তোমরা পঁচিশ-তিরিশ জন রয়েছ, এরা সবাই তো আর এক পরিবারের নয়, তবে কে কোথা থেকে এখানে এসে জুটল?

পাঁচ-সাতজন জামাইকে বাদ দিলে সবার ভেতর কত্তাবাবার রক্ত আছে।

আচ্ছা, যদি একাই থাকার ইচ্ছে তাহলে গাছের ওপর না থেকে একটু দূরে বনের ধারে থাকতে পারতেন।

কত্তা বলেন, বহুকাল মানুষ, জানোয়ার আর জঙ্গল, নদীর সঙ্গে কাটিয়েছি, এখন পাখপাখালির সঙ্গে শেষের কটা দিন ঘর বেঁধে কাটাই। ওদের গান অনেক কাছ থেকে শুনি, নীল আকাশে ওদের ওড়াউড়ি দেখি। এই বটগাছ আমাকে অনেক ছায়া, অনেক শান্তি, অনেক সান্ত্বনা দিয়েছে। এ গাছ আমার মায়ের মত। শেষ সময়টা মাকেই আগলে থাকব।

এরপর আর কোনও কথা চলে, বলুন?

না, এটিই শেষ কথা।

আমি বন দেখলাম, মেয়েরা রান্না করছে। তাও দেখলাম। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে অতিথিকে নমস্কার করল। তারপর কিন্তু কোনও কৌতূহল নেই, যে যার কাজে লেগে গেল।

চুল দেখে বুঝলাম, ওরা ইতিমধ্যে স্নান সেরে নিয়েছে। ওদের ভেতর তিন-চারটি কিশোরী বউ আর পাঁচ-ছ'টি কুমারী কন্যাকে দেখলাম।

দু'জন ছাড়া প্রত্যেকেরই মাজা শ্যামলা রঙ। কয়েকজনকে দেখে চোখ ফেরানো যায় না, ঠিক যেন রঙ না দেওয়া মাটির প্রতিমা।

আমার সঙ্গী যুবকটির নাম, সম্ভবত প্রহ্লাদ। তাকে কেউ কেউ পহ্লাদ বলে ডাকছিল।

বনে ঘুরতে ঘুরতে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের বাজারহাট, কেনাকাটা কোথা থেকে হয় পহ্লাদ?

প্রায় বিশ মাইল দূরে শনি-মঙ্গলবার একটা গঞ্জের হাট বসে। একমাস দু'মাসে একবার করে

নৌকো নিয়ে ওখানে গিয়ে দরকারি জিনিস কিনে আনা হয়। তবে কত্তা বলেন, 'চাহিদা যত কম হবে, সুখ তত বেশি হবে।' একেবারে না হলে নয়, এমন জিনিস ছাড়া আমরা কিছু কিনি না।

দু'একখানা পরার গামছা আর দু'একটা মোটা শাড়ি হলেই আমাদের সারা বছর চলে যায়। বউ-ঝিবা কাচপোকার টিপ তৈরি করে পরে। কচি তালপাতা আর খেজুর পাতা দিয়ে খুব সুন্দর গয়না গড়ে পরে। তার ওপ ঝিনুক ঘষেঘষে চাকতি তৈরি করে গলায় ঝোলায়। তা ছাড়া লাল-হলুদ ফলের বীজ তো আছেই।

তোমরা চাল, নুন, তেল, কাপড়চোপড় সবই ঐ গঞ্জের হাট থেকে সংগ্রহ করে আন তো?

পহল বলল, কাপড়চোপড় হাট থেকে আনতে হয়। নুন, আমাদের মেয়েরা লোনামাটি চেঁছে এনে তৈরি করে। আর মাছের ভেতর থেকেই তেল পাওয়া যায়। ঐ যে ফাঁকা মাঠটা দেখছেন, ওখানে প্রচুর ধান ফলে। গঞ্জে ঐ ধান বিক্রি করে আমরা দরকার মতো চাল কিনে আনি।

গরু দেখছি না তো?

ও সব ঝামেলা বাড়াতে কত্তা মশাইয়ের বারণ। আমরা ঝুম্ চাষ করি। ধান ভালই ফলে। যেদিন হাটে যাই সেদিন মাছ, কচ্ছপ আর কচ্ছপের ডিম নিয়ে যাই। ওসবের সঙ্গে বন থেকে সংগ্রহ করা চাকভাঙা মধু থাকে।

একটু থেমে পহল আবার বলল, এক বুড়ো কবরেজ হাটে আসেন এক মাস অন্তর। তাঁর জন্য বন থেকে অনেক শেকড়বাকড়, পাতাপত্র, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হয়। তিনি আসেন চার ক্রোশ (দু'মাইলে এক ক্রোশ) দূর থেকে। ওঁর গাঁয়ের দু'একজন লোক হাটে আসে, তাদের সঙ্গে উনি জলকাদা পেরিয়ে আসা-যাওয়া করেন। চোখে আজকাল বেশি ঠাওর হয় না। আবছা দেখে, গলা চিনে আমাদের কাছে এগিয়ে আসেন। তখন ওঁর চোখমুখ চকচক করে ওঠে।

কত্তা আমাদের পইপই করে বলে দিয়েছেন, কবরেজ মশায়ের কাছ থেকে কোনও রকম দাম না নিতে। উনি বলেন, কবরেজ তো নয়, সাক্ষাৎ দেবতা, কত মানুষের সেবা করছেন, তেনার থেকে কি দাম নেওয়া যায়!

আপনি শুনলে অবাক হবেন, কত্তা মশায় কোনোদিন ওষুধ খাননি, আমাদেরও দু'এক রকম পাতার রস ছাড়া কিছু খেতে দেন না। বলেন, আপনি সারবে অসুখ। ওষুধ খেলে অসুখ আবার যখন হবে, তখন ওষুধ ছাড়া আর সারবে না।

আমি বললাম, অতি সুন্দর স্বাস্থ্য তোমাদের।

রোদে ঝড়ে জলে পুড়ে ভিজে আমাদের শরীর একদম তৈরি হয়ে আছে। কত্তা বলেন, সারাদিন অসুরের মতো খাটবি, পেট পুরে খাবি, মড়ার মতো ঘুমাবি, শরীরে কোনও রোগব্যাধি থাকবে না।

তোমরা বোধহয় কর্তার কথা খুব মেনে চল?

ওঁর কথাই তো সব। মুখ থেকে একটা কথা খসল কি, সবাই সেই মতো কাজে লেগে গেল। বাইরে যাক আর ঘরে থাকুক, সবাইকে তাঁর অনুমতি নিয়েই চলাফেরা করতে হবে।

এখনও এই বয়সে, উনি কি ভালমন্দ সবকিছু ভাবতে পারেন?

পহল বলল, মাথা একদম সাফ। ওঁর কথামতো কাজ করলে আমাদের কোনোরকম বিপদ আপদে পড়তে হয় না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কোন ঠাকুরের পুজো কর?

পহল বলল, আমরা কোনও ঠাকুর পূজা করি না। কত্তা শিখিয়েছেন, চারজনকে নমস্কার করতে।

কোন চারজন?

প্রথমে ভোরবেলার সূর্যকে নমস্কার করে বলতে হয়, তুমি অন্ধকার সরিয়ে আমাদের আলো দেখাও তাই তোমাকে নমস্কার।

দ্বিতীয় নমস্কারটি আমরা জানাই নদীকে। বলি, হে নদীমাতা তোমার স্রোতের মতো সচল রেখেছ আমাদের। তুমি জল দিয়ে খাদ্য দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছ, তোমাকে নমস্কার।

তৃতীয় নমস্কারটি নিবেদন করি, নদীতীরের বটগাছটিকে।

বলি, তুমি তোমার ডালে শত শত পাখিকে আশ্রয় দাও, ঝড়ের ঝাপটা থেকে আমাদের রক্ষা কর, তোমার ছায়া আমাদের তাপের হাত থেকে বাঁচায়, তোমাকে নমস্কার।

শেষ প্রণামটি জানাই মাটি মাকে।

বলি, মা, তুমি সব্ব জীবকে আশ্রয় দিয়েছ তোমার মাটিতে। পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, নদনদী, সবই তোমার বুকে ভর করে রয়েছে। তুমি আশ্রয় না দিলে আমরা তলিয়ে যেতাম রসাতলে। তাই তোমাকে প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম।

পহল বলল, এরপর আর একটি প্রণাম বাকি থাকে।

সে প্রণামটি কোথায় জানাতে হয় পহল?

গুরুজনের ছিচরণে। সবশেষে গুরুজনকে প্রণাম করে আমাদের কাজ শুরু হয়।

আমি পহলের পিঠে হাত রেখে বললাম, চমৎকার।

সুপর্ণ, সেদিন আমি পথের ধারে একান্নবর্তী পরিবারের একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি, এখন একটি শান্তির সংসারে হৃদয়বিদারক কোনও ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটবে।

সুপর্ণ অবাক হয়ে বলল, কি এমন ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটল ওদের সংসারে?

আমি বছর পাঁচেক পরে নৌকোযোগে ওখানে আর একবার গিয়েছিলাম। দু'তিনটে মাছ ধরার নতুন জাল সঙ্গে নিয়েছিলাম, ওদেব উপহার দেব বলে। আরও কিছু কাপড়-চোপড়, খাবারদাবার ছিল সঙ্গে। শুকনো চিঁড়ে-গুড়, কয়েক কেজি ডাল, আধ কুইন্টাল আলুও নৌকোতে প্যাক করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি প্রথমে জায়গাটা খুঁজে পাইনি। মনে হলো, সামনের বাঁকটাই হবে। কিন্তু সেই বিশাল বটগাছটা তো দেখছি না। কোথায় গেল সে গাছ? আমি আরও খানিক দূর নৌকো বেয়ে যেতে বললাম মাঝিকে। গতবারের মাঝি আমাকে জায়গাটা খোঁজার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারত, কিন্তু এ মাঝি নতুন।

হঠাৎ একজন দাঁড়ী বলে উঠল, বাবু আর দূরে গিয়ে কাজ নেই, জায়গাটা এখানেই।

আমি এতক্ষণ ওকে লক্ষ্য করিনি, ও পুরনো নৌকাতে দাঁড়ী হিসেবেই তো কাজ করেছিল। এখন এই নতুন নৌকোয় কাজ নিয়েছে।

বললাম, তুমি কি করে জানলে? বটগাছ কই?

তা বলতে পারব না বাবু, তবে নদীর বাঁকের কাছে ঐ জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সে-ই শিমুল গাছ, ডালে ডালে লাল ফুল ফুটে আছে।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সত্যিই তো সেই পাঁচ বছর আগেকার লাল ফুলে ভরা শিমূল গাছ। ঋতুটাও বসন্ত। কিশোরী চুমকি সেবার গাছের তলা থেকে দুটো লাল ফুল কুড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বটগাছটা থাকবে না অথচ জায়গাটা থাকবে, এ কি করে সম্ভব! তাছাড়া বহুদিনেব বেড়ে ওঠা গোটা একটা পরিবার কি উবে গেল এখান থেকে।

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে আমাকে খুব বেশি বিলম্ব করতে হল না।

আমি বাঁকের মুখে নৌকো রেখে সবে ডাঙায় নেমে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি এমন সময় দূর থেকে একটা ডাক ভেসে এল, বাবু ম-শা-ই।

আমি শব্দলক্ষ্য করে বনের দিকে মুখ ফেবালাম।

বন চিরে বেরিয়ে আসছে একটা লোক। সে হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে আসছে আমার দিকে। তার পেছনে ছুটছে ময়লা এক টুকরো শাড়ি পরা সাত-আট বছরের একটি মেয়ে। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, তার হাতেও দুটো শিমূল ফুল।

পহল আমাকে গড় হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। অনেকদিন পরে প্রিয়জনকে দেখার আনন্দে আমাব চোখে জল এসে গেল।

এদিকে এক কাণ্ড! ছোট্ট মেয়েটি বাবার দেখাদেখি আমাকে প্রণাম করতে গিয়ে তার হাতের দুটো ফুল আমার পায় রেখে দিল।

আমি তার মাথায় চুমু খেলাম। তার দেওয়া ফুল দুটো কপালে ছুঁইয়ে নিলাম।

কি নাম তোমার?

মেয়েটি আমার দিকে লাজুক হাসি হেসে তাকাল।

পহল তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগল, বল বল, বাবুমশাইকে নাম বল।

মেয়েটি মনে হল খুবই লজ্জা পেয়েছে, সে ফিস ফিস করে তার নামটি উচ্চারণ করে যেতে লাগল।

পহল বলল, বাবুমশাই তোমার কথা একদম শুনতে পাচ্ছেন না, একটু জোরে বল মা।

এবার মেয়েটি সজোরে উচ্চারণ করল তার নাম, গঙ্গা।

ঐ একটিবার মাত্র নামটি উচ্চারণ করেই সে আঁচল উড়িয়ে ছুটে গেল বনের দিকে।

আমার সেদিন মনে হয়েছিল সুপর্ণ, পবিত্র গঙ্গা খল খল খুশিতে তার নাম উচ্চারণ করতে করতে আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে।

পহল আমাকে ছাড়ল না, বনের ভেতর শিমূলতলায় নিয়ে গেল। আমি মাঝিদের ওই বাঁকের মুখেই নৌকো বেঁধে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে বলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, আগে ওর আস্তানাটা দেখি, তারপর একসময় মালপত্র পৌঁছে দেওয়া যাবে।

কিন্তু পহলের শিমূলতলার সংসারে এসে আমার মত বদল হল।

শিমূলতলার একটু দূরে ঝোপ-জঙ্গল আর বাঁশঝাড়ের আড়ালে একটা কুঁড়ে ঘরের একফালি চালা উঁকি দিচ্ছিল।

পহল বনে ঢুকেই হাঁক দিল, ও গঙ্গার মা, দেখে যা কে এসেছেন। পেন্নাম করে যা বাবুমশাইকে।

দু'বার, তিনবার ডাক গেল কিন্তু কারো দেখা নেই।

এবার তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল পহল।

আমি তার গমন-পথের দিকে চেয়ে রইলাম। মুহূর্তে একটা ছবি ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে আমার চোখে এসে পড়ল। পরমুহূর্তে সে ছবি মুছে গেল। বছর চব্বিশ বয়সের একটি শ্যামলা সুন্দর মেয়ে ভীত চোখে চেয়ে আছে। শতছিন্ন ময়লা একটি শাড়িতে সে তার লজ্জাকে ঢেকে রাখতে পারছে না। দুটো হাত চেপে রেখেছে প্রায় নগ্ন বুকের ওপর।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। নৌকোর লোকজন ডাঙায় ঘোরাফেরা করছিল। আমি হাতের ইশারায় নৌকোয় রাখা জিনিসপত্র বনের ভেতর তুলে আনতে বললাম।

ওরা খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু বয়ে আনল শিমূলতলায়। পহল অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে এগিয়ে আসছিল আমার দিকে। বউকে সম্মানীয় অতিথির সামনে হাজির না করতে পারার জন্য কি কৈফিয়ৎ দেবে তাই বুঝি ভাবছিল মনে মনে।

হঠাৎ চোখের সামনে নৌকোর লোকজনকে এতসব জিনিস বয়ে আনতে দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। জিনিসপত্র নামিয়ে দিয়ে চলে গেল নৌকোর লোকজন।

আমি বললাম, এগুলো তোমাদের জন্যই এনেছি পহল। ঘরের ভেতর নিয়ে যাও। নানা রঙের শাড়ি, গামছা আর সাদা ধুতি আছে, তোমরা ব্যবহার করবে। লালপাড়, টিয়া রঙের একটা শাড়ি আছে, ওটা বউমাকে পরতে বল। মাকে কেমন মানায় আমি দেখব।

পহল অভিভূত। কথা বলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছিল। আমাকে আবেগে আর একবার প্রণাম করল। তারপর একটি একটি করে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে গেল তার ঘরের ভেতর।

ইতিমধ্যে আমার বসার জন্য গঙ্গারমা মেয়েকে দিয়ে একটি তালপাতার চাটাই পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি শিমূলগাছের তলাতেই আমার আসন পেতে জাঁকিয়ে বসেছি।

চারদিকে চোখ চালাতে গিয়ে বনের এক জায়গায় কয়েকটা কলাগাছ আমার চোখে পড়ল।

নিশ্চয়ই এটা সংসারী মানুষের একান্ত প্রয়োজনের সৃষ্টি। আড়ম্বর নয়, অতি সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি কিছু নয়।

এবার দেখি সেই লালপাড় টিয়েরঙের শাড়ি পরে পহলের পেছন পেছন এলো তার বউ। মাথায় ঘোমটা। ভারী সুন্দর মানিয়েছে শ্যামলা মেয়েটিকে। এ যেন নগ্ন রিক্ত মাঠ এক পশলা বৃষ্টির ছোঁয়ায় শ্যামল হয়ে উঠেছে।

মাজা থালায় দুটো পার্শে মাছের ভাজা। একটা বাটিতে খানিকটা মধু, তার ওপর খোসা ছাড়ানো পুরুষ্টু দুটো মর্তমান কলা।

পহলের হাতে আর একখানা চাটাই। সে আমার সামনে সেটা পেতে দিল। তার বউ হাতের জলভরা চুমকিটা বড় থালার একপাশে রেখে খাবার সমেত থালাটা বসিয়ে দিল চাটাইয়ের ওপর।

এবার বউটি গলায় আঁচল জড়িয়ে আমাকে প্রণাম করার উদ্যোগ করতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বউটি একেবারে আমার পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

আমার মনে হল, ওর চোখ থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল আমার পায়।

আমি ওর মাথার হাত রেখে আশীর্বাদ করলাম। আমার অনুমানই সত্য, বউটি উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখ দুটো মুছে নিল।

পহলের বউ বেশ সপ্রতিভ। বলল, নৌকোর দাঁড়ী-মাঝিরা আমার এখানেই খাবে বাবা।

আমি বললাম, এতক্ষণে ওরা রান্না চড়িয়ে দিয়েছে, তুমি হাঙ্গামার ভেতর যেও না মা। বরং সম্ভব হলে একটা কিছু রান্নার পদ ওদের জন্য পাঠিয়ে দিও।

পহল বলল, ভরা কোটালে খাল দিয়ে জোয়ারের জল ঢুকেছে। তার সঙ্গে পার্শে, ভেটকি, গুলে মাছ ঠেলে এসেছে। কাল রাতে জাল পেতেছিলাম, আজ ভোর রাতে একা জাল তুলতে পারি না, এত মাছ। ওদের মাছের তরকারি পাঠাব। বাবুমশাই, এখন এটুকু জলযোগ সারুন।

আমি চাটাইতে বসে বললাম, কি নাম তোমার মা?

বারুণী।

বাঃ, বেশ নামটি তো।

বাবা আপনি কিন্তু খাচ্ছেন না, বেলা অনেক হল।

আমি জলযোগ শুরু করেই বললাম, তোমরা সব কাজের মানুষ, তোমাদের আটকে রেখে দিয়েছি।

ওরা দুজনেই হৈ হৈ করে উঠল। কত পুণ্যে আপনার মতো মানুষকে আমরা পেয়েছি বাবা, সাধ্য কি আপনাকে এখানে একা ফেলে চলে যাই!

তাহলে দু'দণ্ড বস আমার কাছে।

ওরা দুজনে আমার মুখোমুখি বসল একটা ঘাসের জমিনের ওপর।

আমি পহলের বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার নামটা কে রেখেছে?

বারুণী বলল, আমার যখন এক বছর বয়স তখন আমার বাবা মারা যায়। আমার মা বাসন মাজত এক জমিদার বাড়িতে। ওই বাড়ির গিন্নীমা আমার নাম রেখেছিলেন বলে শুনেছি।

আমি সামান্য রসিকতা করে বললাম, পহল তো থাকত এ তল্লাটে, তোমার মতো মেয়েকে ও পেল কোথায়?

পহল বলল, সমুদ্রের ধারে পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা বসে। আমি কয়েক কেজি মধু আর কটা শঙ্খমালা নিয়ে মেলায় গিয়েছিলাম। মধু বিক্রি হয়ে যাবার পর মালা নিয়ে বসলাম সমুদ্রের ধারে।

আমার অল্প দূরেই পুণ্যস্নান চলছিল। দু'একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমার মালা কিনছিল। হঠাৎ একটি শাঁখের আওয়াজে আমি ফিরে তাকালাম।

বছর পনেরো বয়সের একটি মেয়ে স্নান সেরে এগিয়ে আসছে। তার ভেজা কাপড়ের ওপরে একটি লাল ডুরে গামছা জড়ানো। তার হাতে ফুলের একটি সাজি। একটি মাঝবয়সী বিধবা মেয়ে তার পেছন পেছন আসছে শাঁখ বাজাতে বাজাতে।

আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল মেয়েটি। একটি লকেট পরানো মালা উঠিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। মনে হল, খুব পছন্দ হয়েছে মালাটি। এবার মায়ের দিকে ফিরে চোখে কাতর অনুনয় ফোটাতে লাগল সে।

মা এগিয়ে এসে জানতে চাইল দাম। আমি দাম বললাম।

খুঁট খুলে পয়সা গুণে দেখল মা, মাথা নেড়ে জানাল, হবে না।

মেয়ের চোখে-মুখে সে কি হতাশা।

আমি বললাম, তোমার ভাল লেগেছে? নিয়ে যাও, দাম দিতে হবে না।

মা হাঁ-হাঁ করে উঠল, সে কি হয় বাবা!

পৌষের পুণ্যিস্নানে এসে বিনি পয়সায় তোমার মালা নেব!

আমি বললাম, বেশ, ঐ সাজি থেকে আমাকে একটি পূজার ফুল দাও, তার বদলে আমি মালাটি দিচ্ছি।

কেন জানি না, সেদিন আমার ব্যবহারে বারুণীর মা এতই খুশি হয়েছিল যে তার একটিমাত্র মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিতে আপত্তি করেনি।

প্রথমে কত্তার কাছে এসেছিল অনুমতি চাইতে।

কত্তা বারুণীর দিকে একবার তাকিয়েই বললেন, শান্ত স্বভাব, কাজের মেয়ে।

বারুণীর মাকে বললেন, এখানে সকলে একসঙ্গে থাকে, দিন আনে দিন খায়। এখন ভাল করে ভেবেচিন্তে মেয়েকে রেখে যাও অথবা নিয়ে যাও।

সেই থেকে বাবুমশাই, বারুণী এ সংসারে রয়ে গেছে।

দিনে রান্না-খাওয়া হয়ে যাবার পর গাছতলায় গড়িয়ে বসে বিশ্রাম হল। আলোছায়ার ভারী সুন্দর আলপনা আঁকা হচ্ছিল শিমূলতলায়। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। সারাক্ষণ আমার পাশে বসেছিল পহল। সে ইতিমধ্যেই আমার নৌকোতে পাঁচ কেজি মতো মধু তুলে দিয়ে এসেছে।

বারুণী অনুরোধ জানিয়ে গেছে দু'বার, বাবাকে আজ রাতে এখানে থেকে যেতেই হবে।

ছোট্ট মেয়েটা কাছছাড়া হয় না। তার মা তাকে আমার দেওয়া হলুদ শাড়ি টেনে গুঁজে পরিয়ে দিয়েছে। কাঁকই টেনে টেনে আঁচড়ে দিয়েছে মাথার চুল। কলাবসনার সুতোয় লাল-হলুদ ফুল গেঁথে জড়িয়ে দিয়েছে মেয়ের মাথায়। বনের ভেতর বনবালার মতো ঘুরে ফিরছে বাপ-সোহাগী গঙ্গা।

সন্ধ্যায় চাঁদ উঠেছে। সেই শিমূল তলায় বসে আছি আমি আর পহল। সে শোনাচ্ছে তার এতবড় পরিবারের ভাঙনের কাহিনী।

তিন বছর আগে প্রচণ্ড খরায় জ্বলে গেল দিক দেশ। ফেটে চৌচির হয়ে গেল মাটি। মিঠে জলের অভাবে শুকিয়ে ফাঁক হয়ে গেল পাখির ঠোঁট।

আষাঢ়ে মেঘ জমল না আকাশে, বৃষ্টি পড়ল না মাটিতে। ক্ষেতে ধানের আশা শেষ হয়ে গেল।

বনের ভেতর যে দু'তিনটে পুকুর ছিল, ধীরে ধীরে তার জল গিয়ে ঠেকল তলানিতে। শেষে সেটুকুও শুকিয়ে কচ্ছপ বা কুমিরের পিঠের মতো হয়ে গেল।

জল আনার জন্য বউ-ঝিয়েরা দু'তিনজন মিলে এক একটা দল করে এক একদিকে বেরুল। সন্ধ্যায় কোনও দল বা ফিরল, কোনও দল ফিরল না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বনে যারা গাছ কাটার ইজারা নিয়েছিল, একে একে তাদের সঙ্গে প্রাণ বাঁচাতে ওরা ভেগে চলে গেছে।

গাছপাতা, অখাদ্য-কুখ্যাদ্য খেয়ে মহামারিতে উজাড় হয়ে গেল প্রায় সবাই।

আমার চেয়ে বছর দু'একের বড় ছিল আমার ছোটকাকা। ছোট খুড়িমা বাড়ির মধ্যে সুন্দরী, কিন্তু তার কোল শূন্য। সব কথাতেই হাসি, এমন হাসি আমার পরিবারে হাসতে পারত না কেউ।

একদিন আমাকে কিছু না জানিয়ে শেষ রাতে খুড়িকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল ছোটকাকা। বউয়ের কাছ থেকে একটা খবর পেলাম।

একটা লোক নাকি বনের ভেতর ছোটকাকার সঙ্গে একদিন গুজগুজ করছিল। তখন সেখানে হাজির ছিল ছোট খুড়িও। কি একটা জিনিস নিয়ে আসতে কাকা ছুটে গেল বুড়ো বটগাছের দিকে। অমনি শুরু হয়ে গেল ঐ অপরিচিত লোকটার সঙ্গে খুড়ির হাসি-মস্করা।

এসব বারুণী নিজের চোখে দেখেছিল, কতকগুলো গাছের জটলার ভেতর দাঁড়িয়ে।

ভয়ে তার জিভ শুকিয়ে গিয়েছিল, সে তখন আমাকে সে কথা বলেনি।

দিন সাতেক ঘর ছাড়ার পর, একপায়ে একটা ছেঁড়া চটি পরা লোককে বটগাছের দিকে ছুটে যেতে দেখলাম।

প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি। ফেরার সময় ছোটকাকাকে চিনতে পারলাম, একেবারে অন্যমানুষ। অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। কেবল বলছে, তোমরা কেউ পরীকে দেখেছ?

ঐ যে পরীকে নিয়ে পারা দ্বীপে গিয়েছিলাম গো, কত জাহাজ আসছে যাচ্ছে, কত আলো জ্বলছে, রাতগুলো সব দিন হয়ে যাচ্ছে। তার ভেতরে পরী হারিয়ে গেল। পরীকে আর খুঁজে পেলাম না। তোমরা কেউ দেখেছ?

বলতে বলতে কাকা একপায়ে ছেঁড়া চটিটা টানতে টানতে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কাকা কাকা বলে কত চেঁচালাম, কানেই তুলল না। আসলে কাকা আমাকে চিনতেই পারেনি।

ছল ছল করে উঠল পহলের চোখ। বলল, বাবুমশাই, এতবড় গুষ্টিতে আমরা তিনজন ছাড়া এখানে আর কেউ রইল না।

আমি তার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলাম। মুখে কিছু বললাম না।

আমরা যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে গাছাগাছালির ফাঁক দিয়ে নদী দেখা যাচ্ছিল। নদীর বাঁকের মুখে আমার নৌকো বাঁধা। টিমটিম করে একটা টেমি জ্বলছিল নৌকাতে। মনে হয় মাঝিরা রান্নাবান্না করছে।

এক ঝাঁক জলচর পাখি বাঁকের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে দূরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঁকের মুখে বিশাল বটগাছটা থাকলে ওখানেই ওরা আশ্রয় নিত। তাছাড়া আমি আগেরবার এসে দেখে গেছি. বহু পাখি স্থায়ী বাসা বেঁধে ছিল বটগাছটার ডালে ডালে। সকাল-সন্ধ্যে সে কি কলরব তাদের।

আমার ভাবনার খেই ধরে যেন পহল কথা বলে উঠল, বাবুমশাই, আপনি কথায় কথায় দু'দুবারবটগাছ আর কত্তার কথা জিজ্ঞেস করেছেন, আমি বলব বলব বলে নানা কাজের অছিলায় সরে গেছি। এখন শুনুন কত্তাবাবা আর তাঁর বটগাছের কথা।

বললাম, আমি কিন্তু সেই আসা অবধি ওদের পরিণতির কথা শুনব বলে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি।

পহল বলতে লাগল, যে বছর খরা হল তার পরের বছর শুরু হল ঝড়। হাওয়ার ধাক্কায় উড়ে চলে যাচ্ছে ময়লা তুলোর মতো রাশি রাশি মেঘ। নদীর ধারে দাঁড়ানো মুশকিল। ঝড়ের বেগে উড়ে গিয়ে পড়ব একেবারে নদীর মাঝখানে।

আমি, বারুণী আর গঙ্গাকে এই শিমূল গাছের সঙ্গে কাপড় আর দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে কত্তাবাবাকে দেখার জন্য বটগাছের দিকে ছুটলাম। ছোটা নয়, মাঠের ওপর হামা দিয়ে, কখনও বা গড়িয়ে গড়িয়ে এগোতে লাগলাম। হাওয়া থমকে থেমে গেল হঠাৎ।

ঘন মেঘ জমে উঠেছিল আকাশে। বাতাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা চকচকে হাসুয়া যেন চোখ ধাঁধিয়ে ঝলসে উঠল। মুহূর্তে চিরে ফেড়ে গেল তাল তাল জমাট মেঘের কল্‌জেখানা। অমনি ভোড়ে ফুটো আকাশ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল বৃষ্টি। মেঘ যত ডাকে, বিদ্যুৎ যত চমকায়, তত উথলে উঠে বৃষ্টির ধারা। এবার বাবুমশাই, থেমে থাকা হওয়া জেগে উঠল। ঘূর্ণির বেগে পাক খেতে খেতে ছুটল চারদিক তোলপাড় করে। একেবারে পাগলের লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

এমন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, আকাশভাঙা বৃষ্টি আর ঝড়ের তাণ্ডব আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি বাবুমশাই।

আমি জানতে চাইলাম, এই দুর্যোগের ভেতর বউ আব মেয়েকে যে বেঁধে রেখে গেলে তাদের কি অবস্থা হল পহল?

বাবুমশাই, তখন তাদের কথা একবারও মনে আসেনি। আমি শুধু ভাবছিলাম কত্তাবাবার কথা। তাঁর আস্তানাকে গাছের ডালের সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে এমনভাবে বেঁধে রেখেছিলাম, যাতে কোনওদিনই

তাঁর গাছ থেকে পতন না ঘটে। কিন্তু পাঁচ কুড়ি দশ বছরের একটি বুড়ো মানুষকে এমন ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টির মুখোমুখি হতে হবে তা কে জানত।

আমি কি কষ্টে যে গড়াতে গড়াতে বাঁকের মুখে বটগাছটার কাছে এসে পৌঁছলাম তা কোনওভাবেই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

সেখানে গিয়ে কত্তার অবস্থা কি কিছু জানতে পেরেছিলে?

কারো হিম্মত ছিল না বাবুমশাই ঐ বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে গাছের ওপর ওঠা। চেষ্টা করতে গেলেই ছিটকে পড়তে হবে নদীতে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকালেও বৃষ্টির জন্য স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

বাবুমশাই, একবার মাত্র দেখতে পেয়েছিলাম কত্তাবাবাকে। তখন ঝকঝকে বিদ্যুৎ খানিকটা সময় ধরে চমকাচ্ছিল। বৃষ্টির ঝাপটা একটুখানি সময়ের জন্য থমকে গিয়েছিল।

কি দেখলে?

সেই পাখির বাসার পুরো কাঠামোটাই উড়ে গেছে। দড়ির গায়ে আটকে আছেন আধশোয়া অবস্থায় কত্তাবাবা। আমি স্পষ্ট দেখলাম বাবুমশাই, বুকের ওপর দুটো হাত জোড় করা। তিনি তখন বেঁচে কি মরে তা আমার বোঝার উপায় ছিল না।

আমি জানতে চাইলাম, সেই বিশাল গাছটা কোথায় উবে গেল পহল?

তখন রাত কত, তা আন্দাজ করার কোনও উপায় ছিল না। আমি শুধু বুঝতে পারলাম, নদীর জল ডাঙায় উঠে আসছে। এ যে 'লোনা ছয়লাপি'! সমুদ্দুর ফুলে ফেঁপে তেড়ে ফুঁড়ে নদীর জলকে ওপরে ঠেলে তুলছে।

আমি প্রায় সাঁতার কাটতে কাটতে বনের দিকে এগোলাম। ছোট-বড় বহু গাছ ইতিমধ্যেই ভেঙে, উপড়ে জলের টানে ভেসে গেছে। বিদ্যুতের আলোয় আমার চেনা বনটাকে তখন বন বলে মনে হচ্ছিল না। একেবারে যেন ফাঁকা ফরসা একটা ডাঙা বলে মালুম হচ্ছিল।

আমি দেখলাম, বারুণী আর গঙ্গাকে যেমনভাবে শিমুল গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনিভাবে বাঁধা অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

আমি সেই বৃষ্টির মধ্যে ওদের জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

আমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠেছিল বারুণী। সে হয়তো ভেবেছিল কোনও জন্তুজানোয়ার তাকে আক্রমণ করেছে। যখন জানতে পারল মানুষটা তার ঘরেরই লোক তখন সে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

আমি তাকে সেই দুর্যোগের ভেতরেই আশ্বাস দিয়ে বললাম, কোনও ভয় নেই, এই তো আমি রয়েছি।

গঙ্গা এতোই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে সে নড়ে না, চড়ে না, কথাও বলে না।

ওই প্রবল বৃষ্টির ভেতরে বাবুমশাই, আমি মেয়েটাকে বুকে তুলে নিলাম। সে ভয়ে কথা বলল না, কিন্তু আমাকে কাঁকড়ার মতো জড়িয়ে ধরল।

সে অবস্থায় ঘুম থাকার কথা নয়, আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম।

ভোরের দিকে বৃষ্টির বেগ কমে এল। মনে হলো ডাঙা থেকে জল নদীর দিকে নেমে যাচ্ছে। সে ঘূর্ণিঝড় নেই। মনে হল ফুঁসে ওঠা সমুদ্র অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে।

আমরা ওই জল কাদায় উঠে বসলাম। আশ্চর্য! ওই শিমুল গাছটার কয়েকটা ডালপালা ভেঙে উড়ে গেছে ঠিক, কিন্তু আস্ত কাণ্ডটা কয়েকটা ডাল নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কাদার ভেতরেই দৌড়তে লাগলাম বটগাছটা লক্ষ্য করে। বিশাল গাছটা তখন নদীরদিকে নুয়ে পড়েছে। আমি মাঝপথ থেকেই দেখলাম নদীর ঘূর্ণি অনেকখানি পাড় ভেঙে ফেলেছে।

গাছটার গোড়ায় তখন ঘূর্ণি জলের দাপট। নদীর ধারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই পুরো গাছটা পাক খেয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ভোরের অস্পষ্ট আলো এসে পড়ছে, তার ভেতর আমি স্পষ্ট কিছু দেখতে পেলাম না। কত্তাবাবা তখনও গাছের ওপর দড়ির বাঁধনের ভেতর আছেন কিনা বলতে পারব না।

ওই বিশাল গাছটা এবার তার ডালপালা, শেকড়-বাকড়, পাতাপত্র নিয়ে পাক খেতে খেতে নদীর স্রোতের সঙ্গে সমুদ্দুরের দিকে ভেসে যেতে লাগল।

একটু পরেই উঠল লাল সূর্য। কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্রই নেই। কাল রাতে যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে তা আজ এই ভোরের আলোয় কে বলবে!

আমার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছিল।

সমস্ত সংসারের ওপরে যিনি তারাটির মতো জ্বলজ্বল করছিলেন, তিনি চিরদিনের মতো চোখের সামনে থেকে সরে গেলেন। আমি আর কাউকে খাবার দিয়ে আসতে পারব না, কারুর হাতের ছোঁয়া আমার মাথায় কোনও দিনই পাব না। উনি বেঁধে রেখেছিলেন সমস্ত সংসার, আজ কে কোথায় আমরা ছন্নছাড়া হয়ে পড়লাম। কত্তাবাবার স্বপ্নের সংসার শুকনো পাতার মতো কোথায় উড়ে চলে গেল।

তবে নিজের চোখে তাঁকে সংসারের ভাঙনগুলো দেখতে হলো না, তা ছাড়া যে বয়েসে তিনি পৌঁছেছিলেন সেখানে একার পক্ষে থাকা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। উনি স্বীকার না করলেও আমি বুঝতাম।

তবে মানুষের কাছ থেকে উনি সরে যেতে চেয়েছিলেন। পাখিদের সঙ্গে শেষ জীবনটা থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়েছিল। ভোরবেলা পাখির কলরব শুনেই তাঁর ঘুম ভাঙত। নীল আকাশে তিনি তাদের ওড়াউড়ি দেখতেন। এইভাবে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল।

আমি বললাম, পহল, তুমি কি এইভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে?

উদাস হয়ে গেল পহল। কিছু সময় থেমে বলল, আর কোথায় যাব বাবুমশাই? এইখানে জন্মেছি, এই নদীর ধারে, বনের ভেতরে ছুটোছুটি করেছি, এই নদীর স্রোতেই গা ভাসিয়েছি, একে ছেড়ে কোথাও যেতে প্রাণ চাইবে না। আমার নৌকো নেই, থাকলে ওটাতেই সংসার পাততাম।

সুপর্ণ, পহলদের ছেড়ে আমাকে চলে আসতে হয়েছিল, ওরা কতদূর অবধি আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। মুখে বলল, আর কি কখনও বাবুমশায় আমাদের এ তল্লাটে এসে দাঁড়াবেন?

আমি বলেছিলাম, আসা-যাওয়া সবই ওই মালিকের ওপর নির্ভর করছে।

আমি আর ওখানে কোনোদিনই যাইনি, রিটায়ার করার পর আমি ওড়িশা ছেড়ে এখানে চলে এসেছি। কিন্তু আসার আগে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে একটা ডিঙি নৌকো বানিয়েছিলাম, আর আমার এক বিশ্বস্ত লোককে দিয়ে ওই নৌকোটি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম পহলের কাছে। লোকটি ফিরে এসে বলেছিল, পহল আর তার বৌ নৌকোর গায়ে হাত বুলিয়ে আকুল হয়ে কেঁদেছিল আর বলেছিল, বাবুমশাইকে কোনওদিনও ভুলব না।

তিন

বিনায়কবাবু সুপর্ণের পদধ্বনি চেনেন। সুপর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেই তিনি ঘরের ভেতর থেকে বলেন, এস ইয়াং ম্যান।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সুপর্ণ বলল, আমি ইয়াং ম্যান নই স্যার, বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই।

আরে আজকাল চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ অবধি দিব্যি ইয়াং ম্যান বলা যায়। পরমায়ুর গড় অনেক বেড়ে গেছে। তা ছাড়া আগের দিনে কৈশোর ছাড়ালেই ছেলেদের বিয়ে-সাদির ব্যবস্থা হতো, তাই চল্লিশেই পাকাপোক্ত ঠাকুরদা বনে যেত। সে যুগে তাই বলত, 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ'। আজকাল শুনি ষাট বছর না হলে পাকাপোক্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। এখন বলো, তোমার কর্মক্ষেত্রের খবর কি?

দিব্যি চলছে। যাঁরা পড়াবার পড়িয়ে যাচ্ছেন আর যাঁরা ফাঁকি দেবার তাঁরা দিব্যি ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের সময়ে যে কেউ ফাঁকি দিত না, তা নয়। তবে কাজ বজায় রেখে।

সুপর্ণ বলল, আজকাল আইন দেখিয়ে দৃষ্টিকটু রকমে ফাঁকি দিচ্ছে, পড়ানোর ব্যাপারটা তাদের কাছে গৌণ।

বিনায়কবাবু বললেন, একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বল?

সুপর্ণ বলল, এই তো সেদিন ঘটনাটা আমাদের চোখের সামনে ঘটল।

কিরকম?

মেয়েটি সবে সার্ভিস কমিশন থেকে আমাদের কলেজে এসে জয়েন করেছে। তেইশ-চব্বিশ বছরের বেশি হবে না বয়েস। হিস্ট্রিতে ভাল রেজাল্ট করে এসেছে। বুদ্ধির দীপ্তি আছে মুখে-চোখে। আমরা ইতিমধ্যে কানাঘুষোতে জেনেছি, একটি বিশেষ পার্টির উনি সমর্থক, এখনও সেখানে কিছু কাজকর্ম করেন। তা করতেই পারেন, আমি অন্তত সে নিয়ে মাথা ঘামাই না। এখন যে কথা হচ্ছিল তার সূত্র ধরে বলি, একদিন অধ্যাপিকাটি প্রিন্সিপালের ঘর থেকে এসে ঢুকলেন প্রফেসার্স রুমে। মুখ থমথম করছে।

ওঁর ডিপার্টমেন্টের দু'একটি বান্ধবী জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি, চৈতালী?

আরে বোল না, হকের ছুটি চাইতে গিয়ে কয়েকটা তেতো কথা শুনতে হল।

একজন অতি কৌতূহলী বলে উঠলেন, কিরকম?

আর কিরকম, ক্যাজুয়াল লিভ চাইতে গিয়ে বিপত্তি। আমি ছুটি চাইবা মাত্র প্রিন্সিপাল বললেন, চার-পাঁচ দিন আগে তুমি ছুটি নিয়েছিলে না? আবার কি দরকার পড়ল?

ভদ্রমহিলার কথাবার্তার ভেতরেই মিষ্টত্বটা কম।

আমি বললাম, এখনও আমার তিনদিন ক্যাজুয়াল লিভ বাকি আছে ম্যাডাম।

উনি আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, সবে জয়েন করেছ, মেয়েদের দিকে একটু বেশি নজর দাও।

আমি দরখাস্তটা ওঁর টেবিলে রেখে দিয়ে গট্‌গট্‌ করে চলে এসেছি।

অন্য একজন বললেন, ওঁর স্বভাবে আদপেই মিষ্টত্ব নেই, কথাবার্তা অত্যন্ত রূঢ়।

বিনায়কবাবু অমনি বলে উঠলেন, তোমার কথায় একটু ইন্টারাপ্ট করছি সুপর্ণ।

সুপর্ণ বিনায়কবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বিনায়কবাবু বলতে লাগলেন, আমরা যখন কলেজে কাজ করেছি, সে সময়কার একটা কথা মনে পড়ছে। কোনওদিন সুস্থ অবস্থায় অথবা নিতান্ত জরুরি কাজ না থাকলে আমরা কলেজ কামাই করার কথা ভাবতেই পারতাম না। একবার আমার গায়ে বেশ টেম্পারেচার দেখে আমার স্ত্রী বললেন, আজ কলেজ গিয়ে কাজ নেই।

আমি বললাম, সে কী হয়! সামনে পরীক্ষা, সিলেবাস এখনো কমপ্লিট হয়নি, আমার ঘরে বসে থাকলে চলে? তা ছাড়া ....

আমার স্ত্রী বললেন, তা ছাড়া কি?

মুখোমুখি দুটো ক্লাসরুম, এক-একটা ক্লাসে আড়াইশোর ওপর স্টুডেন্ট। একটা ক্লাস না হলে যে চিৎকার উঠবে তাতে পাশের ক্লাসটা হতেই পারবে না। তার অর্থ দুটো ক্লাসই গেল। একেবারে অপারগ হলে অন্য কথা, এখনও সেরকম অবস্থায় আসিনি।

দেখ সুপর্ণ আমরা পড়াতে গিয়ে ছুটির কথা আদপে চিন্তা করতাম না। কত ছুটি যে আমাদের ঝরে পচে গেছে তার হিসাব কোনওদিনই রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি।

সুপর্ণ বলল, আপনাদের কাছে অনেক কিছু জানার আছে স্যার।

বিনায়ক বললেন, সে সময়কার প্রফেসারদের ভাব-ভাবনাই অন্যরকম ছিল। এই তো চোখের সামনে ভাসছে সুধাংশুবাবুর মুখ। ইংরেজির ডাকসাইটে অধ্যাপক। কলেজ ছুটি হবার পরেই কিন্তু উনি ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে পা চালাতেন না। ঢুকতেন লাইব্রেরিতে। সেখানে কিন্তু তিনি ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করতেন না, তিনি সংস্কৃত রামায়ণখানা নির্দিষ্ট র‍্যাক থেকে টেনে নিয়ে বসে যেতেন।

তিনি আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেন, রামায়ণের কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত। ওঁদের পাণ্ডিত্য আর নিষ্ঠার কোনও তুলনাই ছিল না।

সুপর্ণ বলল, আপনার কাছে এলে অনেক কথা শোনা যায় স্যার। এসব আমাদের কাছে অমূল্য সঞ্চয়।

বিনায়কবাবু যখন কথা বলেন তখন একটানা অনেক কথাই বলে যান। সেসব কথা কেবল শুনতেই মজার নয়, শেখারও থাকে অনেক কিছু। বহু চরিত্র, বহু ঘটনা সামনে এসে দাঁড়ায়।

এবার বিনায়কবাবু বললেন, আজও কি কলেজের কথা শুনবে নাকি?

তাই বলুন স্যার। এসব কথা কোনওদিন পুরনো হয় না।

আচ্ছা, আজ তোমাকে দুজন প্রিন্সিপালের কথা বলব, যদিও দুটো স্টোরিই একেবারে আলাদা।

আমি প্রথমে বলি, আমাদের প্রিন্সিপালের কথা, অর্থাৎ যখন আমি ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের যিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন তাঁর কথা। ওঁর একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল। কোনও স্টুডেন্ট যদি তাঁর সামনে পড়ে যেত, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার পেটে অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীটি চালিয়ে দিতেন চিমটের মতো। পেটের মাংসে টান পড়লেই ছেলেরা কাতরোক্তি করত। এটা ছিল তাঁর অদ্ভুত ধরনের একরকম কৌতুক। আমি তখন আমার কলেজের সিনিয়র প্রফেসর। আমি যে কলেজে পড়তাম সে কলেজ ছেড়ে এসেছি প্রায় বিশ বছর আগে। ছাত্রজীবনের সেই পিন্সিপালের সঙ্গে দীর্ঘকালই আমার কোনও যোগাযোগ নেই।

আমাদের কলেজে অর্থাৎ আমার কর্মস্থলে তখন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা চলছিল। আমার ওপর সেদিন চার্জ ছিল পরীক্ষা পরিচালনার। আমি প্রফেরস রুমে বসে ছিলাম। একটি বেয়ারা ঘরে ঢুকে আমাকে বলল, বাইরে এক ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন।

আমি বললাম, ওঁকে ভেতরে নিয়ে এস।

একটু পরে ঘরে ঢুকলেন এক অশীতিপর বৃদ্ধ। শীর্ণ দেহ, ফর্সা, ধবধবে সাদা চুল।

প্রথমটা আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনি কিন্তু আমার দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। মুখে মৃদু হাসি। অন্যান্য প্রফেসাররা ওই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়েছিলেন।

আমার স্মৃতিশক্তি সত্যিই দুর্বল। তখন উনি প্রায় আমার কাছাকাছি এসে গেছেন, আমি হঠাৎ চিনতে পেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম। আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়ানো মাত্রই উনি তাঁর ব্রহ্মাস্ত্রটি বের করে আমার জামাসমেত পেটটিকে খামচে ধরলেন।

কি হে কেমন আছ? এসেই শুনলাম তুমি নাকি আজকের পরীক্ষার ইনচার্জ।

হ্যাঁ স্যার। আমি কিন্তু ওঁর ঐ বিচিত্র আচরণের জন্য কোনও প্রতিবাদ জানালাম না। আমার মনে হল, বিশ বাইশ বছর আগেকার সেই কলেজেই আমি ফিরে গেছি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সেই প্রিন্সিপাল, যাঁর সঙ্গে দেখা হলেই চিমটের মতো পেটটি খামচে টেনে ধরেন। আমি জানি, ওটা ওঁর একটা বিশেষ মুদ্রাদোষ।

আমি ওঁকে চেয়ারে বসালাম। বললাম, আপনি স্যার হঠাৎ .....!

আমি কিন্তু ওঁর সামনে চেয়ারে বসতে পারলাম না। সেটা হয়তো আমার আগেকার একটা সংস্কার।

উনি নিজেই বললেন, আরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো, বোসো। আমার ছোট মেয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছে, তোমার এই কলেজে তার সিট পড়েছে। তিনদিন আগে আমার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, মেয়েটা একেবারে ভেঙে পড়েছে, তাই এ বয়সে আমিই এসেছি তার সঙ্গে। তুমি পরীক্ষার চার্জে আছ জেনে বড় আশ্বস্ত হলাম বাবা। ও ভাল মেয়ে, পরীক্ষাটা যেন শান্তভাবে দেয়।

আপনার মেয়ের কি নাম স্যার?

শিউলি রায়।

আপনি নিশ্চিন্তে বাসায় চলে যান স্যার। একেবারে ছুটির সময়ে এসে নিয়ে যাবেন। আপনি উঠেছেন কোথায়?

পরীক্ষার কয়েকটা দিনের জন্যে ইমপেরিয়াল লজের আট নম্বর ঘরে রয়েছি।

আমি বললাম, এই জানলা দিয়েই তো দেখা যাচ্ছে ইমপেরিয়াললজ। আপনি স্যার হোটেলের রুমে বিশ্রাম করুন। ওকে আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার।

সেই ভয়ঙ্কর রাশভারী মানুষটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমার কাজের পুরস্কার আমি পেয়ে গেছি বাবা। চল্লিশ বছর প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করার পুরস্কার।

সুপর্ণ বলল, মানুষটি অদ্ভুত। ছাত্র যত বড়ই হোক, শিক্ষকের কাছে চিরদিনই সে ছাত্রই থেকে যায়।

আপনার দ্বিতীয় প্রিন্সিপালের কথাটি এবার শোনান স্যার।

এবার যে প্রিন্সিপালের কথা বলছি তিনি বহুপূর্বে কলকাতার একটি নামী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই অধ্যক্ষ আর সেই কলেজের নাম জানে না বাংলাদেশে এমন কেউ নেই। কলেজের নাম ছিল, রিপন কলেজ আর অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। কেবল তাই নয়, কলেজের কর্ণধারও ছিলেন, ভারতবিখ্যাত ব্যক্তি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেবার একটি ঘটনা ঘটল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ কাজে কলকাতার বাইরে, সে সময় কলেজে টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। ওই কলেজে সেবার সুরেন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয় টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে। নিয়মানুযায়ী তাকে আর অ্যালাউ করা হল না। রামেন্দ্রসুন্দরের বন্ধু অধ্যাপকরা ছুটে এসে রামেন্দ্রসুন্দরকে বললেন, কি করছেন কি? এ যে স্যারের একেবারে নিকট আত্মীয়।

রামেন্দ্রসুন্দর অবাক হয়ে বললেন, কে?

ওই যে একটিমাত্র ছেলে, যাকে আপনি আলাউ করলেন না, সেই ছেলেটি।

সে তো একটি বিষয় ছাড়া সবগুলোতে ফেল। তাকে অ্যালাউ করব কি করে?

পরের দিন রামেন্দ্রসুন্দরের এক বন্ধু এসে বললেন, কি পাগলামো করছ ভাই! একটা ছেলেকে আটকে রেখে কিবা লাভ! স্যার ক্ষেপে গেলে অনর্থ বাধবে, তখন চাকরি নিয়েই টানাটানি।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, তাই বুঝি?

এরপর রামেন্দ্রসুন্দর পকেটে একটি রেজিগনেশন লেটার নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। মুখে বললেন, ওই ছেলেটাকে পাস করানোর কথা বললেই আমি এই রেজিগনেশন লেটার দিয়ে দেব।

কয়েকদিন পরে ফিরে এলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ। কয়েকজন অধ্যাপক গিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে আগেভাগে রামেন্দ্রসুন্দরের গোঁয়ারতুমির খবরটা দিয়ে দিলেন এবং রামেন্দ্রসুন্দর যে রেজিগনেশন লেটারটি পকেটে নিয়ে ঘুরছেন তাও জানাতে ভুললেন না।

সুরেন্দ্রনাথ চুপচাপ সব শুনে গেলেন, কোনওরকম মন্তব্য করলেন না। দু'একদিন পরেই তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালেন।

রামেন্দ্রসুন্দর যথাসময়ে উপস্থিত হলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ টের পেয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দরেব উপস্থিতি, কিন্তু তিনি তাঁর ফাইলে মুখ ডুবিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। এদিকে রামেন্দ্রসুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন দরজার মুখে, ডাক না পেলে ঢুকবেন না।

একসময় হঠাৎ মুখ তুলে স্যার সুরেন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, কই রেজিগনেশন লেটারটি দিন।

এগিয়ে এলেন রামেন্দ্রসুন্দর, পকেট থেকে রেজিগনেশন লেটার বের করে তুলে দিলেন সুরেন্দ্রনাথের হাতে।

স্যার সুরন্দ্রেনাথ কাগজখানা হাতে নিয়েই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন। মুখে বললেন, আপনি আমাকে কী ভাবেন রামেন্দ্রসুন্দরবাবু! একটা অপদার্থ ছেলের

জন্য আমি আপনার মতো একটি খাঁটি রত্নকে হারাব! এমনই নির্বোধ আমি! এটা শুধু আমার কলেজ নয়, আপনারও কলেজ। এর ভাল-মন্দ শুভাশুভের ভার আপনারই ওপর ন্যস্ত। কলেজের মঙ্গল সম্বন্ধে আপনার বিবেচনাই চূড়ান্ত। জানবেন তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।

সুপর্ণ, সেসব দিনের মানুষের চরিত্র, হৃদয়বত্তা ছিল অন্যরকম। অঙ্কে ফেল করেছিলাম বলে ইস্কুলে অঙ্কের মাস্টারমশাই আমার পিঠে আস্ত বেতখানা ভেঙেছিলেন। কিন্তু সেজন্যে আমার অভিভাবকরা কোনও প্রতিবাদই করেননি। তারপরেই কিন্তু পুরো একটি বছর উনি আমাকে বিনি পয়সায় অঙ্ক করিয়েছিলেন। আজকের দিনে এসব হিসেব-নিকেশ একদম বদলে গেছে।

বিনায়কবাবুর কাছে এলে স্কুল-কলেজের বহু গল্প শুনতে পায় সুপর্ণ। কথা বলতে বলতে কখনও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয় বিনায়কবাবুর চোখ, কখনও বা অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন।

কিন্তু কে বলবে প্রাণের প্রাচর্যে, হাসির অন্তরালে এই মানুষটি লুকিয়ে রেখেছেন কান্নার এক মহাসাগর। কয়েকটা মাত্র টাকা হাতে নিয়ে সে সময়কার নামী অধ্যাপক বিনায়ক চৌধুরী রিটায়ার করেছিলেন। দুই ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে বিনায়কবাবুর সংসার। যা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন রিটায়ার করার বছর দশেক আগে তা ব্যয় করেছিলেন একটি বড় ভাঙা বাড়ি কিনে। তাকে বাড়ি না বলে বড় ভাঙা ইঁটের পাঁজা বলাই সঙ্গত। তবু নিজের মাথা গোঁজার আশ্রয়, এই ভেবে খুশিতেই ছিলেন তিনি। কিন্তু ভাঙা পোড়ো বাড়ির যা হয়, বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়ে উঠেছে এখানে ওখানে। তাপপি দিয়েও তাকে সামলানো যায় না। কিছু টাকা সংগ্রহ করে একবার রাজমিস্ত্রী লাগালেন। সব কটা বট-অশ্বত্থকে কাটা হল। পরিমাণ মতো সিমেন্ট ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল ফাটলগুলোর মুখ। ছ'মাস যেতে না যেতেই সিমেন্টের আস্তরণ ভেদ করে উঁকি দিতে লাগল কচি বটের চারা। ওরা অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে আসে। ওরা পাথর ভেদ করেও জেগে ওঠে।

কোনও ক্ষোভ নেই বিনায়কবাবুর মনে। বিনায়কবাবুর বড় ছেলেটি বাবার মতোই সুদর্শন আর যোগ্য হয়েছে। অবশ্য যোগ্যতা শুধুমাত্র পড়াশুনার ক্ষেত্রে। শৌভিক ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোনোর পর বিনায়কবাবু চেষ্টাচরিত্র করে একটি কলেজে তার চাকরির ব্যবস্থা করে দেন।

একটি সম্পন্ন বাড়ির মেয়ে শৌভিকের প্রেমে পড়ে। প্রেমের এক বছর পূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ পর্যন্ত শৌভিক তার বাবা-মা-কে কিছু জানায়নি। রেজিস্ট্রি করে এসে বাবা-মা-র কাছে ছেলে তার অভিপ্রায়ের কথা জানাল। বিনায়কবাবু আহত হলেন কিন্তু মুখ ফুটে কোনও ক্ষোভের কথা উচ্চারণ করলেন না। শুধু বললেন, যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ, এতে আমাদের কিইবা বলার থাকতে পারে! শৌভিক বলল, দূর্বা বলছিল, এইটুকু ছোট্ট ঘরে এতগুলি প্রাণী মিলে হুড়োহুড়ি করে বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ। বিনায়কবাবু বললেন, কী বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বল। তোমাদের কোনওরকম অসুবিধায় আমরা ফেলতে চাই না। নতুন জীবন, নিজেদের মতো উপভোগ কর।

শৌভিক হাত কচলে বলল, এই কাছে পিঠে কোথাও যদি একখানা ঘর পাওয়া যায়, তা হলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভালভাবে থাকা যায়।

বেশ তাই হবে। তোমরা সুখী হলে আমরাও সুখী। তবে একদিন অন্তত বৌমাকে তাঁর শ্বশুরের রাজপ্রাসাদটা দেখিয়ে নিয়ে যেও।

শৌভিক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, একথা কেন বলছেন বাবা! দূর্বা অবশ্যই আপনাদের প্রণাম করে যাবে।

বিনায়কবাবুর বুকের ক্ষতটায় রক্তক্ষরণ হলেও চাপা দিয়ে রাখলেন। নিরাসক্ত গলায় বললেন, ভেতরে মাকে খবর দিয়ে এস।

শৌভিক ভেতরে চলে গেল। মা আর ছেলেতে কী কথা হল শোনা গেল না। কিছুক্ষণ পরে ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ কান্নার স্বর বাইরের ঘরে ভেসে এল। বিনায়কবাবু বুঝলেন, তাঁর শয্যাশায়ী পঙ্গু স্ত্রী পুত্রের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর কাঁদছেন।

কয়েকদিনের ভেতরেই এ পর্বের শেষ হয়ে গিয়েছিল। শৌভিক আর দূর্বা আগেই কোয়ার্টার ঠিক করে এসে বাবা-মাকে খবর দিয়েছিল।

ওরা দু'একদিনের ভেতরেই চলে গেল। বিনায়কবাবুর মুখে বিরক্তির রেখা ফুটল না। ছেলে আর নববধূর প্রণামের পর তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রীর আলমারি খুলে একটি সোনার হার বের করলেন, যেটি তিনি সাংসারিক বহু দুর্যোগের ভেতরেও হাতছাড়া করেননি।

হারটি বের করে তিনি স্ত্রীকে দেখালেন। বললেন, তোমার ইচ্ছা ছিল পুত্রবধূকে এটি আশীর্বাদী হিসেবে দান করবে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

বাইরের ঘরে গিয়ে বৌমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এর অর্থমূল্য হয়তো কিছু নেই, কিন্তু জননীর অজস্র শুভেচ্ছা রয়েছে এর ভেতরে, তুমি অন্তত একবার এটিকে পরলে আমরা সুখী হব।

এরপর ওরা পুরনো ঘরে রাত্রিবাস করেনি। তার থেকেই বোঝা গিয়েছিল ওরা কোয়ার্টার আগেভাগেই ঠিক করে রেখে এসেছিল।

বিনায়কবাবুর স্ত্রী বহুদিনই পক্ষাঘাতগ্রস্ত। মুখে কম কথা বলেন, চোখ দিয়ে জল গড়ায়। এই অশ্রুপাতের প্রধান কারণ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি। ছেলেটি জন্মাবধি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। সে কিন্তু অনেক কিছু বুঝতে পারে। কষ্ট পেলে একটা গোঙানি উঠে আসে তার বুকের ভেতর থেকে। সে বাবার সঙ্গে বাজারের থলি হাতে নিয়ে বাজার করতে যায়। বিনায়কবাবুই তাঁর ছেলের ভেতরে এই ইচ্ছাটা জাগিয়ে তুলেছেন। যাবার পথে সে কিন্তু বাবার সঙ্গ ছাড়ে না। কেবল ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। অর্থাৎ তার মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে গড়াতে থাকে। চোখে সেই অদ্ভুত দৃষ্টি।

বিনায়কবাবুর স্ত্রী করুণাদেবী অক্ষম সন্তানটিকে যতদিন পেরেছেন আগলে রাখার চেষ্টা করেছেন। তারপর যখন নিজে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেলেন তখন থেকে বিনায়কবাবুর ওপর পড়ল এই অসহায় সন্তানটির পরিচর্যার ভার।

করুণাদেবী মাঝে মাঝে স্বামীর হাত ধরে কেঁদে বলতেন, এ সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী। আমার পাপের শাস্তি আমি আর আমার ছেলে ভোগ করছি। আমার সঙ্গে এসে তোমাকেও এ পাপের অংশ নিতে হচ্ছে।

বিনায়ক বলেন, তুমি তো জানো করুণা, আমি এসবে বিশ্বাসী নই। কর্মফল, ভাগ্য এসব মেনে আমি আমার বিবেচনা, পৌরুষকে ছোট করতে চাই না। দেহমনের এইসব বিকৃতি মানুষের হতেই পারে। যতদূর সম্ভব তার সঙ্গে যুদ্ধ করাই মানুষের ধর্ম। আমি তোমাদের জন্য সামান্য যেটুকু করি তার ভেতর দিয়ে আমার মনুষ্যত্ব আর পৌরুষকেই জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। এই সব পরীক্ষার ভেতরে ফেলে তুমি আর তোমার ছেলে আমার মনের জোরকেই বাড়িয়ে তুলছ করুণা। এজন্যে আমি এতটুকুও ক্ষোভ জানাব না আমার ঈশ্বরের কাছে।

শৌভিক কালেভদ্রে আসে। যতদিন মা জীবিত ছিল ততদিন কয়েকটা করে টাকা গুঁজে দিয়ে যেত মায়ের হাতে। বিনায়কবাবু সব জানতেন কিন্তু বাধা দিতেন না। করুণাদেবীর এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ছেলেকে ডেকে তিনি বলেছিলেন, তোমার সংসারে সন্তান এসেছে, খরচ বেড়েছে. বাজারের অবস্থাও ভাল নয়। তুমি বুঝেসুঝে সংসার চালাও, মায়ের হাতে যা ভালোবেসে তুলে দিতে, তা আমাকে দিয়ে আর কাজ নেই। আমার সংসার ঠিকই চলে যাচ্ছে। আজও দু'একটা অনার্স স্টুডেন্টকে আমি পড়াই। আমার কথা না ভাবলেই আমি খুশি হব।

এরপর শৌভিকের আসা একেবারেই কমে গিয়েছিল। বিনায়কবাবুও বড়ছেলের নামটা প্রায় মুছে ফেলেছিলেন তাঁর জীবনের পাতা থেকে।

করুণাদেবী যতদিন সুস্থ ছিলেন, ছোট ছেলেটিকে পক্ষিণীর মতো আগলে রাখতেন। উত্তাপে, সোহাগে তাকে পূর্ণ করে দিতেন। দেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু নিজে অক্ষম হয়ে যাওয়ার পর কেবলই কাঁদতেন আর বলতেন, হে ঠাকুর, আমার মৃত্যুর আগে তুমি ওকে তোমার কোলে তুলে নাও। আমি যেন ওর মৃত্যু দেখে যেতে পারি।

বিনায়কবাবু তাই শুনে একদিন বলেছিলেন, কার কখন কী ঘটে যায় তা কী কেউ বলতে পারে!

আর বিনায়কবাবুর সেই কথাটাই সত্য হয়ে গেল। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও করুণাদেবী তাঁর পুত্রের মৃত্যু নিজের চোখে দেখে যেতে পারলেন না, অসহায় পুত্রকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখেই তাঁকে চলে যেতে হল।

বিনায়কবাবু বাইরের ঘরে ছাত্রছাত্রীদের পড়ান। একটি ব্যাচেই পাঁচজনকে পড়ান, সপ্তাহে দু'দিন ওরা আসে সুপর্ণের নির্দিষ্ট সময়টুকু বাদ দিয়ে।

সুপর্ণ সন্ধ্যার দিকে এলেই হাতের ব্যাগে কিছু খাবার আর তরিতরকারি নিয়ে আসে। ইদানীং বিনায়কবাবুর চোখে গ্লুকোমা অপারেশন হয়েছে। চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ। উনি বলেন, সব কিছু মেনে নিতে হয়। ডাক্তারকে দোষ দিয়ে, ভাগ্য আর ভগবানকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। তাঁর মতে, বিখ্যাত কত ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে কত সাধারণ রোগীও সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মানুষ এ অবস্থায় ভাগ্যের দোহাই পেড়েই সান্ত্বনা খোঁজে। কিন্তু বিনায়কবাবু কখনও সে পথের পথিক নন।

নিজে যে ধীরে ধীরে অক্ষম হয়ে পড়ছেন সে কথা কাউকে পারতপক্ষে জানাতে চাননি। তাঁর দৈনন্দিন কাজে কেউ সাহায্য করতে এলে তাকে সহাস্যে প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, যতক্ষণ একেবারে না পড়ে যাই, ততক্ষণ নিজের হাতে আমার কাজটুকু করতে দাও।

ব্যতিক্রম শুধু সুপর্ণ। নিচেই মাদার ডেয়ারির ডিপো। সুপর্ণ সন্ধ্যার দুধটা ওই ডিপো থেকে বিনায়কবাবুকে তুলে এনে দেয়। তা ছাড়া আর একটা কাজও কোনওদিন তাকে করতে হয়। অবশ্য কাজটা করে স্বেচ্ছায়। বিনায়কবাবু মুখে বাধা দেন কিন্তু সম্ভবত মনে মনে খুশি হন।

বিনায়কবাবুর পাশের ঘরে থাকে তাঁর ছোট ছেলে সুনন্দ। করুণাদেবীও ওই ঘরে থাকতেন। মায়ের মৃত্যুর পর সুনন্দ অসহায়ের মতো খুঁজত তার মাকে। সে বাবার কাছে কিছুতেই শুতে চাইত না। মাঝে মাঝে গভীর রাতে বিনায়কবাবু পাশের ঘরে থেকে সুনন্দর গোঙানি শুনতে পেতেন। উনি বুঝতেন, মাকে খুঁজে না পাওয়ায় ওই গোঙানির ভেতর দিয়ে সুনন্দর মনের আক্ষেপ প্রকাশ পাচ্ছে।

এক একদিন কথার মাঝেই সুপর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, যদি অনুমতি করেন তো আজ সুনন্দকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরোই।

বিনায়ক বলেন, আবার কেন সুপর্ণ, ও তোমাকে জ্বালাতন করে মারবে।

একটুও না স্যার। ইদানীং সুনন্দর সঙ্গে আমার দারুণ ভাব হয়ে গেছে।

আনন্দটা ভালভাবে উপভোগ করার জন্যে বিনায়কবাবু বলতেন, কি রকম?

বেরিয়ে আমরা যখন পার্কের চারদিকে টহল দিই তখন ওর মুখ চোখ খুশিতে ভরে ওঠে। ও নিজেই আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে হাঁটতে থাকে।

বিনায়কবাবু বিস্ময়ে ফেটে পড়ে বলেন, তাই বুঝি!

সুপর্ণ বলে, আপনি নিজের চোখে দৃশ্যটা দেখলে কিন্তু খুশি হতেন।

হঠাৎ যেন আবেগে মেঘ ঘনিয়ে উঠল বিনায়কবাবুব প্রায় দৃষ্টিহীন চোখে। তিনি বিভোর হয়ে সেই অপরূপ দৃশ্যটি মানসচক্ষে দেখতে লাগলেন। কখনও শৌভিক তার এই অক্ষম ভাইটার হাত ধরে বাইরে কোথাও কোনওদিন নিয়ে গেছে কিনা তা তিনি স্মরণে আনতে পারলেন না।

বিনায়কবাবু বললেন, তোমার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না, এ ধরনের প্রচলিত কথাগুলো প্রয়োগ করতে করতে তার ধার এত কমে গেছে যে তোমার ক্ষেত্রে এ কথাগুলো উচ্চারণ করতে আমার মন একটুও সায় দেয় না। মনে আছে, এক সন্ধ্যায় তুমি আমার বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলে ঠিক এক অপরিচিত দেবদূতের মতো।

ও কথা বলবেন না স্যার, আমি এসেছিলাম আমারই প্রয়োজনে। বিনায়কবাবু বললেন, তুমি কলকাতার প্রাচীন কলেজ এবং তার অধ্যাপকদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিলে।

সুপর্ণ বলল, সেই আসার সূত্র ধরে দুটো লাভ হল আমার. আমি পুরনো দিনের অনেক কথা জানতে পারলাম আর দ্বিতীয় লাভ আপনার মতো মানুষের সান্নিধ্য।

বিনায়কবাবু বললেন, সত্যি অবাক তোমার চরিত্র। সেই কতগুলো বছর ধরে প্রায় প্রতিদিনই তুমি

আসছ একই সময়ে। আমি পঙ্গু, ঘরের ভেতরে বসে আছি, তুমি বাইরের জগতটার রূপ-রস-গন্ধ আমার এই ভাঙা বাড়ির চারটে দেওয়ালের ভেতরে এনে হাজির করছ। চারদিকে মৃত্যুর অন্ধকার। কোন এক ছিদ্রপথে অপূর্ণ এক টুকরো আলোর রশ্মি এনে ফেলেছ তুমি।

একটু থেমে আবার বললেন, খুব কবিত্ব হয়ে গেল তাই না? তবে কথাগুলো একেবারে সত্য।

সুপর্ণ বলল, আমি তো কম পাইনি এ বাড়ি থেকে। কেবল পুরনো দিনের কথা জানা নয়, জীবনের বিচিত্র রূপকে মুখোমুখি জানতে পেরেছি।

সেটা বড় দাম দিয়ে জানতে হয়েছে সুপর্ণ।

একথা কেন বলছেন স্যার! আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিকে অনেকখানি ভরে দিয়েছে আপনার এই ভগ্নপ্রায় বাড়িটি। আমি এখানে এসে শিখেছি, কি করে জীবনে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়।

দার্শনিকের মতো উদাস কণ্ঠে বিনায়কবাবু বললেন, একথা সত্য জীবনে শেখার কোনও শেষ নেই।

হঠাৎ দেখা গেল পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। ও দরজাটা খুলতে গেলেই সামান্য একটু শব্দ হয়। সেই শব্দে দুজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। দুটি পাল্লার ফাঁকে মুখখানা রেখে সুনন্দ মিষ্টি মিষ্টি হাসছে।

বিনায়কবাবু সে ছবি অস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, মনে হয় সুনন্দ কিছু আর্জি জানাচ্ছে।

আপনি বোধহয় ওর হাসিটা দেখতে পাননি। ও বলতে চাইছে, আর কতক্ষণ তোমরা গল্প করবে, আমাকে নিয়ে একটু বাইরে যাবে না!

বিনায়কবাবু হেসে বললেন, তোমাকে নিয়ে সুপর্ণ পিতাপুত্রের টাগ অফ ওয়ার চলেছে। আমি পরাজিত। সুনন্দকে নিয়ে তুমি একটু ঘুরে এস।

একটু থেমে আবার বললেন, এটা তোমার ওপর অত্যাচার হয়ে যাচ্ছে না তো সুপর্ণ?

আপনি এভাবে ভাবেন কেন স্যার! আমার মনেব সায় না থাকলে আমি কি সুনন্দকে প্রায়ই বাইরে টেনে নিয়ে যেতে পারতাম!

সুনন্দকে হাতছানি দিয়ে ডাকল সুপর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে, বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কতকগুলো অর্থহীন শব্দে সে তার আনন্দ প্রকাশ করল।

ওরা বেরিয়ে গেলে বিনায়কবাবু বসে ভাবতে লাগলেন।

অতঃকিম? দু'দিন পরে আমি যখন থাকব না তখন কি হবে সুনন্দের? কিভাবে সে প্রতিদিন যোগাড় করবে একমুঠো ক্ষুধার অন্ন? শৌভিকের মনের মধ্যে ভালবাসা, করুণা বলে কিছু আছে কি? আচ্ছা এ বাড়িটা যদি শৌভিকের নামে লিখে দিয়ে যাওয়া যায় তা হলে কি সে তার ভাইটাকে দেখবে না?

সঙ্গে সঙ্গে হাসলেন বিনায়কবাবু, ভিখারী বাজার রাজপ্রাসাদ। তার জন্যে যুবরাজ তৃষিত নেত্রে তাকিয়ে আছে .... হা হা করে হাসলেন বিনায়কবাবু।

ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে উঠল বিনায়কবাবুর মুখখানা। তা হলে তাঁর অবর্তমানে সুনন্দ কি ভেসে যাবে? পথের ভিখিরীরা যেভাবে একমুঠো অন্নের জন্য ঘুরে বেড়ায়, সুনন্দের কি সে দশা হবে? না, না, তার চেয়ে অনেক বেশি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে ও। ও ভিক্ষে চাইতে জানে না। মানসিক প্রতিবন্ধী ও। ও বুদ্ধি করে নিজের প্রয়োজনটুকুও মেটাতে পারবে না।

বিনায়কবাবু ভাবলেন, এমন একটি জড়বুদ্ধি অর্ধমানবকে কেইবা ভালবাসবে, কেইবা তার ভার নিজের কাঁধে তুলে নেবে, একথাটা বড় নিষ্ঠুর হলেও নির্মম সত্য।

বিনায়কবাবু মনে মনে শৌভিকের ওপর কোনওরকম অভিমান বা অনুযোগ পোষণ করতে পারলেন না। এ পৃথিবীতে সুনন্দকে আনার ব্যাপারে শৌভিকের কোনওরকম দায়িত্বই ছিল না। সে ঘটনাক্রমে সুনন্দের অগ্রজ হয়ে জন্মেছে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। তার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতটাতে একখণ্ড মেঘের ছায়া এসে পড়ুক এটা পিতা হয়ে তিনিও চান না। ও সুখে থাকুক, আনন্দে থাকুক, পিতা হয়ে এই মাত্র তাঁর কামনা। তবে সুনন্দকে কি তিনি ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে যাবেন?

যত ভাবেন, তাল তাল কালো মেঘের মতো সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে সুপর্ণ আর সুনন্দ। দু'জোড়া পায়ের শব্দ বেজে উঠেছে। কি যেন বলল সুপর্ণ, দুর্বোধ্য ভাষায় তার উত্তর দিল সুনন্দ।

আচ্ছা, কে ওর নাম দিয়েছিল সুনন্দ? করুণার এক বান্ধবী। সুনন্দ—আনন্দদায়ক। যে বাবা-মা আব চারদিকের পরিজনদের আনন্দ দেবে সেই তো সুনন্দ। কি আশ্চর্য পরিহাস ভাগ্যের! যে আনন্দদায়ক সেইই অপার দুঃখের আঁধার।

বিনায়কবাবুর মনে হল আনন্দ এসেছে দুঃখের বেশে। ভিখিরী রাজপুত্রের বেশ পরে তাঁর সুনন্দ অভিনয় করে যাচ্ছে স্টেজে।

আজ অনেকদূর ঘুরে এলাম—সুপর্ণের কথায় ঘোর কাটল বিনায়কবাবুর। সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দ কিছু বলতে লাগল। বিনায়কবাবুর মনে হল যখন মানুষের ভাষা ছিল না তখনও মানুষ তার আনন্দকে প্রকাশ করেছে কতকগুলো অর্থহীন শব্দে। সেই শব্দের ভেতর দিয়েই তাদের আনন্দ মুক্তি পেয়েছে। তাঁর সুনন্দ সেই আদিম যুগেরই আনন্দময় এক পুরুষ।

সুপর্ণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, জানেন সুনন্দ আজ আমাকে একটি চমৎকার জিনিস দেখিয়েছে।

কি জিনিস?

আমরা আজ ট্রামে করে গড়ের মাঠ ক্রস করে যাচ্ছিলাম। আমাদের মুখ ছিল আলো ঝলমল চৌরঙ্গির দিকে। কাতারে কাতারে লোকজন চলেছে, সেইসব দেখছিলাম। ও হঠাৎ আমার মুখখানা ঘুরিয়ে দিলে পেছনের দিকে। বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে নিঃসঙ্গ মনুমেন্টটা দাঁড়িয়ে আছে। আলোর মালায় কী অপরূপই না সেজেছে।

আমাকে ওই দৃশ্যটুকু দেখাবার জন্যে ওকে আমি জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করলাম। ও আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখদুটো চকচক করে উঠল আনন্দে।

বিনায়কবাবু অনেকদিন পরে ছেলের একখানা হাত টেনে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য! সুনন্দ তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার জড়িয়ে ধরল তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুপর্ণকে। উজ্জ্বল আলোয় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকে সে দৃশ্য খুব স্পষ্ট দেখতে পেলেন বিনায়কবাবু। তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল।

বিনায়কবাবু মনের দিক থেকে খুবই শক্তিমান। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি নিজেকে কিছুতেই সংযত করে রাখতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, সুনন্দ যাকে জড়িত ধরে আছে, সে তার সহোদর ভাই শৌভিক। সুপর্ণ কি তাঁর সন্তান হতে পারত না? আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বিনায়কবাবুর বলিষ্ঠ শরীরখানা।

কয়েকদিন আপনমনে কিছু ভাবলেন বিনায়কবাবু। একদিন সুপর্ণকে একান্তে ডেকে বিনায়ক তার হাত দুটি ধরে বললেন, তুমি আমার সন্তান সুপর্ণ।

সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণ বিনায়কবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, আমার বাবা-মা বহুদিন গত হয়েছেন, আপনি অবশ্যই আমার বাবার মতো।

একটি কথা আছে বাবা।

সুপর্ণ বলল, সুনন্দের বিষয়ে কি? ওকে নিয়ে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। ওর সব ভার আমি নিলাম।

আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলেন না বিনায়কবাবু, তিনি সুপর্ণকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

সুপর্ণ বলতে লাগল, বিচলিত হবেন না স্যার। আমি বেশ কিছুদিন ধরে সুনন্দ সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা করে রেখেছি।

বিনায়কবাবু নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছেন। তিনি বললেন, কি সে পরিকল্পনা সুপর্ণ? তুমি যা করবে, তাতেই আমি খুশি, তাতেই আমার সুনন্দের মঙ্গল।

সুপর্ণ বলতে লাগল, বেহালা থেকে ডায়মন্ডহারবারের দিকে কিছুটা এগোলে গাছপালা ঘেরা

একটি নির্জন জায়গায় মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আনন্দধাম। জায়গাটা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। সেখানকার আবাসিকদের সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবরও নিয়েছি। আমার মনে হয়েছে, সেখানকার আলো-হাওয়ায় মায়ের স্নেহ ছড়িয়ে আছে।

সে কি রকম?

এক দরদী মা তাঁর সমস্ত স্নেহ দিয়ে ওই আনন্দধামটি গড়ে তুলেছেন।

এক মহিলা!

হ্যাঁ স্যার। তিনি আমাকে নিজের ভায়ের মতো ভালবাসেন। তাঁকে এখানে আনতে পারি।

এতদূর থেকে তিনি এখানে আসবেন?

আসবেন না কেন? অসহায়, বিপদগ্রস্ত মানুষ ডাক দিলেই তিনি চলে আসেন।

বিনায়কবাবু কাতর গলায় বললেন, ওখানে সুনন্দকে দিতে গেলে যে অনেক টাকা লাগবে বাবা।

সে ভাবনা আপনি করবে না। যখন আমাকে নিজের ছেলে বলে ভেবেছেন তখন সুনন্দের সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন। তা ছাড়া ওঁরা তো এই প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে কোনওরকম মুনাফা লাভের চেষ্টা করছেন না। কেবল ওঁদের সঞ্চিত অর্থ থেকে খরচটুকু উঠে গেলেই হল। আমি ইতিমধ্যেই সুনন্দের জন্য একটা অ্যামাউন্ট আলাদা করে ব্যাঙ্কে সরিয়ে রেখেছি।

বিনায়কবাবু বিহ্বল হয়ে গেছেন। তিনি বলে উঠলেন, আমার মৃত্যুর পরে এই জীর্ণ বাড়িটা আমি তোমাকেই দিয়ে যেতে চাই সুপর্ণ। আমি আগেভাগেই রেজিস্ট্রি করে দেব।

তা হয় না স্যার। বাড়িটা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক আপনার ছেলে শৌভিকও এ বাড়ির অংশীদার। তাঁকে আপনি বঞ্চিত করলে কাজটা অমানবিক হয়ে যাবে।

বিনায়কবাবু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, সে তো কোনও মানবিক কাজ করেনি সুপর্ণ। বাবা-মা-ভাই কারো দিকে সে দু'চোখ মেলে তাকায়নি। মা জীবিত অবস্থায় যে কটা টাকা দিয়েছিল সেগুলোও আমি পাই পয়সায় মিটিয়ে দিয়ে যাব।

সুপর্ণ বিনায়কবাবুর হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, ও কাজ করবেন না স্যার। মাকে নিয়ে একটা ছেলের সেন্টিমেন্টে ওভাবে আঘাত দেবেন না! তা ছাড়া মাসিমা তো কোনওদিন তাঁর ছেলেকে তার টাকাগুলো ফিরিয়ে দেননি।

তবে বাড়িটা আমার। আমি যদি সুনন্দের কল্যাণে বাড়িটা আনন্দধামে দান করে যাই তা হলে তো কারো কিছু বলার থাকে না।

সে আপনার অভিরুচি। তবুও পরামর্শের ছলে শৌভিকের কানে কথাটা তুলবেন। তার অভিপ্রায়টা জেনে নিন।

একদিন শান্তাদেবী এলেন আনন্দধাম থেকে। তাঁর মুখ দেখে এবং সেই মুখে স্নেহময়ী জননীর একটা ছায়া দেখে বিনায়কবাবু বড় তৃপ্তি পেলেন।

বললেন, সুপর্ণের মুখে আপনি নিশ্চয়ই সব শুনেছেন। আমার ওই অসহায় ছেলেটির ভার দয়া করে আপনাকেই নিতে হবে।

শান্তাদেবী বললেন, আমার হাত দিয়ে ঈশ্বরই নেবেন ওর ভার। আপনি একান্তে নিশ্চিন্তে থাকুন। সুপর্ণের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

আমি একটা কথা যদি আপনার কাছে জানতে চাই তাহলে আপনি কি কিছু মনে করবেন?

কিছুই মনে করব না, কি জানতে চান বলুন?

অনেক আশ্রয় নিকেতনে শুনেছি জড়বুদ্ধিদের মানুষের মতো মর্যাদা দেওয়া হয় না। সন্তান তো, তাই সে বিষয়ে একটু জানতে ইচ্ছে করে।

প্রশান্ত হাসি হাসলেন শান্তাদেবী। বললেন, আমার একটিমাত্র সন্তান মানসিক প্রতিবন্ধী। তাকে কেন্দ্র করেই আমি এই আনন্দধামটি গড়ে তুলেছি। এর একটি ছেলেকে অমর্যাদা বা আঘাত করলে সে আঘাত গিয়ে বাজবে আমার সন্তানের বুকে। আমি মা হয়ে তা সইতে পারব না।

বিনায়কবাবু বললেন, আজ আমি পরম শান্তি পেলাম মা।

চার

প্রথম বিদায় নিলেন সদানন্দবাবু। পনেরো বছর কম সময় না হলেও তারই ভেতর চলে গেলেন তিনজন। সুপর্ণ পুরো দশ বছর ধরে তিনজনের সান্নিধ্য পেয়েছিল। সময়ের দিকে থেকে সেটা কম নয়।

দশ বছর পরে সুপর্ণ সদানন্দবাবুকে হারাল। পরের পাঁচ বছরে বাকি দু'জন চলে গেলেন।

সদানন্দবাবু যান রাত্রি আটটাতে। সে সময় ওঁর বাড়িতে হাজির ছিল সুপর্ণ, যদিও সে সময়তার বিনায়কবাবুর বাড়িতেই থাকার কথা।

নিশিকান্তবাবুর বাড়ি থেকে সে চলে যায় সদানন্দবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে সর্বশেষ উপস্থিতি বিনায়কবাবুর জীর্ণ প্রাসাদটিতে। এই শেষ বাড়িটিই তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণের স্থান। আর এখানেই সে সময় দেয় অনেকখানি বেশি। যে মানুষটি যথার্থই সবদিক থেকে অসহায়, অথচ নিজেকে কখনো অসহায় বলে মনে করেন না, সে মানুষটির প্রতি কেন জানি না অদ্ভুত রকমের টান অনুভব করে সুপর্ণ।

সে সন্ধ্যায় সদানন্দবাবুর গেটে ঢুকতে গিয়েই উদ্বিগ্ন দুটি রিকশাওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সুপর্ণের। তারা যেন সুপর্ণের জন্যেই পথ চেয়ে ছিল। এ সময় তাদের সাধারণত থাকার কথা নয়, কিন্তু রাস্তায় একজনের রিকশাটা ভেঙে যাওয়ায় সেটাকে আপাতত রাখতে এসেছিল সদানন্দবাবুর বাড়িতে। এসেই দেখে দরজাটা আধখানা খোলা, যা প্রায় কখনও থাকে না। অথচ বাবু বাইরেও বেরোননি। তাই সে ভেতরে উঁকি দিয়েছিল। আর উঁকি দিয়েই সে দেখতে পেয়েছিল, আদ্দেক বিছানায় আর আদ্দেক মেঝেতে পড়ে আছেন সদানন্দবাবু। দু'চারবার ডাক দিয়েও যখন বাবুর সাড়া পেল না তখন সে বাবুকে পুরোপুরি তুলে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল। জ্ঞান ছিল না, কিন্তু তখনও প্রাণটা কোনওরকমে টিকে ছিল। সে হাঁকডাক করে তার দু'একজন সঙ্গীকে যোগাড় করল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সঙ্গে কোনও খবর দেয়নি। তারা জানত ঠিক এই সময়টিতেই আসেন সুপর্ণবাবু, তাই সুপর্ণের জন্যই অপেক্ষা করছিল তারা।

প্রথম কর্তব্য হিসেবে পাশেই ডাক্তারের চেম্বারে ছুটলো সুপর্ণ। ইনিই সামান্য অসুখ-বিসুখে সদানন্দবাবুর দেখাশোনা করে থাকেন। বয়স আশির ওপর, বিচক্ষণ।

ডাক্তারবাবু এসে পরীক্ষা করে বললেন, কেসটা বাড়িতে রাখার নয়, হসপিট্যালে অথবা কোনও ভাল নার্সিংহোমে নিয়ে যেত হবে।

শনিবার, মাসের শেষ সপ্তাহ। এ সময় হাতে অনেকগুলো টাকা থাকার কথা নয়। তাছাড়া সকালের দিকে জানতে পারলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যেত, সে সুযোগও নেই। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মাত্র কয়েকটা টাকায় এসব রোগের চিকিৎসা হয় না।

হঠাৎ খেয়াল হল সুপর্ণের। সে রিকশাওয়ালাদের কাছে কিছু টাকা পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইল। অবশ্য সঙ্কোচের সঙ্গেই বলল কথাটা।

ওদের ভেতরে একজন বলল, কি বলছেন বাবু! বাবার এ অবস্থায় আপনার কতটাকা চাই তা খুলে বলুন। কোনও সঙ্কোচ করবেন না।

দু'তিন হাজার পাওয়া যাবে?

আর কোনও কথা না বলেই ওরা ওদের রিকশার ভেতর থেকে দু'তিনটে থলি বের করে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা পেয়ে গেল।

সুপর্ণ বলল, আমি তোমাদের সব টাকা দু'তিনদিনের ভেতর শোধ করে দেব।

ও কথা থাক। এখন আমাদের কি করতে হবে বলুন? যখন যেমন দরকার আমরা বাবার জন্য তাই করব।

হসপিট্যালের ইনটেনসিভ কেয়ারেই রাখা হয়েছিল সদানন্দবাবুকে। কিন্তু তিনি সেখান থেকে জীবিত অবস্থায় আর বাড়িতে ফিরে আসতে পারেননি।

খবর গিয়েছিল ছেলের কাছে। ছেলে ট্যুরে থাকায় খবরটা দু'দিন পরে পেয়েছিল। সপরিবারে চলে এসেছিল এমার্জেন্সি কোটার টিকিট কেটে ডাইরেক্ট ফ্লাইটে।

খুব যত্ন করেই শব-সংরক্ষণ করে রেখেছিল সুপর্ণ।

ছেলে প্রথমে এসেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। দাদুর গালে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল নাতি কনককেতন।

শোকের প্রবাহ থামলে ছেলে আনন্দবর্ধন সুপর্ণের দুটো হাত ধরে বলেছিল, আপনিই পুত্রের কাজ করেছেন, সুপর্ণদা। এ পরিবার আপনার ঋণ কখনো শোধ করতে পারবে না।

যদি আপনার বাবার জন্য কেউ কিছু করে থাকে তাহলে এই রিকশাওয়ালারাই। ওরাই ওঁকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখে আমাকে খবর দিয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় আমার ব্যাঙ্ক খোলা নেই। টাকা পাই কোথায়? ওরাই পরিত্রাতার মতো আমাকে টাকা যুগিয়েছে।

আনন্দবর্ধন বলল,ওরা যা দিয়েছে আমি ওদের সে টাকার দু'গুণ দিয়ে দেব।

সুপর্ণ বলল, তা করতে যাবেন না, আনন্দ। ওরা আপনার বাবাকে যথার্থই ভালবাসত। ওরা গরিব হতে পারে, কিন্তু ওদের মন ছোট নয়। আপনি বরং ওদের এক সেট করে পোশাক আর একখানা করে কম্বল দিয়ে দেবেন।

আনন্দবর্ধন বলল, আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হবে দাদা।

হ্যাঁ আর একটি কথা, শীতে ওরা যেমন কষ্ট পায়, বর্ষায় তেমনি সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। ওয়াটারপ্রুফ চারজনের চারখানা দিতে পারেন যদি তাহলে বড় উপকার হয় ওদের।

আনন্দবর্ধন বলল, এখানকার বাজারে যতটা ভাল পাওয়া যায় আমি ওদের জন্য তাই কিনে দেব।

কাজকর্ম নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেলে সুপর্ণকে কাছে ডেকে জরুরি পরামর্শে বসল আনন্দবর্ধন।

দাদা, এ বাড়ির ব্যাপারে আপনার একটা পরামর্শ চাই আমি।

কি জানতে চাও বল?

বাড়িটা আমি বিক্রি করতে চাইছি না। কারণ এতে মা, বাবার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাছাড়া, এই রিকশাওয়ালাদের রিকশাগুলো অনেক আগে থেকেই এখানে থাকে। আমি অবশ্য ওদের হটিয়ে এ বাড়ি বেচে দিতে পারি, কিন্তু সেটা আমার কাছে হবে অমানবিক কাজ। তার চেয়ে আপনার কাছে আমি সবিনয়ে একটা প্রস্তাব রাখতে চাই। আমি যতদূর জানি কলকাতাতে আপনার কোনও বাড়ি নেই, আপনি কি এ বাড়িখানা নেবেন? বাবার আত্মা কিন্তু এতে খুশি হবে।

সুপর্ণ আনন্দের হাত ধরে বলল, তোমার মনটা তোমার বাবার মতোই উদার। তুমি কি জান, তোমার বাবা যখন ওড়িশা সরকারের ফিশারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, তখন এক জনহীন নদীতীরে তিনি গিয়েছিলেন মৎস্য চাষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে খতিয়ে দেখতে। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় অতি দরিদ্র কয়েকটি মানুষের সঙ্গে। দ্বিতীয়বার যখন তিনি ওখানে যান, তখন প্রায় পুরো পরিবারটা নানাভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাকি ছিল একজোড়া স্বামী-স্ত্রী আর তাদের একটি কন্যা। ওখানে তোমার বাবাকে ওই হতদরিদ্র স্বামী-স্ত্রী সাধ্যমতো সেবা করেছিল। তিনি নিজের জায়গায় ফিরে এসে কয়েক সহস্রটাকা খরচ করে একটি মাছ ধরার ছোট নৌকো তৈরি করান। তারপর উপযুক্ত লোককে দিয়ে সেই নৌকো পাঠিয়ে দেন ওই হৃদয়বান দরিদ্র পরিবারটির কাছে। তুমি সেই সদানন্দবাবুরই ছেলে, আনন্দ। তোমার মন বাবার মতো প্রসারিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

আনন্দবর্ধন বলল, আসল উত্তরটা এখানো পাইনি, দাদা।

আনন্দ, আমার সংসার নেই, পেছনের কোনও বন্ধনও নেই, আমি এবাড়ি নিয়ে কি করব? হয়তো বাড়িখানা কেনার সামর্থ্য আমার আছে, কিন্তু যেখানে তাকে ব্যবহার করতে পারব না, সেখানে সেটিকে রেখে লাভ কি? আমার ক্ষেত্রে বাড়ি হবে বিড়ম্বনা।

আনন্দ বলল, আমি কিন্তু বাড়ি বিক্রি করতে চাইনি, দাদাকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হিসেবে দিতে চেয়েছিলাম।

সুপর্ণ বলল, তা হলেও যে দানকে আমি মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারব না তাকে নিয়ে আমি কি করব বল?

আচ্ছা আপনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বাড়িটা বেচে দিলে এ বেচারারা একেবারে আশ্রয়হীন হয়ে যাবে যে। এদের কি ব্যবস্থা করা যায়?

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সুপর্ণ বলল, আচ্ছা বেশ আমি বাড়ির দায়িত্ব নিচ্ছি, কিন্তু ভাই দান হিসেবে নেব না, আমি কথা দিচ্ছি বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ আমি করব কিন্তু মালিক থাকবে তুমি। বাবার জন্যে অন্তত একবার দেশে আসতে, এখন দাদার জন্যে এস। বাবা-মায়ের স্মৃতিভরা বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য থেকে যাবে।

তাই হবে দাদা, আপনার প্রস্তাবই বহাল থাকবে। আমার কনককেতনেরও দেশের মাটির সঙ্গে যোগ থাকবে, এটা আমি চাই।

নিশিকান্তবাবু কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর মেয়েকে কাছে পাননি। তাঁর মেয়ে তৃষা মিত্র এলাহাবাদ থেকে এসে দেখেছিল, সুপর্ণের কোলে মাথা রেখে বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। একটু আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন সুপর্ণের কোলে শুয়েই।

বেশ ধুমধাম করেই নিশিকান্তবাবুর পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করল তাঁর একমাত্র মেয়ে তৃষা। প্রতিটি কাজে তৃষা পরামর্শ নিল সুপর্ণের কাছ থেকে। কলকাতার বাড়িটা তৃষা রেখে দিল তার এক দেওরের ব্যবহারের জন্যে। দেওরটি প্রায়ই কলকাতায় আসে তার কোম্পানির কাজ নিয়ে। এ বাড়িটাতে থাকতে পেয়ে তার বেশ সুবিধেই হল।

এলাহাবাদ ফিরে যাবার দিন তৃষা সুপর্ণকে একান্তে ডেকে বলল, বোন যদি সামান্য কিছু স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দাদার হাতে তুলে দেয় তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন কি?

হেসে বলল সুপর্ণ, বোনের সামান্য দানও দাদার কাছে অসামান্য হয়ে উঠবে।

তৃষা তার ব্যাগ খুলে তিনটি ফাউনটেন পেন বের করল। পেন তিনটি শুধু দামী নয়, যথেষ্ট নামীও। একটি গোল্ডক্যাপ পার্কার ফিফটি-ওয়ান, অন্যটি লাইফ টাইম শেফার্স আর তৃতীয়টি মন্ট ব্ল্যাঙ্ক। তিনটি কলম নতুনের মতো ঝকঝক করছে, যেন কলমগুলো সদ্য বাজার থেকে কিনে আনা।

সুপর্ণ বলল, এগুলো কোথা থেকে আমদানি করলে?

এগুলো বাবার অ্যাটাচি কেসের মধ্যে ছিল। আমি এ তিনটে পেন বিভিন্ন সময়ে বাবার জন্মদিন উপলক্ষে দিয়েছিলাম। বাবা নতুন নতুন পেন বড় ভালবাসতেন। কিন্তু আমার উপহার দেওয়া পেনগুলো বড় যত্ন করে গুছিয়ে রাখতেন, ব্যবহার করতেন না। আরও একগোছা পেন বাবার ড্রয়ারে রয়েছে।

সুপর্ণ বলল, এগুলো আমার কাছে অমূল্য দান।

তৃষা বলল, দাদা, এগুলো দেওয়ার পেছনে আমার একটু স্বার্থ আছে। এই পেনেই আপনি বোনকে চিঠি লিখবেন, এই আকাঙ্ক্ষা।

বেশ, তোমার ইচ্ছাপূরণের জন্যে আমি চেষ্টা করব।

সুপর্ণের চলে যাওয়ার মুহূর্তে তৃষা বলল, আজ বাবা নেই কিন্তু আমাদের ভাইবোনের সম্পর্ক যেন অটুট থাকে।

সুপর্ণ বলল, পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর আর পবিত্র এই ভাইবোনের সম্পর্ক। এ বাঁধন কি কখনও ছিন্ন হয় বোন!

নিশিকান্তবাবুর বিদায়ের পর বিনায়কবাবু একদিন বলেছিলেন. সুপর্ণ, তোমার সংবর্ধিত গাছের তিনটি পাতার ভেতর দুটি খসে গেল। এখন রইল কেবল এক। এবার শীতের হাওয়ার কাঁপন লেগেছে। তার রংটিও হয়ে এসেছে বিবর্ণ হলুদ। এবার সময় হয়েছে খসে পড়ার।

সুপর্ণ হেসে বলে, গাছ না ছেড়ে দিলে সাধ্য কি পাতা খসে পড়ে!

বিষন্নমুখে বিনায়কবাবু বলেন, আর কী নিয়ে বেঁচে থাকি, সুপর্ণ! তবু যতদিন সেই জড়বুদ্ধি ছেলেটা এ ঘরে ছিল, একবার করে দরজা খুলে অবাক চোখে আমার দিকে তাকাত। কানা হোক, খোঁড়া হোক, জড় হোক সে আমার আত্মজ সুপর্ণ। তাকে দেখলেই বুকটার ভেতরে কেমন করে উঠত। আজ সে এ বাড়ি থেকে দূরে সরে গেছে, তার দিক থেকে নিশ্চয়ই মঙ্গল, কিন্তু আমি কেমন যেন রিক্ত হয়ে গেলাম।

সুপর্ণ বলল, কালও আমি খবর নিয়েছি স্যার। আনন্দধামে ও সবার সঙ্গে মিলে মিশে আনন্দেই আছে। একটা নাটকেও ও অংশ নিয়েছিল।

বাঃ! আমি ভাবতেও পারিনি আমার সুনন্দ নাটকে অংশ নেবে। তুমি শান্তাদেবীকে আমার অভিনন্দন জানিও। আমি অসুস্থতার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েও যেতে পারিনি বলে আমার হয়ে তুমি ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও।

কালের নিয়মে ত্রিপত্রের শেষ পত্রটি ঝরে গেল। বাবার মুখাগ্নি করতে এল শৌভিক। শ্মশানে একান্তে সুপর্ণকে ডেকেনিয়ে গিয়ে হাত ধরে অনেক চোখের জল ফেলল।

কাজ মিটে গেলে, সুপর্ণ শৌভিককে বলল, তোমার বাবা বসতবাড়িটা 'আনন্দধামে' দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, আমি তোমার কথা ভেবে তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম। এখন তোমার যা অভিরুচি তাই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে শৌভিক বলল, আমি তো বাবার জন্যে কিছু করিনি কোনওদিন। তিনি আমার জন্য সব কিছু করেছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছাটুকু অন্তত আমাকে পূর্ণ করতে দিন। বাড়িটা আমি আনন্দধামকেই লিখে দিতে চাই।

শেষ কাজটি হয়ে যাওয়ার পর বিনায়কবাবুর বাড়ি থেকে চলে আসার সময়ে সহসা আশ্চর্য একটি ছবি ফুটে উঠল সুপর্ণের চোখের সামনে। ঈশ্বরের বিরাট ক্যানভাসে আঁকা একটি বিস্ময়কর ছবি।

ঘটনাটা ঘটেছিল বিনায়কবাবুর মৃত্যুর ঠিক একমাস আগে।

রাত নটায় আনন্দধাম থেকে ফোনটা এসেছিল তারই কাছে। শান্তাদেবী কাতর গলায় বলেছিলেন, সুপর্ণ, সুনন্দ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পাশেই এক ডাক্তারবাবু থাকেন, তাঁকে ডেকে এনে দেখানো হয়েছে, কিন্তু কোনওরকম ফল পাওয়া যাচ্ছে না। সুনন্দ দ্রুত সিঙ্ক করছে। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস।

সুপর্ণ সেই রাতেই বিনায়কবাবুকে ট্যাক্সিতে তুলল। ট্যাক্সি ছুটে চলল ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে।

রাত পৌনে এগারোটায় ওরা পৌঁছল আনন্দধামে। শান্তাদেবী আগলে ধরে বসেছিলেন সুনন্দকে। একটু দূরে ডাক্তারবাবু কী একটা ইনজেকশন দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন।

বিনায়কবাবুকে দেখে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল সুনন্দ। সে দুটো হাত বাড়িয়ে দিল তার বাবার দিকে।

শান্তাদেবী বললেন, সুনন্দ ওর বাবাকে চিনতে পেরেছে। আপনি ওর মাথাটা সাবধানে কোলে নিন।

তাই করলেন বিনায়কবাবু।

সেই জড়বুদ্ধি ছেলের মুখে হঠাৎ আনন্দের আভাস ফুটে উঠল। সে তার দুটো হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। বুদ্ধির জড়ত্বকে, দেহের জড়ত্বকে জয় করে জেগে উঠল অন্তর্নিহিত জিন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বাবার গলা থেকে খসে পড়ল তার হাত। ইনজেকশন ডাক্তারের হাতেই ধরা রইল। সুনন্দ চলে গেল আনন্দধাম থেকে আর এক আনন্দধামে।

শান্তাদেবী বিনায়কবাবুকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন। পুত্রের মৃতদেহ কোলে নিয়ে বুক ভেসে যাচ্ছিল চোখের জলে।

বিনায়কবাবু বলে উঠলেন, আজ আমার পরম শান্তির দিন শান্তাদেবী। অক্ষম ছেলেকে পেছনে ফেলে রেখে আমি যদি আগে চলে যেতাম তাহলে তিলমাত্র শান্তি থাকত না আমার মনে। আজ ও চলে যাওয়ায় আমি একেবারে ভারমুক্ত হয়ে গেলাম। শান্তাদেবী আমার বুকে আনন্দ ও হাহাকার একসঙ্গে মিশে গেছে।

সুপর্ণের নিজের কথা

পাঁচ

কলেজ থেকে অবসর নিয়েছে সুপর্ণ। নানা উপহার এবং পুষ্পিত সমারোহে তাকে বিদায় জানিয়েছেন সহকর্মীরা।আজ সে একেবারে ভারমুক্ত। গঙ্গার ধারে বসে কতক্ষণ জীবনের প্রবাহকে দেখল সুপর্ণ। লঞ্চগুলো পারাপার করছে, নৌকো চলেছে স্রোতের টানে। সূর্যাস্তের আয়োজন চলেছে পশ্চিম আকাশে। বড় অপূর্ব এই সূর্যাস্তের সমারোহ।

এই সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোনালি সকালের একটা ছবি কোথা থেকে ফুটে উঠল।

মানালী লগ হাউসের একটা কুঠরিতে ঘুম ভেঙে গেছে তার। এখনও গা থেকে সব কটা কম্বল সে সরাতে পারেনি। বেয়ারা বেড-টি দিয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে যে টেবিল থেকে গরম চা-টা তুলে নেবে সে ইচ্ছাটুকুও মনের ভেতরে জাগছে না। জাগলেও বিছানা ছাড়তে এতটুকুও ইচ্ছে নেই তার।

জানালার ফাঁক দিয়ে একটুকরো আলো এসে পড়ল মুখে। উত্তাপে ভরা সোনালি আলো। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সুপর্ণ। চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিল। গরম চা-টা চুমুকে চুমুকে শেষ করে দারুণ আরাম বোধ করল সে।

এবার সে খুলে ফেলল জানালার দুটো পাল্লা। একেবারে গভীর খাদ সংলগ্ন তার দেওয়াল। ছাদ থেকে কয়েকটা ফুলে ভরা লতা দোল খাচ্ছে তার জানালার ওপারে। সামনে চিত্রপটে আঁকা এক বিশাল উপত্যকা। সমস্ত উপত্যকা ঘিরে পাহাড়। বাদামী আর নীলাভ তাদের রঙ। শৈলকন্যারা ওড়াচ্ছে কুয়াশার হালকা নীলাভ ওড়না।

দূরে পীরপাঞ্জালের মাথায় ঝকঝক করছে সাদা বরফ। সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটির মাথায় কে যেন সোনালি মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। ওপরে ঝকঝকে নীল চন্দ্রাতপ।

নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ পাইনের সারি। নিচে উপবীতের মতো সাদা মানালসু নদী উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বয়ে চলে গেছে। নদীতীর থেকে দুটো কুরল পাখি সাদা ডানা মেলে উড়ে চলে গেল উত্তর দিকে।

জানালা দিয়ে ডানদিকে কাত হয়ে তাকাল সুপর্ণ। প্রায় সুপর্ণর হাতের নাগালের মধ্যে পাহাড়ি পাইনের জঙ্গল। তারই ভেতর দিয়ে চলেছে একদল কাঠকুড়ুনি। কারও কারও পিঠে শুকনো কাঠের বোঝা। একটু নুয়ে ওপর দিকে উঠছে তারা। দুটো হাত পেছন দিকে কাঠের বোঝা ছুঁয়ে আছে। রঙিন ফিতে দিয়ে বিনুনি বাঁধা। গোল্ডেন অ্যাপেলের মতো অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী। তার ওপর এসে পড়েছে সোনালি সূর্যের আলো। মেয়েগুলি কল কল শব্দ করছে, খল খল খুশি ছড়িয়ে চলেছে। সমস্ত অবয়বে এমন এক সরলতা মাখানো যা নির্মল আনন্দের মতো উদ্ভাসিত। সুপর্ণের মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এল—'এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে'।

প্রথম অধ্যাপনার কাজটুকু পেয়ে ক'দিন পড়াতে না পড়াতেই এসে গেল পুজোর ছুটি।

সে মেয়েদের ক্লাসে সবে শুরু করেছিল 'বলাকা'।

> শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
> উদ্দাম উধাও;
> ফিরে নাহি চাও,
> যা কিছু তোমার সব
> দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।'

অতি অল্প কয়েকটা টাকা কলেজ থেকে পেয়েছিল সুপর্ণ। চাকবির গবম দেখিয়ে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে অনেকগুলো টাকা ধার করল সে। পুরো ছুটিটা তো খরচ হোক, তারপর একসময় শোধ দিয়ে দেওয়া যাবে।

সুপর্ণর চাকরিপ্রাপ্তিতে যেসব বন্ধুরা মনে মনে কিছুটা ঈর্ষাপোষণ করেছিল তারাও দু'হাতে টাকা দিতে কার্পণ্য করল না। পঁচিশ বছরের সুপর্ণ বেরিয়ে পড়ল মুক্ত বিহঙ্গেব মতো। সে একাই ঘুরে বেড়াবে মানালীর পথে পথে। তার বহুদিনের সাধ আর স্বপ্ন।

সে কুলু উপত্যকার কথা এত শুনেছে যে সবটাই তার কাছে ছবি হয়ে গেছে।

ছোট ট্রেনে উঠেছিল কালকায়। ট্রেন সিমলা স্টেশনে এসে পৌঁছেছিল একেবারে বেলা শেষে।

বেলা শেষের আলোকে হঠাৎ ঢেকে দিল একতাল কালো মেঘ। প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠে ইলেকট্রিকের তার, গাছের ডালপালা ভেঙে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। সুপর্ণ কোনওরকমে আত্মরক্ষা করল ওপরে পি, ডবলিউ, ডি-র একটা কুঠিতে ঢুকে। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ নির্মেঘ, চাঁদ উঠল। শুক্লা চতুর্থীর একফালি চাঁদ।

পরের দিন সুপর্ণ ঘুরে বেড়াল সিমলা শহরটা।

পঁচিশ বছরের দুরন্ত যৌবন। সারা পাহাড়টা চষে বেড়াল সুপর্ণ। বিরাট জায়গা। ওপরে-নিচে ওঠানামা করতেই বুক চড় চড় করে, কিন্তু যৌবনের শক্তি কষ্টকে জয় করতেই ভালবাসে।

ছোট্ট একটি ঝর্না চোখে পড়ল একদিন। বেণী দোলানো চঞ্চল এক কিশোরী কন্যার মহিমায় সে ছুটে চলেছে।

দুটি তরুণ তরুণী বসে আছে পাইন গাছের তলায় একখণ্ড মসৃণ পাথরের ওপর। আঙুলে জল ছুঁয়ে আছে মেয়েটি।

গানের কলি ভেসে এলো।

মগ্ন হয়ে শুনছে ছেলেটি।

কথা বোঝা যাচ্ছে না। সুর প্রাণে এসে বাজছে।

সুপর্ণের হাতে পুরানো মডেলের আশাহি পেনটাক্স। মাখনের মতো কোমল ছবি ওঠে।

ও বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিল।

তরুণী মেয়েটি সম্ভবত তার বন্ধুর হাত ধরে, অন্যহাতে সালোয়ার সামলে বোল্ডারের ওপর দিয়ে পার হতে গিয়ে ভিজে গেল।

সুপর্ণ ছবি তুলল ঐ তরুণ-তরুণীর।

ছোট সিমলা থেকে সে এক সন্ধ্যায় তাকাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি সিমলা শহরের দিকে। রাতের সিমলা ঝলমল করছে আলোয়। নিওন আর বাল্ব আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। সব আলোকেই জ্বলজ্বলে নক্ষত্র বলে মনে হচ্ছে। দূর থেকে রাতের শহরটাকে মনে হচ্ছে ঝকঝকে নক্ষত্রখচিত আকাশ।

পরের দিনই ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বাসে চড়ে সুপর্ণ চলল কুলুর উদ্দেশ্যে।

মাণ্ডি ছাড়িয়ে কুলু জেলায় ঢোকার মুখে বাস থেকেই সুপর্ণের চোখে পড়ল বোর্ডের ওপর লেখা : 'ওয়েলকাম টু কুলু'। সুপর্ণ লেখাটা দেখেই রোমাঞ্চ অনুভব করল।

কিছুপথ এগিয়েই সে ডানদিকে পেল কুলুর প্রাণধারা কান্তিময়ী বিপাশাকে। বোল্ডারের ধাক্কা লেগে নীল জল ছড়িয়ে পড়ছে সাদা বেলফুলের মতো। মাঝে মাঝে পাইনের সারি। তীর জুড়ে সারা পথ প্রায় আপেলের বাগান। সেপ্টেম্বরে গাছ ভরে থোকা থোকা আপেল ফলে আছে। ইতিমধ্যে বহু আপেলই তোলা হয়ে গেছে বাগান থেকে। সে সব প্যাক হয়ে চালান গেছে রাজ্যে রাজ্যে। এখন চলেছে শেষের ফলন।

সুপর্ণ আগেভাগে কোনও হোটেল বুক না করেই এসেছে। সে জানে না সামনেই কুলুর দশেরা উৎসব। ভারতের বহু জয়গা থেকেই মানুষজন আসবে। হোটেলে এ সময় রুম পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বাসযাত্রীদের কাছ থেকেই সে কথাটা জেনেছিল। তাদের পরামর্শেই সুপর্ণ কুলুতে না নেমে চলে এল একেবারে মানালী।

বাস থেকে নেমে সে চারদিকে তাকিয়ে হতচকিত হয়ে গেল। কুলু জেলার চারদিকে সে বিচ্ছিন্ন পাহাড় দেখতে দেখতে এসেছে। ব্রাউন আর ব্লু রঙের পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাদা বরফ ছিটানো। কিন্তু মানালী জায়গাটা যেন বিশাল একটা টব। চারদিক ঘিরে পাহাড় টবের মতো মাথার দিকে প্রসারিত গোলাকার হতে হতে অনেক ওপরে উঠে গেছে। পাইন গাছ ও আপেলের বাগান মিলে এ যেন এক স্বর্গীয় উদ্যান। টবের উত্তরের মাথায় কেবল বরফ আর বরফ। পীরপাঞ্জালের সীমাহীন সৌন্দর্য। কাছে পিঠের কোনও হোটেলেই জায়গা নেই। গভর্নমেন্ট রেস্ট হাউস, ট্যুরিস্ট বাংলো কানায় কানায় ভর্তি।

অনেক অনুনয়-বিনয়ে এক সরকারী অফিসার পরামর্শ দিলেন, ভ্যালির কাছে কফি হাউসের ওপরের পাহাড়ের যে লগ হাউস, ওখানে একখানা রুম খালি আছে। পার ডে আপনার কিছু বেশি দিতে হবে, কিন্তু খুবই আরামে থাকবেন। তবে অনেকটা নিচে নেমে খাওয়াদাওয়া সারতে হবে। এসময়ে রাস্তার ধারে ধারে অজস্র রেস্তোরাঁ পাবেন।

উনি একখানা চিঠি লিখে দিলেন, সুপর্ণ তাই নিয়ে ছুটল লগ হাউসের দিকে। কেয়ারটেকারকে চিঠি দেখাতেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা পেয়ে গেল।

লগ হাউসের জানালা খুলেই সুপর্ণ সোনালি সকাল, সবুজ পাইনের বন, অপরূপ উপত্যকা আর কান্তিময়ী কুলুকন্যাদের দেখল।

সকালে সে ঝলমলে রোদ্দুরে স্নান করতে করতে বেরিয়ে পড়ল জায়গাটা ঘুরে দেখতে। ঝকঝকে হৈচৈওয়ালা বিরাট কোনও শহর নয়। উঁচু নিচু বাঁধানো পাহাড়ি পথ। পাইনের পাতা শব্দ তুলছে। বাঁয়ে চিত্রময়ী উপত্যকা। ডাইনে আপেলের বাগানে কুলু-রমণীরা ঝুড়ি ভরে আপেল তুলছে। রাস্তার ধারে ধারে ফল ক্রাশ করে রস বিক্রি হচ্ছে গ্লাসে। ট্যুরিস্টরা রস কিনে খাচ্ছে সুন্দরী কুলু-কন্যাদের কাছ থেকে। এখানে-ওখানে ছবির মতো অনেকগুলি বাড়ি। ট্যুরিস্টরা এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে দল বেঁধে। মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চাকাচ্চা, সব বয়সের নর-নারী।

বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে এসে দেখা গেল একঝাঁক যাত্রী যাচ্ছে রোটাংয়ের দিকে। অন্য দল নাগ্‌গরে। কেউ বা যাচ্ছে কুলু শহরের দিকে। আরো নানান জায়গায় যাত্রী নিয়ে ট্যুরিস্ট বাস ছুটছে।

আজ আর সুপর্ণ ছুটোছুটির মধ্যে নেই। সে বিপাশার দিকে এগিয়ে গেল। এদিকে যাত্রীদের আনাগোনা কম। সাধারণত বেলাশেষে বিপাশার ব্রিজের দিকে কিছু যাত্রী বেড়াতে আসে। এখন দর্শনীয় স্থানে যাওয়ার জন্যেই যাত্রীদের যত হুড়োহুড়ি।

ফরেন ট্যুরিস্ট আর বাঙালি ভ্রাম্যমাণ মিলে গভর্নমেন্টের ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শুধু বাঁচিয়ে নয়,সজীব, সচল করে রেখেছে।

সুপর্ণ বনের ভেতর দিয়ে আলোছায়ার আলপনা মাড়াতে মাড়াতে, বিপাশার দূরাগত ধ্বনি শুনতে শুনতে, এক সময় পৌঁছে গেল ব্রিজের কাছাকাছি।

একটি তরুণী ব্রিজ পেরিয়ে ওপারের রাস্তায় নেমে যাচ্ছিল। সম্ভ্রান্ত বাড়ির বলে মন হচ্ছিল। সুথান বা লম্বা পাজামা পরেছে, মাথায় ঢাকা দিয়েছে রঙিন দোপাট্টা। শালের মতো কাজ করা চমৎকার একটি পাট্টু বা কম্বল গায়ে দিয়েছে সে। বুকের কাছে ওই পাট্টুকে আটকেছে পিন দিয়ে। পাট্টুর রঙ গাঢ় লাল। তাতে সাদা আর কালোর কাজ করা।

ঠিক তেমনি সুন্দর ভোরবেলাকার রোদ্দুরের মতো রঙ মেয়েটির। ট্যাসেল বাঁধা বিনুনি কোমরের নিচ অবধি ঝুলছে।

মেয়েটি যখন নিচে নামছিল তখন ব্রিজের এপারে উঠছিল সুপর্ণ। ব্রিজে ওঠার আগেই একটা মসৃণ পাথর পড়ে আছে। মনে হয় সেখানে দর্শকেরা এসে বসে।

সুপর্ণ ব্রিজে উঠতে গিয়ে দেখল, একটা ছোট্টো প্যাকেট পড়ে আছে। সে এগিয়ে গিয়ে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে খুলে দেখল। ভেতরে কাজ-করা দুটো রুপোর পিন। নিশ্চয়ই ওই তরুণী মেয়েটি ওই প্যাকেটটা ফেলে গেছে। কারণ তখনও ওই ব্রিজের কাছে ট্যুরিস্ট সমাগম হয়নি।

সে প্যাকেটটা নিয়ে ছুটল ব্রিজ পেরিয়ে। চিৎকার করে পেছন থেকে ডাক দিল মেয়েটিকে। মেয়েটি ফিরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। সুপর্ণ প্যাকেটটা নিয়ে নাড়তে লাগল।

এগিয়ে এল মেয়েটি। সুপর্ণ বুঝে নিল ওই মেয়েটিই ওই প্যাকেটটা ফেলে গিয়েছিল।

কাছাকাছি আসতেই যার জিনিস তার হাতে তুলে দিল সুপর্ণ।

কোনও শব্দ নয়, কৃতজ্ঞতার চমৎকার একটি ছবি ফুটে উঠল মেয়েটির চোখে-মুখে। সে হঠাৎ দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল। প্রতিনমস্কার জানাল সুপর্ণ।

মেয়েটির কিন্তু জড়তা নেই। সে বলল, কবে এসেছেন? কোথায় উঠেছেন?

সুপর্ণ লগ হাউসের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

সঙ্গীরা সব কোথায়?

সুপর্ণ ঝকঝকে হাসি উপহার দিয়ে বলল, এ যাত্রায় একাই এসেছি।

মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, সবাই কুলু আসেন সপরিবারে অথবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, তাই জানতে চাইছিলাম।

সুপর্ণ বলল, আমি কুলুকে উপভোগ করতে এসেছি। এখানে আমার আনন্দের অংশীদার অন্য কেউ থাকুক, আমি তা চাই না। এই ধরুন, আমার সারাদিন লগ হাউসের ছোট জানালাটি খুলে ভ্যালির

দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করল, বন্ধুরা থাকলে তা হবার নয়, ফ্যামিলি থাকলে তো নয়ই। মেয়েটি বলল, ফ্যামিলি কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে একটা আলাদা চার্ম আছে, নয়কি?

সুপর্ণ মৃদু হাসল। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের মনের গতি। আমি একটু নিজের ভেতর থাকতে ভালবাসি।

মেয়েটি ভারি সরল, সে হাসি ছড়িয়ে বলল, আমি তো বন্ধুদের ছাড়া থাকতেই পারি না। এই তো সিমলায় কনভেন্টে পড়তাম, তখন আমার মানালীর বন্ধুদের জন্যে কান্না পেত। কোনও কারণে তারা সিমলা গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলে সে যে কি আনন্দ হত আমার কী বলব। কথা আর কথা, কথা ফুরোয় না। হাসি হাসি আর হাসি, একদম থামতেই চায় না। মাদার সুপিরিয়র আসার আগে পর্যন্ত চলতেই থাকে।

মেয়েটি একটু থেমে সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলল, আপনি কিন্তু আনম্যারেড।

কি করে বুঝলেন?

আমরা বুঝতে পারি।

তবু?

আপনি ম্যারেড হলে আপনার স্ত্রী আপনাকে এত বড় একটা ট্যুরে একা ছেড়ে দিতেন না।

সে তো ট্যুরের ব্যাপারটা পছন্দ নাও করতে পারে।

অসম্ভব।

কি করে বুঝলেন?

যিনি একা আনন্দ উপভোগ করতে চান তিনি কোনও বেরসিক মহিলাকে বিয়ে করবেন এটা আমি ভাবতে পারি না।

এখন বলুন, আপনার কুঠিটি কোথায়?

যাবেন নাকি? চলুন আমার সঙ্গে। বড়লোকের কুঠি নয় কিন্তু।

হদিসটা দিয়ে দিন, যাব একদিন।

মেয়েটি হেসে বলল, আমার বাড়িতে তিনটি প্রাণী। আমি, আমার মা আর একটি গাই গরু। বিপাশার ধার ঘেঁষে এই যে রাস্তাটা উত্তর দিকে গেছে, তারই গা দিয়ে ডানদিকে প্রথম যে রাস্তাটা বেরিয়েছে, ওরই কোণায় দুটো পাইন গাছ দেখতে পাবেন। পাইন গাছ বাঁয়ে রেখে দু'চার পা এগোলেই একটা আপেল বাগিচা, ওই বাগিচার উত্তর-পূর্ব কোণে একমাত্র দোতলা বাড়িটি আমার আস্তানা। নিচের তলায় ঘোরাল (গোয়াল), সেখানে আমার গাই গরুটি থাকে। ক'দিন হল তার একটা বাচ্চা হয়েছে। আপনি হুট করে ঘরে ঢুকে পড়বেন না যেন। গাইটা আপনাকে তেড়ে আসতে পারে, তো ফোঁস ফোঁস করবেই।

কেন? বাচ্চাটার জন্যে? কেউ বাচ্চাটার কিছু যদি ক্ষতি করে তাই?

ঠিক তাই।

ভয় নেই, আমি পথ থেকেই ডাক দেব।

আপনি আমার নাম জানেন?

কি নাম আপনার?

মাণ্ডবী।

আপনার সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলতে পারি।

বিস্ময়চিহ্ন চোখে মুখে ফুটিয়ে মাণ্ডবী বলল, কী কথা?

আপনি ম্যারেড।

আপনার অনুমান একদম ভুল।

সুপর্ণ বিস্ময়ের ভান করে বলল, সে কি? আপনার স্বামীর নাম ভরত না?

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। সে হো হো করে হাসি ছড়াল।

একটু থেমে বলল, আমার মা-তো কোথাও যেতে পারেন না, পণ্ডিতজি সপ্তাহে দু'দিন আসেন আমাদের বাড়িতে তুলসীদাসজির রামচরিত মানস পড়তে।

কাল ঠিক এমনি সময়ে যদি আপনার কুঠিতে যাই, তা হলে কি আপনি আজকের মতো বাইরে বেরিয়ে যাবেন?

মেয়েটি বলল, অতিথিকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালে কী বাইরে বেরিয়ে যাওয়া যায়?

সুপর্ণ বলল, বেশ কালই তার পরীক্ষা হবে।

মেয়েটি বাড়ির দিকে পা বাড়াল। আবার ফিরে বলল, আমার বাড়ির ডিরেকশন আপনাকে আগেই দিয়েছি, তা সত্ত্বেও যদি ভুল হয় তা হলে কান খাড়া করে থাকবেন।

সুপর্ণ অবাক হয় বলল, কান খাড়া করে থাকব, কেন?

হাম্বা হাম্বা ডাক শুনতে পাবেন। মিনিটে অন্তত দশ বার আমার গাই গরুটি তার বাচ্চাকে ডাকে।

এবার হাসির পালা দুজনের। তারা বিপাশার কলধ্বনির সঙ্গে হাসি ছড়াতে ছড়াতে, হাত নাড়তে নাড়তে দুজনে দু'দিকে চলে গেল।

সুপর্ণ চারদিকে ঘুরে ফিরে একেবারে পথের ধারের রেস্তোরাঁতে লাঞ্চ সেরে লগ হাউসে উঠে গেল। সে আজ আর কোথাও বেরোবে না। তার মন ভরে আছে একটা স্বপ্নে। বাইরে ঘুরে ঘুরে সে স্বপ্নকে সে এখুনি হাওয়ায় ভেসে যেতে দেবে না। নিভৃত নির্জনে সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে। এ যেন এক অদ্ভুত প্রাপ্তি। 'কি ছিল বিধাতার মনে'— কে জানে।

গলায় কখনও গান আসে না সুপর্ণের, সেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে গাইল—

'আমি চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনী
তুমি থাক সিন্ধু পারে
ওগো বিদেশিনী'

একটু ভুল থেকে গেল। এখানে তো সিন্ধু নেই, তা না থাক, শৈল তো আছে। সিন্ধু-টাকে শৈলপারে করে দিলে একদম কথায় সুরে মিল হয়ে যাবে।

সারা বিকেল খোলা জানালা দিয়ে আঁখি-ভ্রমর দুটোকে উড়িয়ে দিয়েছে। এই ছোট্ট দুটো চোখে এত ছবিও ধরে।

একসময় সূর্যের আলোতে মধুর মতো রঙ ধরল। এক স্বাস্থ্যান্বেষী ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের ওপরে উঠছেন, কিন্তু লাগামটা নিজের হাতে ধরা নেই। ঘোড়াওয়ালা লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর আরোহী ভয়ে ঘোড়ার কেশর জাপটে ধরে মুখ থুবড়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছেন।

কয়েকটা বকরি গলায় বাঁধা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পিঠে বোঝা নিয়ে ওম্ পথ ধরে উপত্যকার দিকে নেমে চলে গেল। একটা গদ্দি পহাল মুখে হ্যালা হুঁই হ্যালা হুঁই আওয়াজ তুলে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

তাল তাল কুয়াশা সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নামতে লাগল পাহাড়ের চূড়া থেকে উপত্যকার দিকে। ধীরে ধীরে উপত্যকাটা যেন একটা দুধের সরোবর হয়ে গেল।

এখানে-ওখানে গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিকঝিক করে উঠছে আলোগুলো—সাদা, হলুদ আর লাল।

যৌবনের অদ্ভুত একটা ধর্ম আছে, যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েক ছত্র গানে ধরে দিয়েছেন :

'একটুকু ছোঁযা লাগে,
একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে
রচি মম ফাল্গুনী'

কিন্তু এখনও তো ছোঁয়া লাগেনি। তা হাতে না হোক, মনে তো ছোঁয়া লেগেছে। তবে ফাল্গুনীটা শরতে রচিত হল, এই যা।

বেয়ারাকে দিয়ে রাতের খাবারটা নিচের রেস্তোরাঁ থেকে আনিয়ে নিল সুপর্ণ। জানালাটা আর খোলা রাখা চলে না। ওই ফাঁকা জানালা দিয়ে শীতের হায়েনাটা মাঝে মাঝে লাফিয়ে কামড় দিয়ে যাচ্ছে। জানালা বন্ধ করে, ভারী পর্দাটা টেনে কম্বলের ভেতর ডুবে গেল সুপর্ণ। গোটা তিনেক কম্বল ভেদ করে শীত ঢোকে সাধ্যি কী! একটু পরে নিদ্রা এবং বলা বাহুল্য স্বপ্ন দর্শন। সারারাত স্বপ্নে যা দেখল তার একটি টুকুরোও ভোরবেলা মনে করতে পারল না। তবে মাণ্ডবীর স্বপ্ন দেখলে হয়তো

তার মনে থাকত। বোধহয় যার স্বপ্ন দেখার কথা ছিল, সে স্বপ্নচারিণী তার স্বপ্নে এসে ধরা দেয়নি। মাণ্ডবী অধরা মাধুরী হয়েই থাক।

ভোরবেলা জানালা খুলেই অবাক কাণ্ড। সারারাত ধরে উপত্যকায় জমে সাদা মেঘগুলো প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মতো পাপড়ি মেলে ওপর দিকে উঠছে। পাপড়ির মাথায় মাথায় লেগেছে লাল সূর্যের রঙিন আভা। সূর্যটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার আভাটুকু রক্তপদ্মের রূপ ধরে মনে ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়ে গেল।

নাস্তাও বেয়ারা এনে দিল। হিসেব করে দেখল, এখনও পকেট ভারী আছে বন্ধুদের দৌলতে।

ছোটবেলায় সুপর্ণ একটা কবিতা পড়েছিল।

'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়'

কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সময়! আজ যেন ভোরের আয়োজন ফুরোতেই চাইছে না। একটু বেলা না হলে কী হুট করে কারও বাড়ি যাওয়া যায়! যদি ভেবে বসে আমার এখানে আসার জন্যে শ্রীমান সুপর্ণবাবুর ঘুম হয়নি। না, একটু দেরি করেই যাওয়া যাক।

কালকের সাক্ষাতের সময়টাকে অন্তত একঘণ্টা পেছনে ফেলে সুপর্ণ ব্রিজ পেরিয়ে মাণ্ডবীর বাড়ির দিকে পা চালাল।

মন আগে আগে চলতে চায় কিন্তু সুপর্ণ রাশ টেনে ধরেছে গতির। ধীরে ধীরে পা চালিয়ে সে এসে গেল সেই চিহ্নিত দুটি পাইন গাছের কাছে। ওই তো আপেল বাগান। দুটি মেয়ে গায়ে রোদ মেখে ফল তুলছে। সুপর্ণ বিস্মিত হয়ে দেখল, মেয়ে দুটির ঝুড়ি ভর্তি হয়ে আছে সোনালি আপেলে। সে জানে, সোনালি আপেলের চাষ হয় সাধারণত কুলুতেই। গোল পাকা উৎকৃষ্ট সোনালি নাসপাতির মতো দেখতে।

আরে ওই তো মাণ্ডবী। সুপর্ণ হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল। আমি আমার কথা রেখেছি।

মধুর একটুকরো হাসি মাণ্ডবীর মুখে। সে তার সহকর্মীকে কিছু নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে এল সুপর্ণের দিকে।

আসুন, আমরা মায়ের কাছে যাই।

অ্যাপ্রনের মতো একটা পোশাক পরেছে ও। সম্ভবত ফল তোলার জন্যে এরকম পোশাকই সুবিধেজনক।

মাণ্ডবী সামনে, তাকে অনুসরণ করছে সুপর্ণ।

সুপর্ণ দেখছে, মাণ্ডবীর পদচারণার ভেতরেও একটি ছন্দ আছে।

পেছন থেকে সুপর্ণ হঠাৎ বলে উঠল, আপনি কি নাচতে পারেন মাণ্ডবী?

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল মাণ্ডবী, আপনি কি করে জানলেন? কে আপনাকে বলেছে?

আপনার পায়ের ছন্দই আমাকে সে খবর দিয়েছে।

আপনি নাচতে পারেন?

এ প্রশ্ন কেন?

নাচিয়ে ছাড়া নাচিয়েকে চিনতে পারে কে?

সুপর্ণ বলল, না না তা নয়। অনেক নাচ দেখেছি, তাই নাচিয়েদের পায়ের ছন্দ চিনি।

উঠোনের কাছে একটা আপেল গাছের তলায় দাড়িয়ে দুজনের কথা হচ্ছিল।

মাণ্ডবী বলল, আপনি দশেরায় কুলুতে যাবেন?

যাবার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু ওখানে তো হোটেল পাওয়া যাবে না।

মাণ্ডবী বলল, ভাবনাটা না হয় আমিই ভাবব, যাওয়ার ব্যাপারটা আপনি নিশ্চিত করুন।

সুপর্ণ বলল, বাজারের ভেতর দিয়ে আসার সময় যাত্রীদের মুখে শুনেছি রাতের অনুষ্ঠানের সব টিকিটই নাকি বিক্রি হয়ে গেছে।

আগে বলুন, রাতে জেগে নাচ দেখার ইচ্ছে আছে কি?

কেন? আপনি নাচ দেখার ব্যবস্থা করে দেবেন?

দুষ্টুমির হাসি হেসে মাগুবী সুপর্ণের সামনে চাঁপার কলির মতো হাতটি পেতে ধরে বলল, এর জন্যে কিছু বেশি দাম দিতে হবে যে সুপর্ণবাবু।

রাজী, সারারাত ধরেকি নাচ চলবে?

মাগুবী বলল, প্রায় রাত একটা পর্যন্ত।

তারপর? আশ্রয় ছাড়া শীতে শেষ রাতে যে জমে পাথর হয়ে যাব।

নাচ যে দেখাবে সেইই দর্শকের নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা করবে। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?

সুপর্ণ বলল, আমি আগেভাগেই আত্মসমর্পণ করছি। আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, আপনি যেন বিশল্যকরণী এনে আমাকে ছুঁইয়ে দিলেন।

বাঃ! আপনি তো বেশ লোক। কে বিশল্যকরণী বয়ে এনেছিল আপনি জানেন?

সুপর্ণ হো হো করে হেসে উঠে বলল, আমি ওই উপমাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

চলুন, মায়ের কাছে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে হাম্বাধ্বনি উঠল। ধবধবে সাদা বাছুরটা চার পা ছড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, তাই মায়ের জোর তলব।

নিচের তলাটা ছায়া ছায়া। ঢোকার সময় ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল সুপর্ণ। হঠাৎ কোনদিক থেকে আক্রান্ত হয় সেই ভয়ে থেমে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে অসংকোচে সুপর্ণের একটা হাত ধরল মাগুবী, চলে আসুন কোনও ভয় নেই। এ মেঘ যত গর্জায়, তত বর্ষায় না।

একটি তরুণী তার হাত ধরেছে, সত্য বলতে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল সুপর্ণ। কিন্তু যে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে তার কোনও বিকার নেই।

ওপরে গিয়েই হাত ছেড়ে দিল মাগুবী। সামনের ঘরটাই তার মায়ের।

বাইরে থেকে কনভেন্টে পড়া মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল, মা, সুপর্ণ এসেছেন।

এক মহিলার ক্লান্ত গলা শোনা গেল, নিয়ে এস ভেতরে।

সুপর্ণকে নিয়ে মাগুবী ভেতরে ঢুকল।

ঘরখানা প্রশস্ত। একদিকে পরিচ্ছন্ন বেডকভার পাতা একটা তক্তপোশের ওপর আধশোয়া অবস্থায় বালিশে ভর দিয়ে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা। সাদা পোশাকে তাঁকে ভারি পবিত্র আর সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছে।

একটা কুর্শি দেখিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, বোসো বাবা। মাগুবীর কাছে তোমার কথা শুনেছি।

তোমার বাড়িটি কোথায়?

ক্যালকাটা-র নাম শুনেছেন? বেশ বড় শহর।

উনি মৃদু হেসে বললেন, আমার ঠাকুরদাদা ক্যালকাটার এক সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন। তাঁর মুখে দুর্গাপুজোর বিপুল সমারোহের কথা শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, দিল্লির আগে এই ক্যালকাটাই ছিল ভারতের রাজধানী।

সুপর্ণ অবাক হল। ঠিক এ জায়গায় এমন এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মহিলার দেখা পাওয়া যাবে সে ভাবতে পারেনি।

সুপর্ণ বলল, আমার প্রভিন্স সম্বন্ধে দেখছি আপনি অনেক কিছুই জানেন।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, আর এও জানি আমার ঠাকুরদার আমলের বাংলা এখন পুব-পশ্চিম দু-ভাগ হয়ে গেছে। একটার নাম হয়েছে বাংলাদেশ, অন্যটি ওয়েস্ট বেঙ্গল।

সুপর্ণ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে বলল, আপনি নিশ্চয়ই কোনও ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করতেন।

ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে বললেন, আমি সিমলায় থেকে কনভেন্টে পড়েছি। বাবা ওখানেই কাজ কবতেন। তা ছাড়া মাগুবী ছোটবেলা থেকেই আমার কাছে পড়েছে। পড়ার, জানার কি শেষ আছে বাবা!

আমার ছোট্ট একটি কৌতূহলের জবাব দেবেন আপনি? অবশ্য কিছু যদি মনে না করেন।

না, না, মনে করব কেন, তুমি মনে কোনওরকম দ্বিধা না রেখেই বল।

সুপর্ণ জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এই ঘরের ভেতরেই থাকেন? বাইরে বেরোন না?

ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল ভদ্রমহিলার মুখে। উনি বললেন, একটা পা আমার চিরদিনের মতো জখম হয়ে গেছে বাবা। তাই বাইরে বড় একটা বেরোই না।

জখম হয়ে গেছে, কিন্তু কেন?

একটা ম্লান ছায়া ঘনিয়ে উঠল ভদ্রমহিলার মুখে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বললেন, আমি চিরদিনই খানিকটা নির্ভীক প্রভৃতির মেয়ে। তিন-চারবছর আগে আমি আর আমার স্বামী একদল গাদ্দির সঙ্গে লাহুলে চলে যাই। ওদের জীবনযাত্রা আমাদের কাছে বড় আকর্ষণীয় ছিল।

বসন্তকাল শুরু হলেই ওরা ভ্যালি থেকে পাহাড়ের অনেক ওপরে ওদের ভেড়া, বকরি নিয়ে উঠে যায়। বারো-চোদ্দ হাজার ফিট ওপরে নীরুঘাসের কাণ্ডা বা সবুজ তৃণভূমি আছে। সেখানে বরফগলা জলে ঘাসগুলো পুষ্ট হয়। ভেড়া, বকরিগুলো প্রাণভরে ওই ঘাস খায়। প্রচণ্ড শীতের শুরুতেই গাদ্দিরা ওপরের পাহাড় থেকে ওদের পশুগুলোকে নিয়ে নেমে আসতে থাকে।

মাণ্ডবী সিমলা কনভেন্টে রয়েছে। আমি আর ওর বাবা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গেলাম একটা পরিচিত গাদ্দি ফ্যামিলির সঙ্গে লাহুলের দিকে।

ওদের সঙ্গে খুবই এনজয় করেছি আমরা। ওরা সত্যিই জীবনটাকে ভোগ করতে জানে। কখনো পাহাড়ের গুহায়, কখনো বা কতকগুলো পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে ওরা সাময়িক ডেরা বাঁধে। ট্রি-লাইনের ওপরের কথাই আমি বলছি। ওখানে ওরা মক্কির রুটি পাকায়, ভেড়ার দুধে চুবিয়ে খায়। সবজি বলতে আলু তাও কালেভদ্রে। ওরা রুবাণা আর বাঁশুরি বাজিয়ে জ্যোৎস্না রাতে গান করে আর নাচে। সেসব আমাদের কাছে ছিল বাবা স্মরণীয় মুহূর্ত।

আমার স্বামীর সঙ্গে আমি গেলেও গাদ্দি মেয়েরা সাধারণত এত ওপরের পাহাড়ে যায় না। স্প্রিং মাইগ্রেশনে ওরা যখন উপত্যকায় ওদের পশুপাল নিয়ে ঘোরে তখন ফ্যামিলি থাকে ওদের সঙ্গে।

আমরা যেবার লাহুলে যাই, তখন আমাদের সঙ্গে একটি গাদ্দি মেয়েও ছিল। সে তার স্বামীর সঙ্গে ওপরের পাহাড়েও উঠেছিল। ওরা স্বামী-স্ত্রী প্রতিবছর কুলুতে যখন নেমে আসত, তখন আমাদের বাড়িতে দেখা করে যেত। ওদের মুখে পথের বর্ণনা শুনে আমরা লাহুলে যাওয়ার পরিকল্পনা করি। ঝুমনি দারুণ গান করত, সবকটাই দুঃখের গান। গাদ্দিরা কাংড়ার যে অঞ্চলে বাস করে তাকে বলে গাদেরান। ওই গাদেরানের সব মেয়েই দুঃখের গান করে। কারণ, স্বামীরা গ্রীষ্মের চারণে সংসার ছেড়ে তিন-চার মাসের মতো ওপরের পাহাড়ে চলে যায়। তখন যত দুঃখ ঘনিয়ে ওঠে গাদ্দি মেয়েদের বুকের মধ্যে। তারা গান করে :

'নদী রে কটলা মনরো তত্রু চীযে—
জীনা রে রুষো সজনো
তীনে গি জীব্না বোলো কিসে।'

নদীর ধারে থেকেও তিতির পাখি পিপাসায় কাতর হয়ে থাকে। বল, একজন নারী তার প্রিয়তমের কাছ থেকে এতদূরে থাকলে তার অবস্থাটা কীরকম হয়!

কাতর স্ত্রী তার স্বামীকে পরামর্শ দিয়ে বলছে :

'ক্ষেতিয়া কানক কুপাহ
মেঁ কাত্তন তু খা
পরদেশ ন যা
পরদেশন্ দি মম্লে জি তোলা মন্দরে।'

ক্ষেতিতে গম আর তুলো ফলবে। আমি তোমার খানা বানিয়ে দেব, কাপড় বুনে দেব। ওগো আমার মনের মানুষ, তুমি পরদেশে যেও না, যেও না, যেও না।

সুপর্ণ বলল, আপনি এতসব জানলেন কী করে? তা ছাড়া এত সুন্দর সুর করে গাইলেন, ফোক সঙ-এর সুর, একেবারে প্রাণে এসে লাগে।

আরও অজস্র গান রয়েছে বাবা।

একদিন এসে আমার ছোট্ট টেপরেকর্ডারে আমি আপনার গানগুলো তুলে নিয়ে যাব। সত্যি কী দারুণ সুর! এবার মাগুবীর দিকে ফিরে বলল, আপনি গাইতে পারেন?

মাগুবী হেসে বলল, এত কথা একসঙ্গে বলে দিলে সব কথাই তো ফুরিয়ে যাবে।

সুপর্ণ বলল, তা হলে আপনার মা-র মুখ থেকেই শোনা যাক লাহুল বিপর্যয়ের কাহিনী।

মাগুবীর মা রুক্মিণীদেবী বললেন, কি শুনবে বাবা সেই বিপর্যয়ের কাহিনী! খুব আনন্দে কাটিয়েছিলাম আমরা। দুমসারামের বউ ঝুমনি শুধু গান নয়, খুব ভাল নাচতেও পারত। প্রতিটি জ্যোৎস্না রাত ওরা দুজনে নেচে-গেয়ে মাত করে দিত। আমার স্বামী মাঝে-মাঝে ওদের নাচে যোগ দিত, আমি বাদ যেতাম না।

যখন খুব শীত পড়ত, তখন লোমওয়ালা ভেড়াগুলোকে কাছে টেনে নিয়ে তাদের লোমের ভেতর ঢুকে পড়তাম।

একদিন আনন্দের শেষ হল, এবার নিচে নামার পালা। বরফ পড়ে চলার পথ ভারি পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। পা টিপে টিপে আমরা নামছিলাম। বাঁ দিকে একটা খাদ, সেই খাদেই অ্যাকসিডেন্টটা ঘটল। দোষটা আমার, দুমসারাম আর ঝুমনি ভেড়ার পাল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমি তাদের পেছনে পা টিপে টিপে নামছি, মাগুবীর বাবা আমার পেছনে। আমি স্লিপ করে খানিকটা নিচে আছাড় খেয়ে পড়লাম। ঝুমনি চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পতন। পেছন থেকে আমাকে তুলতে আসছিল মাগুবীর বাবা। কিন্তু উত্তেজনায় সে ছিটকে পড়ল পাশের খাদের মধ্যে।

আমি তখন নিজের পায়ের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি। অনেকখানি বরফের ফাটলে ঢুকে গেছে পা। ওরা স্বামী-স্ত্রী আমাকে ওই ফাটল থেকে টেনে তুলল।

ঠিক তার পরেই হুঁশ হলো দুমসারামের। বাবুসাহেব কোথায়!

খোঁজ খোঁজ। অনেক খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত মাগুবীর বাবার শরীরটাকে ওরা খাদের ভেতর আবিষ্কার করল।

তুমি নিশ্চয়ই গাদ্দিদের কোমরের অনেকটা অংশ জুড়ে ছাগল-লোমে পাকানো কাছির মতো মোটা বিশ-ত্রিশ ফুট দড়ি দেখেছ। খাদে কোনও ভেড়া পড়ে গেলে ওরা পাথরের সঙ্গে ওই দড়ির একপ্রান্ত বেঁধে বাকি দড়িটার সাহায্যে নিচে নেমে যায়।

এবার ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনের দড়ি জুড়ে আরও মোটা করে খাদের নিচে ঝুলিয়ে দিল। তারপর সেই দড়ি ধরে নিচে নামল দুমসারাম। এবং অবিশ্বাস্য ক্ষমতায় সে মাগুবীর বাবাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে দড়ি ধরে ওপরে উঠে এল। রক্তাক্ত দেহ কিন্তু তখনও প্রাণ ছিল। আমি ঝুমনির কাঁধে ভর দিয়ে নিচে নামতে লাগলাম আর দুমসারাম কাঁধে বয়ে নিয়ে চলল মাগুবীর বাবাকে।

কী কষ্টে যে আমরা এসে পৌঁছলাম রোটাং-এ তা আর কী বলব। ওখানে তখন যাত্রীরা সবে এসেছে। আমরা অনুরোধ করায় একটা গাড়ি আমাদের মানালীতে পৌঁছে দিয়ে গেল। সার্জেনের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

স্বামীর মৃত্যু এবং আমার নিজের যন্ত্রণা এ দুয়ে মিলে সৃষ্টি হয়েছিল এক অসহনীয় অবস্থার।

মাসখানেক পরে ভাঙা পা নিয়েই আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। সেই থেকে সে বোঝা আজও টেনে নিয়ে চলেছি বাবা। শুধু তাই নয়, মেয়েটাকেও অফুরন্ত কষ্টের মধ্যে আমি ফেলে দিয়েছি।

মাগুবী বলে উঠল, ও কথা কেন বলছ মা? তোমাকে নিয়ে তো আমার কোনও কষ্ট নেই। জানকিদিদি তো তোমার সব কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে, আমি শুধু তোমার কাছে বসে বসে কথা বলে যাই। সুপর্ণ, মা প্রায়ই আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখের জল ফেলে। মা কি চায় আমি তাকে ফেলে কোথাও চলে যাই!

মাগুবীর মা বলে উঠলেন, ও সব কথা থাক। তোর বন্ধুকে কিছু খেতে দে।

সুপর্ণ বলল, আমি নাস্তা করে এসেছি মা।

তা হোক, আমার বাড়িতে এসেছ, শুধুমুখে চলে যাবে! ঠিক আছে, তোমাকে আর নাস্তা করতে হবে না, একেবারে দুপুরের খাওয়া সেরে হোটেলে ফিরবে।

মাগুবী হঠাৎ বলল, মা কাল দশেরা। আমাকে দু'দিনের মতো ছুটি দিতে হবে। কাল-পরশু জানকিদিদি থাকবে তোমার কাছে। আমি মনের খুশিতে মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াব।

হঠাৎ মাণ্ডবীর মা বললেন, সুপর্ণ, তুমিও ওর সঙ্গে কুলুর মেলা ঘুরে এসো না, অনেক দেখার জিনিস আছে। মাণ্ডবী, তুই ওর থাকার একটা ভাল ব্যবস্থা করে দিস। আমার জন্যে ভাবিস না, আমি জান্‌কি-কে দিয়ে দুটো দিন চালিয়ে নেব।

একটা জিপের ব্যবস্থা করে রেখেছিল মাণ্ডবী, সেই জিপে মাণ্ডবীর সঙ্গে দশেরা উৎসবে যোগ দিতে বেরিয়ে গিয়েছিল সুপর্ণ।

লোকে লোকারণ্য ঢোল ময়দান। একটা উঁচু পাহাড়ি জায়গা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে বিপাশার কূল অবধি। ওই ময়দানেই উৎসবের শুরু। একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে একটা গোলাকৃতি রথ। তার মাথায় চক্রাকার চন্দ্রাতপ। পুরোহিতরা সেখানে জমায়েত হয়েছে দেববিগ্রহ ঘিরে। হঠাৎ নানারকম বাদ্যধ্বনি শোনা গেল। বিভিন্ন পাহাড়ী গায়ের রাস্তা দিয়ে দলে দলে পাহাড়িরা মিছিল করে আসছিল। বিভিন্ন টিকা বা গ্রামের দেবতাদের গ্রামবাসীরা বাদ্যধ্বনিসহ মিছিল করে নিয়ে আসছে ঢোল ময়দানে। প্রধানত পেতলের তৈরি নরসিং দেবতা। বাদ্যে, কলরবে, জনতার মিছিলে প্রায় দু'ঘণ্টার ভেতর জায়গাটা পূর্ণ হয়ে গেল। এবার ওই রথের একটু দূরে এসে দাঁড়ালেন কুলুর রাজা ও তাঁর দুই ভাই। অত্যন্ত সুদর্শন। বিশেষ করে কনিষ্ঠ বাজকুমারটি। পুরনো দিনের ঝলমলে পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে তিন ভাই। সুপর্ণের এখনও মনে আছে, সে ছোট রাজকুমারের মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি। বছর পনেরো-ষোল বয়সের তরুণ কিশোর। চোখেমুখে সরলতা আর সৌন্দর্য উপচে পড়ছে।

সমস্ত গ্রাম্যদেবতা মিলিত হওয়ারপর রঘুনাথজির রথটি টানা হল। টানলেন তিন রাজকুমার। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে অগণিত মানুষ। সুপর্ণও হাত লাগাল। জিপটা একটা গাছের তলায় রাখা হয়েছিল। সুপর্ণ সেদিকে তাকিয়ে দেখে জিপের ওপর এক ঝাঁক ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। দাঁড়াক ক্ষতি নেই, কিন্তু নাচলেই বিপদ। তরুণী কন্যাটি কোথায় গেল! তার যে পাত্তাই নেই।

জনতা হুড়োহুড়ি করে রথ টানতে টানতে একেবারে নিয়ে গেল বিপাশার কূলে। সুপর্ণ জনারণ্যে যাকে খুঁজছিল এবং এতক্ষণ দেখতে না পেয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল, সে কিন্তু কখন পেছন থেকে এসে তার হাতখানা জড়িয়ে ধরল।

কি ব্যাপার? কোথায় ছিলেন?

মাণ্ডবী হাত ধরে টানতে টানতে বলল, চলে আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

গেলেই দেখতে পাবেন।

অতএব সুপর্ণ চলল মাণ্ডবীর হাতের টানে। একটু দূরে বিপাশার কূল জুড়ে পাইন গাছগুলোর তলায় তলায় অজস্র ছোট-বড় তাঁবু পড়েছে।

একটা বড়-সড় তাঁবুর ভেতর মাণ্ডবীর সঙ্গে ঢুকে পড়ল সুপর্ণ। তাঁবুতে ঢুকেই কিন্তু হাত ছেড়ে দিয়েছে মাণ্ডবী।

মা, কোথায় তুমি?

এক অতি সম্ভ্রান্ত ষাট উর্ধ্বের মহিলা ধবধবে সাদা পোশাক পরে বেরিয়ে এলেন সোনালি ঝালর দেওয়া ব্রোকেডের পর্দা সরিয়ে।

কিরে মাণ্ডবী, মা কেমন আছে?

যেমন থাকার কথা, তার চেয়ে ভাল।

ওই তোর এক উত্তর। সঙ্গে এটি কে?

আমার বন্ধু।

সুপর্ণ গিয়ে প্রণাম করল। ভদ্রমহিলা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

কি নাম তোমার বাবা? তুমি নিশ্চয়ই বাঙালি?

আমি সুপর্ণ। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে আমি বাঙালি?

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, আমাদের রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাঙালি পুরোহিতই দেবপূজা করে থাকেন। আমি তাঁর কাছে বৈষ্ণব— ধর্মে দীক্ষিত।

সত্যিই তো, উনি বাঙালি বিধবাদের মতোই ধবধবে সাদা শাড়ি পরেছেন। গলায় সোনাব সরু চেনের সঙ্গে তুলসীর মালা।

মাণ্ডবী বলল, আপনি যে তিনজন রাজপুরুষকে দেখলেন ময়দানে রথ টানতে, ইনি তাঁদের মা। আমার রাজমাতা, বলেই ছোট বালিকা কন্যাটির মতো জড়িয়ে ধরল কুলুর রাজমাতাকে।

পাগলী ছাড় ছাড়, সুপর্ণ কি ভাববে?

আমি কিছু ভাবছি না মা, ওকে আপনি কতখানি ভালবাসেন তাই দেখছি।

রাজমাতা বললেন, এর মায়ের সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ। ওর মা আমার মেজ আর ছোট ছেলের টিউটর ছিল। এত চমৎকার মনের মানুষ কম দেখেছি। বেচারার পরিবারে এত বড় একটা অঘটন ঘটে গেল, রঘুনাথজির কি ইচ্ছা কে জানে।

মাণ্ডবীর দিকে ফিরে বললেন, তোমরা আজ রাতে আমার এখানে খেও।

মাণ্ডবী বলল, আজ রাতে হবে না মা। এরপর অনুচ্চে কতকগুলো কথা বলল রাজমাতাকে যা সুপর্ণ শুনতে পেল না।

এবার কিন্তু মাণ্ডবীর গলা শোনা গেল। তুমি আমার জন্যে একটা কাজ করে দাও মা। নাগ্‌গরে যে সরকারী হোটেলটা রয়েছে তাতে কাল একটা রুম বুক করে রাখতে হবে, তুমি এখান থেকে ফোনে ম্যানেজারকে বলে ব্যবস্থাটা করে রাখ।

ঠিক আছে, ওর জন্যে ভাবিস না, কাল গেলেই পেয়ে যাবি।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসার সময় উনি ওদের অনেক প্রসাদ খাওয়ালেন, যাতে আর রাতের খাবার খেতে না হয়।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে সুপর্ণ বলল, এখন আমরা কোথায় যাব?

মাণ্ডবী বলল, আপনার বেড়াবার প্ল্যানটা তো আমি করেছি, সুতরাং আমার সঙ্গে চলে আসুন।

ওরে ব্বাস! মস্ত বড় মেলা। সারি সারি স্টল। মেয়ে-পুরুষের ভিড় উপচে পড়ছে। সেই মেলায় ওরা দুজনে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাথায় ঘোমটার মতো পরার জন্যে কত রঙের ঘুন্‌ডি দোকানের সামনে পতাকার মতো পত পত করে উড়ছে। পুরুষরা এক একটা ঘুন্‌ডি কিনে দিচ্ছে তাদের সঙ্গিনীদের। কেউবা কিনছে কাচের চুড়ি, কেউ কিনছে টিপ, ফিতে। তাতেই যেন আনন্দ সোহাগ উপচে পড়ছে।

একটা দোকানের সামনে মাণ্ডবী নিয়ে গেল সুপর্ণকে। কুলুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভরা বেশ দামী দামী লেডিস আর জেন্টস্ শাল বিক্রি হচ্ছিল।

মাণ্ডবী সুপর্ণের দিকে ফিরে বলল, আমার এক বন্ধুকে দিতে হবে, আপনি একটা শাল পছন্দ করে দিন তো।

সাদা একটা শালের দু'পাশে চমৎকার ব্রাউনের কাজ। ফুল বা নকশা তোলা নয়, অদ্ভুত রকমের জ্যামিতিক ডিজাইন।

সুপর্ণ বলল, আমার চোখে এই শালটাই সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

বেশ চড়া দাম দিয়ে মাণ্ডবী শালটা কিনল। সামনে কতকগুলো বিশেষ ডিজাইনের কুলুর টুপি ঝুলে আছে। তারই একটা দামী উলেন টুপিও কেনা হল।

মাণ্ডবী বলল, আপনার ঝোলা ব্যাগের ভেতর এগুলো রেখে দিন, পরে আমি নিয়ে নেব।

এবার ওরা দুজনে দৌড়ে চলে গেল ওপেন এয়ার স্টেজের কাছে। বিপাশার দিকে প্রচুর গাছপালার ভেতর নানারকম রঙিন বাল্‌ব দিয়ে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন ডাল থেকে ঝুলছে নানারঙের উত্তরীয়। সেগুলি দোল খাচ্ছে মৃদু মৃদু হাওয়ায়। অডিটোরিয়ামের চারদিক ক্যানভাস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এখানে টিকিট বিক্রি করে শো দেখানো হবে সারারাত। সমস্ত কুলু উপত্যকার নাচ-গানের শ্রেষ্ঠ দলগুলি আসবে দশেরা উৎসবে এই স্টেজে নাচতে।

মাণ্ডবী সুপর্ণের হাতে একটা টিকিট ধবিয়ে দিয়ে বলল, সামনের রো-তে আপনার সিট। পাশের সিটটি আমি যতক্ষণ না যাব ততক্ষণ খালি থাকবে। আপনি সোজা ঢুকে পড়ুন। এখুনি শো শুরু হবে। আমার বাইরের কয়েকটা কাজ আছে। কাজ সেরে ভেতরে যেতে একটু দেরি হবে আমার।

তাড়াহুড়োর ভেতরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না সুপর্ণের কাছে। সে চেকারের কাছে টিকিটটা দেখিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ফার্স্টরো-র একেবারে মাঝের সিট।। এ সিট কি করে ম্যানেজ করল মাণ্ডবী!

একটু পরেই সকলে উঠে দাঁড়াল, দেখাদেখি সুপর্ণও।

গভর্নর সাহেব এসেছেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে।

স্টেজে ততক্ষণে এসে গেছেন তিনি। কুলুর সীমাহীন সৌন্দর্যলোকের ভেতরে সংস্কৃতির ধারা যে বিপাশার স্রোতের মতো বয়ে চলেছে সেইসব কথা অন্তত পাঁচ মিনিট কাব্যময় ভাষায় বলে গেলেন।

গভর্নর সাহেব চলে যাবার পর ঘন ঘন হাততালি পড়ল। তিনি নেমে এসে কিন্তু বসলেন ওই ফার্স্ট রো-এর বিশেষ একটি চেয়ারে।

একটু পরেই শুরু হল নাচ। প্রতিটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে এসেছে তাদের নাচ, গান আর যন্ত্রসঙ্গীতের দল। শুধু পুরুষ নয়, শুধু মেয়ে নয়, সম্মিলিত মেয়েপুরুষের নাচ। সুন্দর নারী-পুরুষ বাহারি পোশাকে সেজে বিচিত্র রকম লোকনৃত্য নেচে নেচে যাচ্ছ। কখনও বা বিলম্বিত লয়ে ভাব প্রকাশ করছে, কখনও দ্রুত লয়ে ঘূর্ণি তুলে নেচে চলেছে।

দু'তিনটি দলের নাচ হয়ে যাওয়ার পর এল নতুন একটি দল। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই পরেছে সাদা পোশাক। মেয়েরা কোমরে জড়িয়েছে গাচ্ছং। নাভি থেকে দুটো সোনালি ট্যাসেল ঝুলছে। লাল রঙের ঘুন্‌ডি মাথায় বাঁধা। হলুদ দোপাট্টার দু'প্রান্ত ধরে নাচের ছন্দে উড়িয়ে চলেছে। ছেলেরা কোমরে বেঁধেছে সাদা পোশাকের ওপরে কালো গাচ্ছং। মাথায় বাঁধা লালা-পাগড়ি পিঠ অবধি ঝুলেছে।

চক্রাকারে নাচ চলেছে। ধীর থেকে দ্রুত লয়ে। মধ্যমণি এক নারী, তাকে ঘিরে অন্য নারীরা তৈরি করেছে একটি বলয়। আর সবার বাইরে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচছে পুরুষেরা। কখনও ভেতরের নাচ দ্রুত হচ্ছে, কখনও বাইরের।

দূর থেকে মনে হচ্ছে একটা রক্তিম ভোরের আভা লাগা শ্বেতপদ্ম একবার পাপড়ি খুলছে, একবার বন্ধ করছে। পুষ্পের কোরকে যে মেয়েটি মধ্যমণি হয়ে নাচছে সে যেন বড় চেনা, বড় আপনজন বলে মনে হল সুপর্ণের। সে-ই যেন নাচের মুদ্রায় পরিচালিত করছে সমস্ত দলটিকে।

ওই তো সেই কালো তিল। সমস্ত প্রসাধন ভেদ করে বাঁ দিকের গালে ফুটে উঠেছে সেই তিলটি।

তিলে নাকি সৌন্দর্যের প্রকাশ থাকে। বিশেষ করে বাম গণ্ডে অথবা বাম নাসিকার পাতায় ওষ্ঠের তিলও রমণীয়।

সুপর্ণ বড় কাছ থেকে দেখছে এই তিলটি। একবারে ছোট নয়, আকারে কিছুটা বড়। মাগুবী সুন্দরী, কিন্তু একটি তিল তার সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সব থেকে বেশি হাততালি পেল এই গ্রুপটির নাচ। অভিভূত সুপর্ণ নিজেও খুব জোরে করতালির ধ্বনি তুলল। ওরা যখন চক্রাকারে প্রবল বেগে ঘুরছিল তখন গানের দলেও যেন মাতন লেগে গিয়েছিল। যন্ত্রসঙ্গীতে, কণ্ঠসঙ্গীতে, নৃত্যে সেটি ছিল কুলুর একটি শ্রেষ্ঠ নিবেদন।

সুপর্ণ মনে মনে একটু হাসল। দুষ্টুমি করে মাগুবী তার অংশগ্রহণের কথাটা উহ্য রেখেছিল। সে কথাটাই বুঝি ফিসফিস করে বলেছিল রাজমাতার কানে কানে। অথবা অন্যকিছু।

অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে শুকতারাটি জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠল আকাশে। পাশে বসা মাগুবী বলল, চলুন, ভোরবেলাতেই পালাই নাগ্‌গরে।

এখানে কোনও উৎসব নেই। পাহাড়ের ওপরে শিল্পী রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারী। এ এক স্বপ্নের দেশ। আর্ট গ্যালারীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটো লম্বা ফার গাছ। সেখানে মসৃণ একটি পাথরের বেঞ্চ। তারই পাশে পড়ে আছে অর্ধসমাপ্ত দুটি মূর্তি।

ফার গাছের কাছে দাঁড়ালে একটি স্বপ্নময় উপত্যকা চোখের সামনে ছবির মতো ফুটে ওঠে। সামনে পাশাপাশি দুটি নীলাভ পাহাড়। তারই মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে পীরপাঞ্জালের ধবধবে সাদা চূড়াটি। নিচে সবুজ, হলুদ ক্ষেত উপত্যকা জুড়ে। দূরে কাছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে হালকা নীল ওড়নার মতো কুয়াশা উড়ছে। উপত্যকার বুক চিরে এখানে সাদা ফিতের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে বিপাশা। ডানদিকের পাহাড়ে পাইন আর ফারের জঙ্গল। এটি নিকোলাস রোয়োরিখের এস্টেট।

মাগুবী সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল সুপর্ণকে।

কোনও কাজ নেই। সারাদিন শুধু পায়ে পায়ে বিপাশার কূলে ঘুরে বেড়ানো। হাতে হাত রাখা, 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব'। এসব সময়ে কথা না বললেই বুঝি অনেক কথা বলা হয়।

বরফের পাহাড়ে শীত পড়ছে তাই এক ঝাঁক সুখী দোয়েল মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। যেখানে উত্তাপ আছে, নিবিড় উত্তাপ।

ওরা বিপাশার নুড়ির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল, জলে পা ডোবাল, সবুজ ঘাসের ওপর বসে রইল হাতে হাত দিয়ে।

রাত নামল। শীত সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল আশ্রয়ের দিকে। ওখানে রেস্ট হাউস সেদিন ম্যানেজার, বেয়ারা আর দু'একজন কুক ছাড়া জনমানবশূন্য। রাজমাতার দৌলতে তারা চমৎকার একটি রুম পেয়ে গিয়েছিল। ওদের রাতটা ছিল স্বপ্নে রঙিন? কারও চোখে ঘুম নামেনি। নীরবতা যে এত তীব্র হয়, অনুভূতি যে এত গভীর হয় তা সেরাতে প্রথম আস্বাদন করল দুজনে।

দেহের একান্ত কাছাকাছি থেকেও কেউ সংযমের সীমা লঙ্ঘন করতে পারল না। তাদের চাওয়া এমন একটা সৌন্দর্যের স্তরে উঠেছিল যেটাকে দেহস্পর্শে আবিল করতে পারল না দুজনের কেউ।

শেষ রাতে সুপর্ণের হাতের আঙুলগুলো মুখে ঢাকা দিয়ে মাণ্ডবী বলেছিল, আমাদের দেখা না হলে বুঝি ভাল হত।

সুর্পণের হাতে লেগেছিল মাণ্ডবীর চোখের জল। সে বলল, একথা কেন মাণ্ডবী? আমরা দুজন দুজনকেই চাই।

মাকে ফেলে আমি তো কোথাও যেতে পারব না সুপর্ণ। আমার সমস্ত হৃদয় পড়ে রইল তোমার কাছে। কিন্তু এ দেহটা বুঝি তোমাকে সমর্পণ করতে পারলাম না।

সুপর্ণ বলল, সব দিকে যদি শূন্যতা নেমে আসে তা হলে আমার দাঁড়াবার যে কোনও ঠাঁই থাকে না মাণ্ডবী।

আবার বলি সুপর্ণ, আমি এই পঙ্গু মাকে ফেলে কোথাও যেতে পারব না। এটাই আমার জীবনের আশীর্বাদ বল আর অভিশাপই বল। আমি অন্তর থেকে বলছি সুপর্ণ তুমি দেশে চলে গিয়ে সংসারী হও। দু'দিনের নিবিড় আনন্দের মুহূর্তগুলোকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর।

তুমি ভুলতে পারবে মাণ্ডবী?

আমি কোনওদিনই সংসারী হব না সুপর্ণ। তাই এই খণ্ড স্মৃতিটুকু আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

সিমলায় সুপর্ণকে ছোট রেলগাড়িতে তুলে দিতে এসেছিল মাণ্ডবী। সে পতাকার মতো হাত নেড়েছিল। চোখে চিকচিক করছিল জলের ধারা। মুখে একটুকরো হাসি।

মনে মনে বলেছিল সুপর্ণ, সংসার না করার শক্তি যদি তোমার থাকে, তা হলে আমিও সারাজীবন সংসারধর্মের বাইরে থেকে যাব। দুজনে ভাবব দুজনের কথা। এর ভেতর দিয়েই তো আমাদের বেঁচে থাকা।

সেই শক্তি সুপর্ণকে সংসার বাঁধতে দেয়নি। সে মাণ্ডবীর কাছেই শিখেছিল, অক্ষম, অসহায়দের সেবা করার মন্ত্র। এই মন্ত্রই ছিল তার জীবনের ব্রত।

গঙ্গার প্রবাহে দিনান্তের রঙ ধুয়ে ধুয়ে মুছে গেল। জীবনের শিল্পী আকাশের গায়ে মেলে ধরল আর এক দৃশ্যপট। রাতের ময়ূর সারা গগন জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে নক্ষত্রখচিত অপরূপ কলাপ।

উঠে দাঁড়াল কর্ম থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত এক মানুষ। তার মনে হল, জীবন থেকে কখনও কিছু হারিয়ে যায় না, মুছে যায় না, নতুন রূপ নিয়ে সে ধরা দেয়, জেগে ওঠে। কবি তাকে ডাক দিয়ে বলেন, 'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।'

সুপর্ণের সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠল। যাকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে ফেলে রেখে এসেছে শিশিরভেজা এক স্বপ্নময় জগতে, তাকে নতুন করে চিনতে, নতুন রূপে দেখতে বড় ইচ্ছে করল তার।

সুপর্ণ একদিন পাড়ি দিল তার হারানো জগতের উদ্দেশে।

ট্রেন থেকে নেমে আবার ট্রেন। এবার ছোট ট্রেনে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে ওঠা। দূরে কাছে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। কোনও পাহাড় জঙ্গলাকীর্ণ, কোনও পাহাড় নেড়া, কোনও পাহাড়ের গায়ে দূর থেকে শুধু সবুজের আভা দেখা যায়।

ট্রেন উঠছে ওপরে। পাইন গাছগুলো প্রহরীর মতো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতটুকু পরিবর্তন নেই। সেই অরণ্য, সেই পাইন-ফারের শোভা।

এখন বসন্তকাল। লতায় পাতায় ফুলে পাহাড়ে উৎসবের মেজাজ। ছোট ছোট বাড়ি ছবির মতো। থোকা থোকা লতানে গোলাপে আলো হয়ে আছে ঘরের প্রবেশ পথ। ঝরনা নামছে। পাথরের গা বেয়ে নিচে নামার সে কি হুড়োহুড়ি। পোশাক কাচছে পাহাড়ি মেয়েরা। কখনও বা সখিদের ভেতর জল ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা চলেছে। ওদের হাসিতে ঝরনার কলতান।

স্টেশানে গাড়ি ঢুকল। পশ্চিম আকাশে সেই সূর্যাস্তের শোভা। এখন দিন দীর্ঘ হয়েছে। বসন্তের অপরাহ্ণ বেলায় ঝলমল করছে স্টেশান।

ওদিকেরপাহাড়ে লিফট হয়েছে। অনেক ওপরে উঠে যাওয়া যায়। সেদিকে কিন্তু গেল না সুপর্ণ। সে পুরনো পাহাড়ি পথটা ধরে উঠতে লাগল।

সেবার এই পথ ধরে ওঠার সময় হঠাৎ পাহাড় কাঁপিয়ে বনবনান্ত উড়িয়ে ঝড় উঠেছিল। এবার নির্মল নীল আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে রঙিন সূর্যাস্তের আভা।

পরের দিনই সে বেরিয়ে গেল মানালীর উদ্দেশে।

বাতাস মধুর, আবহাওয়া উপভোগ্য। বিপাশায় নামছে বরফগলা জলের ঢল। এখন কলধ্বনির ভেতর অতিথি-আমন্ত্রণের ভাষা।

কি অপরূপ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে আপেলের সারি সারি গাছ। ডাল ভরে সাদা আর পিঙ্ক ফুলের সমারোহ। বাস আপেলের বাগান ঘেঁষে চলেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছি ফুলের ওপর ওড়াউড়ি করছে।

বাস মানালী পৌঁছল সন্ধ্যায়। সেই একই রূপ, একই চেহাবা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী মানালী। ভুবনমনমোহিনী শৈলকন্যা।

এখন সামার সিজন শুরু হয়নি। তাই সব হোটেলেই অঢেল জায়গা। তবু পাহাড় ভেঙে ঐ লগ হাউসের দিকেই উঠে গেল সুপর্ণ।

পঁয়ত্রিশ বছর পরে এসে একেবারে অচেনা ম্যানেজারের কাছ থেকে সে চেয়ে নিল উপত্যকার দিকের সেই বিশেষ ঘরটি।

সময় অপরিবর্তনীয়। সেই সোনালি সকালের আলো জানালা খোলামাত্রই ঝাঁক ঝাঁক হলুদ প্রজাপতির মতো উড়ে এলো ঘরের মধ্যে। খেলা করতে লাগল দেওয়ালে, বিছানায়, মেঝেতে।

ঐ তো ছাদ থেকে ঝুলছে ফুলে ভরা লতা। সুপর্ণের মনে হল, সে সেই পঁচিশ বছর বয়সের সোনালি দিনগুলোতে ফিরে গেছে।

ঐ তো পাইন বনের ভেতর দিয়ে চলেছে এক দল সুন্দরী তরুণী পিঠে কাঠের বোঝা নিয়ে। সুপর্ণের মন হল, এই অপরূপা তরুণীদেরই সে দেখেছে পঁয়ত্রিশ বছর আগে। এই দেবকন্যাদের কোনও পরিবর্তনই যেন স্পর্শ করতে পারেনি। এদের সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে মহাকাল যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, স্তব্ধ হয়ে গেছে তার গতি।

আর দেরি নয়। এবার অদৃশ্য কোনও এক শক্তি যেন তাকে টেনে নিয়ে গেল বিপাশার সেই ব্রিজের দিকে।

সুপর্ণের মনে হল, তার রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে পঁচিশ বছরের এক যুবকের উদ্যম আর কৌতূহল।

ব্রিজের কাছে গিয়ে সে দেখতে পেল পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার সেই মসৃণ শিলাখণ্ডটি। কিন্তু সেদিনের মতো সেখানে কোনও রূপসী তরুণীর কাজ করা রুপোর কাঁটা পড়ে থাকতে দেখা গেল না।

সুপর্ণ ব্রিজ পেরিয়ে নেমে গেল তার অতীত দিনের চেনা পথের ওপর। সে বিপাশার কূল ধরে হাঁটতে লাগল। শেষে এলো সেই পাইন গাছের কাছে। অনেক বড় আর পরিণত হয়েছে গাছ দুটি। সূচের মতো শুকনো পাতার রাশ স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে গাছের তলায়।

ডানদিকে সেই পাথর-বিছানো পথ। এবার কোথা থেকে একটা দ্বিধা এসে তার পথ আটকাল। এক ঝাঁক মৌমাছি যেন গুঞ্জন করতে লাগল তার কানের চারদিকে।

সেকি আজও তেমনি রয়েছে? তার মনের ভেতর থেকে আজও কি মুছে যায়নি অতীত দিনের সেইসব স্মৃতি? সেদিনের সেই তরুণী কি এতদিনও উত্তপ্ত, আনন্দময় একটি সংসার রচনা করেনি?

এইসব গুঞ্জন তুলে মৌমাছির ঝাঁক তাকে ঝালাপালা করে দিল।

না, সে আর এগোবে না। সোনালি স্মৃতিসুধায় ভরে থাক তার পাত্রখানি। সে পাত্র সে সযত্নে রক্ষা করবে, কোনও আঘাতেই তাকে ভাঙতে দেবে না।

সুপর্ণ ফিরে দাঁড়াল। সে পা বাড়াল ব্রিজের দিকে। কয়েক পা এগিয়েই সে দেখতে পেল ব্রিজের দিক থেকে কারা যেন আসছে! আরও কাছে এলে সে দেখল, এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে তিনটি তরুণী আসছে।

একেবারে কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়াল পুরো দলটি। তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠল কৌতূহল, কে এই বিদেশী অচেনা আগন্তুক!

পরিণত দুটি নারী-পুরুষ গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল পরস্পরের দিকে। অতীতের কোনও চিহ্ন কি খুঁজে পাওয়া যাবে ঐ দুটি মুখে? ঐ দুটি পরিণত অবয়বে?

সম্ভ্রান্ত মহিলাটি তিনটি তরুণীকে কিছু বললেন। তারা ব্রিজের দিকে ফিরে চলে গেল।

এগিয়ে এলেন মহিলাটি। ততক্ষণে তাঁকে চিনতে পেয়েছে সুপর্ণ। গালের কালো তিলটি তেমনি অক্ষয় মহিমায় বিরাজ করছে।

মাণ্ডবী এসে হাত ধরল সুপর্ণের।

তুমি আমাকে চিনলে কি করে মাণ্ডবী?

উদ্ভাসিত মুখে মাণ্ডবী বলল, নারী বা শক্তির তিনটি নয়ন। আমি আমার তৃতীয় নেত্রটি দিয়ে তোমাকে চিনেছি সুপর্ণ।

যে মেয়ে তিনটি চলে গেল, ওরা কি তোমার কন্যা?

হ্যাঁ সুপর্ণ, ওরা আমার কন্যা। আরও দুটি আছে। এই পঞ্চকন্যা নাচ শেখে আমার কাছে। এখন তোমার কথা বল? একা এলে কেন? কোন হোটেলে ফ্যামিলি নিয়ে উঠেছ?

পঁয়ত্রিশ পছর আগে তোমার সঙ্গে যখন এক যুবকের দেখা হয় তখনও তুমি এমনি একটা প্রশ্ন তাকে করেছিলে। সেদিন যে উত্তর তুমি পেয়েছিলে আজও তা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

মাণ্ডবী বলল, সেই লগ হাউসে উঠেছ নিশ্চয়ই। প্রতিদিন একবার করে তোমার ঘরটার দিকে আমি তাকিয়ে দেখি।

সুপর্ণ বলল, ঐ ঘরে একদিন আমার অনেক স্বপ্ন জমে উঠেছিল। তাই ভুলতে পারিনি ঘরটাকে। এবারও এসে ঐ ঘরেই আমার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছি।

মাণ্ডবী বলল, এখন থেকে আমাদের আলাদা কোনও ঠিকানা থাকবে না সুপর্ণ। মায়ের দেওয়া ঐ আপেল বাগিচার ঘরখানিই হবে আমাদের দুজনের আশ্রয়। আজ থেকে শেষ হল আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার রাত। চল আমরা নতুনভাবে জীবনটাকে শুরু করি।

মাণ্ডবী, আমি বিশ্বাস করি, জীবন যে কোনও জায়গা থেকেই শুরু করা যায়। তার জন্য আলাদা কোনও সীমারেখার দরকার নেই। যা দরকার, তা হল দুটি হৃদয়ের নিবিড় সংযোগ, গভীর টান।

মাণ্ডবী সুপর্ণের হাত ধরে বলল, চল ঘরে যাই।

সুপর্ণ যেন অতুলপ্রসাদের গানের কথার ভেতর দিয়ে শুনছিল অনুরাগিণীর আকুল কণ্ঠস্বর :

'আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর
ওগো অনেক দিনের পর।'

অপরাহ্ণে দুজনে দাঁড়িয়েছিল ফুলন্ত আপেল গাছের তলায়। বেলা শেষের রোদ দুজনের ওপর ঝরে পড়ছিল মধুবিন্দুর মতো। দুজনের দুটি হাত বাঁধা পড়েছিল নিবিড় নির্ভরতায়।

●

জন্মান্তর

সিস্টার অ্যান বার্ণাদেৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে রইলেন।

কুমার অভিরাম ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করলেন। বার্ণাদেৎকে ধরে গাড়িতে তোলা হল। আঘাত সম্ভবতঃ মাথাতেই। অভিরামের বুকের ওপর মাথাটা হেলান দিয়ে বসে রইলেন বার্ণাদেৎ।

গাড়ি ছুটে চলেছে দেরাদুন মুসৌরীর পথে। হেডলাইট জ্বলছে। সাপের মত বাঁকগুলো আসছে আবার পিছলে সরে যাচ্ছে। মাথাটা ঘুরছে কুমারসাহেবেরও। কি ভয়ানক অ্যাকসিডেন্ট। যেন মুহূর্তে সামনের দু'খানা পা শূন্যে তুলে হ্রেষারব করে উঠল একটা তেজীয়ান ঘোড়া। তারপরই ট্রেনটা কাত হয়ে পড়ল। আশ্চর্যভাবে টাল সামলে নিলেন কুমারবাহাদুর। কিন্তু সহযাত্রিনীটি ছিটকে পড়লেন দরজার ওপর।

স্টেশনের কাছেই অ্যাকসিডেন্টটা ঘটেছিল। লোকের আর্তনাদ, দৌড়োদৌড়ি, আলো অন্ধকারে মুহূর্তে বিরাট স্টেশনটা যেন কেঁপে উঠল।

ড্রাইভার দিলওয়ার সিংই প্রথম বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলেছিল। বেরিয়ে আসতে গিয়ে বাধা পেলেন কুমারবাহাদুর। নানের পোশাকপরা মেয়েটি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে দরজার পাশেই। দিলওয়ার সিংকে ইঙ্গিত করলেন কুমারবাহাদুর। জল এল। মুখে চোখে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন স্বয়ং লালসিয়া এস্টেটের রাজকুমার।

নান একবার যেন একটুখানি প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করলেন। তারপর আবার সেই নিশ্চল অচেতন অবস্থা। অগত্যা কুমারবাহাদুর দিলওয়ার সিংএর সাহায্যে তরুণী নানটিকে তুলে আনলেন স্টেশনের বাইরে। মাঝপথে দিলওয়ার সিং একবার জিজ্ঞেস করল, সাহাব, রেসিডেন্স চলে ইয়া হসপিট্যাল?

নেহিঁ—কোঠি চলো।

গাড়ি আরও জোরে ছুটে চলল।

কুমার মহল। লালসিয় এস্টেটেব দুটি বাড়ি এই পাহাড়ি শহর মুসৌরীতে। একটি ল্যাণ্ডোর ক্যান্টএ, অন্যটি কোম্পানিবাগের চড়াই যেখানে শেষ হল, তার ঠিক নীচের পাহড়ে। ল্যাণ্ডোরের দেওদার বনের আলোছায়ায় কুমারমহল। ছোট্ট বাড়ি। মনে হবে দক্ষ কোন শিল্পীর একটি বহুপ্রশংসিত ল্যাণ্ডস্কেপ।

অন্য বাড়িখানা প্রাসাদবিশেষ। বহু প্রাচীন উঁচু গম্বুজওয়ালা মহল। বাগান, লোকলস্কর, কর্মচারিদের বাইরের ঘর। ভেতর মহল। দোতলা প্রাসাদ। শতাধিক ঘর। পাহাড়ের তিনটি ধাপে বাড়িখানা উঠে গেছে। বাগানে বসার জন্যে কংক্রিটের চেয়ার। পাইনগাছের সারি। এক এলাহী কাণ্ড। প্রাসাদের সামনের গেটে লেখা আছে—'রানীমহল'।

রাজা সুরিন্দর সিং মৃত্যুর আগেই প্রিয়তমা রানীসাহেবাকে এই মহলটি উপহার দিয়ে যান। বহু অর্থ ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল এই শৈলাবাস। সামনের তোরণে একটি পাথরের ফলকে 'রানীমহল' কথাটিও উৎকীর্ণ করে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজা সুরিন্দর সিংএর মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে তাঁর বিশাল জমিদারি, সারা ভারত জুড়ে ছোটবড় ব্যবসা-বাণিজ্য, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলেই সংশ্লিষ্ট লোকদের ধারণা হয়েছিল। কিন্তু অসাধারণ দক্ষতায় সবকিছুকে রক্ষা করলেন লালসিয়ার রানীসাহেবা।

একমাত্র সন্তান অভিরাম বড় হয়ে উঠতে লাগল। বিলাতের ইস্কুলে পাঠ শেষ হলে রানীসাহেবা

তাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। এখন থেকে এস্টেটের ভার একটু একটু করে বুঝে না নিলে ভবিষ্যতে নানা ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে। তাই তরুণ পুত্রটিকে রানীসাহেবা ম্যানেজারের সঙ্গে এস্টেটের নানা জায়গায় পাঠাতে লাগলেন।

অভিরাম প্রখর বুদ্ধিধর, কিন্তু স্থির। তাই সবকিছু বুঝে নিতে তার বিলম্ব হল না।

রানীসাহেবা বর্তমান থাকতেই ল্যাণ্ডোরে কুমারবাহাদুরের জন্য 'কুমার-মহল' তৈরি করান।

কুমার অভিরামের ইচ্ছা অনুসারে সে বাড়িখানি হয়েছিল খুবই ছোট। গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন স্বয়ং কুমারবাহাদুর, অবশ্য ইঞ্জিনীয়ার এসেছিলেন বিলেত থেকে তাঁর সে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে।'

দুটি পাহাড় যেখানে এসে মিলেছে তারই শিরায় উঠে গেছে দেওদারশ্রেণী, নীচ থেকে ওপরে। বর্ষায় ঐ দেওদারের গা বেয়ে কুলকুল করে নামতে থাকে ঝরনার ধারা। নুড়িগুলো জলের স্রোতে ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে গেছে। ঐ দেওদার বনের ফাঁকে দেখা যায় কুমারমহল। সাদা লালে মেশা বাড়িখানা। সামনে লতাবিতান। ছোট্ট একটি বসবার জায়গা। মাথায় গম্বুজাকৃতি চন্দ্রাতপ। লতায় ফুলে পাতায় তা ঢাকা পড়ে গিয়ে আরও সুদৃশ্য হয়ে উঠেছে। বাড়িখানার ঠিক সামনে, লতাবিতানে যাবার পথে একটি মূল্যবান পাথরে বাঁধান অতিক্ষুদ্র জলাধার। তাকে বলা যায় জলদর্পণ। কুমারমহল সেই ছোট আয়নায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

এ হল কুমারমহলের সামনের দৃশ্য। পেছনের বন গভীর হয়ে উতরাইতে নেমে গেছে। সেখানে কোন বাড়ি নেই। শুধু বন আর গভীর খাদ। এই মহলের পেছনে পাহাড়ের ঐ খাদের গায়ে পাথর সাজিয়ে একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। ঐ ঘরখানার ওপরে বড় বড় পাথর এমনভাবে রাখা হয়েছে, আর এমন গাছগাছালিতে তা ভরে দেওয়া হয়েছে যাতে এই গৃহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারো কোন ধারণাই না থাকে। এ ঘরখানা কুমারমহলের মূল বাড়িখানার সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গপথে যুক্ত। অতিশয় মনোরম ও সুসজ্জিত। একমাত্র কুমারবাহাদুর ছাড়া এই গুপ্তগৃহে অন্য কারো প্রবেশ নিষেধ।

হাঁ, আর একজন মাত্র ইদানীং সে গুপ্তগৃহে মাঝে মাঝে প্রবেশের অধিকার পায়। অবশ্য কুমারবাহাদুরের সাহস হয়নি জননী মহারানীসাহেবা বর্তমানে কাউকে সেখানে প্রবেশের অধিকার দিতে। রানীসাহেবার মৃত্যুর পরে লালসিয়া এস্টেটের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। একটি প্রবাদের সূত্র ধরে 'রানীমহল'এ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বসবাস। লালসিয়ার উত্তরাধিকারী তরুণ, তার ওপর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন কুমারবাহাদুরের যদি এতে চিত্তচাঞ্চল্য কিছু ঘটে থাকে তাহলে তা অস্বাভাবিক নয়।

আর মানুষের যখন মন চঞ্চল হয় তখন আশেপাশে দু'একজন সঙ্গীও এসে পড়ে। সুজন সিং কুমারবাহাদুরের তেমনি এক সঙ্গী। বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা হয়, তারপর কুমারবাহাদুরের আকর্ষণে চলে আসে সুজন সিং তাঁর এস্টেটে। এখন সুজন সিং কুমারবাহাদুরের অন্তরঙ্গ অনুচর। কিন্তু পরিজনেরা কানাঘুষোয় বলেন, বৃদ্ধ ম্যানেজারের পরেই সুজন সিং ধরবে এস্টেটের হাল, তখন আর লালসিয়া এস্টেটের ভরাডুবির বিলম্ব হবে না।

সুজন সিং যে সর্বতোভাবে সুজন নয় তা বুদ্ধিধর কুমার-বাহাদুরের অজানা নয়, কিন্তু বুদ্ধি মানুষের যত তীক্ষ্ণই হোক, হৃদয়ের কাছে হার তার প্রায়ই হয়ে থাকে। কুমারবাহাদুরের বুদ্ধি তাঁর হৃদয়ের কাছে হার মানছিল প্রতিদিন। আর এই হার মানার খেলায় যে তাঁকে চালনা করছিল সে স্বয়ং সুজন সিং-এর অসাধারণ কলাবতী ভগ্নী লক্ষ্মীবাঈ।

এই লক্ষ্মীবাইয়ের প্রেমে তখন কুমার অভিরাম মগ্ন। তাঁর ল্যাণ্ডোর ক্যান্টের গুপ্তগৃহে তাই ইদানীং লক্ষ্মীবাঈ-ই ছিল একমাত্র আকাঙ্খিতা অতিথি।

কুমারবাহাদুরের পরিজন, এমন কি লালসিয়া এস্টেটের সাধারণ কর্মচারিদেরও ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে লক্ষ্মীবাঈ একদিন এই লালসিয়া এস্টেটের কাল হয়ে দাঁড়াবে। তারা শুনতে পাচ্ছিল লালসিয়া এস্টেটের অন্দরমহলে অলক্ষ্মীর পদসঞ্চার।

কোন এক বেলাশেষে যখন পাহাড়ি দেওদারের মাথায় মাথায় সূর্য তার শেষ সোনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন পাশাপাশি বসে ছিল কুমারবাহাদুর আর লক্ষ্মীবাঈ। কুমারবাহাদুরকে রাজস্থান কাহিনীর একটি অংশ পড়ে শোনাচ্ছিল লক্ষ্মীবাঈ। হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে লক্ষ্মীবাঈ দেখল, কুমারবাহাদুর শেষ সোনার খেলা দেখছেন গাছের পাতায় পাতায়।

বইখানা বন্ধ করে কুমার অভিরামের আরও কাছাকাছি সরে এল লক্ষ্মীবাঈ।

একটা উত্তপ্ত নিশ্বাসের ছোঁয়া পেয়ে কুমারবাহাদুর চকিত হয়ে উঠলেন ঃ তারপর, তারপর কি হল শিলাদিত্যের? সেই অরণ্যে ভরা মন্দিরের দ্বারে বসে শিলাদিত্য ডাকতে লাগলেন তাঁর ভগ্নীর নাম ধরে। তারপর দরজা কি খুলল?

কুমারবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসির রেখা মুখে টেনে বলল লক্ষ্মীবাঈ, দরজা কি কখনো খোলে কুমারবাহাদুর? তাকে খুলতে হয়।

একটু সংকুচিত হয়ে অভিরাম বললেন, কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মী, আমি সত্যিই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হাঁ, তারপর শিলাদিত্য ডাকতে লাগল ভগ্নীর নাম ধরে।

কুমারবাহাদুর, ওদের আমরা অনেক দূরে ফেলে এসেছি। এখন বাপ্পাদিত্যের রাজত্ব কাল।

তোমার কাছে প্রতিদিনই আমার হার হচ্ছে লক্ষ্মীবাঈ।

ও কথা কেন কুমার?

এই যেমন কখনো তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না আমি, কখনো তোমার পড়ার সময়ে অন্য কথা ভেবে চলেছি।

পুরুষ একটু অন্যমনস্ক হলে ভাল লাগে কুমারবাহাদুর।

কার? হেসে জিজ্ঞেস করেন অভিরাম।

যেন প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে যায় লক্ষ্মীবাঈ। মিঠি হাসির সঙ্গে জবাব ফিরিয়ে দেয়, মেয়েদের।

কুমার অভিরাম অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

এ সপ্তাহে কেম্‌টি ফল্‌স্‌এর দিকেই আমাদের মৃগয়াযাত্রা হবে, কি বল?

উচ্ছল হয়ে উঠল লক্ষ্মীবাঈ ঃ সেদিন আমাদের শিকারপর্ব শেষ না করেই ফিরে আসতে হয়েছিল। এবার ভোরবেলা থেকেই আমাদের যাত্রা। ভাইজীকে আগেভাগেই খবরটা দিয়ে রাখতে হবে।

যদি বলি, এ যাত্রায় শুধু তুমি আর আমি থাকব, সুজন থাকবে না—

অপনার অভিরুচি।

আমার সঙ্গে একা যেতে ভয় করবে না তোমার?

লক্ষ্মীবাঈ সকৌতুকে পালটা প্রশ্ন করল, আপনি বুঝি খুব ভয়ঙ্কর?

যথার্থ পুরুষ সব সময়েই ভয়ঙ্কর লক্ষ্মী।

তাহলে আমাকেও বলতে দিন কুমার, যথার্থ নারী সেই ভয়ঙ্কর পুরুষের কাছেই তার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

হাসলেন কুমার অভিরাম। সে হাসির অর্থ স্পষ্ট করে পড়ে নিতে পারল না লক্ষ্মীবাঈ। সূর্যের আলো ততক্ষণে নিভে এসেছিল। অরণ্যের ঘন ছায়া এসে পড়েছিল ঘরের ভেতর।

লক্ষ্মীবাঈ নিবিড় হতে চাইল এই মুহূর্তে। রক্তে তার বয়ে এল আদিম উত্তাপ। উত্তরের কঠিন তুষার হাওয়াও তাকে শীতল করতে পারল না। কিন্তু একসময় মনে পড়ল তার সুজন সিংএর একটি কথা। চড়াই ভাঙা কঠিন, কিন্তু সেখানে পড়ার ভয় কম, উতরাই যত সহজই হোক সেখানে তাড়াতাড়ি পা বাড়াতে গেলেই পড়ে যাবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

নিজের মনের প্রবল একটা পীড়নকে লক্ষ্মীবাঈ চাবুক মেরে নিরস্ত করে বলল, এখন আমরা বাইরে যেতে পারি কুমারবাহাদুর।

নিশ্চয়ই। আবার কাল শুরু হবে আমাদের পাঠ। তোমার উচ্চারণ, তোমার গলার ওঠা-নামা আমাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে লক্ষ্মীবাঈ।

আপনার প্রশংসার যোগ্য আমি নই তা জানি কুমারবাহাদুর। তবু আপনার মুখের ঐ কথাটুকুকে মিথ্যা বলে ফিরিয়ে দেব এমন সাধ্য আমার নেই।

শেষ অবধি শিকারযাত্রার সঙ্গী হল সুজন সিং। বনের ভেতর বাঁধা হল তিনটি মাচান। লক্ষ্মীবাঈ উপযাচক হয়ে নিজের জন্য পৃথক একটি মাচানের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সে বলেছিল, শিকারে আমি কারো ওপর নির্ভর করতে চাই না।

পাহাড়ি একটা ঝরনা বয়ে গেছে বনের বুক চিরে। তারই একটু দূরে তিনটি গাছে তিনটি মাচান।

কথা হয়েছে, হরিণের দুটি চোখের মাঝে কপাল লক্ষ্য করে গুলি ছুড়বে লক্ষ্মীবাঈ। কণ্ঠ হবে কুমারবাহাদুরের লক্ষ্যস্থল। আর সামনের দুটি পায়ের মধ্যেকার বক্ষ হবে সুজন সিংএর লক্ষ্য। যে সফল হবে সেই পাবে শ্রেষ্ঠ শিকারীর শিরোপা।

সকাল থেকে উত্তেজনার অন্ত ছিল না। কিন্তু শিকার পাওয়া যাবে রাতে। উদ্যোগ-আয়োজন অল্প সময়ের ভেতরেই শেষ হয়ে গেল। কুমারবাহাদুরের যে দু'একজন পার্শ্বরক্ষী ও পরিচারক ছিল তাদের বিদায় দেওয়া হল। দূরের বাসগুমটির কাছে তারা তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করবে। সারারাত চলবে শিকারপর্ব।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। চাঁদ উঠবে দু'প্রহর পরে। সন্ধ্যা নামল পাহাড়ে। পাশাপাশি কতকগুলি সুউচ্চ পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারই গভীর সানুদেশ জুড়ে বন। বনে ছায়া নেমে এসেছে আগেই। বড় বড় পাহাড়ের ছায়া আর বনের ছায়া মিলে সূর্যাস্তের আগেই যেন ঘন আঁধারের রাজ্য সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকের কাছেই আছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বন্দুক, টর্চ। কিন্তু নিতান্ত দরকার ছাড়া টর্চ জ্বালানো বারণ। জন্তুজানোয়ারগুলো এ বনে একটু বেশি সজাগ। বহু শিকারীর আনাগোনা এ অঞ্চলে। প্রতীক্ষা করছে শিকারীর দল। চাঁদ ওঠার প্রতীক্ষা। অন্ধকারে খাদের ভেতর থেকে লাল আর হলুদ চোখের তারা জ্বলে জ্বলে উঠছে। বুনো মোষ, বাঘ কিংবা পাখিদের চোখের অরার আলো ভিন্ন ভিন্ন রকম। অভ্যস্ত শিকারী দেখলেই বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে বনের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে ছোটখাট জন্তুজানোয়ারের দৌড়ে যাবার শব্দ ভেসে আসছে। সে শব্দ থেমে গেলে বনের কীটপতঙ্গের মিহি সুরের আওয়াজ জেগে ওঠে। একটু কান পাতলেই শোনা যায় আর একরকম শব্দ। ভারি মিষ্টি সে আওয়াজ। বড় বড় পাথরের পাশ কাটিয়ে নুড়িগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটে চলেছে যে জলধারা তারই শব্দ। রাতে সকল শব্দই পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পায়, দিনে কোথায় যেন সব হারিয়ে যায় বিপুল শব্দতরঙ্গের মধ্যে।

চাঁদ দেখা গেল। গাছগুলোর মাথায় মাথায় সাদা মিহি ওড়না যেন কে বিছিয়ে দিয়ে গেল। এতক্ষণ অন্ধকার আকাশে যে তারাগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল তারা ধীরে ধীরে কিছুটা অস্পষ্ট হল। আকাশ নীল নির্মল। চাঁদের আলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাহাড়ের প্রতিটি খাঁজে, বনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ঝরনার স্রোতধারাকে মনে হচ্ছে একটি তরল গলিত রৌপ্যের প্রবাহ।

থেমে গেছে আরণ্যক প্রাণীদের অন্ধকার-বিচরণ। যেন সমস্ত বনভূমি একটি নতুন নাটকের জন্য পট তৈরি করে রেখেছে। তিনটি গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসে রয়েছে তিনজন। তিনজোড়া চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে একটি বড় শিলাখণ্ডের ওপর। যেখানে দাঁড়িয়ে প্রতি রাতে বনের প্রাণীরা ঐ ঝরনার জলপ্রবাহ থেকে পিপাসা মেটায়।

প্রথমে এল কয়েকটি বুনো মোষ, সঙ্গে বাচ্চা। অলসভাবে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ঝরনার জল খেয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। কিছুক্ষণ সবকিছু নিস্তব্ধ। দু'একটা শেয়ালের হঠাৎ থেমে থেমে গন্ধ শোঁকা তারপর চোঁ চোঁ দৌড়ে বনের ভেতর ঢুকে যাওয়া। ওবা তিনজনে দেখছে, ভাবছে তিনজনে। কুমারবাহাদুর ভাবছেন, চিত্রিত একটি হরিণ জল পান করে ফিরে তাকিয়েছে। আর তার চোখ দুটি উঁচু করে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠেছে তাঁর হাতের বন্দুক। কণ্ঠে বিদ্ধ হয়েছে গুলি। পড়ে যাবার সময়ে একটি আর্ত চীৎকার করবার সুযোগও সে পেল না।

না, এবারও হরিণ এল না, দুটো শূকর ঘোঁৎঘোঁৎ করে বনের এপার থেকে সরু পথটা পেরিয়ে ওপারে চলে গেল।

একটি মিনিটও পার হয়নি, একটা বাচ্চা হরিণকে সঙ্গে নিয়ে ঝরণার ধারে এসে দাঁড়াল একটা বড় হরিণী। একবার ত্রস্তে তাকাল এদিক ওদিক। তারপর নির্ভয়ে জল পান করতে লাগল। কিছু পরে তাকাল সঙ্গের শিশুটির দিকে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পান করে নাও, দেখ কত ঠাণ্ডা—হরিণের ভাবটা এমনি।

হরিণশিশুটিও মুখ নামাল সেই স্রোতধারায়। একবার মায়ের দিকে, একবার জলের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর হরিণটি তাকাল পূর্ণ চাঁদের দিকে।

ফিরে দাঁড়িয়েছে। কি আশ্চর্য ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে! পেছনে দাঁড়িয়েছে বাচ্চাটা।

তিনটি বন্দুকই গর্জে উঠল। একটি বন্ধুকের গুলি আকাশের চাঁদের দিকে নিক্ষিপ্ত হল। যেন এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটুকুকে মুছে ফেলার জন্য চাঁদের আলো নিভিয়ে দেবার চেষ্টা।

হরিণটা পড়ে গেছে পথের ওপর। পড়ার আগে সে শব্দ করেছিল। নাঃ, কুমারবাহাদুরের শিকারী সাজা উচিত হয়নি। চাঁদের আলো আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুজন সিংই কথা কইল, এবার নামা যাক।

উত্তর এল লক্ষ্মীবাঈ-এর কাছ থেকে, আমিও নামছি কিন্তু।

না, তোমাদের কাউকেই নামতে হবে না, আমিই পরীক্ষা করব।—নিজের আস্তানা থেকে হেঁকে বললেন কুমার অভিরাম। তারপর মই লাগিয়ে তরতর করে নেমে গেলেন নীচে।

ওরা দেখল কুমার অভিরাম ছুটেছেন হরিণটার কাছে। বাচ্চা হরিণটা এতক্ষণ মায়ের গা শুঁকছিল, একটি মানুষকে দৌড়ে আসতে দেখে সে লাফাতে লাফাতে বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুমার অভিরাম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন হরিণটার কাছে। তিনি জানেন, আকাশের বুকে তাঁর নিশানা উধাও হয়েছে। এখন বাকী দু'জন। কৌতূহলী কুমার হরিণের দেহ স্পর্শ করে দেখলেন একটিমাত্র বুলেটের চিহ্ন সেখানে বর্তমান; আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার বুলেট হরিণের ললাট বিদ্ধ করেছে।

কুমার উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন : সাবাস লক্ষ্মীবাঈ, জয়তিলক তোমারই ললাটে পড়ল। কেঁপে উঠল লক্ষ্মীবাঈ-এর সমস্ত মন। কোন জয়তিলক তার ললাটের জন্য অপেক্ষা করে আছে। লক্ষ্যভেদ, না স্বয়ং লালসিয়ার যুবরাজ কুমার অভিরাম। দ্বিতীয় ইচ্ছাটা তার লক্ষ লক্ষ শিরা উপশিরাকে পাক দিতে দিতে মাতাল করে তুলল।

অভিনন্দন জানাবার জন্য ছুটে আসছিলেন কুমারবাহাদুর লক্ষ্মীবাঈএর মাচানের দিকে।

তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠল সুজন সিং।

মুহূর্তে এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। পেছন থেকে তীব্রবেগে তীক্ষ্ণ সিং উঁচিয়ে ছুটে আসছে একটা বাইসন। পেছন ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে কুমারবাহাদুর আহত হয়ে পড়ে গেলেন। গর্জে উঠল সুজন সিংএর বন্দুক। বাইসনটাও কুমারবাহাদুরের একটু দূরেই টলতে টলতে পড়ে গেল। লক্ষ্মীবাঈএর আর্ত চীৎকারে খানখান হয়ে ভেঙে গেল বনের অন্ধকার।

কুমারমহলের একটি কক্ষে ব্যাণ্ডেজবাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছেন কুমার অভিরাম।

পাশে এসে দাঁড়াল নার্স সুভদ্রা ভার্গব। কুমারবাহাদুব বললেন, আজও আমি একটু উঠে বসতে পাব না সিস্টার?

ডাক্তার গর্গের কাছে অনুমতি মেলেনি কুমারবাহাদুর, তবে দু'একদিনের ভেতর আপনি নিশ্চয়ই উঠে বসবেন।

একটু থেমে নার্স বলল, উত্তরের জানালাটা খুলে দেব কি? দূরের পাহাড়গুলো আপনার চোখে পড়বে।

কিছু না পাওয়ার চেয়ে এ একরকম করে পাওয়া। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কুমার অভিরাম।

নার্স সুভদ্রা জানালা খুলে দিল।

ভোরবেলার আলোর খেলা শুরু হয়ে গেছে মেঘে মেঘে। তুষারের পাহাড় তার ফাঁকে ফাঁকে ঠিক যেন ঘোমটার আড়াল থেকে নিজেকে প্রকাশ করছে। হালকা পিঙ্করঙের ছোপ লেগে আছে তুষারের গায়।

জানালাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বয়ে এল।

নার্স তাড়াতাড়ি পায়ের কাছে পড়ে থাকা কম্বলটা কুমাবাহাদুরের গায়ের ওপর টেনে দিল।

এটা আবার কেন সিস্টার? বেশ তো ভাল লাগছিল হাওয়াটুকু।

অনেক কিছু যা ভাল লাগে, সব সময়ে তা ভাল নাও হতে পারে।

নার্স সুভদ্রা ভার্গব মাসাধিককাল রাতদিন রয়েছে কুমারবাহাদুরের পাশে। তাই যে কোন কথাকেই সে অসংকোচে বলার শক্তি অর্জন করেছে।

কুমার অভিরাম সুভদ্রার সেবায় সুস্থ জীবন ফিরে পাচ্ছেন। সুভদ্রা ভার্গবের সহজ মধুর কথা আর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এই ক'টি দিনের ভেতর।

আর কোন কথা না বলে তেমনি করে চুপচাপ শুয়ে রইলেন কুমারবাহাদুর।

হরলিক্সের কাপটা মুখের কাছে টিপয়ের ওপর রেখে কুমারবাহাদুরের পাশের চেয়ারে বসল নার্স সুভদ্রা।

আজ আমি হলফ করে বলতে পারি কুমারবাহাদুরের শরীর খুবই হালকা মনে হচ্ছে।

কুমার অভিরাম আঙুল দিয়ে জানালার বাইরে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। একটি পাখি উড়ছিল তার সাদা ডানা মেলে ভোরের আকাশে।

হরলিক্স এক চামচ কুমারের মুখের সামনে এগিয়ে দিয়ে হেসে বলল সুভদ্রা ভার্গব, কবি হলেই আপনাকে মানায় ভাল, শিকারী হওয়া আপনার সাজে না।

তাই তো সাজা পেলাম। সেদিন তোমাকে কাছে পেলে হয়তো ভুলটা আমার শুধরে নেবার সুযোগ পেতাম।

কুমার অভিরাম কথাগুলো বলে তাকালেন নার্সের দিকে। কি যেন অদৃশ্য লিপির পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন নার্স সুভদ্রার মুখে।

স্থির, প্রশান্ত সুভদ্রা ভর্গবের মুখ। হরলিক্সের চামচটা এবার মুখের এত কাছে এগিয়ে এনেছে নার্স যে সেটাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতে হল।

কিছুক্ষণের নীরবতা। শুধু সুভদ্রার হাতের চামচের সঙ্গে কাপের সংঘাতে মাঝে মাঝে মিষ্টি একটা ঠুংঠাং আওয়াজ উঠছিল। খাওয়া শেষ হলে সুভদ্রা আজ তোয়ালেখানা কুমারের হাতে এগিয়ে দিল।

কুমারবাহাদুর হেসে বললেন, আজ থেকে নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে, কি বল?

তাই তো আপনার পছন্দ ; মুখে বলল, কিন্তু তোয়ালেটা নিজের হাতে নিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিল অভিরামের।

তারপর সুভদ্রা আর সেখানে বসল না। নিজের কাজে চলে গেল কক্ষান্তরে।

তোপটিব্বার ওপরে সেন্ট মেরিজ হসপিট্যাল। সুভদ্রা ভার্গব সেখানকার স্টাফ নার্স। সকাল দশটা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত সেখানে কাজ করতে হয় তাকে। তারপর সে পায় প্রাইভেট কাজ করার সুযোগ।

ডাক্তার গর্গ বহুকাল লালসিয়া রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত। রাজা সুরিন্দর সিংএর সময়ে তিনি চিকিৎসক হয়ে তাঁর পরিবারে আসেন। তারপর রাজা সুরিন্দরের চেষ্টাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন সেন্ট মেরিজ হসপিট্যালে। এখন তিনি হসপিট্যালের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান।

নার্স সুভদ্রা ভার্গবকে তিনিই নিযুক্ত করেছিলেন কুমারবাহাদুরের পরিচর্যার কাজে। সুভদ্রা তাই কিছুদিনের জন্য হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছিল। ডাক্তার গর্গ সুভদ্রাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সুভদ্রার কাজে নিষ্ঠা এবং সেবায় আন্তরিকতার জন্য তিনি তাকেই নির্বাচন করেছিলেন এ কাজে। সুভদ্রাকে তিনি নার্স কোয়ার্টারে না গিয়ে কুমারমহলেই থাকবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সারারাত সুভদ্রা কুমার অভিরামের বেডের কাছটিতে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকে। ঐখানেই তার নিদ্রা, ঐখানেই জাগরণ। মাসাধিককাল ঐ ব্যবস্থাই বহাল রয়েছে। তবে প্রয়োজন আর হবে না রাত্রি জাগরণের। সুভদ্রার সেবার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

আজ সকালে কুমারকে খাইয়ে, সুভদ্রা পাশে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে ঢুকল। আজ আর নার্সের পোশাক পরতে ভাল লাগছে না তার। স্নান সেরে সে পরল একখানা শাড়ি। হালকা সবুজ রঙ, আঁচলায় সোনালী কাজ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে প্রসাধন করল। তারপর কুমারমহলের পেছন দিকের বাগানে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল। কত রকমের লতা আর ফুলের গাছ। নানা রঙ, নানা আকার। প্রজাপতি একটি উড়ছিল। এ ফুলে ও ফুলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হাসি পেল সুভদ্রার। কি চঞ্চল! কোথাও একটু স্থির হয়ে থাকবে না। মন বসবে না ওর কিছুতেই এক ফুলে। আপনমনে খুশিতে ভেঙে পড়ল সুভদ্রা। হাত নেড়ে নেড়ে সে তাড়া করতে লাগল প্রজাপতিটাকে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে কখন হাওয়ায় ভেসে গেল চিত্রিত পতঙ্গটি। এবার খোঁজার পালা সুভদ্রার। ফুলের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে, লতাপাতায় কাঁপন জাগিয়ে ও খুঁজে চলল। চঞ্চল কিশোরী হয়ে গেছে আজ সুভদ্রা। গাড়োয়ালের কোন পাহাড়ঘেরা গাঁয়ে কতদিন আগে তার জন্ম হয়েছিল, সঙ্গীদের নিয়ে শৈশবের কত খেলা খেলেছিল, মা বাবার মৃত্যুর পর কেমন করে দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করল, সবই আজ ভুলে গেল সুভদ্রা ভার্গব। একটি পরিপূর্ণ সুখী মন আজ সঞ্চরণ করতে লাগল ফুলে ফুলে, লতায় পাতায়। সে স্নান করল প্রথম প্রভাতের আলোর ধারায়। যেন আজ কোথা দিয়ে তার জন্মান্তর ঘটল। সত্যি খুশির পরিগুলো যেন আজ তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এই বাগানটুকুর ভেতর। সুভদ্রা আঁচল ঘুরিয়ে গুনগুনিয়ে গান করতে লাগল।

একসময় সে বসল একটি গোলাকৃতি শিলাখণ্ডের ওপর। নীল ও সাদায় মেশা মসৃণ শিলা। সে ভাবতে লাগল। কত অস্পষ্ট স্বপ্ন হিমেল মেঘের মত তার চারদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। এতদিন জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যা কিছু সে ভাববার সুযোগ পায়নি, আজ এই অবসরে তারা সব যেন তাদের পুরো পাওনা চুকিয়ে নেবার জন্য সুভদ্রার কাছে ভিড় করে এল। প্রজাপতিটা ফিরে এসেছে। এবার একা নয়, সঙ্গী নিয়ে এসেছে আর একটি। সুভদ্রা সব ভুলে নিবিষ্ট হয়ে তাদের দেখতে লাগল। ফুলে ফুলে দুলে দুলে সে কি নাচ! একসময় সুভদ্রার সামনে এসে হাজির হল নর্তক নর্তকী। সুভদ্রাকে ঘিরে শুরু হল তাদের নাচ। যেন কতকগুলো এলোমেলো ভাবনা মনের আকাশে পাখা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা কখন চলে গেছে, আর সুভদ্রা মনের আকাশে পাখা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পানের পাতার মত দুটি হাত মুখে ঢেকে কাঁদছে, অঝোরে কাঁদছে। কেন এ কান্না। কি হল আজ সুভদ্রার। নিটোল দীঘির নিস্তরঙ্গ জলে কিসের ঢেউ জাগল!

চমকে উঠল সুভদ্রা, মাথায় কিসের ছোঁয়া পেয়ে। ফিরে তাকাতেই চোখাচুখি হল যার সঙ্গে সুভদ্রা স্বপ্নেও ভাবেনি এখানে তাকে দেখতে পাবে এমন অবস্থায়। কুমার অভিরাম দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। মুখে এক অদ্ভুত হাসি, কিন্তু কাঁপছিল তাঁর সারা শরীর। দুর্বল পায়ের ওপর দেহের ভার যেন আর রাখা যাচ্ছিল না।

কেন, কেন এসেছেন এখানে!—প্রায় কান্নার সুরে অভিরামকে জড়িয়ে ধরল সুভদ্রা। তারপর নার্স যেমন করে অসুস্থ অপটু রোগীকে ধরে নিয়ে আস্তে আস্তে চালনা করে, ঠিক তেমনি সুভদ্রা ভার্গব নিয়ে গেল কুমারসাহেবকে তাঁর বিছানায়।

কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনা কমলে অভিরাম যখন সুস্থ বোধ করলেন, তখন সুভদ্রা বলল, এই সামান্য মেয়েটির রুটি রোজগারের পথটা বন্ধ না করলে কি চলছিল না কুমারবাহাদুর। আজ যদি কিছু একটা ঘটে যেত, তাহলে কি কৈফিয়ত দিতাম আমি ডাক্তার গর্গের কাছে। আর তাছাড়া—। একটু থামল সুভদ্রা। —তাছাড়া লক্ষ্মীবাঈ রোজ এসে খোঁজখবর নিয়ে যান। নানারকম মিঠে কড়া নির্দেশও দিয়ে যান। তিনি ঘটনাটা জানতে পারলে আমাকে কি আর একদণ্ড চাকরিতে বহাল রাখবেন।

কুমার অভিরাম বুঝলেন, লক্ষ্মীবাঈ এই সুন্দরী লাবণ্যময়ী নার্সটির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে ভোলেনি।

প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় একবার করে কুমারবাহাদুরের কাছে আসত লক্ষ্মীবাঈ। অন্য সময় কারও আসা বারণ ছিল ডাক্তারের।

লক্ষ্মীবাঈ এসে খোঁজখবর নিত। কথায় কথায় সুজন সিং-এর প্রশংসা করত। তারপর কোনদিন কুমারবাহাদুরের ইচ্ছা হলে রাজস্থান কাহিনী অথবা কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘের কথা পড়ে শোনাত।

মাঝে মাঝে অবশ্য থামতে হত তাকে। নার্স সুভদ্রা কোন কারণে ঘরে ঢুকলেই তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টির আলো ফেলে তার মুখের গভীরে যদি কোন লুকোনো ভাবভাবনা থাকে তা দেখে নেবার চেষ্টা করত সে।

লক্ষ্মীবাঈএর ওপর এজন্য মনে মনে কিছুটা অসন্তোষ জমা হলেও মুখে তার আভাসমাত্র প্রকাশ করলেন না অভিরাম। সাংঘাতিক আঘাতে আহত হয়ে যখন কুমারবাহাদুর জ্ঞান হারিয়েছিলেন তখন নাকি ঐ ভয়াল জন্তুটাকে গুলি করে মেরেছিল অব্যর্থ শিকারী লক্ষ্মীবাঈ। জ্ঞান ফেরার পর একদিন সুজন সিংএর মুখ থেকেই তিনি শুনেছিলেন এই কথা। তাই লক্ষ্মীবাঈএর ক্ষুদ্র তুচ্ছ ত্রুটিগুলো এড়িয়ে যেতেন কুমার বাহাদুর এক প্রচ্ছন্ন কৃতজ্ঞতাবোধে।

এদিকে কুমারের চোখে নার্স সুভদ্রা ভার্গব এনে দিয়েছে অন্য এক জগতের আলো। সে জগৎ কোলাহলের বাইরে হাতছানি দেয় নির্জন বিশ্রামের। লক্ষ্মীবাঈ নদীপ্রবাহ, আর সুভদ্রা তার মাঝে প্রসারিত চর। শ্রান্ত অভিরাম মনে মনে খরস্রোতা জলধারায় গা ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে চরের বুকে একটি শান্ত আশ্রয় গড়ে নিতে চাইলেন। সুভদ্রা এদিক থেকে তাঁর কাছে অনেক বেশি কাম্য বলে মনে হল।

সুভদ্রা যখন লক্ষ্মীবাঈএর নাম উল্লেখ করে বলল যে আজ ভোরবেলাকার ঘটনাটা জানতে পারলে লক্ষ্মীবাঈ তাকে চাকরিতে বহাল রাখবে কিনা সন্দেহ, তখন কুমার অভিরাম ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, সুভদ্রা ভার্গব চাকরি চলে যাবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে অন্ততঃ এ বিশ্বাসটুকু আর যে করে করুক অভিরাম করবে না। আর তাছাড়া চাকরি দেখার ক্ষমতা যেমন লক্ষ্মীবাঈএর হাতে কেউ তুলে দেয়নি, তেমনি চাকরি কেড়ে নেবার অধিকারও দেওয়া হয়নি তাকে।

সুভদ্রা এ তর্কের ভেতর যেতে চাইল না এই মুহূর্তে। কুমারবাহাদুরের কথাগুলো তার মনে কেমন এক অশ্রুত ঝংকার তুলল।

সুভদ্রা প্রসঙ্গটিতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে প্রথমে মুখে আঙুল দিল, তারপর সকৌতুকে বলল, এখন আপনার কথা বলা সম্পূর্ণ বারণ। আপনি যেহেতু খুবই অন্যায় করেছেন, সেজন্যে আপনাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

কি শাস্তি দেবে সুভদ্রা?

লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া আর সবার কাছে চুপ করে থাকার শাস্তি।

শাস্তিটা বড়ই গুরুতর হল, হেসে বললেন কুমারবাহাদুর, আর একটু লঘু করে দাও।

কি রকম লঘু?

লক্ষ্মীবাঈএর কাছে মুখটা না খুলে আর সবার কাছে খোলার আদেশ হোক।

এ আপনার শাস্তি এড়িয়ে যাবার ছল কুমারবাহাদুর। আর তাছাড়া সেই সারাদিনের ভেতর মাত্র একটিবার লক্ষ্মীবাঈ আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। তাঁকে এভাবে বঞ্চিত করতে আপনার কষ্ট হওয়া উচিত।

মনে হচ্ছে এজন্যে তুমি বেশি কষ্ট পাচ্ছ?

গম্ভীর হল সুভদ্রা। বলল, খুবই স্বাভাবিক। ভুলে যাবেন না কুমারবাহাদুর, লক্ষ্মীবাঈএর মত আমিও মেয়ে। সুতরাং মেয়েদের ব্যথা কোথায় বাজে তা আমার অজানা নয়।

অপরাহ্নে কথা হচ্ছিল। কুমারবাহাদুর বললেন, একটা কথার সঠিক উত্তর দেবে?

সুভদ্রা দুটি চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরল।

আগে বল দেবে, তাহলে কথাটা বলব।

সুভদ্রা এবার মাথা নেড়ে তার নীরব সম্মতি জানাল।

এবার কুমারবাহাদুর বললেন, আচ্ছা, সকলেই একথা জানে যে মেয়েদের ওপর মেয়েদের ঈর্ষাটাই বেশি, তাহলে লক্ষ্মীবাঈএর জন্যে সকালে এমন করে তুমি ওকালতি করলে কেন?

কুমারবাহাদুর এই প্রশ্নটি তুলে তাঁর ওপর সুভদ্রার আকর্ষণের নিবিড়তাটুকু পরীক্ষা করে নিতে চাইলেন।

সুভদ্রা সম্পূর্ণ উলটো জবাব দিয়ে বসল ঃ দু'জনের স্বার্থ যদি একই জায়গাতে থাকে তাহলেই ঠোকাঠুকি লাগার সম্ভাবনা। লক্ষ্মীবাঈএর ওপর আমার ঈর্ষার কি কারণ থাকতে পারে বলুন?

কুমার অভিরাম নার্স ভার্গবের কথায় উৎসাহের কিছু দেখতে পেলেন না। কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। সুভদ্রা কুমারবাহাদুরের মনের সংঘাতের ছবিটুকু আঁচ করে নিয়ে বলল, আপনি খুবই দুষ্টুমি করছেন কুমারবাহাদুর। ফলের রসটুকু খাবার সময় ইচ্ছে করেই আপনি পার করে দিচ্ছেন। নাঃ, আমাকে দেখছি আপনি আর নার্সের চাকরিতে বহাল রাখতে চান না।

কুমার অভিরাম হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন। সুভদ্রার হাতখানা নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বললেন, চাই না তো। নার্সের কাজ তোমায় মানায় না।

সুভদ্রার বুকে আজ কিসের ধ্বনি জাগল। সে বাম হাতখানা টেনে নিল না। ডান হাত দিয়ে টিপয়ের ওপরে রাখা ফলের রসের কাপটা টেনে এনে কুমারবাহাদুরের মুখের কাছে তুলে ধরল। কোন কথাই কিন্তু বলতে পারল না সুভদ্রা।

ফলের রসের লোভটুকুর চেয়ে সুভদ্রার হাতখানা ধরে রাখার লোভ তখন প্রবল হয়ে উঠেছে কুমার অভিরামের কাছে। তাই হাত ছেড়ে কাপটা তুলে নিতে পারলেন না তিনি।

নার্স সুভদ্রাই ধীরে ধীরে এবার তার হাতখানা টেনে নিল। তারপর চামচেতে ফলের রসটুকু খাওয়াতে গিয়ে বলল, ক'দিন ধরেই তো হেঁটে চলে বেড়ানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন। এখন ডাক্তার গর্গ এসে যদি দেখেন, আপনাকে এখনও ফলের রসটুকু খাইয়ে দিতে হচ্ছে, তাহলে আপনার বিছানা ছাড়ার অর্ডার রদ হয়ে যাবে যে!

যদি বলি আমি তাই চাই। বিছানা ছাড়তে গেলে যদি আর একজনকে ছাড়তে হয়, তাহলে নাই বা ছাড়লাম বিছানা।

কথা শুনে এবার হেসে উঠল সুভদ্রা। বলল, ছেলেমানুষি করবেন না কুমারবাহাদুর। পুরুষ শক্ত পায়ে দাঁড়ালে তবেই তাকে মানায় ভাল।

ইতিমধ্যে কুমারমহলের কক্ষান্তরে আর একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল।

সুজন সিং ধরে রাখতে পারছিল না লক্ষ্মীবাঈকে। আজ নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগে ভাই বোন কুমারবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে এসে আড়াল থেকে যে দৃশ্য দেখেছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

লক্ষ্মীবাঈ এই মুহূর্তেই একটা ফয়সালা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। নার্সটার চুলের মুঠি ধরে সে পথে বের করে দিয়ে আসতে চায়। তার পরের বোঝাপড়া চলবে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে। কিন্তু সুজন সিং তাকে চুপিচুপি বোঝাচ্ছিল, অভিরাম যেহেতু এখন নার্সটার প্রেমে ডুবে আছে, সেহেতু এই মুহূর্তে আঘাত করতে গেলেই হিতে বিপরীত হবে। তখন এতদিনের সাজান ভাই বোনের স্বপ্নের প্রাসাদ মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। তার চেয়ে সুকৌশলে লাঠিকে অক্ষত রেখে কালনাগিনীর পাঁজর ভেঙে দেবার সুযোগ খুঁজে দেখা দরকার।

ভাইএর কথায় উত্তেজনা কিছুটা দূর হলেও চোখের জলের বান ডাকল লক্ষ্মীবাঈএর। এ আরও বিপদ। এখুনি কুমারবাহাদুরের কাছে গেলে লক্ষ্মীবাঈএর ভাবান্তরটুকু ধরা পড়ে যাবে। সুজন সিং বলল, তোমারই পথ করে দেবার জন্যে আমি হরিণের ললাট লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছি। বাইসনকে গুলি করে কুমারবাহাদুরকে রক্ষা করার কৃতিত্ব নিজে না নিয়ে তোমার ওপরই দিয়েছি। তুমি ভাল

করেই এসব জান, তবু সামান্য উত্তেজনার বশে সারা জীবনের সম্ভাবনাকে এমনি করে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছ কেন? জীবনে তুমি সুখী হও, আমি তোমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হই, আমাদের লক্ষ্য তাই নয় কি?

কিছু পরিমাণে শান্ত হল লক্ষ্মীবাঈ। কিন্তু দপদপ করে জ্বলতে লাগল মনের আগুন। সুজন সিং লক্ষ্মীবাঈকে সঙ্গে নিয়ে এবার ঢুকল কুমারবাহাদুরের ঘরে।

ঢুকতে ঢুকতেই সুজন সিং বলে উঠল, দেখ. দেখ লক্ষ্মীবাঈ, আজ একেবারে মেঘমুক্তি। কুমারবাহাদুরকে দেখে এখন কে না বলবে যে, শখ করে অবেলায় উনি শুয়ে রয়েছেন। রোগের কোন চিহ্নই তোমার চোখে মুখে আজ দেখা যাচ্ছে না অভিরাম।

একটু থেমেই সুভদ্রার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, হাঁ, সিস্টার সুভদ্রার সেবাই তোমাকে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলেছে। লক্ষ্মীবাঈ তো সুভদ্রার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি বলি, লক্ষ্মীবাঈ সেদিন বাইসনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে অভিরামের প্রাণ, আর জল হাওয়ায় তাকে সজীব করে তুলেছে সিস্টার সুভদ্রা।

এবার লক্ষ্মীবাঈএর দিকে ফিরে সহাস্যে বলল, কুমার তার প্রাণের জন্যে তোমাকে ষোল আনা প্রাপ্য দিতে রাজী থাকলেও, অন্তত চার আনা কৃতিত্ব সিস্টার সুভদ্রাকে তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত।

হাসল সকলে। সুভদ্রা কী যেন কাজ করছিল মাথা নীচু করে। এবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল। চোখে মুখে বিনীত হাসির আভাস। বলল, কি বলছেন আপনি, কার সঙ্গে কার ভাগের হিসেব?

তারপর লক্ষ্মীবাঈএর দিকে চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, উনি দিয়েছেন প্রাণ, প্রাণদানের সঙ্গে আর কোন দানের কি তুলনা চলে? সত্যি, সেদিন আপনি না থাকলে কি সর্বনাশটাই না ঘটে যেত।

এবার বেলাশেষের আলোর মত একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল সিস্টার সুভদ্রার মুখে। বলল, নিঃস্বার্থভাবে আমরা সেবা করতে পারি কই বলুন। রুটি রোজগারের বিনিময়ে আমাদের কাজ করে যেতে হয়। আমাকে আপনারা অনুগ্রহ করে এখানে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন, অন্য কোন নার্সকে ডাক দিলে সে এমনি করেই তার কর্তব্য করে যেত। সুতরাং নার্সদের বেশি আর কম পাওনার কথাই ওঠে না।

সুজন সিং আড়চোখে তাকিয়ে ছিল কুমার অভিরামের মুখের দিকে। তার কথা, আর ঠিক তার পরেই নার্স সুভদ্রার কথা কি প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন আঁকে কুমারবাহাদুরের চোখে মুখে, তাই দেখতেই সে ছিল ব্যস্ত।

কিন্তু কুমারের ললাটে নতুন পাঠ পড়ার সুযোগ সে পেল না, কারণ পাহাড়ী সন্ধ্যার মেঘ ততক্ষণে কুমারমহলে তার গভীর কালো ছায়া ফেলেছে।

আলো জ্বালতে যাচ্ছিল লক্ষীবাঈ। কুমারবাহাদুর বাধা দিয়ে বললেন, বোস লক্ষ্মীবাঈ। আজ আর বই-এর পাঠ ভাল লাগছে না। বরং এলোমেলো কিছু গল্পগুজব করা যাক।

লক্ষ্মীবাঈ-এর মুখ গম্ভীর হল, কিন্তু আলোকহীন ঘরে এবারও মুখের ছায়া কেউ দেখতে পেল না। বাইরে সহসা আকাশ ঘনিয়ে বৃষ্টি নামল। ঘন অন্ধকারে ঘর ভরে গেল।

কুমারবাহাদুর বললেন, একটা অন্ধকার ঘরের ভেতর কয়েকটা মানুষ এলোমেলো দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন সহজে তাদের চিনে খুঁজে নেওয়া যায় না, ঠিক তেমনি মনের ভেতর অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলে কোনকিছু ভাল করে বুঝে ওঠা যায় না লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। তার মনের ভাব কি তবে টের পেয়েছেন কুমার অভিরাম। কোন উত্তর না দিয়ে বসে রইল সে।

কুমার বলে চললেন, মাটিতে বীজ পড়ে বিনা যত্নে যে গাছ বেড়ে ওঠে তার অধিকাংশই হয় আগাছা। ভাল গাছ পেতে হলে যত্ন করতে হয়। উপযুক্ত সেবা না পেলে গাছ বাঁচবে কি করে। তাই সেবা যে করে এক অর্থে সে প্রাণ দেয়।

কথাটা যদিও উপমার আবরণ দিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন কুমারবাহাদুর, তবুও বুঝতে কারো বাকী রইল না কথার আসল লক্ষ্য কে বা কারা।

লক্ষ্মী তীরবিদ্ধ আহত পারাবত। পরোক্ষে কুমার অভিরাম প্রশংসা করছেন, প্রাণদাত্রী বলে বলতে চাইছেন নার্স সুভদ্রাকে। যে সেবা করে সে-ই বাঁচিয়ে রাখে। এরপর মনের ভাব প্রকাশের আর বাকী রইল কি।

নার্স সুভদ্রা ভার্গব বিব্রত ও ব্যথিত। সে বুঝতে পারছে লক্ষ্মীবাঈ-এর ব্যথা। অন্ধকারেও যেন মুক্তোর বিন্দুর মত উজ্জ্বল হয়ে লক্ষ্মীবাঈ-এর চোখের পাতায় ফুটে উঠতে দেখছে সে দুটি অশ্রুধারা।

সুজন সিং-এর মুখের ভাব কঠিন। বুঝি সামনের পাহাড়ের চেয়েও কঠিনভাবে সে লুকিয়ে রাখতে পারে তার ভাবভাবনা।

এরপর সুভদ্রাই প্রথম নীরবতা ভাঙল।

আমাকে এখন কিছু সময়ের জন্যে ছুটি দেবেন কি কুমারবাহাদুর? একটু বাজারে যাবার দরকার ছিল।

লক্ষ্মীবাঈ বলল, নিশ্চয়ই যাবে, দরকার হলে যেতে হবে বইকি।

অমনি সুজন সিং বলে উঠল, কোন্ বাজারে যাবে?

লাইব্রেরী বাজার, উত্তর করল সুভদ্রা।

তাহলে ত ভালই হল, আমার আজ ওখানে স্কেটিং-এ যাবার কথা। তোমাকে একটা লিফট্ দিতে পারি।

সারা মন প্রতিবাদ করে উঠলেও মুখ ফুটে সুভদ্রা তা উচ্চারণ করতে পারল না।

কুমারবাহাদুর বললেন, যদিও বৃষ্টি থেমেছে তবু মেঘ কেটে যায়নি। সুজনের গাড়িতেই তুমি চলে যাও তাড়াতাড়ি।

ওরা চলে গেলে ঘরে রইল দুজন। অভিরাম লক্ষ্মীবাঈ-এর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যাবার সময় সুভদ্রা আলো জ্বেলে দিয়েছিল।

লক্ষ্মীবাঈ নীরবে নতমুখে বসে ছিল। তার মনের ভেতর বাইরের প্রকৃতির ঝড় যেন ভেঙে পড়ছিল।

কি, চুপ করে বসে রইলে যে, আজ কিছু পড়বে না?

তেমনি মুখ না তুলেই লক্ষ্মীবাঈ মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, পড়তে তার ইচ্ছে নেই আজ।

কেন, কি হল তোমার লক্ষ্মীবাঈ, পড়তে ত তুমি ভালই বাস!

লক্ষ্মীবাঈ মুখ তুলল। মুখে তার মৃদু হাসি। বলল, কুমারবাহাদুর, আমাদের রাজস্থান কাহিনীর পদ্মিনী জহরব্রত করে সেদিন জীবনলীলা শেষ করেছেন। এর পর পাঠ কি করে সম্ভব বলুন?

কুমার লক্ষ্মীবাঈ-এর কথায় মনে মনে দুঃখ পেলেন। এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল লক্ষ্মীবাঈ তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছে। সঙ্গ দিয়ে, সেবা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে তাঁর মন। আজ সত্যি অকারণেই তিনি দুঃখ দিয়েছেন লক্ষ্মীবাঈকে।

উঠে বসলেন কুমারবাহাদুর। বললেন, আলোটা নিভিয়ে দেবে কি লক্ষ্মীবাঈ?

লক্ষ্মীবাঈ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে একবার তাকাল কুমার অভিরামের মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল।

এখন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এমনি কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর কুমারবাহাদুর বললেন, কোথায় তুমি লক্ষ্মীবাঈ?

একটা তরল হাসির ঝংকার উঠল : অন্ধকার ঘরে চেনা মানুষকে কি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় কুমারবাহাদুর।

নিজের কথার প্রতিধ্বনি কুমার শুনতে পেলেন লক্ষ্মীবাঈ-এর মুখে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। শব্দ লক্ষ্য করে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীবাঈকে স্পর্শ করে বললেন কুমারবাহাদুর, কিন্তু আমি তো খুঁজে পেলাম।

হাসির তরঙ্গ থেমে গেছে। লক্ষ্মীবাঈ কুমারের বুকে মুখ গুঁজে কান্নার বন্যায় ভেঙে পড়ল।

তোমার খুব টাকার দরকার, তাই না সুভদ্রা?

সুভদ্রা সুজন সিংএর দিকে না তাকিয়েই হেসে বলল, গাছপালা পশুপাখি ছাড়া টাকার দরকার বোধ করে না এমন কে আছে বলুন।

সুজন সিং কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, খুবই বুদ্ধিমতী তুমি সুভদ্রা, আর পাঁচজন নার্সের সঙ্গে এইখানেই তোমার তফাৎ।

আমাকে অকারণে বাড়িয়ে দেখবেন না। নিজেকে আমি অতি সাধারণ হয়ত ভাবতে পারি না, কিন্তু তা বলে অসাধারণ ভাবব এমন বোকা আমি নই।

সুজন সিং কথার মোড় ফেরাল ঃ আচ্ছা, মানুষের সেবা করতে গেলে মানুষের মন আর মেজাজের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় করতে হয়, তাই না?

এ প্রশ্নের সহজ একটা জবাব দিতে পারত সুভদ্রা। কিন্তু তার মনে হল, সুজন সিং যেন প্রশ্নের অতিরিক্ত কিছু জানতে চায়। কুমারবাহাদুরের সঙ্গে তার এই দীর্ঘ সাহচর্য সুজন সিংএর মনে কি কোন সন্দেহের ছায়া ফেলল।

সুভদ্রা হেসে বলল, ঘুড়ি যারা ওড়ায় সুতোর সঙ্গে হাতের কারবার করতে হয় তাদের ঠিক, কিন্তু চোখ তাদের সারাক্ষণ থাকে ঘুড়ির ওপরই। সেবা আমরা করি নিয়মমাফিক, কিন্তু চোখ রাখতে হয় রোগীর মেজাজ মর্জির ওপর।

সুজন সিংএর বুদ্ধির আয়নায় সুভদ্রার মতিগতির স্পষ্ট ছবি ফুটল না। তুমি বেড়াতে ভালবাস? সুজন সিংএর প্রশ্ন।

বেড়াতে কে না ভালবাসে বলুন। তবে নার্সদের বেড়ানোর সুযোগ বড় কম।

একটা প্রস্তাব রাখব তোমার কাছে?

সুভদ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সুজন সিংএর দিকে।

কাল সন্ধ্যের আগে কোম্পানিবাগের দিকে বেড়াতে আসবে?

সুভদ্রা কি যেন একটু ভেবে নিল, তারপর বলল, আসতে পারি। তবে সন্ধ্যে সাতটার ভেতরেই আমাকে ফিরতে হবে কুমারমহলে। ডাক্তার গর্গ আসবেন ঐ সময়।

সুজন সিং বলল, এতদিন তো রইলে এই অঞ্চলে, কিন্তু কাল এমন একটা জায়গা দেখাব যা আগে কখনো দেখেছ বলে হয়ত বলতে পারবে না।

সুভদ্রা বলল, এখন থেকেই সেজন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি।

হাসল দুজনে। গাড়ি ততক্ষণে লাইব্রেরি বাজারে এসে গেছে। নেমে গেল সুভদ্রা। যতক্ষণ না বাজারের ওপরে উঠে গেল সে ততক্ষণ তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল সুজন সিং।

না, কোনরকমেই সুভদ্রা এড়িয়ে চলবে না সুজন সিংকে। সে এখুনি ইচ্ছে করলে আঘাত করতে পারে ঐ মানুষটাকে, কিন্তু তাতে সুভদ্রার জীবনে ঐ সাংঘাতিক লোকটি চিরদিনের একটা শনিগ্রহ হয়ে রইবে। তার চেয়ে সহজ বন্ধুত্বের দুচারটি বাণী-বিনিময় ভাল। এতে আক্রোশ অথবা ঘনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ি হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

পরদিন কুমারমহল থেকে একসঙ্গে বেরোতে দেখা গেল না সুজন সিং আর সুভদ্রাকে।

সুভদ্রা দিনের কাজ শেষ করল। আজ সারাটা দিন সে কুমারবাহাদুরকে কেমন যেন গম্ভীর আর আনমনা দেখল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনের দু'একটা কথাই শুধু হচ্ছিল।

আজ সুভদ্রা তাই মুখ বুজে নীরবে কাজ করে গেল। মনে মনে সে ভাবল, রাজা মহারাজাদের কখনোসখনো খেয়াল হয় সাধারণ মানুষকে নিয়ে দু'দণ্ড খেলা করতে। সুভদ্রা আজ নিজেকে তার

চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারল না। তার মন কেমন যেন এক ভারহীন শূন্যতা বোধ করল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিল এই ভেবে যে, তার দিক থেকে এমন কোন দুর্বলতা সে প্রকাশ করেনি যা তার মনকে গ্লানিতে ভরে দেবে।

আজ অপরাহ্নের আকাশ আলোয় আলোয় ভরে উঠেছিল। মেঘগুলো হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মত আকাশ থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছিল।

ইচ্ছা করেই আজ উত্তরের জানালাটা খুলে দিল সুভদ্রা। দূরে পাহাড়ি রাজ্যের ওপারে তুষার-সাম্রাজ্য। এ যেন আর এক জগৎ, অন্য কোন রূপলোকের আভাস। কুমার অভিরাম আজ উঠে বসার জন্য সুভদ্রাকে কিছু বললেন না। তিনি শুয়ে শুয়েই পাহাড়, বন আর তুষারের শোভা দেখতে লাগলেন।

আজ অনেক আগেই এসে গেল লক্ষ্মীবাঈ। ইন্দ্রাণীর মত ঘরে এসে ঢুকল। হাতে একখানা বই। চেয়ারখানা টেনে নিয়ে সে বসল একেবারে কুমারবাহাদুরের শিয়রে।

আজ শত চেষ্টায় রোজকার কাজগুলোকে যেন সেরে তুলতে পারছিল না সুভদ্রা। এই পরিবেশ থেকে এই মুহূর্তেই সে যেন বেরিয়ে যেতে চাইছিল। কাজ শেষ হলে সুভদ্রা বিনীতভাবে বলল, ডাক্তার গর্গের আসতে এখনও অনেক দেরি। আমি কি এই সময়টুকু বাইরে যেতে পারি?

গত দিনের মত আজ আর লক্ষ্মীবাঈ কিছু বলল না। কুমার অভিরাম কি যেন ভেবে নিলেন, তারপর বললেন, সারাদিন এক ঘরে একজন অসুস্থ মানুষের কাছে থাকলে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। কিছুটা বাইরের আলোবাতাস তোমার চাই বইকি সুভদ্রা।

চলে যাচ্ছিল সুভদ্রা, পেছন থেকে ডাক দিয়ে কুমারবাহাদুর বললেন, ডাক্তার গর্গের আসার আগেই চলে এস কিন্তু।

সুভদ্রা ফিরে না তাকিয়ে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফেটে পড়ল লক্ষ্মীবাঈ ঃ এতটুকু শিষ্টাচার জানে না। সাধারণ, অতি সাধারণ। আপনার কথার জবাবটুকু ফিরে দাঁড়িয়ে দেবার প্রয়োজনও বোধ করল না।

লক্ষ্মীবাঈএর কথায় কুমার অভিরামের চোখে মুখে কোনরকম বিরক্তি বা উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেল না। অভিরাম সোৎসাহে বললেন, সেই মরুবধূর কাহিনী শোনাও যে তার দূর-প্রবাসী প্রিয়তমের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। সেই সালহ্‌কুমার আর মারবানীর বিরহগাথা।

লক্ষ্মীবাঈ পড়তে লাগল ঃ পুষ্করতীর্থে তীর্থযাত্রায় এসেছিলেন রাজা নল। সঙ্গে ছিল শিশুপুত্র। দারুণ মন্বন্তরে সে বছর রাজস্থানের মরুকবলিত পশ্চিমপ্রান্ত কম্পিত হচ্ছে। পুগলের অধিপতি পিঙ্গল রায়ও তপ্ত বালু তাড়িত হয়ে এসেছেন শিশুকন্যা মারুকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্করের শান্তসলিলা হ্রদের তীরে।

তারপর পরিচয় হল দুই পরিবারে। সামাজিক প্রতিপত্তিতে মহারাজা নলের সঙ্গে মরুবাসী সামান্য ভূস্বামী পিঙ্গলের কোন তুলনাই চলে না। তবু প্রজাপতির লীলা। নলের শিশুকুমারের সঙ্গে পুগল-রাজকন্যার বিবাহ সম্পন্ন হল। তারপর যে যার পুত্র কন্যা নিয়ে ফিরে গেলেন নিজ নিজ রাজ্যে। কথা রইল, বয়োবৃদ্ধিকালে বর-বধূ পরস্পরের সাক্ষাৎ হবে।

কিন্তু পুত্র সালহ্‌কুমার যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হল তখন প্রথম বিবাহের কথা সম্পূর্ণ গোপন করে মহারাজ নল মালবপতির রূপবতী কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন।

অন্যদিকে পুগলের মরূদ্যানে ফুটে উঠছিল আশ্চর্য এক পুষ্প। যৌবনের প্রতিটি দল বিকশিত করে সে বসে ছিল সমর্পিত হবার আশায়। কিন্তু ভৃঙ্গ এলো না। আশাপথ চেয়ে তার দিন কাটে। কবে আসবে চতুর্দোলা মারবার নগরী থেকে। তাকে নিয়ে যাবে প্রিয়সমাগমে। কিন্তু নলের রাজ্য থেকে এলো না কোন বধূ-বরণের রথ, এল না সামান্য কোন সংবাদ। শুধু পুগল-রাজকন্যার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তপ্ত মরুর জ্বালা এসে মিশে যেতে লাগল।

ওদিকে প্রতিটি ঋতু পুষ্পের সৌরভ নিয়ে আসে সালহ্‌কুমার আর মালবকুমারীর নবপরিণীত জীবনে। প্রেমের সরোবরে হংস-হংসীর লীলায় ভেসে চলে তাদের বিবাহিত দিনগুলি।

শেষে একদিন গোপনসূত্রে খবর পান যুবরাজ সালহ্‌কুমার তাঁর মরুবাসিনী বধূ সম্বন্ধে। তখন শুরু হল তাঁর যাত্রা। মরুভূমির ওপর দিয়ে বহু দুঃখ ভোগের পর তিনি মিলিত হন তাঁর প্রতীক্ষাকাতরা বধূ মারবানীর সঙ্গে।

কাহিনী শেষ করে থামল লক্ষ্মীবাঈ। কুমার চেয়ে রইলেন জানালার বাইরে। কুয়াশার একটা পাতলা আবরণ ততক্ষণে আধো ঘোমটায় রহস্যময় করে তুলেছে পাহাড় আর দেওদারের বনশ্রেণী।

কুমারবাহাদুরের মনে হল সামান্য কোন এক পর্বতকন্যা হয়ত মনে মনে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। নিজের মুখ ফুটে মনের কথাটুকু জানাবার ক্ষমতা তার নেই। শুধু সারাদিনের সংসারকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তার মন প্রিয়-মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে।

অভিরাম ভাবতে থাকেন, তিনি কি কাউকে বঞ্চিত করেছেন। সহসা একটা মুখ কুয়াশার ঘোমটার ভেতর থেকে আধফোটা পদ্মের মত ভেসে ওঠে। চমকে ওঠেন কুমারবাহাদুর। এ মুখ যে তাঁর বহুচেনা বলে মনে হচ্ছে। সুভদ্রা, হাঁ সুভদ্রার মুখখানাই তো তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

কি ভাবছেন কুমারবাহাদুর? ডাক দিল লক্ষ্মীবাঈ।

সংবিৎ ফিরে এল অভিরামের। মৃদু হেসে বললেন, ও কিছু নয় লক্ষ্মী, একটা আধভোলা স্বপ্ন।

লক্ষ্মীবাঈ ঘর থেকে উঠে গেল বাগানে। এক গুচ্ছ গোলাপ নিয়ে এসে কুমার অভিরামের হাতে দিয়ে বলল, আজ ভারী ভাল লাগছে আপনার হাতে এই গোলাপগুচ্ছ তুলে দিতে।

কুমার বললেন, বড় ভয় পাই লক্ষ্মীবাঈ কারো হাত থেকে কোনকিছু নিতে। কিছু পেলেই তাকে রাখতে হয় তার যথাস্থানে। কিন্তু এত পেয়েছি জীবনে, বুঝি এখন আর আমার রাখার ঠাঁই সংকুলানই হয় না। তবু কারো ভালবাসার দান অনাদরে ফিরিয়ে দিতে পারি কই।

লক্ষ্মীবাঈ কুমারবাহাদুরের এই কথায় যেমন ভবিষ্যৎ জীবনের আশ্বাস কিছু পেল না, তেমনি একেবারে আশা ছেড়ে দেবার মতও কোনকিছু দেখতে পেল না।

প্রেমের এক গোলকধাঁধার ভেতর লক্ষ্মীবাঈ ক্রমাগত ঘুরতে লাগল। এ যেন মেঘবাহন বর্ষাঋতু। রোদের ছোঁয়া সারা অঙ্গে লাগতে না লাগতেই বাদলছায়া ঘনিয়ে এল।

লাইব্রেরি বাজার থেকে পথটা কোম্পানিবাগের দিকে বরাবর চড়াইতে উঠে গিয়েছে। চড়াই যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি ছায়াচ্ছন্ন জায়গা। পাশেই একটি কনভেন্ট স্কুল। রোববার বন্ধের দিন। এই কনভেন্ট স্কুলের পর থেকেই উতরাই শুরু। স্কুলের পাশে একটা পাইনগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল সুজন সিং। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সে তাকিয়ে ছিল লাইব্রেরি বাজার থেকে উঠে আসা পথটার দিকে। না, সুভদ্রা নির্দিষ্ট সময় পার হতে দিল না। যথাসময়েই তাকে দেখা গেল কনভেন্টের দিকে উঠে আসতে। সুজন সিং গাছের আড়াল থেকে দেখছিল। দেখছিল সুঠাম এক রমণীদেহ। উন্নত, সম্ভ্রান্ত আর নির্বিকার। ভাবছিল সুজন সিং, অনেক নারীকে সে সঙ্গ দিয়েছে, পেয়েছেও বহু নারীর সঙ্গ, কিন্তু এ নারী যেন একটু স্বতন্ত্র ; তাদের সঙ্গে এই সামান্য নার্সটির কোথায় যেন বেশ খানিকটা পার্থক্য থেকে গেছে। একে জয় করা কঠিন, তার চেয়েও কঠিন একে ত্যাগ করা।

কাছে এসে চারদিকে একবার তাকাল সুভদ্রা। চড়াই ভেঙে ওপরে উঠে আসতে সে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তার মুখে ফুটে উঠেছিল কয়েকটি সুন্দর স্বেদবিন্দু। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সুজন সিং। কেমন এক বিস্ময়ের হাসি হেসে বলল, অপরাধ নিও না, আমি আবাক হয়ে তোমার দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। ভগবানের যে কারো কারো ওপর পক্ষপাতিত্ব আছে তা তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়।

একটু থেমে বলল, ঐ যে তোমার মুখের স্বেদকণাগুলো, ঠিক যেন মুক্তোর দানার মত কেউ সাজিয়ে দিয়েছে বলে ভ্রম হয়।

মুখটা রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল সুভদ্রা।

সুজন সিং অমনি বলে উঠল, ভাল লাগার জিনিসকে এত সহজে মুছে ফেলতে চাইলেই কি মোছা যায়!

আবার হাসল সুভদ্রা। বলল, আপনার মত সুন্দর করে সবাই কি কথা বলতে পারে। তাই আপনার কথার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব বলুন।

সুজন সিংএর কথার জবাব সুভদ্রা এমনি করে এড়িয়ে গেল।

সুজন সিং এবার কুমারবাহাদুরের খবর নিতে গিয়ে বলল, তোমার রোগী কেমন আছে সুভদ্রা? সে আজ এত তাড়াতাড়ি তোমাকে ছেড়ে দিলে।

আমি তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিয়েই এসেছি। আর তাছাড়া আপনার বোন লক্ষ্মীবাঈও এসে গিয়েছেন, তাই নিশ্চিন্তে আসতে পারলাম।

সুজন সিং এবার তীর ছুড়ল ঃ জান সুভদ্রা, আমার মনে হয় কুমার লক্ষ্মীবাঈএর সঙ্গে ভালবাসার খেলায় মেতেছে। কখনো দূরে সরিয়ে দেয়, আবার কখনো কাছে টানে। এ ওর এক খেয়ালের খেলা। আর এই জন্যেই আমার ভয়। অভিরাম এক জায়গায় কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

সুভদ্রা তাকিয়ে ছিল সুজন সিংএর দিকে। কিন্তু সে তলিয়ে গিয়েছিল তার মনের গভীরে। একটি মানুষ যেন পেছন থেকে এসে তাকে চমকে দিয়েই হেসে উঠল। তারপর কখন একটা হাতের কয়েকটা বলিষ্ঠ আঙুল তার হাতখানাকে মুঠো করে ধরল। সে ছাড়াবার চেষ্টা করল না। তার মনে হল, এমনি অনন্তকাল ধরে সে যদি বসে থাকতে পারত।

সুভদ্রা অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সুজন সিংএর তীক্ষ্ণ চোখে তা এড়াল না।

মাঝে মাঝে তোমার এই হঠাৎ হারিয়ে যাবার ভাবটা আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে। কথা ক'টি বলে হাসতে লাগল সুজন সিং।

ক্ষমা করবেন। সত্যিই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

নিজের আচরণে অপ্রস্তুত হল সুভদ্রা।

হেসে বলল সুজন সিং, রোগীর কাছে এমনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে সে বেচারার দশাটা কি হবে ভেবে দেখেছ কি?

এবার হেসে উঠল দু'জনেই। হাসি থামলে সুভদ্রা বলল, হাঁ, কি যেন এক অভিনব জিনিস আজ আপনি আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন না।

সুজন সিং কেমন যেন ভাবনার ভান করল, তারপর অনেক ভেবে যেন বলল, নাই বা গেলে সেখানে সুভদ্রা। একটি মানুষের ওপর শ্রদ্ধা ভালবাসা সবই হারাবে। না, না, সে আমি হতে দেব না। আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার আমন্ত্রণ।

রহস্যের গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে সুভদ্রা।

সে একটু অবাক হয়েই বলল, শ্রদ্ধা, ভালবাসা হারাব কার ওপর?

যে মানুষকে তুমি শ্রদ্ধা কর, ভালবাস, বলল সুজন সিং।

মনে মনে কি যেন চিন্তা করল সুভদ্রা, তারপর বলল, যাকে শ্রদ্ধা করা যায়, তার ওপর থেকে ও দুটো জিনিস সহসা সরিয়ে নেওয়া যায় না বলেই আমার ধারণা।

অনেক সময় আমাদের অনেককিছু ধারণাই ভুল বলে প্রমাণিত হতে দেখা গেছে।

চুপ করে গেল সুভদ্রা। এরপর এই কথার সূত্র ধরে বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।

সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলল সুজন সিং ঃ আচ্ছা, ওকথা থাক, অভিশাপ বস্তুটিতে বিশ্বাস আছে তোমার?

সহসা এরকম অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না সুভদ্রা। একটু ভেবে বলল, এ বিষয়ে আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

অভিজ্ঞতার কথা নয় সুভদ্রা, বিশ্বাসের কথা। তুমি কি এই শাপশাপান্তের ব্যাপার বিশ্বাস কর?

যা আমার জীবনে কোনদিন ঘটেনি তাকে হয় না বলে উড়িয়ে দেব এমন অবিশ্বাসী আমি নই।

আমি এতক্ষণ তোমার কাছ থেকে এইটুকু কথাই জানতে চাইছিলাম। তুমি অন্তত আর পাঁচজনের

মত ঘোর অবিশ্বাসে সবকিছুকে উড়িয়ে দেবে না এ ধারণা আমার না হলে তোমাকে আমি সে জায়গায় কেমন করে নিয়ে যাই আর কেমন করেই বা সে কথা বলি।

এবার সুজন সিং পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে কিছু আগে অদৃশ্য হয়েছে। কয়েক খণ্ড লাল মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে আছে আকাশে।

তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আসতে পার আমার সঙ্গে।

এই মুহূর্তে সমস্ত পরিস্থিতি সুভদ্রার যাওয়ার প্রতিকূলে মত প্রকাশ করল, কিন্তু প্রবল একটা ইচ্ছাশক্তি সামনে টেনে নিয়ে চলল তাকে। শক্তি তার কৌতূহলী মনের অথবা সামনে যে মানুষটা চলেছে তার, সে কথা সুভদ্রা বুঝে উঠতে পারল না।

ওরা নামতে লাগল উতরাইএর পথে। এসব জায়গায় সূর্যাস্তের আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। দীর্ঘ ঋজু পাইনের বন প্রায়ান্ধকারে সারি সারি মানুষের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট গুল্ম আর ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে কত রকমের পতঙ্গ ডাকছিল। সন্ধ্যার দিকে জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছিল। উত্তুরে হাওয়া। শনশন একটা আওয়াজ কানে আসছিল। মনে হচ্ছিল এই পাহাড়ি অরণ্যের গাছে গাছে কি যেন মন্ত্রণা চলেছে।

ওরা খুব সাবধানে নামছিল। একসময় সুজন সিং থেমে বলল, আমার হাত ধর সুভদ্রা, আবছা আলোয় এই সরু পথটুকু পার হতে তোমার আসুবিধে হবে।

কোন কথা না বলে সুভদ্রা সুজন সিংএর দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর প্রায় অন্ধের মত কি করে যে দুটি পাহাড়ের মাঝের সংকীর্ণ সংযোগ সেতুটি পেরিয়ে এল তা সুভদ্রা ভাবতেও পারল না।

এপারের পাহাড়টায় এসে সুভদ্রার অবাক হওয়ার পালা। কোথাও বসতির চিহ্নমাত্র নেই। নির্জন নিস্তব্ধ বিরাট জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাসাদ। কোথাও বিদ্যুতালোকের রেখামাত্র ছিল না। কিন্তু আকাশের চাঁদ ওপরের পাহাড়ের মাথায় ততক্ষণে উঠে এসেছে। কুয়াশায় ভেজা চাঁদের ম্লান আলোয় ঐ নির্জন প্রাসাদ আশ্চর্য রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল।

এস সুভদ্রা, সুজন সিংএর গলা শোনা গেল। সেই ছোট দুটি শব্দ নির্জন জায়গায় প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। সুভদ্রা সেই ডাকে প্রথমে চমকে থমকে দাঁড়াল। সে কান পেতে শুনতে পেল, ঐ প্রাসাদের বড় বড় থামের আড়াল থেকে কে যেন তার ঐ নামটা ধরে বার বার ফিরে ফিরে ডেকে চলেছে!

সুভদ্রাকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে পিছু হটে এল সুজন সিং।

ভয় পেলে বুঝি, এই তো আমি রয়েছি তোমার পাশে।

আত্মসম্মানে একটু ঘা লাগল সুভদ্রার। সে হাসিতে পরিস্থিতিকে লঘু করে দিয়ে বলল, না না, ভয় কিসের, কোথায় যাবেন চলুন।

ওরা বাঁধান রাস্তার ওপর দিয়ে প্রাসাদটার দিকে এগোতে লাগল। কাছে গিয়ে সুভদ্রা তাকিয়ে দেখল, গম্বুজওয়ালা বিরাট এক অট্টালিকা। যে পথটা ধরে সুভদ্রা উঠে আসছিল তার পাশে কয়েক গজ দূরে দূরে ছিল কতকগুলি আলোকস্তম্ভ। সেই স্তম্ভের সারি শেষ হয়েছিল প্রাসাদের ঠিক সামনেই। সুভদ্রার মনে হল কে যেন বিপুল এক ফুৎকারে সব কটা আলোকে নিভিয়ে দিয়েছে।

সুজন সিং বলল, চল সুভদ্রা আমরা আর এক ধাপ ওপরে উঠে গিয়ে বসি।

প্রাসাদের দক্ষিণপ্রান্তে তারা চলে এল।

একটি সুন্দর ফারগাছ ঘিরে সিমেন্টবাঁধান বেদী।

সুজন সিং সুভদ্রাকে তার ওপর বসতে ইঙ্গিত করে নিজে বসে পড়ল। সুভদ্রা খানিক দূরে বসে তাকিয়ে রইল আজকের রাতের নায়ক সুজন সিংএর দিকে।

পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন একটি রাত। চাঁদের আলো কুয়াশার পাতলা মসলিনখানা ভেদ করে তার উজ্জ্বল আলো ক্রমে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ফারগাছের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রাসাদখানা চাঁদের আলোয় কেমন এক বিস্ময়পুরী বলে মনে হতে লাগল।

শুধু তোমার, আমি শুধু তোমার হীরাবাঈ।

গুরুত্বহীন একটা উচ্ছ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মহিলা।

মনে হল কথাগুলোর যথার্থ অর্থ বা কুমারবাহাদুরের আবেগের উত্তাপ তেমন করে হীরাবাঈকে স্পর্শ করল না।

তবু কেমন যেন এক খুশির ঢেউ বয়ে গেল। যেন ভারি ভাল লেগেছে। বার বার করে উচ্চারণ করতে লাগলেন কুমার বাহাদুরের দেওয়া নামটা।

এরপর তাঁর একটা কথা মনে এল। কুমার অভিরাম তাঁর নামটাকে কেমন মধুর করে উচ্চারণ করেছেন। এমনি করে ডাকলে বুঝি সবকিছুই ভাল লাগে। কেমন একটা মিষ্টি সুর, কোমল ধ্বনি।

এই নামের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটি চেহারাও ফুটে উঠতে লাগল তাঁর ভাবনায়। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সদাশয় একটি মানুষ। তরুণী নান অভিরামের দিকে খুশির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

অভিরাম চলে গেলেন বাগানের এক প্রান্তে। একটি গোলাপ তুলে এনে বললেন, হীরাবাঈ আজ প্রথম তোমার নাম ধরে ডাকলাম, তাই আজকের দিনটা এই গোলাপ দিয়ে স্মরণীয় করে রাখতে চাই।

হীরাবাঈ মৃদু হেসে গোলাপটি হাতে নিয়ে বললেন, খুব সুন্দর। যেমন কোমল তেমনি পবিত্র। ঠিক তোমারই মত অভিরাম।

কুমার মনে মনে সংকুচিত হলেন। জীবনে সত্যিকারের পবিত্রতা কাকে বলে তা তিনি কোনদিন অনুভব করেছেন বলে মনে আনতে পারলেন না।

আজ এই তরুণী নানের মুখে তাঁর সম্বন্ধে পবিত্রতার কথাটি ওঠায় নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হল তাঁর।

কুমার অভিরাম একটু হেসে বললেন, ওটি ফুল নয়, আয়নার বুকে একটি প্রতিবিম্ব। তোমারই প্রতিবিম্ব পড়েছে ওখানে।

হীরাবাঈ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। নিজের মনের গভীরে যেন অভিরামের কথাটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তারপর একসময় বললেন, সুভদ্রা কোথায় অভিরাম?

সে গেছে ল্যাণ্ডোর বাজারে।

আমি ল্যাণ্ডোর বাজারে তার কাছে যেতে চাই।

কেন?

আমার খুবই ইচ্ছে করছে এখুনি ওকে এই ফুলটা দিই।

অভিরাম হেসে বললেন, অদ্ভুত তোমার ইচ্ছে।

সে কথার কোন জবাব দিলেন না হীরাবাঈ। শুধু বললেন, এমন সুন্দর একটা উপহার ওরই পাওয়া উচিত। ও খুব ভাল মেয়ে, বড় দয়ালু।

সুভদ্রাই তোমার ল্যাণ্ডোরে যাওয়া মানা করে দিয়েছে। তুমি এখনও তোমার সবটুকু বল ফিরে পাওনি।

আমি তাহলে যাব না অভিরাম। ওর কথা আমাকে শুনতেই হবে।

তারপর একটু থেমে বললেন, ওর কথা সবাইকে শুনতে হবে। তুমি শোন না ওর কথা?

খু-উ-ব। না শুনে উপায় আছে।

খুশি আর তৃপ্তির একটা ছবি ফুটে উঠল হীরাবাঈএর চোখেমুখে। সুভদ্রা যে সত্যিই ভাল, তাকে যে সকলের ভাল লাগে, এ খবরটুকু হীরাবাঈএর মনের ওপর প্রবলভাবে রেখাপাত করল।

হীরাবাঈ এবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। কুমারমহলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল একটি রোডোডেনড্রন গাছ। সবুজ পাতার ফাঁকে লাল রোডোডেনড্রন ফুল ফুটে আছে। কয়েকটা পাখি জটলা করছিল ডালের ওপর।

হীরাবাঈ বললেন, তুমি ঐ বৃক্ষের মত অভিরাম। তেমনি ঋজু, বলিষ্ঠ, আশ্রয়দাতা আর শোভন সুন্দর।

আমাকে এত বড় করে দেখো না হীরাবাঈ। অনেক অন্যায়, অনেক পাপ, আমার রক্তের ভেতর বাসা বেঁধে রয়েছে।

তুমি নিজেকে এমন ছোট করে ভাবলে আমার খুব কষ্ট হয় অভিরাম। আমার কিন্তু তোমাকে এতটুকু খারাপ বলে মনে হয় না।

তারপর অভিরামের আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তাকাও তো দেখি আমার দিকে।

কুমার স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন হীরাবাঈএর দিকে। এদিক-ওদিক মাথা দুলিয়ে হীরাবাঈ কি যেন দেখে বললেন, কখখনো না, এমন সুন্দর সোজাসুজি চেয়ে থাকতে পারে না পাপীরা। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে অভিরাম।

এবার কুমারবাহাদুর কৌতুক করে বললেন, আমাকে তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে কি?

স-ব-চে-য়ে।

হীরাবাঈ অনেক দীর্ঘ করে টেনে বললেন কথাগুলো।

মুগ্ধ কুমার বললেন, সত্যি!

একটা হাসির তরঙ্গ উঠল। চমকে ফিরে তাকিয়ে দুজনে দেখল কখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সুভদ্রা। চোখে মুখে তার উজ্জ্বল হাসির আভাস তখনও মুছে যায়নি।

কেন যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন কুমার অভিরাম।

হীরাবাঈ এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরলেন।

কপট ক্রোধে সুভদ্রা বলল, এত যে রাত জেগে সেবা করলাম, তার বুঝি এই পুরস্কার। নেবার সময় একজনের কাছ থেকে নিলে, আর দেবার সময় উজাড় করে দিলে অন্যজনকে।

যেন খুবই বিব্রত হলেন হীরাবাঈ। ব্যস্ত হয়ে বললেন, তুমি আমার কথায় খুব দুঃখ পেলে কি সুভদ্রা?

ভী-ষ-ণ, খু-উ-ব। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে সারাজীবন আড়ি করে দিই।

কি করবে বুঝতে না পেরে হীরাবাঈ দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল বুঝি কিছু একটা অন্যায় করে ফেলেছেন। তাছাড়া সবচেয়ে তাঁর খারাপ লাগল এই ভেবে যে তিনি যাকে সত্যিকারের ভালবাসেন তাঁকে তিনি আহত করেছেন।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হীরাবাঈএর চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল।

সুভদ্রা অমনি বলে উঠল, সে কি, আমার কথাগুলোকে একেবারে সত্যি ভেবে বসলে নাকি! নাঃ, তোমার আসল চিকিৎসার এখনও অনেক বাকি!

এবার হীরাবাঈকে দু'হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল সুভদ্রা, তুমি আমাকে ভালবাস, ভালবাস, ভালবাস। এত ভালবাসা কেউ কাউকে কখন দিতে পারেনি আর পারবেও না।

সুভদ্রার কথায় হীরাবাঈএর মনের মেঘটুকু কেটে সমস্ত হৃদয় নীল আকাশের মত নির্মল হয়ে গেল।

হীরাবাঈ বললেন, তুমি বড় ভাল আর করুণাময়ী।

সুভদ্রা মনে মনে বলল, আমি করুণাময়ী কিনা জানি না, তবে তোমার হাতে যা তুলে দিলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন।

অভিরামের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার সৌভাগ্য, এমন রত্ন বিধাতা আপনার কাছে এনে দিয়েছেন। এ আপনার সমস্ত কুমারমহলের কল্যাণলক্ষ্মী।

কুমার অভিভূত হয়ে বললেন, একে তুমিই তো আমার কাছে এনে দিলে সুভদ্রা। তোমার সেবা না পেলে সবই তো ব্যর্থ হয়ে যেত।

দুষ্টুমীতে পেল সুভদ্রাকে। অমনি দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দিন, আমার এত বড় দানের প্রতিদান দিন। কত বড় স্বার্থ ত্যাগ করে দিলাম বলুন।

অভিরাম বললেন, চিরজীবন তুমি আমাকে ঋণী করে গেলে। তুমি আমাকে তোমার সবকিছুই দিলে, কিন্তু আমি তোমাকে সামান্য কিছু দিতে গেলেই তুমি দূরে সরে গেলে। চিরদিন মীনারের ওপরেই রইলে সুভদ্রা, নীচে নামলে না।

সুভদ্রা সেখানে আর দাঁড়াতে পারল না। সামান্য ফুল তোলার অজুহাতে সে তার চোখের জলটুকুকে আড়াল করবার জন্য বাগানের এক প্রান্তে চলে গেল।

এই সামান্য সময়ে জীবনের কয়েকটি পুরনো পাতা এলোমেলো হাওয়ায় উড়ে এসেছিল। অভিরাম আর সুভদ্রার সেই পাতার ওপর হয়েছিল চারিচক্ষের মিলন। মুহূর্তের সেই দেখা, তবু স্মৃতিটুকু অনাগত দিনগুলিকে স্পর্শ করে রইল।

না, সুভদ্রা আজ কিছুতেই তার মনকে আচ্ছন্ন হতে দেবে না। অভিরাম যদি এই মেয়েটিকে জয় করতে পারে তাহলে সে সত্যিই সুখি হবে। আর সুভদ্রা চিরদিনই তো প্রার্থনা করে এসেছে অভিরামের মঙ্গলের জন্য।

সে ভাবল, আজ সে প্রেমের পরীক্ষায় হেরে যাবার বদলে অনেক বেশি করেই জিতে গেল।

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। দিনান্তের গোলাপী আভাটুকু দূরের তুষার পাহাড় থেকে তখনও মুছে যায়নি। তদ্‌গত হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলেন হীরাবাঈ। সমস্ত দেহে যেন কিসের শিহরন বয়ে যাচ্ছিল। পায়ে পায়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল সুভদ্রা। কোন কথা না বলে সেও তাকিয়ে রইল ঐ দিনান্তের সমারোহের দিকে। যখন ছায়া নামল, তুষারের ছবি অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল তখন দু'জনে পাশাপাশি ফিরে এল ঘরের ভেতর।

আলো জ্বলছে। দরজার ঠিক ওপরে অবলোকিতেশ্বরের একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি। তারই তলায় কারুকার্যখচিত আলোকদান। উজ্জ্বল নীলাভ একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। ফিকে হলুদ রঙের একগুচ্ছ ফুল লাল পলতোলা কাচের একটি ফুলদানিতে রাখা আছে বুক-শেলফএর ওপর। আপন মনে একখানা বইএর পাতা ওল্টাচ্ছিলেন অভিরাম। দু'জনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে বলে উঠলেন, কি হল, দুই সখিতে কিছু মতলব এঁটেছ নাকি?

সুভদ্রা বলল, যে মানুষ সবসময় হেরেই আছে, তাকে আবার যুক্তি করে হারাতে যাব কোন দুঃখে?

হার আবার কার কাছে কখন মানলাম?

সুভদ্রা ওপরদিকে একটা আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ ওপরে যিনি বসে পুতুলনাচের সুতো টানছেন, সেই ওপরওয়ালা খেলোয়াড়টির কাছে।

একটু থেমে বলল, আপনি এতদিন জীবনটাকে যেরকম করে গড়তে চেয়েছিলেন, বিধাতাপুরুষ আপনার গড়া পুতুলগুলোকে ভেঙে দিয়ে বললেন, এমনি করে সুতো ধরে এমনি সুন্দর পুতুল নিয়ে জীবনের খেলা খেলতে হয়। হার হয়েছে আপনার ঠিক। কিন্তু হেরে গিয়েও আপনি বড় রকমের একটা জিতে গেছেন। তাই নয় কি?

তোমার এ প্রশ্নের হাঁ, না, কোন জবাবই আমি দিতে পারব না। যেমন একদিকে জয়ের আনন্দ আমার মন ছুঁয়ে যাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে হারানোর হাহাকারও আমাকে কম আহত করছে না।

সুভদ্রা এবার হীরাবাঈএর দিকে ফিরে বলল, চল সখি, অকারণে এ কথার জালে তোমাকে জড়াব না! আমার রুটিনের কাজগুলো এখন আমাকে করতে দাও।

সাঁঝের খাবার খাচ্ছিলেন হীরাবাঈ, পাশে বসেছিল সুভদ্রা।

হীরাবাঈ বললেন, আজ কেন জানি না অন্য দিনের চেয়ে সুস্থ বোধ করছি।

সুভদ্রা বলল, আজ কিন্তু তোমার শরীর আর মন দুদিকেরই কষ্ট হয়েছে বেশি।

আমি তো কই কিছু বোধ করতে পারছি না সুভদ্রা!

মনের একটা অবস্থায় বোধকরি কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয় না।

হীরাবাঈ বললেন, তাই বুঝি।

এক প্লেট ফল এগিয়ে দিয়ে সুভদ্রা বলল, কুমারবাহাদুর আমাকে বড় একটা বিপদে ফেলেছেন।

বিস্মিত হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকালেন হীরাবাঈ।

হাঁ, খুবই বিপদে ফেলেছেন। আজ বাজারের পথে ঘরে গিয়েছিলাম। একটা চিঠি এসেছে বোম্বে থেকে। বেশ ক'দিন চিঠিখানা এসে পড়ে আছে, আর আমি নিশ্চিন্তে রয়েছি এখানে।

বিব্রত হয়ে হীরাবাঈ বললেন, কেন, কিসের চিঠি, কোথা থেকে এল!

সে তুমি বুঝবে না গো বুঝবে না। আমার ঘরের মানুষটিকে তোমার মনের মানুষ ছলাকলা করে বিদেশবিভুঁয়ে পাঠালেন। এখন আমার মানুষটি যে পরবাসে জ্বরে পড়ে কাতর হয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন তার কি হবে।

পাশের ঘরে বসে সব কথাই শুনছিলেন কুমার অভিরাম। শশব্যস্তে এগিয়ে এসে বললেন, কি হল সুজনের, কি লিখেছে চিঠিতে?

সুভদ্রা হেসে বলল, লেখা আছে জ্বর, কিন্তু জ্বরের ধরনটা কি রকম তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অভিরাম বললেন, তোমার সবকিছুতেই রসিকতা! হয়ত সত্যিই সে জ্বরে কাতর হয়ে পড়েছে।

সুভদ্রার কৌতুক বেড়ে গেল। সে বলল, আপনার বন্ধুর আর যা থাক বা না থাক একটা বড় গুণ কিন্তু আছে। সেটি হল জ্বরে পড়লেই প্রেমপত্র লেখেন।

এবার কুমার অভিরামও হেসে উঠলেন।

না, না, হাসির কথা নয়, বলল সুভদ্রা, ওর চিঠিখানা এসেছে কয়েকদিন আগে, আর আমি তার কোন উত্তরই দিতে পারিনি আজও। দেখুন দেখি ও যদি ভেবে বসে ওর গৃহিণীকে আর কেউ ঘরছাড়া করে নিয়ে গেছে তাহলে অন্ততঃ দোষ দেওয়া যাবে না। তাছাড়া আর একটি ভয়ও আছে। এতকাল কোন চিঠি না পেয়ে বিরহে কাতর হয়ে যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাহলে তার স্ত্রী বেচারার অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছেন কি?

সে ভাবনা তোমার নেই সুভদ্রা। ওকে এমন কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছি, যাতে ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ সুযোগ মুহূর্তের জন্যেও সুজন হাতছাড়া করবে না।

একটু থেমে বললেন, তবে যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন সারাটি রাত জেগে লিখে ফেল একটা প্রেমপত্র। আমি একেবারে ভোরবেলা স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার দিয়ে দেরাদুনে পোস্ট করতে পাঠিয়ে দেব।

সুভদ্রা বলল, জাঁহাপনা, এ কাজটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?

তাহলে আর এক কাজ কর। চিঠির অক্ষরগুলোকে দাও কাঁপিয়ে।

তাতে কি সুবিধে হবে?

তুমিই জ্বরে কাতর হয়ে আছ। তাই পত্রপাঠ পত্র দিতে পারনি।

এতে উল্টো ফলও তো ফলতে পারে?

কি রকম?

যদি সত্যি সত্যি পত্নীপ্রেমের পরিচয় দিতে ও স্বয়ং এসে হাজির হয়।

তাহলে চিঠির ভেতর লিখে দাও যে তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ তবে দুর্বলতা সম্পূর্ণ কাটেনি।

সুভদ্রা জয়তিলকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা আপনার বন্ধুপ্রেম আর বন্ধুপত্নীপ্রেম এ দুটোর ভেতর কোনটা বেশি বলুন তো?

দুটিই সমান।

আমার কিন্তু মোটেই তা মনে হচ্ছে না। পক্ষপাতিত্ব যেন বন্ধুপত্নীতেই বেশি।

অভিরাম হেসে বললেন, আগে থাকলেও থাকতে পারত, কিন্তু এখন তোমার ভেতর দিয়ে সুজন আমার আরও কাছে এসে গেছে। তাই বন্ধুপত্নীর মন রাখতে বন্ধুকে কাছে না টেনে পারি কি করে!

বন্ধুপত্নীর মন রাখতে না মান রাখতে?

দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিছু কিছু বোঝা না বোঝার আলো আঁধারির ভেতর প্রসন্ন মুখটি তুলে তাকিয়ে রাইলেন হীরাবাঈ।

আরও কয়েকটি দিন কেটে গেছে। নতুন পরিবেশে নতুন এক নারী যেন জেগে উঠছে হীরাবাঈএর ভেতর।

আবাল্য যে পরিবেশে কেটেছে তার দিন, সেই পুরুষের সঙ্গছাড়া জীবন তাকে যে অপার্থিব লোকের ইশারা দিয়েছে সে জীবন আজ ফেলে এসেছে সে বিস্মৃতির পারে।

এখানে অন্য জগৎ, অন্য মানুষ। তার অভ্যস্ত জীবনের কোন স্পর্শ নেই এখানে। যৌবনে যোগিনী সাজার আয়োজন এখানে কেউ করে দেয় না। বসন্তের এলোমেলো মন-কেমনের হাওয়া যখন অজস্র ফুলের রেণু মেখে ধর্মযাজিকাদের আবাসে বয়ে আসত তখন অভিজ্ঞ সিস্টার বা মাদার স্বয়ং এসে তাকে ঈশ্বরের প্রসাদ বলে ব্যাখ্যা করতেন। আনমনা হলেই তা হওয়া চাই একমাত্র প্রভুর চিন্তা। অন্য কোন চিন্তার স্থান বা অবকাশ এখানে নেই।

বাদলের রাতে নিশ্চয়ই ধর্মযাজিকাদের আবাস-গৃহের ওপরের আকাশ ছেয়ে মেঘ ঘনিয়ে উঠত। ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় খুলে যেত কোন কোন ঘরের জানালা। বিদ্যুতের আলোয়, বর্ষাধারার শব্দে ভেঙে যেত ঘুম। কি এক অজানা বঞ্চিত যৌবনের কান্না উঠে আসতে চাইত বুক ঠেলে। আকাশের ধারার সঙ্গে সমানে ঝরত চোখের ধারা।

কিন্তু বর্ষণ যখন থেমে যেত, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসত চাঁদের আলো তখন অপরাধী নান নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাত ঈশ্বরের কাছে, প্রভু ক্ষমা কর আমার অপরাধ। আমাকে পাপের অন্ধকার থেকে নিয়ে চল তোমার পবিত্র আলোর জগতে। ঘুচিয়ে দাও আমার পার্থিব সকল চাওয়া-পাওয়া।

কিন্তু এখানে নেই সে প্রার্থনা। জন্মান্তরে এক তরুণী নান প্রবেশ করেছে পার্থিব ভোগের জগতে। তার পূর্ব জীবনের সংস্কার রয়েছে অবচেতন মনে। কিন্তু নতুন এক জগৎ তার কাছে এনেছে এক অনাস্বাদিত আনন্দ সংবাদ। তাকে কেমন করে গ্রহণ করতে হয় তা সে জানে না, কিন্তু কেমন যেন এক মৃদু সৌরভের মত তার চারদিকে কামনা বাসনার মৌমাছিগুলি গুনগুন করে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

হীরাবাঈ আশ্চর্য এই অনুভূতির জগতে নিজেকে সমর্পণ করে বসে রইলেন।

আজ কয়েকদিন হল, বেলা পড়ে এলেই সুভদ্রা সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যায় হীরাবাঈকে। তারা বাজারের দিকে না গিয়ে এদিক ওদিক পাহাড়ি পথে ঘুরে বেড়ায়। রাশি রাশি বুনো গোলাপ ফুটে থাকে পথের ধারে, কোন বাড়ির পাঁচিলে। ওরা ফুল তোলে। এ ওর হাত ভরে দেয়, মাথায় গোঁজে। কখন পথের ধারে পাইন গাছের তলায় বসে বসে গল্প করে। টুকরো কথা, টুকরো হাসি। দূরে কখন বা মেঘে ঢাকা থাকে তুষার পাহাড়, কখন বা ঝলমল করে ওঠে বেলাশেষের আলোয়।

হীরাবাঈ বললেন, ঐ পাহাড়ের দিকে শুধু তাকিয়ে বসে থাকতে আমার কি যে ভাল লাগে।

সুভদ্রা কপট গাম্ভীর্য মুখে এনে বলল, আমি তোমার কাছে না থাকলেও?

একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে হীরাবাঈ বললেন, তুমি তো আমার কাছেই থাক সুভদ্রা। তোমাকে ছেড়ে আমার একার থাকার কোন কথাই ওঠে না।

বটে, আসুক আমার ঘরের মানুষ, তখন তোমার কাছে আমাকে কেমন করে রাখতে পার তাই দেখব।

তোমার স্বামী কি রকম লোক সুভদ্রা?

আমার কাছে খুব শান্ত, অন্যের কাছে দুর্দান্ত।

আমি তাকে সবার ওপর শান্ত ব্যবহার করতে বলব।

সে যদি তোমার কথা না শোনে?

হীরাবাই বললেন, আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করব। একবার না বুঝলে আবার বোঝাব।

সুভদ্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল হীরাবাঈএর দিকে, শুনতে লাগল তাঁর প্রতিটি কথা। সুভদ্রা বুঝল, এ মেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া। হীরাবাঈ তার কাছে বসে থাকেন, কিন্তু তবুও থাকেন মনের জগতে বহুদূরে। আমাদের সংসার জীবন, তার সুখদুঃখ, পরিহাস রসিকতা এই নারীর মনের সীমানার ভেতর তার সবটুকু ছায়া ফেলতে পারে না।

সুভদ্রার মনে হয়, যে মেয়ে এতদিন ধর্মযাজিকা হয়ে কাটিয়েছে, তার হৃদয়, মন অনেক সুন্দর, অনেক বেশি পবিত্র। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে আর এক চিন্তার উদয় হয়। কুমারবাহাদুরের জননীকে এক সাধু নাকি বলেছিলেন, যদি এমন রমণী এ বংশের বধূ হয়ে আসেন, যিনি কোনদিন অন্য কোন পুরুষের চিন্তা করেন নি, তবে তিনিই এ বংশকে মুক্ত করতে পারবেন ভয়াবহ অভিশাপের হাত থেকে।

হীরাবাঈ কি হতে পারে না সেই শুদ্ধা নারী।

সুভদ্রা তাকিয়ে থাকে হীরাবাঈএর দিকে। কি সুন্দর মুখশ্রী! চোখে লেগে আছে করুণার স্পর্শ। একটি ফুটন্ত ফুলের মত কমনীয়, লাবণ্যময়।

সেদিন রোজকার মত বেড়াতে বেরিয়ে ওরা এসে পড়ল এমন এক জায়গায়, যেখানে দুটি পাহাড়ের গিরিশিরার মাঝে ওরা দেখতে পেল একটি জীর্ণ গৃহ।

ওরা দুজনে দরজার কাছে এসে দেখল কাঠের দুটি জীর্ণ কপাট খোলা হয়ে আছে।

উঁকি দিতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি বিবাহিতা মেয়ে। সাধারণ পাহাড়ি মেয়েদের মত তার সাজপোশাক। মনে হল, মেয়েটি অত্যন্ত অসুস্থ।

কোন কথা না বলে মেয়েটি দরজায় হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একসময় ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর থেকে এক শতছিন্ন আসন এনে বিছিয়ে দিল দরজার পাশে।

বসুন।

সুভদ্রা বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব সুস্থ নও।

ম্লান হেসে মেয়েটি বলল, আমি আজ ক'দিন জ্বরে ভুগছি।

হীরাবাঈ বললেন, তোমার বাড়িতে তোমাকে সেবা করার জন্যে আর কোন লোক নেই?

আবার অতি ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল মেয়েটির মুখে। বলল, আমার স্বামী রিক্‌শা চালাতেন। আজ এক মাস হল পড়ে গিয়ে বুকে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। ক'দিন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে নিজেই আবার পড়েছিলাম বিছানায়। ওকে আর দেখতে যেতে পারিনি। আজ মনটা কেমন করে উঠল। তাই বেরিয়েছিলাম হাসপাতালের পথে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সামনের চড়াইটুকু ভাঙতে না পেরে ফিরে এসেছি।

মেয়েটির চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল।

হীরাবাঈ তার গায়ে হাতে রেখে বললেন, কোন চিন্তা নেই তোমার বোন, আমরা হাসপাতাল থেকে তোমার স্বামীর খোঁজ নিয়ে আসব।

সুভদ্রা হীরাবাঈকে বলল, তুমি ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা কর, আমি খবর নিয়ে ফিরে আসছি।

সুভদ্রা চলে যাচ্ছিল। মেয়েটি তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ঘরের ভেতর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দুটো শুকনো কমলালেবু হাতে করে এনে বলল, ওর কাছে যাব বলে কিনে এনে রেখেছিলাম, এ দুটি ওকে দয়া করে যদি দিয়ে আসেন।

সুভদ্রা বলল, ও দুটো তুমি রেখে দাও ঘরে, আমি কিছু টাটকা ফল ওর জন্য কিনে নিয়ে যাব।

মেয়েটি কেমন সংকুচিত হল। বলল, আপনি তাহলে একটু দাঁড়ান।

এই বলে মেয়েটি ঘরের ভেতর গিয়ে এক জোড়া রূপোর মোটা বালা নিয়ে এল। সুভদ্রার হাতে দিতে গিয়ে বলল, বহিনজী, আমার তো অন্য কিছু সম্বল নেই। অপনারা যখন এতই দয়া করলেন, তখন এই বালা জোড়াটা বাজারে বেচে যা হয়, তাই দিয়ে কিছু কিনে নিয়ে যাবেন।

সুভদ্রা বালা জোড়া হাতে না নিয়ে বলল, এখন একথা ভাববার তোমার দরকার নেই। তুমি ও দুটো তুলে রেখে দাও, পরে তোমার কাজে লাগবে।

মেয়েটি বলল, আপনাদের কি বলব বহিনজী, এই দুটো বালা ও শখ করে আমাকে গড়িয়ে দিয়েছিল। আমি রাগ করে বলেছিলাম, এ গয়না আমি পরব না। তোমার এত কষ্টের পয়সায় কেনা গয়না আমার পরতে গেলে গায়ে বাজবে। ও কিন্তু শুনল না। একদিন পরিয়ে ছাড়ল।

একটু থেমে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর চেপে নিয়ে বলল, কি হবে বহিনজী এ গয়না। আমার মানুষটার চেয়ে কি গয়নাটা বড় হল। ও ভাল হয়ে গেলে আমার আর গয়নার দরকার কি।

সুভদ্রা ক্ষিপ্রগতিতে চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল, আর মেয়েটির হাত ধরে হীরাবাঈ ঢুকল ঘরের ভেতর।

অতি জীর্ণ দরিদ্রের সংসার। তারই ভেতর মেয়েটি পরিষ্কার করে রেখেছে ঘরখানা।

এতক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছিল মেয়েটি, হীরাবাঈ তাকে বিছানায় বসিয়ে তার পাশে ঐ ছিন্ন আসনটার ওপর বসল।

তারপর একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কি খেয়েছ তুমি আজ?

বড় দুঃখের হাসি হাসল মেয়েটি। ঘরে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

হীরাবাঈ বলল, এখানে তোমার এমন কোন চেনাজানা লোক নেই, যাকে দিয়ে তুমি কিছু খাবার আনাতে পারতে?

না, বহিনজী। আর তাছাড়া ওর কাজ নেই, আমিও বিছানায় পড়ে, খাবার কেনার পয়সা কোথায় পাব। অনেক দুঃখেও ওর দেওয়া এ বালা দুটো বেচতে পারিনি। আজ ভাবলাম, কি হবে এ দুটো বালার মায়া করে!

হীরাবাঈ নিজের হাতের থেকে অভিরামের দেওয়া একটি বহু দামী আংটি খুলে নিয়ে বলল, দেখ একটা কথা বলব তোমাকে, রাখবে তুমি সে কথা?

মেয়েটি নত হয়ে মাথা দুলিয়ে বলল, ভগবান আপনাদের আজ আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনাদের সব কথাই আমাকে শুনতে হবে।

বলল হীরাবাঈ, এ বালাজোড়া তুমি কোনদিন বেচবে না, যত কষ্ট হোক তোমার। তার বদলে এই নাও আমার আংটি। এটি বেচলে অনেক টাকা পাবে তুমি। সৎভাবে থাকলে ঐ টাকায় তোমার অনেক দিন চলে যাবে।

প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চাইল না মেয়েটি। বলল, আমি আপনার কথা রাখব, বালাজোড়া না খেতে পেলেও বেচব না। তবে আপনার অত দামের আংটি নিয়ে কি করব আমি। আমাকে দয়া করেছেন আপনারা। প্রার্থনা করুন, যেন আমার ঘরের মানুষ ভাল হয়ে ঘরে ফিরে আসে, তাহলেই আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

হীরাবাঈ বললেন, আমি ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা জানাব, তবে তোমাকে এই আংটিটা দিতে পারলে আমার তৃপ্তির আর শেষ থাকবে না।

এই বলে মেয়েটির শীর্ণ আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দিলেন।

মেয়েটি চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। তার বুকে অজস্র ধারায় ঝরে পড়তে লাগল।

রাতে ঘুম আসছিল না হীরাবাঈএর চোখে। একটা ছবি বার বার ভেসে আসছিল তাঁর চোখের সামনে। সে দরিদ্র মেয়েটির কি ভালবাসা। স্বামীর জন্যে নিজে অভুক্ত থেকেও দুটি কমলা সে সঞ্চয় করে রেখেছে। আবার তার কতখানি আত্মমর্যাদাবোধ। আংটি নিতে চায় না সে। মানুষ দরিদ্র হলেই লোভী হয়ে যায় না।

কিন্তু আজ তার বিপদের দিনে তার হাতে সামান্য একটা আংটি তুলে দিতে পেরে নিজেকে বড় বেশি তৃপ্ত মনে হল হীরাবাঈএর।

হীরাবাঈ কল্পনার রাজ্যে ভেসে গেলেন। তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন, হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে এসেছে ঐ রিকশাওয়ালা। মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে তাকে তার স্ত্রী ঘরের ভেতর ধরে ধরে আনছে। কত সুখদুঃখের কথা বলছে তারা। শেষে লোকটি তার স্ত্রীকে বালাজোড়া আনতে বলল। বালা দুটি এলে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, কতদিন ভেবেছি, ঐ বালাজোড়াটা বুঝি বেচে ফেলেছিস, আজ মনে হচ্ছে, তুই সত্যিই আমাকে ভালবাসিস বউ।

হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল হীরাবাঈএর। যেন কি একটা কথা তাঁর সহসা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, অভিরামও তো একদিন তাকে একটা আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। সেদিন খুশি হয়েছিল তার মন, কিন্তু তার ভেতর যে কোন গুরুত্ব থাকতে পারে তা সে ভেবে উঠতে পারেনি সেদিন।

আজ তার চোখে সবকিছু কেমন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাহলে অভিরাম কি ঐ রিক্‌শাচালক যেমন করে তার স্ত্রীর হাতে বালাজোড়া পরিয়ে দিয়েছিল তেমনি করে ওর হাতেও আংটি পরিয়ে দিয়েছে।

কথাটা ভেবেই প্রথমে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন হীরাবাঈ। তারপর তাঁর মনে হল, কেমন যেন এক অজানা শিহরন তাঁর দেহকে কাঁপিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই অনুভূতি হীরাবাঈএর জীবনে এই প্রথম। একটি ফুলের গন্ধে যে আবেশ, একটি উজ্জ্বল তুষারশৃঙ্গ দেখে যে মুগ্ধতা, তার সঙ্গে এই অনুভূতির কোন মিল নেই।

সেই অচেনা শিহরন বারবার ঢেউ তুলতে লাগল হীরাবাঈএর দেহে মনে।

হীরাবাঈ বিছানায় উঠে বসলেন। আঙুলে, যেখানে অভিরাম আংটিটি পরম যত্নে পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে অধীর আবেগে চুম্বন করলেন।

সহসা শ্রাবণধারার মত ঝরতে লাগল তাঁর চোখের জল। মনে হল, কত ভালবেসে অভিরাম তাঁকে ঐ আংটিটি সেদিন দিয়েছিলেন। তিনি তার কোন মর্যাদাই দেননি সেদিন, শুধু শুভানুধ্যায়ীর উপহার বলে খুশিতে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আজ সেদিনের ঐ সামান্য দান হীরাবাঈয়ের কাছে অসামান্য হয়ে দেখা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হীরাবাঈ নিজেকে অপরাধী ভাবতে লাগলেন। ঐ দরিদ্র মেয়েটি যদি তার স্বামীর দানকে শত দুঃখেও আগলে রাখতে পারে তাহলে তিনি কেন অভিরামের দেওয়া আংটি হাতছাড়া করলেন। দান করে তিনি দুঃখ পাননি ঠিক, বরং নিজের আত্মাকে তৃপ্ত মনে করেছিলেন, কিন্তু আংটির পরিবর্তে অন্যকিছু দিলেই এ দুঃখবোধের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেতে পারতেন।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন হীরবাঈ। পাশেই অভিরামের লাইব্রেরি ঘর। তার ওপারে শয়নকক্ষ।

ক্ষীণ একটা আলোর রেখা অভিরামের শোবার ঘর থেকে এসে পড়েছিল লাইব্রেরি ঘরের মেঝের ওপর। নীলাভ সেই আলোকচিহ্নকে হীরাবাঈএর মনে হল পথ-রেখা। তিনি কি করছেন, তা তিনি সজ্ঞানে বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তিনি এটি অনুভব করলেন, যাওয়ার গতি রোধ করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়।

শোবার ঘরে নীলাভ একটা আলো জ্বলছিল। অভিরাম জানালা খুলে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তাকিয়েছিলেন বাইরের দিকে।

নিস্তব্ধে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালেন হীরাবাঈ। অভিরাম মগ্ন হয়েই কিছু ভাবছিলেন, তিনি কারো উপস্থিতি জানতে পারলেন না।

জানালার বাইরে রাত নিঝুম। বহু দূরে, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে অন্ধকার কোন সমতলের বুকে দেখা যাচ্ছিল এক আশ্চর্য ছবি। যেন একটি দীর্ঘ জমিনে কেউ লাল, হলুদ, নীল বিন্দু দিয়ে নকশার কাজ করছে। অথবা ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকিরা লাল, নীল, হলুদ রঙের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। ঝিকমিক করছে আলোর বিন্দুগুলো।

ঐ দিকে আনমনে তাকিয়েছিলেন অভিরাম। হয়ত ভাবছিলেন, জীবনের এমনি কোন একটি রোশনাইএর রাতের কথা। কাঁধের ওপর কার হাতের ছোঁয়া লাগতেই চমকে উঠে দাঁড়ালেন।

কে! হীরাবাঈ!

বিস্ময়ের অন্ত ছিল না অভিরামের।

আবেগজড়িত একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমি শুধু হীরাবাঈ নই, আমি তোমার হীরাবাঈ।

অভিরাম বললেন, আজ এই নিদ্রাহীন রাতে তুমি শুধু আমার হীরাবাঈ হয়ে এলে। বল, কি দিয়ে তোমাকে আমি বরণ করব?

সুজন সিং কোন ভণিতা না করেই বলল, এ প্রাসাদ অভিরামের পিতা রাজা সুরিন্দর সিংএর।

সুভদ্রা বলল, কুমারবাহাদুরের অন্য একটি প্রাসাদ কোথায় যেন আছে বলে লোকমুখে শুনেছিলাম, কিন্তু চোখে দেখার সৌভাগ্য আগে কোনদিন হয়নি।

সুজন সিং বলল, আচ্ছা সুভদ্রা, বলতে পার এই বিরাট প্রাসাদখানা এমন করে ফেলে রেখে অভিরাম কেন ঐ ছোট্ট ঘরখানার ভেতর তার ডেরা বেঁধেছে?

সুভদ্রা মাথা নেড়ে জানাল যে সে এসবের কিছুই জানে না।

এবার সুজন সিং বলল, এর পেছনে যদি কোন রহস্য থাকে তা জানতে তোমার কৌতূহল হচ্ছে না?

সুভদ্রা একটু নড়েচড়ে বসে গভীর জিজ্ঞাসার চিহ্ন চোখে মুখে এঁকে সুজন সিংএর দিকে তাকিয়ে রইল।

হাঁ, আজ আমি তোমাকে ছোট্ট একটি কাহিনী শোনাবার জন্যেই এখানে ডেকে এনেছি। তোমার মধ্যে আমি একটি নারীর যথার্থ রূপ দেখেছি। তাই তুমি সামান্য কোন বিবেচনার ভুলে দুঃখ পাও, এ আমি চাই না।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে রইল সুজন সিং। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করল তার কাহিনী।

শোন তাহলে। আগেকার দিনে এমন বহু ধনী ছিল যারা লুঠতরাজ করতে অভ্যস্ত ছিল। তারা এ কাজকে অসম্মানের বলে মনে করত না। আর তাছাড়া ঐ লুঠের অর্থেই তাদের বিষয়সম্পত্তি, সোনাদানা ফেঁপে উঠত।

মাধো সিং ছিল এমনি এক লুঠেরা। তার তলোয়ারের ধার ছিল যেমন তীক্ষ্ণ, তোশাখানায় হীরে জহরতের ভার ছিল তেমনি বিপুল।

মাধো সিংএর ঘোড়া যে পথ দিয়ে যেত, সে পথের ধনী দরিদ্র সকলে পথে নেমে এসে মাধো সিংকে উপযাচক হয়ে নজরানা দিয়ে যেত।

মাধো সিংএর আর এক বিলাস ছিল মন্দির লুঠ করা। কারণ সোনাদানার প্রচুর সঞ্চয় থাকে এই মন্দিরগুলির মধ্যে। সে তার দুর্ধর্ষ কালো ঘোড়া আর তলোয়ারখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত তীর্থের পথে। যে জায়গা জনবিরল, সেখানে সে তার দলবল নিয়ে আস্তানা গাড়ত। তারপর সুযোগ বুঝে লুঠ করত তীর্থযাত্রীর সম্বল। কখনো বা পরিচিত তীর্থপথের বাইরে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত জায়গায় যে সব মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে গিয়ে মাধো সিং লুঠে নিয়ে আসত। কোন জায়গায় বিশেষ কিছু মিলত না, আবার কোথাও বিপুল পরিমাণ গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যেত।

এমনি এক মন্দির লুঠের সময় মাধো সিংকে মন্দিরের সেবায়েত বাধা দেবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে মাধো সিংএর তলোয়ারের ঘায়ে সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। মাধো সিং এরপর সেবায়েতের ঘরে ঢুকে পড়ে লুঠের আশায়। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয় তাকে। সে ভুলে যায় ধনরত্ন লুঠের কথা। যে রত্ন তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, জন্মজন্মান্তরেও এমন রত্ন মেলা ভার।

সেবায়েতের স্ত্রী মূর্ছিতা হয়ে পড়ে ছিল। মাধো সিং তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। এমন রূপ, এমন দেহের গঠন এর আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ল না। অন্য সব রত্নের কথা ভুলে মাধো সিং সেদিন ঐ নারীরত্নটিকে তুলে নিয়ে এল নিজের প্রাসাদে।

কয়েকদিন একটি নির্জন ঘরে অবরোধের পর কিছু পরিমাণে সুস্থ হলে সেই সেবায়েতের স্ত্রী একদিন দেখল তার ঘরের ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে কে যেন একটি তীক্ষ্ণ ছোরা ঘরের মেঝেতে ফেলে দিল। তখনও অসহায় মেয়েটি বুঝতে পারেনি এই আকস্মিক ঘটনার তাৎপর্য কি। বুঝতে পারল সেইদিন রাত্রে। সামান্য নিদ্রা হয়ত বা এসেছিল তার, ঘর খোলার শব্দে চমকে জেগে উঠল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না।

হঠাৎ মেয়েটি চীৎকার করে উঠল। একটা রক্তলোভী জানোয়ার ততক্ষণে লাফ দিয়ে তার সমস্ত প্রতিরোধকে ভেঙে দিয়েছে।

দয়া কর, আমি সন্তানের জননী হতে চলেছি।

শুধু এই আকুল আকুতিটুকু অন্ধকারে একবার কান্নার মত ঝরে পড়ল।

কিন্তু উল্লাস তাতে কমল না বরং অন্ধকারে আরও বীভৎস আকার নিয়ে বেড়ে উঠল।

হঠাৎ সর্বহারা মেয়েটির বোধকরি মনে পড়ে গেল সকালে মেঝের ওপর এসে পড়া সেই ছোরাখানার কথা। সে ঐ ছোরাটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল মাধো সিংএর বুকে। অক্টোপাশের মত যে দুটো হাত দিয়ে সে জড়িয়ে ধরেছিল মেয়েটিকে, মুহূর্তে তা একটা প্রাণফাটা চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুকের ওপর ফিরে এল।

ঘরে ততক্ষণে আলোর রেখা এসে পড়েছে। মাধো সিংএর স্ত্রী তার ন'বছবের শিশুপুত্রটিকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে। সেবায়েতের স্ত্রী এবার এক অদ্ভুত হাসি হেসে হাতের ছোরাখানা বসিয়ে দিল নিজের বুকে।

মাধো সিং নিস্পন্দ পড়ে ছিল মেঝের ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল চারিদিক।

মেয়েটি একটু জল চাইল। মাধো সিংএর স্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। শিশুপুত্রকে জলের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েটির পাশে এসে বসল সে। স্বামীর দিকে একবারও ফিরে তাকাল না।

মেয়েটি ঘোলাটে চোখ মেলে জড়িত স্বরে বলল, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, ব্রাহ্মণের স্ত্রী ; রোজ শুদ্ধ মনে দেবতার পুজো করেছি। আমি আজ মৃত্যুকালে অভিসম্পাত দিচ্ছি, এ বংশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে সমাজের মানুষের কাছে এমনি হীন নিকৃষ্ট বলে পরিচিত হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাধো সিংএর শিশুপুত্র জল নিয়ে দৌড়ে এল মেয়েটির কাছে। মাধো সিংএর স্ত্রী মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েটির মাথা নিজের কোলের ওপর নিয়ে তাকে ধীরে ধীরে জল পান করাল।

মেয়েটি একবার তাকাল মাধো সিংএর স্ত্রীর মুখের দিকে, তারপর চাইল ছেলেটির দিকে। বলল, আমি হয়ত বাঁচতে পারতাম, কিন্তু আমার কলঙ্কিত দেহের মধ্যে যে সন্তান রয়েছে তাকে নিয়ে আমি এ পৃথিবীতে মা হবার জন্য বেঁচে থাকতে পারব না।

একটু থেমে বলল, আমার অভিসম্পাত মিথ্যে হবে না, তবে মরার সময় বলে যাই, তুমিই আমাকে দিয়েছ এই ছোরা, আর তোমার এই ছেলে আমাকে দিয়েছে জল, একে আমার শাপ স্পর্শ করবে না। এক এক পুরুষ অন্তর ফলবে আমার অভিশাপ। তুমি পালাও, এ পাপের আস্তানা ছেড়ে চলে যাও অন্য কোথাও তোমার এ সন্তানকে নিয়ে। একই ঘরে পুরুষানুক্রমে থাকবার চেষ্টা করলেই বিপদ ঘটবে। যাও, পালাও, এখুনি পালাও।

সেদিন মাধো সিংএর স্ত্রী তার ন'বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল প্রাসাদ ছেড়ে। পাঞ্জাবের অন্যত্র পত্তন করেছিল বাসগৃহ।

মাধো সিংএর সন্তান যোগীন্দর সিং নাম নিয়ে জমিদারির পরিচালনা করত। তার ব্যবহার আর দান-ধ্যানে লোকে ভুলে গেল তার খুনে পিতার কথা। কিন্তু অভিসম্পাত ফলল ঠিক পরের পুরুষে। যোগীন্দর সিংএর ছেলে অমর সিংএর দেহের রক্তে আবার পিতামহের অসংযত উত্তেজনার জোয়ার বইল।

ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের ছলে বলে কৌশলে নিজের অন্তঃপুরে আনতে লাগল অমর সিং। শেষে কোন এক সুন্দরী জমিদারবধূকে লুঠ করে আনতে গিয়ে বাধা পেল তীব্রভাবে। এরপর সরকারী আদেশে পুলিশ অমর সিংএর মধুচক্র বেষ্টন করল।

নিরুপায় অমর সিং সেই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক নারকীয় কাণ্ডের অনুষ্ঠান করল। গুপ্তগৃহের মৃত্তিকার তলায় সেদিন জীবন্ত সমাধি লাভ করল অসহায় কতকগুলি নারী।

আদালতের বিচারে সেবার নিষ্কৃতি পেল অমর সিং, কিন্তু অদৃশ্য এক আদালতের বিচারে চরম শাস্তি নেমে এল তার ওপর। নামের অমরত্ব অমর সিংকে রক্ষা করতে পারল না। অকালে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হল তার। মরণকালে নাকি বার বার তাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, তোমরা আমাকে মাটি চাপা দিচ্ছ কেন, সরাও সরাও ; ওঃ, দম যে বন্ধ হয়ে এল ; হাওয়া কই, একটু হাওয়া, একটু হাওয়া।

মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এসেছিল অমর সিংএর।

এর পরের পুরুষ অভিরামের পিতা রাজা সুরিন্দর সিং। পাঞ্জাবের আবাস ছেড়ে তিনি চলে এসেছিলেন মুসৌরীতে। তোমার সামনের প্রাসাদ রাজা সুরিন্দর সিংএর কীর্তি। রানীর নামে এই প্রাসাদ উৎসর্গ করে তিনি নামকরণ করেছিলেন 'রানীমহল'। যদিও রাজা সুরিন্দর সিংএর এক ছাড়া দ্বিতীয় রানী ছিলেন না। মুসৌরীর এমন কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে রাজা সুরিন্দর সিংএর দানের হাত না পৌঁছেছে।

রাজা সুরিন্দরের মৃত্যু হয়েছে। রানীমাতা সবই জানতেন। তাই অভিরামের জন্য তিনি পৃথক করে 'কুমারমহল' তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এই বৃহৎ প্রাসাদ 'রানীমহল' তাই আজ শূন্য পড়ে আছে।

বুঝতেই পার সুভদ্রা, পুত্র অভিরামের ভবিষ্যতের জন্য রানীমাতার মনে কোনদিনই শান্তি ছিল না। তাই তিনি তাঁর কল্যাণের জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন। এক সাধুর দর্শনও নাকি তিনি পেয়েছিলেন। সাধু তাঁকে নাকি বলেছিলেন, অভিশাপের স্খলন হয় বইকি। পবিত্রতার ভেতর দিয়েই তা সম্ভব। এই রাজবংশে যদি এমন কোন বধূ আসেন যিনি একমাত্র পুরুষ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের চিন্তা কখনো করেননি, তিনিই শুধু পারবেন এ বংশের দীর্ঘদিনের অভিশাপ মুছে ফেলতে।

রানীর মৃত্যু হয়েছে। এখন মহাকাল তাকিয়ে আছে অভিরামের ভাগ্যের পরিণতির দিকে।

ঢং ঢং ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বেজে যেতে লাগল। পাহাড়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল তার আর্ত প্রতিধ্বনি।

চমকে উঠে সুজন সিংএর কাছে সরে এল সুভদ্রা।

ভয় কি সুভদ্রা, বলল সুজন সিং, ও রাজবাড়ির ঘণ্টা। একটি বুড়ো দারোয়ান থাকে এখানে, সে-ই প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজিয়ে যায়।

সুভদ্রা বলল, এবার আমাদের ফিরতে হবে।

চল।

সুজন সিং এগিয়ে চলল।

আবারা দু'জনে ফিরে চলেছে সেই পথে। চাঁদের আলোয় পথ এখন আগের মত অস্পষ্ট নয়। কারো মুখে কথা নেই। দু'জন ভাবছে ভিন্ন পথে। সুজন সিং ভাবছে এই কাহিনী শোনার পর সুভদ্রা কি আর চাইবে অভিরামের হাতে হাত রাখতে। এবার লক্ষ্মীবাই আর তার অধিকারের পথটা হয়ত প্রশস্ত হবে। যদি তাই হয়, তাহলে সে কি পাবে না এই লাবণ্যময়ী নার্সটিকে।

সুভদ্রা ভাবছে আকাশপাতাল।

কেন এমন হয়। কি ভয়ঙ্কর এ অভিশাপ। কান্না পেল তার। কুমার অভিরামের অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে নার্স সুভদ্রার বুক ঠেলে একটা কান্নার ঢেউ বেরিয়ে এল। এমন একটা সুন্দর মনের মানুষকে পূর্বপুরুষের পাপের ঋণ শোধ করতে হবে। কি জানি কি ভয়াবহ মূর্তিতে ঐ মানুষটার ওপর দেখা দেবে অভিশাপ। তার মনে হল, অদৃশ্য যেন কোন শক্তি ইতিমধ্যেই কুমারবাহাদুরের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। কুমার অভিরামের যে মন একদিন তার হাতখানাকে টেনে নিয়েছিল, সেই মন এখন সুখী হচ্ছে লক্ষ্মীবাঈএর সান্নিধ্যে। এই চাঞ্চল্য হয়ত কুমারবাহাদুরকে একদিন গ্রাস করে ফেলবে। তখন কি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে সে দাঁড়াবে সমাজের কাছে।

ভাবতে গিয়ে কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল সুভদ্রা।

আর এক ভাবনা এল তার মনে। এমন কোন মেয়ে কি আসতে পারে না কুমারবাহাদুরের জীবনে যে কোনদিন মনে মনেও সহচররূপে কোন পুরুষকে কামনা করেনি। কুমারবাহাদুরই হবে তার জীবনের প্রথম আর শেষ পুরুষ।

সাধু বলেছেন, কেবলমাত্র সেই পবিত্রতাই উদ্ধার করবে এ বংশকে পাপের ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে।

নিজের ওপর ধিক্কার জন্মাল সুভদ্রার। সে যদি তার কুমারীজীবনে পবিত্র থাকতে পারত। অবশ্য

সে তার জীবনের এই বিশটি বসন্তে এমন কোন কাজ করেনি, যা সমাজের চোখে গর্হিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মন! বাইরের চোখে ধরা না পড়লেও তার নিজের কাছে সে যে বার বার ধরা পড়ছে। কত সন্ধ্যায় দূরের ঐ তুষারশৈলের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে তার মনে পাষাণভার নেমেছে। আবার ঝ'ড়ো হাওয়ার সঙ্গে এলোমেলো চিন্তায় উড়েছে তার মন। বর্ষার ধারা যখন নেমেছে অঝোরে, ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পাহাড় পর্বত, তখন রাতের বিছানায় তার চোখেও কি নামেনি বর্ষণ! একাকীত্বের দুঃসহ চিন্তায় সে কি জাগেনি কোন বিনিদ্র রজনী। কোন বান্ধবীর বিবাহবাসরে উত্তম কোন পুরুষকে দেখে তার মনে কি জাগেনি তেমনি কোন এক কান্তিমান কুমারের সান্নিধ্যের লোভ! একান্ত আপনার ছোট্ট একটি সংসার, অবাক চোখে চাওয়া একটি শিশু, বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রতিমূর্তি একটি পুরুষের স্বপ্ন কোন কুমারীজীবনকে না স্পর্শ করে যায়!

সুভদ্রা ভাবল, নারীর এই স্বাভাবিক চিন্তা তাকেও স্পর্শ করেছে, তাই অস্বাভাবিক এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করবার সামর্থ্য তার নেই।

না, সে আর যাবে না কুমারবাহাদুরের অবসর বিনোদনের সঙ্গী হতে। তার যতটুকু কাজ ততটুকু করে সে সরে আসবে নিঃশব্দে। এখন নিজেকে জড়াতে গেলেই কুমারবাহাদুরের ধ্বংসের পথই শুধু মুক্ত করে দেওয়া হবে। না, তা সে প্রাণ থাকতে করতে পারবে না।

আবার একটি চিন্তা তার মনকে অধিকার করে বসল। আচ্ছা, এই বিপদের কথা শুনে সে কেমন করেই বা ত্যাগ করে যাবে কুমারবাহাদুরকে। নার্সের কাজ তো ফুরিয়ে যাবে দু'দিনেই। তারপর সে কোন অজুহাতেই বা যোগসূত্র রক্ষা করে যাবে কুমার অভিরামের সঙ্গে।

বিদ্যুতের মত একটি চিন্তা সুভদ্রার ভারাক্রান্ত মনের মেঘের ওপর দিয়ে সহসা খেলে গেল।

সে অনুভব করল সুজন সিংএর হাত ধরেই সে এতক্ষণ চলেছে। সেই যে কখন সংকীর্ণ একটা সেতুপথ পার হবার সময়ে আবার সে হাত ধরেছিল সুজন সিংএর, ভাবনার তরঙ্গে পড়ে সে হাত এতক্ষণ সে ছেড়ে দেয়নি। আর সুজন সিংও সুভদ্রার সেই হাতটিকে শ্লথ করে দেবার কোন চেষ্টাই করেনি।

সুভদ্রা সংযোগের যেন একটি সূত্র আবিষ্কার করে মনে মনে ভীষণ খুশী হয়ে উঠল। সে যদি সুজন সিংকে তার জীবনের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে হয়ত কুমারবাহাদুরের কাছাকাছি থাকবার একটু সুযোগ পেতে পারবে। আর সেই সুযোগে সে চেষ্টা করে যাবে দু'হাত দিয়ে কুমার অভিরামের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের ওপর এসে পড়া অশুভ ছায়াগুলোকে সরিয়ে দেবার। অবশ্য ভাগ্যের বিধানের বিরুদ্ধে কিছু করার সামর্থ্য তার কতটুকুই বা। তবু আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও যেমন অসুস্থ সন্তানকে জননী বুক দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করে ঠিক তেমনি করে কুমার অভিরামকে সুভদ্রা অশুভ অশনির আঘাত থেকে আড়াল করে রাখতে চাইল।

পথ এবার ফুরিয়ে গেল। ওরা ততক্ষণে এসে পড়েছে কনভেন্টের কাছে।

সুজন সিং সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের আজকের পথটা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল, তাই না?

সুভদ্রা মুখ নত করল, কিন্তু তখনও তার হাতটিকে সুজন সিংএর কাছ থেকে সরিয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করল না।

সাহস পেল সুজন সিং। দুর্জয় সাহসে ভর করে সে বলল, এ হাত এখন আমার, বল সুভদ্রা যদি একে আমি আর না ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে চিরদিনের করে রেখে দিই।

সুভদ্রা তার অন্য হাতখানাও ধীরে ধীরে এগিয়ে দিল সুজন সিংএর দিকে। তারপর চারটি হাতের মাঝে নিজের মুখখানিকে লুকিয়ে কি এক আবেগে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা বার্ণাদেৎ আর কুমার অভিরামকে। কাহিনীর শুরুতে দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে যাকে আমরা প্রথম দেখেছিলাম, সে এখন সেই ভয়াবহ রাত্রির শেষ প্রহরে কুমারমহলে মাথায় অস্ত্রোপচারের পর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে।

আমরা এতক্ষণ যে কাহিনীর আবরণ উন্মোচন করলাম, তা এই ট্রেন দুর্ঘটনার কিছুকাল আগের ঘটনাপ্রবাহ।

ডাক্তার গর্গ যাবার সময়ে বলে গেলেন, কুমার, জ্ঞান এর ফিরবে, তবে মাথায় যে ধরনের আঘাত তাতে অনেকসময় পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। হাঁ, তুমি একবার ডাক দাও সুভদ্রাকে। ও বিয়ের পর নার্সিং ছেড়ে দিয়েছে ঠিক, তবে এসব কেসে আর কারো ওপর ভরসাও রাখা চলে না।

চলে গেলেন ডাক্তার গর্গ।

কুমার অভিরাম বসে বসে ভাবতে লাগলেন। সুজন সিং তাঁর বন্ধু ঠিক, কিন্তু সে কি এই রাতে তার বিবাহিতা স্ত্রীকে একা পাঠাতে চাইবে এই মহলে। আর সমস্ত ব্যাপারটাই রাখতে হবে সংগোপনে। এমনকি সুজনকেও জানান হবে না কথাটা। কারণ তাহলে লক্ষ্মীবাই জানতে পারবে। আর লক্ষ্মীবাই জানার অর্থই হল একটা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি। এই মানসিক ঝামেলার ভেতর নিজেকে ফেলার অর্থই হল নিজের মনের সুখ আর শান্তি নষ্ট করা।

এই মুহূর্তে কুমারবাহাদুরের ভীষণ রাগ হল সুভদ্রার ওপর। তার মত সুন্দর স্বভাবের মেয়ে সুজনের মত একটা চতুরকে কেন বিয়ে করতে গেল। কেনই বা সে প্রতীক্ষা করে দেখল না আর কিছুদিন।

কুমারবাহাদুরের মনে হল, মেয়েরা বড় বেশি বিবেচক। তারা ভবিষ্যতের মনোহর সুখের আশার দিকে চেয়ে না থেকে বর্তমানের সামান্য সুখকেও মুঠো ভরে কুড়িয়ে নিতে চায়।

কিন্তু সুভদ্রা সম্বন্ধে তার মনের থেকে সত্যিই কোন প্রতিবাদ নেই। প্রয়োজনে নীরবে সে তার সেবা করে গেছে। এখনও কোন অনুষ্ঠানে কাছাকাছি এলে তার চোখে মুখে দেখা গেছে বিনম্র আত্মনিবেদনের ভাব। না, কুমারবাহাদুর কোনদিনই তাকে অনাদর করে দূরে সরিয়ে দিতে পারবেন না।

ফোনটা তুলে নিলেন কুমার অভিরাম। ডায়াল করলেন ; হাঁ, সুভদ্রাই ধরেছে।

আমি কুমারমহল থেকে কথা বলছি।

ওপার থেকে ভেসে এল ঃ কুমারবাহাদুর, এত রাতে!

এত রাতে? দরকার, বড় বেশি রকমের দরকার পড়েছে তোমাকে।

আমি এখুনি আসছি।

না না, এখুনি আসতে হবে না। একেবারে ভোর বেলা চলে এস। কাউকে কোন কথা জানাবার দরকার নেই।

ঠিক ভোরেই কুমারমহলের ভেতর কলিং বেল বেজে উঠল।

কুমারবাহাদুর বেরিয়ে এসে দরজা খুলে সুভদ্রাকে সুপ্রভাত জানালেন। শীতের যথেষ্ট পোশাক গায়ে নিয়ে আসতে পারেনি সে, তাই বাইরে দাঁড়িয়ে কষ্ট হচ্ছিল সুভদ্রার।

কুমারবাহাদুর সুভদ্রার অবস্থাটা লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে এই প্রবল শীতের ভেতর নিয়ে এলাম তাই সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। অবশ্য শীতের পোশাকগুলো পরে আসবার মত সময় তোমাকে আমি দিতে পারতাম। রোগীর কাছে ডাক্তার, নার্স সকলেই রয়েছে।

বিস্মিত হল সুভদ্রা। রোগী, কে আবার অসুস্থ হল?

বাইরে দাঁড়িয়ে রইবে কতক্ষণ, ভেতরে এস, সব জানতে পারবে।

সুভদ্রাকে কুমার অভিরাম প্রথমে বার্ণাদেতের ঘরে নিয়ে গেলেন না। তিনি তাঁর বসবার ঘরে সুভদ্রাকে এনে বসালেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতী চা পরিবেশন করে গেল বেয়ারা।

দুজনে চা পান করছিল আর কথা হচ্ছিল।

সুভদ্রা বলল, কি ব্যাপার বলুন তো? এমন রাতেভিতে তলব। তারপর বলছেন রোগী আছে। কুমারমহলে আবার রোগী কোত্থেকে এল?

সে অনেক কথা, কুমারবাহাদুর বললেন, আগে বল দেখি, তুমি যে এখানে এলে সুজন কিছু জানে না।

সুভদ্রা হেসে বলল, কি মনে হয় আপনার?

মনে হচ্ছে আমি তোমাকে জানাতে নিষেধ করেছিলাম।

আপনি আমার কাছ থেকে তাহলে কি আশা করেন বলুন?

কুমারবাহাদুর হেসে বললেন, এখনও তুমি একেবারে স্বাধীন জেনানা, এ কথা কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

সুভদ্রা বলল, হয়ত নয়, কিন্তু আপনার যেখানে নিষেধ, সেখানে কি আপনি মনে করেন সুভদ্রা তাকে লঙ্ঘন করবে?

আচ্ছা হার হল তোমার কাছে সুভদ্রা, কিন্তু একটা জরুরী বিষয় আগে তোমার সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

সুভদ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল অভিরামের মুখের দিকে।

কুমারবাহাদুর বললেন, তোমাকে আমার বেশ কয়েকদিন দরকার হবে সুভদ্রা, তাই সারারাত বসে বসে ভেবেছি কি করা যায়।

একটু থেমে বললেন, আমি যদি আজই জরুরী কোন কাজে সুজন আর লক্ষ্মীবাঈকে কয়েকদিনের জন্যে বোম্বে পাঠিয়ে দিই, তাহলে কি তোমার বিশেষ আপত্তি হবে?

সুভদ্রা হেসে বলল, আপত্তি, ঘোরতর আপত্তি। স্বামী আর ননদিনীকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বিদেশে, পরস্ত্রীকে বন্দী করে রাখছেন নিজের কাছে, এ তো ভাল কথা বলে মনে হচ্ছে না কুমারবাহাদুর। তারপর বলল, ওসব কথা রাখুন, এখন বলুন দেখি আসল ব্যাপারটা কি?

সুজন কিংবা লক্ষ্মীবাঈ কথাটা জানতে পারলে অসুবিধে ঘটতে পারে, তাই আগেভাগে একটা ব্যবস্থা করতে চাইছি।

সুভদ্রা বলল, যাকে যেখানে পাঠালে ভাল হয়, তা আপনি করুন হাজারবার, কিন্তু আমার কাজটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

পরের দিন রাত তখন দুটো, সুভদ্রা কুমারবাহাদুরের বিশ্রামঘরে ঢুকল। একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে কুমার সামান্য একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন। কাঁধে কার হাতের ছোঁয়া লেগে উঠে বসলেন। সুভদ্রা বলল, আসুন রোগীর ঘরে, আপনাকে খুঁজছেন বলে মনে হচ্ছে।

কুমার অভিরাম সুভদ্রার সঙ্গে রোগিণীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মহিলাটি মনে হল, জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন।

কুমারবাহাদুর তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। রোগিণী একদৃষ্টে কুমার অভিরামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর একসময় দেখতে লাগলেন সুভদ্রাকে। আবার চোখ বুজলেন। পরে যখন চোখ মেললেন, তখন দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন। কি যেন চিন্তার চেষ্টা করছেন বলে মনে হল।

আমাকে চিনতে পারছেন? কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল সুভদ্রা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে সুভদ্রাকে দেখলেন, তারপর মৃদু একটুখানি হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর মুখে। এরপর কতক্ষণ কি যেন ভাববার চেষ্টা করলেন। চোখে মুখে সহসা ফুটে উঠল যন্ত্রণার রেখা। তারপর চোখ বন্ধ হল।

সুভদ্রা বলল, উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

কেন সুভদ্রা?

সম্ভবতঃ কোনকিছু ভাবনার উত্তেজনায়।

সুভদ্রা মহিলাটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল। কুমার অভিরাম ফিরে গেলেন গৃহান্তরে।

কয়েকদিনের পরের ঘটনা।

রোগিণীকে নিয়ে ধীরে ধীরে বাগানে পায়চারি করছিল সুভদ্রা। এ ক'দিনে বড় ভালবেসে ফেলেছেন মহিলা সুভদ্রাকে। ডাক্তার গর্গ ঠিকই বলেছিলেন। রোগিণী হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর পূর্বস্মৃতি। এখন বর্তমানের সঙ্গেই তিনি করছেন বোঝাপড়া। তাই সেবাময়ী এই নার্সটির ওপর তিনি হয়ে পড়েছেন নির্ভরশীল।

কুমার অভিরাম কাছে এলে প্রথম প্রথম কেমন যেন চমকে উঠতেন বিদেশিনী এই মহিলা। এখন আর তেমনটি করেন না। খুব সহজভাবে একটু মিষ্টি হেসে সুভদ্রার গায়ে হাত রেখে বলেন, অভিরাম। যেন সুভদ্রার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন কুমার অভিরামের।

এই মহিলাটি যে একজন নান সে পরিচয় জানে শুধু তিনটি মানুষ। কুমারবাহাদুর নিজে, ড্রাইভার দিলওয়ার সিং আর সুভদ্রা। জ্ঞান ফেরার পর মহিলাটিকে বহুভাবে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাঁর ঠিকানা, কিন্তু অসহায় চাহনি ছাড়া তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি আর কিছু।

তাই একদিন অভিরাম নিজের ঘরে সুভদ্রাকে ডেকে বললেন, ঐ মেয়েটিকে দেখে তোমার কি মনে হয় সুভদ্রা?

তার মানে আপনি কি জানতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন।

আমি বলছি খ্রীষ্টান মিশনারী তো ঠিকই কিন্তু খাঁটি, বিদেশিনী বলেই কি তোমার ধারণা?

আপনি ঠিকই ধরেছেন কুমারবাহাদুর। যদিও ওঁর গড়নের মধ্যে বিদেশী ছাপটাই বেশি, তবু পুরোপুরি বিদেশি বলে ওঁকে মনে হয় না।

কুমারবাহাদুর একটু থেমে বললেন, আচ্ছা সুভদ্রা, আমি যদি ওঁর একটা নতুন নামকরণ করি।

বেশ তো, হাসি আড়াল করে বলল সুভদ্রা, যে নাম আপনার সবচেয়ে পছন্দ তাই দিন।

কুমারবাহাদুর অমনি বললেন, সে কি আর দেবার উপায় রেখেছ তুমি।

এবার অবাক হওয়ার পালা সুভদ্রার।

কি রকম?

তুমি নিজেই সে নাম ধারণ করে বসে আছ।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল সুভদ্রা।

তাই নাকি, এত লোভ নামটার ওপর। ভাগ্যিস লোভটা নামের অধিকারীর ওপর এসে পড়েনি।

এবার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন কুমারবাহাদুর।

সহজ কৌতুকের আড়ালে মেয়েটি বার বার যেন কুমারবাহাদুরকে আঘাত করে চলেছে। আহত হচ্ছেন কুমার অভিরাম কিন্তু মেয়েটির ব্যবহার পরক্ষণেই সব দুঃখকে মুছে দিয়ে সেখানে খানিকটা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আবার কথা বলল সুভদ্রা, এখন তাড়াতাড়ি করে ওর একটা নামকরণ না করলে আমাদেরই কাজ চালান মুশকিল হয়ে পড়বে।

তুমিই বরং একটা নামকরণ করে দাও ওর।

সুভদ্রার মুখের দিকে সমাধানের আশায় তাকিয়ে রইলেন কুমারবাহাদুর।

সুভদ্রা গম্ভীর হবার ভান করে বলল, পছন্দ হবে আপনার?

কুমার তাকালেন সুভদ্রার দিকে।

আমার পছন্দ অপছন্দের ওপর কি যায় আসে সুভদ্রা।

ও কথা বলবেন না কুমারবাহাদুর। একদিন হয় সংগোপনে আমার দেওয়া নামটি ওর কাছে উচ্চারণ করতে গিয়ে ভাববেন, কি একখানা নামই না দিয়েছিল সুভদ্রা। আরও কিছু মিষ্টি করে দিতে পারল না; তাহলে আরও মধুর করে ডাকা যেত।

এবার কিন্তু তুমি দূর ভবিষ্যতের কথা নিয়ে জোর আলাপ আলোচনা শুরু করলে বলে মনে হচ্ছে। এত দূরের ভাবনা না ভেবে কাজ চলার মত যাহোক একটা কিছু নামকরণ করে ফেল দেখি।

সুভদ্রা কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে নানাধরনের নাম ভাববার চেষ্টা করল। তার চোখের সামনে কিছুকাল আগের একটা ছবি ভেসে এল। কুমারমহলের বাগানে অজস্র ফুলের স্তবক। প্রজাপতি উড়ছে, কি বিচিত্র তার রঙ, কি সহজ তার গতিভঙ্গী। একটি মেয়ে ছুটছে প্রজাপতির পেছন পেছন। তাকে বসতে দিচ্ছে না কোন ফুলের গুচ্ছে। তারপর সে নিজেই বসে পড়ল একটা শিলাখণ্ডের ওপর। সে প্রজাপতিটা ততক্ষণে ডেকে এনেছে তার দোসরকে। তারা নাচানাচি শুরু করেছে মেয়েটিকে ঘিরে।

কি হল, সহসা চমকে উঠল মেয়েটি। কার হাতের ছোঁয়া লেগে তার সারা অঙ্গে কাঁপন জাগল! কুমারবাহাদুর কেন সেদিন এই সামান্য নার্সকে এমন করে কাঁদালেন!

সুভদ্রা নিজের মনকে শাসন করল, এ সব কি ভাবছে সে। জীবনে শুধু কি নিজের পাওয়া না পাওয়ার কথাই ভেবে যাবে। কেন, তার ভাল লাগার মানুষটির জন্যে নতুন পথের দ্বার খুলে দিয়ে সে কি বলতে পারে না, তোমার পথ সুন্দর হোক।

তোমার পথের ধারে যে ফুলটি তোমার দিকে তাকিয়ে আছে তাকে তুলে নাও। কর তার সমাদর।

এই মুহূর্তে সুভদ্রার মনে হল এমন কিছু ত্যাগ নেই যা সে না করতে পারে কুমার অভিরামের জন্য।

কি, ভাবনার যে শেষ নেই তোমার দেখছি, বললেন কুমারবাহাদুর।

চমকে উঠল সুভদ্রা। মুখ থেকে তার বেরিয়ে এল একটি নাম হীরাবাঈ।

হীরাবাঈ, হীরাবাঈ, দু'বার করে নামটা উচ্চারণ করলেন কুমারবাহাদুর।

এবার হেসে বলল সুভদ্রা, ও নাম বহু মূল্যবান কুমারবাহাদুর। আঁধারেও জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠবে। আপনার মনের সব অন্ধকার কেটে যাবে ও নামের উচ্চারণে।

মনে মনে খুশি হলেন অভিরাম। মুখে বললেন, এ নামে প্রথম তুমিই ওকে ডাক দেবে, কারণ নামটা তোমারই দেওয়া।

দোহাই আপনার, আমি আর ওর ভেতর নেই। নাম দিয়েছি, ইচ্ছে হলে দাম চুকিয়ে দিন, পরের স্ত্রী ঘরে ফিরে যাই।

কুমারবাহাদুর বললেন, ভাইবোন এখন বোম্বের মেরিন ড্রাইভে বেড়াচ্ছে, সুতরাং এখন তোমাকে একা অরক্ষিত ঘরে কেমন করে ছেড়ে দিই বল।

আবার কথা ছুঁড়ে মারল সুভদ্রা, এমন রক্ষক আছে জানলে এ আস্তানা ছেড়ে কে আর অন্যত্র যেত বলুন।

এবার সুভদ্রা আর অভিরাম দু'জনেই হেসে উঠল।

সুভদ্রা গেছে ল্যাণ্ডোরে কিছু কেনাকাটা করতে।

বাগানে একটা ইজিচেয়ারের ওপর বসেছিলেন মহিলাটি।

পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন কুমার অভিরাম।

কি অপূর্ব ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন তরুণী মহিলাটি। চেহারার মধ্যে এমন এক মাধুর্য মাখানো রয়েছে যা কোনদিন অন্য কোন মহিলার মধ্যে দেখেছেন বলে কুমারবাহাদুরের মনে পড়ল না!

হীরাবাঈ, তুমি হীরাবাঈ।

কথা কটি আবেগের সঙ্গে বললেন অভিরাম।

আমি হীরাবাঈ!

হঠাৎ নিজের দিকে তাকিয়ে যেন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করলেন মহিলা। খুশিতে ভরে গেল তাঁর সমস্ত মুখ।

কুমার বললেন, আজ থেকে তুমি আমার হীরাবাঈ, শুধু আমার।

জলভরা চোখে মাথা নেড়ে হীরাবাঈ বললেন, কিছু নয় অভিরাম, আমি কিছু চাই না, শুধু তুমি কাছে থাক।

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। এক সময় অভিরাম বললেন, হীরাবাঈ, তোমার ঐ হাতখানা স্পর্শ করতে দেবে কি?

অভিরাম দুটি হাত প্রসারিত করলেন।

মনে মনে আমি আজ তোমাকে সবকিছু দিয়েছি কুমার।

রাতের নীরব অন্ধকার দুটি হৃদয়ের নিবিড়তার সাক্ষী হয়ে রইল। ঐ দূরের আলোক চিত্রপট মনে হল অনেক কাছে সরে এসেছে।

বাতাস কি বয়ে আনল অজানা কোন ফুলের গন্ধ!

ভোরে উঠে সুভদ্রা দেখল ছোট্ট একটি নতুন ঘটনা ঘটেছে।

এ বাড়িতে সুভদ্রারই হত প্রথম জাগরণ। এ তার হাসপাতালে থাকাকালীন অভ্যেস। এতদিন তার ব্যতিক্রম হয়নি। সে উঠে একে একে সবাইকে জাগাত। ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে রেখে দিত সাজিয়ে। তারপর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে ডাক দিয়ে জড়ো করত সবাইকে।

আজ একি হল! সুভদ্রা উঠে দেখল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় সব ওলটপালট হয়ে গেছে। তার বদলে কে যেন নতুন ফুল এনে সাজিয়ে রেখেছে ফুলদানি। চারদিক ঝকঝক তকতক করছে। সুভদ্রা দেখল চায়ের সরঞ্জাম এনে টেবিলের ওপর রাখলেন হীরাবাঈ। একটি কাপে চা ঢেলে সুভদ্রার কাছে এনে বললেন, আজ সকালবেলার প্রথম চা তোমার।

সুভদ্রা বিস্ময়মেশা হাসি হেসে কাপটা হাতে তুলে নিতে গিয়ে বলল, কি ব্যাপার বল তো, আজ সব উলটো ব্যবস্থা।

হেসে বললেন হীরাবাঈ, অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে, এখন সামান্য কিছু কাজ তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

তার মানে আমার হাতের অধিকারগুলো তুমি ছিনিয়ে নিতে চাও।

কপট ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে নিল সুভদ্রা।

বিব্রত হয়ে পড়লেন হীরাবাঈ। বললেন, আমি কি তোমাকে আঘাত দিয়েছি সুভদ্রা। তাহলে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সুভদ্রা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ক্ষমা নয়, দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে। আর সে শাস্তি নিতে হবে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে।

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে দিয়ে হীরাবাঈএর হাত ধরে কুমারবাহাদুরের ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল সুভদ্রা।

এই দেখুন, দোষীকে ধরে এনেছি। শাস্তি দিন একে।

কি করেছে ও?

হেসে জিজ্ঞেস করলেন অভিরাম।

কি করেনি বলুন, আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে জাঁহাপনা।

কান্নার সুরে কথাগুলো বলল সুভদ্রা।

ও বুঝেছি, বললেন কুমার, এবার তাহলে তোমাকে সব কাজের ভার থেকে রেহাই দিয়ে ওর ওপর বেশি করে কাজের ভার চাপিয়ে দিতে হবে। তবেই শাস্তি ওর পুরোপুরি হবে।

হায় মহারাজ, এতদিন পরে আপনার এই বিচার!

সুভদ্রার কথার ধরন দেখে হেসে উঠল সকলে।

এবার হীরাবাঈএর হাত ধরে টানতে টানতে বাগানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল সুভদ্রা। মুখচোখের

দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, হাঁ, যা ধরেছি ঠিক তাই। কাল রাতে তুমি নিশ্চয়ই রুটিনম্যাফিক কাজ কর নি।

কি করে জানলে তুমি?

তোমার চোখই বলছে।

আমার চোখ বলছে!

হাঁ, মহারানী, চোখে রঙ লাগলে আর কেউ না পারুক আমরা ঠিক ধরতে পারি।

সুভদ্রার কাছে কোন কিছু লুকনো আর সম্ভব নয় জেনে হীরাবাঈ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুভদ্রা হীরাবাঈএর হাত ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, খুব খুশি, তাই না?

এ যে কি সুখ তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না সুভদ্রা।

বলতে বলতেই দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল হীরাবাঈএর।

তা কাঁদো ভাই, এত খুশি ধরে রাখা কি যায়, কিছুটা উপচে তো পড়বেই।

ডাক এল ঘরের ভেতর থেকে, বলি কি মন্ত্রণা চলছে? এদিকে যে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

খুব গরম চা শরীরের পক্ষে হিতকর নয় বলেই ডাক্তারেরা অনেক সময় মন্তব্য করেন।

হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে হীরাবাঈএর হাত ধরে আবার ঘরে এসে ঢুকলো সুভদ্রা!

চায়ের টেবিলেই কথা উঠল। কথাটা ওঠাল সুভদ্রা।

ক'দিন মুসৌরীর বাইরে হানিমুনে বেড়িয়ে আসা দরকার।

বিয়ের অনুষ্ঠান? বললেন অভিরাম।

আপনি কি ঝামেলা বাড়াতে চান কুমারবাহাদুর। চিঠি দিয়ে ঘোষণা করে দিন আপনার প্রতিষ্ঠানের সব জায়গায় যে, আপনি ও লালসিয়া এস্টেটের বর্তমান মহারানী সবার শুভেচ্ছা প্রার্থনা করেন।

সেই ভাল সুভদ্রা। তুমি বুদ্ধিমতী। সুজন আর লক্ষ্মীবাইকে নিয়েই আমার যত ঝামেলা।

অমনি সুভদ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই আমি চললুম। পতি আর ননদিনীর নিন্দে শোনা কোন নারীর ধর্ম নয়।

হীরাবাঈ পরিস্থিতির লঘুত্ব বুঝতে না পেরে বললেন, তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না সুভদ্রা। ওর হয়ে আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

এখুনি এত টান!

হেসে অভিরামের দিকে ফিরে বলল, লালসিয়ার রানী সাহেবার পতিভক্তি অনুকরণযোগ্য।

প্রথমে কিছুতেই যেতে চায়নি সুভদ্রা হীরাবাঈ আর অভিরামের সঙ্গে, কিন্তু যখন সুভদ্রা না গেলে ওঁরাও যাবেন না বললেন, তখন বাধ্য হয়ে সঙ্গী হতে হল সুভদ্রাকে।

ওঁরা অতি সাধারণভাবে প্রায় কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হরিদ্বারের পথে।

গঙ্গা বয়ে চলেছে। অবিরল তার প্রবাহ। কত যুগ আগে নেমে এসেছিল প্রথম স্রোতোধারা, তারপর অনাদি অনন্ত কালের উদ্দেশ্যে সে বয়ে চলেছে। তার তীরে জেগে আছে হরিৎ অরণ্যলোক। নিকটে দূরে ধূমল নীল শৈলরেখা।

খরস্রোতা সুনীল জলধারায় আঙুল দিয়ে হিজিবিজি আলপনা কাটছিলেন হীরাবাঈ। পাশে বসেছিলেন অভিরাম। সুভদ্রা ইচ্ছে করেই দূরে সরে গেছে। সে বেড়াচ্ছিল গঙ্গার ধারে শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। লাল ফুলে ছেয়ে গেছে তরু বীথিকা। গুনগুনিয়ে গান করছিল সুভদ্রা। স্পষ্ট কোন গান নয়, অর্থবহ কোন কথা নয়, তবু প্রাণের গোপন অন্তঃপুর থেকে না বলা কোন বাণী আভাসে ইঙ্গিতে ছড়িয়ে পড়ছিল সুরের পাখায় ভর করে।

সন্ধ্যা নামল। অদূরে মনসাপর্বতের মন্দিরপথে বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। প্রবল স্রোতোপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হীরাবাঈ আর অভিরামের মনে হল তাঁরা যেন গঙ্গার বাঁধান বেদির ওপর বসে নেই। একটি নৌকায় ভেসে চলেছেন দুজনে। কোথায়, কতদূরে যে ভেসে যাচ্ছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। তাঁরা যেন অন্তহীন দূরের যাত্রী।

একটা কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ভরা ডাল পেছন থেকে সামনে এগিয়ে ধরতেই দুজনে অনেক স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এলেন।

কি হচ্ছে তোমাদের, এমন করে লোকে ভালবাসার স্রোতে ভাসে। কতক্ষণ পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছি তা খেয়ালই নেই।

হীরাবাঈ বললেন, আমার ভুল হয়ে গেছে, মাফ কর সুভদ্রা।

সুভদ্রা অমনি বলল, এবার নিজের জন্যেই শুধু মাফ চাইলে! আর কারো জন্যে না?

হাসলেন অভিরাম। হীরাবাঈ বললেন, এখন যে আমরা আর দু'জন নেই সুভদ্রা, এক হয়ে গেছি।

সুভদ্রা অমনি হীরাবাঈকে জড়িয়ে ধরে বলল, এরই ভেতর এত বুদ্ধি হয়েছে তোমার।

ওরা ব্রীজটা পেরিয়ে এপারে এল।

সন্ধ্যার আঁধারে এপারে বাঁধান ঘাটের ধারে ধারে চলেছে অন্য এক খেলা। ফুলে ভরা ছোট ছোট পাতার নৌকোয় দীপ জ্বেলে ভাসিয়ে দিচ্ছে গঙ্গার স্রোতে। ভাসতে ভাসতে এমনি শত শত আলোর নৌকো চলে যাচ্ছে বহুদূরে। সন্ধ্যার গঙ্গাবক্ষে যেন যাত্রীরা পরিয়ে দিচ্ছে গ্রন্থিবিহীন এক আলোর মালা।

ওরা তিনজনে তিনটি ফুলের নৌকো হাতে নিয়ে নেমে এল গঙ্গার ঘাটে। সাদা লাল ফুলের মাঝখানে জ্বালিয়ে দিল প্রদীপ। তারপর একে একে এসে দাঁড়াল গঙ্গার জলে।

প্রথমে ভাসালেন অভিরাম। মনে মনে বললেন, হে আমার পূর্বপুরুষগণ, তোমাদের প্রাণধারা আমি বহন করে নিয়ে চলেছি। এই গঙ্গার প্রবাহের মত সে ধারা সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে বয়ে চলেছে। তোমরা তৃপ্ত হয়ে আমাকে আশীর্বাদ কর। এই গঙ্গার প্রবাহের মত যেন আমার মধ্যে বহমান প্রাণধারাকে পবিত্র রাখতে পারি।

অভিরামের নৌকোকে অনুসরণ করল হীরাবাঈএর আলোর নৌকো। হীরাবাঈ মনে মনে বললেন, হে প্রভু, আমার ভালবাসা যেন গঙ্গার ধারার মত বেগবতী হয়। আমার ভালবাসা যেন সংসারের অন্ধকারের ভেতর ঐ আলোর মত পথ দেখিয়ে চলতে পারে!

সবশেষে ভাসাল সুভদ্রা। সে দুটি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করল, হে শঙ্কর, অভিরাম আর হীরাবাঈকে সুখী কর। আমার মন যেন কোনদিন ওদের সুখে ব্যথা না পায়।

সুভদ্রা নৌকোটা ভাসিয়ে দিয়েই গঙ্গায় ঢেউ তুলল। অমনি তার ফুলের নৌকো জলের ঘূর্ণির ভেতর পড়ে তলিয়ে গেল। ততক্ষণে ওদের দুটি নৌকো পাশাপাশি বহুদূর চলে গেছে।

কি হল সুভদ্রা, নৌকো ডোবালে কেন?

অবাক হয়ে বললেন অভিরাম।

ভাগ্য, বলল সুভদ্রা, জল পান করে কেউ শীতল হয়, আবার জলের তলায় আশ্রয় নিয়েও কেউ শীতল হয়। দ্বিতীয় পথটাই না হয় বেছে নিলাম।

তারপর হাসিতে ভরে দিয়ে হীরাবাঈএর হাত ধরে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, এখন কথার মালা না গেঁথে চল যাই রাতের আস্তানায়। আমার এমন ক্ষিদে পেয়েছে, হয়ত কিছু না পেলে তোমাকেই খেয়ে ফেলব।

এখানে সপ্তধারা। গঙ্গা সাতটি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে সাতটি তপোবনের সৃষ্টি করেছে। তারপর নীলধারা হরিদ্বারের পথে একস্রোতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। বড় প্রশান্ত আর নির্জন স্থান এটি। অগস্ত্য প্রভৃতি সপ্ত ঋষি এক একটি তপোবনে বসে তপস্যা করতেন। তাঁরা তাঁদের পাশেই পেতেন গঙ্গার স্বচ্ছ প্রবাহিত ধারা।

মন্দির রয়েছে সপ্ত ঋষির। পুষ্পিত বৃক্ষে ঘেরা আশ্রম। ওরা আশ্রম প্রদক্ষিণ করে এসে দাঁড়াল গঙ্গার কূলে। এখন গঙ্গা বহুদূর প্রসারিত চর ফেলে শীর্ণ কায়ায় বয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা সাদা পলির ওপর ঘুরে বেড়াল কতক্ষণ।

সুভদ্রা বলল, আচ্ছা কুমারবাহাদুর, সত্যিই কি সপ্তঋষি কোনদিন এখানে বর্তমান ছিলেন?

অভিরাম বললেন, অনেক প্রশ্নের জবাব মন থেকে পেতে হয় সুভদ্রা। সন তারিখ মেলান ইতিহাসের পাতায় তার হদিস পাওয়া যায় না।

একটু থেমে আবার বললেন, কালে কালে কত যাত্রী এসেছেন এখানে। তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করেছেন এই সপ্তঋষির অস্তিত্বে। আজ আমরা কেমন করে অবিশ্বাস করি বল।

হীরাবাঈ অভিরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বলতে চাইছ, বিজ্ঞানের, ইতিহাসের সত্যমিথ্যার হিসেব এখানে না করে শুধু বিশ্বাস করে যেতে।

হাঁ, ঠিক তাই। সব বিষয়ে বিশ্বাস আর নির্ভরতা থাকলে, অনেক দুঃখ, অনেক সংশয়ের হাত থেকে বাঁচা যায়।

হীরাবাঈ একবার তাকালেন ঐ ঋষিশূন্য সপ্তধারা বেষ্টিত সাতটি তপোবনের দিকে। তারপর বললেন, আমি ওঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি অভিরাম।

এর পরদিন গাড়ি এসে দাঁড়াল হৃষিকেশের সেতু লছমনঝোলার কাছে। ওরা গাড়ি থেকে নেমে সেতুর ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পার হতে লাগল। নীচে খরস্রোতা গঙ্গার ধারা। বিরাট আকারের পাথরের স্তূপ জেগে আছে গঙ্গার বুকে। তাদের পাশ কাটিয়ে বয়ে আসছে গঙ্গা। শিলাস্তূপের সঙ্গে আঘাত লেগে সৃষ্টি হচ্ছে অজস্র ফেনার ফুল।

ঐ দেখ দেখ, নীচে জলের ওপর শত শত মাছের ঝাঁক ভেসে উঠেছে।

হীরাবাঈ সোল্লাসে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন। অমনি কাছে এসে দাঁড়াল একটি ছেলে। সে আটার গোলা বিক্রি করে। ওরা তার কাছ থেকে কিছু কিছু খাবার কিনে ছুড়ে ফেলতে লাগল ব্রীজের তলায় গঙ্গার জলে।

বিচিত্র খেলা শুরু হয়ে গেল। মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে দৌড়ে এসে খাবার খেতে লাগল। খাবার শেষ হলে ওরা জলের খানিকটা তলায় কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে, তারপর আবার ওপর থেকে খাবার পড়লে ছুটোছুটি লুফোলুফি শুরু হয়ে যায়।

যতক্ষণ না ঐ ছেলেটার কাছে খাবারগুলো ফুরোলো ততক্ষণ ওরা কেউই নড়ল না ব্রীজের ওপর থেকে।

তারপর আবার শুরু হল যাত্রা। ব্রীজ পেরিয়ে পাহাড়ের কোলের রাস্তা ধরে ওরা চলতে লাগল গীতাভবনের দিকে। গঙ্গা বয়ে চলেছে। এক প্রান্তে সুশোভিত 'বাণপ্রস্থ' আশ্রমটি তুলনাহীন।

কুমার অভিরাম ভুলে গেছেন তাঁর ঐশ্বর্যের কথা। অতি সাধারণ একটি মানুষ জেগে উঠেছে তাঁর মধ্যে। পায়ে চলার পথে পথে ছড়িয়ে আছে কত আনন্দ। পাখি · কটা ডেকে উঠল। সুভদ্রা আর হীরাবাঈ গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

ঐ যে লেজটা দুলছে!

কই, কোথায় কোথায়?

তোমাদের চেঁচামেচিতে না পাখিটা উড়ে যায়।

এমনি অজস্র কথায় ভরে গেল প্রভাত বেলা।

কে বলল, ঐ পথ বদরীনারায়ণের পথ।

কত ছবি ভেসে উঠল ওদের মনে।

ওরা একটা গাছের তলায় বসে আগামী কোন এক সময় কেদারনাথ, বদরীনাথ যাত্রার প্ল্যান করতে লেগে গেল।

যদি যেতে হয় পায়ে হেঁটেই যাওয়া ভাল, বললেন হীরাবাঈ।

অভিরাম বললেন, একেবারে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী পর্যন্ত যাত্রা।

হীরাবাঈ বললেন, পিঠের ওপর বোঝা ফেলে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে চলেছি আমরা। রাতে বিশ্রাম করছি চটিতে। এ সুখের কি তুলনা আছে!

অভিরাম অমনি বললেন, আমাদের যাত্রাপথে দেখতে দেখতে যাচ্ছি কত পর্বত, কত স্বচ্ছ স্রোতোধারা। লোকে বলে, যাত্রাপথে থেমে থাকতে নেই। আমরা কিন্তু থামব, দেখব, আবার চলব।

নীরবে বসেছিল সুভদ্রা। এতক্ষণ অন্য দুজনের লক্ষ্য পড়ল তার দিকে।

অভিরাম বললেন, তুমি যে বড় চুপচাপ বসে আছ, তোমার মতামত কিছু বল?

হীরাবাঈ বললেন, যে শেষে কথা বলে অনেক সময় সে-ই বলে সেরা কথা।

সুভদ্রা বলল, তোমরা কেন কথা বন্ধ করলে হীরাবাঈ। এতক্ষণ কি মধুর স্বপ্নই না আমি দেখছিলাম! তোমরা চলেছ, পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে। চলেছ তুষার রাজ্যে। দুঃখের যাত্রা শেষে তোমাদের চোখের সামনে খুলে গেল তীর্থমন্দিরের দ্বার। প্রদীপ জ্বলছে। বদরীবিশালের পূত পবিত্র প্রদীপশিখা।

অভিরাম বললেন, আমি দেখছি, তোমরা দুজনে নত হয়ে নমস্কার করছ তীর্থদেবতাকে।

সুভদ্রার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল, দূর থেকেই আমাকে নমস্কার জানাতে হবে কুমারবাহাদুর।

হীরাবাঈ অমনি বলে উঠলেন, তুমি তীর্থযাত্রায় যাবে না আমাদের সঙ্গে?

সুভদ্রার হাসি আরও ম্লান, কেন আর আমার দুঃখকে বাড়াচ্ছ বোন। খাঁচার পাখি ওড়ার সুযোগ কতটুকু পায় বল? যেটুকু পায় সেটুকু শুধু বাড়িয়ে তোলে তার ব্যথা।

অভিরাম বুঝলেন, এ আনন্দের প্রসঙ্গটি সুখের চেয়ে দুঃখই আনল বেশি করে।

তিনি বললেন, দূরের চিন্তা না করে চল এখন কাছের চিন্তা করা যাক। বেলা ক্রমেই বাড়ছে। গীতাভবন দেখে আমাদের ফিরতে হবে হরিদ্বারে।

গীতাভবনে ঢোকার আগে ওরা দেখল কালিকমলীবাবার আশ্রমে সাধুরা ভাণ্ডারা নিয়ে যাচ্ছেন।

সাধুসন্তেরা ঈশ্বরচিন্তা করেন, তাই কালিকমলীবাবার মাধ্যমে ঈশ্বরও তাঁর ভক্তদের আহার জুগিয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যবস্থা বহুকাল থেকে চলে আসছে।

ওরা ঢুকল গীতাভবনে। মহাভারতের বহু ঘটনা চিত্রিত হয়ে আছে গীতাভবনের প্রাচীর-পটে।

অভিরাম এক এক করে সব কটি ঘটনা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন হীরাবাঈকে।

তারপর তারা এসে দাঁড়াল মন্দিরের ভেতর। ঘণ্টা দুলছে। যাত্রীরা এসে দুলিয়ে যাচ্ছে ঘণ্টা। ঢং ঢং আওয়াজ উঠছে তার থেকে।

ওরা মনে মনে শুভ কামনা জানিয়ে ঘণ্টা বাজাল।

বাতাস বইছে। মন্দিরের উদ্যান-বাটিকা থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। পূজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। স্তোত্রপাঠ চলেছে। যাত্রীরা আসা যাওয়া করছে। ভেতরেই যাত্রীনিবাস। সেখানে দু'দিনের আস্তানা বেঁধেছে দূরদূরান্তের যাত্রীরা!

ওরা মন্দিরের সামনে চুপচাপ বসে রইল কতক্ষণ। মনে মনে মগ্ন হয়ে রইল প্রার্থনায়।

সুভদ্রা মনে মনে বলল, প্রভু, মঙ্গল কর সকলের। দুঃখতাপে কাতর হৃদয়ে দুঃখ সহ্য করার শক্তি দাও।

এরপর গঙ্গা পার হয়ে ওরা এসে উঠল যাত্রিবাহী বাসে। অনভ্যাসের ফলে, অভিরামের পদে পদে ঘটল বিঘ্ন, কিন্তু হীরাবাঈ আর সুভদ্রার সঙ্গ তাকে যেন নবজন্ম দান করল।

অবশেষে ফুরিয়ে এল আনন্দের কটি দিন।

ফেরার আগের দিন সন্ধ্যায় হর-কি-পেড়ির পাশ দিয়ে ওরা চলে এল গঙ্গার নির্জন এক প্রান্তে। এখানে কতকগুলো গাছ জটলা করে আছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা।

চেঁচিয়ে উঠল সুভদ্রা, আরে শীগ্‌গির এস এদিকে। দেখে যাও কত নুড়ি পড়ে আছে এখানে।

হীরাবাঈএর হাত ধরে ছুটলেন অভিরাম।

রাশি রাশি ছোট বড় নানা আকারের মসৃণ নুড়ি। কোনটি নীল, কোনটি বেগুনী, সাদা, লাল, সবুজ, বিচিত্র সব রঙের বাহার।

হীরাবাঈ কুড়ুতে যাচ্ছিলেন। সুভদ্রা বাধা দিয়ে বলল, আমি আবিষ্কার করেছি, সুতরাং জিনিসগুলো আমার দখলে। এক পা এগিয়েছ কি হাতাহাতি হয়ে যাবে।

হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলেন অভিরাম আর হীরাবাঈ। সুভদ্রা কুড়িয়ে চলল নুড়ি।

এক সময় কোঁচড় ভরে নিয়ে এসে বলল, দয়া করে দীন দাসীর এই ক্ষুদ্র কটি উপহার গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন মহারানী।

হীরাবাঈ হেসে বললেন, তোমার এই দানের সবটুকু ভার বইবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যে কটি না নিলে তুমি দুঃখ পাবে তাই নিলাম।

এই বলে ভাল ভাল কটি নুড়ি সুভদ্রার আঁচল থেকে বেছে নিলেন।

অভিরাম বললেন, দেখ, দেখ ঈশ্বরের কি আশ্চর্য সৃষ্টি। পাহাড়কে চূর্ণ করে প্রবাহিত হচ্ছে যে নদী, তারই তরঙ্গে আবর্তিত শিলাখণ্ডের কি বিচিত্র পরিণতি। এরা কোথায় পেল এত বিভিন্ন রং, এমন বিভিন্ন আকার।

ওরা এসে বসল গঙ্গার কূলে। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। দূরে নীল পাহাড়ের আভাস আবছা হয়ে আসছে। বনের পাতা কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা একটা বাতাস বয়ে গেল। গঙ্গা ছলছল কলকল শব্দে বয়ে চলেছে।

হীরাবাঈ বললেন, সুভদ্রা ভালবেসে আমাকে যা দিলে, তাই আমি তোমাকে দিতে চাই।

এই বলে নুড়িগুলো তুলে দিল অভিরামের হাতে।

ওরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কিছু সময় টুকরো টুকরো কথা বলল। গুনগুন করে গান গাইল সুভদ্রা। ওরা তাকে অনুরোধ করল গলা ছেড়ে গাইবার। সুভদ্রা গাইল, ওরা শুনল। হীরাবাঈএর হাতখানা কখন নিজের হাতের ভেতর তুলে নিল অভিরাম। রাতের অন্ধকারে সুভদ্রার গান শরতের সন্ধ্যায় ঝরা-শিশিরের কান্না বলে মনে হল।

তুমি!

কেন, এত তাড়াতাড়ি আমাকে বুঝি আশা করনি?

সুভদ্রা ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বলল, তা করব না কেন। তবে অভ্যর্থনাটা উল্টো হয়ে গেল আর কি! আমার জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালে।

শোন!

সুজনের গলার স্বরে কোন রকম ক্রোধের ভাব ফুটে উঠল বলে মনে হল না সুভদ্রার। তবু মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে সে ফিরে দাঁড়াল।

কুমারমহলে গিয়ে শুনলাম, অভিরাম ক'দিন হল কোথায় গেছে কেউ জানে না। তোমার হদিস' কেউ দিতে পারল না। ভাবলাম, অসুখের কথা তুমি চিঠিতে লিখেছিলে, হয়ত কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে হাসপাতালে গেছ।

সুভদ্রা বলল, হাসপাতালে যাওনি আমার খোঁজে?

আমার ভাগ্য ভাল তার আগেই তুমি এসে গেলে।

হাসতে লাগল সুজন সিং। হাসিটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হল। হাসি থামলে যেন অতি ব্যস্ত হয়েছে এমনি ভাবে বলে উঠল, আরে চল চল, তোমার অর্ডারমত কত রকমের বোম্বে প্রিন্ট এনেছি দেখবে চল।

ঘরের ভেতর রাশীকৃত কিউরিও, প্রিন্ট শাড়ি প্রভৃতি এলোমেলো ছড়ান পড়ে আছে। সুভদ্রাকে নিয়ে সুজন সিং ঢুকল সেই ঘরে।

সারা বোম্বে কিনে আনলে নাকি? সুভদ্রা বলে উঠল।

যাইনি তো কম দিন। আর সঙ্গে যিনি গেছেন তিনি তাঁর ভাবীজীর জন্যে দোকান উজাড় করে সওদা করেছেন।

লক্ষ্মীবাঈ কোথায়?

এতক্ষণ লক্ষ্মীবাঈএর খোঁজ নিতে পারেনি সুভদ্রা মনের উত্তেজনায়।

সুজন উত্তর করল, ওর কথা আর বল না। বায়না ধরল প্লেন ছেড়ে ট্রেনে ফিরবে। এখন এত গরমের জার্নি সইবে কেন। শয্যা নিয়েছে।

সুভদ্রা ত্রস্ত পায়ে যাচ্ছিল সেদিকে। হাতখানা তার ধরে ফেলল সুজন সিং।

অত ব্যস্ত হয়ো না। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়েছে। ওকে একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম করতে দাও।

একটু থেমেই বলল, আচ্ছা সুভদ্রা, কেম্‌টি ফল্‌স্‌-এ স্নানের জন্যে গেলে কেমন হয়? এ কদিনে গায়ে যে ময়লা জমেছে ঐ ওপর থেকে ঝরে পড়া জল ছাড়া ওকে দূর করা যাবে না।

এতদূর যাবে কি করে? তাছাড়া অবেলায়।

একবার কুমারমহলে ফোন করে দিলওয়ারকে গাড়ি নিয়ে আসতে বললে হয়। এখন লোকজন থাকবে না ঝরনার ধারে, সেই তো ভাল।

সুভদ্রা ভাবল এখুনি সুজন ফোন করলেই অভিরাম এসে ফোন ধরবেন। তখন সুজনের সন্দেহটা আরও ঘনিয়ে উঠবে। তাই সে বলল, তুমি ক্লান্ত, এখন জল দাও চোখেমুখে, আমিই ফোন করে ডেকে নিচ্ছি।

সুজন সিং গৃহান্তরে যাবার ছলনা করে দাঁড়িয়ে রইল আড়ালে। সুভদ্রা তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে ডায়াল করতে লেগে গেল।

আমি কথা বলছি।

ওপার থেকে ভেসে এল, কি ব্যাপার?

ও এসে গেছে। দিলওয়ারকে দিয়ে গাড়িখানা এখুনি পাঠিয়ে দিন। কেম্‌টি যাবার ইচ্ছে হয়েছে।

ওপারের জিজ্ঞাসা, ওর আসার তো কোন খবর ছিল না?

সে পরের কথা। এখন যা বলছি দয়া করে দেরি না করে তাই করুন।

আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু হাসল সুজন সিং। কঠিন আর হিংস্র হয়ে উঠল তার মুখখানা।

কেম্‌টি ফল্‌স্‌ থেকে শেষ বাসখানা চলে গেছে যাত্রী নিয়ে। এখন বাস স্ট্যান্ড সম্পূর্ণ নির্জন। দুটি পাশাপাশি চালাঘর শুধু দাঁড়িয়ে আছে। এ দুটিতে থাকে শরবত আর চায়ের ব্যবস্থা। সারাদিন যাত্রীরা এখান থেকে প্রয়োজন মত চা আর শরবত কেনে। শেষ বাস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারেরাও জিনিসপত্র ঘাড়ে করে দূর গাঁয়ের উদ্দেশ্যে চলে যায়। তখন চালাঘর দুটি রাতের কোন কোন জন্তুর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

সুজন সিংএর কার-খানা এসে থামল নির্জন বাস স্ট্যান্ডে।

দিলওয়ার সিং খুলে দিল দরজা। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সুভদ্রা আর সুজন সিং। ওরা এবার চালাঘর দুটোর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। ড্রাইভার দিলওয়ার সিং বসে রইল পাথরের মূর্তির মত গাড়ির ভেতরে। ওরা দুজনে সাবধানে নেমে চলল নিচের উপত্যকায়।

পাকদণ্ডীর সংকীর্ণ পথ। নিচে নানা ধরনের গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ওপরের বাস স্ট্যান্ড থেকে অনেক নিচে নেমে এসে একেবারে প্রপাতের পাশে এসে দাঁড়াল। বিরাট বিরাট কয়েকটি শিলাস্তূপ এলোমেলো ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর তারই ওপর বহু উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঝরনার জলধারা।

বেলা পড়ে এসেছিল। তার ওপর এত নিচে নেমে এসে সুভদ্রার মনে হল যেন সে সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারের রাজ্যে নেমে এসেছে।

উপত্যকার ভেতর ঝোপঝাড়, গাছগাছালির মাথা থেকে মুছে গেছে শেষ আলোর রেশ। একটা থমথমে অন্ধকার শুধু রাতের জন্যে বাসা তৈরি করছিল।

ছমছম করে উঠল সুভদ্রার সারা দেহ। সে তাকিয়েছিল ঝর্ণার দিকে। সুজন সিংয়ের গলা শোনা গেল, এস এখানে।

সুজন বসেছিল একটা শিলার ওপর। সুভদ্রা মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেল সেইদিকে।

বস।

অতি দূর থেকে ভেসে আসা অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর বলে মনে হল সুভদ্রার।

সে ধীরে ধীরে বসল শিলাস্তূপের ওপর, সুজনেব পাশে।

একটা প্রশ্নের জবাব দেবে আমার?

সুভদ্রা সুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, কি জানতে চাও বল।

তুমি কি আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলে?

এ কথা কেন? পালটা প্রশ্ন করল সুভদ্রা।

হিংস্র একটা জন্তুর মত গর্জন করে উঠল সুজন সিং, জবাব দাও।

পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল সুজন সিংএর ক্রুদ্ধ গলার স্বর।

সুভদ্রা তাকাল সুজন সিংএর দিকে। স্পষ্ট করে বলল, কি বললে খুশি হবে তুমি?

আমি খুশি হতে চাই না, সত্যকে জানতে চাই।

তাহলে জেনে রেখ, ভালবেসে তোমার কাছে আমি আমার সবকিছু সমর্পণ করিনি।

তা আমি জানতাম, আর এও জানতাম অভিরাম তোমাকে গ্রাস করেছে।

চুপ কর মিথ্যাবাদী।

ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে গেল সুভদ্রার সারা দেহ।

হা হা হা হা করে অট্টহাসি হাসল সুজন সিং।

ভয়াবহ একটা প্রতিধ্বনি সন্ধ্যার পাহাড়ে লেগে কত বিচিত্র বিকট আওয়াজ তুলে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল।

হাসি থামলে সুজন সিং উচ্চারণ করল কথাটা, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী। আমি মিথ্যাবাদী! বিয়ের আগে সেবা করতে এসে অভিরামের হাতের ভেতর হাত রেখে কে বসে থাকত? স্বামীকে বিদেশে পাঠিয়ে কে কাটায় সারা দিনরাত রাজকুমারের বাড়িতে? কে ঘুরে বেড়ায় পরপুরুষের সঙ্গে আমোদ লুটবার জন্য। দাও এর উত্তর, দাও আমার কথার জবাব।

উন্মাদের মত চেঁচাতে লাগল সুজন সিং।

সুভদ্রা বলল, আমি তোমার সব কথারই জবাব দিতে পারতাম, কিন্তু একটি কথারও জবাব আর বের করতে পারবে না আমার মুখ থেকে।

এগিয়ে আসছে সুজন সিংএর দুটো হাত। সাঁড়াশীর মত ঐ হাত দুটো চেপে ধরল সুভদ্রার গলা।

হয় তুমি জবাব দেবে, নাহলে চিরদিনের মত বন্ধ করে দেব তোমার স্বর।

দম বন্ধ হয়ে আসছে সুভদ্রার। চোখের সামনে বহু ওপর থেকে ঝরে পড়া ঝরনাটাকে মনে হচ্ছে, একটা অতি হিংস্র চলমান অজগর। সে যেন ছুটে আসছে তাকে গ্রাস করতে।

চীৎকার করতে গিয়েও কোন আওয়াজ বেরোল না সুভদ্রার গলা দিয়ে।

সহসা অতি উজ্জ্বল একটা আলো এসে পড়ল তাদের ওপর। চমকে ছিটকে দাঁড়াল সুজন সিং। অচৈতন্য অবস্থায় শিলাস্তূপের ওপর গড়িয়ে পড়ল সুভদ্রা।

আলো যে ফেলেছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। তীব্র আলোর একটা বৃত্ত শুধু রচিত হয়েছে চোখের সামনে। সুজন সিংএর সমস্ত পাপ ঐ আলোর সামনে যেন স্পষ্টরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে। সে শুধু অসহায়ের মত এই অভাবনীয় ঘটনার দিকে তাকিয়ে রইল। থরথর করে কাঁপতে লাগল তার সমস্ত শরীর।

বজ্রগম্ভীর গলা শোনা গেল ড্রাইভার দিলওয়ার সিংএর, সাহাব, টর্চটা হাতে নাও, মাইজীকে আগে দেখতে দাও আমাকে।

মন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে এল সুজন সিং। দিলওয়ারের হাত থেকে টর্চটা নিজের হাতে নিয়ে তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

দিলওয়ার সিং ঝরনার থেকে জল তুলে ছিটিয়ে দিতে লাগল সুভদ্রার মুখে চোখে। কিছুক্ষণের ভেতর জ্ঞান ফিরে এল। উঠে বসার চেষ্টা করতেই দিলওয়ার তাকে তেমনি শুইয়ে রেখে দিল। ঠিক করে দিতে লাগল অসংবৃত বেশবাস?

এবার চেঁচিয়ে উঠল সুজন সিং, বেল্লিক কোথাকার, জেনানার গায়ে হাত দিতে সরম হচ্ছে না?

কথার উত্তর দিতে ফিরে তাকাল না দিলওয়ার সিং। তেমনি মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে দিতে দিতেই বলল, মায়ের গায়ে হাত দিলে ইজ্জৎ যায় না সাব।

এরপর সুজন সিং চলল আগে আগে টর্চ হাতে নিয়ে। সুভদ্রাকে বহন করে দিলওয়ার সিং দুর্গম চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

গাড়ি চলছে। পেছনের সিটে অতি ক্লান্ত অবস্থায় এলিয়ে পড়ে আছে সুভদ্রা। তারই পাশে বসে আছে সুজন সিং। কারো মুখে কোন কথা নেই। সুভদ্রা আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। সুজন সিং অস্থির মানসিকতার ভেতর কত কথা ভেবে চলেছে।

দিলওয়ারের গলা শোনা গেল, মাইজীর মত জেনানাকে আপনি চিনতে পারলেন না সাব। এ তল্লাটে এমন জেনানা মিলবে না।

খেঁকিয়ে উঠল সুজন সিং, তোমাদের কুমারসাব যাকে নিয়ে খুশি থাকেন, তোমরা তো তার ওপর খুশি থাকবেই।

এমন কথা বলবেন না সাব। মাইজীকে আমাদের কুমারসাব বহিনের মত নজর করেন।

চুপ কর দিলওয়ার।

একটু থেমে আবার বলল, আমিই তোমাকে কুমারবাহাদুরের চাকরিতে বহাল করেছিলাম, মনে আছে?

আছে সাব। আর তাই তো দিলওয়ারের হাত থেকে আপনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। দোসরা আদমী হলে এই কেম্‌টি ফল্‌স্‌এ তাকে রেখে দিয়ে যেতাম।

সুজন সিং কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। সে জানে, দিলওয়ার কম কথা বলে, কিন্তু যেটুকু বলে সম্পূর্ণ দেহ আর মনের জোর নিয়েই বলে।

সুজন সিং এবার হতাশার সুর গলায় ঢেলে বলল, দিলওয়ার, তুমি শুধু অন্যের দিকটাই দেখছ, একবার ভেবে দেখেছ কি আমার কথাটা। স্বামী বিদেশে গেলে তার জেনানা যদি অন্য পুরুষের কাছে রোজ যাওয়া আসা করে তাহলে তাকে কি সতী বলব? আর যদি এটা তোমার নিজের বাড়ির ব্যাপার হত, তাহলে বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, তুমি কি পারতে তাকে নিয়ে ঘর করতে?

গাড়িটা একটা বাঁক নিল। হেড লাইটটা ঘুরে এসে পড়ল নতুন রাস্তার ওপর। অন্ধকার দূরে সরে গেল।

দিলওয়ার বলল, বাবুজী আপনার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি। আমি দুনিয়ার মানুষকে অনেক দেখেছি। একটা কথা বলি শুনুন।

আমার গুরুজী একসময় একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। কতকগুলো পহেলবান লোক কোদাল আর ঝাড়ু নিয়ে অন্ধকারকে সাফ করে ফেলবে বলে মনস্থ করল। তারা যত কোদাল দিয়ে অন্ধকারকে দূরে ফেলে দেবার চেষ্টা করে, যত ঝাড়ু দিয়ে সাফ করে ফেলার চেষ্ট করে তত অন্ধকার জমে যায়। শেষে একটি লোক তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কাণ্ড দেখে বলল, ওরে মূর্খ, একটা আলো জ্বেলে দে, এখুনি অন্ধকারটা সাফ হয়ে যাবে।

একটু থেমে বলল দিলওয়ার, সন্দেহের হাতিয়ার দিয়ে মনের আঁধারকে দূর করা যায় না বাবুসাব, একটু বিশ্বাস, একটু ভরসার আলো জ্বেলে দেখতে হয়।

চুপ করে বসে রইল সুজন সিং। মুখে তার কথা নেই। মনে হল হয়ত কোথাও তার ভুল হয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে এল, দুটি যুবকযুবতী যদি একই সঙ্গে বাইরে বাইরে পরস্পরের সান্নিধ্যে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে কি তারা ঠিক থাকতে পারে। তার ওপর যদি তারা কোন এক সময় প্রেমসূত্রে আবদ্ধ থাকে।

সুজনকে চুপ করে থাকতে দেখে দিলওয়ার সিংই এবার কথা বলল, জানি সাব, এ ড্রাইভারের কথায় আপনার বিশ্বাস হবে না। তবে শুনে রাখুন, মাইজী কুমারবাহাদুরের কোঠীতে এক মেমসাহাবের সেবা করতে যেতেন, আর তাঁকে সুস্থ করে তাঁর সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

মেমসাব। সুজন সিং যেন আকাশ থেকে পড়ল।

হাঁ, কুমারবাহাদুর আর মাইজী ছাড়া সেকথা অন্য কেউ জানে না। আমি গাড়ি চালাই, তাই আমিও জানি কথাটা। এই যে কিছুদিন আগে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হল দেরাদুন ইস্টিশানে, সেই ট্রেনে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে এক নান দুর্ঘটনার মুখে পড়ে যান। আমি তাঁদের গাড়িতে করে গোপনে নিয়ে আসি কুমারবাহাদুরের আস্তানায়। আমার সাহেবের কোন চোট না লাগলেও খ্রীষ্টান নানটি মাথায় আঘাত লেগে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। ডাক্তার গর্গ তাঁর অপারেশন করেন। এখন সুস্থ হয়েছেন তিনি, তবে কোথা থেকে এসেছেন, কি নাম তাঁর, সব ভুলে গেছেন। কিছু আর মনে করতে পারেন না।

একটু থেমে বলল, আপনাকে সাব এত কথা বলতাম না, তবে মাইজীর ওপর আপনার মিছে সন্দেহটা দূর করবার জন্য আমাকে এসব কথা বলতে হল।

সুজন চঞ্চল হয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য একটা উজ্জ্বল আলো এসে সুভদ্রা সম্বন্ধে তার সন্দেহের অন্ধকারটুকু মুছে দিয়ে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে আবার ঘনিয়ে উঠল মেঘ।

এই নতুন খ্রীষ্টান মেয়েটি তার কাল হয়ে এল। নানটি যে তার পূর্বস্মৃতি হারিয়েছে এ কথা বুঝতে তার বাকী রইল না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সে কিইবা করতে পারে। রাগ হল তার লক্ষ্মীবাঈএর ওপর। এত দিনের ভেতর এই মেয়েটা পারল না অভিরামের মত একটা চঞ্চল মনের মানুষকে জয় করে নিতে। সব মাটি, সব মাটি। এই মুহূর্তে তার নিজের মাথার চুলগুলো দুঃখে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। না, ম্যানেজার হবার কোন আশাভরসাই আর তার রইল না। যেখানে লক্ষ্মীবাঈএর আকর্ষণ থাকবে না, সুজন সিং তো নো হোয়্যার।

মনে মনে হা হা করে হাসতে ইচ্ছে করল। তারপর হতাশায় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সুজন সিংএর বুক ঠেলে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল সুজন সিংএর আস্তানায়। সুভদ্রা ততক্ষণে একটু সুস্থ বোধ করছিল। সুজন তাকে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, দিলওয়ার, দেখ কথাটা যেন রাষ্ট্র না হয়।

দিলওয়ার সিং হেসে বলল, হুজৌর, এ কথা রাষ্ট্র করে দিলে যে আমার মাইজীর অপমান, দিলওয়ার এমন বুড়বক বনবে না।

সুজন ক্ষমা চেয়ে নিল সুভদ্রার কাছে। অনুতপ্ত স্বামী যেমন করে করুণ আবেদন জানায়। সুভদ্রা বলল, সবই যখন জেনেছ, তখন আমার দিক থেকে আর কোন ক্ষোভ নেই। শুধু জেনে রেখ, সুভদ্রা বেঁচে থাকতে এমন কাজ করবে না যাতে তার স্বামীর মাথা নিচু হয়ে যায় পাঁচজনের কাছে।

সুজন মনে মনে ভাবল, প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। নিজের সৌভাগ্যের পথে যখন কাঁটা পড়েছে তখন সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে অভিরামের পথেও কাঁটা ছড়িয়ে দিতে। যদি সে ছলে বলে কৌশলে ঐ উড়ে এসে জুড়ে বসা মেয়েটার সন্ধান পায় একবার, তাহলে অভিরামের এই মধুচক্র হয়ত ভেঙে চুরমার করে দিতে পারবে। তখন সাধু সেজে লক্ষ্মীবাঈকে দিয়ে আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে ভাঙা ভাগ্যের মোড়টা আবার ফেরাতে পারে কিনা।

অবশ্য এ সংকল্প মনেই রইল সুজন সিংএর। বাইরে তার কোন প্রকাশই দেখা গেল না। লক্ষ্মীবাঈকে সে স্বাস্থ্য ভেঙে যাবার অজুহাতে পাঠিয়ে দিল পাঞ্জাবে। গোপনে বলে দিল, হয় অভিরামকে তুমি পাবে, নয় অভিরাম কাউকে পাবে না। এখন আমাকে একা একা আমার পরিকল্পনাগুলো কাজে লাগাতে দাও।

এদিকে সুজন সিং নীরব রইল সুভদ্রার কাছে। অভিরামের সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগল পুরাতন বন্ধুর মত।

কিছুদিন এমনি করে কেটে যাবার পর সুজন একদিন কুমার অভিরামকে বলল, দেখ অভিরাম, বহুদিন থেকে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ও সেই সব ধর্মস্থানের ইতিহাস, পুরাণ, লোককাহিনী প্রভৃতি জানার ইচ্ছে আমার প্রবল। তোমার সঙ্গে বিলেত থেকে আসা অবধি সে সুযোগ আমার হয়ে ওঠেনি, কেবল কাজের ভেতরেই তুমি আমাকে রেখে দিয়েছ। এখন কিছুদিন আমাকে ছুটি দাও দেখি। সারা ভারতবর্ষটা একবার ঘুরে মনের ইচ্ছেটা মেটাই।

হেসে বললেন অভিরাম, এমন স্ত্রী ঘরে থাকতে বিবাগী হবার ইচ্ছেটা হল কেন জানতে পারি কি?

সুজন সিং হেসে জবাব দিল, দূরে থাকলে পরস্পরের আকর্ষণ বাড়ে হে। কোনদিন তো এ চক্রে পড়লে না, পড়বে যখন বুঝতে বিলম্ব হবে না।

এবার কুমার বললেন, যাচ্ছ যাও, প্রয়োজন হলেই ম্যানেজারকে টাকার জন্যে লিখতে সংকোচ কর না।

সুজন বলল, তোমার ঋণ শোধ দেব এমন ক্ষমতা বা ধৃষ্টতা আমার নেই, তবে এ যাত্রায় হয়ত নিজের জন্যে টাকা পয়সার দরকার আমার হবে না। শুধু একটি অনুরোধ করে যাব, প্রয়োজন হলে সুভদ্রার আর্থিক দিকটা তুমি একটু দেখ।

কিছুসময় চুপচাপ থেকে বলল, অবশ্য তুমি জান, শত অসুবিধে থাকলেও সুভদ্রা মুখ ফুটে কিছু চায় না কারো কাছে।

অভিরাম বললেন, সে ভার আমার রইল, তুমি নিশ্চিন্তে তীর্থভ্রমণে যেতে পার।

সুভদ্রার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সুজন সিংএর।

সুভদ্রা বলল, এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

সুজন সিং হেসে বলল, ক্ষেপেছ সুভদ্রা, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব ভাবতে যত মজা, কাজে কিন্তু তত সোজা নয়। আর তোমাকে তো বলেছি, আমার এই পরিকল্পনাটা যদি ঠিকমত করে উঠতে পারি তাহলে হয়ত সরকারের কাছ থেকে একটা পুরস্কারও পেতে পারি।

কিন্তু সে তো এক আধদিনের কাজ নয়।

কাজটা অবশ্য তাড়াতাড়ি হবার নয় বলেই মনে হয়, তবে ঠিক ঠিক কাজে না নামলে কতদিন লাগবে তা আন্দাজে বলা শক্ত।

এবার সুভদ্রা একটু গম্ভীর হল, এর ভেতর তুমি কি একটিবারও আসবে না?

হাসল সুজন। বলল, এমন কথাই বা ভাবছ কেন, মন না টিকলে সেই দণ্ডেই টিকিট কেটে তোমার কাছে চলে আসতে পারি।

সুভদ্রা বলল, আমি আর কিছু চাই না, শুধু তুমি ভাল থেকো এই প্রার্থনা জানাই আমার ভগবানের কাছে।

প্রথম যাত্রা করল সুজন সংবাদপত্রের অফিসগুলোতে। মোটামুটি ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের তারিখ বা সময় তার অজানা ছিল না। সে পুরনো কাগজগুলো নেড়েচেড়ে ঠিক ঠিক খবরটা বের করল। অ্যাকসিডেন্টের পরদিন ছবি ছাপা হয়ে খবর বেরিয়েছিল।

তারপর দু'একদিন বেরিয়েছিল আহতদের তালিকা। এরপর সুজন সিং দেখল, সংবাদপত্র নীরব।

কিন্তু সুজন সিং ব্যারিস্টার। তাই কেসটার নাড়িনক্ষত্র জেনে নেবার ইচ্ছেটা সে দমন করতে পারল না। সংবাদপত্রের অফিসে বসে আবার দেখতে শুরু করল বিভিন্ন তারিখের কাগজগুলো।

অতি ছোট্ট একটি খবর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ব্যক্তিগত কলমে এক জায়গায় লেখা আছে, 'এ্যান বার্ণাদেৎ, তুমি যেখানে থাক চলে এস। আমরা তোমার ফিরে আসার জন্যে প্রভুর কাছে রোজ প্রার্থনা জানাচ্ছি।

মাদার ইউজিনিয়া ও উপাসিকা সম্প্রদায়।'

অনেকক্ষণ এই ছোট্ট একটুখানি খবরের ওপর থেকে চোখ তুলে নিতে পারল না সুজন সিং। তারপর ডায়েরীতে পরিষ্কার অক্ষরে লিখে নিল এই মূল্যবান খবরটুকু।

এরপর শুরু হল খোঁজা। এক একটি গীর্জা আর তৎসংলগ্ন হোমে মাদার ইউজিনিয়ার খোঁজ করতে লাগল সুজন সিং।

ইতিমধ্যে একদিন সে একটি খবর পেল। ঐ খবরটি তার কাছে মোটেই সুখকর ছিল না, কিন্তু তার থেকে কিছু পরিমাণে তার লাভই হল।

সে তার এই ভ্রমণের কালে একদিন দিল্লীতে কুমারবাহাদুরের কোন একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জানতে পারল, কুমার অভিরাম সম্প্রতি হীরাবাঈ নামের এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

হীরাবাঈ নামটা শুনে প্রথমে একটু চমকে উঠেছিল সুজন সিং। তারপর নিজের মনেই হেসে নিয়ে ভাবল, বার্ণাদেতের হীরাবাঈ সাজতে কতক্ষণ।

অবশ্য এই বিবাহে তার মর্মাহত হবারই কথা, কিন্তু সে নিজেকে আশ্চর্য ভাবে সামলে নিয়ে ভাবল, এখন কোনকিছু প্রাপ্তির আশা ছেড়েই শেষ গরলটুকু ঢালতে হবে।

সুজন সিং ঐ প্রতিষ্ঠানে একটি কার্ডও দেখল। নব-দম্পতির ছবি ছাপা রয়েছে তাতে। সে সেই ছবিখানা সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখল। তারপর আবার যাত্রা শুরু। প্রায় দুটি বছর পরে সারা ভারত ঘুরে রাঁচির এক আশ্রমে কিছুকাল অপেক্ষার পর পেল মাদার ইউজিনিয়ার সন্ধান। মাদার কার্যোপলক্ষে ইওরোপ গিয়েছিলেন, তাই এ বিলম্ব।

মাদার ইউজিনিয়া অতিথিদের অভ্যর্থনার জায়গায় দেখা করলেন সুজন সিং-এর সঙ্গে। বর্ষীয়সী ব্যক্তিত্ব সম্পন্না ধর্মযাজিকার মূর্তি।

বলুন আপনাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

অতি ধীরে কথাগুলি বললেন মাদার ইউজিনিয়া।

দীর্ঘদিন আপনার সন্ধান করেছি মাদার, তারপর এখানে অপেক্ষা করেছি প্রায় একটি বছর। আপনার ইওরোপ থেকে ফিরে আসারই প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

মাদার ইউজিনিয়া কিছু পরিমাণে বিস্মিত হলেন, এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সুজন সিংএর দিকে।

এবার সুজন সিং বলল, আপনিই কি সিস্টার বার্ণাদেতের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

বহুদিনের কথা। ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের পর কোন সন্ধান না পেয়ে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন মাদার ইউজিনিয়া। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। মাদার ইউজিনিয়া বার্ণাদেতের আশা ছেড়েই দিয়েছেন। সিস্টার বার্ণাদেৎ যে জীবিত নেই এ বিশ্বাস ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হয়েছে তাঁদের সকলেরই মনে। আর তা ছাড়া জীবিত থাকলে এতদিনে সে যেখানেই থাকুক অবশ্যই ফিরে আসত তাদের মাঝে।

মাদার ইউজিনিয়া বললেন, হাঁ, আমি তাঁর জন্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।

নিশ্চয়ই আপনি তাঁর কোন সংবাদই পাননি।

না মহাশয়।

আচ্ছা মাদার, সিস্টার বার্ণাদেৎ কি কোন ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন?

হাঁ, তিনি যে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন, সেই ট্রেন দেরাদুন স্টেশনের মুখেই অ্যাকসিডেন্টে পড়ে।

যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আরও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

করুন।

সিস্টার বার্ণাদেৎ কোথাও কি কাজে যাচ্ছিলেন?

মুসৌরীর কনভেন্টে আমরা তাঁকে কিন্ডারগার্টেন বিভাগের চার্জ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। নতুন খোলা হচ্ছিল ঐ বিভাগটি।

সুজন সিং বলল, সিস্টার বার্ণাদেৎ মুসৌরীতেই আছেন মাদার, তবে কনভেন্টে নয় লালসিয়ার কুমার বাহাদুরের মহলে।

চমকে উঠলেন মাদার ইউজিনিয়া।

অসম্ভব, অসম্ভব, যদি কোন দুর্ঘটনার ফলে তিনি সেখানে গিয়ে থাকেন তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই আমাদের খবর পাঠাতেন। আর তাছাড়া মুসৌরীতে আমাদের কনভেন্টে সহজেই গিয়ে উঠতে পারতেন। আপনি ভুল করেছেন মহাশয়।

ভুল আমার সহজে হয় না মাদার। সিস্টার বার্ণাদেৎ বর্তমানে বিবাহিতা, আর তিনি বিবাহ করেছেন লালসিয়া এস্টেটের বর্তমান রাজা অভিরাম সিংকে।

হেসে আবার বলল সুজন সিং, তাঁর বিবাহোত্তর নাম হয়েছে হীরাবাঈ।

মনে হল মাদার ইউজিনিয়া থরথর করে কেঁপে উঠলেন। কম্পিত গলায় বললেন, কোন কিছুতে বিচলিত হওয়া আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ, তবু সত্যের খাতিরে বলব, আমি বিচলিত বোধ করছি মহাশয়।

পকেট থেকে একটি ফটো বের করে মাদার ইউজিনিয়ার হাতে দিয়ে বলল সুজন সিং, চিনতে পারেন এই মহিলাকে। যদিও আমাদের দেশীয় পোশাক রয়েছে তাঁর গায়ে।

মাদার ইউজিনিয়া অনেকক্ষণ দেখলেন। চোখ মুছলেন বার বার। আবার দেখলেন।

সিস্টার বার্ণাদেতেরই ছবি। একটু থেমে আবার বললেন, সত্যকে বিশ্বাস করা, স্বীকার করাই আমাদের ধর্ম, কিন্তু এ ঘটনা যে আমার বিশ্বাসের বাইরে মহাশয়।

সুজন সিং গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ সত্য, কিন্তু বড় নিষ্ঠুর সত্য মাদার।

মাদার ইউজিনিয়া বড়ই অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, এ ঘটনা আমার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত সাধনার ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। আপনাকে আমি সংক্ষেপে বার্ণাদেৎ সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বললে আপনিও হয়ত আমার মতই বিস্মিত না হয়ে পারবেন না।

সুজন সিং আগ্রহী শ্রোতার মত তাকিয়ে রইল মাদার ইউজিনিয়ার মুখের দিকে।

ফাদার পিটার ইউরোপের একটি চার্চ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে ভারতে এসেছিলেন। তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিভিন্ন জায়গায় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। একসময় তিনি কোন এক পার্বত্য জনবিরল তীর্থপথে এক পরমাসুন্দরী হিন্দু রমণীর সাক্ষাৎ পান। তাঁদের মধ্যে পথ পরিভ্রমণ কালেই প্রেমের সঞ্চার হয়। তাঁরা তীর্থপথের থেকে কিছু দূরে একটি গুপ্ত স্থানে কালযাপন করতে থাকেন। অচিরে সেই রমণীর দেহে মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিল। কিন্তু যথাকালে একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে ইশ্বরের করুণা লাভ করলেন।

অতঃপর সেই শিশুকন্যাকে বহন করে ফাদার পিটার একদিন আমার আশ্রমে এসে দাঁড়ালেন। অকপটে স্বীকার করলেন ধর্মজীবন থেকে তাঁর স্খলনের কথা। পরে সেই শিশুকন্যাকে এই আশ্রমের করুণার উপর সমর্পণ করে তিনি ফিরে গেলেন স্বস্থানে।

সেই মাতৃহীন শিশুর আমি হলাম জননী। তাকে শৈশব থেকে এই দীর্ঘ পঁচিশটি বছর শিক্ষা দিয়াছি সর্বপ্রকার সংযত জীবন-যাপনের। সে ছিল আমার আশ্রমের প্রাণ আর আদর্শস্বরূপিণী। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মহাশয়, কি করে এমন অসম্ভব ঘটনাও ঘটতে পারে!

সুজন সিং বলল, সিস্টার বার্ণাদেতের কাহিনী যথার্থই বিচিত্র। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কাহিনীর মধ্যেও এর তুলনা বিরল নয়। ঋষি বিশ্বামিত্র স্বর্গনটী মেনকার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে তাঁকে সঙ্গদান করেন, ফলে জন্ম হয় শকুন্তলার। তারপর পিতামাতা উভয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে সে আসে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে। সেখানে জননী গৌতমী প্রভৃতির স্নেহচ্ছায়ায় তিনি সংবর্ধিত হতে থাকেন। অবশেষে রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর আকস্মিক সাক্ষাৎ, গোপন প্রণয় ও গান্ধর্ব বিবাহের অনুষ্ঠান হয়।

একটু থেমে বলল সুজন সিং, সিস্টার বার্ণাদেতের কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীর সাদৃশ্য আপনি আশা করি অনুধাবন করতে পেরেছেন। সুতরাং অবিশ্বাস্য বলে কিছু উড়িয়ে দেবার উপায় কোথা বলুন মাদার।

না, সবই সত্য, সবই সম্ভব। তবু আমার মনে হয়, একবার ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি, আমার সব শিক্ষাই কি ভুল। একবার জীবনের পথ পরিবর্তনের সময় মনে কি পড়ল না আমার কথা। এ যদি অন্য কোন নামের বিষয় হত তাহলে হয়ত আমি অবিশ্বাস করতে পারতাম না মহাশয়। তারা অনেক সময় আসে সংসারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। তারপর এই পরিবেশে কিছুকাল কাটিয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে ফিরে যেতে পারে পূর্বাশ্রমে। তাদের পক্ষে হয়ত এটা কোনদিন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বার্ণাদেতের পক্ষে এ তো সম্ভব ছিল না মহাশয়। তার ব্যবহার, তার প্রার্থনার নিবিষ্টতা, তার পবিত্র দেহ আমাকে এই রূঢ় সত্যকে স্বপ্ন বলে ভাবতেই প্ররোচিত করছে।

সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়লেন মাদার ইউজিনিয়া। তিনি প্রার্থনার ভঙ্গীতে উর্ধ্বে তাকিয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলতে লাগলেন।

মাদার, আপনি বড় বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এই ঘটনায় একমাত্র রাজা অভিরাম সিংই অপরাধী, বার্ণাদেৎ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

অতি করুণ হাসি ফুটে উঠল মাদার ইউজিনিয়ার মুখে। তিনি বললেন, উভয়ের সম্মতি, উভয়ের মিলিত চেষ্টা ছাড়া বিবাহের প্রকাশ্য ঘোষণা কি করে সম্ভব বলুন?

সুজন সিং বলল, এর মধ্যে একটি রহস্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে মাদার।

সবিস্ময়ে মাদার ইউজিনিয়া তাকালেন সুজন সিংএর দিকে।

সিস্টার বার্ণাদেৎ ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর পূর্বস্মৃতি। তাঁর সেই বিস্মৃতির সুযোগ নিয়েছে লালসিয়া এস্টেটেব রাজাবাহাদুর।

এ কি সত্য।

সম্পূর্ণ সত্য মাদার। এখনও কি আপনি ওকে পেতে চান আপনার কাছে?

আমি তাকে সব সময়েই চাই মহাশয়। তার এই অসহায় অবস্থার কথা শুনে আমি আরও বিচলিত হয়ে পড়েছি।

ডাক্তারেরা বলেন, আবার কোন উত্তেজনার কারণ যদি ঘটে তাহলে ফিরে আসতে পারে রোগীর পূর্বস্মৃতি। হয়ত এমনও ঘটতে পারে, আপনাকে দেখলেই তাঁর মনে পড়ে যাবে সমস্ত ঘটনা।

মাদার ইউজিনিয়া বললেন, এ বিষয়ে আপনি কি উপদেশ দেন মহাশয়।

আমি বলি, এমন একটি পবিত্র আত্মাকে অসহায়ভাবে সংসারে নিষ্ঠুর বন্ধনের মাঝে পীড়িত হতে দেওয়া কোনমতেই উচিত হবে না। শেষ চেষ্টা করে দেখাই আপনার কর্তব্য, নাহলে এই ধর্মাশ্রমের পবিত্র কর্তব্য থেকে বিচ্যুতির জন্য ঈশ্বরের নিকট আপনি অপরাধী হবেন। এ বিষয়ে যদি আপনি আমার সাহায্য চান আমি পবিত্র কর্তব্যবোধে আপনাকে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও সাহায্য দিতে পারব।

পরামর্শ শেষে মাদার ইউজিনিয়া সুজন সিংএর সঙ্গে মুসৌরী যাত্রা করলেন।

এদিকে কুমারমহল কিঞ্চিদধিক দু'বছরের এক শিশুর কলধ্বনিতে মুখর। যে দরিদ্র রিকশাচালকের স্ত্রীকে একদিন হীরাবাঈ নিজের হাতের আংটি খুলে দিয়েছিলেন, তারা স্বামী স্ত্রীতে এখন কুমারমহলের কাজে নিযুক্ত। প্যারামবুলেটরের যুগ অতিক্রম করে অভিরামের শিশুপুত্র অভিজিৎ সিং এখন রিকশাচালক হাম্বীর ভাইএর হাত ধরে ছোট ছোট পা ফেলে ঘুরে বেড়ায়। কাঁধে চেপে লাল লাল কুরুশের ফুল পাড়ে।

হাম্বীর যখন বলে উঁহু বড্ড লেগেছে, তখন শিশু অভিজিৎ মজা পেয়ে আরও জোরে চেপে ধরে হাম্বীর ভাইএর চুলের মুঠি। তারপর কাঁধের ওপর বসে ঘোড়সওয়ারের মত নাচতে থাকে।

এতে দু'জনের মজার আর অন্ত থাকে না।

এখন কুমার বাহাদুরের গুপ্তগৃহের দ্বার খুলে গেছে। যে লীলারঙ্গের পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছিল

এই গুপ্তগৃহ, আজ তার আর কোন প্রয়োজনই নেই। এখন লালসিয়া ইস্টেটের মহারানী হীরাবাঈএর পাঠ ও নিভৃত বিশ্রামের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে ঐ গৃহ।

সুভদ্রার কাছে এই দীর্ঘ আড়াই বছরে দু'বার মাত্র এসেছিল সুজন সিং। সুভদ্রা তাকে বলে তার নিঃসঙ্গ অবসর সময়টুকু কাটাবার জন্য পুনরায় নার্সের কাজ গ্রহণ করেছে। প্রথমে সামান্য মৌখিক বাধা দিলেও মনে মনে খুশিই হয়েছে সুজন। অন্ততঃ অলস সময়গুলো সে অভিরামের সঙ্গে গল্প করে কাটাবে না।

ঘরে ফিরে এসেছে সুজন। বন্ধুবৎসল সে, স্ত্রীর প্রতি অগাধ ভালবাসা তার। বহু তথ্য নাকি তার সংগ্রহে হয়েছে পুঞ্জীভূত। এ যেন অন্য মানুষ। সম্পূর্ণ সহজ সরল। তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যে যেন মুছে গেছে তার সমস্ত কলুষ, সমস্ত গ্লানি।

কয়েক দিন হল কি যেন হয়েছে হীরাবাঈএর। কেউ কিছু ধরতে পারে না, স্পষ্ট করে তিনিও বলতে পারেন না কিছু। রোজকার কাজের ফাঁকে এক এক সময় কেমন যেন চমকে ওঠেন। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। কি যেন ভাবেন তিনি, তারপর চোখেমুখে কেমন এক যন্ত্রণা বা অসুস্থতার ছবি ফুটে ওঠে। অন্য কেউ না জানলেও হীরাবাঈ জানেন এই অসুস্থতার শুরু কোথায়। তিনি রোজকার মত তাঁর পাঠগৃহে একদিন বসেছিলেন, এমন সময় সুজন সিং ঢুকল সেখানে সুভদ্রাকে নিয়ে।

নানা বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা আর পরিহাস রসিকতার পর এক সময় হঠাৎ সুজন সিং খুলে দিল পুবদিকের একটা জানালা।

এই জানালাটা চিরকালই বন্ধ থাকতে দেখে এসেছেন হীরাবাঈ। তাই তিনিও বোধ করেননি খোলার কোন প্রয়োজন।

কিন্তু এ জানালাটি বন্ধের একটা সামান্য কারণ ছিল। তা জানতো একমাত্র সুজন সিং। যখন কুমার অভিরামের লীলাগৃহ ছিল এই গুপ্ত স্থানটি তখন থেকেই বন্ধ করে রাখা হত এ জানালা। কারণ এই জানালাটি খুললেই দেখা যেত ল্যাণ্ডোর ক্যান্টের চার্চের শীর্ষদেশ। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ধর্মস্থানের আভাস মানুষের মনকে ভীত করবে বলেই জানালা বন্ধের এই ব্যবস্থা হয়েছিল। এইভাবে ধর্মের পৃথিবীকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল দূরে।

সুজন সিং জানালাটি খুলে দিয়ে চলে গেল। আর সেইদিন থেকেই কৌতূহলী হীরাবাঈএর চোখে ফুটে উঠতে লাগল অন্য এক জগতের ছবি।

তিনি ঐ জানালার কাছে বসে দেখতে পেতেন দেওদার বনের আড়ালে জেগে ওঠা চার্চের শুভ্র শীর্ষদেশ। তিনি তাকিয়ে থাকতেন সেদিকে সবকিছু ভুলে।

একদিন তাঁর চোখে পড়ল শভ্র পোশাকপরা নানের দল চলেছেন দেওদার বনের পথ ধরে। হাতে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ। তাঁরা আঁকাবাঁকা পথ ধরে কখনো ওপরে উঠতে লাগলেন, কখনো বা নীচে নামতে লাগলেন।

হীরাবাঈ দেখতে লাগলেন সে দৃশ্য। ঐ তো নানেরা আড়াল হয়ে গেলেন গভীর বনের মধ্যে। আবার দেখা যাচ্ছে। একে একে বেরিয়ে আসছেন বনের ভেতর থেকে। এবার তাঁরা চলে গেলেন পাহাড়ের ওপারে। স্তব্ধ হয়ে গেছে পারিপার্শ্বিক। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে। দেওদার বনের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কখন কাঁপন শুরু হয়ে গেছে হীরাবাঈএর মনে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তাঁর শুধু মনে হল এ ছবি যেন তাঁর বহুদিনের চেনা। যেন কোন জন্মান্তরের পথ পেরিয়ে তিনি চলে এসেছেন এখানে। একটা গভীর যোগসূত্র যেন সহসা ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন বহু পরিচিত কোন জীবনের ছবি, কিন্তু কেমন করে তিনি সেখানে ফিরে যাবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। একটি বহমান নদীর ওপরে যে সেতুটি ছিল সেই সংযোগসূত্রটি কে যেন ভেঙে দিয়েছে। নদীর এপারে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন হীরাবাঈ, কিন্তু ওপারে ঐ নানেরা তাঁর কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না।

কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে, কোথায় যেন এক ঝাঁক দূরাগত মৌমাছির গুঞ্জনের মত প্রার্থনার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

হীরাবাঈএর মাথার ভেতর সে ধ্বনি-গুঞ্জন প্রবল হয়ে বাজতে লাগল। হীরাবাঈ চীৎকার করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

মুখে চোখে জল দিয়ে বিছানায় শুয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন তিনি। কিন্তু ঐ দিন থেকেই মাঝে মাঝে কেমন যেন মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে তাঁর। কেমন আচ্ছন্নের মত আবিষ্ট হয়ে থাকেন কতক্ষণ।

সুভদ্রার মুখ থেকে হীরাবাঈএর পরিবর্তনের খবর স্বাভাবিকভাবেই কানে এসে পৌঁছয় সুজন সিংএর। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সব রোগী অনুকূল পূর্বপরিবেশের স্পর্শ পেলেই রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

সুজন সিং ভাবল, তার এই জানালাটা খুলে দিয়ে আসার পরিকল্পনা তার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এবার আসল আঘাত দেবার জন্যে তৈরি হল সুজন সিং।

কুমার অভিরামের সঙ্গে এ বিষয়ে একদিন কথা হচ্ছিল সুজন সিংএর।

সুজন বলল, সুভদ্রার কাছে শুনলাম রানীসাহেবা নাকি দৈহিক দুর্বলতায় ভুগছেন?

সঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না সুজন। ডাক্তার গর্গকে ডেকেছিলাম, তিনি বললেন, নার্ভের কোন দুর্বলতা বলেই মনে হচ্ছে।

সুজন জোর দিয়ে বলল, আমি তাই আধুনিক কতকগুলো টনিকে গভীর বিশ্বাসী নই। আমার মনে হয় কোলাহলের বাইরে আলো হাওয়ার ভেতর যদি মনের খুশিতে ঘুরে বেড়াতে পান কয়েকদিন, তাহলে রোগের লেস থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

কুমার অভিরাম বললেন, আমিও যে সে কথা ভাবিনি তা নয়। আর কি যে পড়ার বাতিক হয়েছে, ঐ গুপ্তগৃহটি বন্ধ করে আজকাল প্রায় সবটুকু সময়ই মনে হয় ওখানে ও পড়াশোনা করে।

পড়াশোনা করা ভাল কথা ঠিক, কিন্তু অতিরিক্ত পড়াশোনাতে অনেক সময় মানসিক গোলমাল ঘটতে পারে। তুমি বরং সকাল সন্ধ্যে ওঁকে ঐ ল্যাণ্ডোর ক্যান্টের দেওদার বনের দিকে বেড়াতে যাবার পরামর্শ দিতে পার। যত বেশি সময় বাইরে থাকবেন, তত বেশি হবে মানসিক উপকার।

কুমার অভিরামের মনে ধরল বন্ধু সুজন সিংএর পরামর্শ।

এরপর অভিরাম হীরাবাঈকে পাঠাতে লাগলেন সন্ধ্যা সকাল কোন নির্জন স্থানে ভ্রমণের জন্য।

প্রথম প্রথম নিজে সঙ্গে যেতেন। পরে হীরাবাঈ একা যেতে লাগলেন। মনে হল কিছু উন্নতি হচ্ছে তাঁর। কাজের মধ্যে আজকাল কখনো অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে তাঁর কাছে আনা হয় শিশু অভিজিৎকে। অমনি সহসা তাকে নিয়ে শুরু হয়ে যায় তাঁর খেলা। যেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। একটু আগে যে শুরু হয়েছিল তাঁর ভাবান্তর তা আর মনেই থাকে না।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব শুরু হয়েছে। শহরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় সান্তাক্লজের মূর্তি শোভা পাচ্ছে। কোথাও রথের ওপর সান্তাক্লজ; শিং তোলা হরিণ সামনের দুটি পা তুলে ছুটে চলার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ পাইন, ফারের গাছ। রঙ-বেরঙের লাল নীল হলদে আলোর বাহার। শহর মুসৌরী প্রমোদে হয়ে উঠেছে প্রমত্ত।

অভ্যেস মত হীরাবাঈ একাই আজ সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। লালটিব্বার পথ ধরে কিছুদূর ওপরে উঠে আসতেই দেখা হয়ে গেল তাঁর সুজন সিংএর সঙ্গে।

অভিবাদন জানিয়ে সুজন সিং বলল, শুভসন্ধ্যা রানীসাহেবা।

হীরাবাঈ সহাস্যে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

তারপর একই সঙ্গে উঠতে লাগলেন ওপরে।

সুজন বলল, আজ পিতা যীশুর জন্মদিন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি বেথেলহামের আকাশে উজ্জ্বল তারাগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ঐ দেখুন, তাই মনে হয় না কি?

হীরাবাঈ তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। তারায় তারায় আকাশ ছেয়ে গেছে। উজ্জ্বল নীল

একটি তারা যেন নেমে এসেছে বহু নীচে। ঐ দেওদার বনের ওপারে গীর্জার মাথার ওপর জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হীরাবাঈ। সুজন সিংএর ডাকে তাঁর চমক ভাঙল।

চলুন, আজ গীর্জার দিকে যাওয়া যাক।

হীরাবাঈ কেমন এক অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেছেন। তিনি চলতে লাগলেন সুজন সিংকে অনুসরণ করে।

ওরা এসে পৌঁছল গীর্জার কম্পাউণ্ডের ভেতর। সান্তাক্রুজ রথে করে নিয়ে আসছেন শিশুদের জন্য উপহার।

হীরাবাঈএর সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, তিনি যেন নানের পোশাক পরে হাতে অজস্র উপহার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে নেচে চলেছে ফুলের মত সুসজ্জিত ছেলেমেয়েরা। নাচের শেষে তারা হাত পেতে দাঁড়িয়েছে, আর হীরাবাঈ তাদের হাত ভরে দিচ্ছেন খেলনা, বই আর চকোলেট।

সুজন সিং ডাকল, রানীসাহেবা।

হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন হীরাবাঈ, কখনো বা ঘুরতে লাগলেন করতালি দিয়ে। সুজন সিংএর ডাক শুনতে পেলেন না।

রানীসাহেবা, রানীসাহেবা? বারবার ডাকতে লাগল সুজন সিং। শেষে হাত ধরে টান দিতেই সম্বিত ফিরে এল।

আসুন, গীর্জায় প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে।

হীরাবাঈ এগিয়ে চললেন। প্রার্থনার সুর ভেসে আসছে। কাছে এসেই ওরা দাঁড়াল দরজার একটু ভেতরে। মঞ্চে মাতা মেরী রয়েছেন। কি অপূর্ব স্নিগ্ধতা তাঁর চোখেমুখে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ভরে জল এল হীরাবাঈএর।

প্রার্থনার সুর কান্নার মত ভেসে আসতে লাগল তাঁর কানে। কত পরিচিত এ সুর তাঁর কাছে। হীরাবাঈএর গলা কাঁপতে লাগল। কখন তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরোতে লাগল প্রার্থনার কথা, প্রার্থনার সুর।

সরে গেছে সুজন সিং হীরাবাঈএর কাছ থেকে। হীরাবাঈ তন্ময় হয়ে গাইছে প্রার্থনার গান।

প্রার্থনা শেষ হল। হীরাবাঈ সামনের বেদির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চিত্রার্পিতার মত। একে একে সকলে চলে গেল হীরাবাঈকে অতিক্রম করে। হলঘর শূন্য হয়ে গেল। হীরাবাঈ যেমন তাকিয়েছিলেন তেমনি তাকিয়ে রইলেন।

সহসা কে যেন মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন। তারপর পায়ে পায়ে নেমে আসতে লাগলেন সোপান বেয়ে।

হীরাবাঈ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন।

কে, কে আসছেন তাঁর দিকে এগিয়ে! কত চেনা, কত পরিচিত। হীরাবাঈ দৌড়তে লাগলেন। দৌড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন কে যেন তাঁর কানের কাছে অতি মধুর সুরে ডাক দিলেন, বার্ণাদেৎ, এ্যান বার্ণাদেৎ।

চোখ মেলে তাকাল বার্ণাদেৎ। বলল, মাদার এখানে আমি শুয়ে কেন?

তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে বার্ণাদেৎ।

মাদার ইউজিনিয়া বার্ণাদেৎকে নিয়ে চললেন গীর্জার ভেতর মহলে।

মাদার বড় ঘুম পাচ্ছে, কেন যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে আমার চোখ।

চল, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

কুমারবাহাদুর আদালতে লড়েছিলেন। লালসিয়া ইস্টেটের এক বছরের প্রায় অর্ধেক রাজস্ব তিনি ব্যয় করেছিলেন এই কেসে, কিন্তু সুরাহা কিছুই করতে পারেননি।

বড় বড় ব্যারিস্টারেরা আদালতে প্রমাণ করেছিলেন যে বার্ণাদেৎ স্বেচ্ছায় কুমার অভিরামকে বিয়ে করেছেন এবং তাঁর তিন বছরের সন্তানই তার প্রমাণ। কিন্তু আসামী বার্ণাদেৎ চিনতে পারেন নি কাউকেই।

শেষে ডাক্তার গর্গ এসেছিলেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। তিনি সবিস্তারে ইতিহাস বর্ণনা করে বলেছিলেন, অ্যাকসিডেন্টের ফলে পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়েছিল বার্ণাদেতের। তার ফলে তিনি ন্যায়সংগতভাবেই নতুন জীবনে প্রবেশ করে সংসার রচনার অধিকারী হয়েছিলেন।

কিন্তু টিকল না ডাক্তার গর্গের যুক্তি। অনুরূপভাবে বার্ণাদেৎ যখন তাঁর পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়েছেন, এবং ফিরে যেতে চাইছেন তাঁর পূর্বাশ্রমে, তখন তাঁকে নিবৃত্ত করার ক্ষমতাও আইনের থাকবার কথা নয়। নতুন জীবনে প্রবেশ যদি সম্ভব হয় কোন অ্যাকসিডেন্টের ফলে, তাহলে মানসিক সংঘাতের ফলে তাঁর নিষ্ক্রমণকেও নিতে হবে স্বীকার করে।

রায় বের হল, মাদার ইউজিনিয়ার স্বপক্ষে। বার্ণাদেৎ নিযুক্ত হলেন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কিণ্ডারগার্টেনের ভারপ্রাপ্তা শিক্ষিকারূপে।

কিছুদিন পরে ঘটনায় যথার্থ যবনিকাপাত ঘটল। সুভদ্রা কুমার অভিরামের শিশুপুত্র অভিজিৎকে ভর্তি করে দিয়ে এল কনভেন্টের অন্তর্ভুক্ত কিণ্ডারগার্টেনে।

পড়া আর খেলার শেষে যখন ছুটির ঘণ্টা পড়ল তখন দেখা গেল সবাই চলে গেলেও একটি ছেলে যেতে চাইছে না।

বার্ণাদেৎ তাকে আদর করে ঘরের বাইরে যেতে বললেই সে মা মা বলে জড়িয়ে ধরতে চায়।

শেষে বিব্রত হয়ে এক সময় বার্ণাদেৎ একটু ধমকের সুরে সেখান থেকে ছেলেটিকে চলে যেতে বললেন। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে বাইরের দিকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

বার্ণাদেৎ পেছনের দরজার দিকে মুখ ফেরালেন।

কিন্তু বার্ণাদেতের আর যাওয়া হল না। তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল কিণ্ডারগার্টেন হলের পেছনের দেয়ালে রক্ষিত একটি মূর্তির ওপর।

শিশু যীশু খ্রীষ্টকে কোলে নিয়ে পরম স্নেহে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন মাদার মেরী।

কতক্ষণ বার্ণাদেৎ তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। তাঁর দুচোখ ভরে উঠল অশ্রুতে।

উন্মাদিনীর মত ঘরের বাইরে ছুটে এসে অভিজিৎকে তুলে নিলেন বুকের মধ্যে। এবার দুচোখ বেয়ে তাঁর শ্রাবণের ধারা ঝরতে লাগল।

পাশে দাঁড়িয়ে সেই পুরাতন রিকশাওয়ালা ঘণ্টি বাজিয়ে চলল আনন্দে। অভিজিৎকে বুকে জড়িয়ে হীরাবাঈ বার্ণাদেতের পোশাকেই রিকশাতে গিয়ে উঠে বসলেন।

●

আলোর ঠিকানা

এমনি করে সীমার দিনের শুরু। তখনও কলোনীর ঘরগুলোতে ভোরের কলরব ওঠেনি। ও বেরিয়ে এল দরজা খুলে রাস্তায়। কাঁধে ঝুলছে একখানা ব্যাগ। দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল। প্রায় দিনই এমনি করে তাকে দাঁড়াতে হয়। ও পথে বেরোলেই মানিকের যত দরকারি কথাগুলো মনে পড়ে যায়। এটা সীমার অভ্যেস হয়ে গেছে। রাত দশটায় সে যখন স্টেশন থেকে আধ মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফেরে তখন কারো সঙ্গে কোন কথা বলার মত শরীরের অবস্থা থাকে না। কোনরকমে দুটি ভাতে ভাত নামিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। তারপর ভোরের পাখি ডাকার আগেই বেরিয়ে পড়া।

পেছন থেকে মানিকের গলা শোনা যায়, তিন তিন মাসের মাইনে বাকী সে খেয়াল কারো নেই। কালকের ভেতর মাইনের টাকা না দিতে পারলে বের করে দেবে কলেজ থেকে। তাছাড়া অ্যানুয়েল পরীক্ষার ইতি হয়ে যাবে।

সীমা কোন কথা বলল না। শুধু শুনে নিল কথাগুলো। তারপর আবার পথ চলা।

সেই ছোট্ট মানিক আজ কত বড় হয়েছে। মায়ের মুখ ও যখন দেখেছে তখন জ্ঞান পড়েনি ওর। ওকে জন্ম দিয়েই মা মারা গেছেন। বাবা অসহায় দুটি ভাই-বোনকে নিয়ে কোনরকমে সংসার চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মানিকের সব ভারটুকুই এসে পড়েছিল সীমার ওপর।

তারপর একদিন বাবাও চোখ বুজলেন। তখন কত আর বয়স সীমার। তারই ভেতর সে মানিককে লেখাপড়া শেখাতে লাগল, নিজেও শিখল।

আজকাল বড় হয়েছে মানিক। কলেজে পড়ছে। কি রকম আশ্চর্য এক পরিবর্তন এসেছে ওর ভেতর। প্রয়োজন ছাড়া সে দিদির সঙ্গে একটিও কথা বলবে না। অভিমান সীমারও কম নেই। কথা না বলে বলুক। দিদির কর্তব্য সে ঠিকই করে যাবে।

কলোনীর সীমানা পার হয়ে এল সীমা। পথের বাঁকেই ছাইগাদার ওপর রোজকার মত শুয়ে ছিল সর্দার। কারা যে কবে কুকুরটার এই নামকরণ করেছিল তা আজ আর কারো মনে নেই, তবে এই নামেই সে পাড়ায় পাড়ায় পরিচিত। সীমাও তাই জানে। সর্দার রাতের বেলা প্রায়ই ঘুমোয় না। অপরিচিত প্রবেশকারীকে কলোনীর ঠিক মুখেই আটকাবার চেষ্টা করে। তর্জনগর্জন করে তার পেছনে আসতে থাকে, তার উদ্দেশ্যটা মোটামুটি আঁচ করতে পারলে তবে পথ ছেড়ে দেয় তাকে। শেষমেশ পেছন থেকে একবার ডাক দিয়ে বলে, সাবধান, যা তা কিছু একটা করে বস না যেন।

সীমার পায়ের সাড়া পেলেই উঠে আসে সর্দার। গা ঝাড়া দিয়ে ছাইগুলো ঝেড়ে ফেলে। অতঃপর দুটো পা সামনে আর দুটো পা পেছনে যদ্দূর সম্ভব টান টান করে আড়মোড়া ভেঙে নেয়। তারপর পেছন পেছন চলতে থাকে সীমার। একেবারে স্টেশনের কাছ বরাবর তাকে পৌঁছে দিয়ে তবে ফেরা। সীমা দু'একবার বারণ করেছে। বাধা দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কে শোনে কার কথা। সর্দার তার সর্দারি ছাড়েনি। ভাবটা এই, তুমি সোমত্ত মেয়েছেলে, দায়ে ঠেকে ভোর রাতে বেরিয়েছ, তা বলে আমি তোমাকে একা ছেড়ে দিই কি করে। যতক্ষণ সর্দার আছে, ততক্ষণ জেনো তোমার গায়ে আঁচড় কাটে কার সাধ্যি।

আজকাল সর্দারের এই খবরদারি সীমা মেনে নিয়েছে। বরং ভালই লাগে তার সর্দারের সঙ্গ। এতটা পথ ওর সঙ্গে দিব্যি কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সীমা সারাদিন ঘোরাঘুরির ভেতর যে খাবার কিনে খায় তার কিছু অংশ কাগজে মুড়ে ব্যাগের ভেতর রেখে দেয়। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ওঠার আগে ব্যাগ থেকে সে খাবারটুকু বের করে সর্দারকে দিয়ে দেয়। এত পথ সঙ্গ দেবার এটুকু পুরস্কার।

ভোরের ট্রেনটা প্রায় ঠিক সময়েই আসে। হুইসল বাজাতে বাজাতে প্ল্যাটফর্মের ভেতর যখন ঢুকতে থাকে তখন সীমার শরীরের ভেতর দিয়ে কেমন যেন একটা জোয়ারের ঢেউ বয়ে যায়। আলস্যটা সে যেন এইখানে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তৈরি হয় সারাদিনের যুদ্ধের জন্যে।

এই ট্রেনে মর্নিং কলেজের মেয়েরাই আসে বেশি। ভেণ্ডারদের শাকসবজির গাড়ি ছাড়া প্রায় কামরাতেই কলেজের মেয়েদের ভিড়। এক একটা স্টেশন আসে আর নতুন নতুন মেয়েদের মুখগুলো ভেসে ওঠে। যেন নতুন এক ঝাঁক হাঁস কলকল করতে করতে ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামরার ভেতর।

এই যে এস এস গুলঞ্চ। কিছু নতুন গুগগুল ছড়াও।

সবাই সরে বসে বিশেষ একটি মেয়েকে জায়গা করে দেয়।

কৌতুকে ভরা চোখগুলো জোড়ায় জোড়ায় তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

খুব গম্ভীর মুখ করে মেয়েটি বলে, কাল এক কাণ্ড ঘটে গেল আমাদের পাড়ায়।

কি রকম? কি রকম? —মেয়েরা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

রকম আবার কি, একেবারে যাচ্ছে তাই, নারীহরণ। মেয়ে নিয়ে ভর দুপুরে হাওয়া হচ্ছিল ভদ্রলোক।

একজন টিপ্পনী কাটল, ভদ্রলোক কিরে, মেয়েচোর আবার ভদ্রলোক হয় নাকি?

শোন্ না বলি। ঠিক দুপুরবেলা তেমাথার মোড়ে মেয়ে পুরুষে ধস্তাধস্তি। মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠতেই আশপাশের সব জানলাগুলো খটাখট খুলে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখি ততক্ষণে লোকটা মেয়েটাকে টেনে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে ওঠার চেষ্টা করছে। আর যায় কোথা, জুটে গেল পাড়ার মস্তানরা। একটা কাজের মত কাজ পাওয়া গেছে। মেয়ে নিয়ে পালাবে বাপধন। দৌড়ে গিয়ে উত্তমমধ্যম। মেরে আধমরা করার পর জানা গেল ভদ্রলোক কুণ্ডুবাড়ির জামাই। আর গায়ের জোরে যাঁকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর লিগ্যাল ওয়াইফ।

সে কি রে!

হাঁ, ঠিক তাই। রহস্যটা অবশেষে জ্ঞাত হওয়া গেল। শ্বশুরবাড়ি এসে তেমন তেমন খাতির নাকি পাননি জামাতা বাবাজী—এর ওপর আগুনে ঘি পড়ল শালীদের মন্তব্যে। ভদ্রলোক নাকি বেশ কিছুদিন ধরে নাইট ডিউটি দিচ্ছিলেন। তাই শালীরা নাকি বলেছিল, এমন রাতচরা হতোম জানলে বোনটাকে বিয়েই দিতুম না। ব্যস আর যায় কোথা। শালীর বোনকে টানতে টানতে একেবারে রাস্তার বার। সে মেয়েও নড়বেন না, আর উনিও ছাড়বেন না। অবশেষে টাগ-অব-ওয়ারের কাছি গেল ছিঁড়ে। দুজনে পড়ল দু'দিকে ছিটকে। ঘা খেয়ে জামাইয়ের মাজা গেল ভেঙে, আর বউএর সেন্স গন।

একজন মন্তব্য করল, লোকটা এত মার খাচ্ছে দেখেও বউটা কিছু বললে না?

বলবে কি রে! মনে মনে ভাবলে হয়ত কিছু শিক্ষা হচ্ছে হোক। তারপর আর দেখতে না পেরে শোকে জ্ঞানহারা। হাজার হোক স্বামীরত্ন তো।

আবার কেউ বলল, পাড়ার মানুষগুলো কি কানা, জামাইটাকে চিনতে পারলে না?

দূর, চিনবে না কেন, — আরে মারের সুযোগ একটা যখন পাওয়া গেছে তখন তাকে কি হেলায় হারান যায়। কথায় বলে না স্বভাব যায় না মলে। মস্তানির সুযোগ একটা পেলে তখন কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র। পেটাও, পেটাও, পেটাও। আগে ধোলাই পরে কথা। দোষ করলে ক্ষমা বলে তো একটা কথা আছে। মার দেবার পরে ক্ষমাটা চেয়ে নিলেই হবে।

জামাই এখন কোথা, শ্বশুরবাড়ি?

হাঁ, শ্বশুরবাড়ি, তবে আর একটা — লালবাজার। এখন অবশ্য লালবাজার থেকে হাসপাতাল।

লালবাজার আবার কেন?

জটলা দেখে পুলিশের আগমন। ওদের দেখেই মস্তানদের পলায়ন, তারপর পুলিশের গাড়িতে লালবাজার গমন।

একজন বলল, ওরেব্ বাবা, এ যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একসময় ভেতর থেকে একটি মেয়ে বলল, কত পার্সেন্টি রে?

মেয়েটি কপট ক্রোধে ফোঁস করে উঠল, ঐ জন্যেই তো চুপ করে থাকি; বিশ্বসুদ্ধ মানুষগুলো কি অবিশ্বাসী রে বাবা!

ওর কথা বলার ধরন দেখে সকলে হেসে উঠল।

সীমা এক কোণে বসেছে। এই সময়টুকুতে সে যে কোন একটা বইএর পাতায় চোখ বুলিয়ে নেয়। অবশ্য সারাক্ষণ চোখ রাখা যায় না পড়ার বিষয়ে, বিশেষ করে এই সময়টাতে।

সকালবেলা কাজে বেরোবার আগে পাখিগুলো যেমন গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কলরব করে নেয়, এ ঠিক তেমনি। সীমা জানে, এরপর একটানা কয়েক ঘণ্টা মেয়েগুলোকে ক্লাস করে যেতে হবে, তখন প্রায় মুখবন্ধ। তাই যত পার কথা বলে নাও এখন।

সীমার চোখের ওপর ভেসে উঠল একটা ছবি। কলেজের বন্ধুরা মিলে চলেছে ব্যাণ্ডেল চার্চে পিকনিক করতে। কত হাসি কত হুল্লোড়। কত গান। অধ্যাপক নেই, অভিভাবক নেই, এ যেন 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।'

অভিনয় শুরু করল ওরা। প্রথমে চেঁচামেচি শুরু হল। তারপর একটি মেয়ে হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিতে দিতে বলল, ওরে সুদর্শন চক্র, সুদর্শন চক্র।

প্রফেসর 'এস্-সি' অর্থাৎ সুদর্শনা চক্রবর্তী। ইংরাজি পড়ান।

একটি মেয়ে কোনা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে লাগল মেয়েদের দিকে। মুখে রাজ্যের বিরক্তি। চশমার ভেতর দিয়ে চোখ দুটো তার ঘুরছে। মেয়েটি প্রফেসার 'এস-সি'র ভূমিকায়।

মুখ বেঁকিয়ে বলল, ইডিয়েট, যততো সব ইডিয়েট। কয়েকটা মিনিট ঢুকতে দেরি হয়েছে, অমনি 'বার্কিং লাইক ডগ্স'।

তেমনি মুখ বেঁকিয়ে বলেই চলল, কেন, কেন পড়তে আসা! ঘরের কাজে ফাঁকি দেবার জন্যে? যাও শেয়ালদা স্টেশনে ঘুরে ঘুরে সাইনবোর্ড পড়গে। ইংরাজি মাতৃভাষা নয়, এখানে মামার বাড়ির আবদার চলবে না। পরীক্ষায় পাঁচ নম্বরের বেশি ওঠাতে গেলে কিছু রেস্ত চাই। এ তোমার সংস্কৃত নয় যে খাতার পাতায় কালি ছিটিয়ে দিলেই পাস হয়ে যাবে।

সুদর্শনা দেবীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না সংস্কৃতের প্রফেসর প্রীতি ভট্টাচার্যের। তাই সঞ্চিত ক্ষোভটা এমনিভাবে সুযোগ পেলেই প্রকাশ করতেন সুদর্শনা দেবী।

দু'একটি মেয়ে কোনায় বসে ফিসফিস কি যেন কথা বলছিল, অবশ্য চোখ ছিল প্রফেসরের দিকে।

সুদর্শনা দেবী চেঁচিয়ে উঠলেন, — ইউ স্ট্যাণ্ড আপ্।

একটি মেয়ে আশপাশে তাকিয়ে শেষে নিজেই উঠে দাঁড়াল।

আমাকে বলছেন দিদি?

খিঁচিয়ে উঠলেন সুদর্শনা দেবী, — তোমাকে নয় তো কি ওপাড়ার ময়রাণীকে, —যত সব নন্সেন্স। আগে এটিকেট শেখো তারপর পড়া।

সুদর্শনা দেবীর পার্ট শেষ হল, তিনি বসে পড়লেন।

মেয়েরা এবার গান জুড়ে দিলে,

সমবেত : মোদের হাড় জুড়োলে ভাই
এখন সুখে নিদ্রা যাই,

একজন : ও ভাই চক্র সুদর্শন
এখন করেছেন গমন,

সকলে : বিপদবারণ মধুসূদন
এলে প্রাণটা পাই

একজন : ঐ যে এলেন বলে ভাই।....
অমনি সুরের পরিবর্তন :

মেয়েরা সমবেতভাবে ঃ 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'— এ পিরিয়ড মধুসূদনবাবুর।

একটি মেয়ে মধুসূদনবাবুর ভূমিকায় উঠে দাঁড়াল। মধুসূদনবাবু নাদুসনুদুস মানুষ। হাহা করে হাসেন কথায় কথায়।

রেজিস্ট্রি খাতাখানা ধরে ডাকতে থাকেন রোল। নাম্বার ওয়ান।

ইয়েস স্যার।

নাম্বার নাইন।

হিয়ার স্যার।

টুয়েন্টি-সেভেন।

প্রেজেন্ট স্যার।

ততক্ষণে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

স্যার রোল নাম্বার থারাটিন ডাকলেন না তো?

ইউ, আনলাকি থারটিন।

তারপরেই প্রফেসর 'এম, এম'-এর ঠা ঠা করে হাসি।

তুমি কি ক্ষেপেছ, আমি নাম্বার থারটিনকে কল করব। ঘুমোওগে, নাকে সরষের তেল ঢেলে ঘুমোও গে। 'এম, এম'-এর একটা পার্সেনটেজও খোয়া যাবে না। যতসব রাবিশ এই ইউনিভারসিটির কানুনগুলো। আরে বাপু রামগড়ুরের ছানা হয়ে হাস্য নট মুখ করে কতক্ষণ ক্লাসে বসে পুঁথির খসখসে পাতাগুলো ভক্ষণ করা যায়। তার চেয়ে দু'দণ্ড পার্কে বেড়ান, সিনেমায় লাইন দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ঢের ঢের হিতকর। দেখ না, শুধু পার্সেনটেজের ভয়ে কেমন সব মুখ শুকিয়ে বসে আছে ক্লাসে। আমার হাতে আইন থাকলে আগে কলেজ থেকে পার্সেন্টেজের বালাই আমি ঝেড়ে ফেলে দিতাম।

একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, স্যার আপনি খুব ভাল স্যার।

মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে চোখ দুটো কুঁচকে হাসিমুখে অধ্যাপক মধুসূদন মুখার্জী বললেন, এই কমপ্লিমেন্টের জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু এজন্যে বেশি নম্বর পাওয়ার আশা কর না যেন।

মেয়েরা হেসে উঠল। হাসি থামলে একটি মেয়ে বলল, স্যার গতদিন ইতিহাস আর পাতিহাঁস সম্বন্ধে কি যেন বলবেন বলেছিলেন।

মনে আছে দেখছি। একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য করেছি, টক ঝাল খেতে আর হাসির কথা শুনতে মেয়েদের জুড়ি নেই।

হাঁ, কথাটা ঠিক, পাতিহাঁস আর ইতিহাস একই রকম জানবে। হাঁস যেমন দুধমেশান জল থেকে দুধটা তুলে নিয়ে জলটা ফেলে দেয়, যথার্থ ইতিহাসও আজেবাজে জঞ্জাল থেকে খাঁটি জিনিসটা বেছে নেয়।

একটি মেয়ে বলল, এ কথা কোনদিন ভুলব না স্যার।

প্রফেসর মধুসূদন ঃ অমনি ভুললেই হল। ইতিহাস ভুললে যে নিজেকে, নিজের দেশকে, এ দুনিয়াকে ভুলতে হবে। জানবে হিস্ট্রি, 'সবার ওপরে হিস্ট্রি সত্য, তাহার উপরে নাই।'

মধুসূদনবাবু বসলেন। মেয়েরা কলহাস্যে ভেঙে পড়ল।

এর পর পি, সি। প্রফেসর প্রতুল চ্যাটার্জী।

মেয়েরা বলে উঠল, পিসিমা আসছে রে পিসিমা।

নিরীহ মানুষ প্রতুলবাবু। রোগা চেহারা। নাকী সুরে মেয়েলী গলায় কথা বলেন। এসেই ওঁয়ান, টু, থ্রি, ফোঁর করে একশো সাতান্নটা রোল নাম্বার বোধকরি একদমেই ডেকে যান। এ সময়টুকু তাঁর বড় অপচয় বলে মনে হয়। তবে মধুসূদনবাবুর মত তিনের নামতা ধরে ডাকেন না। নিয়মের নড়চড়ে নেই পি, সির কাছে। এক মিনিটও বাজে কথায় কাটাবার লোক নন তিনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ান। রেকর্ডে আলপিন বসিয়ে ফাস্ট চালিয়ে যান। ভাষায় কমা, পূর্ণচ্ছেদ থাকাটা তাঁর মতে মনে হয় অনাবশ্যকে। সময়ের অকারণ অপচয়। শোন মেয়েরা, গোলমাল করছ কেন, কিংবা কাম ইন ইত্যাদি কথা পি, সিকে কখনও বলতে শোনা যায় না। উনি সামনের দিকে তাকিয়ে গড়গড় করে বলে যান।

আশপাশ কিংবা কোন বিশেষ মেয়ের দিকে তাকান না। কে গোলমাল করল, কে কার বিনুনি ধরে টানল এ সব ট্রাইফ্লিং ম্যাটারগুলোকে তিনি ওভারলুক করতেই অভ্যস্ত। পড়ানোর শুরুতেই গতদিনের জের টেনে বলতে লাগলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক কবিতা সেদিনের বাঙালির কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরত, এখন হেমচন্দ্রের হাস্যরসের কবিতার কিছু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। দেশলাই এমনি এক কবিতা।

'নমামি বিলাতী অগ্নি দেশলাই রূপী,
দেহখানি চাঁচাছোলা, শিরে বাঁধা টুপি!
যেমন ডেপুটীবাবু একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বেড় রাগে দেহ ভরা।

নমামি সর্বত্রগামী দারু অবতার,
চৌর্য বিঘ্ন-বিনাশন কুটুম্ব টীকার!
নিদ্রিতের গুপ্তচর, পাচিকার প্রাণ,
লম্বা দাড়ি কাবুলীর শিরে যার স্থান!

নমামি কিরণদণ্ড কোপন স্বভাব,
রাজগৃহ চালাঘরে সমান প্রভাব!
সিন্ধুজলে, পথে, মাঠে, গাড়ি, ঘোড়া, রেলে,
সকলে তোমায় পূজে সূর্য শশী ফেলে।'

হাস্যরসের কবিতা এমন কাঠ কাঠ শুকনো গলায় বলে গেলেন যে মেয়েরা তাঁর গলা শুনে হাসি চেপে রাখতে পারল না।

এরপর এক মিনিটও না থেমে, এবার কবিবর নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র ছিলেন দেশাত্মবোধ ও বিশ্বমানবতাবোধে উদ্দীপ্ত। পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস গ্রন্থগুলিতে তাঁর কবিপ্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আঠারশ...

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। অমনি স্টপ। যেখানকার কথা সেখানে রইল। রেজেস্ট্রি খাতাখানা হাতে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। পরের দিন ঐ আঠারশ-এর জের টেনে বলে যাবেন হয়ত — সাতাত্তর সালে নবীনচন্দ্র .... ।

মেয়েদের মনে রাখতে হবে গতদিন উনি আঠারোশ বলেছিলেন সুতরাং আজ আর আঠারোশ উচ্চারণ করে সময় নষ্ট করবেন না। সাতাত্তর থেকেই শুরু করবেন।

এবার টিপটপ সাজের বহর নিয়ে উঠে দাঁড়াল একটি মেয়ে। কয়েকবার নিজের পোশাক আর মেয়েদের দিকে তাকাতে লাগল। উদ্দেশ্যটা, দেখ, আজ আবার কি রকম নতুন সাজে সেজে এসেছি। ইনি ডি, ডি। প্রফেসর দীপালী দত্ত!

মেয়েরা ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'ফর গেট মি নট' এসেছে রে।

একটি মেয়ে বলল, আজ পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা অঙ্গে 'ভুলো না আমায়'এর অ্যাডভারটাইজমেন্ট সেঁটে এসেছে।

মেয়েরা, 'প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকি' ছিল আগেকার দিনে আমাদের দেশের আদর্শ।

একটি মেয়ে অমনি পাশের মেয়েকে বলল, সে আপনাকে দেখেই মালুম হচ্ছে।

পাশের মেয়েটি অমনি বলল, আরে উনি তো আগে কি ছিল তাই বলছেন, এখন মা যা হয়েছেন তার ছবিটা দেখ ওঁর ভেতর।

ডি, ডি বলে চললেন, সে আদর্শ আজ আমরা হারিয়েছি, তাই দেশ জুড়ে এই অর্থনৈতিক হতাশা।

এর ভেতর অন্ততঃ বারতিনেক প্রফেসার দীপালী দত্ত নিজের সাজের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা গড়িয়ে নিলেন। পোশাকের কোথাও ভেঙেচুরে যাওয়া একেবারে তিনি পছন্দ করেন না।

স্টেশনে ট্রেন এসে থামল! হৈ হৈ করতে করতে মেয়েরা নেমে গেল।

সীমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। কিন্তু সে যেন সত্যিই এক স্বপ্নের দিন। ভবিষ্যতের কত আশা কত কল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিল তারা। কোনদিন কেউ কাউকে ভুলতে পারবে না এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। সেদিন তাদের কথার ভেতর কোন খাদ ছিল না। কিন্তু আজ কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কেই বা কার খোঁজ রাখে। বুঝি এমনিই হয়। সব প্রতিশ্রুতি এমনি করে শুরু হয় আবার এমনি করেই কখন ভেঙে যায়। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সীমার বুক ঠেলে উঠে আসে।

সীমা সচকিত হয়ে দেখে তার চারদিক থেকে কখন উঠে চলে গেছে মেয়েরা। সে এই বিরাট সরীসৃপের মত গাড়িখানার গহ্বরে একাই বসে আছে। পাশে পড়ে থাকা ব্যাগখানা তুলে নিয়ে দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে সীমা।

সকালের রাস্তা, অফিসের ভিড় শুরু হয়নি, মেয়েরাই চলেছে বেশি। হাতে বইপত্তর।

দিদি—

ডাক শুনে সীমা পেছন ফিরে তাকাল। সেদিনের সেই মেয়েটি। লজেন্স নিয়েছিল, কিন্তু পাঁচটা পয়সা দাম দিতে পারেনি। ব্যাগ খুঁজে হতাশ হয়ে বলেছিল, এই যাঃ, একেবারে শূন্য!

ততক্ষণে লজেন্সটা ও মুখে পুরে ফেলেছে।

সীমা ওর সলজ্জ মুখখানা দেখে বলেছিল, তাতে কি হয়েছে ভাই, আর একদিন দিয়ে দিও।

সীমা লক্ষ্য করেছে, মেয়েটি যেন সেদিন তার সামনে থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল।

সীমার কাছে মেয়েটি এগিয়ে এল। ব্যাগ খুলে পাঁচটা পয়সা হন্তদন্ত হয়ে বের করে সীমার হাতে দিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না দিদি, দামটা দিতে বড় দেরি হয়ে গেল।

সীমা বলল, দরকার থাকলে আরও নিও, দামের জন্যে তাড়া নেই। ধীরে ধীরে শোধ দিলেই চলবে।

মেয়েটি মুখ নীচু করে বলল, লজ্জা করে দিদি, রোজ রোজ পয়সা না দিতে পারলে এতগুলো মেয়ের সামনে বড় লজ্জায় পড়তে হয়।

সীমা জানে, এসব মেয়েরা কি কষ্টে লেখাপড়া শেখে। স্টুডেন্ট কনসেসনে কোনরকমে মান্থ্লি টিকিটখানা কেনে। তারপর সকালে কলেজে আসবার সময়ে কোনদিন শুকনো এক মুঠো মুড়ি চিবিয়ে আসে, কোনদিন বা তাও জোটে না। তারপর ক্লাস সেরে ঘরে ফিরতে ফিরতে বারোটারও বেশি বেজে যায়। কলেজে মাঝে মাঝে ক্ষিদের জ্বালায় এরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

সীমা মেয়েটির দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বলল, আমার যদি ক্ষমতায় কুলত তাহলে তোমাকে রোজ রোজ এমনি লজেন্স খাওয়াতাম, কিন্তু তা যখন নেই, তখন দাম আমি তোমার কাছ থেকে নেব। তবে লজেন্স তুমি খুশিমত নিয়ে চলে যেও, দামের কথা আমি বলব না। সময় আর সুযোগ মত তুমি দামটা দিয়ে দিও।

মেয়েটি সীমার পাশে পাশেই চলতে লাগল। সীমা জানে মুখ ফুটে এসব মেয়ে চাইতে পারবে না। তাই নিজে থেকেই সে তার ব্যাগ খুলে দুটো লজেন্স বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, ব্যস্ত হয়ো না, এর দাম এখুনি আমাকে দিতে হবে না।

মেয়েটি কিছু প্রতিবাদ না করেই লজেন্স দুটো নিয়ে নিল।

সীমা বলল, একটা এখুনি মুখে ফেলে দাও তো দেখি।

মেয়েটি কাগজের মোড়ক খুলে লজেন্স একটা মুখে ফেলল। তার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সীমা বলল, আজ নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসায় তোমার কিছু খাওয়া হয়নি, ঠিক বলিনি, বল?

মেয়েটি মাথা নাড়ল। তারপর বলল, তোমার কাছে মিথ্যে বলে লাভ নেই দিদি, আজ কোন খাবার ছিল না ঘরে। বাবা অনেকদিন রিটায়ার্ড করেছেন তো, তাই অসুবিধেয় চলছে। পাসটা করতে পারলে যা হোক একটা চাকরি পাব, তখন কিছুটা সামলে নিতে পারব।

সীমা হাসল। বড় কষ্টের ভেতরেও হাসি পেল তার। কত পড়াই তো সে পড়ল তবু একটা সামান্য চাকরিও কি জোটাতে পেরেছে। শেষে লজেন্স বিক্রি করে সংসার চালাতে হচ্ছে তাকে। আর এই দুঃখী মেয়েটা এখনও স্বপ্ন দেখে, পাস করলেই যাহোক করে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবে।

মেয়েটি এবার পা চালিয়ে চলে গেল। ফার্স্ট পিরিয়ডে তার ক্লাস।

সীমা ধীরে ধীরে রাস্তাটা পার হল। তারও ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু সে এখন খাবে না। আগে কিছু লজেন্স বিক্রি করবে তারপর যাহোক কিছু খাবে। কিছু না খেলে চলা যায় না, তাই।

সকালের একটি কলেজের ভেতরে সীমা এসে ঢুকল। তখন ক্লাস শুরুর ঘণ্টা পড়েনি। সীমাকে দেখে কয়েকটি মেয়ে এগিয়ে এল। তারা কয়েকজন লজেন্স কিনল। ওরা সীমার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। কথা চাপা থাকে না। সীমা যে শিক্ষিতা হয়েও লজেন্স বিক্রির কাজে নেমেছে তা তারা জানে। তারা সীমাকে সমীহ না করলেও ভালবাসে। এর চেয়ে বেশি লাভের কথা সীমা ভাবতে পারে না। মেয়েগুলো যখন সীমাকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন সীমার বড় ভাল লাগে। তার মনে হয়, সে এখনও যেন বেঁচে আছে।

ঘণ্টা পড়তেই একঝাঁক চড়ুইএর মত ফরফর করে মেয়েরা উড়ে পালাল। সীমা নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। এবার অন্য একটি কলেজে তাকে যেতে হবে। পেছন থেকে একটা কর্কশ গলার আওয়াজ ভেসে আসতেই সীমা ফিরে দাঁড়াল। সম্ভবতঃ কলেজের প্রিন্সিপাল ইনি।

তুমি এখানে কিজন্যে এসেছ?

সীমা বলল, আমি মেয়েদের কাছে লজেন্স বিক্রি করি।

আরও রূঢ় গলায় ভদ্রমহিলা বললেন, এই যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেখানে কি হয় তোমার ধারণা আছে?

সীমা মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রমহিলা সমান উচ্চগ্রামে গলা তুলে বলে যেতে লাগলেন, তুমি একটু ভুল করেছ। না, এটা বাজার নয়, এটা লেখাপড়ার জায়গা। এখানে ব্যবসা বাণিজ্য চলে না।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে একটি মেয়ে ছুটে এল ভদ্রমহিলার কাছে।

কি হয়েছে রীতা?

দিদি, সি সেক্সনের মেয়েরা টি. আর স্যারকে ক্লাসে ঢুকতে দিচ্ছে না। টি. আর যত বলছেন, আমার পড়ান হয়ে গেলে তোমরা যা খুশি তাই কর কিন্তু ওরা ডায়াসের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত বক্তৃতা আর হাততালি দিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মেয়েদের চীৎকার প্রবল হয়ে উঠল। সামনেই ইলেকশন। পাঁচটি পার্টি এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। নীচে দু'একটা পটকা কোন্ অজানা হাত ফাটিয়ে দিয়ে চলে গেল। বাজার সরগরম। মেয়েরা এদিক ওদিক ভয়ে দৌড়তে লাগল।

ভদ্রমহিলা হন্তদন্ত হয়ে দৌড়লেন, বেয়ারা, দুবে সিং, কোলাপসিব্‌ল্ গেট লাগাও। মুহূর্তে কোথা থেকে যেন এক দক্ষযজ্ঞ বেধে উঠল।

সীমা নেমে গেল পায়ে পায়ে। একটু হাসল মনে মনে, বাজার থেকে জায়গাটা কি খুব বেশি দূরে?

পথে নেমে কয়েক পা এগিয়েই চোখে পড়ল তার একটি বিরাট সাইনবোর্ড।

'বিষ্ণুশর্মা টিউটোরিয়াল হোম'

এখানে অভিজ্ঞ অধ্যাপক, প্রাক্তন পেপারসেটার ও হেড এগজামিনারের দ্বারা স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারি এবং ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং-এর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

সীমা আবার কি মনে করে যেন হাসল। কলেজে ঐ ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, লেখাপড়ার জায়গায় ব্যবসাবাণিজ্য চলে না।

তার মনে পড়ল একটি কথা। তখন সে এম-এ ক্লাসের ছাত্রী। ফরেন একটি ইউনিভারসিটি থেকে একদল ছেলেমেয়ে এসেছিল তাদের ইউনিভারসিটিতে। স্টুডেন্ট ইউনিয়ন থেকে তাদের রিসিভ করা

হল। তারা সমস্ত ইউনিভারসিটি ঘুরে ঘুরে দেখলে। তারপর বিদায় ভাষণে ওদেরই একজন বললে, আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে, এখানে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ছেলেমেয়েরা তো কথা শুনে তাজ্জব। শেষে নানা কথায় রহস্যের যবনিকা উঠল। ইউনিভারসিটির নিচের তলায় অনেকগুলো দোকানঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছিল আর সেই ঘরগুলো দেখেই ওরা ভেবে নিয়েছিল এখানে হাতে কলমে ছেলেদের ব্যবসা-বাণিজ্য শেখান হয়।

সীমা নিজের মনে মনে ভাবতে লাগল, সত্যিকারের অন্যায়টা তারই হয়েছে। প্রথমে রূঢ় কথাগুলো শুনে তার মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পথ চলতে চলতে তার ভাবনার মোড় ফিরল।

সত্যিই তো একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢুকে কোন জিনিস বিক্রি করা শুধু বে-আইনীই নয় অসংগতও বটে। ভাবতে ভাবতে ভদ্রমহিলার কথাগুলো তার যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হল। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে একথাও তার মনে হল, আর একটু সুন্দর করে, সহানুভূতির সঙ্গে যদি উনি কথাগুলো বলতেন, তাহলে তার মনে কোন ক্ষোভই থাকত না। অবশ্য ফেরিওয়ালার এর চেয়ে বেশি প্রাপ্য কি আর থাকতে পারে।

সীমা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এবার থেকে কলেজের বাইরে দাঁড়িয়ে ছাড়া ভেতরে ঢুকে সে আর লজেন্স বিক্রি করবে না। সীমা কয়েকটি কলেজে ঘুরল। এ তার প্রভাতফেরি। তারপর ইউনিভারসিটি খুললে সে যাবে সেখানে। সাড়ে এগারটা নাগাদ চিপ ক্যানটিনে ঢুকে ভাত আর খানিকটা তরকারি খেয়ে নেবে। তারপর শুরু হবে তার কাজ। ইউনিভারসিটির ছেলেমেয়েদের অনেকেই তাকে চেনে। তারা কেউ কেউ কেনে, কেউ বা নতুন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিক্রির ব্যাপারে সাহায্য করে।

সেদিন ইউনিভারসিটিতে গিয়ে শুনল, অধ্যাপক ব্যানার্জির মৃত্যুতে শোকসভা হবে, তাই ক্লাস দু' পিরিয়ড হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে যাচ্ছে ইউনিভারসিটি থেকে। সীমা চেয়ে চেয়ে দেখছে, ইউনিভারসিটি প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের কথা হাসি গান ভেসে আসছে। তাদের কাছে অধ্যাপক ব্যানার্জী এক অবয়বহীন অস্তিত্ব মাত্র। তারা আজ অধ্যাপক ব্যানার্জীর জন্যে একটা ছুটি পেয়েছে এইটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় লাভের ব্যাপার। শুকনো পুঁথির পাতার কচকচানি থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ছুটি মিলল। ম্যাটিনি শোতে বসে আজ আর পারসেন্টেজ খোয়া গেল বলে মনঃক্ষোভ করতে হবে না।

ওরা চলে গেল। আজ সীমার আর বিক্রি হবে না লজেন্স, তবু সীমা চলে যেতে পারল না। ইউনিভারসিটির উত্তর দিকের পাম গাছটার তলায় সে দাঁড়িয়ে রইল।

ঐ তো সেই ঘরখানা, যেখানে অধ্যাপক ব্যানার্জী বসতেন। রুক্ষ চেহারার মানুষ। কেউ গেলে চোখ কুঁচকে নাক মুখ সিঁটিয়ে থাকতেন, যেন রাজ্যের বিরক্তি সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে এসে জমা হল। তারা যখন ইউনিভারসিটির ছাত্রী তখন অধ্যাপক ব্যানার্জী ছিলেন কলাবিভাগের প্রেসিডেন্ট। একটি দিনের স্মৃতি সীমার মনের ওপর ফুটে উঠল।

নাম কাটা গেছে, কারণ মাইনে বাকী পড়েছে অনেক। কেবল তাঁর নয়, যারা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে তাদেরও। অবশ্য তাদের সঙ্গে সীমার এই মাইনে বাকী পড়ার তফাতটা অনেক। ঘরের পাঠান টাকা তারা এনতার খরচ করত, তাই মাইনে দেবার টাকাটা আর তারা কুলিয়ে উঠতে পারত না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সীমার পক্ষে মাইনের টাকা যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত।

সেবার নাম কাটা গেলে একটি দরখাস্তে নিজের অসহায় অবস্থার কথা লিখে ও ঢুকল সেক্রেটারীর ঘরে। সীমা জানত আগে যিনি সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি সম্প্রতি বিদায় নিয়েছেন, তাঁর জায়গায় নতুন লোক এসেছেন। আগের সেক্রেটারীর দোষগুণ যাই থাক, তিনি ছাত্রদের সুখদুঃখের কথা বুঝতেন। নাম কাটা গেলে দু'এক মাসের মাইনেও বাদ দিয়ে একটা রফা করে নিতেন। কিন্তু নতুন সেক্রেটাবী সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না সীমার। দরখাস্তটি হাতে নিয়ে আধ মিনিট চোখ বুলিয়ে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, পড়াশোনা আবদারের জিনিস নয়। নিয়ম হল নিয়ম। তার নড়চড় হয় না। রি-অ্যাডমিশন ফি, বকেয়া পুরো মাইনে আর তার সঙ্গে ফাইন নিয়ে এস ৩বেই নাম উঠবে খাতায়।

অনুনয় করে সীমা বলল, অনেক কষ্ট করে তিন মাসের মাইনে যোগাড় করে এনেছি স্যার। পাঁচ মাসের মাইনে দেবার সাধ্য নেই। রি-অ্যাডমিশন ফি আর ফাইন দিতে গেলে ইউনিভারসিটি ছেড়ে দিতে হবে স্যার।

আমরা তাই চাই, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল। তোমরা ইউনিভারসিটির বার্ডন। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে আমার করার কিছু নেই।

সীমা অমনি বলল, তাহলে ডক্টর ব্যানার্জির কাছে একবার যাই স্যার।

সীমা বুঝতে পারল না যে কথাটায় নতুন সেক্রেটারির আত্মসম্মানে কতখানি ঘা লাগল।

তিনি সীমার হাত থেকে দরখাস্তখানা চেয়ে নিয়ে তার ওপর খসখস করে কতকগুলো টাকার হিসেব লিখে দিয়ে, কোন ধারার কোন নিয়মে ঐ সব অঙ্ক ইউনিভারসিটির প্রাপ্য সে মন্তব্যও প্রেসিডেন্টের কাছে লিখে দিলেন। ভাবটা, এখন যাও, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওগে।

সীমা ওপরতলায় অধ্যাপক ব্যানার্জির ঘরের দিকে যেতে যেতে সেক্রেটারির মন্তব্যগুলো পড়ে নিলে। নাঃ পার পাওয়ার আর কোন উপায়ই নেই।

অধ্যাপক ব্যানার্জি ঘরেই ছিলেন। সুইং-ডোর একটু ফাঁক করে সীমা দেখল তিনি কি যেন একটা বই পড়ছেন। সীমার তখন যা মনের অবস্থা তাতে কোন কিছু না ভেবেই সে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

ঠিক স্বভাবমত কাজ করলেন অধ্যাপক ব্যানার্জি।

চোখ কুঁচকে রাজ্যের বিরক্তি মুখে ঢেলে চেঁচিয়ে উঠলেন, নাঃ, শান্তিতে যে একটু পড়াশোনা করব তার উপায় নেই। কি চাই?

ভয়ে ভয়ে সীমা দরখাস্তখানা এগিয়ে দিলে। অধ্যাপক ব্যানার্জি আধমিনিট পড়ে সেক্রেটারির মত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না। তিনি সবটুকু দরখাস্ত পড়লেন। সেক্রেটারির মন্তব্যগুলো বিশেষ করে দেখলেন।

কি চাও?

স্যার...।

আর কিছু বলতে পারছিল না সীমা। তার চোখের সামনে ঘনিয়ে উঠছিল একটা মেঘ। এতক্ষণে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

অধ্যাপক ব্যানার্জি যেন দেখেও দেখলেন না। তিনি তেমনি মেজাজি গলায় হেঁকে বললেন, কি করা হয়?

সীমা কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে তাকিয়ে রইল। আরও যেন ক্ষেপে উঠলেন অধ্যাপক ব্যানার্জি, টিউশনিফিউশনি করা হয়?

সীমাকে যেন কথা যুগিয়ে দিলেন ডক্টর ব্যানার্জি।

সীমা বলল, হ্যাঁ স্যার।

একটা টিউশনি কর. না সংসার চালাতে আরও টিউশনি করতে হয়?

সীমা চুপ করে আছে দেখে নিজেই বলে চললেন, বুঝেছি, চার পাঁচটা টিউশনি অন্ততঃ করতে হয়।

তারপর আপনমনে কিছুক্ষণ বকে চললেন, দেশ স্বাধীন হল, তবু যে দুঃখ সেই দুঃখই রয়ে গেল। অযোগ্য, সব অযোগ্য। নিজের নিজের ঘর সামলাচ্ছে।

দরখাস্তের ওপর নিজের মন্তব্য লিখে দিলেন। দু'মাসের মাইনে বাদ, রি-অ্যাডমিশন ফি আর ফাইনের টাকাগুলোও বাদ। তিনি এও লিখেছেন, মেয়েটি অত্যন্ত দরিদ্র অথচ মেধাবী আর পরিশ্রমী।

দরখাস্তখানা সীমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আবার বই-এর ভেতর ডুব দিলেন।

স্যুইং-ডোর খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল সীমা, পেছন থেকে আবার ডাক দিলেন, ওহে শোন।

কাছে যেতেই দরখাস্তখানা চেয়ে নিয়ে বললেন. ফাইন কিছু দিতে হবে বাপু। নইলে সেক্রেটারীর সম্মান থাকে না।

এই বলে নামমাত্র একটা টাকা ফাইন বসিয়ে দিলেন।

সীমা তখন পাখির মত হালকা হয়ে গেছে। সে প্রায় উড়েই এল নীচে সেক্রেটারির ঘরে। দরখাস্তখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই যে নিন স্যার, টাকা জমা দেব, দয়া করে সই করে দিন।

সেক্রেটারী অধ্যাপক ব্যানার্জির মন্তব্য পড়লেন। তাঁর তখন আর করার কিছু ছিল না। সীমা দেখল, রাগে প্রায় তিনি কাঁপছেন। অবশ্য এ রাগটা যে সীমার ওপর নয়, তা বেশ বোঝা গেল যখন তিনি ডক্টর ব্যানার্জির ঐ এক টাকা ফাইনের অঙ্কটাকে ঘচঘচ করে কেটে দিয়ে লিখে দিলেন, ফাইন এক্সকিউজ্‌ড।

সীমা সেদিন সেক্রেটারির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কি হাসাই না হেসেছিল। প্রেসিডেন্টের ওপর একহাত নিতে গিয়ে সেক্রেটারী দোষীকেই বেকসুর মুক্তি দিয়ে দিলেন।

আজ অধ্যাপক ব্যানার্জি নেই। তাঁর শোকসভার আয়োজন হয়েছে। তিনি অনেকদিন ইউনিভারসিটি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাই ক্ষমতাহীন মানুষ সম্বন্ধে যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করা হচ্ছিল। এই নিয়মরক্ষার ক্ষেত্রে হয়ত কয়েকজন আসবেন গণ্যমান্য। ফাইলের ওপর কলমটাকে খোলা রেখেই হয়ত চলে আসবেন কেউ। দু'এক মিনিট বসে থেকে, দু'চারটে মামুলী কথা বলে কাজের অছিলায় উঠে পড়বেন। তারপর একসময় সভা ভঙ্গ হবে। ওপরওয়ালাদের দেখাবার জন্যে যে কটি বশংবদ অতিকষ্টে বসেছিলেন, তাঁরা ততক্ষণে ছুটবেন ট্রাম বাস ধরতে।

নাঃ এ সভায় যাবে না সীমা। সে ঐ ঘরখানার দিকে তাকিয়ে, যেখানে একটি হৃদয়বান মানুষ কঠিন মুখ করে বসে বসে পড়াশুনা করতেন, একটি নমস্কার জানিয়ে পায়ে পায়ে চলে এল।

আজ আর সীমা তার বেসাতি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না। বিক্রি তার বেশি হয়নি আজ। একটি ছাড়া আর কোন কলেজের চৌহদ্দিতে ঢোকেনি সে। বাইরে দাঁড়িয়েই বিক্রি করেছে। তাই জমার ঘরে বেশি কিছু পড়েনি তার।

সীমা ফিরে চলল বাড়ির পথে। আজ অনেক সকাল সকাল সে ঘরে ফিরছে। স্টেশনে নেমে হাঁটতে শুরু করল। বড় তেষ্টা পেয়েছে তার। পাশেই একটা চায়ের দোকান। কোনদিন ঢোকেনি এই দোকানে। আজ পায়ে পায়ে তার ভেতরে গিয়ে ঢুকল। সবে সন্ধ্যা হয় হয়। কলকারখানা ছুটি হয়ে গেছে। কালিঝুলিমাখা কয়েকটা লোক ইতস্ততঃ ছড়িয়ে বসে সুপ্‌সুপ্‌ চা গিলছে। দু'চারটে সবে গোঁফওঠা উঠতি মস্তান একজায়গায় বসে রাজনীতি করছিল। সীমাকে ঢুকতে দেখে নড়ে চড়ে বসল। সীমা অপরূপ নয় তবে সুন্দর। আর সুন্দর হয়েও সে বড় স্থির। তাই ওর প্রতি আকৃষ্ট হলেও, কামনা উদ্বেল হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ চায়ের দোকান অন্য জগৎ। এখানে মস্তানরা বসে থাকে ট্রেনের মেয়ে যাত্রীগুলিকে দেখবার জন্যে। শুধু চোখের দেখা নয়, কিছু কিছু লাগসই মন্তব্য ছুঁড়ে মারবার জন্যে। মস্তানিতে এখানে শুরু হয় ওদের হাতেখড়ি। তারপর কিছুটা পোক্ত হলে মস্তান দাদারাই ওদের নিয়ে যায় নানারকম চোরাই কারবারের কাজে। ওয়াগন ব্রেকার হতে পারে তারা, যারা মার খেয়ে খেয়ে হাড়গুলোকে লোহা বানিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া অভিজ্ঞতা আর সাহসে পয়লা নম্বর হওয়া চাই।

সীমা ঢুকেই একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল। একটা নোংরা অল্পবয়সী ছোকরা, চা-বানানেওলার কাছ থেকে ছিটকে চলে এল সীমার কাছে!

এক কাপ চা।

শুধু চা? নেড়ে বিস্কুট লাগবে না।?

না।

ছেলেটা মাথা চুলকাল। ভাবলে, এইসব ভদ্রমহিলারা কুলিকামিনের মত নেড়ে বিস্কুট খায় না। ভাবনাটা মগজে আসতেই সে অমনি বলল, নানখাটাই আছে, একেবারে টাটকা নানখাটাই।

না, ওসব দরকার নেই।

ছেলেটা নিরাশ হয়ে অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

সীমা স্থির হয়ে বসে আছে। চা এল, ধোঁয়া উঠছে। সীমা তাকিয়ে আছে। এখন সে কোনকিছু ভাবছে না, কোনদিকে তাকাচ্ছে না। মনের এ এক নিষ্ক্রিয় অবস্থা। চা একটু ঠাণ্ডা করে খাওয়াই সীমার অভ্যেস। একসময় সীমা সচেতন হল। চা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ও প্রায় একচুমুকেই চাটা গিলে ফেলল। এই পরিবেশে বেশিক্ষণ বসে তারিয়ে তারিয়ে চা খাওয়া যায় না।

সীমা ছোঁড়াটাকে হাতের ইশারায় ডাকল। সে আসতেই তার হাতে চায়ের পয়সা দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। ঠিক সেই সময় মন্তব্য শোনা গেল, চাককু রে চাককু, ইস্পাতে বিজ্‌লী মারছে।

আর একজন কেউ বলল, ধর ধর, চাককু মেরে কচ করে আমার কল্‌জেখানা কেটে নিয়ে পালাল রে।

সীমা পেছনে ফিরে দাঁড়াল। সারা শরীর তার রাগে রী-রী করছে।

কিছু বলছেন?

এই মুহূর্তে কারখানার সেই চাপায়ী লোকগুলো কোন্ মন্ত্রবলে যেন বোবা বনে গেছে।

সীমা আবার চলা শুরু করতেই কে যেন বলে উঠল, লে বাবা, কথা পড়ল সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।

আর একজন গেয়ে উঠল, দংশন কৈল কালনাগিনী, ক্যামনে প্রাণ বাঁচাই অভাগিনী।

সীমা ততক্ষণে পথে এসে নেমেছে। কারখানার ফিটারগুলো মাতব্বরী করছে দেখে ততক্ষণে উঠতি মস্তানদের সংবিৎ এল। তারা ওদের চেয়ে পিছিয়ে থাকবে এ যে শরম কী বাত। অতএব তারাও চেঁচিয়ে বিগলিত গলায় গান ঢালতে লাগল, 'মন মানে না, সখি। মন মানে না....'

ছেলেগুলো মানিকের বয়সীই হবে। ইচ্ছে করছিল কান ধরে গালে একটি একটি করে চড় কসিয়ে দেয়। একটু থামল সে, ওরাও হঠাৎ থেমে গেল। সীমা আর না দাঁড়িয়ে জোরে পা চালাল বাড়ির পথে। ততক্ষণে জোর কোরাস চলেছে চায়ের দোকানে।

বাড়িতে এসে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে। ভেতরে তখন কি একটা চেঁচামেচি চলছিল। সীমা বাইরেই দাঁড়িয়ে গেল।

মানিককে বলতে শোনা গেল, যারা পকেট মারছে, ওয়াগন ভাঙছে তাদের দোষী করবি কি-করে। চাকরি নেই বাকরি নেই, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে কামিয়ে নাও দু'পয়সা যেদিক দিয়ে পার।

একটি ছেলে বলল, তার চেয়ে কোন একটা পয়সাকড়িওলা রাজনৈতিক দলে ভিড়ে যাওয়া ভাল। ক'দিন প্রেস্টিজ নিয়ে ঘোরাও হবে, আবার দাঁও বুঝে টু-পাইস মারাও যাবে।

হঠাৎ চুপ করে গেল ছেলেগুলো। বোধকরি সীমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে। সামান্য সময় মাত্র। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে ছিটকে কে কোথায় বেরিয়ে গেল।

সীমা ঘরে ঢুকল। মুখ হাত ধুয়ে রান্না চড়াল। এগারটার ভেতরেই খাওয়াদাওয়া সেরে, মানিকের জন্যে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে সে শুয়ে পড়ল।

ভোরের আগেই আবার পথে বেরল সীমা। আজ তার মনটা সত্যিই বিষণ্ন। কাল সন্ধ্যায় মানিকের মত ছেলেদের মুখে সে যে কথা শুনেছে, তা খুব আশাপ্রদ নয়। সে তো আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওকে মানুষ করবার। নিজের এতটুকু সুখের দিকে সে তাকায়নি। তবে কেন মানিকের এ হতাশা।

সর্দার ততক্ষণে সঙ্গ নিয়েছে সীমার। সর্দার চলতে চলতে সীমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। আজ যেন সীমা চলেছে একেবারে অন্যমনে।

ওরা কিছুক্ষণের ভেতর এসে পৌঁছল স্টেশনে। রোজকার মত ব্যাগ খুলে পাউরুটির টুকরো বের করতে গিয়ে সীমা জিভ কাটল। কাল তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরেছে, তাই বিকেলের জলখাবার সে খায়নি, রুটিও তাই কেনা হয়নি।

এখন কি করা যায়। সর্দার দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন আসার সময় হয়ে গেলেও সিগন্যাল পড়েনি। সীমা আবার ফিরল। সর্দার চলল তার পিছু পিছু। সেই চায়ের দোকান। হোক কালকের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত তবু ওখানেই ঢুকতে হবে তাকে। এত পথ এসেছে সর্দার, কিছু না দিলে সে এমনি চলে

যাবে, কিন্তু সারাদিন সে নিজেই শান্তি পাবে না মনে। আজ খাবার না পেলেও কাল সর্দার ঠিকই তার সঙ্গ নেবে, কিন্তু নিজের আত্মীয়েরা পান থেকে চুন খসলেই ব্যাজার করে থাকবে মুখ। সীমা চায়ের দোকানের মুখেই কালকের সেই ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে বলল, রুটি আছে?

আছে, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

না ভেতরে যাবার দরকার নেই, এই নাও পয়সা, একটা রুটি দাও।

ছেলেটা ভেতরে ঢুকল। কারা যেন ভেতরে বসে আছে বলে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে কানে এসে বাজল একটি কথা, কালকের সেই রে। দেমাক দেখিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রি তো করে লজেন্স, তার আবার প্রেস্টিজ কত। একখানা রুটি চিবিয়ে তো বাবা কাটাবে সারাদিন। ভাঙবে তবু মচকাবে না।

কানটা গরম হয়ে উঠল সীমার। নিশ্চয় কালকের সেই কারখানাফেরত লোকগুলো। আজ কারখানায় যাবার আগে এখানে চায়ের আড্ডায় বসেছে। কিন্তু কি করে এরা জানল যে লজেন্স বিক্রি করে তার দিন কাটে। এরা সব জানে। পাড়ার পান দোকান থেকে রাস্তার চায়ের দোকান, প্রতিটি লোকের হাঁড়ির খবর রাখে। সত্যি বাহাদুরি দিতে হয় এদের।

রুটি নিয়ে এল ছেলেটা। কি মনে করে তার হাত থেকে সীমা আর ফেরত পয়সাগুলো নিল না। এবার সে দোকানের দিকে পেছন ফিরে টুকরো টুকরো করে রুটিটা ছড়িয়ে দিলে পথে। সর্দার তাই কুড়িয়ে খেতে লাগল। সীমা হনহন করে হেঁটে চলল স্টেশনের পথে। সে জানে, যতক্ষণ সর্দার ছড়ানো টুকরোগুলো কুড়িয়ে খাবে ততক্ষণ দোকানের ভেতর বসে লোকগুলো তাই দেখবে। সীমা পথ চলতে চলতে এই মুহূর্তে কেমন একধরনের আনন্দ আর উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল। ট্রেনে বসে বসে কত কথাই মনে পড়ে যায় সীমার! আজ কেন জানি না বিপিনবাবুর কথাটা তার মনে পড়ে গেল।

মাঝে মাঝে দুপুরের অবসরে সীমা প্রুফ দেখার একটা কাজ করত। একটি ছোট প্রেসে সে একদিন নিজেই ঢুকে পড়েছিল। বলেছিল, কিছু কাজ দিতে পারেন?

প্রেসের মালিক প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেনে। পরে একটু সামলে নিয়ে বলেছিলেন, কি কাজ জানেন আপনি, কম্পোজ করা, প্রুফ দেখা?

না ওগুলোর কোনটাই আপাততঃ জানি না, তবে শিখে নিতে পারব।

সপ্রতিভভাবে কথাগুলো বলে গিয়েছিল সীমা।

হেসে বলেছিলেন মালিক ভদ্রলোক, আগে শিখে আসুন তারপর কাজের খোঁজ করবেন।

সীমা বলল, শেখার সুযোগই যদি না পেলাম তাহলে আর খুঁজব কি করে।

একটু থেমে তারপর বলেছিল, দিন না আমাকে একটু শেখার সুযোগ। আমি শেখার সময় নিশ্চয় কোন পারিশ্রমিক আপনার কাছ থেকে চাইব না।

ভদ্রলোক সীমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেছিলেন, পড়াশুনা?

সীমা কথাটার জবাব ঘুরিয়েই দিয়েছিল, প্রুফের ঠিক বানানগুলো কেটে তার জায়গায় আমি ভুল বানান বসিয়ে দেব না, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ভদ্রলোক তাঁর নাকের নীচে ঝুলে পড়া চশমার ওপর দিয়ে আর একবার সীমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে আশপাশের কোন বাবুর নাম ধরে ডেকেছিলেন। পাশের ধুলোকালিভরা একচিলতে ঘরের ভেতর থেকে সেই বাবুটি একটা খোলা কলম হাতে বেরিয়ে এলেন। সীমা দেখল ভদ্রলোকের দশা তার চেয়েও করুণ। সত্তর আশী টাকা মাইনের অতি কনিষ্ঠ মাছিমারা কেরানির মত অবস্থা। কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণখানা যেন বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছেন।

সীমাকে দেখিয়ে মালিক বললেন, ইনি কাজ শিখতে চান। আপনি এঁকে টিফিনের ফাঁকে কোন একটা সময়ে একটু একটু করে প্রুফ-রিডিংএর কাজটা শিখিয়ে দেবেন।

ব্যস। সেই থেকে সীমা ঐ প্রেসে দুপুরের দিকে যেতে শুরু করল, আর ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষাগুরুটি সীমাকে প্রুফ-রিডিংএর কাজ শেখাতে লাগলেন। কিছুদিনের ভেতর সীমা কাজটা নিখুঁতভাবে শিখে

ফেলল। সীমাকে যিনি কাজ সেখাতেন সেই দরিদ্র ভদ্রলোকটির নাম ছিল বিপিনবাবু। লেখাপড়া খুব একটা জানা ছিল না ভদ্রলোকের। কোনরকম কাজ চালাবার মত প্রুফ দেখতেন। অবশ্য তাতেই চলে যেত। প্রকাশকের বই কম্পোজ করে একটি প্রুফ দেখে দিতেন এঁরা। তাতে ভুল কিছু কম হত। আর এমনিভাবে কম্পিটিশনের বাজারে কাজ পাওয়ার কিছু সুবিধে হত।

সীমা প্রুফ দেখা নিয়ে বিপিনবাবুকে সাহায্য করতে লাগল। বিপিনবাবু সীমার কাছে তাঁর সংসারের দুঃখের কথা বলতেন।

জান মা, তোমার মত আইবুড়ো দু'দুটি মেয়ে আমার। লেখাপড়া শেখাতে পারিনি, বিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই, বাপের গলগ্রহ হয়ে আছে। এই ক'টা টাকায় কি মা সারা মাস চলে।

মেয়েদের কিছু হাতের কাজ, সেলাই বোনাও তো শেখাতে পারেন, তাতে কিছু রোজগারও হয়।

সেলাই, কাটাই শেখাতে গেলেও তো টাকা চাই মা। এমনিতে তো কেউ শিখিয়ে দেবে না।

তাহলে এক কাজ করুন না, ওদের কিছু লজেন্স কিনে দিন, আর তাই ওরা বেচুক স্কুল কলেজে গিয়ে। ওতে মোটামুটি কিছু রোজগার হতে পারে, একেবারে বসে থাকার চেয়ে ভাল।

হেসে উঠলেন বিপিনবাবু, কি বলছ তুমি, লজেন্স বিক্রির কাজ! গরীব হতে পারি মা তাবলে বামুন বাড়ির মেয়ে অত নীচু কাজ করতে পারবে না। সেলাই ফোঁড়াই একরকম, আর লজেন্স বিক্রির কাজ হল অন্য। ওতে মান পেরেস্টিজ বলে কিছু থাকে না।

সীমা সেদিন আর কিছু বলেনি বিপিনবাবুকে। শুধু তার মনে হয়েছিল, বিপিনবাবুর মত ডান হাত বা বাঁ হাতের লোকেরাও লজেন্স বিক্রির কাজকে কত হীন চোখেই না দেখে!

সীমাকে বিপিনবাবু কিন্তু খুব খাতির করত। সীমা বিপিনবাবুর হাতের কাজ হালকা করে দিত। জীর্ণ প্রৌঢ় মানুষটিকে দেখে সীমার অনেক সময় কষ্ট হত। সে দেখত, একখানা আধপোড়া রুটি, কোনদিন একটা কাঁচা লঙ্কা, কোনদিন বা একটুখানি তেঁতুল দিয়ে বিপিনবাবু জলযোগ করছেন। মাংসহীন চোয়ালটা ওঠানামা করত। বিপিনবাবু যখন ঐ রুটির একটুখানি টুকরো চিবুতেন তখন তাঁর চোখে মুখে একটা ভয়ংকর বুভুক্ষার ছবি ফুটে উঠত। প্রুফ দেখার ফাঁকে সীমা সে ছবিখানা দেখে মনে মনে কষ্ট পেত। খাওয়া শেষ হলে বিপিনবাবু একটা ময়লা অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে অন্ততঃ তিন গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে ফেলতেন। যেদিন রুটির সঙ্গে এক ডেলা গুড় জুটত সেদিন বিপিনবাবুর মুখে সে কি আলোর জোয়ার। সেদিন বিপিনবাবু তাঁর বাপ ঠাকুরদার কথা তুলতেন। তাঁর কোন্ পঞ্চম পূর্বপুরুষ নাকি জমিদারি সেরেস্তার হেড খাজাঞ্চীবাবু ছিলেন সে কথা সবিস্তারে বলতে ভুলতেন না।

এহেন বিপিনবাবুকে একসময় বিপদে পড়তে হল। আর বিপদটার জন্যে পরোক্ষভাবে সীমাই হল দায়ী। সীমার প্রুফ-রিডিংএর কাজ যে নিখুঁত হচ্ছিল তা মালিকের চোখ এড়ায়নি। এতে প্রকাশকের কাছ থেকে কিছু বেশি কাজ আর প্রশংসা জুটছিল তাঁর। সীমা ইদানিং কিছু কিছু করে কাজের পারিশ্রমিকও পাচ্ছিল। খাতিরও জুটছিল তার মালিকের কাছ থেকে।

মাঝে সপ্তাহ তিনেক অসুস্থতার জন্যে আসতে পারেনি সীমা। তারপর এক দুপুরে প্রেসে ঢুকে দেখল মালিক নেই, কিন্তু বিপিনবাবু আছেন।

সীমাকে দেখে বিপিনবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, এতদিন কোথায় ছিলে মা?

সীমা বলল, শরীরটা ভাল ছিল না, তাই আসতে পারিনি।

বিপিনবাবু হঠাৎ উঠে গেলেন ঘর ছেড়ে। দরজার কাছে গিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর ফিরে এসে নিজের হাতলভাঙা চেয়ারখানায় বসে পড়ে বললেন, তোমাকে মা বলে ডেকেছি, একটা কথা নির্ভয়ে বলব?

সীমা বলল, আমার কাছে কথা বলবেন তাতে ভয়-ভাবনার কি আছে। আপনি সোজাসুজিই বলুন।

চাকরিটা বুঝি আর আমার থাকে না মা।

বিপিনবাবুর গলা যেন বন্ধ হয়ে এল এই ক'টা কথা বলতে গিয়ে।

সেকি, এতদিনের চাকরিটা চলে যাবার কি কারণ ঘটল।

বিস্ময় আর দুঃখে অভিভূত শোনাল সীমার গলা।

বিপিনবাবু বললেন, বুড় হচ্ছি মা, চোখে জল গড়ায়, করকর করে, ডাক্তার দেখাতে পারি না, তার ওপর শুদ্ধ করে প্রুফ দেখব কি করে বল তো মা।

কেন, এতদিন তো এই চোখ নিয়েই এরকম করে দেখে যাচ্ছিলেন, কই চাকরি যাবার তো কোন কথা ওঠেনি।

সে তুমি ঠিক বুঝবে না মা। মালিকের আর আমার কাজ পছন্দ হচ্ছে না। কালকে নাকি একটি নামী প্রকাশক শুনিয়ে দিয়ে গেছেন, আমাদের আর কাজ দেওয়া হবে না। এই দু'এক হপ্তার ভেতর কম্পোজ ম্যাটারে নাকি এত ভুল পাওয়া যাচ্ছে যাতে এ প্রেসে কাজ দেবার কোন মানেই হয় না।

একটু থামলেন বিপিনবাবু। তারপর সীমার আরও কাছে মুখটা সরিয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন, তোমার আসার আগে মা বরাবরই আমি প্রুফ দেখেছি। ঐ প্রকাশকের কাজ অনেকদিন ধরেই করছি। তখন তো এমন কথা ওঠেনি। আসলে কথা কি জান মা, তোমার প্রুফ দেখার পর কারও কাজ কর্তার মনে ধরছে না।

সীমা কথাটা বুঝে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

বিপিনবাবু বলে চললেন, আমি গোপনসূত্রে জেনেছি মা তোমাকে পাকাপাকি প্রুফ-রিডারের কাজটা দিয়ে আমাকে টাকা আদায়ের কাজে পাঠাবেন। মরে যাব মা, একেবারে মরে যাব। সারাদিন রোদ্দুরে জলে ঝড়ে প্রকাশকদের দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে হবে। খেটে মরব, একটা ভাল কথা জুটবে না। ওদিকে সব মুখ সেলাই করে বসে থাকবে আর এদিকে কর্তার কাছে মুখখিচুনি। এ ক'খানা হাড়ে কত সইবে মা।

সীমা বসে বসে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় বলল, আচ্ছা অধীরবাবু আসুন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

বিপিনবাবু বললেন, আমি তোমাকে বলেছি যদি জানতে পারেন তাহলে এই দণ্ডেই আমাকে বিদেয় করে দেবেন। তার চেয়ে তুমি কিছু বল না মা, যা হবার হবে। টাকা আদায়, তাই সই। একেবারে চাকরি গেলে প্রাণে বাঁচব না মা।

সীমা বসে বসে প্রুফ দেখতে লাগল। তার মনে হল, বুঝি আর না এলেই ভাল হত। ইতিমধ্যে সে অসুস্থ বলে মালিককে একখানা চিঠিতে জানিয়েও ছিল। কিন্তু এসে যখন পড়েছে তখন দেখাটা না করে যাওয়া ঠিক হবে না।

মালিক অধীরবাবু এলেন। সীমাকে দেখে মনের খুশিটা লুকোতে পারলেন না।

অনেকদিন ধরে আসছেন না তাই বড় চিন্তায় ছিলাম। আপনার চিঠি পেয়ে জানলাম অসুখে পড়েছেন। তা এখন থেকে কাজ করতে পারবেন তো? আর ভাবছি, আপনাকে হোল টাইম প্রুফ-রিডারই করে নেব। বিপিনবাবু থাকবেন আদায়ের কাজে।

সীমা বলল, আপনার দয়ার কথা কোনদিনই ভুলব না। তবে আমার বুঝি আর কাজ করা হবে না।

সীমা গলায় এমন হতাশার সুর ঢেলে বলল যে মালিক অধীরবাবু চমকে উঠলেন, কেন, কেন?

অসুখটা আমার চোখেরই। ডাক্তার বলেছেন, এ অসুখ হঠাৎ করে আমার সারবেও না। সে কথা জানাতেই আজ আপনার কাছে আসা। কিন্তু যদি একটু দয়া করেন তাহলে আমার অনেক উপকার হয়।

অধীরবাবু হঠাৎ মুষড়ে পড়েছিলেন, একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, কি বলুন, অসাধ্য না হলে করতে চেষ্টা করব।

আপনি বিপিনবাবুকে আদায়ের কাজটা দিতে চাইছেন, ওটা কি আমাকে দিতে পারেন না?

আপনি করবেন টাকা আদায়ের কাজ! পারবেন?

না পারার কি আছে বলুন। ঘোরাঘুরিই তো আমার কাজ।

হাসলেন অধীরবাবু, এ শুধু ঘোরাঘুরির কাজ নয়।

একটু থেমে বললেন, বক দেখেছেন? না, আকাশ দিয়ে যে বক উড়ে যায় আর আপনারা কাব্যি

করেন, সে বক নয়। জলার ধারে একটি পা তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকে যে বক, সেই বক। টাকা আদায় হল সেই বকের কাজ। টাকা থাকলেও সহজে কেউ তা ট্যাঁক থেকে বের করবে না। অসীম ধৈর্যে আপনাকে বসে থাকতে হবে। কোনদিন জুটবে, কোনদিন ছুটবে না। তবু দেঁতো হাসি হেসে নমস্কার করে বলতে হবে, দয়া করে বলুন, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

সীমা বলল, একবার কাজটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন, না পারলে আপনার বিবেচনা মত ব্যবস্থা করবেন।

সেই ব্যবস্থাই হল। আপাততঃ বিপিনবাবু পুরনো পদেই বহাল রইলেন। সীমা নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাগাদায় বেরতে লাগল। প্রথম প্রথম দু'একটা জায়গায় ভদ্রমহিলা দেখে কর্মচারীরা বিলপত্র তাড়াতাড়ি পাস করে দিলে। কিন্তু গোল বাধল অধীরবাবুর এক বড় পার্টির কাছে। তারা সারা বছর কাজ যোগায় কিন্তু পেমেন্টের বেলায় শম্বুকগতি। ও পার্টিকে উগরোনোও যায় না, গেলাও যায় না।

সীমা প্রথম দিন তাগাদায় যেতেই প্রকাশক ভদ্রলোক হাঁ করে কতক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন জীবনে এই প্রথম মেয়েমানুষ দেখছেন। তারপর গলায় অদ্ভুত সুর তুলে বললেন, শেষে অধীরবাবু প্রকাশক নিধনে প্রমীলা সৈন্য নিয়োগ করলেন?

হাহা হাহা করে সে কি হাসি লোকটির। শেষে বললেন, আসবেন, আসবেন, শত্রুভাবে নয় মিত্রভাবে। পাবেন, তবে ঘনঘন তাগাদা মেরে লাভ নেই। আমাকে বাঁচতে দিন, তবে আপনারাও বাঁচবেন।

দু'তিনবার ধৈর্যের সঙ্গে সীমা এই লোকটির সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু শেষে একদিন ধৈর্যের সীমা আর রাখা গেল না।

তখন পুজো আসি আসি করছে। অধীরবাবুরও টাকার বিশেষ দরকার। তাই ঘনঘন তাগাদায় পাঠাচ্ছেন তিনি। সীমা সেই বিশেষ প্রকাশকটির কাছে যেতেই তিনি প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন, টাকা কি গড়ের মাঠের গাছে ফলে যে আঁকশি দিয়ে টানলেই ঝরঝর করে ঝরে পড়বে। অধীরবাবুকে বলবেন, তাঁর বাপ মা নামটা রেখেছেন সার্থক। তবে এও বলে দেবেন, ঘনঘন তাগাদায় কাজ হয় না।

সীমা অধৈর্য হয়েই বলল, ভদ্রলোকের নাম নিয়ে কথা বলছেন কেন, দয়া করে বলে দিন আবার কবে আপনার কাছে আসব?

ফোঁস করে উঠলেন প্রকাশক, কথা বলে এই শর্মার কাছ থেকে পার পাবে না কেউ, কথা বেচেই খাই আমি। তা ভালমানুষের মেয়ে বলেই তো মনে হত আপনাকে। এখন দেখছি চক্করও আছে।

সীমা বলল, ওসব আজেবাজে কথা রাখুন, কোন্ সময় নাগাদ পাওনাটা দিতে পারবেন শুধু সেই কথাটাই আমাকে বলে দিন।

দেখুন সময় কারো বাবার চাকর নয় যে ডাকামাত্রই এসে হাজির হবে। যেদিন দয়া করে সুসময় আমার ভাগ্যে এসে উদয় হবেন, সেদিনই অধীরবাবু তাঁর পাওনাটা পেয়ে যাবেন।

সীমা উঠে আসছিলেন, পেছন থেকে ভদ্রলোক ডাক দিলেন, শুনুন।

সীমা ফিরল।

লেখকদের আমরা দুইয়ে খাই, আর আমাদের আপনারা দুইয়ে খান। বলবেন অধীরবাবুকে, বাজার মন্দা। বই কাটছে, তবে সেটা পোকায়। লেখকদের বাঁটে দুধ নেই, শুধু জল। তাই এখন আমাদের দুইতে এলেই কেবল জল পাবেন, আসল মাল পাবেন না।

সীমা একটিও কথা না বলে চলে এসেছিল। অধীরবাবুর কাছে এসে হুবহু ঐ কথাগুলো বলেছিল। তাতে অধীরবাবু সীমাকেই দোষী করেছিলেন।

সীমা বলেছিল, আমার মনিব বলুন যাই বলুন আপনি। কর্মচারীর কাছে মনিবের নাম ধরে কেউ গালমন্দ করলে সেটা কোন কর্মচারীরই সহ্য করা উচিত নয়।

অধীরবাবুর এবার সত্যিই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ জন্যেই মেয়েদের এ কাজে পাঠাতে চাই না। প্রেস্টিজ বড় টনটনে আপনাদের। পার্টি জুতো মারলে সে জুতো আমাদের বাঁধিয়ে রেখে দিতে হয়, জানেন। সে হল লক্ষ্মীর জুতো, মাথায় ঠেকিয়ে পুজো করতে হয়।

সীমা বলল, আপনি পুজো করুন, আমার দ্বারা এ কাজ আর হবে না।

এই রইল আপনার বিল, তাগাদার কাগজপত্র। আমি চললুম।

তা যান, কিন্তু আমার পার্টিটাকে বিগড়ে দিয়ে গেলেন তো।

সীমা কোন কথা না বলে দু'হাত তুলে নমস্কার করে পথে বেরিয়ে এল। ঘৃণায় তার সারাটা শরীর রী-রী করছিল। সন্ধ্যার আলো জ্বলে গিয়েছিল পথে। সীমার মনে হচ্ছিল, এখন একটু অন্ধকারে নির্জনে হাঁটতে পারলে ভাল হত। লোকজনের সঙ্গ সেই মুহূর্তে সে যেন আর সহ্য করতে পারছিল না।

কিছু পথ এগিয়ে এসেছিল সীমা, পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন ডাকলে।

সীমা ফিরে দাঁড়াতেই দেখল বিপিনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছেন। কাছে এসে বিপিনবাবু বললেন, মা, কি সব্বোনাশটাই না হয়ে গেল!

সীমা বলল, কেন কি হয়েছে?

কি হয়েছে! চাকরিটা গেল। আর এ জন্যে আমিই হলাম দায়ী।

সীমা ম্লান হেসে বলল, আপনি দায়ী হতে যাবেন কেন, আমি নিজেই তো ছেড়ে দিলাম।

না মা না, এ বলে ছেলের দোষ তুমি ঢাকতে পারবে না। প্রুফ-রিডিংএর কাজটা আমার জন্যে তো তুমি ছাড়লে মা। ওটা থাকলে আজ তোমার চাকরি ছাড়ায় কে!

সীমা বলল, আপনি নিজেকে অপরাধী ভাববেন না,তাতে জানবেন আমারই অসোয়াস্তি। আমি মনে-প্রাণে অধীরবাবুর কাজ থেকে রেহাই পেতে চাইছিলাম।

বিপিনবাবু বললেন, তাহলে সংসার তোমার কি করে চলবে মা?

লজেন্স বিক্রি করে।

এ তোমার অভিমানেব কথা হল মা।

সীমা বলল, একদিন আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনার মেয়েরা লজেন্স বিক্রি করতে পারে। আপনি সেদিন আমার কথায় মনে মনে দুঃখই পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ সত্যি করে বলি, লজেন্স বেচে পয়সা রোজগার করাই আমার কাজ।

বিপিনবাবু কোন কথা না বলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সীমা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেল।

আজ ট্রেনে বসে সেই পুরনো ছবিগুলোই তার মনে পড়ছিল। একটু আগে সে চায়ের দোকানের ছোকরাগুলোকে বলতে শুনেছিল, লজেন্স বিক্রি করে, তার আবার দেমাক। ঠিক ওভাবে না বললেও বিপিনবাবুর মত লোকও লজেন্স বেচে পয়সা রোজগার করাটাকে ঘৃণার চোখেই দেখতেন।

মনে মনে হাসল সীমা। তাকে বাঁচতে হবে! আগে বাঁচুক তো সে যেমন করে হোক, তারপর ভাববে, কেমন করে বাঁচা যায়।

সীমা রোজকার মত লজেন্স বিক্রি করল, তারপর দুপুরের দিকে গিয়ে দাঁড়াল একটি ঘরের সামনে। দরজায় টোকা দিতেই খুলে গেল কপাট। ভেতরে কোন একটি পার্টির মিটিং চলছিল। একটি ভদ্রলোক উঠে এসে সীমাকে পাশের একটি রুমে নিয়ে গেলেন। খসখস করে একটা চিঠি লিখে সীমার হাতে দিয়ে বললেন, হেডমিস্ট্রেসের হাতে এটি দিও। খুব অসুবিধে না হলে তিনি চাকরিতে তোমাকে বহাল করবেন।

সীমা চিঠি নিয়ে চলে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক তাকে ডেকে বললেন, শোন সীমা, দু'একটা কথা আছে।

সীমা কাছে এল।

ভদ্রলোক সীমাকে বললেন, তুমি তো কলেজ, ইউনিভারসিটির ছেলে-মেয়েদের কাছে লজেন্স বিক্রি করে বেড়াও, আমাদের একটা কাজ করে দিতে পারবে?

বলুন কি কাজ?

আমাদের এই নতুন পার্টির কিছু প্রচারপত্র ঐ সঙ্গে যদি বিলি করে দাও।

সীমা বলল, ও কাজ পারব না অরিন্দমদা, মাপ করবেন। অন্য কিছু বলুন।

ভদ্রলোক একটু ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, কেন পারবে না বল?

সীমাও কঠিন হল, আমি যে পার্টি সম্বন্ধে কিছু জানি না তার কাজ করব কি করে! আর তাছাড়া আপনি তো জানেন কোন পার্টিরই ভেতর নেই আমি।

অরিন্দমবাবু বললেন, পড়ে দেখ আমাদের প্রচারপুস্তিকাগুলো। আমাদের আদর্শ একদিন তোমারও আদর্শ হয়ে যাবে।

সীমা বলল, মেনে নিচ্ছি আপনার কথা। আপনাদের পার্টির নীতি যে খুবই পরিচ্ছন্ন সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই নেই। তবে এর পরেও আমার একটি কথা থেকে যায়।

কি কথা বল?

আমি কৌতূহলে অনেক পার্টিরই প্রচারপুস্তিকা পড়ে দেখেছি। সেগুলির যুক্তি এমনি অকাট্য যে আমি তা চেষ্টা করেও খণ্ডন করতে পারিনি। যে-কোন এক পার্টির বই পড়ি, আর মনে হয়, এরাই তো ঠিক কথা বলছে। এখন বলুন, খারাপ ভালর বিচার করি কি করে?

অরিন্দমবাবু বললেন, কাজ দেখে বিচার করতে হবে।

সীমা বলল, অরিন্দমদা, একটা কথা বলি, প্রতিটি দলই নিজের পথে কাজ করে যাচ্ছে। কাউকে ছোট কাউকে বড় করে দেখার বুদ্ধি এখনও আমার হয়নি। সশস্ত্র বিপ্লব আর অহিংস বিপ্লব দুটো পথেই হয়ত দেশকে উন্নত করা যায়, কিন্তু পরস্পরে যদুবংশধরদের মত মারামারি করে যদি মরে তাহলে দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

সে তুমি বুঝবে না সীমা। জীবজগতের নিয়মই হচ্ছে 'Survival of thc fittest'. অর্থাৎ শক্তিমানেরাই টিকে থাকবে শেষ অবধি।

তা থাকুক, আপত্তি নেই আমার, এখন আমার বাঁচার একটু পথ আপনি করে দিন।

যাও, চিঠি তো দিয়ে দিলাম। তবে ভেবে দেখ আমার প্রস্তাবটা। তোমার বাবা আমার মাস্টারমশায় ছিলেন, স্নেহ করতেন, তাই তোমার ওপরও আমার একটা দাবি রয়ে গেছে।

সীমা মাথা নীচু করে সেখান থেকে চলে যাবার আগে বলল, যদি কোনদিন মনের থেকে এ কাজে সাড়া পাই তাহলে নিশ্চয়ই জানবেন আপনার আদেশ মাথা পেতে নেব অরিন্দমদা।

চলে এল সীমা। আজ 'ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যায়তনে' শিক্ষিকা নেবার জন্য ইনটারভিউ। সীমা আগে থেকেই আবেদনপত্রখানা পাঠিয়েছিল। অরিন্দমবাবুর বিশেষ পরিচিত এই হেডমিস্ট্রেস। তাই চিঠি একখানাও সঙ্গে নিয়েছে সে। ইস্কুলের গেট দিয়ে ঢুকে সে বরাবর হেডমিস্ট্রেসের ঘরের দিকে পা চালাল। সামনেই দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, ইনটারভিউ আপনার, তবে ঐ পাঁচ নম্বর ঘরে গিয়ে বসুন।

আমি হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

এখন তো দেখা হবে না। উনি ব্যস্ত রয়েছেন।

আমার ইন্টারভিউ আছে, কিন্তু একখানা চিঠি হেডমিস্ট্রেসকে দিতে হবে।

তিনি বলে দিয়েছেন, ইন্টারভিউ যাঁদের আছে তাঁদের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না এখন। তবে চিঠিখানা দিন, আমি তাঁকে দিয়ে আসছি।

সীমা দারোয়ানের হাতে অরিন্দমবাবুর লেখা চিঠিখানা দিয়ে দিল।

ওদিকে হেডমিস্ট্রেস সুহাসিনী দেবী দারোয়ানের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে খুলে পড়তে লাগলেন। ফোনটা বেজে উঠল। সুহাসিনী দেবী ফোন তুললেন। ওপার থেকে অরিন্দমবাবু কথা বলছিলেন।

সুহাসিনী দেবী, —হ্যালো, অরিন্দম, কি ব্যাপার, নতুন রিক্রুট নাকি?

অরিন্দম, — চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এখনও বঁড়শির নাগালের বাইরে।

তুমি তো দেখছি একপাতা প্রশংসাপত্র লিখে পাঠিয়েছ।

ওকথা থাক। সামনে এলে সবার মন যোগাতে হয়। তাই তো ফোন করতে হল। ইমপরটেন্স দেবার কোন দরকার নেই। বুঝে শুনে নিও কাউকে, যাকে দিয়ে পার্টির কাজ চলতে পারে।

অত কাঁচা কাজ আমি করি না অরিন্দম, তেমন ক্যাণ্ডিডেট যোগাড় না করে কি এমনি ইন্টারভিউ ডেকেছি। আচ্ছা, তাহলে ছাড়ছি।

অরিন্দম, —হ্যাঁ শোন, একটা কথা বলে রাখি, মেয়েটার রেজাল্ট খুবই ভাল। ওকে কোশ্চেন করে ঠেকান দায় হবে। ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যান্যদের মত ফিরে যেতে পারে।

সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। কাজ হাসিল আমি ঠিকই করে নেব।

ইন্টারভিউতে প্রথমেই ডাকা হল সীমাকে। সীমা ভাবলে চিঠিতে কিছু কাজ হয়েছে।

সে নমস্কার করে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল।

হেডমিস্ট্রেস একখানা নির্দিষ্ট চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

সীমা বসল।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, আপনার কোয়ালিফিকেশন যা দেখছি তাতে আমাদের বলার কিছু নেই।

সেক্রেটারি, যিনি টাকার জোরে এই পদে বহাল রয়েছেন, তিনি হেডমিস্ট্রেসের কথার মাঝেই বলে বসলেন, আচ্ছা বলতে পারেন এর মানে,

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে।'

সীমা বলতে শুরু করল, দুঃখকে ভয় পেলে চলবে না। দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই মনের শক্তি বাড়বে, তখন সুখ লাভ করা খুব কষ্টকর হবে না। আগে চাই দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি।

সেক্রেটারি উচ্ছ্বসিত হলেন, ঠিক কথা, যথার্থ কথা।

হেডমিস্ট্রেস দেখলেন সেক্রেটারির মন ভিজেছে, অমনি তিনি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

আচ্ছা দেশের ধনীদের সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই কিছু একটা ধারণা আছে। সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু যদি বলেন।

সেক্রেটারি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। তিনি এ অঞ্চলের বিশিষ্ট বিত্তবান।

সীমা বলল, সত্যি কথা বলতে কি নিজের সংসার চালানোর চিন্তায় এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ধনীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাববার সুযোগ পাই না। তবে এটুকু বলতে পারি, তাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে খুব বেশি বুদ্ধিমান। অবশ্য সে বুদ্ধির বেশির ভাগই দুষ্টুবুদ্ধি।

সেক্রেটারি যে মেয়েটির দিকে এক মুহূর্ত আগে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন, এবার অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হেডমিস্ট্রেস আবার বললেন, জোর করে জমিদারের কাছ থেকে জমি কেড়ে দিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার যে হিড়িক পড়েছে, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

দেখুন আমি বাংলার ছাত্রী। আর বাংলা পড়াবার জন্যেই আপনারা শিক্ষিকা চান। এ প্রশ্নগুলা ভূমিনীতি বা অর্থনীতির প্রশ্ন।

একটু থেমে সীমা বলল, তবু এ সম্বন্ধে আমার সাধারণ জ্ঞান যা বলে তাতে মনে হয়, ওভাবে ভূমিহীনদের ভেতর জমি বিলি করে দেওয়া ঠিক নয়।

সেক্রেটারি আবার উৎসাহিত হলেন, ঠিক, ঠিক বলেছেন।

হেডমিস্ট্রেস ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন, কেন বলুন?

সীমা বলল, জমিদারের জমি কেড়ে নিন তাতে আপত্তি নেই. কিন্তু বিনা পরিশ্রমে যে মানুষগুলো জমি পেয়ে গেল, তাদের পাওয়াগুলো লটারির টাকা পাওয়ার মত হয়ে গেল যে!

আপনি তাহলে কিরকম সমাধান কবতে চান?

সরকার সব জমির ভার নিন। কৃষক দিয়ে চাষ করিয়ে তাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিন।

হেডমিস্ট্রেস সেক্রেটারির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, কিন্তু এই সর্বহারা জমিদারদের তাহলে কি হবে?

তাঁরা যে ধরনের কাজ পারেন, সরকারকে মোটামুটি সেই ধরনের কিছু কাজে তাঁদের নিযুক্ত করতে হবে। সোজা কথা বসে বসে অনেক পাওয়ার লোভ ছাড়তে হবে, খেটে খেতে হবে।

সেক্রেটারি মুখ গম্ভীর করে বসে রইলেন।

হেডমিস্ট্রেস শেষ প্রশ্ন করলেন, এর আগে কাজের কি এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনার?

আমি কোন স্কুলেই আগে চাকরি করিনি।

কোনকিছু কাজ করেন না আপনি?

আগে টিউশনি করতাম।

ওটা অভিজ্ঞতার কোন কোয়ালিফিকেশন নয়। আমি বলছি, এখন সংসার চালান কি করে? দরখাস্তে দেখছি, আপনার একার ওপরে সংসার নির্ভর করছে।

আজ্ঞে হাঁ। আমি বিভিন্ন স্কুল কলেজের মেয়েদের কাছে লজেন্স বিক্রি করে বেড়াই।

ঘরে যেন বোমা পড়লেও এতখানি চমক লাগত না। ইনটারভিউ বোর্ডের সবাই বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

হেডমিস্ট্রেস বললেন, আই সি। আচ্ছা এখন আপনি আসতে পারেন।

সীমা নমস্কার করে চলে আসতে আসতেই শুনতে পেল, হেডমিস্ট্রেস বলছেন, যে মেয়ে লজেন্স বিক্রি করে সে কর্মী হতে পারে, কিন্তু আদর্শবাদী হতে পারে না। শিক্ষকের প্রধান গুণ হবে আদর্শ, উচ্চ আদর্শ। আদর্শ উচ্চ না হলে ছেলেমেয়েরা শিখবে কি! লজেন্স বিক্রি হবে আমাদের মেয়েদের আদর্শ। হোপলেস।

সেক্রেটারি হেডমিস্ট্রেসের কথায় জোরে মাথা নেড়ে সায় দিতে লাগলেন। মেয়েটির জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে কথাগুলো তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি।

সীমা আবার সেই পথে! ক্ষীণ আশার যে আলোটুকু দেখছিল তা হঠাৎ নিভে গেল। আজকাল কাজে বড় ক্লান্তি এসেছে তার। যে স্বাধীন কাজের প্রেরণা থেকে সে লজেন্স বিক্রি করাকে হীন চোখে দেখেনি, আজ সকলের কাছ থেকে ঘৃণা কুড়োতে কুড়োতে সে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু পা চালাতে হয়। ভোরের ট্রেনের বাঁশি বাজে। দৈনন্দিনের কাজ শুরু হয় তার।

সেদিন সে চলছিল পথে। ভোরবেলা, তখনও লোকজনের তেমন সমারোহ ছিল না। বাস ট্রামও পথচারিদের পথরোধ করে দাঁড়ায়নি।

সীমা।

মেয়ে গলায় কে যেন ডাকলে।

পেছন ফিরে কাউকে দেখতে না পেয়ে সীমা আবার সামনে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় পাশের একটা চায়ের দোকান থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে তাকে প্রায় টানতে টানতে দোকানের ভেতর নিয়ে গেল।

বোস, চিনতে পারলি না তো?

উগ্র প্রসাধন করা মেয়েটিকে সত্যিই সে চিনতে পারেনি। একরকম হকচকিয়ে গিয়েছিল।

তারপর স্মৃতিতে যখন এল, তখন হেসে বলল, লোপামুদ্রা না?

চিনতে পারলি তাহলে। তবে এখন আর এতবড় নামটা নেই। কেউ বলে লোপা, আবার কেউ বলে মুদ্রা।

সীমা বলল, বলে দে আমি কি বলে ডাকব।

তুই লোপা বলেই ডাকতে পারিস, কিন্তু আজকাল আমার মুদ্রা নামটাই পছন্দ।

হেসে বলল, মুদ্রা ছাড়া দুনিয়া অন্ধকার।

একটু থেমে আবার বলল লোপামুদ্রা, জানিস আমার অফিসের অন্য মেয়েরা আড়ালে আমায় বলে 'মুদ্রারাক্ষস'। স্রেফ জেলাসী। অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার মুখার্জি সাহেব আমার কাজ ভালবাসেন, তাই তাঁর ঘরে আমার ঘনঘন ডাক পড়ে, এই হয়েছে ওদের জ্বালার কারণ। আচ্ছা তুই বল সীমা, টাকা ছাড়া কি এক পাও চলা যায় দুনিয়ায়!

সীমা একটা সম্মতিসূচক হাসি হাসল।

বেয়ারা, দু'কাপ চা, দুটো ডবল ডিমের অমলেট।

সীমা অমনি বারণ করলে, না ভাই আমি কিছু খাব না।

সে কি রে, নাইট ডিউটি দিয়ে ফিরছি সবে, কিছু টাকাও পেয়েছি উপরি, তার ওপর বহুদিনের বন্ধুকে দেখলাম, একটু সেলিব্রেট করতে দিবি না!

সীমা বড় বেশি সাবধানী। জীবনে একটি দিনের জন্যেও সে উৎসব করতে চায় না। একদিন কোনকিছু ভালমন্দ খাওয়া কিংবা ভালমন্দ দেখার মাসুল দিতে হয় অনেক। ঐসব ভালকিছুর ছোঁয়া লাগে মনে, মাঝে মাঝে সেই ছোঁয়া তার সামর্থ্যের বাইরে তাকে নিয়ে যেতে চায়। আর তা ছাড়া যে একদিন তাকে কিছু দেয়, অন্যদিন তার কাছেও থাকে তার পাওনা। সে পাওনা শোধ দিতে না পারলে জাগে অকারণ মনঃক্ষোভ। তাই সীমা এসব লেনদেনের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়।

তবু লোপামুদ্রার আমন্ত্রণকে সে একেবারে উপেক্ষা করতে পারল না। বলল, কিছু মনে করিসনে ভাই, এখন খেলে আমার সইবে না, অমলেট তুই খা, আমি বরং চা-টা খাব।

অগত্যা তাই হল। একটা অমলেটের অর্ডার কাটা হল।

লোপামুদ্রা বলল, এখন বল তোর কথা।

সীমার সঙ্গে কলেজে পড়েছে লোপামুদ্রা। বি-এ পাসের আগেই কলেজ ছেড়েছিল। তখন লোপামুদ্রার অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। তবে যা ছিল ওর, তা অনেকেরই থাকে না। তাকানোর ধরন আর কথা বলার কায়দা অনেককেই আকৃষ্ট করত। তখন শাড়ির বাহার কিংবা প্রসাধনের চাকচিক্য কোনটাই ছিল না ওর। এখন সেটাও উগ্রভাবে ওর স্বভাবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সন্দেহ নেই, লোপামুদ্রা ঐ জোরেই এখন দিগ্বিজয় করে ফিরছে।

সীমা লোপামুদ্রার কথার উত্তরে বলল, এই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

লোপামুদ্রা কপালে চোখ তুলে বলল, সে কি রে, চাকরিবাকরি।

হেসে বলল সীমা, একটা চাকরি করি, —লজেন্স বিক্রি। কিছু কমিশন পাই।

লোপামুদ্রার চোখ বিশেষ একটা মুদ্রায় স্থির হয়ে রইল। একসময় বলল, এই কাজ! পড়াশোনা কদ্দুর চালিয়েছিলি?

এম-এ পাস করেছি।

লোপামুদ্রা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, তাই এই দশা। যত বেশি পড়বি, চাকরি খোঁজার সময় তত কম পাবি। আমার মত হল, মোটামুটি একটা পাস দিয়ে নাও, তারপর গরু খোঁজার মত চাকরি খোঁজ। ব্যস।

তারপর একটুখানি থেমে সকরুণ একটা ধিক্কারের সুরে বলল, অন্ততঃ পাঁচ ছ'টা বছর পড়া আর পরীক্ষায় নষ্ট করলি। এই মহামূল্য দিনগুলো চাকরির খোঁজে কাটালে এতদিনে একটা হিল্লে হয়ে যেত তোর। উচ্চশিক্ষার পোকা। একবার এ পোকা মাথায় ঢুকলে আর নিস্তার নেই। পুঁথির অক্ষরগুলোকে কেটে কুঁচিয়ে ঐ মগজের ভেতর ভরতে থাকবে। তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং দেখবি তোকে পথে বসিয়ে মাথা ফুঁড়ে ওগুলো বেরিয়ে গেছে।

সীমা ওর কথা বলার ধরন দেখে হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। কি নির্মম সত্যগুলোকে ও অবলীলায় বলে যাচ্ছে। আজ পরীক্ষায় পাস না করেও লোপামুদ্রা সংসারের কঠিন যুদ্ধটায় জয়ী হয়েছে। সীমা লোপামুদ্রার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে রইল। ওর ঐ উগ্র প্রসাধন এখন আর সীমাকে পীড়িত করল না। ওর স্বচ্ছন্দ জীবনটা এই মুহূর্তে সীমার কাছে অনেক বেশি লোভনীয় বলে মনে হল।

পুরনো বন্ধুকে পেয়ে লোপামুদ্রার খুশি আজ যেন উপচে পড়ছিল। সে অনর্গল কথা বলে গেল। সীমা প্রায় শ্রোতার ভূমিকায় রইল। একসময় মনে হল, বড় কষ্ট হচ্ছে যেন তার। ঠিক বিয়েবাড়ির সানাই আর রোশনাই-এর পাশ দিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে কোন শবযাত্রা চলে গেলে যেমন মনে হয়।

সীমার আর ভাল না লাগলেও সে উঠতে পারল না। সে জানে কলেজের ফার্স্ট পিরিয়ড ওভার

হয়ে গেছে। এখন তার লজেন্স বিক্রির সময়। তবু ঐ অজুহাতে সে লোপামুদ্রাকে ফেলে চলে যেতে চাইল না।

একটুখানি চুপ করে থেকে লোপামুদ্রা হঠাৎ বলল, অফিসে চাকরি করবি?

সীমার মনে হল, সে যেন দৈববাণী শুনছে।

কি বললি?

কথাটা ভাল করে আর একবার শুনতে চায় সীমা।

যদি চাকরি করার ইচ্ছে থাকে তোর তাহলে ঝটপট একখানা দরখাস্ত লিখে ফ্যাল দেখি।

লোপামুদ্রা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দিলে। তাদের অফিসে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের পি এ নেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে মিঃ মুখার্জি লোপামুদ্রাকেই নেবার পক্ষপাতী। তবু যাতে কোন দিকে কোন কথা না ওঠে সেজন্যে লোক দেখানো অ্যাডভারটাইজমেন্ট করে ইন্টারভিউ নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লোপামুদ্রার কথা শুনে সীমা হেসে বলল, তুই যাবি যে পোস্টে সেখানে আমি ইনটারভিউ দিতে যাব কোন দুঃখে।

দেখ, সীমা, লেখাপড়া শিখেছিস, কিন্তু এখানটাতে তোর (সীমার মাথার বিশেষ একটা জায়গায় আঙুল তুলে দেখালে) এক ফোঁটা ঘিলু জমেনি। আরে তোর দরখাস্ত হবে পি এ-র জন্যে। ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থাও আমি করে দেব। কিন্তু পোস্টটা আমারই হবে।

একটু থেমে লোপামুদ্রা বলল, ব্যাপারটা বড় গোলমেলে ঠেকছে, তাই না? তবে আসল কথাটা শোন, আমি পি-এ হয়ে গেলে আমার পোস্টটা খালি পড়বে, তখন ঐ একই ইন্টারভিউতে তুই যাতে আমার ছেড়ে আসা পোস্টটা পেয়ে যাস, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।

হেসে বলল, মুখার্জি সাহেবের কাছ থেকে কাজ আদায়ের ভারটা আমারই রইল।

যন্ত্রচালিতের মত একখানা দরখাস্ত লিখে ফেলল সীমা। লোপামুদ্রার হাতে দিয়ে বলল, এ নিয়ে আমি কিছু ভাবতে পারছি না ভাই। তুই যা বুঝিস তাই করিস।

সীমা চলল কলেজে তার দৈনন্দিন লজেন্স বিক্রির কাজে। এ কাজ তাকে যিনি দিয়েছিলেন তিনি বুঝিয়েছিলেন, লজেন্স খেয়ে কেউ শরীর হঠাৎ খারাপ করে বসবে না। সুতরাং সেদিক থেকে ভাবনা নেই। তারপর আজকাল কলেজে পড়া মেয়েদের তিন ভাগ গরীব বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। তারা পাঁচটা পয়সা দিয়ে একটা লজেন্স বেশ কিছু সময় মুখে রাখতে পারবে। তাছাড়া অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা লজেন্স খেতে ভালবাসে। তাই ব্যবসার দিক থেকে এর জুড়ি নেই।

সীমা তখন প্রায় কলের জল খেয়েই কাটাচ্ছিল। সে তাই লজেন্স বিক্রির প্রস্তাবটাকে অথৈ সমুদ্রে একটা ভেসে চলা কাঠের টুকরোর মত ধরে ফেলেছিল। ডুবে যেতে যেতে সে বেঁচেছে। যদিও সে এখনও ভরসাহীন সমুদ্রে ভেসে চলেছে তবু একেবারে তলিয়ে তো আর যায়নি। সীমা বাইরে কোথাও লজেন্স বিক্রি করে না, যা কিছু বিক্রি তার সবই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতর। সবকিছু হারিয়ে গেলেও কোথায় যেন তার শিক্ষাজগতের সঙ্গে একটুখানি যোগ থেকে গেছে।

কয়েকদিন পরের কথা। সীমা একখানা অফিসিয়াল খামের চিঠি পেয়ে খুলে দেখল, তাকে ইন্টারভিউ-এর জন্যে ডাকা হয়েছে।

সীমার মনে আবার ক্ষীণ আশার আলো একটা জ্বলে উঠল। লোপামুদ্রা তাহলে মিথ্যে করে তার কাছ থেকে দরখাস্তখানা লিখিয়ে নেয়নি। যদি চাকরিটা নাও হয়, তাহলেও সে কৃতজ্ঞ থাকবে লোপামুদ্রার কাছে। কত দরখাস্তই তো সে পাঠিয়েছে কত জায়গায়, কিন্তু ক'টা ইন্টারভিউতেই বা তার ডাক পড়েছে।

তারিখটা ভাল করে দেখে নিল সীমা। আগামী কাল দুপুর দু'টোয় ইনটারভিউ নেওয়া হবে তার। সীমা একটু চঞ্চল হয়েই পড়ল। কাপড়চোপড় আজ রাতেই কেচে ফেলতে হবে। কাল সকালে সে আর রোজকার কাজে বেরোবে না। অনেক কাজ তার ঐ সময়টুকুর ভেতর করে নিতে হবে। কাপড় ইস্ত্রি থেকে নিজেকে সম্ভবমত পরিপাটি করে তৈরি করে নেবার জন্যে যত রকমের ছোট বড় কাজ।

সীমা যথাসময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঠিকানা খুঁজে সে হাজির হল একটি নামকরা অফিসের সামনে।

এই যে আয়, তোকে রিসিভ করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

লোপামুদ্রা হাসতে হাসতে এসে ওর হাত ধরল। তারপর সীমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আমি যদি ছেলে হতাম তাহলে তোকে চিরদিনের মত চাকরি দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখতাম। আর সে সুযোগ যখন নেই তখন পরের হাতেই ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

সীমা হাসল। হাসলে সীমাকে আরও সুন্দর দেখায়।

লোপামুদ্রা একটু থেমে বলল, এখন শোন, ঐ সামনের ঘরে গিয়ে আর পাঁচজনের সঙ্গে বোস। ডাক পড়লে যাবি মুখার্জি সাহেবের কামরায়। ইন্টারভিউ হয়ে গেলে ভুলে যাবি না যেন। ঐ ঘরেই আবার ফিরে এসে বসবি। আমি এলে তবে উঠবি, তার আগে নয়।

সীমা বলল, তোর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, তুইই চাকরি দেবার আসল কর্তা।

লোপামুদ্রা চলে যেতে যেতে বলল, দেখ না কি হয়। আগে চাকরিটা হাতে আসুক, তারপর না হয় ডাকিস কর্তা বলে।

যেখানে সীমারা বসে ছিল, তার পাশের ঘরটিই মুখার্জি সাহেবের। সামনে বসে আছে বেয়ারা। নাদুসনুদুস বেয়ারাটি বেশ মজার লোক। ইন্টারভিউ আরম্ভ হতেই, সে এক একজনকে ডাক দিয়ে নিয়ে যায়। সীমা লক্ষ্য করল বেয়ারাটা আপাদমস্তক মেয়েটিকে দেখে নেয়। তারপর মুখে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটিয়ে তোলে। কখনও বা তার মুখ দেখলে মনে হয়, সে বলতে চাইছে, হবে না বাপু, মিছে মেহনত। আবার কখনও বা যেন বলতে চায়, দেখ চেষ্টা করে হলেও বা হতে পারে।

সবার শেষে এল সীমার ডাক। সীমা কৌতূহলের দৃষ্টি মেলে তাকাল বেয়ারাটার দিকে। ওর মুখে একটা গদগদ ভাব ফুটে উঠেছে। মুখার্জি সাহেবের দরজার সামনে আসতেই ও হঠাৎ বলল, ভুলে যাবেন না যেন এই অধমকে। অধমের নাম ভোলানাথ কর্মকার। এখানে পনেরটা বছর কেটে গেল। 'এল গেল' সব সাহেবদেরই আমি চিনি। হবে, মনে হচ্ছে আপনার হবে।

সীমা কোন কথা না বলে একটু হেসে ঘরের ভেতর ঢুকল। হাত জোড় করে নমস্কার করল। তখনও বোধকরি তার মুখে হাসির রেশটুকু লেগে থাকবে। মুখার্জির দৃষ্টি এড়াল না।

সামনের মুখোমুখি চেয়ারখানা দেখিয়ে দিলেন সীমাকে।

সীমা বসল। মিঃ মুখার্জি সুপুরুষই বলতে হবে। মুখ দেখে বয়সের আন্দাজ করা সম্ভব নয়। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের ভেতর বলেই মনে হয়।

সীমা বসলে মুখার্জি সাহেব কিছুক্ষণ নিজের ফাইলপত্রে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন। দু'এক জায়গায় সইও করলেন। দু'এক মিনিট মাত্র। তারপর সব কিছু বন্ধ করে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন সীমার দিকে।

সীমা মুখ নামাল।

মুখার্জি সাহেব হঠাৎ বললেন, আপনার বান্ধবীর কাছে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। আপনার কথা বলতে গিয়ে মিস সেন তো পঞ্চমুখ। বেশ তাহলে কাল থেকেই কাজ বুঝে নিন।

সীমা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

হাঁ, আর একটা কথা।

সীমা মুখার্জি সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখ মেলে।

দেখুন, দশটা পাঁচটা অফিসের সময় মেনে চললে আমার কাজ চলবে না। জরুরী দরকারে আপনাকে হয়ত অফিস আওয়ার্সের বাইরেও কাজ করতে হতে পারে। আবার কোনদিন কাজ না থাকলে আগেই চলে যেতে পারবেন। এসব সুবিধে অসুবিধের কথা বুঝে নিন, তারপর...।

সীমা বলল, পরিশ্রম করার অভ্যেস আমার আছে। প্রায় রাত দশটায় কাজ সেরে আমি বাড়ি ফিরি।

মাই গুডনেস! অ্যাতো রা—ত!

সীমা বলল, তিন বছর ধরে আমাকে তাই করতে হয়েছে স্যার।

বেশ, আমার এমনি লোকেরই দরকার।

সীমা এবার নমস্কার করে উঠল। মুখার্জি সাহেবের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তিনি ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বললেন, সরি, কাল তো ছুটির দিন, আর পরশু সানডে। আপনি এক কাজ করুন, একেবারে মানডেতে চলে আসুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সেইদিনই দিয়ে দেব। কাজও শুরু হবে আপনার সেইদিন থেকে।

মুখার্জি সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করবার ভঙ্গীতে টেবিলের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সীমা হাত ধরল। একটুখানি ঝাঁকানি দিয়ে মিঃ মুখার্জি হেসে বললেন, উইশ ইউ গুড্ লাক্।

সীমা চলে এল ঘরের বাইরে। নিজেকে সে যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না। বুকের পাথরখানা সরিয়ে কে যেন তাকে হালকা করে দিলে। সে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল লোপার কথা। সে যে বসতে বলেছিল পাশের ঘরে। আবার উঠে এল ওপরে। সিঁড়ির মুখেই কিন্তু দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল লোপামুদ্রা।

কি রে চাকরি পেয়ে বন্ধুকে একেবারে ভুলে গেলি?

সীমা সত্যি লজ্জিত হল।

কিছু মনে করিসনে ভাই, খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার।

লোপা বলল, কেমন দেখলি বসকে?

আমার তো মনে হল খুব ভাল লোক।

দারুণ?

লোপামুদ্রা একটা চোখ কুঁচকে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল।

সীমা বলল, সে তুই জানিস, আমার তো এই কয়েক মিনিটের দেখা। মোটামুটি মানুষটিকে খারাপ লাগল না।

লোপামুদ্রা বলল, এখন তোর চাকরি প্রাপ্তি প্রায় নিশ্চিত, সুতরাং সিনেমা দেখাতে পারিস।

বল কবে দেখবি?

লোপা বলল, সেই তো আসবি তুই কতদূর থেকে। তাহলে রোববার ম্যাটিনি শো-এর টিকিট কেটে রাখব লাইটহাউসে। সিনেমা দেখে রেস্টুরেন্টে খেয়ে তারপর বাড়ি ফিরব।

সীমা বলল, সব খরচটাই কিন্তু আমার।

এখন যা, সে দেখা যাবে পরে।

সীমার হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। সে বলল, হাঁরে, মুখার্জি সাহেব যে সোমবার আমাকে কাজে যোগ দিতে বললেন, তা কাজটা তোর পোস্টেই তো?

লোপা বলল, মিঃ মুখার্জির সঙ্গে সেরকম কথাই তো আমার হয়েছে। আমি প্রমোশন পাব ওঁর পি-এর পোস্টে, আর তুই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবি আমার পোস্টে। অবশ্য আমরা দুজনেই থাকব মুখার্জি সাহেবের ডিপার্টমেন্টে।

সীমা লোপামুদ্রার হাত ধরে বলল, কলকাতার পথের ওপর অনেক চোখের জল পড়েছে ভাই, আজ ভাবছি কোনকিছুই অকারণে যায় না। তোর কথা কোনদিনও ভুলব না।

সীমার গলাটা ধরে উঠল। মাথা নীচু হল। টপটপ করে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ার আগেই সে আঁচল টেনে তা মুছে ফেলল।

আরে, তুই তো দেখছি ভারী সেন্টিমেন্টাল সীমা। জীবনে সুখদুঃখ দুটোকেই যে মুঠো করে ধরে রাখতে পারে সেই তো বাজি জেতে রে। আমার জীবন দিয়ে তাই দেখছি সীমা।

একটু থেমে লোপামুদ্রা বলল, আজ আয় তাহলে। ভুলিস না রোববারের কথা। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

সীমা হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানাল সে আসবে।

নেমে গেল সীমা নীচে। লোপামুদ্রা তাকিয়ে রইল তার চলে যাবার পথের দিকে। সীমা চলে গেলে লোপা গিয়ে ঢুকল মিঃ মুখার্জির কামরায়।

আজ এই প্রথম লোপামুদ্রা লক্ষ্য করল, মিঃ মুখার্জি কাজের মাঝে ডুবে গিয়ে তাকে যেন দেখেও দেখলেন না। লোপা অবাক হল। যে মুখার্জি সাহেব লোপার ঘরে ঢোকামাত্র সব কাজ ফেলে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে তাকাতেন, তাঁর আজকের ব্যবহার লোপার একটুও ভাল লাগল না। মুখার্জি সাহেবের অনেক সন্ধ্যার ভ্রমণ-সঙ্গিনী হতে হয়েছে তাকে। কত কথাই না শুনতে হয়েছে তাকে এজন্যে। কিন্তু একমাত্র টাকা রোজগারই ছিল লোপামুদ্রার লক্ষ্য, তাই সে গ্রাহ্য করেনি কাউকে। কিন্তু আজ যেন কোথায় একটা তার কেটে গেছে বলে মনে হল তার।

লোপামুদ্রা চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়েই রইল।

কিছুক্ষণ কাজের ভেতর মগ্ন থাকার পর মিঃ মুখার্জি চোখ তুলে তাকালেন।

এই যে কখন এলে?

লোপামুদ্রা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, আমার বন্ধুকে চাকরি দেবার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে এলাম।

এবার মিঃ মুখার্জি বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, আরে বোস বোস দাঁড়িয়ে রইলে যে।

লোপামুদ্রা বসল।

মিঃ মুখার্জি বললেন, তোমার নির্বাচনকে তারিফ না করে পারছি না মিস সেন। তোমার বান্ধবীটি এককথায় অনবদ্য।

লোপামুদ্রা বলল, সে তো আপনাকে আমি বলেইছিলাম।

তোমার বলার চেয়েও বোধকরি বেশি।

হাসলেন মিঃ মুখার্জি। তারপর সহসা মুখখানা গম্ভীর করে বললেন, কিন্তু ভেরি সরি মিস্ সেন, তোমাকে পি-এর পোস্টে প্রমোশন দিয়ে নেওয়া যাবে না। ডাইরেক্টরের স্ট্রিক্ট নির্দেশ, অফিসের কাউকে যেন প্রমোশন না দেওয়া হয়। নানান ঝামেলায় পড়তে হবে শেষকালে।

লোপামুদ্রা মুহূর্তে বুঝে নিল, সীমাকে মিঃ মুখার্জির মনে ধরেছে, আর তাই এই অজুহাত সৃষ্টি। আজ সকালেই ফোনে মিঃ মুখার্জির সঙ্গে তার পাকাপাকি কথা হয়েছিল, পি-এর পোস্টে সেই আসছে আর তার পোস্টে আসছে সীমা। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ভেতর ডাইরেক্টরের কড়া নির্দেশ এসে যাবে এ অসম্ভব। তাছাড়া লোপা ভাল করেই জানে ডাইরেক্টর রয়েছেন সিমলার অফিসে।

লোপামুদ্রা মিঃ মুখার্জির কাছে নিজের সম্বন্ধে কোন তদ্বির আর করল না। শুধু চলে আসার সময় বলল, আমার ওপর এতদিন যেটুকু কৃপা দেখিয়েছেন সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, আর বিশেষ কৃতজ্ঞ আমার বন্ধুকে চাকরি দেবার জন্যে। তবে এটুকু মনে রাখবেন, সকলে লোপামুদ্রা নয়।

লোপামুদ্রা মুখার্জি সাহেবের কামরা থেকে বেরিয়ে এল।

রোববার লাইটহাউসের সামনে দেখা হল দু'বন্ধুতে। আগেই টিকিট কেটে রেখেছিল লোপা। দুজনে বসে বসে সিনেমা দেখল। নর্তকী ইসাডোরা ডানকানের লাইফ নিয়ে গড়ে উঠেছে এ বই। সামাজিক আইনে অনেক সময় যাকে দোষণীয় বলে ঘোষণা করা হয়, ইসাডোরা চিরদিনই সে আইন ভেঙেছে জীবনের সত্যকে খুঁজতে গিয়ে।

মন ভরে দেখবার মত ছবি। সীমা পর্দায় ফেলা আলোর ঝলকে হঠাৎ দেখল তার পাশে বসে গালে হাত দিয়ে ছবি দেখছে লোপা, তন্ময় হয়ে দেখছে।

ছবি শেষ হল। বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। তখনও যেন লোপা নিজের তদগত ভাবখানা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সীমা দেখল, লোপার চোখে জল চিকচিক করছে।

ওরা গাড়িতে উঠল না। গড়ের মাঠের গাছগুলোর নীচে পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটতে লাগল। গরম পড়েছে খুব, তাই ফাঁকা মাঠের হাওয়াটা ভালই লাগছিল।

প্রথমে কথা বলল লোপা, দেখ, আজ রেস্টুরেন্টে খাবার কথা ছিল, কিন্তু মনটা ভাল লাগছে না রে ভাই।

সীমা বলল, তাতে কি হয়েছে, আর একদিন না হয় খাওয়া যাবে। এখন তো রোজই তোতে আমাতে দেখা হবে।

লোপা হাসল। বলল, যাবি একটু গঙ্গার ধারে?

সীমা বলল, চল, আমার এখন কোন তাড়া নেই।

ওরা গঙ্গার ধারে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসল। সামনে সন্ধ্যার গঙ্গায় তরল অন্ধকারের স্রোত। বড় বড় দুটো জাহাজে আলো ঝলমল করছিল। জলে পড়েছিল সেই আলোর ঝলক। ওরা দেখছিল। কতক্ষণ কোন কথাই কেউ বলল না।

একসময় লোপা বলল, তোকে একটা কথা বলব বলে এখানে ডেকে নিয়ে এলাম।

সীমা লোপার দিকে তাকাল।

তুই চাকরি পেয়েছিস, তোর চেয়ে আমি কম খুশি হইনি সীমা।

সে আমি জানি লোপা। পথের থেকে তুই আজ আমাকে তুলে নিয়ে এলি অনেক ওপরে।

লোপা বলল, সেইখানেই আমার ভয় সীমা। আমি মাঝে না থেকে যদি তুই নিজে চাকরিতে আসতিস, তাহলে আমার কোন ভয় বা দায় থাকত না। আজ তাই চাকরিতে যোগ দেবার আগে তোকে আমার একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার।

সীমা বলল, আমি একেবারে অজানা জগতে ঢুকছি ভাই, তোর সাহায্য ছাড়া হয়ত আমার চলাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

না সে কথা নয়। আমি বলছি, যে কোম্পানিতে তুই চাকরি করতে ঢুকছিস, আর যার কাছে বসে রোজ কাজ করবি সেখানে তোকে মনে মনে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সীমা কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

লোপামুদ্রা বলল, প্রাইভেট অফিসে কাজ করার অভিজ্ঞতা তোর নেই, তাই এত কথা বলা। সব প্রাইভেট অফিসের কথা আমি বলছি না কিন্তু আমাদের অফিস সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, তাই বলছি। চাকরি রাখতে হলে বসের মন যুগিয়ে চলতে হবে সব সময়। তাকে সবরকম খুশি করতে না পারলে তোমার উন্নতি নেই, — উন্নতি তো দূরের কথা চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়ে যেতে পারে।

সীমা অবাক হয়ে বলল, সবরকমে বসকে খুশি করা মানে, তুই কি বোঝাতে চাইছিস?

লোপা বলল, এই সহজ কথাটা বুঝলি না। দরকার হলে বসের সঙ্গে তাঁর প্রাইভেট কারে করে এই গঙ্গার ধারে হাওয়া খাওয়ার জন্যে আসতে হবে।

সীমা বলল, অসম্ভব।

লোপা বলল, মানুষের প্রয়োজন সব অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেয় সীমা। আমি কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম, এত সহজে কাউকে সঙ্গ দিতে পারব!

সীমা বলল, আমাকে খুলে বল ভাই, অন্ধকারে রাখিসনে।

লোপা বলল, এতদূর এগিয়ে এসে আর পেছনো যায় না সীমা। তার চেয়ে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করিস। দারিদ্র্যের জ্বালা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে পারবি।

সীমা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তা বলে নিজেকে বিক্রি করে আমি বড়লোক হতে চাইনে।

হাসল লোপা।

তোর প্রয়োজন হয়ত অনেক কম সীমা, কিন্তু এমন প্রয়োজনও থাকে মানুষের, যার জন্যে সবরকম কাজ করতেই সে প্রস্তুত থাকে।

সীমা কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল।

লোপা বলল, মিঃ মুখার্জির তোকে খুব পছন্দ হয়েছে। তাই তিনি চান তাঁর পি-এর কাজে তোকেই দেখতে।

সীমা লোপার কথার ভেতরেই বলে উঠল, সে কি করে হয়। কাজ পেলে আমি বেঁচে যাই এ কথা যেমন ঠিক, অন্যের কাজ কেড়ে নিয়ে আমি বাঁচতে চাই না, এ কথা তেমনি সত্য। আর বিশেষ করে যেখানে তোর আমার প্রশ্ন।

লোপা বলল, কাজ করতে এসে সেন্টিমেন্টাল হোসনে এই আমার অনুরোধ। মুখার্জি সাহেব একটি ক্ষুধিত নেকড়ে। ওকে সব সময় নজরে রেখে চলবার চেষ্টা করবি, আমার এইটুকু সাবধান করে দেওয়া।

আমি এ পরিস্থিতির ভেতর কাজ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না লোপা।

লোপা বলল, আমি তো পারছি।

সীমা বলল, তুই যে ছবি তুলে ধরলি, তাতে নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে কাজ করা কি সম্ভব?

লোপা বলল, সম্ভ্রম কাকে বলিস তোরা জানি না, তবে আমার সংসারের প্রয়োজনগুলো এম· ঃ। করে গিলতে আসে, যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমাকে অনেক সময় ছদ্মবেশ ধরতে ঽ ।

ছদ্মবেশ!

বিস্মিত হল সীমা।

হাঁ ছদ্মবেশ। যে আমি আমার সংসারের আমি, তাকে অফিসে আসার সময় ঘরে ফেলে আসি। অফিসের আমির আর এক চেহারা। আমার জীবনটা কি রকম জানিস, একদিকে, সংসারের ঘরণী অন্যদিকে রঙ্গমঞ্চের নায়িকা।

সীমা বলল, আমি কিছু ভাবতে পারছি না ভাই। কোনদিন এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। তুই যা পারিস, আমার পক্ষে সে পারা প্রায় অসম্ভব।

একটু চুপ করে থেকে সীমা বলল, দু'দিন দেখব, তেমন তেমন মনে হলে কাজ ছেড়ে দেবে।

লোপা বলল, দেখ সীমা, মুখে আমি রঙ মাখি ; মুখার্জি সাহেবের ঘরে যাই বাড়তি রোজগারের ধান্দায়, সে আমার বিলাসের জন্যে নয়। টাকা থাকলে লোকে বিলাসিতা করে আবার টাকার জন্যেও বিলাসিতার ছদ্মবেশ ধরতে হয়। শেষের বিলাসিতাটা আমার জন্যে সীমা।

সীমা কিছু বুঝতে না পেরে বিভ্রান্তের মত বসে রইল। তার মনে হল লোপামুদ্রার এমন কি প্রয়োজন যার জন্যে সে নিজেকে একটা নেকড়ের কাছে বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

লোপা সীমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, তুই হয়ত আমার কথাই ভাবছিস। আর ভাবছিস নিশ্চয়ই, মেয়েটা কি নোংরা। এর সঙ্গে দেখা না হলেই বুঝি ভাল ছিল। কিন্তু আমার সব ছবিটুকু না দেখে আমাকে বিচার করিসনে ভাই। অন্যে তো আমার সম্বন্ধে কত কথাই না ভাবে, তারা আমাকে হয়ত টাকা রোজগারের ধান্দায় ঘুরে বেড়ান একটা বিলাসিনী মেয়ে ছাড়া কিছুই ভাবে না। আমি তাদের ভুল ভেঙে দিই না কোনদিন। ওটুকু বাড়তি কাজ করার সময় কই আমার। কিন্তু তোর কাছে আজ কিছু লুকব না সীমা। তুই আজ চল আমার সঙ্গে আমার ঘরে। হয়ত তোর কষ্ট হবে, কিন্তু আমি একটু শান্তি পাব ভাই।

সীমা কিছুই বুঝল না, সে লোপামুদ্রার সঙ্গে চলল তার বাড়ি। ওরা বাস থেকে এসে নামল দক্ষিণ কলকাতার একটা বস্তি অঞ্চলে। সীমা লোপার সঙ্গে সেই বস্তির একখানা টালি-ছাওয়া ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল।

সীমা ভাবতেই পারল না যে লোপামুদ্রা এই বস্তিতেই বাস করে। লোপার বেশবাস পোশাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তা কোনকিছুর সঙ্গেই যেন সংগতি নেই এর।

দু'খানি ছোট ছোট ঘর পাশাপাশি। একখানার ভেতর রান্নার সরঞ্জাম থেকে বাক্স বিছানা গাদাগাদি হয়ে আছে। অন্য ঘরখানা ভেজান।

লোপামুদ্রা একখানা ছেঁড়া মাদুর পেতে দিল সীমাকে বসতে। তারপর হেসে বলল, এই আমার রাজাসন, বোস এখানে। এখন কি খাবি বল?

সীমা বলল, খাবার কথা তো ছিল না, সে আর একদিন হবে এখন।

কেন, আমার রাজ্যপাট দেখে বুঝি তোর ক্ষিদেও পালিয়েছে।

এ কথা কেন ভাই। আচ্ছা যা তোর খুশি তাই খাওয়া। তবে বাইরে থেকে কিছু আনিসনে যেন।

লোপা বলল, আমি এই আসছি, ততক্ষণে তুই আমার সংসারটায় একটু চোখ বুলিয়ে নে।

লোপা ছোট্ট একচিলতে বাথরুমের ভেতর ঢুকল। বেরিয়ে যখন এল তখন অন্য এক লোপামুদ্রা। লালপাড় একখানা সাদা শাড়ি পরেছে সে। সীমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তুই একটু বোস ভাই, আমি চুলে চিরুনিটা দিয়ে নি।

লোপামুদ্রা চুলে আলতো করে চিরুনি বুলিয়ে নিল। তার পরে সিঁদুরের কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে কপালে আঁকল বড় এক টিপ। সিঁথি ভরে টানল সিঁদুরের রেখা।

সীমা অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দেখে লোপামুদ্রা মুখ টিপে হেসে বলল, কি রে, কোনটা আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারছিস না?

সীমা বলল, তুই বিয়ে করেছিস!

মাথায় যে চিহ্ন এঁকেছি, তা দেখে কি মনে হয়?

আমি ভাবতেও পারিনি লোপা, যে তুই বিবাহিতা।

শুধু কি বিবাহিতা, আমি মহারানী, আর দেখবি আয় আমার মহারাজাকে।

লোপা পাশের ভেজান দরজাটা খুলে ফেলল।

সীমা দেখল একখানা খাটের ওপর পরিষ্কার বিছানা পাতা। পাশে টিপয়ে ফ্লাওয়ার ভাসের ওপর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। বিছানায় উঁচু দু'তিনটে বালিশে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত একটি মানুষ। দুটি চোখ শুধু প্রাণের লক্ষণ ঘোষণা করছে, তাছাড়া সমস্ত দেহ পাথরের মত নিশ্চল।

দেখ, আমার রাজাকে দেখ।

সীমা কি বলবে ভেবে পেল না। হাত তুলে সেই নিশ্চল পাথরের মূর্তিটিকে নমস্কার করল।

এতক্ষণে একটুখানি প্রাণের সাড়া যেন প্রকাশ পেল সেই মূর্তিতে। ঠোঁট দুটো একটু যেন নড়ে উঠল।

লোপা এগিয়ে গিয়ে বলল, আমার কলেজের বন্ধু সীমা। অনেকদিন পরে দেখা, তাই নিয়ে এলাম।

আবার ঠোঁট দুটো নড়ল। লোপা সীমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই এসেছিস বলে খুব খুশি হয়েছে ও। তোকে আদরযত্ন করতে বলছে।

এবার লোপা সীমাকে নিয়ে আগের ঘরে এসে বসল। দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। কোন কথা না বলে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে কয়েকটা আম কাটলে। একটা প্লেটে সাজিয়ে সীমাকে খেতে দিলে। সীমা দেখল খুব সুন্দর আর একখানা প্লেটে কয়েক টুকরো আম নিয়ে লোপা পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল, তুই খেতে থাক ভাই, আমি এখুনি আসছি।

দরজাটা খোলাই ছিল। সীমা দেখল, ঐ মানুষটিকে লোপা যত্ন করে আম খাওয়াচ্ছে। ডান হাত দিয়ে খাওয়াচ্ছে। আর বাম হাতটা বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়। অস্ফুটে কিছু যেন বলছে। হয়ত দীর্ঘসময় পরে আসার জন্যে আদর জানাচ্ছে।

সীমার মনে হল, একটি অসহায় শিশুকে তার মা পরম স্নেহে খাইয়ে দিচ্ছে।

খাওয়ান শেষ হলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে এল লোপামুদ্রা। সীমা তাকিয়ে দেখল, কি পরিতৃপ্তি লোপার চোখে মুখে।

লোপা বলল, তুই খাসনি এখনও, বসে আছিস প্লেট নিয়ে।

তুই আয় একসঙ্গে খাব।

লোপা এসে বসল সীমার পাশে। দু'বন্ধুতে খেতে খেতে কথা শুরু হল।

লোপা বলল, খুব অবাক লাগছে না রে? এই আমার সংসার, এই আমার জীবন।

সীমা বলতে যাচ্ছিল, তোর স্বামী...।

লোপা বলল, হাঁ ভাই আমার স্বামী, পক্ষাঘাতে পঙ্গু। আর ওকে সারিয়ে তুলব বলে আমি আজ চারটে বছর পাগলের মত টাকা কুড়িয়ে বেড়িয়েছি।

সীমা বলল, কিছু উপকার হয়েছে ওঁর?

তুই তো নিজের চোখেই দেখলি ভাই। দিনে দিনে আমার ভাঁড়ার শূন্য হয়েছে আর ও নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।

সীমা চুপ করে বসে রইল। লোপা উঠে কয়েকখানা ছবি তোরঙ্গ থেকে বের করে এনে সীমার সামনে রেখে বলল, দেখ তো দেখি, চিনতে পারিস?

লোপার ছবি, কিন্তু কি জীবন্ত! উজ্জ্বল অথচ কোমল রঙে প্রতিটি ছবি অপরূপ হয়ে উঠেছে। কোন ছবি, জলভরণে চলেছে লোপা, অস্তসূর্যের আভা এসে রাঙিয়ে দিয়েছে মুখ। কোন ছবিতে বসন্তের পলাশবনে ফুল কুড়িয়ে খোঁপায় গুঁজছে লোপা। আবার আকাশভরা মেঘের দিনে কোমরে কাপড় জড়িয়ে কপালের ওপর হাত রেখে তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে। এ যেন অন্য এক জগৎ বলে মনে হল সীমার।

সত্যি আশ্চর্য সুন্দর।

সীমা ছবি দেখা শেষ করে মন্তব্য করল।

এ আমার রাজার দান ভাই। পথে পথে একদিন ঘুরে ফিরছিল মডেলের সন্ধানে। পরিচয় হল। পয়সা ছিল না ওর হাতে। বললাম, যদি আমাকে দিয়ে কাজ চলে তাহলে আমি বিনি পয়সার মডেল হতে রাজী আছি।

আমাকে নিয়ে পাগলের মত ছবির পর ছবি এঁকে চলল। একদিন ছবির মানুষ ঘরের মানুষও হল। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল ভাই ব্যাধিতে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল আমার শিল্পী। যার ছবির এগজিবিশন দেখে কত বড় বড় লোক বাহবা দিলে, কত খবরকাগজের আর্ট ক্রিটিক প্রশস্তি করে লিখলে তারা কেউ একটি পয়সা নিয়ে এল না এই অসুস্থ মানুষটাকে সাহায্য করতে।

রাগ করে একদিন আমার রাজা বলল, দাও সব ছবি বিক্রি করে, যা পাওয়া যায় তাই ভাল। ভীষণ জেদী মানুষ, যা বলবে তাই করতে হবে। কিন্তু তুই বল ভাই, প্রাণ ধরে এসব ছবি আমি বিক্রি করতে পারি। সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম চাকরির ধান্দায়। শেষে এই কোম্পানিতে মুখার্জি সাহেবের নজরে পড়ে গেলাম। চাকরি হল, উপরি রোজগারও হল। ওকে এসে বলতাম, সারাদিন ঘুরে তোমার এই ছবিখানা বিক্রি করেছি। বানিয়ে গল্প বলতাম। মাইনের আর উপরি রোজগারের টাকাগুলো দেখাতাম, ওর ছবির মূল্য বলে। ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। দীর্ঘ দু'চার মাস পরে পরে আবার ছবি বিক্রির টাকা বলে ওর হাতে অনেকগুলো করে টাকা তুলে দিয়েছি। তুই ভাবতে পারবি না ভাই এ চার বছর ধরে আমি ওর সঙ্গে ছবি বিক্রির সেই অভিনয়ই করে চলেছি।

একটু থামল লোপা, গলাটা তার ধরে এসেছিল। একসময় বলল, বড় ডাক্তারে বলে গেছে আর বেশিদিন ওকে ধরে রাখা যাবে না।

হাসল লোপা। কান্নার মত শোনাল সে হাসি।

লোপা হাসতে হাসতেই বলল, আমার অভিনয়ের দিনও ফুরিয়ে এসেছে ভাই। যার জন্যে পাঁককে চন্দন বলে গায়ে মাখলাম, তাকে হারালে আমার আর কি রইল বল?

সীমা কি উত্তর দেবে এর। সে শুধু বলল, আমার অনেক ধারণা আজ বদলে গেল লোপা। তোকে দেখে আজ মনে হচ্ছে, তুই সত্যিকারের পদ্ম। পাঁকের ভেতরে আছিস তবু গায়ে তোর পূজার গন্ধ লেগে আছে।

পরের দিন সোমবার। সীমার কাজে যোগ দেবার দিন। সেজেগুজে সীমা বেরিয়ে গেল নতুন অফিসে। সিঁড়ি ভেঙে উঠল ওপরে। তারপর সোজা গিয়ে ঢুকল মুখার্জি সাহেবের কামরায়।

আসুন, আসুন মিস বোস। ভেরী পাংচুয়াল। খুব খুশি হলাম। দেখুন কাজ করতে এসে যারা দেরি করে আর ঘন ঘন ছুটি নেয় তাদের আমি একেবারে দেখতে পারিনে। কাজ না থাকলেও বসে থাকুন নিজের কাজের জায়গায়। তবেই তো বলব কাজের মানুষ।

খুব খুশি হলাম আপনার কথা শুনে মিঃ মুখার্জি।

সীমার কথা শুনে মুখার্জি সাহেব বিগলিত হলেন।

এই যে আপনি স্যার স্যার না করে প্রথম দিনেই মিঃ মুখার্জি বলে সম্বোধন করলেন, এতে জানবেন আমি একটুও দুঃখিত হইনি, বরং আনন্দ পেলাম প্রচুর।

একটু থেমে মুখার্জি সাহেব বললেন, দেখুন, যার সঙ্গে কাজ করবেন, তাকে যদি আপনার করে নিতে না পারলেন তাহলে কাজ করবেনই বা কিসের জোরে।

সীমা বলল, আপনার কথাগুলো ভারী ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে চাকরিটা করতে পারলে লাভই হত আমার।

মুখার্জি সাহেব হঠাৎ যেন কিছু বুঝতে পারলেন না। তারপর বললেন, কি বলছেন মিস বোস। চাকরিটা করতে পারলে মানে?

দুঃখিত মিঃ মুখার্জি, আমার পক্ষে চাকরিটা নেওয়া সম্ভব হবে না। আর দয়া করে এ কথাটা আপনি আমার বান্ধবী লোপামুদ্রাকে জানিয়ে দেবেন। লোপা হয়ত রাগ করবে, কারণ তার কথাতেই আপনি আমাকে চাকরিটা দিয়েছিলেন।

এমন একটা চাকরি হাতে পেয়েও আপনি ছেড়ে দেবেন, বাজারে চাকরির অবস্থা দেখেছেন!

ভেবে দেখলাম, চাকরির প্রয়োজন আমার যতখানি তার চেয়ে অন্য একজনের প্রয়োজন অনেক বেশি হতে পারে। তাই বলতে পারেন, নিজে সরে গিয়ে অন্যকে সুযোগ করে দিলাম।

মুখার্জি সাহেব বললেন, মিস সেনের কাছে শুনেছিলাম, লজেন্স বিক্রি করে নাকি আপনার সংসার চলে। আমাদের কোম্পানির কাজটা কি তার চেয়ে ছোট বলে মনে করেন? তাছাড়া উপরি আছে।

সীমা বলল, ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না। তবে কি জানেন সব কাজ সকলের সয় না। অনেক ভেবে দেখলাম, লজেন্স বিক্রি করাই আমার ভাল। কোনদিন ইচ্ছে হল কাজ করলাম, কোনদিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম।

মুখার্জি সাহেব এবার তাঁর শেষ টোপ ফেললেন, কাজের ভয় করছেন মিস বোস? প্র্যাকটিকেলি কাজ এখানে কিছু নেই। শুধু হাজিরা দেওয়া। বসে গড়িয়ে মাসের শেষে মাইনেটা নেওয়া। ফর শো একজন পি-এ দরকার। ডাইরেক্টর সাহেবের মর্জি। বলতে পারেন, রাজ্য নেই তবু রাজঠাট।

হা হা করে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন মিঃ মুখার্জি।

সীমা বলল, না ঠিক তা নয়, আমাকে এতটা অকর্মণ্য ভাববেন না। তবে ভেবে দেখছি, বসে বসে মাইনে নেওয়া আমার ধাতে সইবে না। হেঁটে চলে রোজগার করে অভ্যেসটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

মুখার্জি সাহেব এবার স্বমূর্তি ধরলেন, দেশটা উচ্ছন্নে গেল। যতসব বিড়িওলা, ফেরিওলারাই এখন দেশের সামনে উচ্চ আদর্শ। শিক্ষিত বেকারগুলো দেখছি সব সেদিকেই ছুটছে।

সীমা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, লেখাপড়া না থাকলে হয়ত আপনার এই কাজকেই মাথায় তুলে নিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার কয়েকটা ডিগ্রি রয়ে গেছে। তাই পারলাম না বলে দুঃখিত। নমস্কার

সীমা বেরিয়ে এল মিঃ মুখার্জির ঘর থেকে। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেলে যেমন ক্ষুধিত নেকড়ে আক্রোশে গজরাতে থাকে মুখার্জি সাহেব একা ঘরের ভেতর বসে বসে তেমনি গজরাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, নতুনের চেয়ে পুরনোই ভাল। মিস সেনকেই কাজটা দিয়ে দেওয়া যাক্। মেয়েটা সাবমিসিভ।

মুখার্জি সাহেব হাঁকলেন, বেয়ারা, মিস সেন।

আবার পথ। পথ চলার যেন আর বিরাম নেই সীমার। এমনি চলতে চলতে একদিন এক বুক স্টলে ও দেখতে পেলে একটি মাসিক পত্রিকা। পাতা ওলটাতে গিয়ে চোখে পড়ল অনির্বাণ চৌধুরীর একটি গল্প।

কলকাতার কোন একটি বিশিষ্ট কলেজে তিনি প্রধান অধ্যাপকের কাজ করেন, তাছাড়া ইউনিভারসিটিতেও পার্ট টাইম অধ্যাপনা করেন ডক্টর চৌধুরী। সীমারাও ওঁর কাছে পড়েছিল। শুধু তাই নয় অধ্যাপক চৌধুরী একজন বিশিষ্ট লেখকও।

সীমা বোধহয় জীবনে এই প্রথম তিনটি টাকা খরচ করে ঐ মাসিক পত্রিকাটি কিনল। কারণ কতকগুলো বাস্তব প্রয়োজন ছাড়া টাকা খরচ করার মত অবস্থা কোনদিনই তার ছিল না।

কলেজ স্কোয়ারে একটি ছায়ার আশ্রয়ে বসে সে গল্পটি প্রায় একনিশ্বাসেই পড়ে ফেলল। কি অদ্ভুত লেখার কলম অধ্যাপক চৌধুরীর। যেন প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনা চোখের সামনে মিছিল করে চলেছে।

সীমা গল্পটা পড়ে ঠিকানা খোঁজ করে অধ্যাপক চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে একদিন উঠল।

অধ্যাপক চৌধুরী সীমাকে চিনতে পারলেন, আরে এস এস, কি খবর? বস, বস।

সীমা প্রণাম করে বসল। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী বসে ছিলেন। পাশে একজন ভদ্রলোক কি যেন লিখছিলেন নিবিষ্ট হয়ে। তাঁর লেখা বুঝি শেষ হল সেই মুহূর্তে।

তিনি বললেন, পড়ব স্যার?

পড়ুন, পড়ুন।

ভদ্রলোক পড়তে লাগলেন, যখন গিয়ে পৌঁছলাম লেখক অনির্বাণ চৌধুরীর বাড়িতে তখন দেখি তিনি নিবিষ্ট মনে বিজ্ঞানবিষয়ক একখানি গ্রন্থ পাঠ করছেন। এত নিবিষ্ট ছিলেন যে আমার পায়ের সাড়া পেলেন না। হঠাৎ একসময় মুখ তুলে আমার পরিচয় পেয়ে হেসে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর সেই বিশ্বজয়ী হাসি দিয়ে তিনি মুহূর্তেই আমার হৃদয় জয় করে নিলেন।

বললাম, আপনি আর্টসের লোক, সাহিত্য নিয়ে কাটালেন চিরদিন, কিন্তু আপনার হাতে দেখছি বিজ্ঞানের বই?

হা হা করে সেই ভুবনজয়ী হাসি হেসে তিনি বললেন, স্বামী স্ত্রীতে কথাকাটাকাটি হয় বলেই কি এক ঘরে বাস করব না। বরং বাইরের আপাত বিরোধ অন্তরের গভীর মিলনকেই প্রকাশ করে। আর্টস আর সায়েন্স ঠিক তাই।

কথাগুলো যখন শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাকিয়ে ছিলাম তাঁর মুখের দিকে। তাঁর মুখের ওপর দেখছিলাম একটা গভীর বিশ্বাসের ছবি। তিনি কথা বলে চলেছিলেন, কখনও বিজ্ঞান, কখনও ধর্ম, কখনও বা সাহিত্য সমাজ নিয়ে। কি অনায়াস গতি তাঁর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার। আমার মনে হল যেন তাঁর ললাটে নতুন সূর্যের উদয় দেখলাম। মনে হল, আমাদের সৌরমণ্ডলে এক সূর্য, এ বিজ্ঞানের সত্য, কিন্তু সাহিত্যের সূর্য বারবার ফিরে ফিরে পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়। শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে দেখে সেদিন আমার মনে সেই বিশ্বাসই জেগে উঠল।

এত বড় লেখক হয়েও তিনি কিন্তু আমাকে চলে আসার সময় চা জলখাবারে আপ্যায়িত করতে ভুললেন না। বেয়ারাকে চলে যেতে বলে নিজের হাতেই তিনি চা পরিবেশন করলেন। এ সৌজন্য তাঁর সহজাত। তাই পথে নেমে মনে হল, তিনি স্রষ্টা হিসেবে যেমন দরদী, ঠিক তেমনি সৌজন্যের বেলাতেও অকৃত্রিম। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা যেন মিশে গেছে তাঁর মধ্যে অভিন্ন হৃদয়ে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে না দেখলে এ কথার সত্য উপলব্ধি হবে না।

অধ্যাপক চৌধুরী বললেন, অনেক বাড়িয়ে লিখলেন আমার সম্বন্ধে।

সে কি কথা স্যার, এই তো আমাদের কাজ। এ আমার তৃতীয় সাক্ষাৎকার। দেখবেন, 'বিশ্বহিতৈষী' পত্রিকায় যে ক'টি সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে সব ক'টির সুর ভাষা ব্যঞ্জনা আলাদা। এ না করতে পারলে রিপোর্টার কি স্যার।

কিন্তু এখনও আপনার চা খাওয়া হয়নি সুজিতবাবু।

সে তো হবে জানি স্যার, তাই আগেভাগেই লিখে রাখলাম।

চা এল। সীমার জন্যেও এল এক কাপ। চা খেতে খেতে হালকা গল্প হচ্ছিল। অধ্যাপক চৌধুরী সীমার দিকে ফিরে বললেন, আজকাল কাজকর্ম কি করছ?

লজেন্স বিক্রি করছি স্যার।

লজেন্স বিক্রি!

যেন আকাশ থেকে পড়লেন অধ্যাপক চৌধুরী।

তোমার রেজাল্ট তো খারাপ ছিল না, স্কুল কলেজে একটা চাকরি জোটাতে পারতে।

পেলাম কই স্যার।

অধ্যাপক চৌধুরী সেদিক দিয়ে আর হাঁটলেন না। তিনি রিপোর্টার ভদ্রলোককে বললেন, দেখুন, ভালভাবে এম-এ পাশ করে বসে আছে মেয়েটি.... একটি চাকরি নেই তার সামনে। সারাদিন লজেন্স নিয়ে ঘুরছে। 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি।'

রিপোর্টার উচ্ছ্বসিত হলেন, দাঁড়ান স্যার দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতার লাইন দিয়েই ক্যাপসান বানাব।

তারপর সীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার নাম?

সীমা বোস—

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আনম্যারেড।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রসিকতা করলেন রিপোর্টার ভদ্রলোক, কিছু মনে করবেন না, আজকাল বিয়ে করা মেয়েরা নিজেদের কুমারী বোঝাবার জন্যে সিঁদুরকে শিরোধার্য না করে চুলের অরণ্যে নির্বাসন দিচ্ছেন।

তারপর বললেন, হ্যাঁ বলুন দিকি আপনার পোষ্য ক'টি?

সীমা বলল, একটি ভাই আর আমি।

শুধু লজেন্স বিক্রির ওপর সংসার চলে?

না, ছোটখাট কিছু কাজ কখনওসখনও পেলে করি। এই যেমন প্রুফ দেখা, দু'একটা পাণ্ডুলিপি কপি করে দেওয়া।

এরপর একগাদা প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। খাতা বন্ধ করে ভদ্রলোক বললেন, নমস্কার, অদ্ভুত সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম। আমাদের বিশ্বহিতৈষীর শনিবারের সংখ্যা দেখবেন। 'জীবন-যন্ত্রণা' বিভাগে আপনার কথাই লেখা হবে। হয়ত দেখবেন ভাগ্য খুলে যেতে পারে।

রিপোর্টার ভদ্রলোক উঠলেন। সঙ্গের ক্যামেরাখানা তাক করলেন অধ্যাপক চৌধুরীর দিকে। অধ্যাপক চৌধুরী পকেট থেকে পেনটা টেনে নিয়ে হাতে ধরলেন, তারপর সেই পেনসহ হাতখানা ডানদিকের গালে স্থাপন করে চিন্তাবিদের পোজ করলেন। ক্লিক করে ছবি তোলা হয়ে গেল।

এবার আপনার।

সীমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। সীমা সংকুচিত হল, না, না, আমার কেন।

আমাদের পাবলিসিটির নিয়মই হচ্ছে তাই। কেবল ছবি তোলার সময় হাসবেন না প্রচলিত প্রথা মত। তাতে 'জীবন-যন্ত্রণা'র ভাবটা প্রকাশ পাবে না।

সীমার আপত্তি সত্ত্বেও ভদ্রলোক তার একখানা ছবি তুলে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বিদায় নিলেন। অন্য কোথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, দেরি হয়ে গেল।

ভদ্রলোক চলে গেলে অধ্যাপক চৌধুরীর মুখোমুখি হল সীমা।

আপনার গল্প পড়লাম স্যার।

কোন্ গল্প?

ঠগ্।

অধ্যাপক চৌধুরী স্মরণে যেন আনার চেষ্টা করতে লাগলেন, ঠগ্ ঠগ্।

সীমা বলল, ঐ যে স্যার গল্পটাতে একটি মেয়ে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছিল। মেয়েটি শিক্ষিতা কিন্তু চাকরি পায় না, প্লুরিসি হয়েছে। মেয়েটি টাকা চায়নি, তবু তার করুণ অবস্থা দেখে লেখক তাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, ঠিকানা রেখে যান চেষ্টা করে দেখব। শেষে একদিন একটা চাকরি যোগাড় করে ঐ ঠিকানায় চিঠি লিখে দেখা গেল, সব ভুয়ো।

মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, অনেকদিনের লেখা ফেলে রেখেছিলাম। সেদিন হঠাৎ 'ভূ-স্বর্গ' পত্রিকার সম্পাদক এসে ছিনে জোঁকের মত ধরে লেখাটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তা লেখাটা লাগল কেমন?

ভাল স্যার। আর তাই বলতেই আমার অ্যাদ্দূর আসা।

খুব খুশি হলাম।

কিন্তু একটা কথা বলার আছে স্যার।

বল?

অনেক মা-বাপ-হারা মেয়ের চাকরির দরকার আছে। তারা অনেকেই লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। তাদের সকলেই ঠক নয়। আমি এইটুকু জানাতেই আপনার কাছে এলাম।

হো হো করে হেসে উঠলেন অধ্যাপক চৌধুরী।

আরে তুমি যে দেখছি সব সত্যি বলেই ভেবে নিলে।

আপনাদের কথা আমাদের বিশ্বাস করাই ধর্ম। সমাজের সত্য ছবিটাই আপনাদের কলম থেকে বেরোবে, লোকে এই আশাই করে।

হেসে বললেন অধ্যাপক চৌধুরী, পড়নি কবিগুরুর এই কবিতা ঃ

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নয়।'

লেখক সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। তারা মনের কারবারী, ঘটনার সত্যই সব সময় তাদের কাছে সত্য নয়।

সীমা মর্মাহত হয়ে বলল, এ আমার বুদ্ধির বাইরে স্যার।

অধ্যাপক চৌধুরী বললেন, দেখ সীমা, মিথ্যাকে সত্যের মত করে যিনি দেখাতে পারেন, তিনি যে কৃতী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সেটা তাঁর রচনার কৃতিত্ব হতে পারে কিন্তু তা সত্য নয়।

শোন তাহলে বলি, খবরের কাগজে হঠাৎ একদিন বেরোলো, অমুককে মন্ত্রী করা হয়েছে। সাতসকালে রিপোর্টাররা তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলেন, বলুন স্যার আপনার রি-অ্যাকশন কি?

সদ্যঘোষিত মন্ত্রীপদপ্রাপ্ত মানুষটি বললেন, এই প্রথম আপনাদের কাছ থেকে আমি খবরটা পেলুম। আমার মনোভাবে আমি কি জানাব আপনাদের, সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমাকে অবাক করে দিয়েছে। খবরটা পাকাপাকি এসে পৌঁছলে আমার সাধ্যমত জনগণের সেবার চেষ্টা করব আমি।

সেই ঘুঘু ব্যক্তিটিকে আমি জানি। বহু মহামানবের অবসর বিনোদন যাতে মধুর হতে পারে সে ব্যবস্থা বহুদিন ধরে তিনি করে এসেছেন। এবং এই পুরস্কার প্রাপ্তির কথা তিনি অনেক আগে থেকেই জানতেন। তদ্বিরের ত্রুটি ছিল না।

আরও শোন, কাগজ পড়ে কত ভুলই না আমরা করে থাকি।

অমুক লেখক 'বোধিদ্রুম' পুরস্কার পেয়েছেন। রিপোর্টাররা তাঁর কাছে গিয়ে ভিড় করেছেন। কারণ এই পুরস্কারের নগদ মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা।

লেখক স্মিতহাস্যে বললেন, এইমাত্র আপনাদের আসার আগে সংবাদপত্র মারফত জানতে পারলাম আমার পুরস্কার প্রাপ্তির খবর। এ পুরস্কার পেয়ে আমার কেবল মনে হয়েছে, এ প্রাপ্তি আমার নয়, যাঁরা আমার লেখাকে ভালবেসে আজ আমাকে এই সম্মানের অধিকারী করেছেন তাঁদের। আজ অযাচিতভাবে এই পুরস্কার পেয়ে আমি তাই আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার নিবেদন করছি আমার বাংলাদেশের পাঠক জনসাধারণকে।

এই যে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক এত কথা বললেন, জেনে রেখ তাঁর কত জোড়া চটির সুকতলা ক্ষয় হয়েছে, কত ফোনের বিল উঠেছে, কত সুধা-চক্রে পুরস্কার প্রদান কমিটির ধুরন্ধরদের আপ্যায়ন করতে হয়েছে তার লেখাজোখা নেই।

একটু থেমে আবার অধ্যাপক চৌধুরী বললেন, তোমরা লেখা পড়ে শুধু বিশ্বাস করে যাও, কিন্তু তার আড়ালে যে কত সুকৌশল পাবলিসিটির কাজ চলে তার খোঁজ পাও না। এ দুনিয়াটা চলেছে তদ্বির আর পাবলিসিটির জোরে সীমা।

কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনার ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেল। আপনি এমন সহজভাবে অন্ধকারের ঢাকাটা সরিয়ে না দিলে এসব মিথ্যাকে আমি পুরোপুরি সত্য বলেই বিশ্বাস করতাম।

অধ্যাপক চৌধুরীকে প্রণাম করে সীমা বেরিয়ে আসছিল। অধ্যাপক চৌধুরী পেছন থেকে হেঁকে বললেন, তোমার ঠিকানাটা কই রেখে গেলে না, বল, লিখে রাখছি।

সীমা ঠিকানা বলল। যদিও সে জানে, এ ঠিকানা রাখাটাও কেবলই সান্ত্বনা দেবার একটা ছলনা হতে পারে।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে অধ্যাপক বললেন, তোমাকে নিয়ে একটা গল্প লেখা যেতে পারে। হ্যাঁ শোন, আর একটা কথা। লজেন্স বিক্রির কাজটা যত তাড়াতাড়ি ছাড়তে পার ততই মঙ্গল। কারণ ওটা জানাজানি হয়ে গেলে ভাল জায়গায় চাকরি পাওয়া মুশকিল হবে।

সীমা বলল, মনে রাখব স্যার, তবে চাকরি না পেলে একে ছাড়ব কি করে। একমুঠো খাবারের যোগাড় এই লজেন্স বিক্রি করেই আমাকে করতে হচ্ছে। সীমা পায়ে পায়ে পথে নেমে এল।

কয়েকদিন পরের কথা। এ ক'দিন সারা কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি কারণে যেন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় বন্ধ। তাই সীমাও বেরতে পারেনি তার লজেন্স বিক্রির কাজে। ঘরে বসে থাকা সীমার কাছে আরও অস্বস্তির। ভাইটা একেবারে বয়ে গেছে। আগে তবু ওকে আড়াল করে কিছু করত, আজকাল চোখের সামনে দিয়েই কোথায় যেন যায় আসে। সীমা দেখেও না দেখার ভান করে।

আজ পথে বেরিয়ে ভারী ভাল লাগল। পথ চলতে চলতে সে যেন একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলল। পড়াশোনা করে সে একটা চাকরি পায়নি, মনের ভেতর সেজন্যে ব্যথার একটা অদৃশ্য কাঁটা বিঁধে থাকে সারাক্ষণ, তার ওপর কর্মহীন দিনগুলোয় ঘরে বসে থাকলে মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। এই যে কিছু একটা কাজ নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান, তাতে নিশ্বাসটা সহজ হয়ে আসে।

সকালের কলেজগুলোতে বিক্রির কাজ সেরে সীমা নিয়মমত দুপুরের দিকে গিয়েছিল ইউনিভারসিটিতে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অঞ্জনার সঙ্গে। ওদের সঙ্গে এম-এতে পড়ত অঞ্জনা। বড়লোকের বাড়ির মেয়ে। রোজ গাড়িতে করে আসা যাওয়া করত। সুভদ্র সরকারের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে অনেক কথা রটনা হয়েছিল সে সময়। সুভদ্র সীমাদের সঙ্গেই পড়ত। ভাল ছেলে। অবস্থা ভাল ছিল না। প্রায় রোজ অঞ্জনার গাড়িতে করে ইউনিভারসিটি থেকে ফিরত ও। অঞ্জনাই ওকে সঙ্গে নিয়ে যেত বাড়িতে। ওর কাছ থেকে পড়া বুঝে নিত। হাবেভাবে প্রকাশ পেত ওর ভালবাসা। পাস করার পর অঞ্জনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি সীমার।

সীমাকে দেখে অঞ্জনা উচ্ছ্বসিত হল। হাতে ধরা একগোছা কার্ড থেকে একটি কার্ড টেনে নিয়ে নাম লিখল সীমার। তারপর সীমার হাতে কার্ডখানা দিয়ে বলল, আসিস কিন্তু। আমি স্যারেদের কার্ড দিতে বেরিয়েছি। একাকে এদিকটা সারতে হচ্ছে, বড় ব্যস্ত আছি ভাই।

অঞ্জনা চলে গেল। সীমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কার্ডখানা খুলল। না, কোথাও সুভদ্র সরকারের নামটা তার চোখে পড়ল না। বিয়ের ব্যাপারে অঞ্জনা হিসেবী মেয়ে। জনৈক শুভ্রাংশু মিত্র, আই-এ-এস-এর নাম কার্ডে অঞ্জনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। সীমার কি জানি কেন মনটা ভারী হয়ে উঠল। তার মনে হল সুভদ্রের সঙ্গে অঞ্জনার বিয়ে হলেই বুঝি সে সবচেয়ে খুশি হত।

অঞ্জনার বিয়ের দিন সে ঠিকানা খোঁজ করে দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। বিয়ে হয়ে গিয়েছিল গোধূলি লগ্নে। সন্ধ্যায় ও যখন পৌঁছল তখন বর বধূ দু'পক্ষের বন্ধুবান্ধব সমরোহে মজলিশ জমিয়েছে বাসরঘরে।

সীমা একটি সুন্দর প্ল্যাস্টিকের কৌটো কিনেছিল, আর তার ভেতর ভরে দিয়েছিল নানারকমের লজেন্স। বাসরঘরে ঢুকতেই তার দেখা হয়ে গেল অনেক পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে। কেতকী চিরদিনই ছিল অঞ্জনার পার্শ্বচারিণী। সীমা দেখল, কেতকী প্রেজেন্টেশনের জিনিসগুলোর নাম সরবে ঘোষণা করে লিখে রাখছে।

সীমা অঞ্জনার হাতেই তার সামান্য উপহারটুকু তুলে দিলে। কেতকী প্রায় ছোঁ মেরে তার হাত থেকে সীমার দেওয়া কৌটোটা নিয়ে খুলে ফেলতেই কয়েকটা লজেন্স ছত্রাকার হয়ে ছিটকে পড়ল। অমনি উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ল ঘরখানা।

কেতকী তৎক্ষণে সরবে ঘোষণা শুরু করে দিয়েছে, সীমা বোস—লজেন্সের কৌটো

মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে থাকা লজেন্সগুলো কেউ তুলল না। ওগুলো যেন সীমার দীনতার সাক্ষী হয়ে সবার চোখের ওপর জেগে রইল।

বর নিজেই জিজ্ঞেস করল অঞ্জনাকে, এঁকে তো চিনতে পারলাম না।

অঞ্জনা বলল, পড়ত একসময় আমাব সঙ্গে।

সীমার মনে হল অঞ্জনা তার পরিচয়টা বরপক্ষের কাছে দিতে লজ্জা বোধ করছে।

গৌরী বসে আসর মাতাচ্ছিল। সে এগিয়ে এল সীমার কাছে।

হাঁরে আজকাল কি করছিস তুই, শুনেছিলাম যেন কোথাকার একটা ইউনিভারসিটিতে কাজ করিস?

চিরদিনই কেতকীর ঠোঁটকাটা বলে সুনাম আছে। সে এগিয়ে এসে গম্ভীর হয়ে বলল, সীমা এখন কাজ করছে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিতে।

সকলে কথাটা শুনে সচকিত হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই কেতকী বলল, কলকাতা ইউনিভারসিটিতে কাজ করছে লজেন্স বিক্রির।

হা হা হা হা করে হাসির রোল উঠল।

হাসি থামলে সীমা অনুত্তেজিত গলায় বলল, কার্ড দিয়ে বড় ভুল করেছিস ভাই অঞ্জনা। তখন ভাবতে পারিসনি যে আমি আসব। এখন ভারি আপসোস হচ্ছে মনে মনে, তাই না? তবে তুই হয়ত জানিস না আমি যা, তার বাইরে নিজেকে কোনদিনই আমি জাহির করি না। ময়ূরের পাখা যোগাড় করে আনলে দাঁড়কাক শুধু যে ময়ূর হতে পারে না তা নয়, নিজের জাতি থেকে সে ছিটকে পড়ে। চেষ্টা করলেও ভাই আমি আমার ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আর পাঁচজনের মত পাল্লা দিয়ে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক সাজতে পারব না।

সীমা উঠে দাঁড়াল। বাসরঘর নিস্তব্ধ। চলে যাবার আগে বরের দিকে হেসে তাকিয়ে নমস্কার করে বলল, ক্ষমা করবেন রসভঙ্গ করলাম বলে। আমার বন্ধু অঞ্জনাকে এই রসকষহীন বন্ধুটিকে ডাকার জন্যে গঞ্জনা দেবেন না এই আমার একান্ত অনুরোধ।

সীমা বাসরঘর ছেড়ে চলে গেল। সবাই তাকিয়ে রইল তার চলে যাবার পথের দিকে। কেউ একটি কথাও উচ্চারণ করল না।

সেদিন ঘরে ফিরতে সীমার বেশ কিছু রাতই হয়ে গেল। স্টেশনে সে যখন নামল তখন রাত এগারোটা। চারদিক প্রায় নিস্তব্ধ। সীমা আপনমনে হেঁটে চলছিল। অঞ্জনার বিয়ের বাসরের ঐ ঘটনাটাকে সে কিছুতেই মনের থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। মানুষ যে এমন হৃদয়হীন হতে পারে, তাদের পরিহাস যে এত নীচু মানের হতে পারে তা যেন ভাবতে পারছিল না সীমা। আবার নিজের ওপর দুঃখও হল তার। সে গরীব আর ওরা বড়লোক, এই অসম বন্ধুত্ব কখনও যে হতে পারে না, এটা বোঝা অন্ততঃ তার উচিত ছিল।

নানা কথা ভেবে ভেবে একমনে পথ চলছিল সীমা, হঠাৎ পেছনে একটা সাইকেল রিকশার ঘণ্টা বেজে উঠল।

সীমা পথের ওপর থেমে গিয়ে রিকশাটাকে চলে যাবার পথ দিল। সীমার পাশাপাশি এসে রিকশাটা থেমে গেল। রিকশা থেকে নেমে পড়ল তার চালক। সে আবছা অন্ধকারে সীমার দিকে তাকিয়ে বলল, রিকশাতে উঠুন দিদি, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

সীমা বলল, এটুকু পথ দিব্যি আমি হেঁটেই চলে যেতে পারব।

রিকশাওয়ালা বলল, আপনি তো বলছেন, আমি চলে যেতে পারব, কিন্তু এত রাতে আমি

আপনাকে একা যেতে দিই কি করে বলুন তো। যদি না দেখতাম তাহলে একরকম হত, কিন্তু দেখা যখন হয়ে গেল।

সীমা কোনদিন রিকশাতে ওঠে না। তবে রিকশাওয়ালারা প্রতিদিন তাকে ঐ রাস্তায় আসা যাওয়া করতে দেখে, তাই হয়ত ওরা সীমাকে চেনে।

সীমা বলল, সত্যি কথা বলি ভাই রিকশাতে যাবার মত পয়সা আমার নেই।

রিকশাওয়ালা অমনি বলে উঠল, তাতে কি হয়েছে, আমি এত্ত রাতে যে কোন খদ্দের পাব এ আশা করিনি। আর পেলে স্টেশনেই দু' একটি যা পেতাম, পথে পাবার আশা করিনি এত রাতে। আপনি উঠুন তো দিদি, পয়সার কথা ভাববেন না। পয়সা মানুষ ঢের রোজগার করে।

সীমা বলল, তোমার পয়সার পরোয়া নেই, কিন্তু আমার তো আছে ভাই। তুমি নেবে না ঠিক, কিন্তু আমি না দিয়ে উঠি কি করে।

রিকশাওয়ালা বলল, দিদি আপনি যখন উঠবেনই না তখন আমিও আর রিকশায় উঠছি না। চলুন আপনার পাশে হেঁটে হেঁটেই যাই।

সীমা হাঁটতে শুরু করেই বলল, সে কি করে হয়, হাঁটা আমার কাজ, কিন্তু তা বলে, আমার জন্যে আর কেউ কষ্ট পাবে এ আমি চাই না।

হেসে উঠল রিকশাওয়ালা, কষ্ট কি বলছেন দিদি, বরং আপনাকে এত রাতে পথে পেছনে ফেলে চলে গেলে রাতে ঘুমুতে পারব না। জায়গাগুলো বড় বিচ্ছিরি কিনা, তাই বলছি।

সীমা বলল, তবে ওঠ রিকশায়, আমিও উঠছি, যখন তুমি আমার কথা একবারে শুনবেই না।

মনে হল রিকশাওয়ালা খুশি হয়েছে। সীমা তার রিকশায় গিয়ে বসল।

এইটুকু পথ আসতে আসতে সীমার সঙ্গে অনেক কথা হল রিকশাওয়ালার।

রিকশাওয়ালা বলল, ওদিকের পুব কলোনীতে শুনেছি কয়েকটা ছোঁড়া খুব মস্তান হয়েছে। ওরা দল তৈরি করেছে। রাত বারোটার পর এ অঞ্চলগুলো ওদের রাজ্য। আপদবিপদে কোন পথচারী গেলে তাদের কাছ থেকে যা পায় কেড়ে নেয়। তাছাড়া স্টেশনের কাছে সিনেমা হাউস থেকে রাতের শোয়ে বই দেখে এদিকের কোন যাত্রী যখন ফেরে তখন তার সব কেড়েকুড়ে নেয়। অবশ্য এত রাতে এদিকের কোন যাত্রী বড় একটা থাকে না।

সীমা বলল, এরা কি শুধু এই ছিনতাই-এর কাজই করে?

না দিদি, কেবল ঐটুকু কাজের জন্য ওরা পথে বেরোয় না, রাত গভীর হলে ওরা ওয়াগন ভাঙার কাজ করে। সীমা বলল, পুব কলোনীর ছেলেদের কথা বলছ?

হ্যাঁ দিদি। আগে একদল পেশাদার বদমায়েশ ভাঙত, এখন ঐ ছোঁড়াগুলো ঐ কাজে হাত পাকাচ্ছে।

সীমা বলল, বল কি?

রিকশাওয়ালা বলল, মারামারি প্রায় লাগে ওদের দুদলে। তবে উঠতি দলটা বোমাবাজিতে ওস্তাদ, তাই পুরনো দলটা একটু বেকায়দায় পড়েছে। ওরা সাবেক কালের ছোরাছুরি নিয়ে চোরাগোপ্তাই জানে।

বোমাবাজির কথা শুনে সীমার বুকখানা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল।

সীমা বলল, তাহলে দু'দল চোরাকারবারীতে মারপিট লেগেই আছে বল।

রিকশাওয়ালা বলল, মজার ব্যাপার কি জানেন, ওদের মারামারির ভেতর যদি রেল পুলিশ এসে পড়ে তাহলে তাদের আর নিস্তার নেই। তখন দু'দলের মারামারি এক নিমেষে থেমে যায়। ওরা তখন একজোট হয়ে পুলিশকে তাড়া করে।

দুঃখের ভেতরও সীমার হাসি পেল।

সীমা বলল, দেখ, এইসব ছেলেরা যদি কিছু লেখাপড়া শিখত তাহলে এতটা নীচু কাজ হয়ত করতে পারত না।

রিকশাওয়ালা বলল, পড়ে শুনে কি হবে বলুন, চাকরিবাকরির দফা শেষ। এই তো আমাদের রিকশা অ্যাসোসিয়েশনে তিনজন মেম্বার আছে, গাড়ি চালায়, তারা কলেজে পাস দিয়েছে।

একটু থেমে রিকশাওয়ালা আবার বলল, এই যে ছোঁড়াগুলোর কথা বলছিলাম, ওয়াগান ভাঙে, ওদের একজন নাকি কলেজের ছাত্র।

সীমার মনে হল তার মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে গেল।

মানিক এ কাজ করে না তো! সে যে বোমা বানাচ্ছে আজকাল, তা পাড়াপ্রতিবেশীর কথা থেকেই সে আঁচ করেছিল। তবে সেটা হয়ত রাজনৈতিক কোন কাজের উদ্দেশ্যে। সেখানে তার সমর্থন থাক বা না থাক, কাজটা খুব গর্হিত বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু ওয়াগন ভাঙছে মানিক আর সেজন্যে বোমা তৈরি করছে, এ কথা ভাবতে গিয়ে সারা শরীরটা তার অসাড় হয়ে এল।

সীমা রিকশাওয়ালার কথার উত্তরে ওকেই আবার প্রশ্ন করে বসল, তুমি জানলে কি করে যে ওদের ভেতর একজন কলেজের ছাত্র?

কথা হাওয়ায় ওড়ে দিদি। কবে ওয়াগান ভাঙা হবে, কারা ভাঙছে সব খবর আমাদের কানে এসে বাজে।

সীমা বলল, তোমরা যদি আগেভাগে জানতে পার তাহলে পুলিশকে খবর দাও না কেন?

রিকশাওয়ালাটি রিকশা চালাতে চালাতে প্রায় থেমে গেল, কি বলছেন দিদি, আমরা দেব পুলিশকে খবর! তাহলে আর এ তল্লাটে রিকশা চালিয়ে খেতে হবে না। হয় দেশ ছেড়ে পালাতে হবে, না হলে প্রাণটা ওদের হাতেই তুলে দিতে হবে।

সীমা বলল, এমনি ভয়ের ভেতর কতদিন তোমরা কাজ করতে পারবে?

যে ক'দিন ওদের না ঘাঁটিয়ে চলে দিদি। শুধু কি তাই, বিনি ভাড়ায় দরকার হলে ওদের চোরাই মালও বয়ে দিয়ে আসতে হয়।

তোমরা নিজেরা দল গড়ে প্রতিরোধ করতে পার না?

পারতে গেলে বোমা চাই। বোমার জবাব বোমাতে না দিলে আমাদের হার। এখন বলুন সারাদিন ঘরে বসে বসে বোমা বানাব না ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে দু'পয়সা রোজগার করব।

সীমা হয়ত কোন উত্তর দিতে পারত, কিন্তু সে উত্তর তাহলে হয়ে যাবে দার্শনিকসুলভ। বাস্তব সমস্যার সঙ্গে হয়ত তার কোন যোগ থাকবে না।

সীমা বড় রাস্তাব মোড়ে এসে পড়ল।

বলল, এইখানেই নামব ভাই।

রিকশাওয়ালা রিকশা থেকে নেমে দাঁড়াল। সীমা ব্যাগ খুলে পয়সা দিতে যেতেই সে বলল, সে কি দিদি, আমি নিজেই তো আপনাকে ডেকে তুললাম।

তা হোক, এতটা পথ তুমি এসেছ, একেবারে পয়সা নেবে না, এ কি করে হয়।

রিকশাওয়ালা রিকশাতে উঠতে উঠতে বলল, দিদি বলে ডাকলাম, আমাকে পয়সা দিয়ে পর করে দেবেন?

সীমা আব পয়সা দিতে পারল না। সে শুধু বলল, এ কথা কে বলে ভাই। যেখানে পয়সার ওজনে মানুষের ওজন হয় সেখানে তোমার এই হিসেব আজকের দিনে অচল।

তারপর সীমা তার ব্যাগ থেকে গোটাকয়েক লজেন্স বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, এগুলো তোমার দিদির দান বলে নিলে খুব খুশি হব।

রিকশাওয়ালা সীমার দেওয়া লজেন্সগুলো মাথায় ঠেকিয়ে নিল, তারপর গাড়িখানা চালিয়ে চলে গেল।

সীমা অনেক রাতেই আজ ঘরে ঢুকল। মানিক আজকাল ঘরে থাকে না বললেই হয়। সীমা কর্তব্যের খাতিরে মাসের প্রথম দিকে কিছু টাকা ওর বিছানার ওপর রেখে দিয়ে আসে। উদ্দেশ্য, দিদি যে তার কর্তব্য ঠিকই করে চলেছে তা সে বুঝুক।

আজ ঘরে ঢুকে সীমা দেখল, তার বিছানার ওপর একখানা চিঠি পড়ে আছে। চিঠিখানা অবশ্য কোথাও থেকে আসেনি। এই বাড়িতে বসেই পত্রলেখক এই চিঠি রচনা করেছেন। সম্ভবতঃ মানিকই চিঠিখানা রেখে দিয়েছে এখানে।

চিঠি পড়ে সীমা বুঝল, 'বিশ্বহিতৈষী' পত্রিকায় তার সম্বন্ধে যে খবর বেরিয়েছিল তা পড়ে কোন একটি কোম্পানির লোক তার খোঁজে এসেছিল। তারা সীমাকে চাকরি দিতে চায়।

সীমার মনটা চাকরির ওপর হঠাৎ যেন বিষিয়ে উঠল। সে চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। না, সে আর চাকরির পেছনে ছুটবে না। তার চেয়ে কিছু না করাও ঢের ভাল। সীমার মনটা আজ বড় ক্লান্ত ছিল। সে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। পরের দিন যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সূর্য অনেকখানি উঠে গেছে। সে আর ঘরের বাইরে বেরবে না বলেই ভেবে নিল।

রোজ সে খুব ভোরে ভোরেই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে, তাই দিনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে তার পরিচয় বড় কম। ফেরে সেই রাত্তিরে। কিন্তু আকস্মিকভাবে ঘরে আটকে পড়ে সেদিন তাকে একটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হল।

তখনও মানিক ঘুমুচ্ছিল। কত রাতে সে ঘরে ফিরেছে সীমা কিছুই জানে না। সে বাইরে পায়চারি করছিল। একদল লোক সেখানে এসে হল্লা শুরু করে দিলে।

এ্যায় মানিকবাবো, বাহার আইয়ে।

সীমা এগিয়ে গিয়ে বলল, কি দরকার তোমাদের এখানে?

মানিকবাবোর কাছে টাকা পাওনা রইয়েছে।

সীমা দেখল এরা অবাঙালী। ভাঙা বাঙলাতেই কথা বলার চেষ্টা করছে।

কিসের টাকা পাওনা?

আরে দিদি, হামলোগকো বলল, তুমলোগ হামাদের পার্টির প্রশেসানমে চলো। মাথাপিছু তিন রূপেয়া করকে মিলেগা। হামলোগ বললে, ওদিন আউর এক পার্টিকা প্রশেসানমে লাইন লাগাকে হামলোগোকো চার রূপয়া করকে মিলা। তো মানিকবাবো বলা, পহিলে লাইন লাগাও, পিছু জরুর মিলেগা। ও পার্টিসে এ পার্টি বহুৎ দেনেবালা। মানিকবাবোকা বাতসে হামলোগ লাইন লাগায়া। আজ চার রোজ হইয়ে গেলো এক রূপয়া ভী নেহি মিলা। রোজ বলতা দেগা, দেগা, আভি তক নেহি মিলা।

ততক্ষণ মানিকবাবুর ঘুম ভেঙেছে। তিনি জেগেই বুঝতে পেরেছেন, দিদি ঘরের বাইরে আজ যায়নি।

মানিক ঘুমজড়ান লাল লাল চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে হামলা করছ কেন? যাও এখান থেকে।

ওদের দলের পাণ্ডা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, রূপয়া দে দো, হামলোগ জরুর চলা যায়েগা।

কাল বটতলার পাশে সন্ধ্যায় এলে টাকা পেয়ে যাবে। বাবু নিজে এসে তোমাদের টাকা দিয়ে দেবেন।

হামলোগ কই বাবুকো নেহি জানতা, তুমলোগোকো রূপয়া দেনে পড়েগা।

আচ্ছা, এখন যাও, বললাম তো কাল পাবে।

লোকগুলো গজরাতে গজরাতে শাসিয়ে চলে গেল।

সীমা বলল, কিসের টাকা মানিক?

সে তুমি বুঝবে না।

সীমা বলল, ওরা যা বলে গেল তা যদি ঠিক হয়, তাহলে পার্টির প্রশেসানে লোক সাপ্লাই করার দালাল হয়েছ তুমি।

কি বললে, দালাল। হাঁ তাই যদি হয়ে থাকি, তাতে তোমার কি। ক'টা টাকা মাস মাস দিচ্ছ বলে মাথা কিনে রেখেছ নাকি।

সীমা উত্তেজিত হয়ে বলল, এ কাজ করতে মাথাটা নীচু হয়ে আসছে না তোর! ওয়াগন ভাঙার কাজ শুরু করে দিয়েছিস নাকি রে?

ইস্পাতের ছুরির মত ঝিকিয়ে উঠল মানিকের চোখ, বেশ করি ওয়াগন ভাঙি। বুদ্ধির জোরে, কব্জির জোরে ভাঙি। সারাদিন পথে পথে ঘুরে ঐ লজেন্স বিক্রির মত ছুঁচো কাজ করি না।

কি বললি, লজেন্স বিক্রি ছুঁচো কাজ!

নয় তো কি, রাস্তায় ঘাটে লোকে আমাকে বলে, তোর দিদি লজেন্সওয়ালী। গর্বে তো বুকখানা আমার এত বড় হয়ে যায়! যা যা, আর মেলা বকাসনে।

সীমা আর কোন কথা বলল না, সমস্ত শরীর যেন তার অসাড় হয়ে গেছে।

ঘরের ভেতর বসে তার মনে হল, এই ভাইকেই সে খাইয়ে পরিয়ে এত বড় করেছে। কত আশা ছিল তার, ভাই বড় হবে। হয়ত কোথাও একটা চাকরি করবে। একটা দেখে শুনে বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে আসবে ঘরে। কতদিন এমনি কত কল্পনা করেছে সে। কিন্তু আজ সব ভাবনা তার শেষ হয়ে গেল। আবার মনে হল সীমার, সত্যিই তো সে লজেন্সওয়ালী। তার বেশি সে কিছু নয়। সকলেই তো তাকে ঘৃণা করে। সে যে শিক্ষিতা হয়েও লজেন্স বিক্রির সামান্য কাজটুকুকে বেছে নিয়েছে সেজন্য কে তাকে কবে প্রশংসা করেছে। ভাবতে ভাবতে সীমার মাথা ঘুরতে লাগল। মনে হল, সবাই যেন তাকে চারদিক থেকে তাক করে রাশি রাশি লজেন্স ছুঁড়ে মারছে। সবাই যেন তার কানে তালা লাগান চীৎকারে বলছে, লজেন্সওয়ালী, লজেন্সওয়ালী, লজেন্সওয়ালী!

সীমা মাথা ঘুরে ঘরের দাওয়ায় পড়ে গেল।

দুপুর গড়িয়ে যখন দুটি লোক এল তার কাছে, তখন সীমা একটু সুস্থ হয়েছে। ওরা বাইরের দাওয়ায় বসল শতরঞ্চের ওপর।

সীমা নমস্কার করে বলল, বলুন কি চাই আপনাদের?

কাল আমরা আপনাকে না পেয়ে একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিলাম, আশা করি পেয়েছেন।

সীমা কাল হলে ওদের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেয় করে দিত হয়ত, কিন্তু আজ সে তা করল না। সে মাথা নেড়ে জানাল যে চিঠি সে পেয়েছে।

ওদের মধ্যে একজন তখন বলল, কাগজে আপনার শিক্ষাদীক্ষা আর কাজকর্মের সম্বন্ধে কিছু খবর বেরিয়েছিল। তাই দেখে আমাদের কোম্পানির মালিকপক্ষ আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করার জন্যে পাঠিয়েছেন।

বলুন আমি কি করতে পারি আপনাদের জন্যে?

ওদের মধ্যে আর একজন বলল, না না, আপনার কিছু করার ব্যাপার নয়। আমাদের কোম্পানি নতুন একটি কাজে সম্প্রতি হাত দিয়েছে। কয়েকটি প্রোডাক্ট ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। আবার অতি সম্প্রতি 'মলিন মুক্তি' বলে একটি গুঁড়ো ধোলাই সাবান তৈরি করেছে। আর এ জন্যেই আপনার কাছে আসা।

সীমা বলল, আপনারা আমার সম্বন্ধে ভেবেছেন বলে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি আপনাদের ঐ সাবান নিয়ে ঘরে ঘরে ফিরি করে বেড়াতে পারব না।

প্রায় জিভ কেটে একজন বলল, আপনি আমাদের আসার আসল কারণটা এখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি, তাই এমন করে বলছেন।

একটু থেমে লোকটি বলল, আপনি গুঁড়ো সাবান ফিরি করে বেড়াবেন কোন দুঃখে। আমাদের কোম্পানির ডাইরেক্টর বাহাদুরের ইচ্ছে, আপনি এই প্রোডাক্টগুলোর প্রচারের পুরোপুরি দায়িত্ব নিন। যাকে বলে পাবলিসিটি অফিসার। আপনার আণ্ডারে বহু মেয়ে প্রচারের কাজ করে বেড়াবেন।

সীমা বলল, অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে না দিয়ে আপনাদের ডাইরেক্টর বাহাদুর আমাকেই বা পাবলিসিটি অফিসারের পদটি দিতে চাইছেন কেন?

লোকটি বলল, আমাদের ডাইরেক্টর বাহাদুর বড় গুণগ্রাহী মানুষ। তিনি মনে করেন, যিনি এত বড়

শিক্ষিতা হয়েও লজেন্সবিক্রির কাজকে ছোট কাজ বলে মনে করেন না, তিনি দেশের কাছে আদর্শ। এমন একজন মহিলা তাঁর ফার্মে থাকলে শুধু তাঁরই উন্নতি হবে না, সারা দেশ ব্যবসায়িক দিক থেকে উন্নত হবে।

সীমার মনে হল, এতদিনে অন্তত একটি লোকও তাকে মর্যাদা দিল।

বেশ, রাজি আছি আমি, এখন কি করতে হবে বলুন?

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সঙ্গে করেই এনেছি, কিন্তু আপনাকে একবার কলকাতার বাইরে ডাইরেক্টর বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। খরচপত্র সব কোম্পানির।

আগে বাইরে কোথাও যাবার কথা শুনলে হয়ত ভয় করত তার, কিন্তু আজকের ঘটনার পরে সে বাইরে যাওয়াকেই শ্রেয় বলে মনে করল।

সীমা পথঘাটের হদিশ জেনে নিল লোকগুলির কাছে। ভোর সাতটাতে একটা ট্রেন আছে। সে ট্রেন নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছবে দুটোর কাছাকাছি। ঐ ট্রেনেই সীমা যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করল।

ওদের ভেতর একজন বলল, আমি আজ রাতের ট্রেনেই যাচ্ছি, সুতরাং আপনার কোন অসুবিধেই হবে না। কাল স্টেশনে থাকব আমি।

সীমা স্টেশনে নেমেই দেখতে পেল লোকটিকে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখল একখানা গাড়ি অপেক্ষা করছে।

লোকটি আপ্যায়ন করে সীমাকে গাড়িতে বসিয়ে নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে চলল। ছোট ছোট দু'একটা টিলা তার মাঝ দিয়ে পথ। বনের ছায়া কোথাও পথে এসে পড়েছে। কালটা নাতিশীতোষ্ণ। ফাল্গুনের কাছাকাছি। কয়েকটা শালগাছের জটলা পেরিয়ে এল ওরা। মঞ্জরী এসেছে শালের শাখায়। সীমা ভুলে গেল তার ট্রেনের ক্লান্তি। বুক ভরে সে নিশ্বাস টানতে লাগল। আঃ, এত মুক্তিও ছিল তার জন্যে সঞ্চিত।

ঐ তো একটা ছোট্ট নদী টিলার কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে। সাঁওতালদের বসতি মনে হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেগুলো খেলা করছে উঠোনে। কুকুরগুলোও খেলছে তাদের সঙ্গে। কি শান্ত জীবন। উদ্বেগহীন প্রসন্নতা যেন ছড়িয়ে আছে এখানকার আকাশে মাটিতে। সীমার মনে হল, এমন সুন্দর একটা জায়গায় সে সারাজীবন যে কোন একটা কাজ নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে।

গাড়িটা সীমাকে এনে পৌঁছে দিল একখানা প্রাসাদের মত বাড়ির সামনে। গেট খুলে দিল বন্দুকধারী দরোয়ান। লনের পাশ দিয়ে গাড়িটা বাড়ির বাঁ দিকের একটা জায়গায় এসে থামল। সীমা গাড়ি থেকে নেমে দেখল সামনের লনে নানারকমের রঙ-বেরঙের সিজন ফ্লাওয়ার ফুটে আছে।

লোকটিকে অনুসরণ করে সীমা এল একতলার একখানা ঘরে। এটি অফিসঘর বলেই তার মনে হল। মূল বাড়ি থেকে এ ঘরটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

সীমাকে লোকটি বলল, আপনি বসুন, সাহেবকে আমি খবর দিচ্ছি।

লোকটি চলে গেলে সীমা দেখল, ঘরখানা ফাইল-পত্রে বোঝাই।

একটু পরেই লোকটি ফিরে এসে বলল, সাহেব এখন ফ্যাক্টরিতে রয়েছেন, আপনি সামনেব গেস্ট হাউসে চলুন, নাওয়া খাওয়া সেরে বিশ্রাম করুন, রাত আটটা নাগাদ উনি ফিরবেন, তখন ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

লোকটি সীমাকে গেস্ট হাউসে এনে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সীমা ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। ঘরখানা ছবির মত সাজান। সীমা এমন একখানা পরিপাটি করে সাজান ঘর কখনো দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। ঘরের দেয়াল জুড়ে বিলিতি সব ছবি। একদিকের দেয়ালে একখানা জাপানী ক্যালেন্ডার ঝুলছে। সীমা উলটে দেখল, ছ'খানা নারীমূর্তি। ঘরের কোণে আর একখানা পাথরের মূর্তি। সীমা কাছে গিয়ে দেখল, মূর্তিখানা গ্রীকদেবতা অ্যাপোলোর। শ্বেতপাথরে গড়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে সীমা সত্যিই মুগ্ধ হল। এমন পৌরুষ আর লাবণ্যের মিশ্রণ

বুঝি আর কোন মূর্তিতে নেই। আকর্ষণ করার মত দেহভঙ্গিমা বটে। সীমা সারা ঘরখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর জানালা খুলতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল একটা প্রসারিত জলাশয়ের ওপর। নীচে ছোট সাদা রঙের একখানা নৌকো। কি সুন্দর জায়গাটা। সীমা হঠাৎ চোখ বন্ধ করল, তারপর আবার চোখ খুলল। সে ভাবতে চেষ্টা করল, স্বপ্ন দেখছে না তো। ঘরখানা আগেই বন্ধ করেছিল। এখন সে স্নানের ঘরের দরজাটা খুলল। স্নান করে নেবে। ট্রেনের ক্লান্তি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সে গা এলিয়ে দেবে এই সুখ-শয্যায়। হোক একদিনের পাওয়া, তবু জীবনে যে সুখ সে কোনদিন অনুভব করেনি, আজ যখন অযাচিতভাবে সে সুখ-ভোগের সুযোগ এসেছে তখন সে তা হারাবে না। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে সীমা স্নান করতে লাগল। তার মনে হল, মুক্তোর দানার মত জলের ধারাগুলো তার সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছে। সুখ কত সুন্দর, কত তৃপ্তি এনে দেয়।

স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করার দরকার ছিল না সীমার, কারণ ঘরের দরজা সে ভেতর থেকে বন্ধ করেই রেখেছিল। একটু খারাপ ছিল বুঝি বাথরুমের দরজাখানা, ভেজিয়ে দিতে গেলেই খুলে যায়। থাকগে, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই তার।

এদিকে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটছিল সীমার পাশের ঘরে।

যে লোকটি সীমাকে ঘরখানা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল, সে সীমার পাশের ঘর থেকেই দৃষ্টি রেখেছিল সীমার ওপর। সীমার ঘরের ওপরের ঘুলঘুলি দিয়েই সে তীক্ষ্নভাবে চেয়ে ছিল সীমার দিকে। দেখছিল তার প্রতিটি আচরণ। যখন স্নান করছিল সীমা, তখনও সে দেখছিল সীমার স্নানলীলা!

কিছুক্ষণ পরে সে লোকটি নেমে এল ওপর থেকে। বাইরে বেরিয়ে যাবে এমন সময় তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে।

মেয়েটিকে দেখে লোকটি বলল, এই যে দেবী সঞ্চারী, অসময়ে অধীনকে মনে পড়ল!

মেয়েটির দেহের গড়ন দর্শনীয়, রঙও উজ্জ্বল, কিন্তু সারা মুখে বসন্তের গভীর দাগ তার সব আকর্ষণই নষ্ট করে দিয়েছে।

মেয়েটি গম্ভীর মুখে বলল, ও ঘরে নতুন আমদানী বুঝি?

লোকটি বলল, দেখেছ তাহলে। কিন্তু আমি কি করব বল, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

তা ভাল। পছন্দ হয়েছে তোমার। মেয়েটিকে সুন্দরী বলেই মনে হল।

লোকটি হেসে বলল, আমার পছন্দ যে ভাল তার প্রমাণ তো তুমি নিজেই। আজ বসন্তের কোপে না পড়লে তোমার নখের যুগ্যি হতে পারত ঐ মেয়েটা।

মেয়েটি প্রশংসায় গলে গেল না। সে তেমনি স্থির গম্ভীর গলায় বলল, আমার মত ওকেও কি স্বামীর সংসার থেকে ছিনিয়ে আনলে নাকি?

লোকটি বলল, আনকোরা নতুন, কপালে এখনও সূর্যোদয় হয়নি।

তবু ভাল। দুঃখটা একতরফাই হবে। একাই মেয়েটা কাঁদবে।

আচ্ছা সঞ্চারী, আজ না হয় ভগবানের মারে তুমি তোমার মর্যাদা হারিয়েছ, কিন্তু সত্যি করে বল, এতদিন সাহেব তোমাকে পেয়ার করেনি।

অশেষ দয়া তাঁর। এখন একেবারে তাড়িয়ে না দিয়ে রান্নার কাজে লাগিয়েছেন।

তুমি কেন ভাবছ সঞ্চারী। আমি থাকতে তোমাকে কোনরকম দুঃখই পেতে দেব না। তুমি এতদিন সবার ছিলে, এখন শুধু আমার হবে। বিশ্বাস কর আমি তোমাকে আগের মতই ভালবাসি।

সঞ্চারীর মুখে একটুকরো বাঁকা হাসি খেলে গেল।

সে বলল, এখন চললে কোথায়, সাহেবকে খবর দিতে?

হাঁ তাই। ভয় ছিল মেয়েটা বাগ মানবে কিনা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভাববার কিছু নেই।

কি করে বুঝলে?

ঐ তোমার ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখলাম। তোমার বেলা যেমন করে দেখেছিলাম, ঠিক সেই কায়দায়।

কি দেখলে?

মেয়েটা একটা একটা করে জাপানী মেয়েগুলোর ছবি ওলটালো। তারপর ঐ উলঙ্গ এ্যাপোলোর মূর্তিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল। এরপর বোঝার কি বাকি থাকে বল। এখন টোপ ফেললেই গিলবে।

মেয়েটি বলল, যাও আর দেরি কর না। জীবনে অনেক কিছু দেখলে, অনেক কিছু পেলে। তবু দেরি করা ঠিক নয়। পুরস্কারটা হাত ফসকে যেতে পারে।

অদৃশ্য কোনকিছুর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে লোকটি বলল, পুরস্কারের কথা বলতেই হবে না। কাজটা মনের মত হলেই সাহেব একেবারে মা বাপ। তখন টাকাকে টাকা জ্ঞান থাকে না। বলেন, একেবারে দু'হাত ভরে নাও যত বান্ডিল নোট ওঠাতে পার! এমন লোক দেখেছ কখনো?

মেয়েটি বলল, সত্যিই নমস্য।

লোকটি চলে যেতে যেতে বলল, একটু লক্ষ্য রেখ। নতুন শিকার তো, যা চাইবে তাই দেবার চেষ্টা করো। আমি গাড়ি নিয়ে আবার আসব সাতটায়। সাহেব থাকবেন ঝিল-মঞ্জিলে। ওখানেই রাতে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

মেয়েটি বলল, আমি রইলাম রান্নার কাজে, তদারক করা আমার পক্ষে তো আর সম্ভব নয়।

না না, সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। পাখি পালাবে না। আর পালাবেই বা কি করে। গেটে রয়েছে দুর্জয় সিং। বাজের মত চোখ আর নখ তার। ছোঁ মেরে ধরে নেবে।

লোকটা হাসতে হাসতে নীচে নেমে গেল।

সীমা স্নানশেষে বেল বাজিয়েছিল। সঞ্চারী গিয়ে তাকে খাবার দিয়ে এল। সে সময় একটু কথা হয়েছিল সীমার সঙ্গে সঞ্চারীর।

আপনি বুঝি এই বাড়িতে থাকেন?

সীমা সাধারণভাবে প্রশ্ন করল।

সঞ্চারী বলল, এখানে অনেকগুলো বাড়ি আছে মালিকের। আমাকে এখানে ওখানে প্রায় সব জায়গাতেই থাকতে হয়।

আপনি কেবল রান্নার কাজ নিয়েই থাকেন?

এখন তাই থাকতে হচ্ছে। আগে আমার অন্য কাজ ছিল।

সীমা মেয়েটির আগের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করল না। সে শুধু বলল, আপনাদের এ জায়গাটা যত দেখছি ততই ভাল লাগছে, যেন একখানা ছবি।

মেয়েটি বলল, অভিজ্ঞতা তো আস্তে আস্তে হয়, এর পর আরও অনেক কিছু দেখবেন।

মেয়েটি চলে গেল। সীমা খাওয়ার শেষে বেল বাজাতে একটি বেয়ারা এসে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিয়ে চলে গেল। সীমা দরজা বন্ধ করে টানা একটা ঘুম দিল। দরজায় টোকা না শুনলে সে হয়ত উঠত না। উঠে পড়েই সে বুঝল ঘরটা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ভরে আছে। সুইচটা সে হাতড়ে না পেয়ে দরজাটা এমনিই খুলে ফেলল।

সেই মেয়েটি আবার এসেছে।

সীমা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কখন অন্ধকারে ভরে গেছে ঘরখানা, সুইচবোর্ডটা খুঁজে পাচ্ছি না, আপনি একটু জ্বালিয়ে দেবেন?

মেয়েটি চুপিচুপি বলল, কথা আছে, আলোটা না জ্বালানোই ভাল। বরং ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিন।

মেয়েটি ঘরের ভেতর ঢুকে নিজেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলে।

সীমা একটু বিস্মিত হল। কি বলতে চায় মেয়েটি। ততক্ষণে সঞ্চারী খুলে দিয়েছে পশ্চিমের জানালা।

এদিকে আসুন।

মেয়েটির ডাকে সীমা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন তো, কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

সীমা দেখল নীচের লেকের মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটি বাড়ি। তার থেকে নানাধরনের আলো লেকের জলে এসে আলোর মালার সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমদিকের এ ছবি সীমা আগে দেখেনি। ওখানে যে লেকের ওপরে এমন সুন্দর একখানা বাড়ি আছে তা তার জানা ছিল না।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ভারী সুন্দর তো, যত দেখছি তত ভাল লাগছে জায়গাটা।

মেয়েটি বলল, আর কিছুক্ষণের ভেতরই ঐ বাড়িতে আপনি যেতে পারবেন।

সীমা বলল, কি রকম?

সাতটা নাগাদ গাড়ি আসবে আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে।

ওখানে আমাকে যেতে হবে কেন?

মেয়েটি স্পষ্ট গলায় বলল, ডাইরেক্টর বাহাদুরের মনোরঞ্জনের জন্যে।

সীমা চমকে উঠল, মনোরঞ্জন! আপনি কি বলতে চাইছেন একটু খুলে বলুন দয়া করে।

পৌনে সাতটা বেজেছে, বেশি বলার সময় নেই, এখুনি গাড়ি এসে যাবে।

সীমা ভীষণ ভয় পেয়ে মেয়েটির হাত জড়িয়ে ধরল, বলুন, দয়া করে বলুন, আমার কেমন ভয় করছে।

মেয়েটি বলল, আমি ভুক্তভোগী, তাই বলছি। যে সর্বনাশ আমার হয়েছে, আপনি যাতে সেই সর্বনাশের ভেতর না পড়েন, সেজন্যে সাবধান করে দেওয়া।

বলুন, কি সে সর্বনাশ!

মেয়েটি হাসল, আমার সংসার, স্বামী সব ছিল; সেখান থেকে একদিন ওরা কৌশলে আমার স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তাঁকে হত্যা করে আমাকে এখানে এনে তুলল।

কিন্তু, আপনি কি...।

সীমার কথা শেষ হল না, মেয়েটি বলল, না আমি এমন কুৎসিত ছিলাম না আগে। গত বছর ফাল্গুনে বসন্তরোগে আমাকে এমন কুৎসিত করে দিয়েছে। আমার মুখে এই কলঙ্কের চিহ্ন এঁকে ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন।

সীমা অধীর হয়ে বলল, দিদি, আমাকে বাঁচান আপনি।

দুটো পথ বেছে নিতে হবে আপনাকে। একটি হল, ওদের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া। বিদেশীরা কারবারের সূত্রে এই কোম্পানিতে আসে। তাদের ভোগে লাগতে হবে আপনাকে। ডাইরেক্টর বাহাদুর আগে আপনাকে সব দিক থেকেই পরীক্ষা করে নেবেন।

সীমা বলল, মরে যাব দিদি, আমাকে বাঁচান আপনি।

মেয়েটি বলল, আমি বাঁচাতে পারব না বোন, তবে দ্বিতীয় আর একটা পথ খোলা আছে তোমার সামনে। সে পথে গিয়ে মরলেও তুমি বাঁচবে।

আমি তাই বেছে নেব, সে পথটা আমাকে বলে দিন।

মেয়েটি আঙুল তুলে লেকের দিকে দেখিয়ে দিলে, ঐ তোমার বাঁচার একটি মাত্র পথ। যদি তুমি সাঁতরে ওপারে উঠে পালাতে পার, তাহলে হয়ত বাঁচবে, আর নয়ত ডুবে গিয়েও বাঁচবে।

সীমা ইতস্ততঃ করে বলল, রাত অন্ধকার, সামনের পথ ধরে কোথাও পালান যাবে না?

মেয়েটি হেসে বলল, আমি তাহলে হয়ত পালাতে পারতাম। কিন্তু এ ঘরে ঢুকলে বোধকরি মরণ ছাড়া বাঁচার পথ নেই। সামনে কড়া পাহারা মোতায়েন হয়ে আছে। কেবল লেকের পথটাই খোলা। কেউ এ পথে যে বাঁচতে পারে তা ওদের ধারণার বাইরে।

সীমা বলল, আমি সাঁতার জানি, আমাকে আপনি নিয়ে চলুন লেকের ধারে। যদি মরি তাহলেও আপনার উপকারের কথা মনে রেখেই মরব।

সময় নেই, এস আমার সঙ্গে। যদি বেঁচে যাও মনে রেখ আমার কথা। না, আমাকে উদ্ধার করার কথা বলছি না, আমার বাইরের পথ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার পথ আছে খোলা। ভগবান তোমাকে বাঁচান, এই আমার প্রার্থনা।

খিড়কির পথ দিয়ে ওরা এল লেকের ধারে। নৌকো বাঁধা আছে, কিন্তু ওকে ব্যবহার করা চলবে না। সীমা জানে না, কেমন করে নৌকো বাইতে হয়। নৌকোর সাহায্য নিলে ধরা পড়ারই সম্ভাবনা। সে ধীরে ধীরে জলে গিয়ে নামল। হাঁসের মত জল কেটে সে এগিয়ে চলল ঐ জলমহলের আলো লক্ষ্য করে। জলমহলের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পেল গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ। গাড়িটা ঐ জলমহল থেকে বেরিয়ে লেকের ভেতরে বাঁধান পথ ধরে বিদ্যুৎগতিতে প্রায় তার পাশ দিয়েই চলে গেল। তাকেই তাহলে আনতে চলেছে এ গাড়ি। সীমার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে এল।

সীমা জল থেকে কূলে যে কি করে উঠল তা সে জানে না। একটা বিকট ভীতির রাক্ষস তাকে যেন তাড়া করে এগিয়ে নিয়ে চলল।

সীমার সারা শরীর সিক্ত, পা ক্ষতবিক্ষত। অন্ধকার পথে সে উঠছে পড়ছে। না, তবু সে থামবে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু তার থামার উপায় নেই।

সামনে একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। ঐ আলোটাকে লক্ষ্য করে সীমা ছুটে চলল। ক্রমে আলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। তাহলে লোকালয় আছে ওখানে। আলোর কাছে সীমাকে একসময় পৌঁছে দিয়ে পথটা হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেল।

একটা ভীষণ উদ্বেগ থেকে একটা নিশ্চিন্ততার ভেতর পৌঁছে সীমা যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। সে একটি ঘরের সামনে এসেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

শব্দটা কানে গিয়েছিল দিবাকর মিশ্রের। তিনি পড়া ফেলে হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আলো তুলে দেখলেন, কি সর্বনাশ, তাঁরই ঘরের বাইরে একটি মেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে! বৃদ্ধ দিবাকর তানিয়া তানিয়া বলে কাকে যেন ডাক দিলেন। একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে—কেনে ডাকছিস বাবা, বলতে বলতে দৌড়ে এল। দিবাকর বললেন, তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আয় ভেতর থেকে। তিনি নত হয়ে মেয়েটিকে পরীক্ষা করলেন। সারা গা যে ভেজা। তানিয়া জল নিয়ে আসতেই তিনি মেয়েটির চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই সীমা চোখ মেলল। আবার চোখ বন্ধ করে ভাববার চেষ্টা করল। শেষে পেছনের ঘটনাগুলো যখন তার মনে পড়ল তখন সে উঠে বসল মাটির ওপর।

দিবাকর মিশ্র আর তানিয়া সীমার হাত ধরে তাকে নিয়ে এল ঘরের ভেতর।

সীমা কিছু বলার চেষ্টা করছিল, মিশ্র মশায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কিছু বলার দরকার নেই মা, তুমি আগে বিশ্রাম করে সুস্থ হও।

তানিয়ার সাহায্যে সীমা তার ভেজা পোশাক পরিবর্তন করে একটি বিছানায় আশ্রয় নিল। তাড়াতাড়ি করে এক বাটি গরম দুধ সীমাকে খাওয়ান হল। পরম শান্তিতে সীমা ডুব দিল ঘুমের মাঝে। ভোরের আগে ভাঙল না সে ঘুম।

কতকগুলো ছেলের কলরব কানে যেতেই সীমা উঠে বসল বিছানার ওপর। ছোট্ট জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নদীর একটি অংশ। নদী না বলে একটি খাল বলা যায় ঐ স্রোতধারাকে। দূরে আকাশের সঙ্গে মিশে কয়েকটা পাহাড়ের রেখা। ওদিকে কিছুটা চোখে পড়ে গ্রামের সবুজ।

কয়েকটি ছেলে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিয়েছিল। তারা দু'একবার জানালার পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতেই সীমার চোখে পড়ল। আদিবাসীদের ছেলে বলেই মনে হয়। কিন্তু পরিষ্কার ছোট ছোট কাপড় কোমরে জড়িয়ে বেঁধে পরেছে।

সীমা তাদের একজনকে হাত ইশারায় কাছে ডাকতেই সে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল সীমার দিকে। তার চোখে বিস্ময়। এই নতুন আগন্তুকটি কোথা থেকে এক রাতের ভেতর এখানে এসে হাজির হল।

সীমা ধীরে ধীরে বলল, তোমরা এখানে খেলা কর বুঝি?

মেয়েটি বলল, আমরা পড়ি।

এখানে পড়?

হাঁ, আমরা মিশ্র ঠাকুরের পাঠশালায় পড়ি।

সীমা বলল, মিশ্র ঠাকুর তোমাদের পড়ান বুঝি?

ততক্ষণে আরও দু'চারটি কচি মুখ দেখা দিয়েছে। তাদের একজন অবাক হওয়ার ভঙ্গীতে বলল, মিশ্র ঠাকুর পড়াবেন কেনো, ছোট ঠাকুর পড়াবেন। মিশ্র ঠাকুর তো আমাদের ওষুধ খাওয়াবেন।

সীমা বলল, মিশ্র ঠাকুর তোমাদের ওষুধ খাওয়ান, কি ওষুধ?

খুব খারাপ ওষুধ। খেলে বুঝবে। মুখ ধুলেও যাবে নাই।

আরেকজন থুথু ফেলার ভঙ্গী করে বলল, তেতো, তেতো।

সব ছেলেরাই ঐ ছেলেটির দেখাদেখি থুথু ফেলতে লেগে গেল।

একজন বলল, ঐ যে ছোটঠাকুর আসছেন।

আর একজন বলল, চল চল পড়তে বসে যাই।

ছেলেগুলো চড়ুইপাখির মত ফরফর করে উড়ে পালাল।

সীমা বিছানায় বসে ঐ জানালার ফাঁকে তাকিয়ে রইল। ছোটঠাকুর নামক পাঠশালার পণ্ডিত মশাইটিকে দেখবার জন্যে তার ঔৎসুক্য প্রবল হল। ছোটঠাকুর একসময় সীমার জানালার সামনে এলেন, পরমুহূর্তেই অন্য প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক-মুহূর্তের দেখা, কিন্তু সীমার মনে একটা স্থায়ী দাগ টেনে দিয়ে গেলেন ছোটঠাকুর। পাঠশালার পণ্ডিতের আকৃতি আচরণ সম্বন্ধে সীমার যে চিরদিনের ধারণা, তার সঙ্গে এই মানুষটির কোথাও মিল আছে বলে মনে হল না। বয়েস তিরিশের মধ্যে বলেই মনে হল। দীপ্ত সুন্দর চেহারা। মুখে কেমন একধরনের প্রশান্ত দৃঢ়তা। এ মুখ একবার দেখলেই বহুদিন মনে রাখা যায়।

তানিয়া ঘরে ঢুকতেই সীমা তার দিকে ফিরে বসল।

ক্যামন আছেন গো?

সীমা মিষ্টি মৃদু একটুখানি হেসে মাথা নেড়ে জানাল, সে ভাল আছে।

তানিয়া এবার বলল, পাশের ঘরে তুমি সিনান সেরে জলটল খেয়ে লাও, তারপর বাইরের ঘরে বাবামশায়ের সাথে দেখা কর।

সীমা ধীরে ধীরে সব কাজ সেরে উঠে দাঁড়াল বাইরে যাবার জন্যে। তানিয়া এসে তাকে নিয়ে গেল বাইরের ঘরে।

রাতে সীমা প্রায় কোনকিছুই দেখেনি, আর তার দেখার মত অবস্থাও ছিল না। এখন সে দেখল, দিগন্তজোড়া ফাঁকা পাহাড়ি অঞ্চল। পাশেই একটি নদী বয়ে চলেছে। অদূরে পশ্চিম দিকে সবুজ ক্ষেত আর কৃষকদের বসতির চিহ্ন।

এই বাড়ি আর তার সংলগ্ন বাগান, ঐ বসতি অঞ্চল থেকে বেশ খানিকটা দূরে বলেই সীমার মনে হল।

তিন চারখানি টালিছাওয়া ঘর। একটি ঘর নদীর একেবারে ধারে, ডালপালা মেলে দেওয়া এক অশ্বত্থ গাছের তলায়। ছেলেরা তারই ভেতর গুঞ্জন করে কি যেন পড়ছিল। সীমা বুঝল ঐ ঘরখানাই পাঠশালার জন্যে নির্দিষ্ট।

তানিয়ার সঙ্গে সীমা যে ঘরে এসে ঢুকল, সেখানে বসে ছিলেন এক বৃদ্ধ মানুষ। বুক অবধি ঝুলে পড়েছে তাঁর সাদা দাড়ি। সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা প্রসন্নতা। তিনি কতকগুলি আমলকি সযত্নে একটি পাত্রে রাখছিলেন।

এসো মা বস।

মাদুর বিছান ছিল। সীমা সেই মাদুরের এক প্রান্ত ঘেঁষে বসল।

বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র হাতের কাজ শেষ করে সীমার দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখে নিলেন।

কেমন মনে হচ্ছে এখন?

সীমা বলল, ভাল।

তানিয়ার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আমি যে ওষুধ দিয়েছিলাম, তা কাল রাতে ক'বার খাইয়েছ?

দু'বার বাবামশায়।

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে জানালেন, ঠিক আছে।

তানিয়া সেখান থেকে কর্মান্তরে চলে গেল। বৃদ্ধ বললেন, তুমি এখন কোথায় যেতে চাও বল, আমরা সঙ্গে লোক দিয়ে সেখানে তোমাকে রেখে আসব।

সীমা অন্যমনস্ক হল। সে ভেবে ঠিক করতে পারল না, এই অবস্থায় সে কোথায় যাবে। ঘর তার কাছে দুর্বিষহ বলে মনে হল। একটি আশ্রয় এখন তার প্রয়োজন যেখানে সে অন্তত কয়েকটা দিন সুস্থভাবে থাকতে পারে।

সীমা বৃদ্ধের মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলল, যাবার মত জায়গা ...। তারপর হঠাৎ কি ভেবে বলে উঠল, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনার বোঝা আমি আর বাড়াতে চাই না। আমি এখুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

বৃদ্ধ বললেন, না, না, তা আমি বলছি না, তোমাকে চলে যেতে হবে কেন। আমি ভেবেছিলাম, যে কারণেই তুমি এখানে এসে পড় না কেন, ঘরে ফিরে যাবার একটা ইচ্ছে সবারই থাকে।

না বাবা, আমার তেমন কোন পেছুটান নেই।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি কি মা বিবাহিতা?

সীমা মাথা নেড়ে জানাল যে সে বিবাহিতা নয়।

বৃদ্ধ দিবাকর বললেন, সংসারে এমন কোন দুঃখ নেই মা, যাকে জয় করা যায় না। সাময়িকভাবে কোন কারণে হয়ত তুমি বিচলিত হয়েছ, আবার দেখবে ধীরে ধীরে তুমি শান্ত হয়ে এসেছ।

একটু থেমে হেসে বললেন, মন আর জল দুটোই একরকম। একটুতেই ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে, আবার আপনিই স্থির হয়ে যায়।

সীমা বলল, আমার এখানে আসার একটা কারণ আছে বাবা, সে ঘটনা আপনি জানলে আমার সম্বন্ধে হয়ত অন্যরকম ভাবতে হবে আপনাকে।

কোন সংকোচ না রেখেই বল মা। কিছু একটা অসহায় অবস্থার ভেতরে পড়েই যে তুমি এসেছ তা আমি বুঝতে পেরেছি, তবে যা একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার তাতে অন্যের কৌতূহল ঠিক নয়। তবে আমার কাছে তুমি সবকিছু খুলে বলতে পার।

সীমা বলল, আমি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্রেডিং কোম্পানির একটি চাকরির আশায় কলকাতা থেকে এ অঞ্চলে এসেছিলাম।

বৃদ্ধ উৎসুক হয়ে বললেন, তারপর?

সীমা বলল, আমি এসেই, বলতে পারেন একটা বিরাট ঘরে বন্দি হয়ে ছিলাম।

বৃদ্ধ তেমনি ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে রইলেন সীমার দিকে!

সীমা বলে চলল, ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি ঠিক সময়ে ওদের কু-মতলবের কথা জানতে পারি, আর রাতের অন্ধকারে লেক সাঁতরে পার হয়ে আপনার এখানে পালিয়ে আসি।

সীমা দেখল বৃদ্ধের স্থির দুটো চোখে যেন আগুন বেরোচ্ছে। একটু পরেই তা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। তিনি বললেন, বড় কষ্ট পেলে মা। তবে যখন রক্ষাই পেলে তখন কলকাতা ফিরে যেতে চাইছ না কেন?

সীমা বলল, সেখানে আমার কথা ভাববার মত কোন লোক নেই বলে।

বৃদ্ধ একটু থেমে বললেন, এখন কি করতে চাও?

সীমা বলল, আমি আপনাদের বিব্রত করতে চাই না। পথে নেমেই হেঁটে চলব যেদিকে দু'চোখ যায়।

বৃদ্ধ বললেন, যখন মা বলে তোমাকে ডেকেছি তখন যতদিন তোমার খুশি এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পার।

সীমা বলল, এমনি খেয়ে বসে কি করে থাকি বলুন, যদি এত দয়া করলেন, তাহলে আমাকে কিছু কাজ দিন। তা যত ছোট, যে রকমেরই হোক। আপনার ঋণ একেবারে শোধ করতে না পারলেও, সাধ্যমত চেষ্টা করব।

বৃদ্ধ বললেন, কাজের রাস্তা ধরেই তো জীবনের চাকাটা গড়িয়ে চলে মা। ওই রাস্তা অচল হলেই জং ধরবে জীবনের চাকায়।

একটু থেমে বললেন, তুমি কাজ করবে বইকি, তবে এখন বিশ্রাম কর, কাজের সময় এলে ঠিকই তোমাকে ডেকে নেব।

সীমা বলল, দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজ করার অভ্যেস আছে আমার, তবে একটু শান্তি চাই আমি, যা কোথাও খুঁজে পাইনি।

হাসলেন বৃদ্ধ। নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, শান্তি এখানে ছাড়া কোথায় পাবে মা। এই মনখানাকে বশে আনলেই পাবে শান্তির সঠিক ঠিকানা।

সীমা মাথা নীচু করল।

বৃদ্ধ আবার বললেন, যে হাওয়ায় তরী ডোবায়, সেই হাওয়া নইলে যে মা প্রাণ বাঁচে না। এই মনই অশান্তির ঘূর্ণি তুলে তোলপাড় করে, আবার এই মনই শান্তির আশ্রয়। তুমি কিছু ভেব না মা, নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রেখ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ উঠলেন। সীমা সঙ্গে সঙ্গে উঠল।

বৃদ্ধ বললেন, এখন আমাকে গ্রামে যেতে হচ্ছে। যা দরকার তানিয়াকে বললেই পাবে। সংকোচ কর না কোনকিছুতে। সুপ্রকাশ রয়েছে পাঠশালায়, তেমন কিছু দরকার পড়লে তার সাহায্যও পাবে। আমি ফিরব ওবেলা অপরাহ্নের দিকে।

সীমা মাথা নেড়ে জানাল, সে বৃদ্ধের সকল কথাই বুঝতে পেরেছে এবং প্রয়োজনে সব রকমের সাহায্যই সে নেবে।

বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র লাঠি ঠুকতে ঠুকতে প্রথমে গিয়ে ঢুকলেন পাঠশালায়। সুপ্রকাশকে ডেকে নিয়ে এলেন বাইরে।

মেয়েটি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্রেডিং কোম্পানির লেক রাতের অন্ধকারে সাঁতরে পার হয়ে এসেছে, সুতরাং একটু সতর্ক থেক।

সুপ্রকাশ বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এদিকে ওঁর খোঁজে কেউ আসতে সাহস করবে না।

বৃদ্ধ বললেন, তা জানি, তবু সাবধানের মার নেই।

সুপ্রকাশ বলল, আমি তো রইলাম, আপনি ফেরার সময় বীরু আর বঙ্কুকে নিয়ে আসবেন। ওরা রাতে ক'দিন এখানেই থাকবে।

বৃদ্ধ বললেন, তা আমি ভেবেই রেখেছি। আর শোন, মেয়েটির ঘরে ফেরার তাগিদ কিছু নেই, ও কাজ চায়, একটা কিছু ভেবে রেখ।

সুপ্রকাশ মাথা নাড়ল, বৃদ্ধ লাঠিখানা ঠকঠক করতে করতে এগোতে লাগলেন গ্রামের দিকে।

সুপ্রকাশ পেছন থেকে হাঁক দিয়ে বলল, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান না।

বৃদ্ধ থামলেন। একটুখানি মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমাকে এত তাড়াতাড়ি অক্ষম করে দিও না সুপ্রকাশ। মনে মনে যেদিন নিজেকে বুড়ো বলে ভাবব, সেদিন তো পায়ের চাকা আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। যতদিন মন চলে ততদিন একা একা পা চালাতে দাও।

বৃদ্ধ আবার চলতে লাগলেন। সুপ্রকাশের মুখে একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল। কিছুক্ষণ বৃদ্ধের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে সে ঢুকল পাঠশালার ভেতর।

সীমার হাতে কোন কাজ নেই। তানিয়া কিছু আগে সামনের পথ ধরে গরুগুলোকে নিয়ে গেছে

ছোট নদীটার দিকে। ওখানে চরের বুকে হয়ত কচি ঘাসের সন্ধানে। সীমা ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের চারদিকে। এখানে আকাশ এত বড়, প্রান্তর এমন প্রসারিত, বাতাস এত নির্মল যে সীমা মাঝে মাঝে চোখ বুজে বুক ভরে নিশ্বাস টানতে লাগল। সে দেখতে পেল ছোট নদীটি তরতর করে বয়ে চলেছে; এক ঝাঁক পাখি সামনের অশত্থগাছের পাতার ফাঁক থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল। তারা হাওয়ার ওপর নাচতে নাচতে ভাসতে ভাসতে নদীর তীর ঘেঁষে উড়ে গেল কিছুদূর। তারপর প্রান্তরের বুকে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সীমা ভুলে গেল গত রাতের কথা। সে যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে, নিজের শেষ শক্তিটুকু প্রায় নিঃশেষ করে জয়ী হয়েছে, আজ তার কাছে সে সব কথা তুচ্ছ হয়ে গেল। সীমার মনে হল, তার পেছনে কোন জীবন নেই, কোন ইতিহাস নেই, সে সবে এই আলোয়, এই হাওয়ায় তরুণী হয়ে ভূমিষ্ঠ হল।

সীমা অনুচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলল,

'বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে
ধন নয় মান নয়
একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।'

আবৃত্তি শেষ হল। সীমা দক্ষিণে ফিরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল একটি পলাশগাছ। সারা দেহে যেন আলোর প্রদীপ জ্বেলেছে। সীমা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। একটি ডাল নীচু হয়ে এসেছিল ভারি সুন্দর ভঙ্গিতে। ফুলগুলি যেন দীপাবলীর একসারি দীপের মত নেমে এসেছিল ওই ডালের গা ছুঁয়ে। সীমা হাত বাড়িয়ে ফুল পাড়ার চেষ্টা করতে লাগল। আজ তার মন নিজের সঙ্গে কথা কইছে। সে সাজতে চায়, যৌবনের দিনগুলোকে এমনি পত্রপুষ্পহীন চলে যেতে দেবে না। কিন্তু নাগাল পেল না সে ফুলের। মন ছুঁয়েছে ফুল, কিন্তু হাত ছুঁতে পারছে না। ফিরে এল সীমা। আসতে আসতে কয়েকবার তাকাল পেছন ফিরে। সবকিছু চাইলেই কি পাওয়া যায়? জীবনকে ধন্য করবে যে তার প্রসাদ নইলে সাধ্য কি পাওয়া।

সীমা উঠোন পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। তানিয়া ততক্ষণে ফিরে এসেছে। কি গো দিদি, চারদিকটা ঘুরে ফিরে দেখলে বুঝি?

হাঁ, এই একটু ঘুরে এলাম।

ক্যামন লাগল বললে নাই তো?

খুব ভাল তানিয়া।

তারপর কপট ক্রোধের ভান করে বলল, জান তোমার ওপর খুব রাগ হচ্ছে।

তানিয়া যেন আকাশ থেকে পড়ল, কি দোষ করলাম গো দিদি?

সীমা হেসে বলল, তুমি এতদিন একা একা এমন সুন্দর একটা জায়গায় রয়েছ। তাই তোমাকে দেখে ভারী হিংসে হচ্ছে আমার।

ও তাই বল, আমি ভাবলাম, কি দোষ করলাম, বাবামশায় কি বললেন।

সীমা বলল, তুমি খু-উ-ব ভাল মেয়ে তানিয়া।

তানিয়া হাসতে লাগল।

আচ্ছা তানিয়া তোমার বাড়ি কোথায়, কে আছে তোমার বাড়িতে?

তানিয়া সপ্রতিভ উত্তর করল, কেউ নাই দিদি। বাপ মা আমাকে ছোটকালে বেচে দিয়ে কুথা চলিয়ে গেছে। যার কাছে বেচল, আমার বয়স হলে সে বুড়া আমাকে সাদি করল। এক বরষ যাইল না বুড়া মরল। তখন আমার জাতের মরদগুলো আমার লেগে লড়াই শুরু করিয়ে দিল। আমি বাবামশায়ের পা জড়াইয়ে ধরলাম আর ছাড়লাম নাই। কইলাম, এগুলানের হাত থেইকে আমাকে রক্ষা কর!

বাবামশায় কইলেন, আবার সাদি না করিয়ে তুই থাকতে পারবি? আমি কইলাম, হঁ, কেনে পারব নাই। বাবামশায় তখন আমাকে তেনার কাজে বহাল করলেন।

সীমা বলল, তাহলে তুমি বেঁচে গেলে তানিয়া।

তানিয়া বলল, বাবামশায় আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

বাবামশায় কেমন লোক তানিয়া?

তানিয়া যেন মুহূর্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গেল। মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল, দেবতা, বুড়া শিউজী। এ তল্লাটের যত চাষাভূষা, কুলিকামিন সব বাবামশায়কে 'ঠাকুর' বইলে ডাকে। আর হুঁই যে পাঠশালায় আছেন গো, উনি হলেন ছোটঠাকুর। ওকে সবাই ডরে। এমন মরদ নাই যে ওর ডাকে সাড়া দিবে নাই।

সীমা সুপ্রকাশের সম্বন্ধে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তানিয়া, তোমাদের ছোটঠাকুর বড়ঠাকুরের কেউ হন কি?

অতশত বোলতে পারব নাই দিদি। তবে ছোটঠাকুর যদি কারও কথা শোনে সে হল বাবামশায়ের। বাবামশায়ের ওপরে কারও কথা চলবে নাই।

তোমাদের ছোটঠাকুর আর বাবামশায় কি এখানেই থাকেন?

বাবামশায় এইখানে থাকেন, ছোটঠাকুর গাঁওতে চলিয়ে যান।

সেখানে ওঁর বাড়ি?

তানিয়া বলল, ওঁর ঘরবাড়ি নাই গো দিদি। লোকে বলে, ও রাজা, সবার সঙ্গে ভিখারী সাজিয়ে আছে।

ভিখারী সেজে আছে!

হাঁ গো হাঁ, ওঁর মাথায় নাকি এত্তবড় একখানা জাহাজ আছে, পুঁথির জাহাজ গো। আর নাকি বস্তা বস্তা টাকা ওই চাষাগুলানকে দিয়ে দিয়েছে।

খুব ভাল লোক তাহলে তোমাদের ছোটঠাকুর, কি বল?

তানিয়া এবার কেমন যেন বিষণ্ণ মুখ করে বলল, ভাল আছে, তবে কোনদিন আমার হাত থেইকে এক ঘটি দুধ চাইয়া খাইল নাই। খালি বলে, তানিয়া ওই বাচ্চাগুলানের ছুটি হইয়া গেলে উদের দুধ খাওয়াইয়ে দাও। বোল তো দিদি, কত কষ্ট হয় মনটায়।

সীমা বলল, এ তো ভাল কথা তানিয়া। ছোটরা দুধ খেলে তবে তো তাদের চেহারা ভাল হবে। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠবে। লেখাপড়া ভাল শিখবে।

তানিয়ার কথাটা মনে ধরল না। সে বলল, আরে ধুৎ, ওই বাচ্চাগুলান বড় হইলে কুলিকামিন হবে। হাঁড়িয়া গিলবে। জরু ঠেঙাবে।

সীমা বলল, ও কথা ভাবছ কেন তানিয়া। ছোটঠাকুরের কাছে যখন ওরা পড়ছে তখন নিশ্চয়ই ওরা হাঁড়িয়া খেয়ে মাতলামি করবে না।

তানিয়া অন্যমনস্কভাবে বলল, হবে দিদি, হবেও বা ; ছোটঠাকুর মানুষ নাই, দেব্‌তা আছে।

ওদের কথার মাঝে হঠাৎ একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটল। একটি ছেলে কোঁচড়ে করে অনেকগুলো পলাশফুল নিয়ে এসে সীমার কাছে দাঁড়াল। সীমা তো পলাশ দেখে অবাক।

ছেলেটি বলল, তোমার জন্যে এই ফুল এনেছি।

সীমা দু'হাত ভরে ফুলগুলো নিল। তারপর বলল, তুমি কি করে জানলে যে আমি পলাশফুল ভালবাসি?

ছোটঠাকুর বললেন, ফুল পেড়ে দিয়ে আয়।

সীমা কৌতুক করে বলল, কাকে দিতে বললেন?

ছেলেটি বলল, তুমি যখন ফুল পাড়তে গিয়ে নাগাল পেলে না, তখন ছোটঠাকুর পাঠশালা থেকে দেখছিলেন, তারপর তুমি চলে এলে আমাকে ফুল পেড়ে তোমার হাতে দিয়ে আসতে বললেন।

সীমা মনের খুশি যেন চেপে রাখতে পারছিল না। বলল, তুমি লক্ষ্মী ছেলে। আমি খুব ভালবাসি ফুল।

ছেলেটির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে এবার একদৌড়ে পাঠশালার ভেতর গিয়ে ঢুকল।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। দিবাকর মিশ্র সীমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাইরের ঘরে। এ ক'দিন সীমা প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিল। চিরদিন কাজই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। তা সে যত ছোটই হোক। কিন্তু এখানে আসার পর সীমা যেমন উদার প্রকৃতির মাঝে মুক্তি পেয়েছিল, তেমনি কাজের মাঝে থাকতে না পেরে হাঁপিয়েও উঠেছিল। তাই দিবাকর মিশ্র যখন তাকে ডেকে পাঠালেন তখন সীমা যেন কি এক প্রত্যাশায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

দিবাকর মিশ্র সীমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, বোস মা, কয়েকদিন বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারিনি।

সীমা বসল।

দিবাকর মিশ্র বললেন, কেমন লাগছে মা তোমার?

সীমা বলল, আপনার আশ্রয়ে ভাল না লাগবার কথা নয়, কিন্তু আমি যে বড় হাঁপিয়ে উঠেছি বাবা।

কেন মা?

কাজ ছাড়া কেবল শুয়ে বসে থাকা আমার আছে বড় কষ্টকর হয়ে উঠেছে বাবা।

ও, এই কথা।

হাসলেন দিবাকর মিশ্র। বললেন, চলাটা জীবনের ধর্ম ঠিক, কিন্তু কখনও কখনও থামতেও হয় মা। থেমে থাকা নতুন চলারই প্রস্তুতি। গাছ কি সবসময় ফুল ফোটায়, ফল ফলায়, তাকেও থামতে হয়। এই থামার ভেতর দিয়েই চলে তার নতুন ফলের আয়োজন।

সীমা লজ্জিত হল।

জীবনে কোন কিছু করতে না পেরে আমি অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমি তোমার জন্যে কাজ এনেছি মা।

সীমা উৎসুক চোখ তুলে তাকাল দিবাকর মিশ্রের দিকে।

কাজটা সাময়িক, পরে অন্য কাজের কথা ভাবা যাবে, কিন্তু এখন কিছুদিন তোমাকে এই কাজই করতে হবে।

বলুন কি করতে হবে আমাকে?

এই পাঠশালাটি চালানোর কাজ। এ কাজ সুপ্রকাশই করে, তবে কিছুদিনের জন্যে তাকে বাইরে যেতে হচ্ছে জরুরি কাজে, তাই এ ভার আপাতত তোমার ওপরেই এসে পড়ল।

আমি কি পারব বাবা?

সংশয় কেন মা। পারব বলে যারা কাজে নেমে পড়ে, কোন কিছুই তাদের কাছে অসাধ্য থাকে না।

আপনার কাছে ভরসা পেলাম। এখন মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই পারব।

দিবাকর মিশ্র বললেন, কাজটা কিন্তু মা তোমাকে বুঝে নিতে হবে সুপ্রকাশের কাছ থেকে।

সীমা বলল, তাই হবে।

পরে বলল, ওঁর কাছে কি এখন যেতে হবে বাবা?

দিবাকর মিশ্র বললেন, ও নিজেই তোমার কাছে ডাক পাঠাবে। সমস্ত কাজ ওর ছবির মত ছকে ফেলা। কাজ করতে করতে দেখবে মা, কত আনন্দ ও প্রতিটি কাজের ভেতর মিশিয়ে দিয়েছে। চাষাভুষো থেকে কুলিকামিন তাই তো ওর বশে।

সীমা বলল, সেই জন্যেই তো ভয় আমার। মনে হয় এমন সুন্দর ছন্দে-বাঁধা কাজগুলোকে হয়ত ভেঙেচুরে এলোমেলো করে ফেলব।

ভুল না হলে তো শিখতে পারবে না মা পুরোপুরি। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যে ভুল হয়, সে ভুল জানবে মঙ্গলের।

সীমা বলল, আমি চেষ্টা করব ওঁর নির্দেশমত কাজ করতে।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন দিবাকর মিশ্র। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মত করে বললেন, খরশান ইস্পাত আমার সুপ্রকাশ। ও যতখানি নমনীয় ঠিক ততখানিই আবার দৃঢ়। সারা দেশ জুড়ে কয়েকজন মাত্র সুপ্রকাশ যদি জন্ম নিত তাহলে আমূল বদলে যেত দেশের চেহারা। এ জাতের ছেলেরা শুধু স্বপ্ন দেখতেই জানে না তাকে রূপ দিতেও জানে।

থেমে গেলেন দিবাকর মিশ্র। সীমা দেখল, কি এক তন্ময়তায় মগ্ন হয়ে রইলেন বৃদ্ধ।

তারপর একসময় সহজ হয়ে বললেন, সুপ্রকাশের কাছে কোনকিছু গোপন রেখ না মা, ও বড় স্বচ্ছ, বড় পরিষ্কার। স্পষ্ট করে তোমার কথা বলবে, তাতে খুশি হবে ও।

সীমা বলল, কাজের ভেতর দিয়ে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব ওঁকে খুশি করবার।

সেই ভাল মা, বড় কাজপাগল ও। কাজ ছাড়া কিছু জানে না। কাজের মানুষ সঙ্গে পেলে ও একেবারে মেতে ওঠে।

দুপুরের দিকে বৃদ্ধ দিবাকর চলে গেলেন গ্রামে। একা একা বসে থেকে সীমার ভাল লাগছিল না। সে তানিয়ার সঙ্গে তাই বেরল নদীর চরে। উদ্দেশ্য গরুগুলোর তদারকি। বাছুরগুলোকে এখন মায়েদের কাছছাড়া করে ঘরে ফিরিয়ে না আনলে সাঁঝে আর দুধ পাওয়া যাবে না। ছোট্ট একটি খাল বেরিয়ে এসেছিল নদী থেকে। তানিয়া তার ভেতর নেমে পড়ল। সে সঙ্গে এনেছিল ছাঁকনি জাল। তা দিয়ে সে ছোট ছোট মাছ ধরার কাজে লেগে গেল। খালের পাড়ে বসে সীমা মাছ ধরা দেখছিল। তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সেও তানিয়ার দেখাদেখি নেমে পড়ল জলে। দুজনে মহা উৎসাহে মাছ ধরতে লেগে গেল। সীমা ও কাজে একেবারে অনভ্যস্ত। তাই তার মাছ ধরার কাজ যত না এগোল, জলে ঝাঁপাঝাঁপি দাপাদাপিটাই চলল বেশি। কাপড় তো আগেই ভিজেছিল, এখন মাথার চুলগুলোও বড় একটা রক্ষা পেল না। যখন ওরা মাছ ধরার খেলা ফেলে উঠল তখন সূর্য অপরাহ্নের আকাশে রঙ বদল করছে। তানিয়া বলল, এই দুটো বাছুরকে তাড়িয়ে নিয়ে তুমি ঘরে যাও দিদি, আমি গরুগুলান লিয়ে পিছু যাচ্ছি। উয়াদের জল খাওয়াইতে হবে।

সীমাকে আজ যেন খেলায় পেয়ে বসেছে। সে বাছুরগুলোর পেছন পেছন দৌড়ে তাড়া করে নিয়ে চলল। চঞ্চল বাছুরগুলো এদিক ওদিক নেচে নেচে দৌড়য়, আবার থামে, আবার দৌড়য়। সীমা সমানে তাদের তাড়া করে নিয়ে চলল। এ সত্যিই এক মজার খেলা। ছোট থাকার জন্যে বাছুরগুলোর বুদ্ধি গরুগুলোর মত পাকেনি, তাই ঘরের কাছে এসেই ওরা গোবেচারার মত গোয়ালে সরাসরি ঢুকে পড়ল না, ঢুকল গিয়ে সবজিক্ষেতে। সবে কিসের যেন চারা বসান হয়েছিল, যাবি তো যা একেবারে তারই মাঝখানে। সেখানে পৌঁছেও তাদের নাচ থামে না। দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে সীমা মহা বিব্রত। সবজিক্ষেতটা আবার পাঠশালার লাগাও। সীমা ক্ষেতের ভেতর ঢুকতেও সাহস পাচ্ছিল না। কে জানে সুপ্রকাশ এখন পাঠশালায় আছেন কি না। তাছাড়া খালে মাছ ধরতে গিয়ে তার চেহারাখানার যা অবস্থা হয়েছে তা ভদ্রসমাজে বের করার মত নয়। ভাবতে ভাবতেই পাঠশালা থেকে দুটো ছেলে বুলেটের মত দৌড়ে বেরিয়ে এল। তারা অতি কৌশলী। বেরিয়ে এল যত বেগে, বেড়ার কাছে এসে সে বেগ একেবারে স্তিমিত হয়ে গেল। অতি ধীরে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সবজিক্ষেতে ঢুকল। কয়েকটা পাতা তোলার অভিনয় করল, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বাছুরগুলোর কাছে। এবার জড়িয়ে ধরল ওদের গলা। একেবারে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল গোয়ালে। সীমা লজ্জিত হয়ে পায়ে পায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তখন কাপড়চোপড় বদলে সীমা একটু ভদ্রস্থ হয়েছে, ডাক এল পাঠশালা থেকে।

সীমা মনে মনে যে একটু ভয় পেল না তা নয়। আজ সারা দুপুর আর বিকেল সে যেভাবে

কাটিয়েছে তাতে কিছু বকুনি যে তার প্রাপ্যের ঘরে জমা পড়েছে, এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহই রইল না।

সে বাধ্য একজন পাঠশালার ছাত্রীর মত পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল সুপ্রকাশের সামনে। ছেলেরা চাটাই পেতে বসে ছিল। সুপ্রকাশেরও উপবেশন একখানি চাটাই-এর ওপর। সীমা আসতেই সুপ্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করল। ছেলেরা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

একটি ছেলে বলল, ঠাকুর, ঝিঙেফুল ফুটে গেছে, এখন আমাদের ছুটি।

সুপ্রকাশ হেসে বলল, আচ্ছা এস তোমরা।

ছেলেরা চলে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল, সুপ্রকাশ তাদের বলল, একটু থাম।

ওরা দাঁড়াতেই সুপ্রকাশ সীমাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাব, ইনি কাল থেকে তোমাদের পড়াবেন, বুঝলে?

ছেলেরা মাথা নাড়ল। সুপ্রকাশ বলল, আচ্ছা এখন তোমরা এস।

ওরা চলে গেলে সুপ্রকাশ সীমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ছেলেদের কিন্তু আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে।

সীমা মৃদু হেসে বলল, কি করে বুঝলেন?

এই আপনি ওদের মত নদীতে ঝাঁপাই ঝুড়তে, গরু বাছুরের পেছনে দৌড়তে, গাছ থেকে ফুল পাড়তে ভালবাসেন বলে।

সীমা আর সুপ্রকাশ একই সঙ্গে হেসে উঠল।

সীমা ভাবতে পারেনি যে তাদের প্রথম পরিচয় এমন সহজ হয়ে দেখা দেবে।

সুপ্রকাশ বলল, আপনি বাবামশায়কে কাজ কাজ করে পাগল করে তুলেছিলেন, এখন কাজের প্রথম পরীক্ষাটা দিন।

বলুন কি করতে হবে।

কাল থেকে কিছুদিন আমার ছুটি, আর সে পদে আপনাকে বহাল হতে হবে।

সীমা হঠাৎ বলে বসল, ছুটি কেন?

সুপ্রকাশ বলল, সে কি কথা, কাজ করলে ছুটি পাওনা হবে না! অন্তত সে ছুটি তো আমার প্রাপ্য।

সীমা মৃদু হেসে মাথা নাড়তে লাগল। ভাবল, এ ধরনের ছুটির দরকারই হবে না সুপ্রকাশবাবুর।

সুপ্রকাশ বলল, মনে হচ্ছে না আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করলেন বলে। তাহলে আপনার বিশ্বাসযোগ্য কিছু একটা বলতে হয়, তাই শুনুন। ওই যে গ্রামখানা দেখছেন, ওর নাম সীতাপুর। ওই গ্রামে তিন বছর অন্তর একটি করে মেলার আয়োজন করতে হয়। আর তারই ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকতে হবে বলে আমার ছুটির দরকার।

সীমা বলল, কোন পালপার্বণে ওই মেলা বসে বুঝি?

না না, তা নয়। ওই গ্রামখানাকে আদর্শ একটি গ্রামের রূপ দেবার জন্যে আমরা কাজ করি। কিভাবে কাজের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি, তা দেখাবার জন্যেই এই মেলার আয়োজন। আমাদের এখানে যে সব কাপড় বোনা হয়, কিংবা যে সব কুটিরশিল্পের কাজ হয়, তা যাতে বিভিন্ন গ্রাম আর শহর বাজারে বিক্রি হতে পারে সেজন্যেও এই মেলার ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিত হয়ে কলকাতার অনেক ব্যবসায়ীই এসময় এখানে আসেন। তাঁদের আকর্ষণ করবার জন্যেও আমাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হয়।

একটু থেমে সুপ্রকাশ বলল, এখন পাঠশালায় ছেলে পড়ানোর কাজে হাত পাকান, তারপর এসব কাজেও আপনার হাত লাগানোর দরকার হয়ে পড়বে।

সীমা বলল, খুব ইচ্ছে করে আপনাদের ওই গ্রামে যেতে।

সুপ্রকাশ বলল, নিশ্চয়ই যাবেন। ও গ্রাম সবার জন্যে। আমরা নানা জায়গা থেকে লোককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি। তাঁরা দেখে কিছু সমালোচনা করুন অথবা প্রেরণা পান, এইটাই আমরা চাই। এতে

আমাদের কাজের সংস্কারও যেমন হবে, তেমনি আদর্শ যদি কিছু থেকে থাকে তাও ছড়িয়ে পড়বে।

একটু থেমে সুপ্রকাশ বলল, পরশু রোববার, ছুটির দিন। বিকেলের দিকে নিয়ে যাব আপনাকে গ্রামে।

সীমা বলল, দূর থেকে ওই জায়গাটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। এত সবুজ, চোখ জুড়িয়ে যায়।

সুপ্রকাশ বলল, শহরের হাত থেকে ওই সবুজটুকু বাঁচাবার জন্যেই আমাদের যুদ্ধ। প্রকৃতির সবুজ আর মনের সবুজ, দুটোই মিলবে ওইখানে!

সীমা চুপ করে রইল। তার মনে হল কৃত্রিম একটা জগৎ থেকে সে আজ যেখানে এসে পড়েছে, সে জগতের সঙ্গে কোথায় যেন তার প্রাণের একটা যোগ ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গেছে।

সুপ্রকাশ এবার কাজের কথা পাড়ল, দেখুন এখন আমরা একটু কাজের কথা আলোচনা করে নিই।

সীমা সুপ্রকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

আমি এই পাঠশালার কথা বলছিলাম। এর কাজ কিন্তু একটু অন্য ধরনের। আপনি ছেলেদের কোন একটি অঙ্ক বুঝিয়ে দিলেন। তারপর কয়েকটি ওই ধরনের অঙ্ক কষতে দিলেন। এখন সব ছেলেই যে ঠিক করবে এমন নয়। কেউ কেউ ভুলও করবে।

সীমা বলল, ভুল তো করবেই, আমি সাধ্যমত বুঝিয়ে দেব ওদের।

সুপ্রকাশ হেসে বলল, সেইটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি একটু অন্যরকমের।

সীমা ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল সুপ্রকাশের দিকে।

সুপ্রকাশ বলল, আমরা ছেলেদের দিয়েই ছেলেদের পড়ানোর চেষ্টা করি। যে ছেলে অঙ্ক ঠিক করল তার ওপর ভার দি' যারা পারেনি তাদের বুঝিয়ে দেবার। এ কাজে দরকার হলে আমাদের সাহায্য তো আছেই। শুধু অঙ্ক নয়, সব বিষয়েই আমাদের এই ব্যবস্থা।

সীমা বলল, বাঃ ভারী সুন্দর তো।

সুপ্রকাশ বলল, এতে ছেলেবেলা থেকেই পরস্পরের সহযোগিতার মনোভাব দেখা দেয়। তাছাড়া বোঝাতে গিয়ে কথা বলার ক্ষমতাও বাড়ে।

সীমা বলল, আমি এমনিভাবে পড়ানোর চেষ্টা করব।

সুপ্রকাশ বলল, আমাদের পাঠশালায় শাস্তির ব্যবস্থাও আছে কিন্তু।

সীমা কৌতূহলী হল, কি রকম?

এই বার বার বুঝিয়েও যাকে বোঝান গেল না, তাকে আমরা সবজিক্ষেতের কাজে পাঠাই, কিংবা দুধ দোয়ার সময়ে বাছুর ধরার কাজে লাগাই।

সীমা বলল, এতে তো ওদের মজা বলেই আমার মনে হয়।

ঠিক তাই। হাতেনাতে কাজও কিছু করে, আবার পাঠশালার বাইরে খোলা হাওয়ায় মাথাটা কিছু সাফও হয়।

সীমা হেসে বলল, এরকম শাস্তি পেলে আমরাও পাঠশালায় ভর্তি হয়ে যেতে পারি।

সুপ্রকাশ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল বাইরে। বলল, আমি এখন চললাম গ্রামে। বাবামশায়ের ফিরতে একটু রাতই হবে। সাবধানে থাকবেন।

চলে গেল সুপ্রকাশ। সীমা তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। মিথ্যা গাম্ভীর্যের আড়ালে নিজেকে গুণ্ঠিত করে রাখে যে সব মানুষ তাদের চেয়ে এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পরের দিন ভোরবেলা সীমা তৈরি হয়েই ছিল। ছেলেরা আসতেই সীমা তাদের নিয়ে পাঠশালার ভেতর পড়াতে শুরু করে দিলে।

সীমা একটি ছেলেকে বলল, কি নাম তোমার?

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সমীরণ।

সীমা গালে হাত দিয়ে অবাক হওয়ার অভিনয় করে বলল. বাব্বাঃ এত বড় নাম!

তার রকম দেখে ছেলেরা খুব মজা পেয়ে হেসে উঠল।

আচ্ছা সমীরণ মানে কি বল তো?

ছেলেটি আকাশপাতাল ভেবেও মানে বের করতে পারল না।

সীমা বলল, এখন তোমরা কেউ ওর নামের মানেটা ওকে বুঝিয়ে দাও।

একটি ছেলে বলল, ওর ভাইকে সবাই ডাকে 'সমী' বলে। ওর ভাইয়ের আসল নাম শমীন্দ্র। আমার মনে হয় ওর ভাই-এর সঙ্গে 'রণ' মানে যুদ্ধ মারামারি করে বলেই ওর নাম হয়েছে সমীরণ।

সীমা তো হেসেই সারা। এমন গম্ভীর হয়ে আবিষ্কারকের মত ছেলেটি কথাগুলো বলে গেল যে সীমা তাকে কাছে ডেকে আদর না করে পারল না।

সীমা বলল, খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ তুমি। হাতের কাছে সন্দেশ বা রসগোল্লা থাকলে এখুনি তোমাকে খাইয়ে দিতাম। তা যখন নেই তখন ...।

সীমা হাতখানা মারের ভঙ্গিতে তুলে আলতো করে ছেলেটির পিঠে বসিয়ে দিয়ে বলল, এটাকে কি খাওয়া বলে?

সকলে চেঁচিয়ে উঠল, মার খাওয়া।

সীমা বলল, তাই খাওয়ালাম এখন। পরে সন্দেশ পাওয়া যায় কিনা দেখা যাবে।

সবাই খুব মজা পেয়ে গেল। সীমা এবার সমীরণ কথাটির মানে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলল, সমীরণ মানে বাতাস। এখন এই বাতাসকে আর কি কি শব্দে বোঝান যায় বল দেখি? অন্তত আর গোটা চারেক শব্দের নাম কর।

একটি ছেলে বলল, বায়ু, পবন।

আর একটি বলল, সমীর।

এরপর সারা পাঠশালার ছেলেদের মুখে ফুটে উঠল শুধু ভাবনারই ছবি। সমাধান আর হল না।

তখন সীমা বলল, চারের নম্বরের নামটা হল গন্ধবহ। বাইরে ফুল ফুটলে কে গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে আমাদের কাছে?

ছেলেরা বলল, বাতাস।

সীমা বলল, তাই বাতাসের আর এক নাম গন্ধবহ। আচ্ছা বল তো, বর্ষাকালে যে বাতাস মেঘ বৃষ্টি বয়ে আনে তাকে কি বাতাস বলে?

একজন বলল, মৌসুমী বাতাস।

আর একজন বলল, ওই যে 'মৌসুমী' বসে আছে ওখানে।

মৌসুমী মেয়েটি ওদের ক্লাসে পড়ে।

ছেলেরা 'মৌসুমী বাতাস', 'আমাদের মৌসুমী বাতাস' বলে মনের আনন্দে যত চেঁচাতে লাগল, মেয়েটি তত কাঁদো কাঁদো মুখ করে তাকাতে লাগল চারদিকে।

একজন বলল, ওই দ্যাখ মৌসুমীর চোখে বৃষ্টি নামছে রে।

সবাই চেঁচাতে লাগল বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি বলে।

মেয়েটি হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সীমা উঠে গিয়ে মেয়েটিকে নিজের কাছে টেনে নিল। তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। কেন বিনা দোষে মৌসুমীকে এমন করে কাঁদালে!

ছেলেরা একেবারে চুপ।

সীমা বলল, সবাই বাইরে গিয়ে সবজিক্ষেতে জল দেওয়ার কাজ কিংবা অন্য কিছু করোগে।

মৌসুমী ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল। সীমা বলল, আধঘণ্টার ভেতর চলে এসো কিন্তু।

সবাই চলে গেলে সীমা মৌসুমীকে বলল, তুমি রাগ করছিলে কেন বোকা মেয়ে। বলতে পারলে না ওদের যে মৌসুমীর বৃষ্টি নইলে মাঠে চাষ হবে কি করে? ধান না হলে খাবে কি তোমরা? তাহলে দেখতে সবাই কেমন জব্দ হয়ে যেত।

বুদ্ধিটা পেয়ে মৌসুমী খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণের ভেতর একটি ছেলে ফিরে এল। হাতে তার পলাশফুলের একটি ডাল। সীমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খুব ভাল ফুল আছে এতে।

সীমা দেখল সেদিনের সেই ছেলেটি, যে তাকে ফুল দিয়ে এসেছিল। সীমা কপট ক্রোধে বলল, কে তোমাকে ফুল আনতে বলল!

আপনি ফুল ভালবাসেন বলেছিলেন সেদিন, তাই আনলাম। অনেক উঁচু ডালের থেকে পেড়ে এনেছি।

সীমা বলল, যদি অত উঁচু ডালে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে?

ছেলেটি বোধহয় এরকম কথা কোনদিন শোনেনি। অবাক হওয়ার পালা তার, পড়ব কেন, ডাল ধরে গাছে উঠলে আবার কেউ পড়ে নাকি?

সীমাকে স্বীকার করতেই হল যে গাছ বেয়ে উঠলে বাস্তবিকই কারও পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। অন্ততঃ মুখ চোখে তেমনি ভাবই ফোটাতে হল সীমাকে। সে হাত বাড়িয়ে তার কাছ থেকে সেই ফুলে ভরা ডালটা নিয়ে মৌসুমীর হাতে দিয়ে বলল, নাও, এটা তোমাকে দিলাম।

এমনি পড়া পড়া খেলার ভেতর দিয়ে কোথা দিয়ে কেটে গেল দিনটা। বেলাশেষে ছেলেরা নদীর তীর ধরে চলে গেল গাঁয়ের দিকে। সীমা তাকিয়ে রইল ওদের চলে যাবার পথের দিকে। তার শুধু মনে হতে লাগল, এই মুক্তি কি পায় শহরের ছেলেরা তাদের ইস্কুল, কলেজ, পাঠশালায়।

রোববার এল। সুপ্রকাশের দেখা নেই। সকালে সীমা দেখল নদী পেরিয়ে দলে দলে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ আসছে তাদের আস্তানার দিকে। তারা এসে ভিড় করল পাঠশালার উঠোনে। দিবাকর মিশ্র ঘর থেকে বেরোতেই ওরা প্রণাম করল।

বল্, কেমন আছিস সব।

ভাল নয়, বাবামশয়।

কেন রে, কি হল তোদের?

ওদের হয়ে সর্দার মুংরাই কথা বলল, কি কইরে ভাল থাইকব। সাহেবের হুকুম জারি হইয়েছে এবার মেলায় যে আসবে তার কাজে জবাব হইয়ে যাবে।

দিবাকর মিশ্র বললেন, মেলা তো একটা আনন্দের ব্যাপার। ক'দিন ছেলেমেয়ে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াস, তীর ছোঁড়ার খেলায় মাতিস, তাতে সাহেবের রাগের কি কারণ হল?

মুংরা বলল, বুঝলি নাই, হিংসায় জ্বলিয়ে মরছে। এত বড় মেলা আমাদের রাজাভাই বানাইল, আর ও কিছু বানাইতে পারল নাই।

ওকে তো কেউ বারণ করেনি মুংরা। ও যদি ভাল কিছু করে তাহলে সীতাপুর গাঁয়ের চাষাভুষো সবাই তাতে যোগ দেবে।

মুংরা বলল, ওর আরও রাগ আছে বাবামশয়। আমাদের ছেইলাগুলান তোর পাঠশালায় পড়ছে। কথা বুইলতে শিখছে, হিসাব শিখছে, এই উয়াদের রাগ।

দিবাকর মিশ্র বললেন, ওরা তো একটা পাঠশালা খুললে পারে।

মুংরা বলল, সে তো তুই জানিস বাবামশয়। আমাদের মতন ছেইলেগুলান হিসাব শিখবে নাই, কিতাব পড়বে নাই, তবে ত উয়াদের সুবিধা হবে। ঠগবাজি করবে উয়ার চেলাগুলান। পড়ালিখা শিখলে উয়াদের যে জুয়াচুরি চলবে নাই।

দিবাকর মিশ্র বললেন, এখন তাহলে তোরা কি ঠিক করলি, মেলায় আসবি না আসবি না?

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, আলবৎ আসব। কেন আসব নাই।

দিবাকর মিশ্র বললেন, কাজ যাবে তোদের সেকথা ভেবে দেখেছিস? বউ ছেলে নিয়ে যাবি কোথায়?

নোকরি যায় তুর পায়ে আইসে পড়ব। তবু উয়ার কথা শুনতে পারব নাই।

দিবাকর মিশ্র একটু ধমকের সুরেই বললেন, ছেলেমানুষি করিসনে মুংরা। তোরা কাজ করছিস ওখানে। এখুনি চাকরি গেলে এতগুলো লোকে খাবি কি। ছেলে বাচ্চাগুলোর মুখেই বা কি দিবি। তার চেয়ে সাহেবের কথা শুনে এ বছর সামলে থাক। ধীরে ধীরে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

তু তো এমনি কথা বলবি।

না রে মুংরা, তোদের রাজাভাই বলে, তোদের ছেলেগুলো যখন লেখাপড়া শিখে কাজ করতে যাবে তখন ভেঙে দেবে ওদের বিষদাঁতগুলো। ঠিক ঠিক কাজ করবে আর ঠিক ঠিক পাওনা আদায় করে নেবে।

দু'একজন বলল, হুঁ. ঠিক, ঠিক কথা কইছে আমাদের রাজাভাই।

ক'টি মেয়ে এসেছিল ওদের সঙ্গে। তাদের একজন বলল, মরদগুলানের কথা বাদ দাও, আমরা মেয়েছেইলা কাচ্চাবাচ্চা লিয়ে মেলায় আইসব। বড়ঠাকুর তু আমাদের বাধা দিবি নাই।

দিবাকর মিশ্র বললেন, তোরা যদি আসিস আমি বাধা দিতে যাব কেন বল? তোদের সকলের জন্যেই তো মেলার ব্যবস্থা। তবে বুঝে সুঝে কাজ করিস, এই আমার কথা।

ওরা নিজেদের ভেতর কিসব বলাবলি করল, তারপর নমস্কার করে চলে গেল আস্তানার দিকে।

বিকেলে বেলা পড়ে এলে একটি মেয়ে এল সীতাপুর গাঁ থেকে। দিবাকর মিশ্রের ঘরে ঢুকে কি যেন বলল। দিবাকর মিশ্র সীমাকে ডেকে বললেন, এই যে মা তোমার ডাক এসেছে সুপ্রকাশের কাছ থেকে। তুমি আজ ওই গাঁয়েই থাকবে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

সীমা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল মেয়েটির সঙ্গে।

পথে যেতে যেতে কথা হচ্ছিল।

সীমা জিজ্ঞেস করল, কি নাম ভাই তোমার?

গৌরী।

সীতাপুর গ্রামেই তোমার বাড়ি?

না দিদি, আমার বাড়ি তিন চারখানা গাঁয়ের ওপারে অক্ষয়বট গাঁয়ে। আমার মামার বাড়ি সীতাপুরে।

এখানে বেড়াতে এসেছ বুঝি?

না, আমি এখানেই থাকি। সীতাপুর ইস্কুলে পড়ি।

সীতাপুরে ইস্কুল আছে বুঝি?

হাঁ, দুটো ইস্কুল। একটা মেয়েদের, আর একটা ছেলেদের।

সীমা অন্য কথায় গেল, তোমাদের এখানে মেলা হবে বলে শুনছি?

হাঁ, মেলা হবে। খুব বড় মেলা। অনেক লোক আসে নানা জায়গা থেকে। কত যাত্রা, কবিগানের আসর বসে। পুতুলনাচ, সার্কাস—সে এক এলাহী ব্যাপার।

তোমরা খুব মজা কর নিশ্চয়ই।

মেয়েটি বলল, মজা হয় খুব, তবে সুপ্রকাশদা আমাদের ওপর অনেক কাজের ভার দিয়েছেন।

সীমা কৌতুক করে বলল, তাহলে তো তোমাদের মজা ষোল আনা হল না ভাই।

মেয়েটি উৎসাহের সঙ্গে বলল, বাইরের কত লোক আসেন আমাদের গাঁয়ে। তাঁরা খুশি হয়ে ফিরলে আমাদের কত আনন্দ হয় বলুন দেখি। তাছাড়া আমরা গাঁয়ের তৈরী জিনিস স্টলে সাজিয়ে বিক্রি করি। সে যে কি মজা তা আর কি বলব।

সীমা বলল, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাজ করব ভাই।

করবেন বৈকি। সুপ্রকাশদার কাছে কারও রেহাই নেই। সারা গাঁয়ের ছেলে বউ ঝি সবাই কাজে লেগে যায়। জানেন, মেলার সাত দিন কোন বাড়িতে রান্না হয় না। গ্রামের সকলে মিলে ইস্কুলবাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে।

সীমা মনে মনে ভীষণ খুশি হল।

উত্তর দিক থেকে নদীর তীর বরাবর একটা বড় বাঁধ এসে গাঁয়ের ভেতর ঢুকে গেছে। সীমা দেখল সেই বাঁধের ওপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে আসছে পাল পাল গরু আর মোষ। রাখাল ছেলেরা তাদের আগে পাছে চলেছে। সীমার মনে হল, এ যেন এক শোভাযাত্রা। একেবারে রাস্তা জুড়ে তারা ফিরছে গাঁয়ের দিকে। ওরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে গিয়ে ওদের চলে যাওয়ার পথ করে দিলে। কয়েকটা রাখাল শুয়ে ছিল মোষগুলোর পিঠের ওপর। তারা তাদের বয়ে নিয়ে চলেছে। একটি ছেলে মোষের পিঠে বসে বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলেছে। সীমার মনে হল, এ যেন এক অন্য জগৎ, ভিন্ন জীবন। গোধূলির আকাশ শেষ সূর্যের গলানো সোনায়, গরুর খুরের ধূলিতে আর উর্ধ্বমুখী তালগাছগুলোর পাতার আন্দোলনে এক মহান দৃশ্য মেলে ধরল সীমার চোখের ওপর। সে মনে মনে তার প্রাণের ঈশ্বরকে নমস্কার জানাল।

মেয়েটি সীমাকে নিয়ে যেখানে এল, সেখানে আগেই অনেক মেয়ে এসে জমায়েত হয়েছিল। সুপ্রকাশ বসে ছিল সেখানে। কি যেন আলোচনা চলছিল তাদের ভেতর। সীমা এসে পৌঁছলে ওদের আলোচনা থেমে গেল।

সুপ্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইনি আমাদের নতুন কর্মী সীমা। বাবামশায়ের ইচ্ছে, এবার আমাদের মেয়েমহলের কাজের পুরো দায়িত্ব এঁরই ওপর দেওয়া হোক।

মেয়েরা খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল। তাদের মধ্যে একজন উঠে বলল, আমরা আমাদের ভেতর নতুন মানুষটিকে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আমরা সকলেই বাবামশায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী ওঁর নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলব।

এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় সীমা বুঝি কখনও পড়েনি। সীমা সবাইকে নমস্কার করল। তারপর বলল, আমি আপনাদের প্রীতির আশ্রয়ে এসেছি, সুতরাং আপনাদের দেওয়া দায়িত্ব আমি আমার সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা করব। পরিচালনা করবার বা নির্দেশ দেবার যোগ্যতা আমার নেই। আমরা সবাই সহযোগিতার ভেতর দিয়ে কাজ করব। আমি একেবারে নতুন, আপনারা এ কাজে অভিজ্ঞ, তাই আমার ভুল ত্রুটি ঘটলে আপনারা শুধরে নেবেন। আজ আপনাদের ভেতর এসে মনে হচ্ছে, আপনারা আমার অনেকদিনের পরিচিত। আপনারা আমাকে আপনাদের সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত বলে মনে করলে আমার আনন্দ আর তৃপ্তির শেষ থাকবে না।

সীমা কথাগুলো বলে বসে পড়ল। মেয়েগুলি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সীমাকে ঘিরে বসে আলাপ করতে লাগল।

মেলার পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথাই আলোচনা করল সুপ্রকাশ। তারপর একসময় উঠে পড়ল।

চলুন, আপনাকে আমাদের কয়েকটা কাজকর্মের জায়গা ঘুরিয়ে দেখাই।

সীমা বেরিয়ে গেল সুপ্রকাশের সঙ্গে। আকাশে চাঁদের পূর্ণতা এসেছে। চতুর্দশীর চাঁদ ভৃঙ্গার থেকে যেন সাদা দুধ ঢেলে দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। পথঘাট, ঘরবাড়ি, গাছপালা সবই রাতের বেলাতেও দৃশ্যমান।

সুপ্রকাশ চলতে চলতে বলল, আপনি যে এতখানি কাজের মানুষ, তা কিন্তু আমি আগে বুঝতেই পারিনি।

সীমা অবাক হয়ে বলল, কি রকম?

এই যে আপনাকে পরিচালিকার পদটি দেওয়ামাত্র আপনি কোন ওজর আপত্তি না দেখিয়েই গ্রহণ করে ফেললেন।

সীমা বলল, সত্যি বলছি, আপনি এতখানি বিপদে ফেলবেন জানলে আমি আজ কিছুতেই এমুখো হতাম না।

সুপ্রকাশ বলল, সাঁতার কাটতে যখন জানেন, তখন এটাও জানেন যে সাঁতার শেখার প্রথম দিকে যিনি শেখান তিনি জলের মধ্যে ঠেলে দেন। প্রথমটা ভীষণ কষ্ট হয়। কিন্তু পরিণামে ওতেই কাজ হয়।

সীমা হাসল, বলল, আপনি শিক্ষার্থীকে ধারেকাছে রেখে আগে হাত পা-টাও চালাতে শেখালেন না, একেবারে ডুবজলে ছুঁড়ে দিলেন। চেষ্টা করব উঠতে, না পারলে গুরুই ধরে ওঠাবেন।

এবার হাসির পালা সুপ্রকাশের।

ওরা কথা বলতে বলতে এসে দাঁড়াল একটি লম্বা ঘরের সামনে। ভেতরে হেজাকের আলো জ্বলছে। ঠকাঠক মাকু চলছে। সঙ্গে সঙ্গে গান।

ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে গানটা শুনল। গান শেষ হলে সীমাকে নিয়ে সুপ্রকাশ ঢুকল ভেতরে।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, এই যে আমাদের রাজাভাই এসেছে।

সুপ্রকাশ হাসতে হাসতে বলল, ভাল গান বেঁধেছ দেখছি। গানটা লিখল কে?

সিধু মাস্টার।

সুর দিল কে?

সুধা দি।

গাইল কে?

আমরা গো, আমরা সবাই।

সুপ্রকাশ হাসতে হাসতে বলল, এই তোমাদের গাঁয়ের নতুন মানুষ। গ্রামকে ভালবেসে শহর কলকাতা ছেড়ে এসেছেন। আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন।

ওরা নমস্কার করল। সীমা হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করল ওদের। একজন বলল, তুমি খাঁটি জহুরি রাজাভাই, দামী হীরে চেনা তোমার পক্ষে শক্ত কি।

ওরা সমস্ত তাঁত বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখল। সীমা তো অবাক। এত সুন্দর ডিজাইনের কাপড়ও তৈরি হয় এখানে।

সীমা বলল, সত্যি কাপড়ের জমি আর ডিজাইন দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে এত দূরের একটা গাঁয়েও এসব তৈরি হচ্ছে।

সুপ্রকাশ বলল, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই এসব করেছে। দেশবিদেশের ডিজাইন বই দেখে আমাদের গাঁয়ের পাশকরা শিল্পী ছেলেরা এসব নতুন নতুন ডিজাইন বের করেছে। পুরনোদিনের বালুচরী শাড়ি, শবনম মসলিন থেকে আটপৌরে সাধারণ শাড়ি পর্যন্ত এখানে এইসব শিল্পীরা তৈরি করছে।

সীমা বলল, মসলিন প্রভৃতি শাড়ি আজ তো দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে বললেই হয়। তেমন কারিগর কি এখনও আছে?

সুপ্রকাশ বলল, হয়ত তত সূক্ষ্মকাজের কারিগর নেই, কিন্তু এরা যা করছে তাতে অনেকেই অবাক না হয়ে পারেন না। আসল কথা কাজে যদি প্রাণ থাকে তাহলে কাজটা নিখুঁত হতে দেরি লাগে না।

ওরা কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

সুপ্রকাশ বলল, এইসব ছেলেদের অনেকেই বিদেশ থেকে ঘুরে এসেছে। দেশবিদেশের নানা জিনিস ওরা চোখে দেখে, হাতে কলমে শিখে তবে এসেছে এ গাঁয়ে। এদের এক একজন অনেক টাকার মাইনেতে ঢুকে যেতে পারত কোন বড় চাকরিতে, কিন্তু তা ওরা করেনি। ওদেরও সামনে একটা আদর্শ আছে। চাকরিতে বসে শুধু পদোন্নতি কি করে হয় সে কথা ভাবলে দেশকে কিছু দেওয়া যায় না। এই বিশ্বাস নিয়েই ওরা কাজ করছে।

সীমা বলল, আজকের দুনিয়ায় এ কথা ভাবলেও অবাক লাগে।

এবার ওরা এসে পৌঁছল আর একখানা ঘরের পাশে। সেখানে নানারকমের হাতের কাজ চলছিল। কেউ শোলা দিয়ে তৈরি করছিল কৃষ্ণরাধার মূর্তি। কাংড়া পেন্টিং-এর অনুসরণে। তার চারদিকে অবশ্য

কল্কা আর ময়ূরের বেষ্টনী দিয়ে নতুন পুরাতন রীতির মিলন ঘটান হচ্ছিল। কোথাও তৈরি হচ্ছিল সফ্‌ট্‌ স্টোনের মূর্তি। কোনারক, ভুবনেশ্বরের মূর্তির অনুকরণে শিল্পী তৈরি করছিলেন মূর্তিগুলি।

সুপ্রকাশ বলল, এরা ওড়িশাতে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ শিখে এসেছে। একটি মূর্তি হাতে তুলে বলল, দেখুন তো দেখি ওই বই-এর ফটোর সঙ্গে এর মিল আছে কিনা?

এমন নিখুঁত কাজ সত্যিই সীমা দেখেনি।

সে বলল, আমি ভাবতেও পারছি না, এখানে কি করে এ দক্ষতা পেলেন এঁরা।

সুপ্রকাশ হেসে বলল, তাহলে রঙরেজিনীর গল্প বলতে হয়। একদিন বাদশা দেখলেন তাঁর উজির বড় সুন্দর রঙে পাগড়িখানা রাঙিয়ে এসেছেন। বাদশার ভারি পছন্দ হয়ে গেল। তিনি বললেন ওহে উজির, তুমি এ পাগড়ি রাঙালে কোথায়? উজির বললেন, জাঁহাপনা, আমার বিবিসাহেবা এ কাজ করে দিয়েছেন।

বাদশা তখন খুশি হয়ে বললেন, তাহলে আমার জন্যেও এমনি একখানা রাঙিয়ে এনো।

কয়েকদিন পরে উজির নিয়ে এলেন একখানা পাগড়ি রাঙিয়ে। কিন্তু বাদশার পছন্দ হল না। এ রঙ উজিরের পাগড়ির রঙের চেয়ে নিরেস বলেই তাঁর মনে হল।

তখন একটার পর একটা পাগড়ি রাঙিয়ে নিয়ে আসতে লাগলেন উজির বাদশার কাছে। কিন্তু বাদশা শুধু মাথা নেড়ে নেড়ে জানাতে লাগলেন, হল না, এ ঠিক হল না।

শেষে একদিন বাদশা তলব করলেন উজিরের বিবিকে। উজির সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁকে।

বাদশা বললেন, আচ্ছা আপনি তো একই রঙ গুলে পাগড়ি রাঙিয়েছেন, কিন্তু উজিরেরটি যেমন হয়েছে, আর কোনটি তেমন হচ্ছে না কেন? বিবিসাহেবা বললেন, জাঁহাপনা, সব পাগড়িই আমি একই রঙে ছুপিয়েছি ঠিক, কিন্তু আপনার উজিরের পাগড়িতে আর একটা বেশি রঙ পড়েছে।

বাদশা অমনি বললেন, কি সে রঙ?

বিবি হেসে বললেন, জাঁহাপনা, সে রঙ আমার দিলের—অনুরাগের। তা ওই উজিরের পাগড়িতে ছাড়া আর কোথায় ঢালব বলুন।

সুপ্রকাশ হেসে বলল, এদের কাজে সেই দিলের রঙ লেগে এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে সবকিছু।

একজন বলল, সে রঙ হয়ত সবার মনেই ছিল, তবে তাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে শিখিয়েছ তুমিই রাজাভাই।

সেখান থেকে ওরা পথে নামল। চলতে চলতে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুপ্রকাশ। হঠাৎ কি মনে হতেই উঠে পড়ল ওই বাড়ির দাওয়ায়।

হাসি? হাসি আছিস নাকি রে?

ভেতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। বছর ষোল সতের বয়স হবে।

হাসি এসেই কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এই তোমার নারকোল মুড়ি খেতে আসার সময় হল। সেই পরশু সকালে হেঁকে বলে গেলে, আমি এখুনি আসছি, মুড়ি নারকোল রেডি রাখিস। তারপর আর দাদাসাহেবের দেখাই নেই। ভারি বয়ে গেছে আমার তোমাকে খাওয়াতে। দেখো আর কখ্‌খনো যদি তোমার হাতে কিছু তুলে দিই।

হাসির গলাটা সত্যিই ভারি হয়ে এল।

সুপ্রকাশ বলল, কে যে তোর হাসি নামটা রেখেছিল তাই ভাবি, তোর নাম কান্না, নয়ত অশ্রু হওয়াই উচিত ছিল।

হাসি এবার সতিাই হেসে ফেলল, তুমি মনে করেছ, এমন করে হাসিয়ে দিয়ে তুমি আমার রাগ কেড়ে নেবে।

সুপ্রকাশ অমনি বলে উঠল, তোর রাগ কেড়ে নেব কি রে, রাগলেই তো তোকে ভাল দেখায়।

আবার হাসল হাসি।

সুপ্রকাশ বলল, এই তো, একেবারে পূর্ণিমার শশিমুখী! দে, এখন কিছু খেতে দে।

তারপর হঠাৎ সীমার কথা মনে পড়ে গেল। অমনি সুপ্রকাশ বলল, হাঁ শোন হাসি, যিনি ওই দাঁড়িয়ে আছেন পথে, তিনি আমাদের মহিলা সমিতির নতুন পরিচালিকা নিযুক্ত হয়েছেন। বাবামশায়ের নির্বাচন।

হাসি বলল, তুমি তো ভারি স্বার্থপর। নতুন মানুষকে নিজে আগলে বেড়াচ্ছ। সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে আসবে তো।

বলতে বলতে হাসি পথে বেরিয়ে গিয়ে সীমাকে নমস্কার করে বলল, দেখুন তো দিদি, সুপ্রকাশদার কাণ্ডখানা, আপনাকে পথে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে গল্পে মত্ত হয়ে গেছেন।

সীমা বলল, না না তাতে কি হয়েছে। আমার তো কোন কষ্ট হচ্ছে না। বেশ লাগছে।

আপনার হয়ত ভাল লাগছে, কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমার ঘরের সামনে এসে আপনি বাইরে দাড়িয়ে থাকবেন, এ কি করে হয়।

অগত্যা সীমা হাসির ঘরে গিয়ে উঠল।

সুপ্রকাশ বলল, হাসি, ইনি হলেন সীমা।

তারপর সীমার দিকে ফিরে বলল, আর উনি যে হাসি তা ওঁর হাসি হাসি মুখখানা দেখেই বুঝতে পারছেন।

সীমা আর হাসি দুজনেই হেসে উঠল।

হাসি সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন বল কি খাবে?

সুপ্রকাশ বলল, হাসি, ইনি আজ রাত থেকে মেলা না ফুরনো পর্যন্ত তোর এখানেই থাকবেন। ওঁকে নিয়ে আমি একটু পরেই ফিরে আসছি। তুই খাবার যোগাড় করে রাখ, আমিও খেয়ে যাব।

হাসি বলল, কি ভাল লাগছে আমার। একা একা ছিলাম, সঙ্গী পাওয়া গেল। তুমি কি ভাল সুপ্রকাশদা। আজ আমি তোমার প্রিয় খাদ্য ছানার ডালনা রেঁধে খাওয়াব।

সুপ্রকাশ পথে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, বেশি লোভ দেখাসনে, হয়ত কাজকর্ম ভুলে এখানেই থেকে যাব।

সীমা গ্রামখানা ঘুরে ঘুরে অনেককিছুই দেখল। দিনরাত গ্রামের ছেলে মেয়ে বুড়ো সবাই মিলে আগামী মেলার জন্যে কাজ করে চলেছে। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। সবচেয়ে বড় কথা, কোন কাজকে ছোট বলে কেউ অবজ্ঞা করছে না, অসম্পূর্ণ অবস্থায় দূরে সরিয়ে রাখছে না। গান উঠেছে আকাশে বাতাসে।

'মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলাভাষা
মাগো তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা।
কি যাদু বাংলা গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।'

সীমা মনে মনে অনুভব করল, এ এক পরিপূর্ণতার জগতে সে এসে পড়েছে।

পরের দিন ভোরে সীমা দেখল, নদী থেকে খাল কেটে নিয়ে আসা হয়েছে গ্রামের ভেতর, আর সেই খালের থেকে জল তুলে চাষ হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল ধান আর নানারকম সবজির। সুপ্রকাশ বলল, এ সমস্ত জমি জায়গা, এর উৎপন্ন ফসল সব গ্রামবাসীদের। তারা জমির ভেতর ছোট ছোট আলের সীমা ভেঙে দিয়ে নিজেদের ভেতরের বিভেদ ঘুচিয়ে ফেলেছে। এ জমি ট্র্যাক্টরেই চাষ হয়।

সীমা বলল, চাষের পর ফসলের ভাগ যে যার জমির পরিমাণ অনুযায়ী নেয় নিশ্চয়।

সুপ্রকাশ বলল, তা কেন হবে। ফসলের কমবেশি ভাগ হয়, প্রতি বাড়ির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। তাছাড়া এ গ্রাম আগে ছিল বাবামশায়ের জমিদারি। ওঁর জমিই ছিল বেশি। বাকি যাদের জমি জায়গা ছিল, উনি তাদের অন্য গ্রামে বদলি জমি দিয়ে, কাউকে বা নগদ টাকা দিয়ে এ গ্রামখানা একেবারে নিজের করে নেন। তারপর পড়াশোনা শেষ করে যখন ফিরে এলাম, তখন তিনি বললেন, এ গ্রামখানা আমার বড় প্রিয়। তোমার হাতে একে তুলে দিচ্ছি। তুমি মনের মত করে একে গড়ে তোল। তোমার লেখাপড়ার শক্তিতে তুমি হয়ত চাকরি বা ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে, কিন্তু অনেক শান্তি এই গ্রামের ছায়ায় লুকিয়ে আছে, তুমি তার খোঁজ কর, এই আমার ইচ্ছে।

সুপ্রকাশ বলল, আজ যে গ্রামখানাকে গড়ে উঠতে দেখছেন, এ তাঁরই ইচ্ছার রূপ। আমি এ গ্রাম সমস্ত গ্রামবাসীকেই দান করেছি। এ এখন সকলের সম্পত্তি।

সীমা বলল, ভারতের প্রতি গ্রাম যদি এমন হত তাহলে হয়ত মানুষে মানুষে অনেক বিভেদ ঘুচে যেত।

সুপ্রকাশ বলল, আমার স্বপ্ন ঠিক তাই জানবেন। তবে এ কাজ একার দ্বারা হয় না। দেশের সরকার যদি হাতে তুলে নেন এ কাজ তাহলেই কেবল তা সম্ভব। অবশ্য লাল ফিতার বাঁধনের ভেতর শুধু পরিকল্পনার পর পরিকল্পনার স্তূপ জমিয়ে তুলে কোন লাভই হবে না।

পড়ন্তবেলায় আবার বেরল সুপ্রকাশ আর সীমা। নদীর ওপর একটি কাঠের সাঁকো। কয়েকখানা নৌকোয় মাল বোঝাই হচ্ছিল। সুপ্রকাশ সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে হেঁকে বলল, মোহনদা, শনিবারের ভেতর ফিরে আসা চাই কিন্তু। মাদারপুর থেকে কবিগানের লোকজনকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে ভুল হয় না যেন।

মাঝি মোহন পাল হেঁকে বলল, সে কথা ভুললে ছেলেছোকরার দল আমাকে কি আর আস্ত রাখবে দাদাভাই।

সাঁকো পেরিয়ে সুপ্রকাশ চলল ওপারে। এদিকে আদিবাসী পল্লী। ছোট ছোট চালাঘর। মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। একদল হাঁস। প্যাকপ্যাক করতে করতে পাশের কোন একটা জলা জায়গা থেকে উঠে এল। দুটো ছাগলছানা ভয় পেয়ে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। তাদের ঘিরে কালো একটা পোষা কুকুর দৌড়োদৌড়ি আর লম্ফঝম্প করছে।

সুপ্রকাশ একটা চালার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁকল, ঝুম্‌রী ঘরে আছিস?

একটি বুড়ি বেরিয়ে এল ঘরের ভেতর থেকে। কপালে বাঁ হাতখানার আড়াল দিয়ে আগন্তুককে দেখার চেষ্টা করল।

অনেকক্ষণ পরে যেন ঠাওর করে বলল, কে, ছোটঠাকুব না?

হাঁ, আমি। তা তুমি আছ কেমন?

আর থাকব কি, বুড়া হইয়েছি, নজর চলে নাই।

সুপ্রকাশ বলল, যেও একদিন ঝুম্‌রীকে নিয়ে আমাদের হাসপাতালে। মনে হচ্ছে ছানি পড়েছে চোখে। কাটাতে হবে।

বুড়ি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, দোহাই ছোটঠাকুর, কাটাতে পারব নাই। একেবারে অন্ধ হইয়ে যাব।

অন্ধ হয়ে গেলে ভয় নেই, আমি তোমাব হাত ধবে পথে পথে ঘোরাব।

তু বড় ভাল লোক আছিস ছোটঠাকুর, তোর খুব দয়া আছে।

এবার সুপ্রকাশ বলল, ঝুম্‌রী কোথা, আমাকে দেখে পেছনেব দরজা দিয়ে পালাল নাকি?

একটা খিলখিল হাসির আওয়াজ এল ঘরেব ভেতর থেকে।

পালাইব কেনে। তু কি শের আছিস, তু তো ছোটঠাকুর আছিস।

সুপ্রকাশ বলল, বেরিয়ে আয় একবার, শের কি ঠাকুর দেখে যা। ঠিক ধরেছি, এখনও চাটাই তৈরি হয়নি, তাই লুকনো হচ্ছে।

ঘরের ভেতর থেকে একগোছা তালপাতায় বোনা চাটাই তুলে এনে সুপ্রকাশের সামনে ফেলে দিয়ে ঝুম্‌রী কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

বুনি নাই। দ্যাখ কত্‌তো চাটাই বুইনেছি।

এই ক'খানা বুনে আবার বীরত্ব হচ্ছে। আমার কিন্তু শুক্কুরবাবের ভেতর চাই। না পেলে তোর ঐ দাঁতক'টা ভেঙে দেব। দেখবি তখন আর চুরি করে শক্ত পেয়ারাগুলো চিবিয়ে খেতে পারবিনে।

খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুম্‌রী, তু আমার দাঁত ভেইঙে দিবি রাজাভাই। আমার মরদ কি বইলবে।

তোর ভাঙা দাঁত দেখলে গুরাং তোর মাথাটাই ভেঙে ফেলবে।

ঝুম্‌রী অঙ্গভঙ্গি করে হাত নেড়ে বলল, যাঃ, তাহলে ল্যাঠা একেবারে চুকিয়ে যাবে।

সুপ্রকাশ আর সীমা হাসতে হাসতে চলল এগিয়ে। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে উঠেছিল। এদিকে কয়েকটা পলাশগাছ। পাতা নেই, শুধু ডালের কোলে কে যেন আটকে রেখে গেছে লাল লাল ফুল। সুপ্রকাশ হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, কে ওখানে?

আমি ছোটঠাকুর।

কে তুই, বলবি তো?

শনিচারী।

ভর সাঁঝে কি করছিস ওখানে, এদিকে আয়। শনিচারী সুপ্রকাশের ডাকে কাছে এল। ওরা দেখল শনিচারী তেল দিয়ে মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ে বেঁধেছে। কালো খোঁপায় পলাশফুল গোঁজা।

কিরে খুব সেজেগুজে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?

মরদের লেইগে!

খুব ভাল, বুধনের আসার সময় হল।

একটু থেমে সুপ্রকাশ বলল, হাঁরে, ওদের তো শুনেছি ওভারটাইম চলছে। ও এত তাড়াতাড়ি আসবে কেন?

ওকে বাড়তি কাম দিবে নাই।

কেন, কি হল আবার ওর?

ও সাহেবের সামনে বুইলেছে, ও মেলায় যাবে। তাই সাহেব গোসা কইরেছে। চাকরি খতম হইয়ে যেত, মুংরা সাহেবের কাছে ওর হইয়ে মাপি চাইয়েছে।

সুপ্রকাশ বিরক্ত হয়ে বলল, বাবামশায় তো বারণ করেছেন তোদের মেলায় আসতে। মিছিমিছি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে কেন বুধন।

ও মানবেক নাই। ও বলে, আমি বাড়তি কাম করব নাই।

তোদের জ্বালায় পারা গেল না দেখছি। হাঁ শোন, বুধনকে বুঝিয়ে বলিস, মেলায় এবার না এলেও টাকা ঠিক পাবি তোরা। এইখানে তীর ছোঁড়ার খেলা খেলতে বলিস।

সে আমি বইলব কেমন কইরে। ও মরদ আমাকে মানবেক না।

সুপ্রকাশ বলল, তোর গায়ে জোর নাই? মেরে মানাবি।

শনিচারী হেসে অস্থির। বলল, তু মারলে ও কুছু বলবে নাই। আমি মারলে দু'খান কইরে নদীতে ভাসাইবে।

বুধনকে আমার নাম করে বলিস, ও যেন গোলমাল না করে।

ওরা এবার ফিরল গাঁয়ের দিকে।

সুপ্রকাশ বলল, এইসব সাধারণ মানুষ, মেলায় এসে একটু আনন্দ করে, তীর ছোঁড়ার খেলায় অংশ নেয়, তাতে মালিকের ক্ষতি কোথায় তা বুঝতে পারি না। কাজের ভেতর আনন্দ না ছড়ালে কাজ যে মানুষের কাছে ভার হয়ে উঠবে।

সীমা বলল, ওরা চিরাচরিত প্রথায় কাজ করে যায়, ওতেই অভ্যেস। কাজের ভেতর আনন্দকে ওরা মনে করে অনাসৃষ্টি। আজকের দিনের মালিকরা রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীর মাঝখানে বাস করছে। বাইরের একটু আলোয় ওদের চোখ বুজে আসে, একটু মুক্ত হাওয়ায় বন্ধ হয়ে আসে ওদের দম।

সুপ্রকাশ বলল, ভারি সুন্দর বলেছেন আপনি। আমার কি মনে হয় জানেন. কৃষি আর শিল্প, দুটো নিয়েই আমাদের দেশের উন্নতি। কাউকে ছেড়ে কেউ এগিয়ে চলবে না। পাশাপাশি চলবে, নির্বিরোধে। শুধু বদলে দিতে হবে পুরনো ধারাগুলো। শাসন আর শোষণ থাকলেই তার সঙ্গে থাকবে পতনও।

এ কথা ওরা বোঝে না কেন?

হাসল সুপ্রকাশ। বলল, এত সহজে বুঝলে ওদের যে সব চলে যাবে। ক্ষমতার যে নেশায় ওদের পেয়ে বসেছে, সে নেশা আছে তার চেয়ে অনেক বড়।

সীমা বলল, আজকের দুনিয়ায় রোজই ওরা আঘাত পাচ্ছে, অশান্তির কাঁটায় বিঁধছে সারা শরীর তবু হুঁশ নেই।

সুপ্রকাশ বলল, শিকারি যারা, তারা বিপদের ঝুঁকি নিতেই ভালবাসে। শিকার তাদের নেশা। ওরা এ দুনিয়ার দুরন্ত শিকারি। এক দল পশুকে হত্যা করছে, অন্য দল মানুষকে।

ওদের কি সুবুদ্ধি কখনো হবে না?

যার যত তাড়াতাড়ি ঐ বুদ্ধিটা আসবে, বাঁচার পথ তার ততখানিই খোলা থাকবে।

ওরা কথা বলতে বলতে এসে পড়ল গাঁয়ের ভেতর।

একটা প্রবল উন্মাদনার ভেতর দিয়ে চলল কয়েকটা দিন আর রাত। সীমা যেন কাজের মাঝে হারিয়ে ফেলল নিজেকে। মেয়েদের নানারকমের কুটির শিল্পগুলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে স্টল সাজাল। কখনো বা গানের দলের সঙ্গে বসে গান গাইল। কখনো বা বিক্রেতা মেয়েদের বুঝিয়ে বলল, এক দাম বলবে জিনিসের। আমাদের কাছে দ্বিতীয় কোন দাম নেই। এই অভ্যেসটা চালু হয়নি বলেই ক্রেতা অনবরত দাম কমাবার চেষ্টা করে, আর বিক্রেতা চেষ্টা করে তাকে ঠকাতে।

আবার বলল, যদি কোন ক্রেতা তোমার সমস্ত সাজান জিনিস নেড়ে চেড়ে কিছু না কিনেও চলে যায়, তাহলেও তুমি তার পেছনে কোনরকম মন্তব্য কর না। বরং হাত জোড় করে বলবে, দরকার হলে দয়া করে আবার আসবেন।

মেলা বসেছে। অতিথিরা বিভিন্ন শহর, গঞ্জ থেকে এসেছেন। দর্শকেরাও মিছিল করে আসছে প্রতিদিন। সীমার উন্মাদনার শেষ নেই। দলে দলে ভাগ করে ফেলেছে সে তার বাহিনী। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ওপর দেওয়া দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

সীমা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দৌড়দৌড়ি করে ফিরছে।

একসময় একটি কর্তব্যরত মেয়ের কাছে এসে সে চুপি চুপি বলছে, রাণুদিদি আসবেন তোমার জায়গায়, কিন্তু খেতে একটু দেরি হচ্ছে ভাই, তাই আসতেও দেবি হচ্ছে। বুঝতে পারছি বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেছে তোমাব। এই নাও একটা বেগুনি খেয়ে নাও।

সীমা মেয়েটির মুখে বেগুনি পুরে দিয়ে চলে গেল।

কোথাও গিয়ে বলল, ফুলপিসি, পান ছাড়া কি করে আছ গো? তোমার তো এক মিনিট পান ছাড়া চলে না।

কি করব মা। কাজ ছেড়ে যাই কি করে। মুখের ভেতরটা টক হয়ে উঠেছে। তা হোক, কাজ ফেলে তো আর পান খাওয়া যায় না।

এই নাও তোমার পান। জর্দাও এনেছি সঙ্গে।

ফুলপিসি অমনি ফুটে উঠলেন, লক্ষ্মী মেয়ে বেঁচে থাক মা। আহা, এমন করে আমাব কথা মনে রেখেছ।

সীমা সেখান থেকে সরে চলে গেল।

অতিথিদের জন্য যে আস্তানা করা হয়েছে, সেখানে গিয়ে ঢুকল সীমা। কোন কোন বিশিষ্ট অতিথি সস্ত্রীক এসেছেন মেলায়। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, তাঁদের তদারক করার জন্যে পালা করে মেয়েরা আসছে। গান-বাজনা, হাসি-গল্প সবই চলেছে সেখানে।

সীমা এসে বলল, সার্কাস কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আপনারা ইচ্ছে করলে ওখানে যেতে পারেন।

একটি অতিথি বলে উঠলেন, শহরে তো সাকার্সের অনেক খেলাই দেখেছি, এখানে আর নতুন কি দেখব?

সীমা হেসে বলল, একটা ভারি সুন্দর বিশ্বাসের খেলা দেখায় এরা। হয়ত আপনারা এ খেলা একটু ভিন্ন রকমে দেখে থাকবেন। কিন্তু বারবার দেখলেও এ খেলা পুরনো হয় না।

একটি মহিলা অতিথি বললেন, কি রকম?

সীমা বলল, পেছনে একটি বোর্ড, তার সামনে একটি মেয়ে। কিছু দূর থেকে স্বামী তার স্ত্রীর দিকে খুব ধারাল ছোরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। স্ত্রী বেরিয়ে এলে দেখা গেল ছোরা দিয়ে অবিকল একটি মেয়ে তৈরি হয়ে গেছে।

অতিথিরা বললেন, এ খেলা আমরা দেখেছি।

সীমা বলল, এরপর ওরাই গভীর বিশ্বাসের খেলাটা দেখাবে।

স্বামীর চোখ ভাল করে বেঁধে দেওয়া হল এবার। স্ত্রী গিয়ে দাঁড়াল বোর্ডের সামনে। হাতে একখানা ছোট হাতুড়ি। তাই দিয়ে নিজের শরীরের চারদিকে ঘা দিয়ে চলল, আর স্বামীটি সেই শব্দ শুনে তীক্ষ্ণধার ছোরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে, এতটুকুও ভয় নেই মনে। এতটুকুও কাঁপল না। কি আশ্চর্য নির্ভরতা!

অতিথি ভদ্রমহিলা ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, চল না দেখে আসি।

স্বামী বেচারা আর কি করেন, চললেন স্ত্রীকে খুশি করতে।

সীমা হেসে বলল, এমনি নির্ভরতা সংসার জীবনেও দরকার, কি বলেন?

ভদ্রমহিলা হেসে জবাব দিলেন, কেবল একতরফা হলেই চলবে না।

স্বামীকেও ভাবতে হবে, সংসারের সব আঘাত থেকে স্ত্রীকে অক্ষত অবস্থায় কি করে রক্ষা করা যায়।

সীমা বলল, আপনার একথা অবশ্যই মানব। পরস্পরের বিশ্বাস আর একাগ্রতা না থাকলে সংসার জীবনে বিপদ বাধা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

ওরা এসে পৌঁছল সার্কাসের তাঁবুর সামনে। সীমা ওদের বসিয়ে দিয়ে এল অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে।

ফিরে আসছিল, কানে গেল কবির গান। একজায়গায় আসর জমজমাট। কবির লড়াই চলেছে। একজন বলছে ঃ

ও ভাই, সরস্বতী গুণবতী গুণের সীমা নাই
তেনার কমল চরণ করলে শরণ ভাবনা কি আর ভাই।
বলি, বিদ্যা বলে মানুষ চলে গ্রহ গ্রহান্তরে
তাই, সরস্বতীর দেখ খাতির সবার ঘরে ঘরে।

লক্ষ্মীর স্বপক্ষে ততক্ষণে বাদ্যিবাজনা শুরু হয়ে গেছে। দেবী লক্ষ্মীর পক্ষের কবিয়াল লম্ফ দিয়ে আসরের মাঝখানে এসে গেল।

লক্ষ্মীছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, কর ব্যাটাকে এদেশ ছাড়া;
চাল কলা আর পাওনা ছাড়া মন্ত্র পড়া টিকি নাড়া—
চলবে ক'দিন?
বলি, চলবে ক'দিন তাক্ ধিনা ধিন্, চর্ব চুষ্য লেহ্য পেয়,
সরস্বতীর বুলি লম্বা, অষ্টরম্ভা, ভরে না পেট শূন্য দেহ।
দেখ, ভাল ছেলে ঘরে এলে সবাই বলে 'লক্ষ্মী ছেলে',
'সরস্বতী ছেলে' বলে কোনকালে ডাকে কেহ?

এমন ঘুরে ফিরে আসর জমিয়ে গান করছিল লোকটি যে সীমার হাসি পেয়ে গেল। সে আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াল না। তার মনে হল কেতকী ভারি মজার মেয়ে। ক'দিন কাজের মাঝে সে হাসি গল্পে প্রায় জমিয়ে রেখে দিয়েছিল। ও এই গান শুনলে বড় খুশি হবে। শুধু তাই নয়, অনেকদিন ও এইসব অভিনয় করে সবার হাসির খোরাক যোগাতে পারবে।

সীমা চলল মিষ্টির স্টলের দিকে। গ্রামে তৈরি নানারকমের মিষ্টি সাজান ছিল সেই স্টলে। কেতকীর ওপর ভার ছিল খদ্দেরদের কাছে সেই মিষ্টি পরিবেশনের। সীমা গিয়ে দেখল, কয়েকজন খদ্দের ওদিকের বেঞ্চে বসে মিষ্টি খাচ্ছে। ও কেতকীর কাছে গিয়ে বলল, মিষ্টিমুখ করাচ্ছ দেখছি?

কেতকী বলল, ময়রার তো নিজের মিষ্টি খাবার হুকুম নেই, তাই মিষ্টিমুখ করান ছাড়া তার আর গতি কি বল।

সীমা বলল, আর মুখ ব্যাজার করে থাকতে হবে না, দৌড়ে চলে যাও কবিগানের আসরে। কিছুক্ষণের ভেতরেই আশা কবি হাসি মুখখানা নিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

কেতকী চোখ কপালে তুলে বলল, আর দোকান দেখবে কে?

সীমা বলল, সে ভাবনা আপাততঃ আমার। তবে গিয়ে একেবারে জমে যেও না। এই আধঘণ্টা ছুটি তোমার।

কেতকী হাসতে হাসতে দৌড়ে পালাল।

সীমা দাঁড়িয়ে ছিল স্টলের ভেতর নির্দিষ্ট জায়গায়। একটি একটি করে খদ্দের খেয়ে উঠে আসছিল। সীমার হাতে তারা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। শেষে দুটি লোক উঠে এল। তারা সীমার হাতে একটি পাঁচটাকাব নোট ধরিয়ে দিয়ে চলতে শুরু করল।

সীমা ভাঙানি নিয়ে মুখ তুলে দেখল লোকগুলি চলে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে বলল, এই যে শুনছেন, চেঞ্জটা নিয়ে যান।

সীমার ডাকে ওরা একবাব ফিরে দাঁড়াল। তারপর দূর থেকে একমুখ অদ্ভুত হাসি হেসে জনতার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভূত দেখলেও বুঝি সীমা এতখানি বিচলিত হত না। তার সারা দেহ কেঁপে উঠল, মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। সে বসে পড়ল চেয়াবের ওপর।

সে ঠিকই দেখেছে সেই দুজনকে যারা তার বাড়িতে গিয়ে চাকরির লোভ দেখিয়ে ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্রেডিং কোম্পানিতে এনে তুলেছিল। সমস্ত মুখে কি বিকৃত শয়তানি হাসি ফুটিয়ে ওরা চলে গেল। সীমাব মনে হচ্ছিল সে যেন এখনও বন্দী হয়ে আছে প্রথম দিনের সেই প্রাসাদোপম ঘরখানির ভেতর।

যে মেয়েটি প্লেটে করে পবিবেশন করছিল, সে সীমার কাছে এসে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি সীমাদি?

সীমা এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেল। সে বলল, না, এই মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। এক গ্লাস জল দাও তো ভাই।

মেয়েটি জল এনে দিল। সীমা চোখে মুখে জল দিল। তাবপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আবার মন

দিল বিক্রির কাজে। ইতিমধ্যে কেতকী ফিরে এল। সীমা তার হাতে কাজের ভার দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এই জনারণ্য থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এসে দাঁড়াল সেই নদীর ধারে। কাঠের কালো ব্রীজখানা দাঁড়িয়ে আছে। এপার ওপারের একমাত্র সেতুবন্ধ। এদিকে কৃষক পল্লী ওদিকে আদিবাসী কুলিকামিনের আস্তানা। সীমার মনে হল, একজন দেশকে গড়ছে সর্বস্ব দিয়ে, আর অন্যজন দেশকে ভেঙে শুধু ভরাচ্ছে নিজের বিত্তের ভাণ্ডার। কেবল এতটুকু নদীর ব্যবধান। কিন্তু কি বিপুল ব্যবধান এদের দু'পক্ষের চিন্তার।

সীমা মেলার দিকে তাকিয়ে দেখল, আলো জ্বলছে, কোলাহল এখানেও ভেসে আসছে, দপদপ করে সবার মাথার ওপর জ্বলছে সার্কাসের তাঁবুর মাথার আলোটা।

সীমার মনে হল, তাদের অতিথি স্বামীস্ত্রীতে এখন হয়ত দারুণ উত্তেজনার খেলাটা পাশাপাশি বসে দেখছেন। তাঁরা নিবিড় ভয়ঙ্কর মৃত্যুমুহূর্তে হয়ত পরস্পরের হাত অন্ধকারের ভেতর জড়িয়ে ধরেছেন। তারপর খেলা শেষ হলে হাসিমুখে বোর্ডের কাছ থেকে চলে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছে সেই সার্কাসের মেয়েটি। দর্শকদের করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে। সীমা যেন দেখতে পেল, অতিথি ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী সার্কাসের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছেন হাত ধরাধরি করে। একটা পরম নির্ভরতার আলো ফুটে উঠেছে ওঁদের মুখে। ওঁদের চোখে মুখে যেন সেই প্রতিজ্ঞার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে,—আমরা বিশ্বাসে হাত বেঁধে চললে কোন ঝড়ই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

সীমা, সীমা!—।

সীমা চমকে উঠল। সুপ্রকাশের গলা বলে তার মনে হল।

দূর থেকে কাছে এল সুপ্রকাশ।

আপনি এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে! ওদিকে অতিথি ভবনে কেউ কেউ আপনার খোঁজ করছেন।

সীমা বুঝল, সার্কাসের ঐ খেলা দেখে এসে স্বামী স্ত্রী বিশেষ তৃপ্ত হয়েছেন, আর তাই তার খোঁজ পড়েছে এসময়।

সে সুপ্রকাশকে বলল, যদি নাম ধরেই ডাকলেন, তাহলে আব আপনিব গণ্ডী টেনে দূরে সরিয়ে রাখলেন কেন?

ও এই কথা।

মনে হল সুপ্রকাশের গলায় অপ্রস্তুতের একটা স্বর বেজে উঠল।

তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, একদিন মেলামেশার ভেতর তো নাম ধরে ডাকতেই হবে।

সীমা বলল, সেই ডাকটা যখন আজকের শুভমুহূর্তে ভেসে এল আমার কাছে, তখন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাকেই সত্য বলে মেনে নেব সুপ্রকাশদা।

সুপ্রকাশ সেই মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। দূরের পাহাড়ের আড়াল থেকে রক্তবর্ণ চাঁদটা উঁকি দিল।

সুপ্রকাশ সীমার হাত ধরে বলল, এ ক'দিনে নিজেকে নিঃশেষ করে তুমি কাজ করে গেছ সীমা। তোমার এই অক্লান্ত উৎসাহই আমার সমস্ত শক্তির উৎস। আজ শুধু বল, আমার এ কর্মযজ্ঞ কেবল আমার নয়, তোমারও।

তাই হবে সুপ্রকাশদা।

সীমার গলা প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। সে বলল, শুধু বঞ্চনার পৃথিবী থেকে তুমি আমাকে টেনে তুললে বিশ্বাসের জগতে। আমার মনে হচ্ছে, দুজনে পাশাপাশি চলে আমরা পৌঁছতে পারব নতুন সূর্যোদয়ের দেশে।

...মেলার শেষ দিনটি ঘনিয়ে এল। আদিবাসীরা মানল না তাদের সাহেবের কথা। তারা মেয়ে পুরুষে দলে দলে পৌঁছল শেষ দিনের অনুষ্ঠানে। তেমনি উৎসাহে চলল তীরের খেলা। শুধু মেলায় এল না বুড়ী তুরাইয়া। সে চোখে ভাল দেখে না, তার ওপর পল্লী ছেড়ে সবাই চলে যাবে কি করে। একজন অন্ততঃ পাহারায় থাকা চাই। সাঁঝের আগে লক্ষ্যভেদের খেলা শেষ হলে শুরু হবে মেয়েদের

নাচ। ওরা সবাই চলে গেছে। মনের খুশিতে পলাশফুল সংগ্রহ করতে থেকে গেছে শুধু একজন। সে শনিচারী। পলাশবনে ঘুরে ঘুরে আঁকশি দিয়ে সে ফুল পেড়ে চলল। আজ তার খুশি বাধ মানছিল না। মরদগুলো আজ তার স্বামীর কথা মেনেছে। তারা যদি উপরি কাজ নাও পায় তবু তারা যাবে মেলায়। তাই আজ শনিচারীর সুখের দিন। গর্বে তার বুকটা ভরে উঠেছে। সে মেয়েদের বলে দিয়েছে, তুরা যা, আমি ফুল লিয়ে যাব।

মনের খুশিতে ফুল পেড়ে সে ঝুড়ি ভরেই চলেছে। কখন সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে উঠেছে সে বুঝতেই পারেনি। যখন আর ফুল দেখা যায় না, তখন শনিচারী ফিরে দেখল পশ্চিমের লালচে আকাশটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

একি, এ যে আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী! শনিচারী পাগলের মত ছুটে চলল। বস্তি দাউদাউ করে জ্বলছে। তুরাইয়া, তুরাইয়া বলে ডেকে চলল সে। পথের ধূলায় ছড়িয়ে পড়ল সদ্য তুলে আনা রাশি রাশি পলাশফুল।

আগুন তখন অনেকগুলো জিভ মেলে দিয়েছে। শনিচারী ছুটল নদীর ওপর সাঁকো লক্ষ্য করে। হাঁপাচ্ছে সে। পথে পড়ে যাচ্ছে। আবার উঠে দৌড়োচ্ছে। সাঁকোর কাছে এসে সে আছড়ে পড়ে গেল। সাঁকো জ্বলছে। এপার থেকে ওপারে যাবাব পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। কারা শনিচারীর অবশ দেহখানাকে তুলে নিল জীপে। কে যেন বলে উঠল, এটা সেই হারামজাদা বুধনের বউ।

এদিকে তখন মেলায় আদিবাসী মেয়েদের নাচ শুরু হয়ে গেছে। মাদল বাজাচ্ছে পুরুষেরা, মেয়েরা কোমর জড়িয়ে ধরে নাচছে আর গাইছে।

আগুন! আগুন!

আগুনের মত সারা মেলায় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। সবাই ছুটল আগুন লক্ষ্য করে। দৌড়ে তারা যখন এসে পৌঁছল নদীর ধারে তখন সাঁকোটা জ্বলে নদীর স্রোতে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

আদিবাসী মেয়ে পুরুষেরা চীৎকার করে বুক চাপড়াতে লাগল। বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র তাঁর আস্তানা থেকে তখন আগুন দেখতে পেয়ে চলে এসেছেন। তাঁকে দেখে মুংরা তার পায়ে আছড়ে পড়ল, বাবামশয় আমাদের সব্বোনাশ হইয়ে গেলো। এ আমাদের কি হইল রে! হায়, হায়, হায়!

বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র শুধু কপালে হাত ঠেকিয়ে তাকিয়ে রইলেন নদীর ওপারে লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে।

সেই মুহূর্তে একটি ঘটনা ঘটল। বুধন শনিচারী শনিচারী বলতে বলতে ঝাঁপিয়ে পড়ল খরস্রোতা নদীর জলে। অন্ধকার স্রোতে ভাসমান সেতুর কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে কোথায় সে হারিয়ে গেল।

আদিবাসীরা রয়ে গেল এপারে। পরদিন অনেক পথ ঘুরে মুংরা যে খবর ট্রেডিং কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করে আনল তা আরও ভয়াবহ। রাতে কোম্পানির ডাইরেক্টর সাহেব খুন হয়েছেন। আর এই খুনের দায়ে ধরা পড়েছে বুধন আব শনিচারী।

...কেস চলল। একদিকে পুলিশ অন্যদিকে আদিবাসীরা। ডাইরেক্টর বাহাদুর ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর কেস চালাতে লাগল পুলিশ। হাতেনাতে ধরা পড়েছে আসামীরা। পুরাতন কোন আক্রোশের সুযোগ নিয়ে তারা এই হত্যাকাণ্ড করেছে। বুধন নিজেই আদিবাসী পল্লীতে আগুন দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে যে ডাইরেক্টর সাহেবের লোকেবা এ কাজ করেছে। তারপর নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে। এর ভেতরেও সে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে তার স্ত্রীর ওপর বলাৎকার করার দরুনই এ কাজ সে করতে বাধ্য হয়েছে।

পুলিশ পক্ষ আবও বলেছে, আমরা অনুসন্ধানে জেনেছি, সেদিন আদিবাসী পল্লীর একটি বৃদ্ধা ছাড়া সবাই সীতাপুব গ্রামে মেলায় গিয়েছিল। তবে এই আদিবাসী স্বামী স্ত্রীতেই বা কি জন্যে যায়নি সেখানে। নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা গভীব ষড়যন্ত্র ছিল। তাছাড়া আরও কোন সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক মনে হয় এর পেছনে কাজ করছে। কিন্তু প্রমাণ অভাবে এখনও সঠিক সে কথা বলা যাচ্ছে না। এই যুবা আদিবাসী দম্পতি শুধু যে ডাইরেক্টর বাহাদুরকেই খুন করেছে তা নয়, একটি নিরীহ বৃদ্ধাও এদের এই নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছে।

জেরার মুখে বুধন বলেছে, সে স্ত্রীর মান বাঁচাতে সাহেবকে মেরেছে।

আবার শনিচারী বলেছে, তার মরদের কোন দোষ নেই। সে নিজেই মান বাঁচাতে মেরেছে সাহেবকে। মরদ তাকে খুঁজতে এসেছিল সাহেবের মঞ্জিলে।

পুলিশ বলেছে, অসম্ভব কথা। ডাইরেক্টর তিমিরবরণ মিশ্রের নামে এমন কোন কলঙ্কের কাহিনী তাদের জানা নেই। তারা তাঁকে সৎ একজন কর্মযোগী পুরুষ বলেই জানে। তাছাড়া, তারা একসময় কোন একটি অনুষ্ঠানে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মুখ থেকে শুনেছে যে, কাজই তাঁর সহধর্মিণী।

সুপ্রকাশ এসে বলল, সীমা, এখন তোমার পালা। সমস্ত সংকোচকে দূরে সরিয়ে সত্যকে তুলে ধরার সময় এসেছে।

সীমা সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

জেরার উত্তরে সে বলল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে একটি ভদ্র রকমের চাকরি যোগাড় করতে পারেনি। শুধু লজেন্স বিক্রি করেই দিন কাটছিল। একদিন এক পত্রিকার রিপোর্টারের সঙ্গে তার দেখা। সেই রিপোর্টার ভদ্রলোক তাঁদের পত্রিকায় তার অবস্থা সম্বন্ধে একটি পরিচয় প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকা পাঠ করে দুটি লোক তার বাড়িতে যান, এবং তাঁদের কোম্পানির ডাইরেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাঁরা এও বলেন যে ডাইরেক্টর বাহাদুর নাকি তাঁর ফার্মে এমনি কর্মীই চান।

সীমা বলল, সে সেই আশ্বাসেই এসেছিল, এবং এসেই উঠেছিল ডাইরেক্টর বাহাদুরের অতিথি নিবাসে। কিন্তু রাতে একটি মেয়ে এসে ডাইরেক্টরের কুমতলবের কথা তার কাছে বলে। সে তখন নিরুপায় হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে পার হয়ে আসে। তারপর রাতের অন্ধকারে বহুদূর পথ পার হয়ে দিবাকর মিশ্র মহাশয়ের আশ্রয়ে এসে পৌঁছয়!

সীমার সাক্ষ্য শেষ হলে হাজির করা হল সেই মেয়েটিকে যে ডাইরেক্টরের কু-মতলবের খবর দিয়েছিল সীমার কাছে।

বসন্তের দাগে ভরা মুখ নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, দোহাই ধর্মাবতার, আমার অতীত জীবনের কথা তুলে আমাকে আর বিব্রত করবেন না। শুধু আমি এইটুকু বলব, আমার আগের সাক্ষী যে দুটি লোকের কথা উল্লেখ করে গেলেন তারাই একদিন গিয়েছিল আমাদের গ্রামে। তারপর নানা ছলে আমার স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তারা তাঁকে চাকরি দেবার নাম করে নিয়ে আসে কলকাতায়। তারপর সেখান থেকে ওদেরই একজন একদিন গ্রামে আমার কাছে গিয়ে বলে যে আমার স্বামী বিশেষ অসুস্থ, আমাকে তখুনি যেতে হবে। আমি ওদের সঙ্গে চলে এলাম। এসে দেখলাম, একটি অন্ধকার ভাঙা ঘরে আমার স্বামী মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর কি রোগে মৃত্যু হল তা আমি বুঝলাম না। তখন শোকে আমি আচ্ছন্ন। স্বামীর শেষকৃত্য করে ওদেরই সঙ্গে এসে উঠলাম ডাইরেক্টর বাহাদুরের প্রমোদভবনে। সে বন্দী জীবন আমার আজও চলেছে। বিশ্বাস করুন, আমি সুন্দরীই ছিলাম একদিন। এই কিছুকাল আগে বসন্তরোগে আমি আমার রূপ হারিয়েছি। বোধহয় রূপ হারিয়েই আমি বেঁচে গিয়েছি। আমাকে শুধু ডাইরেক্টর বাহাদুরেরই মনোরঞ্জন করতে হত না, তাঁর ওখানে ব্যবসায়িক সূত্রে যে সব দেশবিদেশের অতিথি আসতেন তাঁদেরও মনোরঞ্জন করতে হত। আমি একটি পণ্যা নারীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য যাতে আর কারো ওপর গিয়ে না পড়ে সেজন্য আমি সীমা দেবীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

শেষ সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ দিবাকর মিশ্র।

মহামান্য বিচারক মহোদয়,

জীবনের একটি সত্যকে এতকাল আমি গোপন করে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন বুঝেছি সত্যকে কখনো গোপন করে রাখা যায় না।

এই যে ট্রেডিং কোম্পানি, এককালে এর মালিক ছিলাম আমি। আমার সঙ্গে প্রথম থেকে কাজ করে যিনি এই ফার্মটি গড়ে তোলায় আমাকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি আমার কর্মচারী হলেও ছিলেন

বন্ধুর মত। তাঁর সততায় ও আমার কর্মক্ষমতায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। আমরা এমনি বন্ধু ছিলাম যে দুই বোনকে আমরা বিয়ে করি। দু'বোনের দুটি পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু এক অগ্নিকাণ্ডে এক বোনকে বাঁচাতে গিয়ে দুই বোনেরই মৃত্যু হয়। শিশু দুটি বাইবে বেড়াতে গিয়েছিল বলে তারা রক্ষা পায়। আমার বন্ধু এমনি ব্যথা পেয়েছিলেন যে তিনি সংসার ছেড়ে তাঁর সন্তানকে আমার হাতে তুলে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। ...আমি শিশু দুটিকে মানুষ করি। কিন্তু আমার নিজের সন্তান অত্যন্ত দুর্দান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আমার বন্ধুর ছেলেটি হল সুস্থির। আমি দুটিকে বাল্যকালেই ভারতের দুটি আলাদা জায়গায় রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলাম। ওরা যখন শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে ফিরল তখন আমার আপন সন্তানের হাতে তুলে দিলাম এই ফার্মের ভার, আর আমার বন্ধুর পুত্রকে দিলাম আমার জমিদারি— সীতাপুর গ্রামখানা।

আমি দেখলাম, শিক্ষা আমার সন্তানের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারল না। তার উচ্ছৃঙ্খলতার খবর আমার কানে এসে পৌঁছতে লাগল। এদিকে আমার বন্ধুপুত্র সুপ্রকাশ তার গুণে আমাকে মুগ্ধ করল। আমি দেখলাম, লোভ মানুষকে কিভাবে হত্যা করে, আর ভালবাসা মানুষকে কিভাবে সবার অন্তরে চিরজীবী করে। তিমিরবরণকে আমি জন্ম দিয়েছি কিন্তু সুপ্রকাশ পেয়েছে আমার হৃদয়ের অধিকার। ধর্মাবতার, পুত্রের মৃত্যু প্রতিটি পিতার কাছেই শোকের সংবাদ, কিন্তু পুত্রের অন্যায়কে যদি আজ আমি না স্বীকার করি তাহলে পরলোকে গিয়েও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

বিচারগৃহ স্তব্ধ।

যেদিন রায় বের হল সেদিন বেকসুর মুক্তি পেল বুধন আর শনিচারী।

এরপর শুরু হল সেই ভাঙা সেতু গড়ে তোলার কাজ। সীতাপুরের কৃষক আর আদিবাসী কুলিরা হাত মেলাল একসঙ্গে। সুপ্রকাশ পেল ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্রেডিং কোম্পানির দায়িত্বভার। সেদিন সীতাপুরের কৃষক আব ওপাবের কুলিরা মিলে তাদের চিরদিনের রাজাভাইকে নিয়ে উৎসব করল।

কর্মচারীদের কল্যাণেই সেদিন সুপ্রকাশ উৎসর্গ করল তার ফার্ম।

একসময় নিভৃতে সীমাকে পেয়ে সুপ্রকাশ বলল, বিধাতা দু'পারের রাখীবন্ধন সম্পূর্ণ করলেন। এখন বাকি রইল শুধু আর একটি বন্ধন।

সীমা বলল, সে কি আজও বাকি আছে সুপ্রকাশদা।

●

ফেরা

জানালাটা এখন বন্ধ করে দিতে হবে,—বেজে উঠল জয়তিলকের গলা।

অন্তরা জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিল।

এতক্ষণ যে দুরন্ত কালবৈশাখী মিহি বালির ঘাগরা উড়িয়ে ঝাউগাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নেচে বেড়াচ্ছিল সেদিকেই তাকিয়েছিল অন্তরা। নিজের জীবনটার সঙ্গে হয়তো বা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিল সে। তার গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। জানালাটা বন্ধ হবার শব্দ শুনল সে।

জয়তিলক ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল! সিঁড়িতে তার রুম স্লিপারের শব্দটা বাজছিল। সামনের উঠোনে টিনের চালে বৃষ্টি চড়বড়িয়ে উঠল।

অন্তরা গাইল, 'বরষা আইল ঐ ঘন ঘোর মেঘে দশদিশি তিমিরে আঁধারি।'

সিঁড়িতে স্লিপারের শব্দটা থেমে গেল।

এখন অন্তরার ঘরে উঠে আসছে জয়তিলক। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, গান গাওয়া চলবে না আপনার। কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না সে। সিঁড়ি ভেঙে চলে গেল তার একতলার ঘরে। একঝলক কান্না বুক ঠেলে উঠে এল অন্তরার। গানের একটা ভাঙা টুকরোও কি আর সে গাইতে পারবে না!

জয়তিলক নাচের ঘরে তার সোফায় বসে তাকিয়েছিল। জানালার বাইরে ঢেউ-খেলানো বালিয়াড়ি। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো জায়গা জুড়ে বনঝাউয়ের সংসার। আর ঠিক তার পরেই উঁচু সী-ডাইক। নীচের থেকে সমুদ্রটা চোখে পড়ে না। আওয়াজটা শোনা যায়। ওপর থেকে কিন্তু এই বালিয়াড়ি বনঝাউ আর সামনের সমুদ্র চোখ দুটোকে টেনে রাখে।

জয়তিলক মাসখানেক আগে যখন এখানে এসেছিল তখন সে ওপরের ঘরটাই দখল করেছিল। ক'দিন আগে অসুস্থ অন্তরা এসে পড়ায় তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে দোতালার ঘরখানা। অবশ্য তাতে কোন রকম অসুবিধেই মনে হচ্ছে না জয়তিলকের। আঙ্কল মিত্র কলকাতা থেকে চিঠি দিয়ে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন, তিনি ফিরে না আসা অবধি যেন জয়তিলক অন্তরাকে লক্ষ্য রাখে। আঙ্কল মিত্র তাঁর এখানকার হাউস ফিজিসিয়ানকেও চিঠি দিয়েছেন। ভদ্রলোক রোজ একবার করে এসে দেখে যান, ইনজেকশনও দিচ্ছেন। এখানকার ডাক্তার ভদ্রলোক জানেন না যে জয়তিলক বোস ভেলোরের একজন নামকরা সার্জেন। অত্যন্ত শক্ত হার্ট অপারেশনের সঙ্গে জয়তিলকের নামটা অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। এ খবর তামাম হিন্দুস্থানের সার্জেন মহলে সুবিদিত হলেও জুনপুটের এই নির্জন সমুদ্রতীরে অন্তরা নামের অসুস্থ মেয়েটি, কিংবা পাঁচ মাইল দূর থেকে রোজ আসা ডাক্তারবাবুটি রাখেন না। জয়তিলককে ডাক্তারবাবু চলে যাবার সময় নানারকম নির্দেশ দিয়ে যান। বাধ্য ছেলের মত জয়তিলক মাথা নেড়ে সায় দেয়। কোনদিন তার ডাক্তারী বিদ্যের সামান্যতম ছায়াও সে মুখে-চোখে ফুটিয়ে তোলে না।

একদিন ডাক্তার চক্রবর্তী রোগী দেখে চলে যাবার সময় জয়তিলককে বললেন, চলুন অমার সঙ্গে, আপনারও একটু বেড়িয়ে বেড়ানো উচিত। সারাদিন ঘরে কন্‌ফাইন্ড হয়ে থাকাটা ঠিক নয়। বাধ্য ছেলের মত জয়তিলক বেরিয়ে এল ডাক্তারের সঙ্গে। একথা সেকথা এবং অনেক কথার পর ডাক্তার চক্রবর্তী বলেলেন, ইয়ংম্যানদের ক্ষেত্রে এসব রোগ চট করে সংক্রামিত হয়ে যেতে পারে।

কথাটা বলেই একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন ডাক্তার চক্রবর্তী।

জয়তিলক কোন কথা না বলে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল।

ডাক্তার চক্রবর্তী গলার স্বর হঠাৎ গম্ভীর করে ফেললেন। অত্যন্ত গোপনীয় সিরিয়াস কোন উপদেশ দিতে গেলে মানুষের গলা ঠিক যেমনটি হয়ে ওঠে।

জানেন মিঃ বোস, এ সময় ঐসব টি. বি. পেসেন্টদের মনে হতে পারে ওরা সুস্থ মানুষদের সঙ্গে সমান। মেলামেশা খাওয়া-দাওয়াতে বাধা কি। আর এদিকে আপনি যুবক। এসব সময়ে শরীরের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিপদের ঝুঁকি নেওয়াতেই আনন্দ। সেন্টিমেন্টে ভরা মনের কাছে বিপদ আগুনের মত ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আর তাছাড়া মিস মজুমদারও, কিছু মনে করবেন না, একটু বেশি রকমের অ্যাট্রাকটিভ। শেষের দিকের বাক্যটি ডাক্তাব চক্রবর্তী যেন সমুদ্র, বালিয়াড়ি আর বনঝাউগুলোর কান বাঁচিয়ে নীচু গলায় বললেন।

জয়তিলকের ঠিক এই সময় ডাক্তার চক্রবর্তীকে দারুণ রকম ধমকে দেবার কথা, কিন্তু তা সে করল না। যে যার মত চলা কিংবা কথা বলার অধিকারে সে বিশ্বাসী। আর প্রত্যেকের বিশ্বাসে তার ব্যক্তিগত আস্থা না থাকলেও তা নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে তার রুচিতে বাধে। সে পড়াশোনাতে যেমন মগ্নতা দেখিয়েছে, কাজের বেলাতেও তার সেই নিষ্ঠা দেখা গেছে। তাই অল্প কথা বলাই তার স্বভাব। নিজের ভেতব ডুবে থাকাই যেন জয়তিলকের স্বভাবের ধর্ম।

ডাক্তার চক্রবর্তী কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। শহর থেকে পীচের রাস্তাটা সমুদ্রতীরের ফিশারী ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্টারগুলোর পাশ রবাবব এসে বালিতে সেঁধিয়েছে, সেই অবধি মফঃস্বল টাউনের একটা বাস রান করে। দিনে বার ছয়েক ফেরি দেয়। তাতেই আসেন ডাক্তার চক্রবর্তী। নেমেই সমুদ্র-তীর ধরে বালির ভেতর পা ডুবিয়ে মাইল খানেক হেঁটে আসতে হয়। এখানে সমুদ্রতীরে বিখ্যাত সঙ্গীত-সাধক ভবানন্দ মিত্র তাঁর বাংলো বাড়িটি তৈরি করেছেন। কলকাতা থেকে একটুখানি সুযোগ পেলেই চলে আসেন এখানে। তাছাড়া নিজের কোন সংসার না থাকলেও অগুণতি অনাত্মীয়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ। পথ চলতে তিনি প্রিয়জন কুড়িয়ে পান। সে সংযোগ অন্যপক্ষ না ছিঁড়ে ফেললে তাঁর দিক থেকে অটুটই থেকে যায়। জয়তিলক বোস যখন মেডিকেল স্টুডেন্ট তখন একটা অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে এমারজেন্সিতে ওদের দেখা। জয়তিলকের সেদিনের ব্যবহার ভবানন্দ মিত্রের মনে দারুণ দাগ কেটেছিল। আর অনাত্মীয় এক পথচারীকে অ্যাকসিডেন্টের জায়গা থেকে তুলে এনে যে ভাবে দিনের পর দিন তিনি সেবা করলেন, তাতে জয়তিলক ভবানন্দকে মনে মনে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেনি। সেই থেকে দুজন অ-সমবয়সীর যোগ। সে যোগ দিনে দিনে নিবিড় হয়েছে। জয়তিলক ভবানন্দ মিত্রকে আঙ্কল বলে ডাকে। অন্তরাও অবশ্য ডাকে কাকু বলে। কিন্তু অন্তরার সঙ্গে ভবানন্দ মিত্রের সংযোগের সূত্র একটু ভিন্ন। অন্তরাব বাবার সঙ্গে গায়ক ভবানন্দ নাড়া বেঁধেছিলেন একই গুরুর সঙ্গীত আসরে। সেই সুবাদে অন্তরা ভবানন্দকে কাকু বলে ডাকার একটা স্বাভাবিক অধিকার পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে জয়তিলক আর অন্তরা দুজনের কাছে অপরিচিত।

ভেলোর থেকে দীর্ঘ চার মাস ছুটি নিয়ে এসেছে জয়তিলক। অতি নির্জন কোন জায়গায় সময়টাকে খুশিমত খরচ করবে এই ইচ্ছে মনে আসতেই আঙ্কল মিত্রকে লিখেছিল তার অভিপ্রায়ের কথা। ভবানন্দ মিত্রের জবাব পেতে ফেরত ডাকের বেশী অপেক্ষা করতে হয়নি। জয়তিলক এই বাড়িতে এসে আঙ্কল ভবানন্দ মিত্রকে পেয়েছিল। ক'দিন তাদের কেটেছিল কথায় গানে। ভোরবেলা সমুদ্রের ধারে নির্জনে বেড়িয়ে বেড়াত দুজনে। বেলা বাড়লেই ফিরে আসত তারা বাংলোতে। সমুদ্রতীরের অল্প দূরবর্তী গাঁ থেকে আসত একটি চাষীর কুমারী মেয়ে। সে সাবাদিন রান্নাবান্না করে খাইয়ে দিয়ে সন্ধ্যেয় চলে যেত। রাতে আসত তার বাবা। সে এই বাংলো-বাড়ির পাহারাদার। কদিন কাটানোর পর আঙ্কল মিত্র কোন কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য কলকাতা চলে গেলেন। একা রইল জয়তিলক। কিন্তু স্বল্পভাষী সার্জেনের তাতে বিশেষ কোন অসুবিধে হল না। আর তাছাড়া এই নির্জনে বসে সে একটি মেডিকেল জার্নালের জন্য আর্টিকেল লিখতে আরম্ভ করে দিল। অপারেশনের নতুন একটা পদ্ধতি সম্বন্ধে তার নিজস্ব পরিকল্পনার কথা।

যখন সে প্রায় ডুবে আছে তার আর্টিকেল লেখার কাজে, এমন একদিন সম্পূর্ণ একাকী অন্তরা এলো এই বাংলোয়। একেবারে অচেনা মেয়েটিকে বাংলোর বারান্দায় বসে থাকতে দেখল জয়তিলক। পড়ন্তবেলায় বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখতে পেল অন্তরাকে। আর ঠিক সেই দিনটিতেই কাজের মেয়েটি চলে গিয়েছিল আগে-ভাগে ছুটি নিয়ে। জয়তিলক বাংলোয় ঢুকেই একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় মেয়েটিকে দেখছিল। অন্তরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাকু নেই এখানে?

জয়তিলক এগিয়ে এল দরজার কাছে। ভেতরের ঘরের তালা খুলতে খুলতে বলল, তিনি তো বেশ কয়েকদিন আগে কলকাতা গেছেন। গানের কনফারেন্স রয়েছে।

ঘর খুলে আনাড়ী হাতে আলো জ্বালতে চেষ্টা করছিল জয়তিলক। মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, সরুন আপনি, অমি জ্বেলে দিচ্ছি। কোথায় কি থাকে আমার জানা। জয়তিলক বুঝতে পেরেছিল, এ বাড়িতে এই মেয়েটির অধিকার আগে থেকেই সাব্যস্ত হয়ে আছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এল দূর গাঁয়ের পাহারাদার লোকটি। হাতে তার সেদিনের ডাক। পিয়নের কাছ থেকে সে-ই নিয়ে রাখে চিঠিপত্র।

খামে বেশ ভারি ওজনের একখানা চিঠি এসেছে জয়তিলকের নামে। ভবানন্দ লিখেছেন। জয়তিলক চিঠি পড়ে জানল অন্তরার কথা। সে অসুস্থ। বিশ্রাম আর চিকিৎসার জন্য এখানে থাকতে চায়।

চিঠিতে অসুখের উল্লেখ না থাকলেও অন্তরার কাশি থেকে আর তার চেহারার দিকে তাকিয়ে জয়তিলকের অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারল অসুখটা কোন জাতের। টিউবারকুলেসিসের অনেকগুলো লক্ষণই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল অন্তরার মধ্যে।

জয়তিলক সে রাতে বিশেষ কোন কথা না বলে নিজের বিছানাটা নামিয়ে আনল নীচের ঘরে। ওপরের ঘরটা অন্তরার জন্য ছেড়ে দিলে। পাহারার লোকটির সাহায্যে বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে অন্তরাকে পাঠিয়ে দিলে সেখানে। রাতে নিজের দুধটা অন্তরার খাবারের সঙ্গে ওপরে পাঠিয়ে দিলে।

ভোরবেলা ডাক্তার চক্রবর্তী এলেন। ভবানন্দ মিত্রের বহুদিনের বন্ধু তিনি। শহরের নাম-করা চিকিৎসক।

এসে অন্তরার এক্সরেগুলো পরীক্ষা করলেন। আগেই চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। এখন চিকিৎসার শেষপর্বে ওষুধপথ্য ও পূর্ণ বিশ্রাম। তাই অন্তরা ভবানন্দ মিত্রের কাছে চিঠি লিখে সমুদ্রতীরের এই আস্তানাটা তার রোগমুক্তির জন্য চেয়ে নিয়েছিল। ভবানন্দ মিত্রকে চিঠি লিখেই সে সোজা লক্ষ্ণৌ থেকে চলে এসেছে এই সমুদ্রতীরের বাংলোয়। উত্তরপ্রাপ্তির অপেক্ষাও করেনি।

ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন, রোগ এখনও নির্মূল হয়নি। কিছু সময় তো লাগবেই। ভয় নেই, আমি রোজ আসব। ওষুধ এখানে তো পাওয়া যাবে না, টাউন থেকেই আনতে হবে। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

অন্তরা মাথা নাড়ল। জয়তিলক বুঝেছিল অন্তরা ডাক্তার চক্রবর্তীর পূর্বপরিচিত। চলে যাবার সময় ফিরে তাকিয়ে ডাক্তার চক্রবর্তী বলেছিলেন, আপনাকে তো এর আগে দেখিনি মিঃ...

জয়তিলক বলল, আমি জয়তিলক বোস। এখানে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি।

কাজকর্ম কলকাতায়?

না, দক্ষিণ ভারত আমার কর্মস্থল।

আর কোন কথা ডাক্তার চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করেননি জয়তিলককে। সুতরাং অযথা উত্তর দেবার হাত থেকে সে রেহাই পেয়েছে।

শুধু যাবার সময় কয়েকটি বিষয়ে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়ে গেলেন ডাক্তার চক্রবর্তী।

ক'দিনের ভেতর জয়তিলক বুঝতে পারল মেয়েটি দারুণ মুডি।

প্রথম দিকে জয়তিলককে তার ঘরে ঢুকতে দিতেই চাইত না। শেষে জযতিলক তাকে অনেক বুঝিয়ে তবেই গৃহপ্রবেশের অনুমতি পেয়েছে।

এখন অন্তরার বিশেষ কোন আপত্তি নেই। বরং সন্ধ্যা পার করে জয়তিলক বেড়িয়ে ফিরলে তাকে কেমন যেন একাকীত্বের শূন্যতায় পেয়ে বসে। আবার কোনদিন সামনের সমুদ্রে স্নান সেরে ফিরতে দেরী করলে উদ্বেগে অস্থির হয়ে ওঠে তার মন। অকারণ কান্নার একটা ঢেউ উঠে আসে তার বুক ঠেলে। যেদিন অন্তরা এমনি কোন কারণে দুঃখ পায় সেদিন সে তার বাঁধা রুটিনে নিয়মভঙ্গের ঢেউ তোলে। কাজের মেয়েটি জয়তিলকের কানে খবরটা পৌঁছে দিলেই জয়তিলক ওপরে উঠে যায়। অতি শান্ত অথচ কমাণ্ডিং গলায় সে দরকারী কাজগুলো করতে বলে। অন্তরা তখন একেবারে বাধ্য মেয়ের মত সব কিছুই করে যায়। কোথায় চলে যায় তার শূন্যতাবোধ, তার জমে ওঠা অভিমান।

দুজনের ভেতর কথা হয় কম, তাও শুধুমাত্র অন্তরার প্রয়োজনগুলোকে কেন্দ্র করে।

চিঠি না দিয়েই এক অপরাহ্নে এসে পৌঁছলেন আঙ্কল মিত্র। দীর্ঘ চেহারার মানুষটি যখন অন্তরার ঘরে ঢুকলেন তখন বাড়িতে ছিল না জয়তিলক। সন্ধ্যার সমুদ্রকে নির্জনে উপভোগ করার জন্য সে অনেকখানি হেঁটে গিয়ে বসেছিল কতকগুলো বনঝাউয়ের আড়ালে।

ভবানন্দ মিত্র অনেকদিন পরে দেখলেন অন্তরাকে। বিছানার পাশে বসে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। অন্তরা উঠে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল। চোখের জল তার গড়িয়ে পড়ছিল দুচোখ উপচে।

ভবানন্দ নিজের আবেগকে সংযত করে নিয়ে বললেন, কত যুগ তোকে দেখিনি বেটি, একবারও কি মনে পড়ে না কাকুকে?

এবার নিজের হাঁটুর ভেতর মুখ লুকাল অন্তরা। সে তখন ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ভবানন্দ তার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুই এসেছিস এতেই আমি খুশি। সুখের দিনে না হোক, অন্ততঃ কষ্টের সময় কাকুকে মনে পড়েছে এতেই আমার সব রাগ উবে গেছে পাগলী। কান্নাকাটি রাখ, অসুখের সময় কান্নাকাটি ভাল নয়।

তারপর চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, ডাক্তারের সাড়া পাচ্ছি না তো, গেল কাথায় সে?

অন্তরা কান্নাভেজা চোখ মুছতে মুছতে বলল, ডাক্তারবাবু তো এবেলা আসেন না, সকালে এসে ইন্‌জেকশন দিয়ে যান।

ভবানন্দ ওর ভুল চিন্তাটার সংশোধন করে বললেন, না না, আমি ডাক্তার চক্রবর্তীর কথা বলছি না, আমাদের ফেমাস সার্জেন জয়তিলকের কথা বলছি।

অন্তরা হঠাৎ বুঝতে পারল না কথাটা, ভবানন্দ কোনরকম কৌতুক করে বলছেন কিনা। সে বলল, মিঃ বোস অনেক সময় একটু বেশী সন্ধ্যে করেই বাংলোয় ফেরেন।

ভবানন্দ বললেন, ভাগ্য ভাল তোর, জয়তিলক এসে পড়েছে এ-সময়। ডাক্তার চক্রবর্তী নিশ্চয় ওর সঙ্গে কনসাল্ট করেই কাজ করছেন।

অন্তরা বলল, অমার সামনে কোন কথাই হয় না ওঁদের। তবে উনি প্রতি কাজে যেভাবে খবরদারী করেন তাতে মনে হয় আড়ালে ওঁদের ভেতর কিছু পরামর্শ হয়ে থাকবে।

হঠাৎ আবার বলে উঠল অন্তরা, জান কাকু, আমাকে একটুও গান গাইতে দেন না মিঃ বোস। আমি কতদিন গান গাইনি। আমার কান্না পেয়ে যায়। আমি যে গান কোনদিন শিখেছিলাম, সে কথাও ভুলে যেতে বসেছি।

ভবানন্দ বললেন, দুঃখ কোর না, ডাক্তারের কাজ ডাক্তার করছে, আমার কাজ এবার শুরু হবে। একশোর ওপর বাছাই রেকর্ড এনেছি মাদার, রাতদিন চুটিয়ে শোন। গানও গাইতে পারবে, তবে শরীরটাকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে কিছুটা সময় দিতে হবে বইকি! শরীরের তোয়াজ না করে রাতদিন গলার রেওয়াজ করে গেছ, তার শোধ তুলছে সে এখন। যত শ্রম হয়েছে তার ডবল বিশ্রাম চাই।

অন্তরা শুনতে শুনতে ভবানন্দের মুখের ওপর থেকে তার চোখ সরিয়ে দরজার দিকে ফেলতেই ভবানন্দ ফিরে তাকালেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে এসো এসো ডাক্তার। এতক্ষণ তোমার বিরুদ্ধে নালিশের পাহাড় মাথা তুলে উঠেছে।

অন্তরা অমনি বলে উঠল, মোটেও না কাকু। আমি ঠিক সেভাবে বলতে চাইনি।

ভবানন্দ হেসে উঠে বললেন, ডাক্তারকে যে রোগীরা বিশেষ সুনজরে দেখে না, এটা অবধারিত সত্য। ডাক্তারকে ভালবাসলেই অসুখকেও ভালবাসতে হবে। ডাক্তার আর অসুখ হল ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মত। রাশভারী স্বামী যেমন জেদী বউকে রাতদিন সজারুর কাঁটার মত খোঁচা দিয়ে চলেছে—তেমনি সেই বউকে নইলে তার একদণ্ডও চলে না।

জয়তিলক হেসে উঠে বলল, বিয়ে তো করেননি আঙ্কল, তাহলে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে এমন অভিজ্ঞের মত কথা বলছেন কি করে?

ভবানন্দ অমনি বলে উঠলেন, ইউ নটি বয়, কে বললে তোমাকে যে ভবানন্দ মিত্রের জীবনসঙ্গিনী নেই?

অন্তরা বলল, আমি সাক্ষী জয়তিলকবাবু, কাকু কোনদিনই বিয়ে করেননি।

ভবানন্দ বললেন, বটে! এখন রোগী বদ্যিতে দেখছি হোলি প্যাক্ট হয়ে গেছে। দুধে আমে মিশে গেল, আঁটি রইল পড়ে।

জয়তিলক বলল, আঁটি থেকেই তো আবার গাছ বেরুবে, তাই জীবনধর্মে আঁটিটাই খাঁটি বা আসল বস্তু।

ভবানন্দ বলল, এখন ওসব কথা থাক, আজ রাতে খাবার কি ব্যবস্থা হয়েছে তাই বল।

অন্তরা জয়তিলকের মুখের দিকে তাকাল। কারণ হেঁসেলের ব্যাপারে সে এখন অচ্ছুৎ।

জয়তিলক বলল, আপনার চলে যাবার পর এখানে ছোটখাট একটা পোলট্রি গড়ে তোলা হয়েছে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ আমিষের ব্যবস্থা আছে।

ভবানন্দ মুখ সিঁটকে বললেন, ও নিরিমিষের বাড়া। রোগীর পথ্য মাংসের চেয়ে ডালভাত অনেক রুচিকর।

অন্তরা বলল, না, না, আপনি তা খাবেন কেন কাকু, আপনাদের জন্যে লহনা আলাদা করে রেঁধে দেবে।

ভবানন্দ বললেন, তার স্বাদ তাহলে রোগীর ঝোলের ওপর উঠবে না। নিজেকেই দেখছি পাচক বৃকোদর সাজতে হবে।

ঘরের অসুস্থ আবহাওয়াটা তিনজনের হাসিতে লঘু হয়ে মিলিয়ে গেল।

সম্ভ্রম বোধ এসেছে অন্তরার মনে। সে জানতে পারেনি এতদিন, নিঃশব্দে এত বড় এক সার্জেন নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে রেখেছিল। এ কথাটা যখনই তার মনে হচ্ছে, নিজের প্রতিদিনের আচরণগুলোকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। কোনদিন সে অবাধ্য আচরণ করেছে জয়তিলকের কাছে, কোনদিন তাকে উপেক্ষার চোখে দেখেছে, এসব ভুলে যাওয়া ঘটনা মনের অতল থেকে উঠে এসে তাকে প্রায়ই চমকে দিয়ে যাচ্ছে। জয়তিলক এক দারুণ প্রতিভা এ কথা তার মনে এলেই হঠাৎ বেজে ওঠে সারা মন জুড়ে আলি আকবরের সরোদ।

এক রাতে বিছানায় শুয়ে সে তাকিয়েছিল সমুদ্র আর ঐ ঝাউবনের দিকে। ঝাউয়ের পাতার সবুজ তারগুলো তখন বাজাচ্ছিল কি এক রাগিণী। চাঁদটা রাত জাগবে বলে যেন আকশের নীল আসরে এসে বসেছিল! হঠাৎ জয়তিলকের ভাবনা তার মনে উড়ে এল একটা রাতজাগা পাখির মত। সে তাকে ঘিরে অনেক অনেকক্ষণ উড়ে বেড়াল। ভারী সুন্দরি এলোমেলো ভঙ্গীতে উড়ে ফিরল পাখিটা। অঢেল জ্যোৎস্নায় ডুব সাঁতার কাটল। শেষে যখন চাঁদটা তলিয়ে গেল পশ্চিম সাগরে, তখন হঠাৎ আর একটা বিরাট পাখি কালো দুটো ডানা ঝাপটে উড়ে আসতে লাগল। অন্ধকার সমুদ্রটা ক্ষ্যাপার মত আছড়ে

পড়তে লাগল বালুর জমিতে। একটা বিভীষিকার ভেতর যেন কুঁকড়ে যেতে লাগল অন্তরা। ঐ কালো পাখিটা এসে বসল তার জানালার ওপর। আজম খাঁ। লক্ষ্ণৌয়ের শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গায়ক মহম্মদ খাঁর ছেলে। আজমের কথা মনে আসতেই কলকাতার একাডেমী অব ফাইন আর্টসের হলঘরটা আলোয় ঝলমল করে উঠল।

পর্দাটা সরে যেতেই দেখা গেল সারেঙ্গী, তানপুরাওয়ালা আর তবলচীর মাঝখানে বসে রয়েছে আজম খাঁ। ঝকঝকে চেহারার এক যুবক হাত তুলে নমস্কার জানাল শ্রোতাদের। অভিনন্দিত হল করতালিতে। শুরু হল গান। অন্তরার মনে হল যেন এক আকাশ জ্যোৎস্নার জল ঝরে পড়ল তার ওপর। সে স্নান করতে লাগল। সুরের ধারায় স্নান সেরে সে যখন উঠে দাঁড়াল তখন শিল্পী গান শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে, আর ছোট হলটা করতালিতে ফেটে পড়ছে।

কে তাকে টেনে নিয়ে গেল মঞ্চের ওপারে, যেখানে পর্দার আড়ালে সঙ্গীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে শিল্পী আজম খাঁ।

প্রথমে কথা বলতে পারল না। নমস্কার করল হাত তুলে।

আজম খাঁ প্রতিনমস্কার করে তাকাল তার দিকে। তরুণ আজমের চোখে সেই মুহূর্তে ঘোর লেগেছিল। অন্তরা তখন সত্যিই জ্বলছিল তার রূপের আগুনে। অসাধারণ আপনার গান, এতক্ষণে কথা বলল অন্তরা।

হেসে বলল আজম খাঁ, আমি একেবারে সাধারণ, আপনার প্রশংসাই আমাকে অসাধারণ করেছে, —সুন্দর মুখ থেকে যে কথা বেরোয় তার জবাব দিতে জানে আজম খাঁ।

হেসে বলল অন্তরা, আপনি কিন্তু আমাদের প্রাণের গান কেড়ে নিয়ে গেয়েছেন।

অন্তরার কথা শুনে বিস্ময়ের চমক লাগল আজম খাঁর চোখে।

অন্তরা আজম খাঁর গাওয়া গানটা আবৃত্তি করল ঃ

বাজে বাজেরে মুরলিয়া
পাশ ক্যায়সে যাঁউ তোরে মিতোবা।
মুরলীকা ধূন শুনি কলন পরত হ্যয়
ক্যায়সে কাটে দিন রাতিয়া।

হাসল আজম খাঁ। সত্যিই তো সে মেয়েদের মুখের গানই গেয়েছে।

বলল, আপনি সঙ্গীতরসিক, মনে হচ্ছে আপনি সুগায়িকাও।

অন্তরা বলল, কি করে বুঝলেন আমি গান গাই?

আজম বলল, গানের কথাগুলো যখন বলে যাচ্ছিলেন তখনই সুরে বাজছিল আপনার গলা।

অন্তরা মিষ্টি হেসে বলেছিল, গান হয়তো গাইবার চেষ্টা করি কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভালবাসি গান শুনতে।

এরপর একাডেমীর ছোট্ট হলটা ওদের আলাপ ধরে রাখতে পারেনি। আজমের বন্ধুর বাড়ি, ভবানন্দ মিত্রের বাড়ি হয়ে ওদের আলাপ লক্ষ্ণৌতে গিয়ে শেষ হয়েছিল।

আজমের বাবা মহম্মদ খাঁ অন্তরাকে ছেলের সঙ্গে বসিয়ে তালিম দিয়েছিলেন। তারিফ করেছিলেন অন্তরার গলার আর নিষ্ঠার। শেষে ছেলে আজমের সঙ্গে অন্তরার সাদী দিয়েছিলেন খুব ঘটা করে।

কলকাতার পরিচিত মহলে খবরটা কেউ জানল না। বাবা মা ছিল না অন্তরার, ভবানন্দ মিত্রের আশ্রয়েই কাটছিল তার দিন। বিয়ের পরে সে শুধু একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিল ভবানন্দকে তার বিয়ের খবরটা।

ভবানন্দের কাছ থেকে সে কোন উত্তর পায়নি। হয়তো ভবানন্দ উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ভেবেছিলেন। চলে যাবার সময় যেমন অন্তরা তাঁকে বলে যায়নি, তেমনি জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে ভবানন্দ হয়তো কোন মন্তব্য করতে চাননি। কারুর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে অন্তরা বিষণ্ণ

হয়েছিল ঠিক, কিন্তু ভবানন্দ উত্তর না দিয়ে যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন ও কথা তার মনে হয়নি। গোপনে আজমের সঙ্গে চলে আসায়, ভবানন্দের কাছে যে অপরাধ করেছে সে সম্বন্ধে সে সচেতনই ছিল।

ভবানন্দ মানুষটি গান-পাগল। নিজে উঁচুদরের শিল্পীই শুধু নন, প্রতিভার দেখা পেলে তাকে ফুটিয়ে তুলতে জানেন। তাঁর আশ্রয়ে অন্তরা বাবা মাকে হারিয়ে যে নিঃসঙ্গ ছিল না, একথা সুখ দুঃখের প্রতিটি মুহূর্তেই সে অনুভব করেছে।

আজমকে ভালবেসেছিল অন্তরা। একটা গানের প্রতিভাকে যেমন ভালবাসে মুগ্ধ শ্রোতা। কিন্তু আজম চেয়েছিল অন্তরার দেহের কুলভাঙা জোয়ারের স্রোতে ভেসে যেতে। ভোগও সে করেছিল। কিন্তু শুধু ভোগে তৃপ্তি কই! তীব্র বিতৃষ্ণা তাকে অল্প সময়ের ভেতরেই বিরূপ করে তুলেছিল অন্তরার ওপর। আজমের মনের সুতোয় গাঁথা ভালবাসার ফুলগুলো মালার থেকে একদিন খসে পড়ে গেল। অন্তরা যেমন ভেসে এসেছিল স্রোতে, তেমনি ভেসে চলে গেল।

লক্ষ্ণৌয়ের নানা মহলে ধাক্কা খেতে খেতে একদিন নিঃস্ব অবস্থায় তার মনে পড়ল আশ্রয়দাতা ভবানন্দের কথা। তখন যে রোগে তাকে ধরেছে তার থেকে পরিত্রাণের কড়ি তার ছিল না। তাই প্রাথমিক চিকিৎসার পরই সে ভবানন্দকে চিঠি লিখে চলে এল সমুদ্র-সৈকতের এই নির্জন নিবাসে। সে জানত, সংসারে তাকে সবাই ঘৃণা করলেও একটি মানুষের কাছে সব অপরাধ নিয়ে আশ্রয়ের আশায় দাঁড়ানো যায়। ভুল হয়নি অন্তরার ভাবনায়। ভবানন্দ এতদিন পরে অন্তরাকে দেখে কোন রকম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। ফিরে পাবার খুশিতে অতীতের বিরাট অন্যায়টাকে মুছে দিলেন।

ভবানন্দ অন্তরার প্রতিটি খবরই পেতেন। লক্ষ্ণৌতে তিনি গান শিখেছিলেন প্রথম জীবনে। সেখানকার পরিচিত মহল মাঝে মাঝে তাঁকে অন্তরার খবর জানিয়ে চিঠি লিখত। তিনি দুঃখ পেলেও কারো চলার পথে বাধা দিতে বা উপদেশ ছড়াতে চাইতেন না।

সন্ধ্যায় অন্তরা নির্জন ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল তার সদ্য ফেলে আসা অতীত জীবনটার কথা। হঠাৎ একটা সুর কানে এল। পাশের ছোট ঘরে টেপ রেকর্ডাবে বাজছে তারই গাওয়া একটা গানের সুর। অন্তরা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

ভবানন্দ তাকে অনেক যত্ন করে গান শিখিয়েছিলেন। প্রাচীন বাংলা গান, রাগপ্রধান, অতুলপ্রসাদ, ডি. এল. রায়, আরও কত নামী সঙ্গীতস্রষ্টার গান। তাকিয়ে দেখ, বিধাতাপুরুষ কত যত্নে রঙ ঢেলে, গন্ধ ঢেলে, ফুলটিকে ফুটিয়ে তুলছেন, তবেই তো 'আহা আহা' বলে বাহবা দিচ্ছে মানুষ। গায়ককে স্রষ্টার মত সুরে সুরে ফুটিয়ে তুলতে হবে গান, তবে পাবে সমঝদারের স্বীকৃতি।

কত দিন কত রাত গান-পাগল এই মানুষটি তাকে কাছে বসিয়ে গান শিখিয়েছেন। গাইতে গাইতে থেমে গিয়ে বলতেন, গান শুনতে হয়। যত শুনবে, সুর তত মনের মধ্যে বসতে থাকবে। একসময় সুরে সুরে ভরে যাবে যখন তোমার মন তখন কণ্ঠ দিয়ে সে সুর আপনি উপচে ছড়িয়ে পড়বে।

সামান্য শুনেই গলার খেলা খেলতে নেই। তাতে বাইরে থেকে পাওয়া সুর বাইরের ঘর থেকেই ফিরে যায়, একান্ত অন্দরমহলের অন্তরঙ্গতা কখনো পায় না।

ভবানন্দ তাকে গান শিখিয়েছিলেন। টেপও করে রেখেছিলেন তার গান। কত দিন পরে অন্তরা আজ শুনতে পেল নিজের গাওয়া গান। তার মনে হল, এ যেন অন্য এক জীবনের লীলা। কোন জন্মান্তরে এই সুর, এই গান তার গলায় গুঞ্জন করে ফিরেছিল সোনালী এক ঝাঁক মৌমাছির মত। পর পর অনেক ক'টি গান বাজল। সব ক'টিই ভবানন্দের কাছে শেখা অন্তরার গলার গান।

এক একটি গান শেষ হচ্ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে জয়তিলক তারিফ করে উঠছিল সে গানের। অন্তরার মনে হচ্ছিল কে যেন একটি একটি করে গোলাপ, চাঁপা, গন্ধরাজ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে তাকে লক্ষ্য করে।

একসময় টেপ করা গান বাজানো শেষ হল। অন্তরা বুঝতে পারল ভবানন্দ আর জয়তিলক বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওরা নীচে নেমে গেল। সিঁড়িতে পায়ের সাড়া অনেক মৃদু মনে হল। অন্তরা বুঝল, ওরা ওকে বিশ্রাম থেকে জাগিয়ে কিছু বলতে চায়নি, তাই প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা একা বেড়িয়ে ফিরল জয়তিলক। ভবানন্দ কাজে গেলেন টাউনে। জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল লহনা। অন্তরা চুপি চুপি বলল, গোরাবাবু কোথায় রে?

লহনা ফর্সা রঙের লোককে বলে গোরাবাবু। জয়তিলক লহনার কাছ থেকে গোরাবাবু সার্টিফিকেট পেয়েছিল। অন্তরার কথার জবাবে লহনা একটু হেসে বলল, গোরাবাবুকে পাঠিয়ে দেব দিদিমণি?

লহনার ভাবনায় বুদ্ধির চমক আছে।

অন্তরা একটু ধমকের সুরে বলল, আমি কি তাই বলেছি তোকে?

লহনা অনেক আগে, বেশ কিছুকাল ধরে অন্তরাকে এখানে দেখেছে। তার মেজাজ মর্জির সঙ্গে সে কিছুটা পরিচিত। তাই অন্তরার ধমকটা গায়ে মেখে নিয়ে সিঁড়িতে দ্রুত লযে যেন কত্থকের বোল বাজাতে বাজাতে নেমে গেল।

একটু পরে সিঁড়িতে আবার পায়ের সাড়া বেজে উঠতেই অন্তরা বুঝল, জয়তিলক ওপরে উঠে আসছে। অন্তরার মনে হল নিশ্চয়ই ঐ নির্বোধ মেয়েটা জয়তিলককে তাব সম্বন্ধে কিছু বলে থাকবে। সে সঙ্কোচে দরজার দিকে না তাকিয়ে চুমুক দিয়ে গরম দুধটুকু খেতে লাগল।

জয়তিলক ঘরে ঢুকে সোজাসুজি বলল, আমি কালই মনে কবেছিলাম আপনাকে বলব কথাটা।

অন্তরা চমকে উঠল। কি বলতে চায় জয়তিলক! তার কোন ত্রুটি বা অবাধ্যতার জন্য শাসন কি?

সে অজ্ঞাত আশঙ্কা বুকে চেপে ম্লান চোখে তাকাল জয়তিলকেব দিকে।

জয়তিলকের মুখে কিন্তু শাসনের ছবি ছিল না। একটা উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠেছিল তার চোখে-মুখে।

জয়তিলক বলল, কাল সন্ধ্যেটা খুব সুন্দর কেটেছিল আমাদের।

অন্তরা কিছু যেন আন্দাজ করতে পারছিল। তবু সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল। জয়তিলক বলল, আপনি যে এত ভাল গান করেন তা আমি জানতাম না।

অন্তরা চোখ নামিয়ে চামচটা অকারণে দুধের কাপে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আপনি খুব গান ভালবাসেন বুঝি?

জয়তিলক জনালার কাছে এগিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, গান কে না ভালবাসে বলুন? গানের মত গান হলে ঘন্টার পর ঘন্টা একই আসরে কাটিয়ে দেওয়া যায়। মেডিকেল পড়ার সময়ে হোল নাইট কনফারেন্স শোনার জন্যে বন্ধুরা সব হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

অন্তরা বলল, আপনি ক্লাসিক্যাল শুনতে ভালবাসেন বলে মনে হচ্ছে?

জয়তিলক বলল, শিল্পী যে গানই করুক, গলা ক্লাসিক্যালে সাধা না থাকলে গানের যথার্থ রূপটি ফুটে ওঠে না বলেই আমার বিশ্বাস।

অন্তরার চোখে গভীর তৃপ্তির আলো। সে বলল, গান সত্যিই আপনি ভালোবাসেন দেখছি।

জয়তিলক বলল, আপনার গলার গান আঙ্কল টেপ করে নিয়েছিলেন। কাল সন্ধ্যায় সেই টেপ বাজিয়ে শোনালেন। অসাধারণ আপনাব গলা।

প্রবল বেগে কে যেন একটা ধাক্কা দিল অন্তরার বুকে। সে অতি কষ্টে দুটো চোখ বন্ধ করে সে ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার সামনে জেগে উঠল একাডেমীর মঞ্চ। আজম খাঁ দাঁড়িয়ে পর্দাব আড়ালে। সে আজম খাঁকে বলছে, অসাধারণ আপনার গান।

ঠিক তেমনি ভাষায় তার গানের তারিফ করে উঠল জয়তিলক। তাই কোন অশুভ অশঙ্কায় হঠাৎ দুলে উঠল তার মন।

নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলাব চেষ্টা কবল অন্তরা, একদিন গান হয়েতো ভালবাসতাম, কিন্তু সে এখন অতীতের বস্তু হয়ে গেছে।

জযতিলক বলল, এ কথা কেন বলছেন?

খুব কষ্টেব একটা হাসি ফুটে উঠল অন্তরার মুখে। বলল. আপনিই তো বাবণ করেছেন আমাকে গাইতে।

ও তাই বুঝি? কথাটা বলেই হাসতে লাগল জয়তিলক। বলল, আমার ভেতর দুটো মানুষ বাস করছে। একটা সমঝদার, আর একটা ডাক্তার। সমঝদার মানুষটা যখনই মাথা নেড়ে বলছে, 'গান চলুক, গান চলুক,' ঠিক তখনই ডাক্তার মানুষটা তেড়ে উঠে বলছে, 'চলবে না, চলবে না।'

অন্তরা আর জয়তিলক একই সঙ্গে হেসে উঠল।

হাসি থামলে জয়তিলক বলল, অপনার নিজের গলাতেই গান শুনে যাব আমি। এখন তো আপনি প্রায় সেরেই উঠেছেন।

অন্তরার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। বলল, এ আপনার সান্ত্বনা। জানি, আর কোনদিন তেমন করে গান গাওয়া আমার হবে না।

জয়তিলক বলল, আমি ডাক্তার হয়ে আপনাকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছি, একেবারে সুস্থ হয়ে গেলে গান গাইবার বাধা আর আপনার থাকবে না।

অন্তরার চোখে জল টলমল করে উঠল। বলল, সত্যি আপনি আমাকে বাঁচিয়ে তুললেন। আমি মনে মনে একরকম মরেই গিয়েছিলাম। গলা থেকে গান গেলে আমার আর রইল কি বলুন?

জয়তিলক হঠাৎ বলল, প্রশ্নটা সঙ্গত হবে কিনা বুঝতে পারছি না, তবে একটা কথা জানার কৌতূহল জেগেছে মনে।

অন্তরা বলল, অসংকোচে বলতে পারেন।

জয়তিলক বলল, আপনার সংসারে কে আছেন?

ম্লান হেসে বলল অন্তরা, আপাততঃ নিজে ছাড়া কেউ নেই।

চুপচাপ জানালার বাইরে চেয়ে বসে রইল জয়তিলক।

এবার প্রশ্ন করল অন্তরা, কি দেখছেন।

জয়তিলক মুখ না ফিরিয়েই বলল, সি-গাল, সমুদ্র, ঝাউবন, দু'একটি নৌকোর ভেসে চলা।

অন্তরা বলল, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই নিজেকে দেখছেন। এতগুলো জিনিস একসঙ্গে কেউ দেখে না। সব কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকলেই বুঝতে হবে মানুষ নিজের মন নিয়ে খেলা করছে।

জয়তিলক বলল, আমি মন-টনেব কারবারী নই।

অন্তরা বলল, এই দিনের শুরুতেই মিছে কথাটা বলছেন কেন?

জয়তিলক তাকিয়ে রইল অন্তরার দিকে।

অন্তরা আবার বলল, যিনি হার্ট অপারেশন করেন তিনি হার্টেব খবর রাখেন না, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

জয়তিলক হেসে বলল, কথায় আপনার কাছে হার মানলাম, কিন্তু এ কথা স্পষ্ট জেনেছি, হার্টের খবর হার্ট অপারেশন করে পাওয়া যায় না।

অন্তরা বলল, এখন আমার একটা কৌতূহলের উত্তর পাব কি?

জয়তিলক চেয়ারে নড়ে চড়ে বসে বলল, অবশ্যই।

আপনার সংসারে কে কে আছেন? প্রশ্ন করল অন্তরা।

জয়তিলক বলল, আমার সংসার ষোলকলায় পূর্ণ। মা বাবা, ছ'টি ভাই-বোন। দাদাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি ভাইয়েদের ভেতর ছোট। আমার দাদারা সকলেই কৃতী আর সংসারে প্রতিষ্ঠিত। একটি বোনের বিয়ে বাকী। আমার বাবা মা দারুণ রকম স্বাধীনচেতা। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বিশ্বাসী।

অন্তরা বলল, আমি বাবা-মাকে বেশি দিন কাছে পাইনি তাই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তাঁরা আমাকে কি ভাবে গড়ে তুলতে চাইতেন।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল লহনা। জয়তিলকেব দিকে তাকিয়ে বলল, আজ কি রান্না হবে?

জয়তিলক অন্তরার দিকে মুখ তুলে বলল, আজ থেকে এই দিদিমণির কাছে প্রতিদিনের রান্নার ব্যাপারটা জেনে নিও।

অন্তরা বলল, বেশ তো চলছিল। এর ভেতর আবার আমাকে টানাটানি কেন? আর তাছাড়া আমি অসুস্থ মানুষ।

জয়তিলক বলল, এখন থেকে অপনার আর নিজেকে অসুস্থ ভাবা চলবে না। আপনি সম্পূর্ণ না হলেও সুস্থ হয়ে গেছেন এ কথা আজ থেকেই আপনি ভাবতে পারেন।

অন্তরা হেসে বলল, আমি কিন্তু ভাবতে পারছি না।

কেন? চোখে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে অন্তরার দিকে তাকাল জয়তিলক।

অন্তরা বলল, একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছি এতদিন, তবু বলছেন আমি নিজেকে সুস্থ বলে ভাবব?

জয়তিলক বলল, কাল সকাল থেকে আপনি আমার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরোবেন।

অন্তরা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটা। বলল, সত্যি বলছেন, আমি বেড়াতে বেরোব? যদি ডাক্তার চক্রবর্তী অথবা কাকুর কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায়?

জয়তিলক বলল, সে দায়িত্ব আমার। ভরসা রাখুন আমার ওপর। প্রথম প্রথম আমার হাত ধরে হাঁটবেন। তারপর নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস জন্মালে নিজেই হাঁটতে পারবেন।

অন্তরা কিছু বলল না। সে মেঝের দিকে তাকিয়ে একটা অসম্ভব সুখের ভাবনা ভাবতে লাগল। তার শরীরটা সহসা শিউরে উঠল। মনে হল সে যেন ভোরের কোমল রোদটুকু গায়ে মেখে জয়তিলকের হাত ধরে সুমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো বা হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলেছে করতালিতে সীগালগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে, জয়তিলক তাকে ধরার চেষ্টা করছে, সে কিছুতেই ধরা না দেবার জন্যে ছুটছে আরও জোরে। কিন্তু একসময় জয়তিলকের কাছে তাকে হার মানতে হল। ততক্ষণে তার সবটুকু দম ফুরিয়েছে। জয়তিলক ছুটে এসে শক্ত করে জড়িয়ে না ধরলে সে নিশ্চয়ই নিঃশেষ হয়ে লুটিয়ে পড়ত। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল অন্তরা, কখন তার ভাবনার ফাঁকে জয়তিলক নিঃশব্দে ঘর থেকে উঠে চলে গেছে।

ভবানন্দ মিত্রের সাগরবেলার বাড়িতে কাটল জয়তিলক ও অন্তরার আরও দুটি মাস।

ডাক্তারের হাত ধরে চলতে গিয়ে অন্তরা বুঝতে পারল এ হাত অনেক শক্ত আর নির্ভরযোগ্য। আপত্তি ছিল না জয়তিলকের দিক থেকেও। সে চিরদিনই গান ভালবাসে। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের সে একজন উৎসাহী সমঝদার। অন্তরার সাধা গলার সঙ্গে কর্ণাটক সঙ্গীতের সুরের যোগ হলে অনেক সমৃদ্ধ হবে সে গলা, এ ধারনা জয়তিলকের মনকে অধিকার করে বসল। কথাটা শুনে অন্তরারও উৎসাহের অন্ত রইল না।

একদিন সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে জয়তিলক ভবানন্দ মিত্রের কাছে অন্তরাকে ভেলোর নিয়ে যাবার প্রস্তাব রাখল। ভবানন্দ হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বললেন, নিয়ে যেতে চাও যাও। কিন্তু এ যাওয়া দু'রকমের হতে পারে। এক চিকিৎসার জন্যে, আর দ্বিতীয় সঙ্গিনী করে সঙ্গে নিয়ে। এখন এর ভেতর কোনটির কথা ভেবেছ আমাকে খুলে বল।

জয়তিলক বলল, আঙ্কল, আমি ডাক্তার কিন্তু গান আমার রক্তে ঢেউ তোলে। সেদিক থেকে ভেবে দেখেছি একটা প্রতিভাকে সুস্থ পরিবেশের ভেতর রাখতে পারলে সে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন অন্ততঃ শরীরের ব্যাপারে ও অন্য পাঁচজনের চেয়ে আমার ওপর বেশী ভরসা রাখতে পারে। আর তাছাড়া দক্ষিণী গানের জগৎ থেকে ওরও কিছু নেবার আছে।

জয়তিলকের কথায় বার্তায় কোন অস্পষ্টতা নেই, তাই ভবানন্দ ভালোবাসেন এই প্রতিভাধর যুবকটিকে। বললেন, উত্তম প্রস্তাব, আমার দিক থেকে কোন বাধার প্রশ্নই ওঠে না, তবে যাকে নিয়ে যেতে চাইছ, নিশ্চয়ই পেয়েছ তার সম্মতি?

জয়তিলক বলল, আমি ওকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে চাই, স্পষ্ট করে কিছু না বললেও দুজনের মনের ইচ্ছাই যে এক তা আমরা বেশ অনুভব করেছি।

ভবানন্দ বললেন, তোমাদের দুজনকেই আমি ভালোবাসি, তাই তোমাদের বোঝাপড়ার ভেতর কোন অস্পষ্টতা থাকে এ আমি চাই না।

একটু থেমে আবার বললেন, অন্তরা কি তার অতীত জীবনের কোন কথা তোমার কাছে বলেছে?

জয়তিলক বলল, কথায় কথায় সবই জেনেছি আমি ওর। এতে অন্তরার ওপর আমার আকর্ষণ আরো বেড়েছে।

ভবানন্দ বললেন, আমি তোমাদের মিলনে সবচেয়ে বেশী খুশি হব জানবে। তবু একটা কথা আজ তোমাকে বলতে চাই। এ কথার সবটুকু অন্তরা জানে না, কিন্তু তোমার জানা দরকার। কোন গোপনতা এই মুহূর্তে অমি রাখতে চাই না তোমার আর তার মিলনের মাঝখানে।

জয়তিলক তাকাল ভবানন্দের মুখের দিকে। ভবানন্দ বললেন, এসো ঐ ঝাউ-গাছগুলোর তলায় বসি। —ওরা ঝাউয়ের তলায় গিয়ে বসল।

ভবানন্দ বললেন, তোমরা তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্র মতে কি বলবে জানি না, কিন্তু আমরা পূর্বপুরুষের রক্তের একটা প্রভাব অনেক সময় পড়তে দেখেছি। আর তাই স্বভাবের ভেতরেও আশ্চর্য রকম মিল দেখা গেছে ওদের।

জয়তিলক বলল, এটা অসম্ভব নয়।

ভবানন্দ বললেন, অন্তরার ইমিডিয়েট পূর্বপুরুষের ইতিহাসটা তোমার জেনে রাখা ভাল।

জয়তিলক তাকিয়ে রইল ভবানন্দের মুখের দিকে।

ভবানন্দ বললেন, ঘটনাটা সংক্ষেপেই বলি। অন্তরার বাবা ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাদের কর্মক্ষেত্র ছিল আলাদা, কিন্তু আমরা গান শিখতাম একই গুরুর কাছে।

অন্তরার বাবা স্বভাবে বড় চঞ্চল আর উচ্ছৃঙ্খল ছিল, দেহবিলাসে রুচির বালাই ছিল না তার। প্রতিবেশীর মেয়েরা সন্ত্রস্ত থাকত। একসময় অবস্থা এমন দাঁড়াল যে পাড়ার বিশিষ্ট লোকেরা ওর বিরুদ্ধে একজোট হল। শেষে বেগতিক বুঝে ওকে আমরা ক'বন্ধু এনে তুললাম অন্য পাড়ায়। সেখানেও কিছুদিনের ভেতর শুরু হল অশান্তি আর ঝামেলা।

আমরা তখন উপায়ান্তর না দেখে প্রায় জোর করেই ওর বিয়েটা দিয়ে দিলাম।

একটু থেমে ভবানন্দ বললেন, ভুলই করেছিলাম জয়তিলক। বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে একটি নিরপরাধ মেয়ের সর্বনাশই করলাম।

জয়তিলক বিস্মিত। সে জিজ্ঞাসু-চোখে তাকিয়ে রইল ভবানন্দের মুখের দিকে।

ভবানন্দ বলতে লাগলেন, বিয়ের ক'টা দিন কাটতে না কাটতেই বুদ্ধিমতী মেয়েটি চিনতে পারল স্বামীর স্বরূপ। তারপর থেকে হাসিখুশি মেয়েটিকে ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখলাম। বিয়ের পর বোধকরি একটি বছরও কাটল না, অন্তরার জন্ম দিয়েই সে পৃথিবী থেকে সরে গেল।

জয়তিলক বলল, অন্তরার জন্ম দিতে গিয়ে কি ওর মা মারা যান?

ভবানন্দ বললেন, না, সে আত্মহত্যা করেছিল।

জয়তিলক আর কোন প্রশ্ন করল না দেখে ভবানন্দ বলে চললেন, স্ত্রী মারা যাবার পর আর বিয়ে করেনি অন্তরার বাবা, কিন্তু সেটা স্ত্রী-বিয়োগের ব্যথার জন্য আদপেই নয়। মেয়েকে দেখাশোনা করার জন্য একটি আয়া দেখে শুনে নিযুক্ত করা হল। আয়াটি অচিরেই বাপ আর মেয়ে দুজনের সেবাতেই লেগে গেল। আমরা নানাভাবে ওর স্বভাব বদলের চেষ্টা করলাম, কিন্তু স্বভাব না কি মৃত্যুর পরেও অটুট থাকে, তাই হার মানতে হল ওর কাছে। আমরা আস্তে আস্তে সরে এলাম। ওর সঙ্গ আমাদের কাছে কেমন অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু এই চঞ্চলতার ভেতর ওর মনের আর একটা দিক আমাকে অবাক করে দিত। ও যখন গান

শিখত বা গাইত তখন ওর মুখের ওপর গভীর মগ্নতার একটা ছবি ফুটে উঠতে দেখতাম। ও তখন পারিপার্শ্বিক বেমালুম ভুলে ডুবে থাকত গানের ভেতর। ভদ্র পল্লী থেকে নিষিদ্ধ পল্লী সব জায়গাতেই শুধু গান শেখার জন্য সে যাতায়াত করত। মাঝে মধ্যে এক আধবার দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। সত্যি বলতে কি আমি নানাকাজের অছিলায় ওকে এড়িয়ে যেতাম। আগের বন্ধুত্বে তখন আমাদের চলছিল ভাঁটার টান।

প্রায় এক যুগ পরে ওকে একদিন দেখলাম আমার সামনে এসে দাঁড়াতে। অন্তরা তখন সবে তেরো কি চোদ্দ বছরের কিশোরী। একপাশে দাঁড়িয়ে সে অবাক চোখে সব কিছু দেখছিল।

আমি ওদের ঘরের ভেতর এনে বসালাম। অনেকদিন পরে দেখা। মনে হল অন্তরার বাবার শরীরটা এরই ভেতর দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়েছে।

একথা সেকথার পর আসল কথা উঠল। অন্তরাকে আমার কাছে রেখে নিশ্চিন্ত হতে চায় আমার বন্ধু। ওর নাকি গানের গলা আছে, আর সে গলা আমার কাছে উপযুক্ত তালিম না পেলে কিছুতেই খুলবে না।

কৌতূহলী হয়ে কিশোরী অন্তরাকে দিয়ে গান গাওয়ালাম। ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠ ছাড়া এমন গান গাওয়া যায় না। দেখলাম বাবার কাছে অনেকদূর এগিয়ে গেছে ও। এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। আমার কাছে মেয়েকে রেখে সেই যে ও চলে গেল, তার আর কোন হদিশ পেলাম না। হঠাৎ একদিন এক অচেনা জায়গা থেকে চিঠি পেয়ে জানলাম, অন্তরার বাবা বাংলাদেশের বাইরে কোন এক পাহাড়ী জায়গায় আশ্রম খুলে বসেছে। সেখানে এক অসামান্যা মহিলা নাকি তার উত্তর সাধিকা। আমাকে আশ্রম দেখার আমন্ত্রণও জানিয়েছে। বলাবাহুল্য যাবার কোন বাসনাই জাগেনি আমার মনে।

তুমি জান, নিজের সংসার বলতে যা বোঝায় তা আমার নেই। আমি অন্তরাকে নিজের মেয়ে ভেবে নিয়ে গান শেখাতে লাগলাম। গান ও শিখত অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে। ভোর রাত থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে ও রেওয়াজ চালিয়ে যেত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, পরিবর্তন ঘটতে লাগল ওর মনের। গান শেখার নেশার সঙ্গে কি এক মাতাল হাওয়ায় উড়ে চলার নেশায় পেয়ে বসল ওকে। গুণগ্রাহী আর বন্ধুবান্ধবের দল ভীড় জমাল ওর চারদিকে। তাদেরই তদ্বির আর চেষ্টায় ও গানের আসরে সুযোগ পেল বসার। নামও শোনা যেতে লাগল। আমার ঘর তখন ওর বন্ধুবান্ধবে সরগরম। একদিন কানে এল একটুকরো কথা। জানতে পারলাম, নামী কোন শিল্পীকে ডাউন করে ওর চেলারা ওকে ওঠাবার চেষ্টা করছে। ওরা পর পর কয়েকটা আসরে দল বেঁধে যাবে। বিকৃত মন্তব্য ছুঁড়তে থাকবে বিখ্যাত শিল্পীটির গানের সময়, আর ঘন ঘন করতালিতে অভিনন্দিত করবে অন্তরাকে।

এ ব্যবস্থা হয়তো অনেক অগে থেকেই চলে আসছিল। কথাটা শোনার পর ওকে একসময় নিভৃতে ডেকে বললাম, অন্তরা, কাউকে ছোট করে নিজেকে বড় করা যায় না। আর ভাড়াটের হাততালির ওপর ভরসা না রাখাই ভাল। একদিন যারা তোমাকে তুলছে তারাই তোমাকে নামাবে।

সেদিন অন্তরা উত্তেজিত ছিল। বলল, তোমাদের যুগ চলে গেছে কাকু। ভাল গলা নিয়ে বসে থাকলে কেউ সেধে এসে ডেকে নিয়ে যাবে না।

একটি তথাকথিত জনপ্রিয় শিল্পীব নাম করে বলল, তুমি জান ও কি দরের গাইয়ে। কিন্তু টাকা উড়িয়ে, মেক আপ দিয়ে ও এখন হয়েছে প্রথম সারির শিল্পী। ভাড়াটেদের হাততালির জোরে আওয়াজ উঠেছে তুঙ্গে। এখন ওর ডাক আসছে দূরে কাছে সব জায়গা থেকে।

আমি ওকে স্নেহ করি, তাই ওর স্বভাবের এই পরিবর্তনে দুঃখ পেলাম। আর কোন উপদেশ দিতে গেলাম না। আমি জানতাম, মানুষ আঘাত পেয়েই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। উপদেশের চেয়ে তার দাম অনেক বেশি। তাই চুপ করে গেলাম।

এর অল্পদিন পরেই একাডেমী অব ফাইন আর্টসের মঞ্চে আজম খাঁর সঙ্গে ওর দেখা। তার পরের ঘটনাগুলো হয়তো তোমার অজানা নয়। আমি আজ তোমাদের নতুন জীবনে প্রবেশের মুহূর্তে এ

কথাগুলো নিজের ভেতর গোপন করে রাখতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে ভালোবাসি বলেই সব বললাম। এখন তোমার দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দিলাম জয়তিলক। মেয়েটার ভেতরে বস্তু আছে। তাকে ঠিক রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যাও, তোমার কাছে আজ এই আমার প্রার্থনা।

জয়তিলক বলল, প্রার্থনা বলছেন কেন আঙ্কল, আশীর্বাদ করুন যেন গভীর দুঃখের দিনেও ওকে ভালবাসতে পারি।

ভবানন্দ মিত্রের ভাবান্তর হল। তিনি কতক্ষণ জয়তিলকের হাতখানা চেপে ধরে বসে রইলেন।

দক্ষিণ ভারত থেকে অন্তরার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার খবর নিয়ে চিঠি এল। জয়তিলকের চিঠিতেই অন্তরা ভবানন্দকে দু'ছত্র লিখে জানিয়েছে, সে দক্ষিণী গুরুর কাছে সঙ্গীতে তালিম নিচ্ছে।

খুশি হলেন ভবানন্দ। চিঠির উত্তরও দিলেন। তারপর পুরো দু'টি বছর নীরবতা। ভবানন্দ সাধ্যমত মানুষের উপকার করে যাওয়াতে বিশ্বাসী, তাই প্রত্যাশার দুঃখ তাঁকে পীড়া দিতে পারল না।

দু'বছর পরে চিঠি এল জয়তিলকের। সে পশ্চিম জার্মানীর কোন হসপিটালে ভিজিটিং সার্জেন হয়ে তিন বছরের জন্যে চলে যাচ্ছে। অন্তরাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সে গান ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। এদিকে বিখ্যাত এক রেকর্ড কোম্পানীর অন্যতম ডাইরেক্টরের সঙ্গে জয়তিলকদের আলাপ হয়েছে। তিনি তাঁর বাংলাদেশের অফিস থেকে অন্তরার গানের রেকর্ড যাতে করা হয় সে বিষয়ে অনুরোধ জানাবেন বলেছেন। অন্তরা নাকি বলেছিল, রেকর্ড কোম্পানী একটা দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ। ঢোকার পথ শক্ত, বেরোনোর পথ ততোধিক। জয়তিলক শেষে লিখেছে, অন্তরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিনই আমি দাঁড়াইনি। ও বাংলাদেশে যেতে চাইছে, যাক। শুধু অনুরোধ, সম্ভব হলে আপনি ওকে লক্ষ্য রাখবেন। ও উন্মাদনার বশে কাজ করে। ওকে একটু সংযত হতে সাহায্য করবেন।

ভবানন্দ শুনলেন, অন্তরা কলকাতা এসেছে। উঠেছে এক নামী হোটেলে। সেখানে দু'বেলা পার্টি দিচ্ছে রেকর্ড কোম্পানীর হর্তাকর্তাদের।

কিছুকাল পরে শুনলেন, রেকর্ড বেরিয়েছে অন্তরার। নিজে গিয়ে কিনে আনলেন। বাজিয়ে শুনলেন দুটি চোখ বন্ধ করে। খাসা হয়েছে অন্তরার গান। গলার কাজ হয়েছে পরিষ্কার। আনন্দ পেলেন ভবানন্দ। দক্ষিণে গিয়ে যে বসে থাকেনি অন্তরা তার প্রমাণ পেলেন এতদিনে। অভিমান যে না হচ্ছিল তাঁর তা নয়, তবে অন্তরার কৃতিত্বে তাঁর অন্তর এমন ভরে উঠেছিল যে অভিমান সব ঠেলে ওপরে উঠে আসতে পারছিল না।

কাগজে সমালোচনা বেবোল রেকর্ডের। প্রশংসায় ভরে উঠেছে পাতা। ভবানন্দ এক বড় বিক্রেতার কাছে জিজ্ঞেস করে জানলেন, রেকর্ডখানা বিক্রিও হচ্ছে প্রচুর! কোন একদিনে নাকি দেড়শো খানা রেকর্ডও বিক্রি হয়েছে।

ভবানন্দ খুব খুশি হলেন। কিন্তু পথে আসতে আসতে তাঁর মনে হল, এ আবার অন্তরার সেই আগের খেলা নয় তো! টাকা ছড়িয়ে বাজার থেকে নিজের রেকর্ডগুলো কুড়িয়ে নেওয়া চাহিদা সৃষ্টির সোজা পথ।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে একসময় নিজের মনকে শাসন করলেন। অন্তরার রেকর্ড বিক্রি হোক ওঁর অন্তরের ইচ্ছা, তাহলে এসব অশুভ ভাবনা কেন?

ভবানন্দ শেষে অন্তরার কৃতিত্বকে স্বাভাবিক আনন্দে স্বীকার করে নিলেন।

পর পর রেকর্ড বেরোতে লাগল অন্তরার। গান শুনতে শুনতে মনে হল ভবানন্দের, কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছে। প্রথম দিকের গানে শিল্পীর যে প্রাণঢালা আকুতি ছিল, এখনকার রেকর্ডে তা যেন আর নেই। এ যেন কোম্পানীর ফরমায়েসী গানে গলা দিতে হচ্ছে। অতি আধুনিক গানের এলোমেলো কথায় এলোপাথাড়ি সুরের খেলা চলেছে।

দুঃখ পেলেন ভবানন্দ। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। একজন নামজাদা ভাস্কর যখন জনতার হাতে তাঁর সৃষ্ট মূর্তিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে দেখেন, তখন তাঁর মনের অবস্থা যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

ইতিমধ্যে খবর আসতে লাগল হাওয়ায় উড়ে, অন্তরা ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। রোজ তাকে দেখা যাচ্ছে ম্যানেজার সাহেবের গাড়িতে। অন্তরা নাকি এখন সাহেবের খাস কামরার সঙ্গিনী।

ভবানন্দ মিত্র ভাবেন, কার অপরাধে এমন হল? জয়তিলকের মত এমন একটা প্রতিভাকে চিনতে পারল না অন্তরা। কি আশ্চর্য রক্তের প্রভাব। কি ভীষণ নামের নেশা।

হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল অন্তরার সঙ্গে। তানপুরার তার কিনতে এসেছিল একটা দোকানে। সেই পথে যাচ্ছিলেন ভবানন্দ। অন্তরাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। চোখাচোখি হতেই অন্তরা নেমে এল পথে। অনিচ্ছায় একটা প্রণামও করতে হল।

ভবানন্দ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অন্তরা বলল, কিছু মনে কোর না কাকু, অমি যে তোমার কাছে গান শিখেছি, একথা কাউকে না বললে আমার উপকার হবে। এখন সবাই জানে আমি দক্ষিণী গুরুর কাছ থেকে তালিম নিয়ে এসেছি। ওরা সেজন্যে আমাকে আলাদা চোখে দেখে।

ভবানন্দ বুঝলেন, অন্তরার অধঃপতন একেবারে শেষ অঙ্কে এসে পৌঁছেছে।

তিনি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, অমি তো রেকর্ড-আর্টিস্ট অন্তরাকে গান শেখাইনি, আমি যাকে গান শেখাতাম সে গান শেখার তাগিদেই গাইত, নামের জন্যে গাইত না। সে যাই হোক,শরীর তোমার ভাল যাচ্ছে তো? জয়তিলকের খবর কি?

অন্তরা বলল, এত কথা বলবে জানলে ও কথা তোমাকে বলতাম না। আগেও বলেছি এখনও বলছি, নাম করতে গেলে চুপচাপ বসে থাকলে চলে না। কেউ কারো হয়ে কিছু করে দেবে না। নিজের পথ নিজেকেই কেটে চলতে হবে। হ্যাঁ, জয়তিলকের কথা জিজ্ঞাসা করছিলে না? সে জার্মানী থেকে ফিরে কাজে যোগ দিয়েছে বলেই শুনেছি। অন্ততঃ হিসেব মত এতদিনে ওর ফিরে আসার কথা।

ভবানন্দ বুঝলেন, নামের পেছনে ছুটতে গিয়ে পেছন ফিরে তাকানোর অবকাশ আর নেই অন্তরার।

বললেন, অনেক দিন পরে দেখলাম তোমাকে। চেহারায় সে রুগ্নতা আর নেই দেখে খুশিই হলাম। জয়তিলক নিজে ডাক্তার। তার কাছে থেকে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।

একটা দামী গাড়ী পাশে এসে দাঁড়াল। প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক নামলেন গাড়ি থেকে। অন্তরা প্রায় দৌড়ে গিয়ে তাঁকে রিসিভ করল।

ভবানন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলল, ইনি আমাদের মজুমদার সাহেব। ইস্ট ইন্ডিয়া রেকর্ড কোম্পানীর প্রাণশক্তি।

হাসলেন মিঃ মজুমদার, বললেন, তোমরা প্রাণ-ভোমরা। তোমাদের ছেড়ে দিলে রেকর্ড কোম্পানী শক্তিহীন। কি বলেন মশায়?

ভবানন্দর দিকে তাকিয়ে রসিকতায় তাঁকে সাক্ষী মানলেন।

ভবানন্দ কোন উত্তর করলেন না। একটুখানি ভদ্রতার হাসি হাসলেন।

জাস্ট এ মিনিট প্লীজ, অন্তবা প্রায় দৌড়ে তানপুরার দোকানে ঢুকে গেল, পরমুহূর্তে ফিরে এসে বলল, চলুন মজুমদার সাহেব, আপনার হয়তো দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রতার খাতিরে মিঃ মজুমদার বললেন, আপনাকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

অন্তরা বলল, ওঁর সঙ্গে আমার অনেকদিনের জানাশোনা।

একটু হেসে মজুমদার সাহেব অন্তরাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি ভবানন্দের পাশ দিয়ে

বেরিয়ে গেল। ভবানন্দ দেখলেন, মজুমদার সাহেব কিংবা অন্তরা কারো চোখই তাঁর দিকে নেই। উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে দুজনে পাশাপাশি বসে। সেই মুহূর্তে জয়তিলকেব জন্যে দারুণ একটা দুঃখ অনুভব করলেন ভবানন্দ। সে দুঃখের অনুভূতি তাঁকে বেশ কয়েকটি দিন ধরে পীড়া দিতে লাগল।

মজুমদার সাহেব কঠিন কর্মকাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে গা-ঢাকা দিতে ভালোবাসেন। কাক-পক্ষীতেও টের পায় না কোথায় তিনি অবসর যাপন করছেন। মজুমদার সাহেব অবশ্য যথার্থ অর্থে অবসর বিনোদন করেন। সঙ্গে থাকে সঙ্গিনী। জীবন-সঙ্গিনীকে তিনি সংসার সঙ্গিনীর মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু অবকাশ-সঙ্গিনীর জন্য তাঁকে আর টানাটানি করার প্রবৃত্তি হয় না তাঁর। অবকাশ বিনোদনে চাই তেমন সঙ্গিনী, যিনি সঙ্গ দেবেন, আর হৃদয়ে বাজাবেন সঙ্গীতের সুর।

দু তিনটি দারুণ রকম উন্নতিকামী গায়িকার ভেতর থেকে তিনি মনে মনে নির্বাচন করেন একটিকে। প্রতিবারেই তাঁর স্বাদ বদলানো চাই। প্রতি বস্তুরই স্বাদ গন্ধের তফাত আছে। যিনি দক্ষ সমঝদার তিনি বস্তুতে বস্তুতে রকমারি স্বাদ সন্ধান করে বেড়ান। সেদিক থেকে মজুমদার সাহেব অসাধারণ সমঝদার।

এবার অন্তরা তাঁর অন্তরে ঠাঁই পেয়েছিল। স্থানটা আগে ভাগেই স্থির করে রেখেছিলেন। চাঁদিপুর-অন-সী। ওড়িষ্যার এই নির্জনতম সাগরতীরের খবর বড় কেউ একটা রাখে না। তাই ট্যুরিস্ট বাংলোয় স্থান পেতে কোন অসুবিধাই ছিল না। তবু বালেশ্বরের ট্যুরিস্ট ইনফরমেসন অফিসারকে লিখে আগে-ভাগে ট্যুরিস্ট লজ বুক করে রেখেছিলেন।

যাত্রার দুদিন আগে মজুমদার সাহেব ডেকে পাঠালেন অন্তরাকে। বললেন, তৈরী হয়ে নাও, পরশু রওনা দিতে হবে।

অন্তরা বিস্ময়ে ভরা দুটো চোখকে ওপরে তুলে বলল, ওমা, কোথায়?

মজুমদার সাহেব বললেন, নিশ্চয় ভেলোরে নয়।

অন্তরা বলল, তা আমি জানি। তবে স্থানটার নাম শুনলে বুঝতে পারব দূরে না কাছে।

মজুমদার বলল, সে প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?

অন্তরা বলল, মাসখানেকের ভেতর বিশাল ভারত মিলন মেলায় গান গাইবার ডাক পেয়েছি। তার জন্যে প্রস্তুতির দরকার, তাই বলছিলাম।

মজুমদার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, পাপিয়া নাগ সঙ্গে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি, তাকে এখনও কথা দিইনি। তোমার যখন অসুবিধে তাহলে থাক। পাপিয়া যাক আমার সঙ্গে।

অন্তরার এই মুহূর্তে নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্যে জিভটা কেটে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। সে হঠাৎ রুমাল বের করে কিছু বেশী সময় ধরে শুকনো চোখ দুটো মুছল। তারপর ধরা গলায় বলল, জানি, পাপিয়ার গান আপনার বেশী পছন্দ। সেদিন ই. পি. হয়েছে ওর। মুখের কথা বলতে হয়, তাই একবার বললেন। নইলে মনে মনে তো ঠিকই করে ফেলেছিলেন পাপিয়াকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে।

মজুমদার সাহেব দেখলেন, এক চালেই বাজী মাৎ হয়েছে। এখন গলার সুর নরম করে বললেন, ঐ নির্জন সমুদ্রতীরে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবাই যায় না।

অন্তরা বলল, আপনি আগে-ভাগেই রাগ করে বসলেন। আমার গানের সুবিধে অসুবিধের কথা আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব বলুন?

একটু থেমে আবার বলল, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি যাব না, একথা আপনি ভাবলেন কি করে? যিনি আমাকে গানের জগতে প্রতিষ্ঠা দিলেন, তাঁর কথার চেয়ে বড় কিছু আছে বলে যে আমি ভাবতেই পারি না।

খুশি হলেন মজুমদার সাহেব অন্তরার অন্তরিক টানটুকু দেখে।

এরপর রাতের ট্রেনে এলেন বালেশ্বর। স্টেশনে নেমেই দেখলেন ভোরের আয়োজন চলেছে। ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলেন। ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছতে আধ ঘন্টার বেশী লাগল না।

রাতে ট্রেনে ঘুম নামেনি অন্তরার চোখে। সে বসে বসে ভাবছিল। কত পথ কত প্রান্তর পেরিয়ে এলো সে। জীবনের পথেও তার যাত্রা কম হল না।

স্টেশনের পর স্টেশনে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলার যেন বিরাম নেই। কখন কোথায় একেবারে শেষ হবে যাত্রা তা সে জানে না, কে যে তাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে জীবনের এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে তা কোনদিন জানার চেষ্টাও করেনি সে। শুধু ভেসে চলার আনন্দেই সে ভেসে গেছে। ঘাটে ঘাটে তার বেচাকেনা। এক ঠাঁই কাজ শেষ হলে নতুন বন্দরে ভেসে চলা। বিশেষ কোন একটি বন্দরের বন্ধন-স্মৃতি তার কাছে উজ্জ্বল নয়। ট্যুরিস্ট লজের সামনেই ঝাউবন। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ছবির মত সাজানো বাংলো। বারান্দায় বসে সমুদ্রের ঢেউ গোনা যায়।

মজুমদার সাহেব আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছেন। হাতলের ওপর লীলাভরে বসে আছে অন্তরা। পাখি উড়ছে। অগুণতি পাখির ঝাঁক।

মজুমদার সাহেব বললেন, কেমন লাগছে অন্তরা?

অন্তরা বলল, এ ভাল লাগার তুলনা নেই।

মজুমদার সাহেব আবার বললেন, জায়গাটা কেমন নির্বাচন করেছি?

অন্তরার মুখে খুশির ঢেউ ভেঙে পড়ল, ওয়াণ্ডারফুল. এটা নির্বাচন কেন বলছেন, রীতিমত আবিষ্কার।

মজুমদার সাহেব অন্তরার হাতখানাতে নিজের হাতের আলতো চাপ দিয়ে বললেন, তোমাকে খুশি করতে পেরেছি, এতেই আমার তৃপ্তি। তুমি আর্টিস্ট, তোমার ভাল লাগা না লাগার অনেক দাম।

অন্তরা বলল, এমন করে বলবেন না। আপনি গাইতে না জানলেও শিল্পীর সৃষ্টিতে আপনার দান কম নয়। আপনি আমাদের সঙ্গীত-সংসারের প্রধানপুরুষ।

মজুমদার সাহেব খুশি হলেন মনে মনে।

বিকেলে রোদের তেজ কমে এলে জায়গাটা ধীরে ধীরে নির্জন হয়ে এল। মাটি আর বালি মেশা শক্ত বেলাভূমিতে হাঁটছিল দুটি মূর্তি। অন্তরা মাঝে মাঝে অষ্টাদশী হয়ে যাচ্ছিল। চঞ্চল পায়ে পাখিদের কাছাকাছি ছুটে গিয়ে হাততালি দিয়ে তাদের উড়িয়ে দিচ্ছিল। ফিরে এসে হাঁটছিল মজুমদার সাহেবের সঙ্গে। কখনো হাতে হাত রেখে, কখনো হাত ছেড়ে দিয়ে।

এক জায়গায় বনঝাউয়ের জটলা পার হয়ে আসার সময়ে মজুমদার সাহেব বললেন, অন্তরা এটি বোধহয় পৃথিবীর নির্জনতম স্থান।

অন্তরা বলল, আসুন এখানে একটু বসা যাক।

মজুমদার সাহেব তাই চাইছিলেন।

ওরা বালির ওপর বসে পড়ল। পেছনে বনঝাউয়ের সংসার, সামনে সমুদ্র। আকাশে তখন ধূসর আলোটুকু ধরে রাখার সকরুণ চেষ্টা। মজুমদার সাহেব মুঠো করে ধরলেন অন্তরার হাত। অন্তরা সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল।

একটা ঢেউ কিছু ভেজা হাওয়া পাঠিয়ে দিল। অন্তরার শ্যাম্পু-করা চুলগুলো উড়ছিল। হঠাৎ অন্তরার মনে হল, যে মানুষটা তার হাত ধরে আছে সে জয়তিলক। ভাবতে গিয়ে সারা শরীরে তার রোমাঞ্চ খেলে গেল। সেই অসুস্থ থাকার দিনগুলোতে কে তাকে যেন ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

জয়তিলক বলল, কি ভাবছ অন্তরা?

অন্তরা নরম গলায় বলল. আমার সব ভাবনা যার কাছে এসে শেষ হয়েছে তার কথাই ভাবছি।

হাতে আরও জোরে চাপ দিলেন মজুমদার সাহেব। অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগোলেন আরও এক ধাপ।

কাঁপা গলায় যেন বলল জয়তিলক, আমার চেয়ে এই মুহূর্তে আর কেউ বেশী সুখী আছে কিনা জানিনা অন্তরা। আমাব সম্মান সম্ভ্রম আজ তোমার এই হাতের ভেতরেই বাঁধা।

অন্তরার মুখে রহস্যময় জ্যোৎস্নার হাসি। সে যেন অনেক দূরের কোন অন্ধকার জগতে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, আজ আমার যা কিছু আছে, সব তোমার। তুমি দস্যুর মত লুঠ করে নাও। আমি আমার একান্ত আপনার বলে কোন কিছু গোপন করে রাখব না।

সন্ধ্যার সমুদ্রের হাহাকার শুনতে শুনতে অন্তরা মজুমদার সাহেবের হাত ধরে এসে ঢুকল টুরিস্ট বাংলোয়। খানসামা এগিয়ে এসে ডিনারের মেনুর কথা জানতে চাইলে মজুমদার সাহেব বললেন, মেমসাব কো পুছো।

অন্তরা বলল, রাতে আমার কিছু খাবার ইচ্ছে নেই। তোমার জন্যে চিকেন তন্দুরীর অর্ডার দিচ্ছি।

খানসামা চলে গেল। মজুমদার সাহেব ঘরে ঢুকে একখানা সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। অন্তরা আলো জ্বেলে আয়নায় নিজেকে দেখল। চিরুনি চালিয়ে এলোমেলো চুলগুলোকে ঠিক মত গুছিয়ে নিল। তারপর একটুখানি প্রসাধনের টাচ নিয়ে এসে বসল বিছানার ওপর।

মজুমদার সাহেব অন্তরার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আজ ইন্দ্রাণী।

অন্তরা খিল খিল করে হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। আমি ইন্দ্রণী! আবার হাসি। আমি ইন্দ্রাণী! হাসির তরঙ্গ যেন বয়ে গেল ঘরের ভেতরে।

হাসিটা সুখের কি রুদ্ধ কান্নার তা বোঝা গেল না।

মজুমদার সাহেব বললেন, এমন করে হাসছ কেন, আমি তো ভুল কিছু বলিনি। আমার চোখে এই মুহূর্তে তুমি যে ভাবে ধরা পড়েছ, তাই আমি স্পষ্ট করে বলেছি। আবার হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল অন্তরা, তাহলে আমার ইন্দ্র আজ রাতে আপনি মজুমদার সাহেব।

মজুমদার বললেন, বেশ তো 'তুমি' শুরু হয়েছিল, আবার 'আপনি' কেন?

অন্তরা হাসতে হাসতে বলল, জিভের ওপর ভরসা কি! সবার সামনে আপনি বলতে বলতে ফস্ করে যদি তুমিটা বেরিয়ে পড়ে কখনো, আর সে সময় যদি আপনার অনেক পেয়ারের সুচন্দ্রা সেন উপস্থিত থাকে তাহলে তার গলায় অমনি বেজে উঠবে ঃ 'তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে'।

মজুমদার সাহেব অন্তরাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন. আর হুড়োহুড়ি কোর না, এখুনি গান গাইতে হবে। আমার সন্ধ্যেগুলো ভরিয়ে তুলতে চাই তোমার গানে।

অন্তরা বলল, আপনার দিকে তাকিয়ে যদি সব গান ভুলে যাই?

মজুমদার সাহেব এবার রসিকতা করলেন, ভয়ে না ভালোবাসায়?

অন্তরার হাসি যেন আর থামে না। তারি মাঝে বলল, দুটো মেশানো। কোম্পানীর কর্ণধারের সামনে ভয় আর নির্জন বাংলোর সঙ্গীর মুখোমুখি ভালোবাসা।

মজুমদার সাহেব এবার বললেন, গান অনেক গলার কাছ থেকে উপহার পেযেছি, কিন্তু কথা আর সুরে এমন সুস্পষ্ট মিলন একই গলা থেকে পাওয়া একটা দুর্লভ সৌভাগ্য।

অন্তরা এবার আত্মস্থ হল। তার চটুলতা দূর হয়ে গিয়ে একটা সুন্দর ভাবুকতার ছবি ফুটে উঠল মুখে।

সে ধীর গলায় বলল, আপনি গান শুনতে চান, কি গান শোনাব বলুন?

মজুমদার সাহেব বললেন, যে গান কখনো পুরনো হয় না।

অন্তরা বলল, তাহলে আমাকে ক্লাসিক্যাল গাইতে হয়। কিন্তু বিনা যন্ত্রে ওটা গাওয়া যাবে না।

মজুমদার বললেন, না, না, ওসব গলার কাজওয়ালা গান নয়, প্রাণ ঢেলে দেওয়া গান। যাকে বলে প্রেম পর্বের গান, ঐ গান মানুষের মনে চিরদিন বেঁচে থাকবে।

অন্তরা বাঁকা চোখের চাহনি হেনে বলল, আর এই পর্যায়ের গানের চাহিদাও বেশি, কি বলেন?

মজুমদার বললেন, প্রেমই তো কোম্পানীকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

অন্তরা হেসে বলল, তাই জেনেই কবি প্রেমভিখারীর হাহাকার নিয়ে গান বেঁধেছিলেন ঃ 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে'।

অন্তরা গানটি গাইল। গাইতে গাইতে ভাবের অনেক গভীরে চলে গেল। গান শেষ হলে তার মনে হল, যেন একটা শুচিতার ছোঁয়া লাগল তার গায়ে।

মজুমদার সাহেব বললেন, তুমি যে রবীন্দ্র সঙ্গীতেও কৃতী তা আমার জানা ছিল না। আধুনিক গাইয়েদের গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ঠিক তেমন করে বাজে না। অবশ্য দু'একটি শিল্পীর কথা বাদ দিলে।

অন্তরা বলল, এবার তাহলে আমাকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড করার সুযোগ দিন।

মজুমদার সাহেব বললেন, গানের প্রতিটি বিভাগে অগুণতি শিল্পী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই এক বিষয়ের শিল্পীর বিষয়ান্তরে না যাওয়াই ভাল।

অন্তরা বলল, কিন্তু দীপা মিত্র, সোমা চ্যাটার্জীর বেলা নিয়মভঙ্গ হল কেন? তারা রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর থেকে মুখ বদলাতে বিষয়ান্তরে ঘুরছে না?

মজুমদার বললেন, ওরা একদিন আমাদের ধরে উঠেছে, এখন গাছে ওঠা রপ্ত করে আমাদের ফল পেড়ে খাওয়াচ্ছে। ওদের খেয়াল-খুশিতে এখন আমাদের চলতে হয়। ওদের সঙ্গে তাল দিতে না পারলেই অন্য কোম্পানী আসরে ফল কুড়োতে নেমে যাবে।

অন্তরা বলল, যাকগে আদার ব্যাপারীর ওসব খবরে কাজ কি।

মজুমদার সাহেব কি যেন ভেবে নিলেন মনে মনে। তারপর বললেন, তোমার বেলা আমাদের কোন বাধাই নেই। তবে পয়সা চাও তো তোমার ঐ আধুনিক গানের আসর ছেড়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতে আসতে চেও না। এখানে নাম আর পয়সা দুটো করতেই সময় লাগবে।

অন্তরা বলল, আমি নিজের জায়গাতেই খুশি। বেঁচে থাক অরণ্যদেব চৌধুরীর সুর আর আমার গলা। তাতেই আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ।

মজুমদার সাহেব কি ভেবে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, জানো অরণ্যের সুর পছন্দ হল না একটি মেয়ের। প্রায় মুখের ওপর বলে গেল সেদিন।

অন্তরা তীক্ষ্ণ বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি করে বলল, পছন্দ হল না! সেই সুধাকণ্ঠী গায়িকাটি কোন স্বর্গে বিচরণ করেন?

মজুমদার সাহেব পঞ্চ'ম'কারে আসক্ত হলেও গুণী লোক। যথার্থ গলা চিনে নিতে কখনও ভুল হয় না তাঁর।

তিনি বললেন, সাধারণ একটি ফাংশানে আমি তার গান শুনেছিলাম। গলা একেবারে সাধা। শত্রুতেও প্রশংসা না করে পারবে না।

অন্তরা বলল, আপনি যখন প্রশংসা করছেন তখন নিশ্চয়ই অসাধারণ গলা।

মজুমদার সাহেব বললেন, অসাধারণ না হলেও কানে বাজার মত সুরেলা। তারপর ব্যাপারটা শোন, আমি ঠিকানা খোঁজ করে লোক মারফৎ অফিসে ডেকে পাঠালাম।

অন্তরা সরব মন্তব্য করে উঠল, কি সৌভাগ্য মেয়েটির।

মজুমদার সাহেব বললেন, নতুন প্রতিভাকে খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ।

অন্তরা বলল, তারপরের ঘটনা বলুন। মেয়েটি পড়ি কি মরি করে রেকর্ড কোম্পানীর কর্ণধার সাহেবের খাস কামরায় এসে হাজির।

মজুমদার বললেন, ঠিক তা নয়। মেয়েটি আমার লোকের মুখে খবর পাঠাল, স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে একদিন যাব। অবশ্য যাবার আগে ফোনে জানিয়ে দেব।

অন্তরা বলল, সেই পতিব্রতার জন্যে কতদিন আপনাকে প্রতীক্ষা করতে হল?

মজুমদার সাহেব বললেন, চার পাঁচদিন পরেই এলো। ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। স্বামী রত্নটিকে দেখলাম। একেবারে সদাগর অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। মেয়েটিকে তো আগেই দেখেছি, অত্যন্ত সাদামাটা ধরনের।

অন্তরা বলল, বয়েস কত?

মজুমদার ভেবে বললেন, সাতাশ-আঠাশ হবে বোধকরি। তোমাদের বয়েস অনুমান করা আবার মুসকিলের ব্যাপার কি না।

অন্তরা অমনি বলল, বলুন তো আমার বয়েস কত?

হেসে বললেন মজুমদার সাহেব, তুমি উর্বশী, অনন্তযৌবনা। তোমার বয়স এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

অন্তরা আবার হেসে দেহখানাকে নামিয়ে আনল প্রায় বিছানার কাছা-কাছি। হাসি থামলে বলল, আপনি না কিছুক্ষণ আগে আমাকে ইন্দ্রাণী বলেছিলেন? এখন ইন্দ্রসভায় সাধারণ নর্তকী হয়ে গেলাম যে।

মজুমদার সাহেবও হাসলেন। বললেন, সাধারণ নর্তকী বলছ কেন, উর্বশী অসাধারণ। মানুষের রক্তের প্রবাহে তার নৃত্যের ছন্দ।

অন্তরা বলল, আজ দারুণ দারুণ সব কথা বলছেন আপনি।

মজুমদার সাহেব বললেন, শোন হে ইয়ং লেডি, আমিও একদা রবি ঠাকুরের কবিতা মুখস্থ করেছিলাম। তার ছিটেফোঁটা এখনও মনের অতল থেকে ভেসে ওঠে।

ইয়ং লেডি বলাতে অন্তরা সেই মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ল। তার তেত্রিশ বছরের যৌবন হঠাৎ একটি মন্ত্রেই দশ বছর কমে গেল।

সে বলল, চুলে আপনার পাক ধরেছে ঠিক, কিন্তু সত্যি বলছি মিঃ মজুমদার এখনও আপনাকে দেখলে মনে হয়, এভারগ্রীন।

মজুমদার সাহেব বয়সটাকে পাঁচ বছর কমিয়ে একান্নতে বিহার করছেন। তিনি অন্তরার উদ্দীপক উক্তিতে অবশ হয়ে পড়লেন।

বললেন, বয়সের হাওয়া লেগেছে গায়ে, তবু বলি আজকের দিনের ইয়ং জেনারেশনের মত অকালে বুড়ো হয়ে যাইনি। এখনও পাকা দশ ঘন্টা অফিসের কাজ করি। রোজ চার মাইল চক্কর দিই ময়দানে। জোর কদমে দু'পা চালিয়ে গেলে হাঁফ ধরে না আজকালকার ছেলে ছোকরাদের মত।

অন্তরা বলল, আমরা কিন্তু আসল কথা থেকে অনেক দূর চলে এসেছি। অপনি কি যেন বলছিলেন সেই সতীসাধ্বী মেয়েটির সম্বন্ধে?

মজুমদার সাহেব একটু ভেবে নিয়ে কথার খেইটা ধরলেন। বললেন, মেয়েটি ঢুকেই স্বামীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ক'দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কাল থেকে অফিসে জয়েন করেছে। আজ একটু আগে-ভাগে ছুটি নিয়ে এসে পড়ল, তাই আপনার কাছে আসতে পারলাম।

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, কোথায় কাজ আপনার?

খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল লোকটি। মিনমিন করে হাত কচলে বলল, অতি সামান্য কাজ করি। মানে এই বইপত্রের দোকানে। বলার মত কিছু নয়।

মেয়েটি অমনি স্পষ্ট করে বলল, ও সোনা কোম্পানীর বইয়ের দোকানে সেলস্‌ম্যান।

হেসে বললাম, সামান্য কাজ বলছেন কেন, কোম্পানীর নামটা তো খুবই মুল্যবান। সোনা কোম্পানী!

মেয়েটি একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, ঠিকই বলেছেন আপনি। টাকা-পয়সা খুব বেশি নেই, তবে কোম্পানীর মালিকের মত এমন উচ্চ হৃদয়ের লোক খুব কম দেখা যায়। প্রতিটি কর্মচারীর বিপদ-আপদে পাশে এসে দাঁড়ান। সব রকম সাহায্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আপনাদের বিপদে দাঁড়াব বইকি, আমরা যে এক পরিবারের মানুষ। এখানে অঢেল পয়সা পাবেন না, তবে এও বলে রাখি, এর চেয়ে সম্মানের কাজ আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই। এবার স্বামীর দিকে

তাকিয়ে বলল, ইংরেজী বই পড়তে বড় ভালবাসে। মালিক জানতে পেরে বলেছেন, আপনি যত খুশি বই বাড়ি নিয়ে যাবেন, আর সাবধানে পড়ে ফেরত দিয়ে যাবেন।

লোকটি স্ত্রীর কথায় সঙ্কুচিত হয়ে বলল, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।

মেয়েটি বলল, রোজ আমাকে ও বই পড়ে শোনায়। এত ভাল ভাল বই পড়ার সুযোগ কোথায় পাব বলুন? তাই কম পয়সা হলেও এ চাকরী ছাড়তে আমাদের কারুর ইচ্ছে নেই।

তারপর কাজের কথা পাড়লাম। মেয়েটিকে বললাম, আপনার গান শুনেছি। গলা ভাল। অনুশীলন করলে আরও ভাল হবে। আমি আপনাকে রেকর্ড কোম্পানীতে একটা চান্স দিয়ে দেখতে চাই।

মেয়েটি বেশ অবাক হয়ে গেছে বলে মনে হল। অবশ্য তাকে যখন আমি ডেকেছি তখন তার কিছুটা আঁচ করা উচিত ছিল। লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখখানা হাঁ হয়ে আছে।

মেয়েটি কথা বলল, যদি মনে করেন আমার গলায় রেকর্ড হওয়া সম্ভব তাহলে আমাকে সুযোগ দিতে পারেন।

বললাম, সব জেনেই প্রস্তাবটা রাখছি আপনার কাছে। হ্যাঁ, তবে একটি কথা। আপনার গলা সুরেলা হলেও আমাদের ট্রেনারের কাছে আপনাকে বেশ কয়েকদিন ট্রেনিং নিতে আসতে হবে।

মেয়েটি কি চিন্তা করে বলল, আপনাদের ট্রেনারের নামটা জানতে পারি কি?

বললাম, অরণ্যদেব চৌধুরী। আধুনিক গানের সুরকার হিসাবে ওর জুড়ি এখন আর কেউ নেই। সিনেমা কোম্পানীগুলোকে তো প্রায় মনোপলি করে নিয়েছে।

মেয়েটি একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, জানি ওঁর খুবই নাম, তবে অমি যে ধরনের গান গাইতে অভ্যস্ত তাতে ওঁর গায়কীর সঙ্গে আমার মেজাজের মিল হওয়া সম্ভব হবে না।

অন্তরা বলল, উনি তাহলে কেবল গান গাইতেই জানেন না, মেজাজ দেখাতেও জানেন। আমরাই কেবল পারলাম না।

মজুমদার সাহেব বললেন, মেয়েটিকে আমার সরল আর বেশি রকমের বোকা বলেই মনে হল। ওকে আবার বললাম, আপনার ওসব ভেবে কাজ নেই, আমাদের কথা মত কাজ করে যান, আপনার কিছু পসিবিলিটি আছে কিনা দেখা যাক।

মেয়েটি চুপচাপ বসে থেকে কি ভাবল। তারপর বলল কি জান, আমার গুরু বলেছেন, কোন লোভের কাছে মাথা নোয়াবে না। আপনার কোম্পানীতে রেকর্ড করলে আমার নাম হবে ঠিক, কিন্তু অরণ্যদেব চৌধুরীর কাছে গান শিখলে আমার জাত খোয়াতে হবে।

বললাম, তার মানে?

মেয়েটি বলল, আধুনিক গানের নামে যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। ঐ গুলো কি সুর? যেন মনে হয়, হাঁপানীর রুগী তেড়ে ফুঁড়ে উঠে গাইছে। কিছু মনে করবেন না। আমার একটুও পছন্দ হয় না ওঁর সুর।

বললাম, সারা বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে ভেঙে পড়ে ওর গান শুনতে।

মেয়েটা বলল কি জান, আপনারাই সর্বনাশ করছেন দেশটার। আজকাল অধুনিক গানের যেমন ভাষা তেমনি সুর। আপনারাই পারতেন মানুষের রুচি বদলাতে, কিন্তু রেকর্ড বিক্রির লোভে আপনারা গা ভাসালেন। তাই আপনাদের খুব বাহারী নৌকোয় চেপে ওরা ট্যুইস্ট নাচতে নাচতে এগিয়ে যাবার সুযোগ পেল।

বললাম, আপনাদের মত ক্রেতারাই লুফে নিচ্ছেন। পড়তে পাচ্ছে না আধুনিক গানের রেকর্ড।

মেয়েটি বলল, আপনারা ভাল গান বাজারে ছাড়লে শ্রোতার কান তৈরি হত, যাঁরা রেকর্ডপ্লেয়ার কিনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ঐসব রেকর্ড কিনতেন।

ভাগ্যিস ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল। অমনি বললাম, আচ্ছা ভেবে দেখা যাবে আপনার প্রস্তাব।

ওরা স্বামী-স্ত্রী উঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গীতগুরুর নামটা জানতে পারি কি?

মেয়েটি বলল, ভবানন্দ মিত্র।

হঠাৎ চমকে উঠল অন্তরা, কি বলল, ভবানন্দ মিত্র?

মজুমদার সাহেব বললেন, এমন করে চমকে উঠলে যে? জান নাকি লোকটাকে?

অন্তরা বলল, না।

আটটি বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে আসা অন্তরা ঘূর্ণির মত পাক খেতে খেতে হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল। মজুমদার সাহেব রিটায়ার করতেই নতুন কর্ণধার এসে বসলেন তাঁর চেয়ারে। পূর্বসূরীর সব অপকীর্তি মুছে দিলেন তিনি। অন্তরার একচ্ছত্র অধিকারে নির্মম ভাবে ছেদ পড়ে গেল।

এদিকে ড্রিংক শুরু হয়েছিল মজুমদার সাহেব আর তাঁর সাকরেদদের কল্যাণে। এখন অতিরিক্ত ড্রিংক করার ফলে অন্তরার গলা হারাল তার সুরের সূক্ষ্ম কাজ। ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে মঞ্চের আড়ালে চলে গেল অন্তরা।

সে কি অবর্ণনীয় কষ্ট শিল্পীর! গানের জগতকে ধরে রাখার কি করুণ চেষ্টা। যে শিল্পীর গানে করতালি উঠত বাতাস কাঁপিয়ে, সে শিল্পীকে আসর থেকে তুলে দেবার জন্যে পড়তে লাগল হাততালি।

গলার অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য বাড়ল প্রসাধন। দিনে দিনে উগ্র হয়ে উঠল অন্তরার সাজ। কিন্তু সব করেও শেষরক্ষা হল না। ভাঁটার টানে অতি দ্রুত তখন সব কিছু গড়াতে শুরু করেছে। যারা অন্তরার সঙ্গে বারে যাওয়াটাকে ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করত, বারের কড়ি কে আগে দেবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হত, তারা হাত গুটিয়ে নিল। অন্তরা রয়ালটির পয়সা ভেঙে সপার্ষদ কিছুদিন ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টা করল। কিন্তু নতুন রেকর্ড হচ্ছে না আর, পুরনো রেকর্ডের বিক্রিও অনেক কমে এসেছে, তাই রসদে পড়ল টান।

এখন নির্বান্ধব যায় বারে। দুঃখ ভোলার জন্যে মদ গেলে আকণ্ঠ। ফলে পুরো মাতাল হয়ে বাসায় ফেরে। ট্যাক্সি প্রথম প্রথম ডেকে দিত বারের ওয়েটাররাই। কিন্তু ইদানীং টিপস পাওয়া যায় না বলে তারাও আর গ্রাহ্য করে না। নিজেকেই ডেকে নিতে হয়। যেদিন অতিরিক্ত পানের ফলে জড়তা আসে গলায়, সেদিন আর ট্যাক্সি ডাকা সম্ভব হয় না। একদিন দুদিন পথের ওপর থেকে পুলিসের লোকে টেনে তুলে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দিয়েছে।

ভবানন্দ খবর পেলেন। অন্তরার তলিয়ে যাবার খবর তাঁকে শুনতে হল। তিনি বড় আঘাত পেলেন। নিজের হাতে পোঁতা দামী ফুলের গাছটাকে পোকায় মুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলতে দেখলে যেমন দুঃখের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ঠিক তেমনি একটা অনুভূতিতে ভুগতে লাগলেন ভবানন্দ। কি করে দেখা পাওয়া যায় অন্তরার! অসময়ে একটু সহানুভূতির ছোঁয়া পেলে সে হয়তো ফিরে আসতে পারে। এখনও সংযত জীবন যাপন করলে হয়ত ফিরে পেতে পারে তার আগের ক্ষমতা।

ভবানন্দের মনে হল অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জীবনকে জানতে গেলে মূল্য দিতে হয় বড় বেশি। ভবানন্দ আগে ভাবতেন, অভিজ্ঞতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, কিন্তু এখন অন্তরার পরিণতি দেখে মনেব সে বিশ্বাসে চিড় ধরল।

শহরতলীর দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় বস্তি এলাকার একটা ছোট্ট ঘরে কম ভাড়ায় থাকে অন্তরা। বিলাসের দিন অনেক আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। এখন চলেছে কৃচ্ছ্র সাধনের দিন। দু'একটা গানের টিউশনি সম্বল। গলার সে দাপট নেই। আগের দিনের নামটুকু ভাঙিয়ে যোগাড় হয়েছে এই গান শেখানোর কাজ।

মাঝে মাঝে কি অন্তরার মনে পড়ে জয়তিলকের কথা? জয়তিলক ফিরে এসে অন্তরার কোন খোঁজ কি নিয়েছে? অন্তরার মনে হয়, সে-ও তো কোন খোঁজ রাখেনি জয়তিলকের। একটা উন্মাদনার স্রোতে কয়েকটা বছর সে ভেসে চলেছিল, সে ভুলে গিয়েছিল তার অতীতকে। গানের জগতে নাম করতে হবে, এই ছিল তার ধ্রুব মন্ত্র। সে যদি নীচে নেমে থাকে তাহলে গানের জন্যেই নেমেছে। অন্তরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে মনে মনে ভাবে, মা তার সন্তানের মুখে অন্ন দেবার জন্য, তার উন্নতির জন্য দেহ-বিক্রিও করে বলে শোনা যায়, তাহলে গানের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াতে দোষ কোথায়? চলতি দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে পায়ে পায়ে পিছিয়ে পড়তে হবে। একবার নাম হলে, রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড থাকলে, লোকে তাকে মনে রাখবে বহুকাল। তার পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পরও হয়তো সে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু দিন গেলে কেউ মনে রাখবে না, সে যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ওপরে উঠেছিল। ভাবতে ভাবতে কখনও কখনও সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন মনে কেমন যেন ছায়া ফেলতে থাকে কয়েকটা মেঘ।

টাকা দিয়ে সে যাদের টিকিট কিনে দিয়ে কনফারেন্সে করতালি কুড়োত, তারা যেন তার চারদিকে অট্টহাসি হাসে। ওদের হাসির শব্দ ছাপিয়ে যে ও গলা তুলতে পারে না। গলার স্বর কেমন যেন ভেঙে ভেঙে যায়।

বার থেকে বেহেড মাতাল হয়ে যেদিন বেরোয় সেদিন হঠাৎ সামনে ল্যাম্প পোস্টটা দেখে চমকে ওঠে। এমনি কতবার চমকে উঠেছে সে। ভবানন্দ যেন দাঁড়িয়ে আছেন। পথের ওপর আলো ফেলে বলছেন, অন্তরা আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। ঐ আলোর পথ ধরে চলে যাও। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। এ তোমার নিজের জায়গা নয়। সেখান থেকে অন্তরা টলতে টলতে সরে যায়।

এক আধদিন দেশপ্রিয় পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পায় মজুমদার সাহেব গাড়ি থেকে নামছেন। বোধহয় টেনিস কোর্টের দিকে যান। অন্তরা গা-ঢাকা দিয়ে পালায়। তার বিধ্বস্ত দেহটাকে নিয়ে সে পুরাতন পরিচিত জগতে ফিরে যেতে চায় না।

তার অনেক সময় মনে হয় মজুমদার সাহেব তার চেয়েও দুঃখী। অর্থের অভাব হয়তো তাঁর নেই, কিন্তু প্রতিপত্তির এতবড় একটা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য হারিয়ে তিনি মনে প্রাণে নিশ্চয়ই একেবারে ফতুর হয়ে গেছেন।

যারা তাঁর পাশে ঘিরে থাকত, আজ তারা মানুষটাকে পরিত্যক্ত ভুক্ত-পত্রের মত আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।

অন্তরা তাঁর কোম্পানী ছেড়ে চলে যাবার পরও বার দুয়েক দেখা করেছে। তখন অন্তরার দেহে ভাঙনের সুস্পষ্ট চিহ্ন। তাই তার দিকে চেয়ে থেকে মজুমদার সাহেবের চোখ দুটো আগের মত আর চক্ চক্ করে ওঠেনি।

যে দেহকে সম্বল করে উঠেছিল একদিন, সে দেহ চলে গেলে অন্তরার সেই বানানো স্বর্গে দাঁড়িয়ে থাকবার আর কোন অবলম্বন রইল না।

সে এখন নিজেকে সবার চোখের আড়াল থেকে সরিয়ে রাখতে চাইল। আর তার এই পরিণতির জন্য কেউ দায়ী নয়, তাই তাকে নিজেকেই বইতে হবে এ দুর্বহ জীবনের ভার। সে তাই চলমান সংসার থেকে সরে এল অনেকখানি আড়ালে।

ভবানন্দ একদিন অনেক খোঁজ করে এলেন অন্তরার শহরতলীর আস্তানায়। মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চিনতে কষ্ট হচ্ছিল অন্তরাকে।

অন্তরা ভবানন্দকে দেখে প্রণাম করল না। মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল তার। শেষবেলায় প্রসাধন সেরে বেরোচ্ছিল বারের উদ্দেশ্যে। বারের ম্যানেজার এককালে তার গান শুনতে ভালবাসত, সেই সুবাদে আজও কিছু কনসেসন পায় সে। তাছাড়া বিপত্নীক ম্যানেজার বিকৃতদর্শন পুরুষ। ওকে নিয়ে অন্তরা তার জোয়ারের যুগে বন্ধুদের সঙ্গে কত রসিকতা করেছে। এখন ঐ ম্যানেজার মাঝে

মাঝে নিঃসঙ্গ অন্তরাকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করে। কোন কোনদিন ম্যানেজার নিজের চেম্বারে অন্তরাকে ডেকে নেয়। সেদিন বারের খরচটা বেঁচে যায়। বিকৃত মানুষটারও সেদিন নিজেকে সম্রাট বলে মনে হয়। তাকে খুশি রাখার জন্যে অন্তরাকে ভাঙা গলায় ফরমায়েসী গান গাইতে হয়।

সেদিন বারে অন্তরা ম্যানেজার সাহেবের অতিথি। তাই অতিরিক্ত প্রসাধনে দেহের ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টায় একটা সকরুণ ছবি ফুটে উঠেছিল তার সারা অবয়বে।

সে অদ্ভুত একটা হাসি হেসে তাকাল ভবানন্দের দিকে। ভাবখানা এই, এদিকে কি মনে করে বৃদ্ধ?

ভবানন্দ কিছু মনে করলেন না অন্তরার ব্যবহারে। ঈশ্বর মানুষের সব ক'টি হৃদয়বৃত্তি তৈরি করার শেষে 'স্নেহ' বস্তুটিকে সৃষ্টি করেন। প্রতিটি ভাবের ত্রুটি ঐ এক স্নেহ দিয়েই ঢাকা দেন তিনি।

ভবানন্দ অন্তরার পরিণতি দেখে অভিভূত হলেন। তাঁর স্নেহ তখন হৃদয়ের উৎস থেকে বেরিয়ে এসেছে। অন্তরার কোন ত্রুটিকেই আর তিনি তখন ত্রুটি বলে মনে করতে পারছেন না।

কথা বললেন ভবানন্দ, তোকে দেখতে এলাম বেটি। অনেকদিন দেখিনি, তাই—

অন্তরা বিকৃত গলায় বলল, আজকাল অনেকদিনের চেনা মানুষেরা হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হয়। সহানুভূতি দেখিয়ে চলে যায়। মনে হয় ওরা দেখতে চায় অন্তরার একেবারে শেষ হয়ে যেতে আর কত বাকি।

কথাগুলো উত্তেজনায় বলে গিয়ে হাঁপাতে লাগল অন্তরা।

দুঃখের হাসি ফুটে উঠল ভবানন্দের মুখে। তিনি প্রতিবাদ করলেন না অন্তরার কথার। মানুষের উত্তেজনাকে বেরিয়ে যাবার পথ করে দিতে হয়। প্রতিবাদ না করে, ক্ষোভ প্রকাশ না করে সে সময় সহনশীল হতে হয়।

ভবানন্দ বললেন, দরজা থেকেই ফিরে যাব, না একটু বসতে বলবি?

অন্তরা হাত তুলে ভবানন্দকে তার একমাত্র ঘরের তক্তপোষখানা দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল।

ভবানন্দ বিছানায় বসে বললেন, অনেক দূর থেকে এলাম, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারিস।

অন্তরা ঘরের কোণে রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনল। ভবানন্দ জল খেলেন। অন্তরা বলল, চা চাইলে কিন্তু পাবে না কাকু।

ভবানন্দ অনেকদিন পরে অন্তরার মুখে কাকু ডাক শুনতে পেলেন। মনটা তাঁর কেঁপে উঠল। তবু কোন রকম উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে নিজেকে দমন করলেন।

ভবানন্দ বললেন, সকালে আর রাত্রে রেওয়াজের আগে দু'কাপ চা খাই, এখন তার বেশি আর খাই না রে।

অন্তরা অমনি স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি তো আগে দশ-পনেরো কাপ চা খেতে।

ভবানন্দ বললেন, এক এক সময় অভ্যেস মানুষকে খায়, আবার কখনো মানুষই অভ্যেসকে তাড়ায়। যদিও অভ্যেসটাকে তাড়ানো বড় কঠিন কাজ।

অন্তরা বলল, অভ্যেস তাড়ানো শুধু কঠিন কাজ নয়, বোধহয় ওটা তাড়ানো যায় না।

ভবানন্দ হেসে বললেন, তুই আজকাল সাঁঝ সকালে রেওয়াজ করিস?

অন্তরা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, রেওয়াজ, সে যে কোন যুগে করতাম তা এখন আর মনে আনতে পারি না।

ভবানন্দ বললেন, তবে, এই যে একটু আগে বললি, অভ্যাস তাড়ানো যায় না? তোর রেওয়াজ করার অভ্যেসটা তাহলে ছাড়লি কি করে?

অন্তরা হেসে উঠে বলল, তুমি উকিল হলে খুব পসার জমাতে পারতে কাকু।

ভবানন্দ বললেন, আমার ঠাকুর্দা কোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন বলে শুনেছি। নাতির রক্তে হয়ত তার রেশটুকু থেকে গেছে।

ভবানন্দ বললেন, থাক ওসব কথা। প্রতিভা না হাতি। এখন বল তোর কথা। কোথায় চলেছিস?

অন্তরা বলল, এক বন্ধুর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

ভবানন্দ বললেন, তাহলে এখন উঠি, তোকে আবার যেতে হবে এখুনি।

অন্তরা বলল, না না, তুমি বোস না। এমন কিছু জরুরী নয়, সে যাবো'খন।

ভবানন্দ বললেন, অনেক খুঁজেছি তোকে, কিন্তু কারো কাছ থেকেই হদিস পাইনি। শেষে রেকর্ড কোম্পানীতে গিয়ে সঠিক ঠিকানা পেয়ে গেলাম।

অন্তরা অবাক হয়ে বলল, কি করে? আস্তানার ঠিকানা তো ওখানে নেই।

ভবানন্দ হেসে বললেন, কোম্পানীর খাতা পাইনি ঠিক, কিন্তু ক্লার্ক নিরাপদবাবুর কাছ থেকে পেয়েছি। উনি আমার পরিচয় পেয়ে ঠিকানাটা লিখে দিলেন।

অন্তরা বলল, রেকর্ড কোম্পানীর খরচের খাতায় যে সব আর্টিস্টের নাম উঠে গেছে তাদের সবার বন্ধু এই নিরাপদবাবু।

ভবানন্দ বললেন, লোকটিকে আমার বেশ ভাল বলেই মনে হল।

অন্তরা বলল, আশ্চর্য মানুষ এই নিরাপদবাবু। বড় বড় দেমাকী আর্টিস্টদের উনি ছেড়ে কথা কন না। ওঁর মতে, যত তাড়াতাড়ি চড়চড় করে উঠবে, তত তাড়াতাড়ি হড়হড় করে নামবে। ধীরে উঠলে চুড়োয় থাকতে পারবে অনেক কাল।

ভবানন্দ বললেন, সত্যিকারের গুণী মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

অন্তরা বলল, আমরা কেউই ওঁর মুখের কাছে দাঁড়াতে পারতাম না। কোন আর্টিস্টের খাতির করে উনি কথা বলেন না। রয়ালটি হিসেব করে পেমেন্ট দেবার ভার ওঁর ওপর, তাই কেউ ওঁকে অবহেলা করতে পারে না, সবাই গিয়ে ভীড় জমায়।

ভবানন্দ বললেন, স্পষ্ট কথা বলার লোক এ দুনিয়ায় খুব বেশি নেই রে বেটি। যে বলতে পারে সে সবার অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে পিছোয় না।

অন্তরা বলল, রয়ালটি যে বেশি পেল, তার হাতে চেকটি দিয়েই নিরাপদবাবু বলতেন, এর থেকে কিছু রেখে দিও ফিক্সড্ ডিপোজিটে। আখেরে কাজে লাগবে। গলা গেলে আর ফিরে আসে না।

কথাটা হয়তো খারাপ লাগে সে সময়, কিন্তু এখন বুঝেছি কি নির্মম সত্য কথা তিনি বলেছিলেন।

ভবানন্দবাবু তাকিয়ে রইলেন অন্তরার মুখের দিকে।

অন্তরা একটু থেমে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যারা এতকাল রেকর্ড সেবা করল, কোম্পানীর কোন কৃতজ্ঞতাই নেই তাদের ওপর। সেল কমলেই নির্মম ভাবে ছাঁটাইয়ের খড়্গ এসে পড়ল। মানে মানে এখন সরে পড়। সৌজন্য দেখানোর সময় কই তাঁদের। এটা একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জায়গা নয়।

ভবানন্দ বললেন, দুঃখ করিস না, দুনিয়ার নিয়মই এই। তাই আমার বিবেচনায় যে শিল্পী নিজেকে নিরাসক্ত রেখে যত বেশি সাধনায় ডুবে থাকতে পারবে তার তত লাভ। সে সন্মান পাবে, কিন্তু দুঃখ পাবে না। আবার যে শিল্পী যথাসময়ে অবসর নিতে জানে তার কোনদিন অসম্মানের ভয় থাকে না। যদিও এই দারুণ মোহের জগৎ থেকে সরে আসা বড় কঠিন কাজ।

অন্তরা বলল, সেই যে নিরাপদবাবুর কথা হচ্ছিল কাকু! তাঁর মত এমন লোক খুব কম দেখেছি। কোম্পানীর কাছে শিল্পীদের দাম যখন কমে যায় তখন নিরাপদবাবু তাদের নানাভাবে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। হয়তো ক'জন শিল্পীর একখানা লং প্লেইং রেকর্ড হচ্ছে, তদ্বির করে পুরনো আর্টিস্টকে ঢুকিয়ে দিলেন। রেকর্ডের দোকানে গিয়ে পুরনো আর্টিস্টের প্রশংসা করে এলেন। অনুরোধ জানালেন দু'কপি পুরনো রেকর্ড রাখতে।

তাই খরচের খাতার আর্টিস্টদের মরমী বন্ধু নিরাপদবাবু। তাঁর কাছে সবার মান অভিমান দুঃখ আক্ষেপের কথা জমা থাকে।

ভবানন্দ বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে এ ঠিকানা পেয়েছি। তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা জানতে

পেরে তিনি কাগজে ঠিকানা লিখে দিতে দিতে বললেন, খুব প্রতিভা নিয়ে এসেছিল মেয়েটা, বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।

অন্তরা মেঝের ওপর চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ ভবানন্দ দেখলেন টপ্‌টপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ল অন্তরার চোখ থেকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অন্তরাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অন্তরা ততক্ষণে ঢুকে গেছে রান্নাঘরে।

একটু পরে বেরিয়ে এল একটা ফাটা প্লেটে খানিকটা বাদাম তক্তি আর একগ্লাস জল নিয়ে। বলল, নিজের কেনার পয়সা নেই, টিউশনির একটা মেয়ে দিয়েছিল, তুমি এলে আর শুধু মুখে চলে যাবে। এটুকু অন্ততঃ খেয়ে গেলে শান্তি পাব।

ভবানন্দ বললেন, তুই কি মনে করেছিস তোর কাকুর এখনও বাদাম-তক্তি খাবার বয়েস আছে? সব ক'টা দাঁত বাঁধানো রে। তবে রেখে দিলাম পকেটে, তোর দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে দিতে তো পারব না।

আবার সহানুভুতির ছোঁয়ায় অন্তরার চোখে জল এল।

ভবানন্দ বললেন, কেন এমন কৃচ্ছ্রসাধন করছিস বেটি, তোর কাকু তো মরে যায়নি। আর কেনই বা তুই ভুলে আছিস জয়তিলককে? কি করেছে ও তোর?

কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে লাগল অন্তরা, ও আমার খোঁজ নিয়েছে একদিনও? আমি বিপথে চলেছি বলে কোনদিন ও ভর্ৎসনা করেছে আমাকে? ও নিজের কাজে পাগল। কাজ পেলে ও স্ত্রীকে নয়, নিজেকেও ভুলে যায়। আমি চাই না কেউ আমাকে মনে রাখে। তুমিও না, জয়তিলকও না।

ভবানন্দ অন্তরার মুখে-চোখে প্রবল উত্তেজনার ছবি দেখে আর কিছু বললেন না।

অনেকগুলো ক্ষোভের আগুন উদ্‌গীর্ণ করে থেমে গেল অন্তরা। সেদিনের মত ভবানন্দ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন অন্তরার ঘর থেকে।

সেদিন বারে অন্তরার জন্যে একটি অভিনব প্রস্তাব অপেক্ষা করছিল। বারের ম্যানেজার অন্তরার হাতে মদের গেলাস তুলে দিয়ে বললেন, যদি আপত্তি না থাকে, এসো আজ থেকে আমরা দুজনে পার্টনার হয়ে জীবন কাটাই।

অন্তরার জোয়ারের দিনে একথা উঠলে ম্যানেজার খড়-কুটোর মত ভেসে যেত বানের ধাক্কায়, কিন্তু সেই মুহূর্তে জোরের সঙ্গে 'না' বলতে পারল না অন্তরা। সে শুধু বলল, তুমি আমার দুঃখের দিনের সঙ্গী, তোমাকে ভুলতে পারব না। তবে এতবড় একটা ডিসিসান নেবার জন্যে একটু সময় দাও আমাকে।

ম্যানেজার বললেন, তুমিও আমাকে এতদিন দেখছ, আমিও তোমাকে দেখছি, এর ভেতর ভাবনার কি আছে? আমি বিপত্নীক, আমার বৌ-এর বালাই নেই, আর তুমি স্বামীকে ছেড়ে এসেছ। তাই বলছিলাম কাল হরণের দরকার কি? বল তো আজ থেকেই আমরা থাকব একই কোয়ার্টারে।

অন্তরার ঘরে যদি ভবানন্দ আজ না আসতেন, তাঁর স্মৃতিটুকু যদি তার মনে তাজা হয়ে না থাকত, তাহলে হয়তো ম্যানেজারের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত অন্তরা। নিজের বিক্ষত হৃদয়ের নিরাময় না হলেও সাংসারিক অনটনের হাত থেকে সে মুক্তি পেত।

অন্তরা বলল, আজ আমি তোমার অতিথি হয়ে এসেছি, তোমার সঙ্গিনী হয়ে আসতে গেলে যে মনের প্রস্তুতি দরকার তা আজ আমার নেই। তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে আমার কোনরকম আপত্তির কারণ থাকতে পারে না, তবু বলি আমাকে নতুন ভাবনা নিয়ে একটা বিশেষ দিনে তোমার কাছে আসতে দাও।

ম্যানেজারের কুৎসিত মুখের ওপর জেগে ওঠা জ্বলজ্বলে দুটো চোখ হঠাৎ নিভে গেল। বিকৃত মুখখানাতে একটুখানি হাসি ফোটাতে গিয়ে তা আরও ভীষণ বীভৎস হয়ে উঠল। অন্তরা ডিনার শেষ

করে যখন পথে নামল তখন তার হাত ধরে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে গেলেন স্বয়ং ম্যানেজার। বললেন, আমার দরজা খোলা রইল তোমার জন্যে, এবার যেদিন আসবে একেবারে চলে এসো পুরনো বাসা ভেঙে দিয়ে।

অন্তরা নেশার ঘোরে বার কয়েক মাথা নেড়ে গেল।

ভোর হলে অন্তরা কোথাও আজ আর গেল না। সে পুরোপুরি যেন ছুটি উপভোগ করছে এমনি একটা মেজাজ নিয়ে পড়ে রইল বিছানার ওপর।

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ড্যাম্প লাগা ঘরের ছোপ ছোপ আঁকিবুকিগুলো দেখতে লাগল সে। তার মনে হল, চোখের ওপর নানা আকৃতির কতকগুলো মুখ ফুটে উঠেছে। কতকটা আজম খাঁ-র মত একখানা মুখ। ঠিক যেন বাঁ হাতখানা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে গান গাইছে।

আজম খাঁকে সাদি করার পর তার নাম হয়েছিল রিজিয়া। অনেক পেয়ার পেয়েছিল সে সাদির পর চার পাঁচটা মাস। গানের কাজ যতখানি সূক্ষ্ম ছিল আজমের, বিবির ওপর ব্যবহারটা ততখানি সূক্ষ্ম ছিল না। তাই মাস পাঁচেক পরে যখন অমিত-দেহভোগের তৃষ্ণা মিটল তখন ফুটে উঠল আজমের আসল ছবি। গান শেখাব জন্যে পাগল অন্তরার ওপর চলল তাচ্ছিল্যের নির্যাতন। অন্তরা দেহের নির্যাতনকে চিরদিন উপেক্ষা করে এসেছে, কিন্তু যে গানের জন্যে সে নারীর সব সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল, সেই গানের ক্ষেত্রে উপেক্ষা সে সহ্য করতে পারল না। যখন গভীর নিষ্ঠায় গলা সাধত তখন হঠাৎ তার কাছে এসে হয়তো হাজির হত আজম। রুক্ষ্ম গলায় বলত, খানা বানাও, রেওয়াজ পরে হবে। কোন কোনদিন আজমের বন্ধুরা এসে গান শুনতে চাইত অন্তরার। বলত, বাংলা গান গাও, আমরা ঐ গান শুনতে চাই।

অন্তরা গান ধরত, আর তখনি বন্ধুদের সঙ্গে উচ্চরবে আলোচনার দরকার পড়ত আজমের। এ উপেক্ষা অন্তরার মনে বড় বেশী করে বাজত। সে বুঝতে পারত না একজন জাতশিল্পীর পক্ষে কি করে এ কাণ্ড করা সম্ভব!

অন্তরার আজ মনে হল, আজমের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে বেঁচে গেছে। বারের বিকৃত দর্শন ম্যানেজারকে সে বুঝতে পারে। তার একমাত্র লোভ দেহটার ওপর, সে একথা জেনেই তার সঙ্গে মেশে। কিন্তু এই আজম খাঁর মত লোককে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। গানের উঁচুদরের শিল্পী তার সঙ্গিনীকে সঙ্গীতের জগতে টেনে নেবে, এই তো হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজম শুধু করে গেল দেহ-ভোগ। ঐ বিকৃত ম্যানেজারের চেয়েও আজমের মনটা আরও বিকারগ্রস্ত বলে মনে হল তার।

মজুমদার সাহেব যেন গলায় টাই বেঁধে বসে আছেন। অবিকল সেই ভঙ্গী সৃষ্টি হয়েছে সিলিংয়ের শ্যাওলা-ধরা রেখায়।

এই মানুষটার ওপর অন্তরার কোন ক্ষোভ নেই। মেয়েদের কাছে পাওয়া সুযোগের কখনও একটুও অপব্যবহার করেননি মজুমদার সাহেব। কিন্তু তাদের গানের লাইনে সম্ভবমত সুযোগ সুবিধা দিতে তাঁর কার্পণ্য দেখা যায়নি কোনদিন। তিনি কোম্পানীর উন্নতির জন্য অনলস কাজ করে গেছেন, কিন্তু নিজেকে অভুক্ত রেখে নয়। এ ব্যাপারে তাঁর এককালের আশ্রিতা কয়েকটি শিল্পী গানের লাইনে কিছু করে খাচ্ছে।

ঐ তো জয়তিলকের মত মনে হচ্ছে একখানা মুখ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না মুখখানা। সার্জেনের সাদা পোশাকে ঢাকা অবয়ব।

পাগল, একটি বদ্ধ পাগল। কে জানত গান ভালবেসে তার গায়িকাকে এমন বেমালুম ভুলে যাবে কেউ? যত গান বাজত অন্তরার গলায় অবসর মুহূর্তে, সব ক'টি টেপ করে রাখা চাই জয়তিলকের। খেতে শুতে নাইতে বাজাত সেই টেপ। কিছু বলতে গেলেই সরিয়ে দেবে ধাক্কা দিয়ে। যেন ঐ গানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অন্তরাব। আবার অন্য রোগও আছে। রোগী নিয়ে মত্ত হলে

জয়তিলককে আর পাওয়া যাবে না সংসারের কাজে। সিরিয়াস কোন অপারেশনের ব্যাপার হলে ক'দিন কথা বন্ধ। মানুষটা তখন বন্ধ কালা আর বোবা।

সামাজিকতার ধার ধারে না জয়তিলক। অন্তরা হয়তো তার গানের গুরুর সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নেমন্তন্ন করেছে, তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও হয়েছে. হঠাৎ আসর ছেড়ে অভদ্রের মত উঠে চলে গেল জয়তিলক। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, কি একটা গুরুতর বিষয় মনে পড়ায় সে স্টাডিতে বসে নোট করছে নিবিষ্ট হয়ে।

কোনদিন সামাজিক নেমন্তন্ন থাকলে অন্তরা হয়তো সেজে বসে আছে, যথাসময়ে দেখা নেই জয়তিলকের। চারদিকে লোক পাঠিয়েও তার হদিস মিলল না। শেষে ঘন্টা দুয়েক পরে সিগারেট টানতে টানতে ঘরে ঢুকেই বোকার মত বলল, কি ব্যাপার, এমন সেজেগুজে বসে আছ যে।

অন্তরা হয়ত রাগে ফেটে পড়ে বলল, তুমি একটা রোগিনীকে বিয়ে করলে পারতে!

জয়তিলকের উত্তর, তাই তো করেছি। তুমি সে সময় কঠিন রোগ ভোগ না করলে কে বিয়ে করত তোমাকে।

অন্তরার গলায় রাগ ঝলসে উঠল, উদ্ধার করেছ আমাকে। দয়া করে এখন চল পার্টিতে, প্লেটগুলো অন্তত: তোলার কাজ পাওয়া যাবে।

কিছুদিন জয়তিলকের সঙ্গে চলার পর অন্তরা দেখল, অসম্ভব। ওকে কারো পক্ষে চালানোর চেষ্টা করাটাই বাতুলতা। তাই নিজেই চলতে লাগল সে। গানের ফাংশন, পার্টি, পিকনিক, সব জায়গাতেই সে জয়তিলক ছাড়া ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে যদি দেখত জয়তিলক ফিরে এসেছে, তাহলে তুলকালাম লেগে যেত তাদের ভেতর। জয়তিলকের কথা হল, সারাদিন পরিশ্রমের পর সে যখন ঘরে ফিরে আসবে তখন বউ তার। ইচ্ছে হলে তার দিকে যতক্ষণ খুশি সে তাকিয়ে থাকবে। তার গান টেপ করবে। তার কানে শোনাবে সেদিনের অপারেশনের বিপদ-সঙ্কুল কাহিনী।

অন্তরাকে ভালবাসবে জয়তিলক অথচ তার স্বাধীনতাকে স্বীকার করবে না, এ কেমন কথা? সেইখানে জয়তিলকের সঙ্গে তার বিরোধ নিবিড় হয়ে উঠেছে।

জার্মানীতে যাবার আগে জয়তিলক বলল, চল আমার সঙ্গে। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন গানের জগতের সঙ্গে হবে তোমার পরিচয়। আর তাছাড়া একা একা এখানে থাকলে রাতদিন ফাংশন আর পার্টি করে বেড়াবে। হাল ধরার কেউ নেই, ঘুরে ফিরবে ঘূর্ণি জলের টানে।

শেষের কথাগুলো গরম সীসের মত কানের ভেতর কে যেন ঢেলে দিল। ঠিক ঐ ক'টি কথাই বাড়িয়ে দিল তার জেদ।

সে বলল, জার্মানীতে বিখ্যাত কোন সার্জেনের সঙ্গিনী হয়ে যাবার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। তার চেয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেকর্ড কোম্পানীর ডাইরেক্টরের চিঠি নিয়ে ওদের কলকাতা অফিসে যাওয়া অমার কাছে অনেক বেশি জরুরী।

কিছু সময় কি যেন ভাবল জয়তিলক। তারপর একসময় একেবারে শান্ত গলায় বলল, তোমার উন্নতির পথে কোনদিন আমি বাধা হয়ে দাঁড়াব না। কলকাতা যাচ্ছ যাও, তবে আঙ্কেলের সাহায্য আর পরামর্শ নিতে ভুলবে না। ওঁর মত শুভার্থী তোমার আর কেউ নেই।

অন্তরার মনে আবার একটা ধাক্কা এসে লাগল। কেন, ভবানন্দ মিত্র ছাড়া কি তার নিজের একটি পা-ও চলার ক্ষমতা নেই? জয়তিলক তার ওপর বার বার বিশ্বাস হারাচ্ছে কেন? সে তাহলে নিজের পথেই চলবে। জীবনের অনেক ক'টা বছর স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে সে যেমন চলেছিল এখনও তেমনি চলবে। মনে মনে জয়তিলক যদি তাকে বিশ্বাস করতে না পেরে থাকে তাহলে চোখে চোখে রাখার পাঁচিলের ভেতর সে আবদ্ধ হয়ে থাকবে না।

জয়তিলকের সেদিনের কথায় সে আর কোন জবাব দেয়নি।

কলকাতায় ফিরে এসে অন্তরা তার নিজের পথেই চলেছিল। আজ তার এই পরিণতির জন্যে সে কাউকে দায়ী করতে যাবে না, নীরবে নিজের কৃতকর্মের প্রয়শ্চিত্ত করে যাবে।

অন্তরা কয়েকটা সপ্তাহ নিজেকে প্রায় ঘরের ভেতর বন্দী করে রাখল। না গেল টিউশনিতে না গেল বারে। নিজেকে এমন নির্বাসিত করে রাখা এই বুঝি তার জীবনে প্রথম।

কিন্তু আর বুঝি থাকা যায় না। কড়ি সংগ্রহের জন্যেও অন্ততঃ বেরোতে হয়।

অভাবিত ভাবে টাকা এলো রেকর্ড কোম্পানীর কাছ থেকে। তার রয়ালটির টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন নিরাপদবাবু। অন্তরার মনে হল, সে ভারত-সম্রাজ্ঞী। এতগুলো টাকা হঠাৎ হাতে এসে পড়লে কে না নিজেকে সম্রাজ্ঞী বলে মনে করে।

টাকা ক্যাশ হবার পর অন্তরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে বেরোল বারের দিকে। উদ্দেশ্য, আজ সে ম্যানেজারকে তার নিজের পয়সা খরচ করে খাওয়াবে। সে লোকটাকে বিয়ে করুক আর না করুক, তার কাছে তার ঋণের পরিমাণ কম নয়। অনেকদিন পরে আবার পরিচিত পৃথিবীতে বেরোল অন্তরা। বেশ কিছুদিন উগ্র পানীয় আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে দূরে নিজেকে সরিয়ে রাখার ফলে অন্তরা আবার উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে উঠেছিল। আজ পথে চলতে গিয়ে নিজের শক্তিকে যেন সে ফিরে পেল। কয়েকটা পুরনো টিউশনির বাড়ি সে ঘুরে ঘুরে গান গাইল। নিজের কানে নিজের গলার এমন সুর কতদিন সে শোনেনি। না থাক আগের গলা, অন্ততঃ একটু সুর গলায় থাকলে সে আরও অনেককাল টিউশনির কাজটা চালিয়ে যেতে পারবে। তাতে খাবার অভাবটা তার নাও হতে পারে।

সন্ধ্যার একটু পরে বারের পথে পা বাড়াল অন্তরা। পথে এক গুচ্ছ গোলাপ কিনল কি যেন ভেবে। পথ পেরিয়ে এসে উঠল বারের দোতলায়।

ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে দেখল ঘর শূন্য। একটা বেয়ারা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার সাহেবের কথা।

বেয়ারা বলল, আপনি অনেকদিন আসেননি, তাই না?

অন্তরা বলল, হ্যাঁ, তা না হয় হল, কিন্তু ম্যানেজার সাহেবকে দেখছি না কেন?

বেয়ারাটা জানত ম্যানেজার সাহেবের ঘরে মহিলাটির যাতায়াত ছিল। সে তাই একটু ঘুরিয়ে বলল, আপনার মত সাহেবও অনেকদিন আসেননি।

অন্তরা বলল, অনেকদিন আসেন নি, কেন? অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো?

বেয়ারা বলল, পক্স হয়েছে বলে শুনেছি। স্মল আর চিকেন মেশা। একসময় অবস্থা নাকি খুব খারাপ হয়েছিল, এখন শুনছি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

অন্তরার মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। বলল, তুমি কখনো ওঁর কোয়ার্টারে গেছ?

বেয়ারা বলল, গেছি বইকি। অবশ্য অসুখ হবার পরে আর যাইনি।

অন্তরা বেয়ারার কাছ থেকে ম্যানেজারের বাসার হদিশটা নিয়ে চলতে লাগল। অপরিচিত কয়েকটা ছোট বড় রাস্তা পেরিয়ে সে একসময় এসে পৌছল ম্যানেজারের বাসায়।

ম্যানেজার সাহেব এক চিলতে লনের ওপর বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ভেতরের ঘরে দেখা যাচ্ছিল একটা আয়া জাতীর মেয়ে ঘোরাফেরা করছে।

চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে অন্তরা বলল, কেমন আছ?

চমকে অন্তবার দিকে ফিরে তাকালেন ম্যানেজার সাহেব। গলায় বিস্ময় উপচে পড়ছে, তুমি! সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি।

অন্তরার গলায় গভীর আন্তরিকতার সুর বাজল। সে বলল, সন্ধ্যে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, বাতাসে এখনও ঠাণ্ডার আমেজ আছে, চল ঘরের ভেতর বসি।

ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ঘরের দিকে। পেছন পেছন চলল অন্তরা।

ঘরের ভেতর দুটো চেয়ারে এসে বসল তারা। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। কারো মুখে কথা নেই। ম্যানেজার দেখলেন, অন্তরা যেন নতুন শ্রী পেয়েছে। তার খসে পড়া যৌবন জাদুর ছোঁয়ায় ভরন্ত হয়ে উঠেছে। চোখের কোলে কালির চিহ্ন এখন অনেক ফিকে।

ম্যানেজার অবাক হয়ে দেখছিলেন অন্তরার পরিবর্তন। কিছু পরে অন্তরার কাছে নিজেকে বড় বেমানান আর অসহায় বলে মনে হল। তিনি চোখ অন্যদিকে ফেরালেন।

অন্তরা দেখছিল ম্যানেজারকে। ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেছে, কিন্তু গভীর দাগগুলো মেলায়নি। বিধাতা যেন বিকৃত মুখখানাকে কত বীভৎস করে গড়া যায় তার পরীক্ষা করছেন ম্যানেজারের ওপর।

হঠাৎ এই কুৎসিত মানুষটা অন্তরার হৃদয়ে আলোড়ন তুলল। তাব মনে হল, মানুষটা কখনও কারো ভালোবাসা পায়নি, আর পাওয়া সম্ভবও নয়। তাই একটুখানি ভালোবাসার উত্তাপে তাকে উত্তপ্ত করে তুলতে ইচ্ছে হল তার।

অন্তরা গলার সুর নরম করে বলল, কতদিন তোমাকে দেখিনি।

ম্যানেজার অন্তরার গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া পেলেন। তাঁর বর্তমান চেহারা নিয়ে কোন মেয়ের সামনে যে দাঁড়ানো যায় না, এ অনুভূতি তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠেছিল. কিন্তু অন্তরার কোমল আন্তরিকতার ছোঁয়ায় তা দূর হয়ে গেল।

তিনি বললেন, আমার অসুখের খবর পেলে কবে?

অন্তরা বলল, আজই খবরটা জানলাম! অনেকদিন বারে আসিনি।

ম্যানেজার বললেন, বাঁচার আশা ছিল না। মনে হচ্ছে নতুন জীবন পেলাম। অসুখের সময় কেন জানি না প্রায়ই তোমার কথা মনে হত।

অন্তরা বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে অসুখের সময় তোমার কাছে আসতে পারিনি বলে।

ম্যানেজার বললেন, ঐটুকু কথা যে বললে অন্তবা, তাতেই আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করছি। তুমি আজ এসেছ, এ রোগের কথা শুনলে আর কেউ আসত কিনা জানি না।

অন্তরা বলল, আয়া রেখেছ নিশ্চয়ই।

ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ। তবে সেবার চেয়ে টাকার খাঁই বেশি। রাতে ডেকে ডেকে গলা শুকিয়ে গেলেও ঘুম থেকে জেগে কেউ পাশে এসে একবারটি দাঁড়াত না। একটু যখন ভাল হয়ে উঠলাম তখন টাকার জন্যে ঘন ঘন তাগাদা। হাত কাঁপে তবু চেকে সই করে দিতে হল। যে টাকায় চুক্তি হয়েছিল তা আগে ভাগেই নেওয়া হয়ে গেছে। এখন অসহায় পেয়ে নানা অজুহাত দেখিয়ে টাকা টানছে।

অন্তরা বলল, আজই ওকে ডেকে বিদেয় করে দাও।

ম্যানেজার অন্তরার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে দেখে অন্তরা আবার বলল, আমি আছি, এখন তো তুমি প্রায় সুস্থ হয়েই উঠেছ। তোমার এটুকু সংসারের কাজ এক হাতেই চালিয়ে নিতে পারব।

ম্যানেজার অন্তরার হাতখানা টেনে নিয়ে কতক্ষণ ধরে রাখলেন তাঁর হাতের ভেতর। একসময় বললেন, তোমাকে আমার ঘরে থাকতে বলি এ সাহস আমার নেই অন্তরা। একদিন হয়তো অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমাকে নিয়ে, আজ এই বসন্তের দাগেভবা মুখখানা নিয়ে সে স্বপ্ন দেখাটা পাগলামি ছাড়া আর কি হতে পারে বল?

অন্তরা উঠে দাঁড়িয়ে ম্যানেজারের মাথাটা নিজের দেহে আলতো করে চেপে ধরে বলল, কোন কথা নয়। তোমার কাছে আজ আমি এসেছি বন্ধু হয়ে। চিরদিন যদি আমরা স্বামী স্ত্রী হয়ে সংসার করতে নাও পারি, বন্ধু হয়ে থাকতে ক্ষতি কি। আজ আমাকে তোমার সবচেয়ে বেশি দরকার, তাই এসেছি তোমার কাছে। আবার যখন আমাদের দরকাব ফুরোবে তখন যেন সহজেই বাঁধন ছিঁড়তে পারি।

ম্যানেজার তার মাথাখানা গভীর অনুরাগ আর কৃতজ্ঞতায় ঘষতে লাগল অন্তরার পোশাকের ওপর।

ম্যানেজারের কুৎসিত মুখখানায় একটা অসহায় ছবি ফুটে উঠতে দেখে অন্তরা তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে রইল।

ভেলোরে জয়তিলকের কোয়ার্টারে বসেছিলেন ভবানন্দ আর জয়তিলক মুখোমুখি। কথা হচ্ছিল তাদের ভেতর।

ভবানন্দ বললেন, আমি যে তোমার এখানে কোনদিন আসব তা একবাবও ভাবিনি জয়তিলক।

জয়তিলক হেসে বলল, আমিই কেবল আঙ্কলকে দেখতে যাব আর আঙ্কল আমার কাছে আসবেন না তা কি করে হয়? তাই বিধাতা বিচার করে আঙ্কলকে আমার কাছে এনে দিলেন।

ভবানন্দ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর এক সময় মনের গভীর থেকে বললেন, মানুষকে ভালবাসার মত দুঃখ নেই জয়তিলক। সে কাছে থাকলে হারাই হারাই ভাব, আর সে দূরে সরে গেলে অভিমানের যন্ত্রণা।

জয়তিলক বলল, আঙ্কল আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি, অনেক বন্ধু অনেক পরিচিত পবিবর্তিত হয়ে গেছে, কিন্তু আঙ্কল ভবানন্দ মিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। বিশ্বাস করুন আঙ্কল, আপনার কথা ভাবলে সবার ওপর থেকে আমার সব অভিমান চলে যায়।

ভবানন্দ বললেন, কিন্তু আমি তো কারো দুঃখ ঘোচাতে পারলাম না জয়তিলক। চেষ্টা করেছি সবাইকে আগলে রাখতে, ভালবাসা দিয়ে বাঁধতে, কিন্তু সব বাঁধন আলগা হয়ে গেছে।

জয়তিলক বলল, আমি কিন্তু তেমনি আছি আঙ্কল। আপনাকে ভুলিনি।

ভবানন্দ বললেন, সে আমি জানি জয়তিলক। তবে মাঝে মাঝে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। তোমাদের জীবনের এই একটা ট্র্যাজেডি ঘটার ব্যাপারে নিজেকে যেন কিছুতেই অপরাধমুক্ত বলে ভাবতে পারছি না।

জয়তিলক মনে হল একটুখানি উদাস হয়ে গেল। পরক্ষণেই সে ম্লান হাসি হেসে বলল, অনেক হার্ট অপারেশান করলাম আঙ্কল, কিন্তু হৃদয়ের রহস্য আমার কাছে দুর্বোধ্যই রয়ে গেল।

ভবানন্দ বললেন, যাঁরা মনোবিশ্লেষণ করে সব কিছু ধরতে পারেন বলে বড়াই করেন, হৃদয়ের ওঠা-পড়ার ছন্দ তাঁদের কাছেও অজ্ঞাত।

জয়তিলক এবার অন্য কথা পাড়ল, আচ্ছা আঙ্কল, এতক্ষণ আপনি আপনার বেটির কথা বললেন না তো? কেমন আছে ও? আজ প্রায় দুমাস ওর কোন খবব আসছে না।

ভবানন্দ অবাক হয়ে সোফার ওপর সিধে হয়ে বসলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে অন্তরার?

জয়তিলক বলল, ওর সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ না থাকলেও আমার কলকাতার ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। তারাই ওর ওঠানামার খবর জানিয়ে আসছে আমাকে। ও যে বারে যাতায়াত করে আমার এক ছেলেবেলার বন্ধু ঐ বারের ওয়ার্কিং পার্টনার। সে আমাকে প্রায় সব কথাই লিখে জানায়। শুধু ওর মাস দুয়েকের খবর ও পাচ্ছে না।

ভবানন্দ বললেন, আমি ওর সম্বন্ধে তোমাব চেয়ে অনেক কম খবর রাখি জয়তিলক। ও আমাকে এতদিন এড়িয়ে চলেছিল, মাস দুয়েক আগে ওর বাসার খোঁজ করে গিয়েছিলাম।

জয়তিলকেব গলায় ঔৎসুক্যের সুব বাজল, কেমন দেখলেন ওকে?

ভবানন্দ বললেন, নিজের দুঃখের জালে ও এমন করে জড়িয়ে পড়েছে, সেখান থেকে ও চেষ্টা করেও মুক্তি পেতে পারছে না।

একটু থেমে আবার বললেন, ওর চোখে জল আর মুখে তেজ দেখেছি। বলেছিল, জয়তিলক কি আমার খোঁজ নিয়েছে কোনদিন? তার স্ত্রী বিপথে গেল বলে ভর্ৎসনা করেছে কখনো?

জয়তিলক বলল, অন্তরার অভিযোগ মিথ্যে নয় আঙ্কল। আমি আমার কাজ নিয়েই পাগল হয়েছিলাম, ওর ওপর বলতে পারেন অবিচারই করেছি।

ভবানন্দ বললেন, এখনও দেরি হয়ে যায়নি জয়তিলক। দুজনের ভেতর যে অভিমান আর অনুশোচনা এসেছে, তাই তোমাদের পুনর্মিলনের পথকে সুগম করে দেবে। অবশ্য যদি মিলনের ইচ্ছে এখনও থেকে থাকে মনে।

জয়তিলক বলল, আমি ডাক্তার, দেহের অন্ধিসন্ধি আমার অজানা নয়। তাই দেহের লোভে যে আমি ওকে গ্রহণ করিনি, এটুকু আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।

ভবানন্দ বললেন, তোমাকে অমি চিনেছি প্রথম থেকেই, কিন্তু যে ছিল আমার একেবারে পাশটিতে সে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

জয়তিলক বলল, ওর গানের প্রতিভাই আমাকে আকর্ষণ করেছিল আঙ্কল, যেজন্য ওকে অসুস্থ জেনেও আমি গ্রহণ করেছিলাম।

ভবানন্দ বললেন, অন্তরার একটি সন্তান যদি থাকত তাহলে হয়তো ও জীবনটাকে এমন করে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারত না।

জয়তিলক বলল, দেহের ক্ষুধায় ও যে ঘুরে বেড়ায় তা কিন্তু নয় আঙ্কল। ও দেহ সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের নির্লিপ্ত। নিজের সঙ্গীত আর সেই পথে উন্নতির শীর্ষে ওঠা, এই ওর স্বপ্ন। তার জন্য দেহের মর্যাদাকে ও ধুলোর মত উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

ভবানন্দ বললেন, তুমি অন্তরাকে সত্যিই ভালোবাস জয়তিলক, না হলে তাকে এমন করে বিশ্লেষণ করতে পারতে না।

জয়তিলক ভবানন্দকে ডেকে নিয়ে গেল বেডরুমে! ভবানন্দ দেখলেন চারিটি দেয়ালে অন্তত ছ'খানা বিভিন্ন ধরনের রঙীন ছবি টাঙানো অন্তরার।

জয়তিলক বলল, বসুন।

ভবানন্দ সুসজ্জিত ঘরে বসলেন।

জয়তিলক বলল, পাশাপাশি দুটো বিছানা দেখছেন, ঐ দক্ষিণেরটা অন্তরার। আজও ওটি সমান যত্নে সাজানো থাকে। ওর ওপরে দেখছেন অন্তরার তানপুরা। ওখানে বসে সকালে ও রেওয়াজ করত।

ভবানন্দ বুঝলেন, শিল্পী অন্তরাকে কতখানি ভালোবাসা দিয়েছে ডাক্তার জয়তিলক। সে অন্তরার বর্তমান জীবনের সবকিছু জেনেও তাকে মনের থেকে টেনে ফেলে দেয়নি দূরে।

জয়তিলক বলল, গান শুনুন আঙ্কল। ভাল স্টিরিও এনেছি আমি!

ভবানন্দ কান পাতলেন। জয়তিলক একটি করে রেকর্ড বসায় আর বলে কত তারিখে সেই রেকর্ড বাজারে বেরিয়েছিল।

সব ক'টি গানের শিল্পী অন্তরা। তার শেষ রেকর্ডটিও জয়তিলকের সংগ্রহ থেকে বাদ যায়নি।

ভবানন্দ বললেন, জয়তিলক, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক ওপরে। তোমাকে সকলে মস্ত বড় সার্জেন বলেই জানল কিন্তু তার আড়ালে কত বড় মরমী একটা মানুষ লুকিয়ে আছে তা জানল না।

হাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ নিয়ে ম্যানেজারের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছিল অন্তরা, পাশে এসে দাঁড়াল একখানা গাড়ি। গলিপথের কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্প পোস্টের আলো থেকে চেনা যাচ্ছিল না গাড়ির আরোহীকে।

অন্তরা ফিরে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়াল যে, সে যেন বহু যুগের ওপার থেকে এসেছে। অপলক দাঁড়িয়ে তাকে যেন চেনার চেষ্টা করছে সে। জয়তিলক বলল, চল অন্তরা, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। অনেক ঘুরে তবে পেয়েছি তোমার এ আস্তানার সন্ধান।

অন্তরা কোন কথা বলতে পারছে না, শুধু তার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

জয়তিলক বলল, স্বামী বলে স্বীকার করে যদি না আসতে চাও, অন্ততঃ ডাক্তার বলে এসো। আমি জানি তুমি দেহে মনে বড় ক্লান্ত। এ সময় ডক্তারকে তার কর্তব্যটুকু করার সুযোগ দাও।

অন্তরার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে দাঁত দিয়ে অধর দংশন করে নিজের উত্তেজনা চাপবার চেষ্টা করতে লাগল।

জয়তিলক আরও কাছে গিয়ে রজনীগন্ধা-সহ ধরল অন্তরার হাত। বলল, আর ক্ষোভ অভিমান নয় অন্তরা, তোমার সাজানো গানের ঘর তোমাকে ডেকেছে, তুমি চল মনে এতটুকু গ্লানি দ্বিধা না রেখে।

অন্তরা প্রবল আবেগে মাথা নেড়ে বলল, আমি পারব না, পারব না জয়তিলক ঐ ঘরে যেতে। গান গাইতে আমি আর কোনদিন পারব না। গানের জগৎ থেকে অন্তরার নাম মুছে গেছে।

জয়তিলক বলল, একদিন যখন অসুস্থ ছিলে তখন আর কোনদিন গান গাইতে পারবে না বলে বলেছিলে, কিন্তু সেই অন্তরা আবার গান গাইল। তাই বলছি, আমার হাতে সব ভার ছেড়ে দাও, তোমাকে সুস্থ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব গানের জগতে। যেখানে শুধু তুমি আর আমি। তুমি গাইবে আর আমি শুনব।

অন্তরা বলল, অপেক্ষা কর জয়তিলক, আমি আসছি। বড় সংকট মুহূর্তে তুমি এসে পড়েছ। বলতে বলতে অন্তরা ঢুকে গেল ম্যানেজার সাহেবের কোয়ার্টারে।

আজ ম্যানেজারের ড্রইং কাম ডাইনিং রুম আলো ঝলমল। দামী পানীয়ের ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে ম্যানেজার। কাজে যোগ দিয়েছে হপ্তা খানেক। আজ তাই অন্তরার সঙ্গে পান ভোজনের পাকাপাকি ব্যবস্থার শুরু। এই রাতের থেকে অন্তরাকে একান্তে পেতে চান ম্যানেজার সাহেব।

ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিল অন্তরা। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল তখন সে। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে রজনীগন্ধা। ভেতরের ঘর থেকে পায়ের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন ম্যানেজার। আজ তাঁর পরনে সব সেরা পোশাকখানা মনের খুশিকে বাইরে প্রকাশ করছিল।

ম্যানেজার সাহেব অন্তরাকে এ অবস্থায় দেখে প্রথমে একটুখানি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন।

কি হয়েছে অন্তরা, কি হয়েছে তোমার? ম্যানেজারের গলায় উদ্বেগ ভেঙে পড়ল। অন্তরা ম্যানেজার সাহেবের বুকে মুখ রেখে একরাশ কান্না ঝরিয়ে যখন স্থির হয়ে দাঁড়াল তখন ম্যানেজারের মূক, অবাক চোখ দু'টো জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে তাকিয়ে অন্তরার দিকে।

অন্তরা নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে এখান থেকে।

ম্যানেজার হতাশ-রুদ্ধ গলায় বলল, কেন অন্তরা, আমাকে এমন করে একা ফেলে রেখে যেতে চাইছ?

অন্তরা বলল, আমার স্বামী আজ প্রায় এক যুগ পরে বহুদূর থেকে এসেছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। বার থেকে ঠিকানা নিয়ে এ বাড়ি খোঁজ করে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে।

হঠাৎ কি হল, ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ম্যানেজার সাহেব। বললেন, সেকি, বন্ধুমানুষকে তুমি বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছ! চল চল, ভেতরে ডেকে নিয়ে আসি।

অন্তরাকে একদিকে সরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরোলেন ম্যানেজার সাহেব। পেছন পেছন তাঁকে অনুসরণ করে পায়ে পায়ে এল অন্তরা।

ম্যানেজার জয়তিলকের সামনে গিয়ে বললেন, আরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আপনি অন্তরার স্বামী, মানে আমার বন্ধু হলেন। আসুন গরীবখানায়। লেট্‌স হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক।

জয়তিলকের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন ম্যানেজার। পান ভোজনের সব সরঞ্জামই প্রস্তুত। ওরা এসে বসল। অন্তরা শুধু ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। শোবার ঘরে খাটে আজ সুন্দর নতুন বেড কভার পাতা হয়েছে। অন্তরার জীবনে শেষ সংসার রচনার অনুষ্ঠান এ শয্যা। হাতে ধরে থাকা রজনীগন্ধার গুচ্ছ অন্তরা অনেক যত্নে শুইয়ে রেখে দিল বিছানার ওপর। বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুক ভেঙে যেন বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। ওরা দুজনে কিছু খেল, ড্রিঙ্ক করল, কিন্তু অনেক অনুরোধেও অন্তরা আজ আর ড্রিঙ্ক করল না। সে শুধু চেয়ে চেয়ে ঐ কুৎসিত মানুষটাকে দেখতে লাগল। তার মনে হল, একটা অনেক উঁচু হৃদয় থেকে ঐ বিকৃত মুখখানার ওপর আশ্চর্য এক আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্তরাকে নিয়ে জয়তিলকের গাড়ি গলি পেরিয়ে আসছিল। ব্যাক গ্লাসের ভেতর দিয়ে অন্তরা তাকিয়েছিল পেছন দিকে। খানিক দূরে অস্পষ্ট এক দীর্ঘদেহী মানুষ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তখনও একই ভাবে হাত নেড়ে চলেছিল।

গাড়ি বাঁক নিতেই সব মুছে গেল। অমনি জয়তিলকের গায়ে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল অন্তরা।

●